সবাই শেষ দেখা দেখতে এসেছেন। চাসনালার আকাশে বাতাসে এখন কান্নার রোল

১৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৩শে জানুয়ারী ৭৬ ॥ দাম : ৪০ পঃ

কল্যাণ ঘোষ

অবশেষে দুর্ঘটনার তেইশদিন পর জলপ্লাবিত খনি চাসনালা থেকে কয়েকজন শ্রমিকের পচা গলা মৃতদেহ তুলে আনা হল। অনেক আশা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি দেখলাম রামলীলা ময়দানে। যে শ্রমিকদের মৃতদেহ তুলে আনা হয়েছে, দুজন ছাড়া কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি। সনাক্তকরণ করা হয়েছে মেটাল বেল্টের নম্বর দেখে। অদের এক-জনের নাম কালী বাউরী, অপরজনের নাম সম্ভবত মহম্মদ ইসমাইল। দ্বিতীয় মৃতদেহটি সাঁওতাল মহম্মদ ইসমাইলের কিনা তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কালীবাউরীর মৃত-দেহে খনিঅঞ্চল সংলগ্ন রামলীলা ময়দানেই দাহ করা হয়। আঠেরো তারিখ রাত থেকেই আটক খনি শ্রমিকদের আত্মীয়রা খনিমুখে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সকালে কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার করার পর উপস্থিত শ্রমিকপরিবার্গ-গুলির কান্নায় চাসনালার আকাশ ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। একদিকে মৃতদেহের পচা গন্ধ, অপরদিকে কান্নার রোল দরের দিলে উপস্থিত জনতেরও সকাল হয়ে ওঠে বিষণ্ণ। এ পর্যন্ত সাতজন শ্রমিকের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আর পাওয়া গেছে শরীরবিহীন একটি মস্তক।

রামলীলা ময়দানে অনেকগুলি কাঠের মঞ্চ সাজানো হয়েছে পর পর। উদ্দেশ্য মাতে মৃতের আত্মীয়রা শেষবারের মত দেখতে পারে তাদের প্রিয়জনকে। শ্রমিকের আত্মীয়পরিজনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে কাঠের বেঞ্চগুলি দেয়া একটি জায়গা। ঠিক হয়েছে, মৃতদেহ ওইবার পর ময়না তদন্ত হবে, তার-পর দেহগুলিকে লাল কাপড় মুড়ে রাখা হবে সাজানো মঞ্চে। তারপর পুলিশপহরাতে করে দেহগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে দামোদর নদ তীর-বর্তী কোন স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য।

(সেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

রাজ্যপালের নির্দেশে চৌ এন লাইয়ের স্মরণসভা বাতিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এক নির্দেশে গত সতেরই জানুয়ারী শনিবার কলকাতায় হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজ্য কমিটি কর্তৃক আয়োজিত চৌ এন লাইয়ের স্মরণসভা বাতিল করে দিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে এই সভা বাতিল করা এবং একথা উপযুক্ত সময়ে জনসাধারণকে জানতে না পারার ফলে বিকেলে ত্যাগরাজ হলের সামনে অনে-কেই হাজির হন। সেখানে সি পি আই (এম) নেতা শ্রীলক্ষ্মী সেন ও শ্রীপ্রশস্ত শূর সমবেত কর্মিদের রাজ্য-পালের আদেশের কথা জানান। অতঃপর সকলে ত্যাগরাজ হলের সামনে এক মিনিট নীরবতা পালন করে প্রয়াত রাষ্ট্রনায়ক চৌ এন লাইয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৪ই জানুয়ারী স্যাদরাত হলে আটটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক আয়োজিত আর একটি সভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। ফলে সেই সভাটিও অনু-ষ্ঠিত হতে পারেনি।

গত ১৮ই অক্টোবর জন কবহারলাল নেহরুর শাসন ও শক্তি স্বাধীনতার ওপর একটি ঘরোয়া সভার বোম্বাইয়ে ডিনার হলে কয়েক-আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীজে সি শা এবং বোম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীএম সি চাগলার ভাষণ দেবার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ কমিশনার সেই সম্মেলনের জন্য প্রয়ো-জনীয় অনুমতি দেননি। এই ব্যাপারে এখন সুপ্রীম কোর্টে মামলা চলছে।

ভারতে পাপ ব্যবসার চাঞ্চল্যকর তথ্য

(দর্পণের নিজস্ব সংবাদদাতা)

ভারতে চুরি, জালিয়াতি, স্মাগ-লিং, বলাৎকার, ডাকাতি যাহা-জানি, খুন, মেয়ে-চুরি, নেতাগিরি, ঘোষাই ঘোরার ঘোপন কারবারের চলাও ব্যবসায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই পাপ ব্যবসার সঙ্গে বিরাট উঁচু মহ-লের যোগাযোগের অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রকাশ, এই অবৈধ কার-বারের পেছনে রয়েছে কুখ্যাত মাফিয়া বংশের এক সংগঠন। অভি-যোগে প্রকাশ, এই ভারতীয় মাফিয়া সংগঠনের পেছনে রয়েছেন সরাজের বড় বড় মাথা। কিছু সৎ সাংবাদিক ও সরকারী অফিসার এই পাপ-চক্রকে উৎঘাটন করতে গিয়ে হয় নিজেদের প্রাণ হারিয়েছেন অথবা চাকরী খুইয়েছেন অথবা বদলি হয়েছেন অন্যত্র। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ওঁরা "পদোন্নতি"পেয়েছেন।

রাষ্ট্র সংঘের ড্রাগ কমিশনের মতে, বছরে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের যে ব্যবসা হয় তার পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকার মতে, এই বেআইনী ব্যবসার এক তৃতীয়াংশ আসে ভারতের বুক থেকে। এ ছাড়া, বছরে যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা হয় তার পরিমাণও বছরে দু হাজার কোটি টাকা।

সম্প্রতি ক্যাপ্টেন কোলাবা-ভালা লিখিত "ইন্ডিয়ান মাফিয়া ইন্ অ্যাকশন" নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই পাপচক্র সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন কোলাবা-ভালা বোম্বাই থেকে শুরু করে ভারতের বড় বড় শহরের গোপন পাপ ব্যবসা সম্পর্কে নিজের জীবন বিপন্ন করে খবর সংগ্রহ করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন কি ভাবে সৎ সাংবাদিক আয়ারকে খুন করা হয়। শ্রীআয়ার পি টি আই কর্মী ছিলেন এবং তিনি বোম্বা-ইয়ের গোপন অপরাধ জগত সম্পর্কে নানা দরদ খবর লিখতেন। কোলা-বাভালার অভিযোগ যে, অপরাধ জগতের নায়করা আয়ারের ওপর ভীষণ চটে ছিলেন। তাই ১৯৬৯ সালে বোম্বাই-পাঁচগানি রোডে তিনি মোটর "দুর্ঘটনায়" আহত হন। প্রকাশ, শ্রীআয়ার নিজের গাড়ীতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ঘ-টনায় গাড়ীর ক্ষতি নাকি সামান্যই হয়েছিল। দুর্ঘটনার পরদিন সেই

(সেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সঞ্জয় গান্ধী আসছেন ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এন এস সি সি-র রাজ্য সম্মেলনে সঞ্জয় গান্ধী ভাষণ দেবেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে। এই সম্মেলন বিশে থেকে বাইশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে।

সঞ্জয় গান্ধীর ফেব্রুয়ারী মাসের সাত তারিখে কলকাতার আসার কথা ছিল। কিন্তু ঐ তারিখে তিনি আসছেন না। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি কলকাতায় আসবেন।

কলকাতায় অবস্থান কালে সঞ্জয় গান্ধী জনসাধে এক যুব-ছাত্র জমায়েতে ভাষণ দেবেন। রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করার পর সঞ্জয় এই প্রথমবার কলকাতায় আসছেন। তাই এ ব্যাপারে কংগ্রেস মহলে খুব তোড়জোড় চলছে।

যুব ছাত্র জমায়েতে কত লোক হয় তার উপর বর্তমান ক্ষমতাসীন যুব নেতৃত্বের মর্যাদা অনেকটা নির্ভর করছে। কারণ সঞ্জয় গান্ধী এবার দেখবেন যে, কত সংখ্যায় ছাত্র-যুব নতুন নেতৃ-ত্বের পেছনে আছে। তাই এই জমা-য়েতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে তোলার জন্য বর্তমান ক্ষমতা-

(সেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

হাসপাতালে ডাঃ বিধান রায়ের অপঘাতে মৃত্যু

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যাদবপুর কুমুদশঙ্কর রায় বক্ষ্যা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বিধান রায়ের মূর্তিটি সরিয়ে দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেখানে কে এস রায়-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়ে-ছেন বলে সর্বভারতীয় যুব নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জী অভিযোগ করেছেন।

এই ঘটনার খবর পেয়ে পঙ্কজবাবু হাসপাতালে যান। সেখানে কয়েকশ স্থানীয় জনসাধা-রণ উপস্থিত। তারা সকলেই উত্তেজিত। তাদের বক্তব্য কে এস রায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হোক তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু বিধান রায়ের মূর্তি ভেঙে দিয়ে সেখানে অন্য কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বরদাস্ত করা যায় না।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিধান রায়ের মূর্তিটি ভেঙ্গে আবর্জনার স্তূপে ফেলে রেখেছে। আর বিধান রায়ের মূর্তিটি যে বাক্সায় ছিল সেখানে বসানো হচ্ছে কুমুদশঙ্কর রায়ের মূর্তি।

পঙ্কজবাবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছেন, দয়া করে আপনারা নব বাংলার রূপকার বিধান রায়কে নির্বাসনে পাঠাবেন? না। যে এস রায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হলে আমিও খুশী হব। এবং কে এস রায়ের মূর্তিটি বিধান রায়ের মূর্তির পাশেই বসানো হোক। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য পঙ্কজবাবু অনু-রোধ জানিয়েছেন।

দর্পণ

১৯তম বার্ষিক সংখ্যা

আগামী ২৬শে জানুয়ারী দর্পণ উনবিংশ বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে দর্পণের ৩০শে জানু-য়ারীর সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এতে থাকবে বিভিন্ন বিষয়ে সময়োচিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং সেই সঙ্গে যাত্রা সম্পর্কে একটি ক্রোড়পত্র। দাম এক টাকা।

ফ্যাসীবাদী শাসনের বিরুদ্ধে স্পেনে বামপন্থী অভ্যুত্থানের সূচনা

দীর্ঘকালবাদে স্পেন থেকে আশার খবর আসছে। দেশে ফ্যাসীবাদী একতন্ত্রী শাসনের বদলে গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রবর্তনের দাবীতে স্পেনের মানুষ সংগ্রাম শুরু করেছেন। ১৯৩৬ সালে ফ্রাঙ্কো ক্ষমতায় আসার পর দেশে এক ফ্যাসীবাদী শাসনের প্রবর্তন হয়। গত বছর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর ফ্রাঙ্কোর অনুগামীরা রাজা জুয়ান কার্লোসকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। দীর্ঘকাল ফ্যাসীবাদী শাসনে নিষ্পেষিত স্পেনের মানুষ এখন গণতন্ত্র চান। কিন্তু দেশের ঘটি বহুৎ দল, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রীদল নিষিদ্ধ। এমন কি প্রগতিশীল ধর্মযাজকরা পর্যন্ত সরকারের চক্ষুশূল। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী শাসনে দেশের অর্থনীতি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। জীবনধারণের আন পশ্চিম য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক নীচে। জীবনের শেষ দশকে ফ্যাসিস্ত নেতা ফ্রাঙ্কো এটা প্রত্যক্ষ করে গেছে যে, আর স্পেন একনায়কত্ব সহ্য করবে না। বিশেষ করে ফ্রাঙ্কোর সামরিক বাহিনীর প্রায় পঁচিশ অফিসার সহ স্পেনের প্রতিষ্ঠিত লেখক, বুদ্ধিজীবী শ্রমিক নেতাদের ইস্তাহার এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সর্বশেষ্ট ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রসঙ্গটি বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়। এছাড়া, ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আইনী করার দাবীও তোলা হয়। এখানেই শেষ নয়, বার্সিলোনা, আদ্রিদ এবং বাস্কে অঞ্চলে শ্রমিক বিক্ষোভ সংগঠিত হতে থাকে। এ অবস্থায় জুয়ান কার্লোসকে ক্ষমতায় বসানো হয় এবং এই ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, জুয়ান কার্লোস স্পেনে কিছুটা পশ্চিমী ধরনের সাঁমাবদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেবেন। চতুর রাজা জুয়ান কার্লোস কিন্তু রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পেনের সাধারণ মানুষের মূল দাবী এখনো অবহেলিত।

দেশে জরুরী অবস্থার অবসান, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী বেতন এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবীতে সমস্ত স্পেনে হরাই জানুয়ারী থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। এখন সেই ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটের চেহারা নিচ্ছে। বর্তমানে চার লক্ষ ধর্মঘটীর মধ্যে রয়েছে আদি হাজার টেলিফোন কর্মী, তিন হাজার ব্যাঙ্ক কর্মী, এক লক্ষ খনি ও ইস্পাত শ্রমিক। এই ধর্মঘটের ফলে রাজধানী মাদ্রিদের জীবনযাত্রা প্রায় অচল। রাস্তায় অজস্রদের দাবীর সমর্থনে হাজার হাজার ছাত্র বেরিয়ে পড়েছে। গ্রামগুলোও সাড়া পড়েছে। খরার জন্য যার দেশ-ত্যাগী বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকে গোপনে দেশে

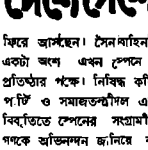

ফিরে আসছেন। সৈন্যবাহিনীর বড় একটা অংশে এখন স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রীদল এক যুক্ত বিবৃতিতে স্পেনের সংগ্রামী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত না স্পেনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে।

স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ক্রমেই উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। বলতে গেলে, বসক অঞ্চলে জনগণের ছোটখাটো অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। সমস্ত দেশের বড় শহরের দেয়ালগুলো নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট পার্টির পোস্টারে ভরে গেছে। পুলিশের সঙ্গে ছোটখাটো সংগ্রাম হচ্ছে। বহু লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত লক্ষ লক্ষ মানুষকে সামরিক আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করছে রাজা জুয়ান কার্লোস। ধৃত বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এগিয়ে এসেছেন স্পেনের বুদ্ধিজীবী মানুষ।

শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য রাজা কার্লোসের সরকার এক অভিনব পদ্ধতি বের করেছে। স্পেন সরকার লোভ দেখাচ্ছেন শ্রমিকদের এই বলে যে, যারা ধর্মঘটে যোগ দেবে না তাদের সৈন্যবাহিনীতে ভালো চাকরী দেওয়া হবে। জানা যায়, এই প্রলোভনে স্পেনের শ্রমিকদের বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

সঞ্জয় গান্ধী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সঞ্জয় যুব নেতারা চেষ্টার ত্রুটি রাখবেন না।

এদিকে এন এল সি সি-র রাজ্য সম্মেলনে সঞ্জয় গান্ধী ভাষণ দেবেন শুনে আই এন টি ইউ সি-র কয়েকজন নেতা বেশ বিব্রত বোধ করছেন। এন এল সি সি-র রাজ্য সম্মেলন সঞ্জয়ের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে এই সংস্থাকে কংগ্রেসী শ্রমিক কর্মচারী মহলে আরও কায়েক অধিপত্য বিস্তার করতে সাহায্য করবে। তাতে আই এন টি ইউ সি-র পক্ষে অসুবিধা হওয়ারই কথা।

চাসনালা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম উদ্ধারকারী দলটি খনিতে নামেনি সকাল ছয়টায়। তারা উঠে এলেন কয়েকটি মৃতদেহ নিয়ে সাতটা পাঁচ মিনিটে। প্রথম উদ্ধারকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন কুলবন্ত সিং। শ্রীসিং খনি থেকে উঠে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন সংবাদিকদের কাছে। তিনি বলেন, খনিতে কোমর জল, হাওয়া ঢোকার পথ বন্ধ, করলা তোলার টব গাড়িগুলি দুমড়ে মুচড়ে যতত্রত পড়ে আছে। খনিতে কত কেঁসে জল ঢুকেছে সে কথা বলতে গিয়ে শ্রীসিং বলেছেন তিনি প্রায় কুড়ি টন ওজনের একটি মেসিনকে উল্টে পড়ে থাকতে দেখেছেন। এর দ্বারাই বোঝা উচিত কত বেগে জল ঢুকেছে।

দ্বিতীয় উদ্ধারকারী দলটি নামে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। এই দলটিতে ছিলেন কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের খনি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি এন মিটাল শ্রীএ কে রুয়, কাঁপেন সামন্ত, শ্রীজি এস মারহাওয়া, শ্রীএস কুমার, শ্রীএস প্রসাদ, শ্রীসেমি ও চাসনালা কলিয়ারীর চীফ একজিকিউটিভ মিঃ ওরি।

তাছাড়াও শ্রীস ডি বাজাজের নেতৃত্বে দশজন ইঞ্জিনীয়ারের একটি দল খনিগর্ভে নেমেছিলেন খনির অবস্থা দেখার জন্য। এই পর্যবেক্ষক দলের নেতা শ্রীবাজাজ কথাপ্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছিলেন হয়তো এই খনিকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করতে হবে। যদি এই খনিকে আবার কাজের উপযুক্ত করে তুলতে হয় তবে তা হবে প্রচর ব্যয়সাপেক্ষ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, তারা খনির যে নক্সা পেয়েছেন তা ভুল। কারণ, মাপ অনেকারী তারা খনিগর্ভকে জলমুক্ত করার চেষ্টা করে দেখেছেন যে খনিটি আসলে আরও বেশী গভীর, কিন্তু তাদের হাতে ভুল তথ্য সরবরাহের জন্য জল তোলার কাজ কিছুটা কাহত হয়েছে। প্রথম স্তর থেকে জল বার করতে যে সময় লাগবে বলে অনুমিত হচ্ছে ছিল কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, লাগল তার অনেক বেশী সময়। বিশেষজ্ঞরা প্রথমে বলেছিলেন যে খনিকে সম্পূর্ণ জলমুক্ত করতে দিন কুড়ি লাগবে। কিন্তু প্রথম স্তর থেকে অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশ ফুটে যে স্তরে কয়লা কাটা হয় তার থেকে জল বার করতেই লেগে গেল বাইশ দিন। তাও প্রথম স্তর সম্পূর্ণ জলমুক্ত হয় নি। কোথাও কোমর জল কোথাও কোথাও বা তারও বেশী জল রয়েছে বলে উদ্ধারকারী দলের ধারণা। পার্শ্ববর্তী খনিটি থেকে জল এই প্রথম স্তর ভেদ করেই খনিটিকে প্লাবিত করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

এখনও মৃতদেহ উদ্ধার কর্য চলছে। এইমাত্র (২০-১-৭৬) খবর পেলাম এখন পর্যন্ত মোট তেরটি মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকদের আত্মীয়পরিজনেরা প্রবল শীত উপেক্ষা করে অপেক্ষা করছেন মৃতদেহ সনাক্তকরণ এবং শেষ সৎকার আশায়। উদ্ধার কার্য এখনও চলছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আরো অনেক মৃতদেহের সন্ধান তারা পেয়েছেন। খনির ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে। সেই সঙ্গে মৃতদেহের পচাগন্ধ মিশে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে খনিগর্ভের প্রথম স্তরে।

ইস্করাত জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসোরীন বুটাপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে অভ্যাশকে বলেছেন, এই দুর্ঘটনার ফলে তার সম্পদ বেশ কিছু, তরুণ কর্মিদের কর্মীকে হারিয়েছে। কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ভরণপোষণের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়েছে যে, প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে। আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে এ পর্যন্ত মোট পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার টাকার। দুর্গত পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্রন করা এবং রেলে যাতায়াতের জন্য ফ্রি রেল পাশ দেয়া হচ্ছে বলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানলেন।

ইস্কারার বার্ণপুর হাসপাতালের এক চিকিৎসক দল শ্রমিক কলোনীগুলিতে ঘুরে ঘুরে দুর্গত পরিবারগুলির সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখেছেন। যাতে মহামারী না ছড়িয়ে পড়ে সেইজন্য ঐ চিকিৎসক দলটি আপ্রাণ কাজ করে চলেছেন। এই চিকিৎসক দলটিতে রয়েছেন দজন মহিলা সহ আট জন চিকিৎসক। এই দলের নেতা ডাঃ কাঞ্জিলাল জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বাইশজন মহিলা গর্ভবতী। তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।

ধানবাদের ডেপুটি কমিশনার খনিশ্রমিক কলোনী এলাকায় সুদখোর মহাজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন যাতে সুদখোরদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে বিরক্ত না করতে পারে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সাতজন সুদখোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদখোরদের আক্রমণ থেকে শ্রমিক পরিবারগুলিকে বাঁচানো যাবে কি? কারণ কুলি-সর্দাররাই আসলে সুদখোর। তাদের প্রতাপ প্রবল।

চাসনালা আজ গমগমে, লোকারণ্য। পচাগন্ধ বাতাসকে করে তুলেছে ভারী। সেই গন্ধ ঢাকবার জন্য ছড়ানো হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার এবং উগ্র সুগন্ধী ইউক্যালিপটাস তেল। প্রথম স্তরের উদ্ধার কাজ শেষ হলেই দ্বিতীয় স্তরের জল বার করা শুরু হবে। আবার মৃতদেহের পাহাড় জমবে। আর একবার কান্নাকাটির ঝড় বইবে। ক্রমশঃ সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। স্মৃতি পরিণত হবে বিস্মৃতিতে। আবার হয়তো এই খনি কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে, শ্রমিকরা কাজ করবে নতুন ভাবে। এই সব হতভাগ্য শ্রমিকদের আর কেউ মনে রাখবে না। যদি আবার কখনো কোন খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে তখন উদ্ধারণ বা উপমা হিসেবে উচ্চারিত হবে এই ভাগ্যহত শ্রমিকদের কথা।

কন্সোল রুম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ যে খনিগর্ভ পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে খনিতে একটি এয়ার পকেটের সৃষ্টি হয়েছে, এবং অনুমান করা হচ্ছে যে কিছু শ্রমিক হয়তো জীবিত আছেন। পর্যবেক্ষক দলের জনৈক সদস্য জনৈক মোট বাইশ জন শ্রমিক হয়ত ঐ এয়ার পকেটে বেঁচে আছেন। খনিপথ অবরুদ্ধ থাকায় তারা এখনো উদ্ধারকারের উদ্ধার করতে পারেন নি। যত শীঘ্র হয় তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

খনিশ্রমিক নেতা বামপন্থী মধোজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন যে, লোভ এবং উপকরণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাবের জন্যই খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া কয়লা তোলা এবং কাটার পদ্ধতি আধুনিক না হওয়ার জন্যই চাসনালাতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন যতদিন না এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন খনিশ্রমিকরা লোভের মুখোশ নিজেদের বলি দেবে।

গরু দান প্রকল্প প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলস্টেন জারসী এবং অস্ট্রেলিয়ার ভলো জাতের গবাদি পশু আরা শঙ্কর গরু মহিষ উৎপাদন এবং দোহন প্রকল্পে বিস্তর ঘটাবার যে ব্যবস্থা চালাচ্ছেন তা মার খাচ্ছে। কথা ছিল ডেয়ারী দপ্তর রাজ্য সরকারের যব দপ্তরের মাধ্যমে গরু এবং ছাগল পোষার জন্য বেকার শিক্ষিত ছেলেদের ঋণ দেবে। এই বাপারে উৎসাহী বেকারদা সরকারের প্রস্তাবিত এবং দেওয়া স্কীম (প্রকল্প) নিয়ে ব্লকের দরজায় হাজির হচ্ছে। সেখানে ব্লকের বাবরা হেসেই অস্থির, প্রকল্পটি নাকি একরকম অসম্ভব মুক্তমান অনুযায়ী প্রস্তুত। এখন ঐ টাকায় গরু পোষা সম্ভব নয়। বাঁচতে টাকা দেবে না। এদিকে প্রায় চারশত ঐ ধরণের ভালো স্কীম পাশ হয়ে আছে অথচ গরু কেথায় পাওয়া যাবে তা ব্লকদপ্তর কিবা ডেয়ারী দপ্তর কেউ ঠিকমত বলতে পারছে না। গরুর নাকি অভাব। বাকী স্কীম তৈরীর অভাব নেই। নদীয়ার চাকদহ কল্যাণী এবং মদনপুরে বেসব ভলো জাতের গরু বিক্রি হচ্ছে তাদের অনেকের গোসব রোগ টি বি আছে বা বাঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে বলে প্রোগ্রেসিভ কলিয়ারাল সোসাইটির ইউনিয়ন আলী হালদার জানিয়েছেন। সরকারের দোহন উন্নয়ন দপ্তর বা ডেয়ারী দপ্তরের উচিত হরিণঘাটা ফার্ম থেকে গরু কিনে দেওয়া। ফার্ম থেকে যে সব টি বি রোগগ্রস্ত গরুকে গুলি করে হত্যা করার কথা সেই গরুই বেকার শিক্ষিত উদ্যমী যুবকদের ভাগ্যে জুটেছে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মীদের দৌলতে।

নেতাজীর অন্তর্ধানের কাহিনী

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে পালিয়ে মুক্তি পেয়েই সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বালুচর ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ীতে এসে নিজের শয়ন-কক্ষেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। দোতার দিকে বাইরের সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করলেও শেষের দিকে বাইরের কারও সাথেই বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের যাঁরা আসতেন—তাঁদের আমরাই বলতেম—তিনি গুরুতর অসুস্থ, দেখা করা ডাক্তারের নিষেধ।

এবার ছেলে গিয়েই তিনি গোঁফ রাখা সুরু করলেন। গোঁফ গজাতে তাঁর দেরী হত তাই তিনি সুরু থেকেই গোঁফ কামানো বন্ধ করে দিলেন। অনশনের সময় থেকে দাড়ি কামানোও বন্ধ করলেন। পালিয়ে মুক্তি পাবার পর বাড়ীতেও আর গোঁফ দাড়ি কামাতেন না। ক্রমে মুখমণ্ডল দাড়ি আর গোঁফে ভরাট হয়ে উঠলো।

তাঁর শয়ন কক্ষের বিছানার দুপাশে থাকতো সীতা আর চণ্ডী। ভাবখানা এই তিনি সর্বদাই আধ্যাত্মিক সাধনায় রত। এ সময়ে তাঁর ঘরে বাইরের কারও উপস্থিতি তিনি পছন্দ করতেন না। ২৪ আদালতে যে মামলা চলছিল তাঁর নামে, সেই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দিন ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যে মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করা হোক—সেটা দিতেন ডাক্তার যে) এবং সর্বশেষ সার্টিফিকেটটি দিয়েছিলেন ডাঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী। বক্তব্যে Date এর তারিখ-পত্রে তাই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করে বলা হত, তিনি গুরুতর অসুস্থ।

বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র যখন হলওয়েল আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী—সেই সময় গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করলেন। গান্ধীজী তাঁর একান্ত অনুগামী বাছাই করা সত্যাগ্রহীদের একক ভাবে ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দিলেন। শান্তিপূর্ণ এই সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি মনোনীত করলেন তাঁরই একান্ত অনুগামী শ্রীবিনোবা ভাবেকে। এই সত্যাগ্রহীদের সুযুক্ত বিরুদ্ধে যে স্লোগান তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তা হল "আংরেজী ইস লড়াইমে—না এক পাই, না এক ভাই।" জেল থেকে পালিয়ে মুক্তিলাভের পর সুভাষচন্দ্র এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সুযোগটি গ্রহণ করতে চাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—ইংরাজ রাজশক্তির মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তিনি এই সময় গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে একখানা পত্র লিখলেন। তাতে তিনি এই মত ব্যক্ত করলেন, "আপনার নেতৃত্বে একজন সৈনিক হিসাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশ নিতে চাই। আপনার আশীর্বাদ আর অনুমোদন প্রত্যাশা করি।"

ইতিমধ্যে মিঞা আকবর শাহকে তিনি কলকাতার ভলব করেছেন। মিঞা আকবর শাহ সে সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি। সীমান্তের উপজাতিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাঙাকাকাবাবু মিঞা আকবর শাহকে বল্লেন—তিনি আকালি অথবা কীর্তিকিষাণ কোন দলের প্রতি আর ভরসা করবেন না—যখন যে ফাঁস হয়ে যায়। আকবর শাহ যেন তাঁর গোপনে ভারত ত্যাগের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে আসেন। রাঙাকাকাবাবু আমার নির্দেশ দিলেন মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে আমি যেন যোগাযোগ রেখে চলি।

কলকাতায় তাঁর থাকার ব্যবস্থার ভার ছিল আমার ওপর। প্রভাবশালী পার্কের উত্তর পশ্চিম কোণে ইণ্ডিয়া হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা আমিই করে দিই। মিঞা আকবর শাহ দুবার কলকাতায় এলেন। গভীর রাতে নিভৃতে এলগিন রোডের বাড়ীতে তাঁদের মধ্যে গোপনে আলোচনা হত। সে আলোচনা একান্তই রাঙাকাকাবাবু ও মিঞা আকবর শাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আকবর শাহ চলে গেলেন নওশেরায়। সে খা নে কীর্তিকিষাণের একমাত্র সমস্ত ভরণপোষণ ভত্তাবধারের সঙ্গে সমস্ত কিছু গোপন ব্যবস্থা পাকা করে আবার তিনি ফিরে এলেন। এবার সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লকের মাথার মাপের ফিল্ডিবারা টুপি—জিন্না-ক্যাপ।

পেশোয়ার থেকে তাঁর শরীরের মাপ অনুযায়ী পালওয়ার আমার কথা সেদিন চিন্তায় আসেনি। কলকাতা থেকে পালওয়ার কেনাটা তখন আর সম্ভব ছিল না। হঠাৎ যদি পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের নজরে পড়ে যায়।

ইতিমধ্যে বড়দিনের অবকাশে ভাইসরয় কলকাতায় এসেছেন। স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার টেলিফোনে আমায় সংবাদ দিলেন। সেদিন তিনি বল্লেন—ভাইসরয় তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ক্যাবিনেট-এ যোগদান সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার জন্য। সংবাদটি আমি জানালেম রাঙাকাকাবাবুর কাছে। শুনে তিনি বল্লেন, "তাঁর দেখা করে লাভ কী? আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। চেয়েছিলাম যেন তেন প্রকারে কারা-প্রাচীরের বাইরে চলে আসা। সুতরাং আর দেখা করে লাভ নেই। তবে তুমি বরং কায়দা করে বলে দাও—গভীর আমার অসুখ। দেখা করাটা ডাক্তারের নিষেধ। দুঃখ হলে আমি দেখা করব।" আমি তাঁর নির্দেশ মতো তার বাসবারীকে টেলিফোনে সেটাই জানিয়ে দিলেম।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। রাঙাকাকাবাবু যার কাছে যতটুকু গোপন কাজের দায়িত্ব দিতেন—অন্যকে সে গোপন কাজ সম্বন্ধে কিছু বলতেন না—যা জানতে দিতেন না। সমস্ত কিছুই গোপনে রাখতেন। গোপনীয়তা রক্ষাই হোল বিপ্লবী চরিত্রের বিশেষ গুণ।

তাঁর পরিকল্পিত ভারত ত্যাগের কথা অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে গোড়াতেই জানিয়েছিলেম। এবার জানালেম ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি রাজী হয়েছেন। তবে তাঁর শরীর খারাপ বলে দেখা করতে পারবেন না। ডাক্তারের নিষেধ। ভাইসরয় তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে গেলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র আমার ভূজতুত ভ্রাতা শিশির বসুকে ডেকে পাঠালেন। কারণ বাড়ী থেকে গোপনে বেরিয়ে রওনা হতে হলে এমন একজনকে মনোনীত করতে হবে যার ওপর পুলিশের নজর নেই, বিশ্বস্ত লোক হবে। অথচ সে হবে বাড়ীরই বিশ্বস্ত ছেলে। আমার বা অরবিন্দর দ্বারা সেটা সম্ভব নয় কারণ সে সময়ে আমরা দুজনেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়ে অল ইণ্ডিয়া ইয়ুথলীগ গঠন করে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছি। নিজের ব্যবহৃত গাড়ীটিও তাঁর গোপনে গৃহত্যাগে সহায়ক হবে না বরং হবে বিপদ্জনক। তাই তিনি স্থির করলেন অগ্রজ শরৎচন্দ্রের জার্মান car ওয়াণ্ডারার গাড়িটিই ব্যবহারে গৃহত্যাগের পক্ষে নিরাপদ। শিশির ভাল ড্রাইভও জানতো। আর সে সময়ে শিশির মেডিকেল ছাত্র। সক্রিয় রাজনীতিতে ও কোনদিন ছিল না। রাঙাকাকাবাবু তাঁর পরিকল্পনাটি নিখুঁত ভাবেই রচনা করে রেখেছিলেন। আমার আর এক খুল্লতাত তথা স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অন্যতম কন্যা ইলা বসু রাঙাকাকাবাবুর গৃহত্যাগের প্রাক্কালে যাবতীয় কাজের অন্যতম সহায়ক ছিলেন। আমাদের পরিবারের মধ্যে আমরা চারজনই তাঁর গোপনে গৃহত্যাগের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তুলতে সচেষ্টা ছিলেম। সেদিনের আমাদের কাজের ধারা ছিল গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রতিটি কাজের দায়িত্বকে অতি সন্তর্পণে সতর্ক ভাবে পালন করা।

শিশির বসুকে মোটর ড্রাইভ করে নিরাপদে গোমো ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কঠিন দায়িত্ব রাঙাকাকাবাবুই দিয়েছিলেন এবং এ সম্বন্ধে পথের খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং তাঁকে তিনি আই, বি, ওয়াচারদের চোখ এড়িয়ে ছদ্মবেশে মোটর যোগে গৃহত্যাগ করবেন তার বিশদ আলোচনা তিনি শিশিরের সঙ্গেই করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে শিশির তার পিতার ওয়াণ্ডারার গাড়ীটি ড্রাইভ করে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পথঘাট নিরীক্ষণের জন্য বেশ খানিকটা অংশ কয়েকবার চক্কর দিয়ে এলো।

এবার টাকা পয়সা জোগাড়ের দিকে মন দিলেন। ডাক্তার দেবেন মুখার্জীর মারফৎ জোগাড় হল চার অঙ্কের মতো টাকা। আরও দু একজন দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ডাক্তার মনমোহন বাঁদ অন্যতম। তিনিও দিয়েছিলেন চার অঙ্কের অঙ্কুরূপ টাকা।

এবার রাঙাকাকাবাবুর যাবার আয়োজন সব প্রস্তুত। গৃহত্যাগের প্রাক্কালে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। গভীর রাত, বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শিশির সন্ধ্যা-তেই ওয়াণ্ডারার গাড়ী ড্রাইভ করে আমাদের এলগিন রোডের বাড়ীতে এল। বাড়ীর কেউ জেগে আছেন কিনা। আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য রাখছি সতর্কতা বে। একবার আমার তিনতলার শয়নকক্ষের দিকে জানালা দিয়ে দেখলাম,—বাইরের রাস্তায় আমাদের বাড়ীর দামনে কুইনাথে বে আই, বি ওয়াচারম্যান বসে থাকতো দিনরাত, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা এবং তারা কী করছে। দেখলাম যে-সব ওয়াচাররা আমাদের বাড়ীর গামনে দিন রাত মোতায়েন থাকতো তারা সেদিন আমাদের বাড়ীর সামনে নেই। আমাদের বাড়ীর অদূরে পূর্বদিকের উডবার্ন পার্কের কুটপাতে শীতের রাতে ওরা সব কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় অবস্থায় নিদ্রাতুর।

নীচে দোতলায় রাঙাকাকাবাবুর ঘরে ফিরে এলেম। ইলা, আমি আর অরবিন্দ তাঁর সুটকেস বিছানা সব গোছগাছ করে দিচ্ছি। হঠাৎ এই সময় খেয়াল হল, সালোয়ার কেনার জন্য ওয়াছেল মোহার দোকানে পাঠিয়েছিলেম কিন্তু শেরুনে ওয়াচার অনুসরণ করায় কেনা সম্ভব হয়নি।

আমার দেহাকৃতির সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দেহাকৃতি একই মাপের। তাই উপায় না দেখে আমি আমার কিছু সার্ট ও পায়জামা তাঁকে দিই। তিনি পায়জামা পরলেন, গায়ে চাপালেন সেরওয়ানী, মাথায় দিলেন কিস্তিবারা টুপী। মা জননীর দেওয়া সোনার গোল রিষ্টওয়াচটি এবং দেশবন্ধুর উপহার দেওয়া স্মৃতিচিহ্ন ফাউন্টেন পেনটি সঙ্গে নিলেন।

নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কিছু আগে রাঙাকাকাবাবু আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বল্লেন, দেখতো আমার চিনতে পারা যায় কিনা? সেরওয়ানী পায়জামা পরিহিত মাথায় ফিল্ডক্যাপ শোভিত সুভাষচন্দ্রকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর চশমাটা অপরিবর্তিত থাকায় মুখটা বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

আমি বল্লেম, কালো ফ্রেমের ওই চশমাটা বদলানো দরকার। তবে ইলা সঙ্গে সঙ্গে লোহার নিপুণ থেকে একটি সরুফ্রেমের রোল্ড গোল্ডের চশমা এনে পরিয়ে দিল। চশমাটা ছিল পুরোনো। যখন কলিকাতা পৌরসভার চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন, সেই আমলে তিনি এই চশমাটা ব্যবহার করতেন।

চশমাটি চোখে পরিয়ে দিতেই তিনি বল্লেন "কাপসা দেখছি।" আমি বল্লেম, তা হোক। যেহেতু ওই কালো ফ্রেমের চশমায় আপনাকে চিনে ফেলার সামান্যতম অবকাশ রয়েছে তাই কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে আপনার পুরোনো ওই রোল্ড গোলডের সরুফ্রেমের চশমাটি পরা দরকার।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১।

ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত সাড়ে ন'য়োটা। সারা সহর যেন ঘুমোচ্ছে। নীরব রুদ্ধশ্বাস রাত। বাড়ীর পরিবারের অন্যান্য সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। জেগে আছি শুধু আমি, অরবিন্দ, শিশির আর ভগ্নী ইলা।

আগেই বলেছি শিশির ওয়াণ্ডারার গাড়ীটি নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই এ বাড়ীতে অপেক্ষা করছে। কয়েকটা দিন রোজই শিশির এই গাড়ীখানি নিয়ে শরৎবাবুর উডবার্ন পার্কের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এই বাড়ীতে আসতো। আসা যাওয়ার মহড়া দিত যাতে বাড়ীর সামনে প্রহরারত

(শেষাংশ ৪র পৃষ্ঠায়)

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

প্রশ্ন ॥ জলগমন সুনিশ্চিতি কবে প্রথম গাওয়া হয়েছিল ?

উত্তর ॥ কলকাতার ডিসেম্বর উনিশশো এগারো'তে কংগ্রেসের ছাব্বিশতম অধিবেশনে এটি গীত হয়েছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে রামসে ম্যাকডোনাল্ড, যিনি পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন, তার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তাঁর অনিবার্যকারণে তিনি আসতে না পারলে ইউ পি-র নেতা পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ধর সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

প্রশ্ন ॥ ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি কী ?

উত্তর ॥ সেদিন থেকে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে বেঁধে দেয়া হলো। ভারত থেকে কাঁচামাল সরবরাহ শুরু হলো এবং কৃষক সমাজ কিস্তবাজারের ওঠানামার সঙ্গে তাদের ভাগ্যকে বন্ধ করলো।

প্রশ্ন ॥ কৃষক-সমস্যার ব্যাপারে উনিশ শতকের মনীষীরা কীভাবে ব্যবহার করেছেন ?

উত্তর ॥ আমাদের সেকালের বুদ্ধিজীবী মনীষীগণ ছিলেন হয় জমিদার না হয় চাকুরিজীবী। তাঁরা কখনো কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। কাজেই তাঁরা দ্বিমুখো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে গেলে তাঁদের পায়ের তলার মাটি থাকে না। এবং ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৮৭৩-এ স্থানীয় জমিদারদের অন্তর্কলহের বিরুদ্ধে পাবনায় যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তার নেতৃত্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কী সৈয়দ জমিদারের মধ্যে পড়েন ?

উত্তর ॥ যতদূর জানি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি পাবনাতেই ছিল।

প্রশ্ন ॥ উনিশ শতকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেয়ার পক্ষে কী কেউ ছিলেন না ?

উত্তর ॥ ছিলেন। "ভারতীয় রায়ত" গ্রন্থের লেখক অভয়চরণ দাস। আঠারোশ একাশি সালেই তিনি প্রস্তাবটি তোলেন।

প্রশ্ন ॥ ইংরাজরা এদেশে শাসনভার গ্রহণ করবার আগে আমরা কী অন্ধকারে ছিলাম ?

উত্তর ॥ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন সাক্ষ্য দেয় না। কৃষির পরে বস্ত্রশিল্প ছিল আমাদের প্রধান শিল্প। লবণ, রেশম শিল্পেও বহুলোক নিযুক্ত ছিলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে অধিকাংশ মানুষের জীবিকা ছিল, ভূমিহীন মজুর ছিল না। আঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এ দেশে ব্রিটিশ পুঁজি খাটানো হয় নি। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের পুঁজির জন্য ভারতীয় বেনিয়াদের উপর নির্ভর করত।

প্রশ্ন ॥ এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টির কারণ কী ?

উত্তর ॥ আঠারোশ সত্তর থেকে এটিই ছিল সরকারি রাজনীতি। সাম্প্রদায়িকতাকে মদৎ দাও তাহলেই এটা যজ্ঞনীতি মহাযুদ্ধে পরিণত হবে। তাই হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ উনিশ শতকে সদ-জাগ্রত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা কী ?

উত্তর ॥ যখন দিল্লীতে জনসাধারণ ব্রিটিশ উচ্ছেদ করে ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করছেন তখন এদেশী শিক্ষিত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সহযোগী ও প্রভুভক্ত হবার তৃপ্তিতে বিভোর।

প্রশ্ন ॥ সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ইংরেজ সমর্থনের কারণ কী ?

উত্তর ॥ ব্রিটিশের সঙ্গেই তাদের আর্থিক স্বার্থ যুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ব্রিটিশ শাসনকে কী এদেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ বলা যায় ?

উত্তর ॥ এ দেশের সম্পদ লুঠ করেই ইংলণ্ডে "শিল্প বিপ্লব" ঘটেছিল এই ইতিহাস যদি ভুলে যাই, তাহলে মনে করতে বাধ্য কী ?

প্রশ্ন ॥ উনিশ শতকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা কী ?

উত্তর ॥ একটি "জমিদার দর্পণ", অপরটি "নীল দর্পণ"—দুটি বইয়ের উপরই বঙ্কিমচন্দ্র বিরূপ ছিলেন নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থেই।

প্রশ্ন ॥ 'ইদানিং পশ্চিমে বলশেভিজম, ফাসিজম প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকরণ, তার আকারপ্রকার সম্পূর্ণ বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গণতন্ত্রের আধুনিক স্বাধীনতা বড়ো ছমল।"—বলুন তো উদ্ধৃতিটি কার ?

উত্তর ॥ রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথার' ভূমিকা। রচনাকাল আষাঢ় ১৩৩০।

প্রশ্ন ॥ "তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব যুগোপযোগী চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষে মানুষে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে।" এটি কার উপলব্ধি ?

উত্তর ॥ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। রচনাকাল ১৩৪০।

প্রশ্ন ॥ চু এন লাইয়ের মৃত্যুতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

উত্তর ॥ গর্কির মৃত্যু-সংবাদে লণ্ডনের এক মহিলা-শ্রমিক উচ্চারণ করেছিলেন 'It is sad to die when one is loved by so many people'—আমিও তাই বলতে চাই।

গ্রন্থ সমীক্ষা

শরৎ সাহিত্যে কৃষিজীবী সমাজের চিত্র

সাধন গুহ

এই রাজ্যের মার্কসবাদী মহলে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে গঠনমূলক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য দৈনিক গণশক্তির সম্পাদক এবং শরৎচন্দ্রের অতীব স্নেহধন্য সরোজ মুখার্জী এম পি এবং বহু বিদ্বজ্জন শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী অথবা কমিউনিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত না করেও এই মহান কথাশিল্পীর জীবন ও সাহিত্য-কর্মের অন্তর্দ্বার্থক দিকটিকে তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্রের আর্ত সামাজিক প্রেক্ষিত বিচার করে। এদিক থেকে আর একটি নতুন সুযোজন কুমুদকুমার ভট্টাচার্যের গ্রন্থ। তাঁর একনিষ্ঠ গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে সম্প্রতি বাঙালী পাঠক সমাজে তিনি উপহার দিয়েছেন "শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক" (শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক। কুমুদকুমার ভট্টাচার্য। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, বাংলা বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২। দশ টাকা।) নামক মূল্যবান গ্রন্থটি।

বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ও জাতিতত্ত্ববিদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেছেন, "এই লেখকের অধ্যবসায়ের ভারের পাল বাঁধতে বাধা-বাধা নয়, তাঁর জলে হাত ডোবাতে হবে; আর ন্য হয়ে থেকতে প্রস্তুত হবে হবে। তিনি সমালোচনার বাঁধা পথ পরিহার করে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে নতুন গবেষণার প্রস্তুত হয়েছেন, যার সঙ্গে বহুতর সমাজ-মানসিকতার জটিল সম্পর্ক।

কুমুদবাবু তাঁর গ্রন্থে দশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন আলোচনাকে এবং পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছে শরৎচন্দ্রের "ষোড়শোক্ষর" ১৩৮২ সংখ্যার প্রকাশিত তাঁর লিখা "শরৎ চেতনার শিল্প ও প্রমিক" নামক মূল্যবান প্রবন্ধটি। গ্রন্থে উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁসের নিগূঢ় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ার টেনে এনেছেন শরৎচন্দ্রকে। কথা বাহুল্য, যে, রাঁরেণীর রেনেসাঁস কমাশিয়াল বুর্জোআ শ্রেণীর জন্যরে পরিচালিত এবং সামন্ত-তান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো উচ্ছেদের এই অংগ্রামে কৃষকশ্রেণী ছিল সক্রিয় শরিক। কিন্তু, উনিশ শতকের তথাকথিত "রণশীর রেনেসাঁস" ছিল ইংলেন্ডের মার্কেন্টাইল বুর্জোআ এবং এই দেশে তদাশ্রিত মুৎসুদ্দি বুর্জোআদের সম্মিলিত এবং সংপরিকল্পিত চক্রান্তের পরিণতি এবং এর লক্ষ্যই ছিল তদানীন্তন মন্ত্রিকর্মীদল অথণ্ড কৃষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহী চেতনাকে পর্যুদস্ত করে নব্য ভূস্বামী শ্রেণী গঠনের মধ্যদিয়ে ইংরেজের ঔপনিবেশিক ভিত পোক্ত করা। এবই সঙ্গে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় সৃষ্টি করে সামগ্রিক মুক্তিকামী ইচ্ছাকে দমন করাও ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। মেকলের অঠারোশ পঁয়ত্রিশ সালের মিনিটস অব এডুকেশনই তার প্রমাণ। এই উনিশ শতকের রেনেসাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা হলো অর্ধশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাস শতক থেকে উনিশ শতকের অন্তীম দশক পর্যন্ত পরিক্ষীপ্ত কৃষক বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিভূমিতে নির্মম কুঠারাঘাত। বস্তুতঃ, এই রেনেসাঁস এতদর্থে খণ্ডিত এবং সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। শাহেদুল্লাহ সাহেব এবং লেখকবাবুর মত মার্কসবাদে দীক্ষিত প্রবীন লেখকরা এই পটভূমিটি বিবেচনা না করেই শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ নিন্দেছেন যা তাঁদের মত প্রাজ্ঞজনদের কাছে কোন অর্থেই আমরা আশা করতে পারি নি। শরৎচন্দ্র এক নিম্ন সাম্প্রদায়িকতার পরোক্ষ শিকার ছুঁয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু, তিনি কখনও সামগ্রিক মুসলিম সম্প্রদায়কে আঘাত করেন নি. বরং মোল্লা খওলানদের হাতে অনম্য সহ্য মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষ অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন বলেই-ইতীন মত প্রকাশ করেছেন। মিহির আচার্য এতদ্সম্পর্কে "ষড়ুক্ষোম" জার্নালে বিশদ আলোচনাও করেছেন। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির প্রশ্নই অবান্তর। এতদসত্বেও অবশ্যই স্বীকার্য যে, সামগ্রিক ভাবে শরৎবাবু কিছুটা উগ্র মন্তব্যই করেছিলেন। কিন্তু, শাহেদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে "বিনা বারাসে" বিচার করলেও শরৎ সাহিত্যের কোথাও কি এই সাম্প্রদায়িক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? এবং, লেখকবাবুও কি অস্বীকার করতে পারেন যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একদা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিজে বলেছেন যে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে কবি হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু রাজ স্থাপনের চিন্তার বিভোর ছিলেন। তা বলে কি রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট করতে হবে তাঁর সামগ্রিক বিচারের জন্য? তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে 'অনেক সময় কমিউনিষ্ট নেতাকেও বিভ্রান্ত করতে পারে তার চলন্ত প্রমাণ মুজফ্ফর আহমদ সাহেব। পূর্ববঙ্গের ওপর ইয়াহিয়া খাঁর পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর তান্ডবের নিন্দা করতে গিয়ে তিনি "পশ্চিমা মুসলমান" মন্তব্যটিই প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু, এই সাময়িক প্রসত্তর্তাই কি ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 'অন্তীম জন্মদাতাকে প্রাদেশিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট?

আলোচ্য গ্রন্থে নব্য ভূস্বামীর আবির্ভাব, কৃষক পাঁড়নে ভূস্বামী শ্রেণী, রায়ত জীবনে আইন আদালত, জনজীবনের জাতীয় চেতনা ও শ্রেণী চেতনা, রংশ বিস্তার ও শরৎচন্দ্র, বিশশতকের প্রারম্ভে কৃষিজীবী সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করে কুমুদবাবু দেখিয়েছেন শরৎযুগে শ্রেণী সংগ্রামের দীর্ঘায়ত্বতা সত্ত্বেও কেমন করে কৃষক চরিত্রায়ণে গভীর অন্তর্বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র দীনম অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের শ্রেণী অবস্থান বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, "পাল্লাঙ্কবাদ ও সমসত্তান্ত্রিক শোষণাবসানের অক্লান্ত বোদ্ধা শরৎচন্দ্র রেখে গিয়েছেন তাঁর অমর সাহিত্য যা সেকালের মতো একালের পাঠকের কাছেও সোনার বন্ধনার অবসানের চরাচরে অন্তর্প্রাণিত উপস্থিতি অনুভব করবে। এই গ্রন্থে সরোজ আর্থাৎ দেখানো হয়েছে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক লাহিড়ীপুরের গ্রাম, কলকাতা মফঃস্বল শহর পশ্চিমাঞ্চল এবং ব্রহ্মদেশের যথাক্রমিক প্রাধান্য, এতে করেও সমগ্র বাংলা, সমগ্রভারত ও বহির্ভারতের চিত্রায়ণে দেখানো হয়েছে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক অবস্থান বেখানে মর্ধ্যবিত্ত শিক্ষিতের সংখ্যা বাহুল্য জন। এবং, শরৎ বর্ণের শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি নিস্পক্ষতার ফলেই মর্ধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজই একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল. কুমুদবর্দ্ধন প্রমার্শ দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেই তথ্যটি অভ্রান্ত নিদর্শন সঙ্গে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আরও লক্ষণীয় এই যে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মার্কসবাদী দৃষ্টিই প্রয়োগে যান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এবং শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বক্তব্য তথা শরৎসৃষ্ট চরিত্রের জবানীতেই তিনি শরৎচন্দ্রকে তুলে ধরেছেন। কোথাও অবৌক্তিকভাবে নিজস্ব মতামত আরোপ করতে যাননি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে যে, এতবড় গবেষণামূলক আলোচনাতে কোথাও তিনি নিজকে পন্ডিত হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেননি। অন্তঃত সর্বত্র আবেগ নিয়ে সহজ ভাষায় তিনি বইটি লিখেছেন। বইটি নিঃসন্দেহেই শরৎ-গবেষকদের কাছে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। মুদ্রণ ঝকঝকে। বাধাসা আলম অঙ্কিত প্রচ্ছদটিও আকর্ষণীয়।

নেতাজীর অন্তর্ধান

(তৃতীয় পর্বের পর)

সেলাল ব্লাকের ওয়াচারদের মনে এই প্রশ্নও হয় যে ওটা দৈনন্দিনের ঘটনা।

রাঙ্গাবাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে এবার শিশিরের সঙ্গে নিচের তলায় নেমে গেলেন রাঙ্গাকাকাবাবু। অরবিন্দ বেন্টিং আর দুইকেশ নিয়ে বাড়ীর অভ্যন্তরে রাখা ওভারকোর্ট গায়ে দুলে দিল। রাঙ্গাকাকাবাবু গাড়ীর মধ্যে বসে বললেন। শিশির ছোটের স্টার্ট দিল, নামনের ফটকটি সন্তর্পণে খুলে দিল অরবিন্দ। বাড়ীর ফটক পার হয়ে ডানদিকে বেঁক নিয়ে আবার ডাইনে এলেনবি রোড ধরে আবার বাঁয়ে ঘুরে লাডলডাউন রোড (বর্তমানে শরৎচন্দ্র বসু রোড) ধরে সার্কুলার রোড পার হয়ে ডালিমস রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) ধরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ধানবাদের পথে গভীর রাতে গাড়ী ছুটলো।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ থেকে দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধানে সপ্তম সংগ্রামের প্রস্তুতির প্রত্যাশা নিয়ে তিনি চলে গেলেন পিতৃসমৃতিবিজড়িত ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ী ছেড়ে। ধানবাদের পথে বারাতীতে, শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকনাথ বসুর বাড়ীতে এসে গাড়ী থামলো। এই বিশ্বজনক যাত্রা-পথে এলগিন রোডের বাসভবন থেকে মোচর যোগে ছদ্মবেশে নিষ্ক্রমণের ইতিহাস আমার চাইতে শিশিরই ভাল বলতে পারে কারণ সে তিল সেই মহা নিষ্ক্রমণের গোধো পর্যন্ত আনষিক যাত্রা পথের সাথী। এর পরের ইতিহাস সবারই জানা।

১০দিনের মধ্যেই ওঁকে যে-ভাবেই হোক ইংরেজ রাজশক্তির নাগালের বাইরে পৌঁছতে হবে। যাত্রা-পথের সময়-সীমা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০দিন নির্ধারিত হয়েছিল। সেই দশদিনের সময়সীমা অতিক্রমের পর ২৬শে জানুয়ারী আমরা ঘোষণা করলেম সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি হঠাৎ গৃহত্যাগ করেছেন।

গৃহত্যাগের কদিন আগে থেকেই যে কদদিন তিনি তাঁর শয়ন কক্ষে অবস্থান করছিলেন তাঁরই নির্দেশে সেই ঘরের অভ্যন্তরে আরও একটা ছিদ্রের পর্দা দিয়ে ছোট ঘর করে রাখা হয়েছিল। ওই পর্দাঘেরা ছোট্ট ঘরটিতে যেন তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার মগ্ন। কারও সঙ্গে তিনি আর দেখা করবেন না।

ইতিমধ্যে তাঁর একান্ত সচিব অমূল্য মুখার্জী মহাশয়কে চুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে গৃহভৃত্য কানাইকে ও আর ওখানে যেতে দেওয়া হোত না। প্রতিদিনকার আহার্য যথারীতি ওই পর্দার ঘেরা ছোট ঘরটির দামনের দিকে রেখে দেওয়া হোত। আহার্য গ্রহণ করে রাঙ্গাকাকাবাবু যেন শুদ্ধ পাত্রটি পর্দার বাইরে বের করে দিতেন।

আসলে কিন্তু ১৭ তারিখ থেকে আমরা অর্থাৎ আমি, অরবিন্দ ও ওরী ইলা ওই খাবারগুলি খেয়ে নিতেম এবং ঠিক তিনি যেমন পর্দার বাইরে যাওয়া দেখে থালা বাটিগুলো রেখে দিতেন সেইভাবে আমরা খাবার উদরস্থ করার পর রেখে দিতেম। রাতে তিনি যে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার পর গলা গার্গল করতেন তারপর ঘরের বাতিটির সুইচ অফ করে শুয়ে পড়তেন আমরা ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত অনুরূপ ভাবে ঘরগুলি দিতেম। এ সবই করা হোত বাইরের প্রহরারত পেশোয়ার ব্লাকের ওয়াচারদের বিভ্রান্ত করে, রাখার জন্য—যেন রাঙ্গাকাকাবাবু বাড়ীতেই রয়েছেন।

২৬শে জানুয়ারীর সকাল।

আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরী ইলা দরজা ঠেলে রাঙ্গাকাকাবাবুর ঘরে ঢুকে একটা চৈ চৈ সুরু করে দিল। আমি ও অরবিন্দ এসে আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইলাকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী ব্যাপার?

খাবার সব যেমনকার তেমনিই পড়ে রয়েছে, রাঙ্গাকাকাবাবুকে ঘরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের এই চৈ চৈ আর চেঁচামেচিতে বাড়ীর সবাই এসে জড়ো হল রাঙ্গাকাকাবাবুর ঘরে। তন্নতন্ন করে তাঁকে খোঁজার ভাণ করতে লাগলেন। যেকাকাবাবু শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন তখন বিরভূমে বাগান বাড়ীতে। আমার অগ্রজ ঔরেন্দ্রেনাথ বসু ওরফে ধনেশদাকে পাঠালেন হোল যেকাকাবাবুর বিরভূমে বাগান বাড়ীতে। গাড়ী নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল সংবাদ নিতে।

পরিত্যক্ত কাপড়ের মাঝে যথাস্থানে পড়ে রয়েছে তাঁর কালো ফ্রেমের চশমাটি। পুরাণ বদার সময় যে গরমের পাঞ্জাবীটি তিনি পরিধান করতেন সেটাও যথাস্থানে ন্যস্ত। তবে তিনি গেলেন কোথায়? রাজনীতিকে বীভৎস করে তবে কি তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে গেলেন? বাড়ীর বিভিন্ন লোক ছুটলো বিভিন্ন দিকে রাঙ্গাকাকাবাবুর সন্ধানে; কেউ গেলেন রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের দিকে আবার কেউ গেলেন কেওড়াতলা শ্মশানে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হোল কিন্তু রাঙ্গাকাকাবাবুকে কেউই খুঁজে বার করতে পারলেন না।

[শেষকের "নেতাজীর অন্তর্ধানের অকথিত কাহিনী" নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

গণনাট্যে। 'পঁয়লাল' পালার বন্দনা দেবী এবং নটসূর্য দিশীপ চট্টোপাধ্যায়। পালাটি আগামী ২৩শে জানুয়ারী বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে অভিনীত হচ্ছে।

যাত্রাশিল্পীদের দক্ষতা অপরিসীম

(দর্শকের সংবাদদাতা)

থিয়েটারের কোন কোন ব্যক্তিদের যাত্রাশিল্পের প্রতি একটা অবজ্ঞা আছে। ব্যাপারটা মোটা বৃদ্ধির, মোটা দাগের বলে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস দেখা যায়।

আবার থিয়েটার থেকে আমন্ত্রিত হয়ে যাত্রায় এসেছেন, তাদের মধ্যে ব্যঙ্গ এখানে প্রকৃতই ঠাঁই করে নিতে পেরেছেন তাঁরা জানেন কত ধৈর্য্যের আর বিপুল কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি এই শিল্প। দর্শকের আসন থেকে মঞ্চ, যাত্রাজগতের ভেতর বাইরে নিবিড় পরিচয় না থাকলে বোঝা যায়, শুধু মোটা বুদ্ধি দিয়ে এই মোটা শিল্প সম্ভব নয়।

অভিজ্ঞতা অনুশীলন আর মঞ্চ শিল্পীর অনুভূতি না থাকলে এ শিল্প সম্ভব নয়। জনসমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপের মতো একটি মঞ্চে শিল্পীরা একে একে ছুটে গিয়ে দর্শকের মনে যে ছবি এঁকে আসেন, তাদের সেই অপরিসীম জনতার পরিচয় মেলে একবার শ্রীমরুক থেকে দাঁড়িয়ে যাত্রার মঞ্চের দিকে চোখ রাখলে।

অভিনয়ের গোড়াতেই মঞ্চে ঢোকার আগে অগ্রজ অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রতি সম্মানের পর চোখে না দেখলে অনুভব করা যায় না যে এরা অভিনয় শিল্পের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান। এখানে সম্মানীয় শিল্পীর সম্মান আছে, শিক্ষার্থী শিল্পীর শ্রদ্ধাবোধ আছে।

মনে করুন এই মুহূর্তে মঞ্চ থেকে একজন অভিনেতা ফিরলেন, আবার মঞ্চে ছুটে যাবার আর মাত্র দু মিনিট আছে, এরই মধ্যে আমার মত বহিরাগত বন্ধুর সঙ্গে সাময়িক কুশল বিনিময়, আবার আমার সঙ্গে কথা শেষ না করে চলিতেই বক্তাকে রেখে গিয়ে মঞ্চে পতন এবং অপ্রত্যাশী সংলাপ দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই শৈল্পিক সচেতনতার যন্ত্রচালিতের দক্ষতা যাত্রা জগতে প্রতিটি শিল্পীর। এদের মুড থিয়েটারের অভিনেতাদের মতো নয়।

যে কোন মুহূর্তে গ্রীনরুম থেকে মঞ্চে যাবার মুল দরজায় পা রাখলেই এদের মুড। এই দক্ষতা থেকেই শিল্পীরা ক্রিকেটের বোলারের মতো 'উইথ এ্যাকশন' দৌড় শুরু করেন আর মঞ্চে গিয়ে তাদের কাজ দর্শককে আষ্টেই করা। মাপা লেখে ছুটে যেতে হয়, বিনের ঠিক বাঁধা চাই কোন সময়ে ঠিক দৌড় শুরু করলে ঠিক সময়ে মঞ্চে গিয়ে পূর্ব অভিনেতার সংলাপের শেষ থেকে শুরু করা যাবে।

এই ভাবেই যাত্রার অভিনেতারা শত রজনীর থেকে সহস্র রজনীর কিনারায় পৌঁছোচ্ছেন। আজকের রজনী যদি বাঁকুড়ায়, কালকের রজনীতে ছুটতে হতে পারে বেদিনীপুর। এই বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন, বিপুল পরিশ্রম, বিপুল দর্শকের মধ্যে যারা বাস করেন, তারা সার্থক শিল্পী হবেন না তো কে হবেন?

আবার যাত্রা সম্মেলন

বারোদিন ব্যাপী বঙ্গীয় যাত্রা সম্মেলন আজ (২৩শে জানুয়ারী) থেকে শুরু হচ্ছে বেলেঘাটায়। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন: নিউ প্রভাত অপেরা (মা সারদাময়ি) লোকনাট্য (দোয়াড়), শিল্পী-ভীর্থ (গঙ্গা-যদুনা), প্রবীণ অপেরা (ভুলেশ্বরী) নাট্য ভারতী (লালগাধর) জনতা অপেরা (স্ত্রী) তরুণ অপেরা (শ্রীউদ্ধার) মাশ্মীকার (আন্তিগোনে), বহুরূপী (মুকুরাং) বহুমুখী (রক্ত দাও), প্রতীক (মল্লিকা)।

সার্কাসের বিস্ময়!

জেমিনি সার্কাস

পার্ক সার্কাস ময়দানে

দৈনিক তিনটি শো : ১, ৪, ৭টায়

টিকিট : ১·৬০, ২·৮০, ৪·৯০ ৬·৫০

কেবলমাত্র ১ম শ্রেণী ও ডি. সি.র জন্য

ফোন : ৪৪-০০৭৪,

Standard

চাকরীচ্ছেদের আদেশ বাতিল

তিয়াত্তর সালের সাতাশে জুলাই 'শ্যালো বন্দেজ' দিন অফিসে অনুপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের রেজিস্ট্রারের ওপর ঐ বিভাগের উপসচিব তিয়াত্তর সালের ষোলই নভেম্বর চাকরী-চ্ছেদের যে আদেশ জারী করেন কলকাতা হাইকোর্ট সেই আদেশ বাতিল করে দিয়েছেন। এই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী কলকাতা হাইকোর্টে এর্ব মামলা দায়ের করেন। মামলার শুনানীর পর বিচারপতি শ্রীসত্যব্রতী মুখার্জী চাকরীচ্ছেদের উক্ত আদেশ বাতিল করে দেন। রাজ্য সরকার এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীও আপীল করেন বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জীর রায়ের যে অংশে সাতাশে জুলাই অনুপস্থিতির জন্য বেতন কাটার আদেশ বহাল রাখা হয় তার বিরুদ্ধে। এর ফলে অতঃপর বিচারপতি শ্রীমুখার্জীর রায় স্থগিত রাখার এক অন্তর্বর্তী আদেশ জারী করা হয়। গত সাতই জানুয়ারী প্রথম বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র এবং বিচারপতি শ্রীসলিলকুমার দত্ত অন্তর্বর্তী স্থগিত আদেশ তুলে দিয়ে বিচারপতি শ্রীমুখার্জীর রায় বহাল রাখেন।

পাপ বাবস'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মোটর গাড়ীটি বোম্বাই আনা হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পরদিনই গাড়ীটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আরো প্রকাশ, এ গাড়ীতে ট্রাঙ্ক-বের সঙ্গে ছিলেন

লালার একদা স্টাফ রেপোর্টারের মালিক নাকতি। পরে নাকতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আখারের মৃত্যু-রহস্য অনুঘাটিত থেকে গেছে। দুর্ঘটনার পর কে বা কারা আখারকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। হাসপাতালে আখারের বন্ধুরা গিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কোলাবাওয়ালা ছিলেন। ক্যাপ্টেনকে দেখে আখার পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "তোমাকেও ওরা ধরবে। পালাও।" পরের দিন আখার মারা যান এবং "জ্ঞত" তার দেহের গতি করা হয়। ক্যাপ্টেন কোলাবাওয়ালার মত হল সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা সবাই জানেন যে, আখারের দুর্ঘটনায় মৃত্যু মামুলি ব্যাপার।

কোলাবাওয়ালা অভিযোগ করেছেন যে, বিনা আইন প্রয়োগ করার কিছু আগে ইণ্ডিয়ান আইস স্টার হোটেলে অনবার অগুতের কিছু মাথা মিলিত হয়। তারা নাকি অনৈক আক্রমানকে বাঁচানোর জন্যে উদ্বিগ্ন ছিল। সেই বৈঠকে ঠিক করা হয় কি ভাবে উঁচু মহলে চাপ সৃষ্টি করা হবে যাতে সেই আক্রমান বেরাই পায়। সংশ্লিষ্ট আক্রমান নাকি বেআইনী মাদকদ্রব্যের মস্ত বড় পাণ্ড। তাকে বোম্বাই থেকে তিন মাসের মধ্যে তার অগেলে কেরার সরকারী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কোলাবাওয়ালা জোর গলায় বলেছেন যে, অনবার অগুতের অনৈক মুখপাত্র বলেছিলেন সংশ্লিষ্ট আক্রমান ঐ সময়ের মধ্যে বোম্বাই ত্যাগ করবে না। সে বোম্বাইতে আসে অনেক দিন থাকার অধিকার পাবে। কোলাবাওয়ালা বলেছেন, তার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যায়।

কিছু সং অফিসার যারা দেশের অপরাধ কমাতে চান তাদেরও কি ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয় তার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের অনৈক প্রবীণ অফিসার মিনি এই অপরাধ অগতের অনেক খাবার গোপন খবর ও সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করেছিলেন তাকে অল্প খদলি হয়ে যেতে হয়। কারণ তার হঠাৎ পদোন্নতি ঘটে যায়। তদলোক দিল্লী থেকে কেরার পথে বোম্বাই বিমান বন্দরে তার হাতে বরলির ও পদোন্নতির নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অফিসের ড্রয়ারের চাবি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। যে ড্রয়ারে অপরাধ অগতের বড় বড় মস্তানদের সম্পর্কে নানা তথ্য ও প্রমাণ বাধা ছিল।

কিছু কাল পূর্বে লোকসভার অনৈক সদস্য অভিযোগ করেছিলেন যে, এই অপরাধ অগতের সঙ্গে পুলিশ বিভাগ ও শুল্ক বিভাগের গোপন যোগাযোগ আছে। অন্য একজন সদস্য রাজ্যসভায় বলেই বসলেন যে, পুলিশ ও শুল্ক বিভাগের বড় বড় কর্তারা স্মাগলারদের কাছ থেকে মালোয়ারা পান।

অপরাধ অগতের আরও খবর হল, ভারতে বাৎসরিক চোরাই (স্মাগলড্) দ্রব্যের মূল্য দশ হাজার কোটি টাকা। দৈনিক বেআইনী জুয়া (বাংকা) থেকে আয় হয় পাঁচ কোটি টাকা। অনেক মস্তান ঠাট্টা করে বলেছে, "মাংকা বন্ধ করলে পুলিশরা বর্ষণ করবে।" শুধুমাত্র বোম্বাইয়ের বেস্তালয় থেকে অপরাধ অগতের মস্তানদের দৈনিক আয় হয় চার লক্ষ টাকা।

এখানে ১৯৭০ সালের অপরাধের একটি চিত্র দেওয়া গেল। ১৯৬০ সালের তুলনায় এই অপরাধ বৃদ্ধির হার চারলক্ষ। রাহাজানি ১৩২৫, ১৯৬০ সালের তুলনায় বৃদ্ধির হার শতকরা ১৭·৮ ভাগ। ডাকাতি ৯৮৩৭, ১৯৭১ ভাগ বৃদ্ধি। খুন ১৫,৭৭৮; শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি; ধরণ ১০,১১১; শতকরা ৬৭·৮ ভাগ বৃদ্ধি। গরু চুরি ৩৩৭-২১১, শতকরা ৪৭·৪ ভাগ বৃদ্ধি। সাধারণ চুরি ৯৮৩৩, শতকরা ১৪৫·১ ভাগ বৃদ্ধি। মারপিট ২২৬৭৯, শতকরা ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি; বিশ্বাসভঙ্গ ১২৩৩১, শতকরা ৩৩·৯২ ভাগ বৃদ্ধি, নোট জাল ৬১০, শতকরা ১৭·৩ ভাগ বৃদ্ধি। অন্যান্য অপরাধ ২৯৫,২৬৭; শতকরা ৬১·১ ভাগ বৃদ্ধি। শান্তিযোগ্য অপরাধ ৯৫৫-৪২২, শতকরা ৫৭·৬ ভাগ।

উপরোক্ত তথ্যগুলো পুলিশের গবেষণা সংস্থার।—১৯৭০ সালে বালক-বালিকাদের অপরাধ ভয়াবহ ভাবে বেড়ে গেছে। ১৩৫৪১৯ জন অল্প বয়সীর মধ্যে ৪৪০১ জন বেড়ে। উল্লিখিত তথ্য ছাড়াও বলা যায় যে, যে সব অপরাধ সংগঠিত হয় তার শতকরা ৩৭ অপরাধের কোন তথ্য রাখা হয় না যেগুলো প্রধানত গাঁয়ে ঘটে থাকে। ভারতের এই ভয়াবহ সমস্যার একটা দিক হল এই যে, মস্তানদের ভয়ে কেউ পুলিশের কাছে গোপনেও অভিযোগ করতে যায় না। কারণ মস্তানদের সঙ্গে পুলিশের সবিশেষ আঁতাত রয়েছে।

এই 'ভারতীয় মাফিয়াদের' ক্রিয়াকলাপ কোনদিনই বন্ধ হবে না যদি মানুষ সচেতন না হন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

নিপীড়িত মানুষের সহোদর
পল রবসন

শান্ত আচার্য

ওল্ ম্যান্ বিহাবের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে কণ্ঠস্বরকে এথেল্ ম্যানিন্ বন্দিত করেছিলেন কালো ভেল্ভেটের সঙ্গে তুলনা করে।

একাধারে গায়ক, অভিনেতা, মুক্তিযোদ্ধা, আইনবিদ্ ও মানুষের সমানাধিকারের লড়াইয়ে পুরোধা পল্ রবসন দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ফিলাডেল্ফিয়ার এক হাসপাতালে ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ চার্চের এক নিগ্রো পাদ্রীর কনিষ্ঠ পুত্র পল্ লেবর রবসন্ ১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। পলকেও শৈশব থেকে বহু নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে বড় হতে হয়েছে। তবু লেখাপড়া ও খেলায় তিনি সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যদিও পড়ার খরচ তাঁকে নিজের উপার্জনেই চালাতে হয়েছে। ১৯১৫ সালে তিনি স্নাতক হয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি নিয়ে নিউ জার্সির বিশ্ববিদ্যালয় "রাটগার্স"-এ পড়তে গেলেন। একই সঙ্গে খেলায় কৃতিত্বের জন্য রাটগার্স ফুটবল টীমের সদস্য করে নেওয়া হ'ল তাঁকে। যদিও এ ব্যাপারে বর্ণবিদ্বিষ্টি সাদা-চামড়ার ছাত্রদের প্রবল বিরোধিতা ছিল।

১৯২০ সালে রবসন্ আইন পাঠের জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। পিতার তখন মৃত্যু হয়েছে। ফলে আর্থিক অবস্থা আরো শোচনীয়। তিনি ভাকঘরে চাকরি নিলেন। গানের দলের গান গেয়ে বাস্কেটবলের শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আর্থিক বিপর্যয়, কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯২৩ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বটে তবে কালো চামড়ার জন্য জজ আইনব্যবসায় করার সুযোগ পেলেন না।

আগের মতই অর্থোপার্জন করে সংসার চালাতে চালাতে হঠাৎ ১৯২২ সালেই সুযোগ পেয়ে গেলেন অভিনয়ের। "ট্যাম্বু" নাটকের একটি প্রধান চরিত্রে। পরের বছরই প্রস্তাব এল এক পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়াইয়ের। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন পল্ কারণ তাঁর মতে, তখনকার দিনে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ ছিল নীচগতি। এদিকে ১৯২৪ সালে ইউজিন ওনীলের "এমপারার জোন্‌স্" ও "অল চাই চিলান গট উইংস" নাটক দুটিতে অভিনয় করলেন। অল্পদিনের মধ্যে নিউইয়র্কের অভিনয় জগতে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে পড়লেন। এই প্রতিষ্ঠা পেয়েই রবসন্ আমেরিকান সঙ্গীতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। নিগ্রোদের ধর্মসঙ্গীত ও নিগ্রো শ্রমিকের গান তিনি গাইতে লাগলেন বিভিন্ন আসরে। তরুণ গায়কের বলিষ্ঠ সুরেলা কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠল নিপীড়িত নিগ্রো জাতির দুঃখ সুখ আশা ও বৈরাগ্যের কথা। সেই সুরে ধ্বনিত হল পৃথিবীর শোষিত মানুষের অন্তর্দুতি। সেদিন রবসন্ এই সাধারণ লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমস্ত নিউইয়র্কবাসির এমনকি বিশ্ব নাগরিকের মনকে নাড়া দিয়েছিলেন। নিগ্রোদের মর্মবেদনার কথা এর আগে এমন করে শিল্পের মাধ্যমে কেউ বহির্জগতে পৌঁছে দেয় নি।

আমেরিকান জনগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ঢেউ এসে পৌঁছল লণ্ডনে। পল্ আমন্ত্রিত হয়ে এলেন। "এম্‌পারার্ জোন্‌স্" নাটকের ক্রীতদাস জোনসের ভূমিকায় অভিনয় করে লণ্ডনবাসীর হৃদয় জয় করলেন। ১৯২৮ সালে লণ্ডনের ড্রুরি লেন থিয়েটারে এড্‌না ফারবারের "শো বোট্" নাটকে মাঝি "জো"র ভূমিকায় "ওল্ড ম্যান রিভার" গানটি গেয়ে রবসন্ নাটকের সকল প্রশংসা একাই কুড়োলেন। এর পর স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপের বড় শহরগুলোয় গান গাওয়ার আহ্বানে তিনি ঘুরিয়ে গেলেন। আবার ফিরে এসে লণ্ডনে "ওথেলো"র নাম ভূমিকায় নামলেন। এই ভূমিকায় রবসনের অভিনয়ের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখে "মর্নিং পোস্ট" সংবাদপত্রটি মন্তব্য করল, এমন প্রাণবন্ত অভিনয় ব্রিটেনের মঞ্চে আগে কখনো দেখা যায় নি।

১৯৩৪ সালে সস্ত্রীক বাণিজ্যের গেলেন রবসন্। পরের বছরই যুক্ত-

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

অনিবার্য কারণে দর্পণের বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশ করা গেল না। তার পরিবর্তে আগামী (৯ই ফেব্রুয়ারী) সংখ্যাটি বর্ধিত কলেবরে বিশেষ কয়েকটি সাময়োচিত প্রবন্ধ এবং যাত্রা সম্পর্কে একটি ক্রোড়পত্র সহ প্রকাশিত হচ্ছে। দাম: এক টাকা।

ইস্কোয় শুধু খরচ বাড়ছে উৎপাদন বাড়ছে না

১৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারী ৭৬ ॥ দাম: ৪০ পঃ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

ভারতীয় কাঠামো শক্তিমত্ত করার ক্ষেত্রে ইস্পাতের ভূমিকা যে সর্বাগ্রগণ্য তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতপক্ষে, দেশের ইস্পাত কারখানাগুলো জাতীয় স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথে যোগ্য ভূমিকা পালন করবে—এটাই দেশবাসী আশা করে। কিন্তু, ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার কর্তৃক বার্নপুর ইস্কো কারখানা অধিগ্রহণের পর সেখানকার প্রশাসন কতখানি আন্তরিকতা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরছি। তার আগে একটি সবিনয় জিজ্ঞাসা লিপিবদ্ধ করে নিতে চাই।

ইস্কোর প্রাক্তন মেণ্যাল এ্যাণ্ড ইকনমিক এডভাইসার ও অশোক চ্যাটার্জী সরকারী অধিগ্রহণের কালে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার হিসেব দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি মাত্র ৬৬ লক্ষ টাকার হিসেব দাখিল করতে সক্ষম হন। বাকী ৫৬ লক্ষ টাকার হিসেবের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করা হয়। সরকার কি দয়া করে দেশবাসীকে সেই মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবেন? প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতি দমনের ঘোষণার সঙ্গে

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মিসায় আটক বন্দীরা
শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলে মিসায় আটক রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে সি, পি, আই (এম) দলভুক্ত লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্ত ইন্দ্রেন সেন পশ্চিমবঙ্গের কারামন্ত্রী শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপালকে লেখা এক চিঠিতে অভিযোগ করেছেন যে, শীতের দিনে বন্দীদের প্রয়োজনীয় কম্বল সরবরাহ করা হচ্ছে না।

১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখে লেখা এই চিঠিতে শ্রীসেন বলেছেন যে জেল হাসপাতালগুলো হাসপাতাল মানের যোগ্য নয় এবং পায়খানা ও ড্রেনেজ খুবই অপরিচ্ছন্ন। পানীয় তথা ব্যবহারযোগ্য জলেরও খুব অভাব বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

শ্রীসেন জানাল আবেদীন নামক জনৈক কৃষক বন্দীকে মাসিক মাত্র ২৫ টাকা পারিবারিক ভাতা মঞ্জুর (সরকারী আদেশ নং ৩২৮৯৭ এম ১(২) তাং ১৯।১১।৭৫) করায় ঘটনাটিকে এক নির্মম পরিহাস বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীসেন কারাগ্রীকে তাঁর অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বেলুড় ইএস আই হাসপাতালে চরম নৈরাজ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেলুড় ই, এস, আই যক্ষ্মা হাসপাতালে রোগীদের দুরবস্থা এখন চরমে। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, রোগীদের খাওয়া দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যাপারে সারা হাসপাতাল জুড়ে এখন এক নৈরাজ্য চলছে। রোগীদের সকাল দুপুর সন্ধ্যায় যে খাবার দেওয়া হয় তা নিয়ে রোগীদের মধ্যেও রয়েছে দারুণ বিক্ষোভ।

হাসপাতালের জনৈক পদস্থ অফিসার আজ জানান, রোগীদের আত্মীয় ও সাংক্রিষ্ট রোগীদের অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। তবে এরথাও ঠিক ওদের কথা একেবারে ফেলে দেবার মতনও নয়। অফিসারটি বলেন হাসপাতালের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে বারবার ই, এস, আই ডিরেক্টরকে চিঠিপত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কেমন কোনও সাড়া শব্দ নেই। রোগীদের দুরবস্থা সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সচেতন হলেও তাদের করার কিছু নেই। একদিকে আর্থিক সঙ্কট, অপরদিকে প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব। টাকার অভাবে হাসপাতালের বেশ কয়েকটি বিভাগ ফেলে সাজান সম্ভব হচ্ছে না। অথচ টি, বি, রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীদের বাঁচাবার এগুলি বড় প্রয়োজন। বিভাগগুলির সামান্য পরিবর্তন দূরের কথা, ডাক্তার, নার্স, ডি, ডি, এ ও ঝাড়ুদারদের পক্ষে হাসপাতালের কাজ কর্ম চালানোই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে।

অফিসারটি জানান, গণেশচন্দ্র এভেনিউ-র ই, এস, আই (এম, বি,) স্কীম অফিসে বহুবার এ ব্যাপারে চিঠি দেয়া হয়েছে। কিছু দিন আগে ঐ দপ্তরে প্রেরিত (মেমো নং ই, এস, আই/বেলা/১৭৮৭) এক চিঠিতে জানান হয় বেলুড়ের এই হাসপাতালে সংক্রামক রোগীদের জন্য নার্সের বড় প্রয়োজন। হাসপাতালটি যথার্থ ভাবে চালাতে হলে অবিলম্বে নার্সের শূন্য পদগুলি পূরণ করা দরকার। কিন্তু কিছুই হয়নি। ফলে নার্সের অভাবে রোগীদের পরিচর্যায় নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। তাতে রোগীরাও ক্ষুব্ধ। কিন্তু কিকর্তৃপক্ষের কিছু করার নেই। হাসপাতালে স্যাবরেটরী এ্যাসিসটেণ্ট ওয়াসারম্যান কিরিওথোফিট, সহ নানা পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্যই রয়ে গেছে। এ ছাড়া, দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কি, ডি, এ, ঝাড়ুদারদের কাজ করে হচ্ছে। এরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতেই কাজ করে যাচ্ছেন। স্থানীয় চাকুরীতে অগ্রাধিকারের দাবীতে শূন্য পদে স্থানীয়দের নিয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলী কর্মীরা আবেদন নিবেদনও করেছেন। এই আবেদন ডিরেক্টরের কাছে ও প্রদপ্তরেও এসে পৌঁছেছে। অভিযোগ, ডিরেক্টরের ওড়ানো মনোভাবেই নাকি এ ব্যাপারে কিছু হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট এলাকার অনেকেরই বক্তব্য অনাদর উপেক্ষায় বেলুড় ই, এস, আই ডি, বি হাসপাতাল এখন ধুঁকছে। ধুঁকছে এখানকার রোগীরাও।

তাহলে কেন বুদ্ধিজীবী

জনৈক বুদ্ধিজীবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমার বক্তব্য শুরু করি। আমার নিজের কথাই বলছি। জনশ্রুতি, আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, প্রগতিপন্থী অধ্যাপক, এখানে-ওখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-ও আদর্শ-গত সমস্যার কথা বলে থাকি। সমাজবিপ্লব বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তি পরাহত, তর্কে-আলোচনায় প্রায়ই এই বিশ্বাস ব্যক্ত করি, বাঘালক ছাত্র-ছাত্রীদের বাহবা কুড়োই।

কিন্তু কতটুকু মূল্য এ-ধরনের বুলি কপচানোর? আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমাজতন্ত্রের আদর্শের সামান্যতম ছোঁয়াও নেই। থাকি পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে যা একদা সৌখিন সাহেবপাড়া ছিল—এখন পয়সাওলা, যা ছো য়া ড়ী-পাড়াপী-অধ্যুষিত—এমন এক বিভূত রাস্তার চারতলার আধাসজাত ফ্ল্যাটে, কান্ড করি এমন এক প্রতিষ্ঠানে যেখানে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গল বাইরের সহ-অবস্থান আছে, সবরে ঘোরাফেরা করি বিদেশ থেকে আমদানী করা গাড়িতে। বছরে একদিনও ট্রামে-বাসে চড়তে হয় না আমাকে, দাঁড়াতে হয় না র‍্যাশনের লাইনে ঠেলতে হয় না রেলস্টেশনের ভিড়। কলকাতার বাইরে যখন অন্যত্র যেতে হয়, হাওয়াই জাহাজই প্রশস্ত। তাছাড়া প্রতি বছর দু'একবার দেশের বাইরে যাওয়া তো লেগেই আছে। মস্ত রেডিওগ্রাম, ভদ্রগত হয়ে ইওরোপীয় সঙ্গীত শুনি; শখ হলে পুরোনো কবিবন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে বাংলা কবিতার ঘোর অন্ধকার নিয়ে আলোচনা করি; গঙ্গার-বেষবায়-যমুনার জল বয়ে যায়।

আমাকে যিহিদে দেখা যায় না, মহদাদের মিছিলে দেখা যায় না। গা বাঁচিয়ে, অবসর বিনোদনের আধার হিসেবে আমার সমাজতন্ত্রে আস্থা। কচিৎ-কদা চিৎ লিখে, অথবা বিহিন বক্তৃতা দিয়ে, আমার সাম্যবাদী দ্যোতনের লীলা শেষ। সারবর্ত সব প্রবন্ধ, উদ্ধার তাদের চিরন্তনুখ নাথা বাণী। দেশ থেকে বড়লোকদের বেঁটিয়ে তাড়াতে হবে, এই-এই শিল্পোদ্যম রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রে ঐক্য মহাজনদের উপর কর বসাতে হবে; মার্কিন দস্যুরা ভিয়েতনামে যে পাশব তাণ্ডব শুরু করেছে, তার প্রতিবাদে সবাইকে সামিল হতে হবে; ট্রামের ভাড়া বাড়ানো অবশ্যই অনুচিত; ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বক্তব্যে এবং জীবনযাত্রার কোন মিল নেই; সন্দেহ হয়, মনে, আর মুখেও নেই। আমার প্রবাদিত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস হয়তো নিছক একটি অজ্ঞান। কিশোর এবং তরুণ বয়সে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, পরীক্ষায় ভালো করার লোভে সে-বন্ধন আস্তে আস্তে আলগো করে আনি। তারপর এক কুড়ি বছর কেটেছে জীবিকার মান উপরে তোলার ধাঁধায়, সুবিধাম্বেষণের অনেকগুলি অর্গল পেরিয়ে আপাতত কের কলকাতায় স্থিত হয়েছি। যাদে কিছু টাকা অঢেল, বাইরের লোকের জানা নেই, চুপি চুপি একটা ছুটো জমি কলকাতার আশেপাশে কেনা আছে, 'আগতিক সঙ্কোচের মনভালে বধে এবার নতুন করে মনে হচ্ছে, সমাজতন্ত্র মন্দ জিনিস নয়, একটা ছুটো প্রবন্ধ লেখা যাক। এবং, এমনই বাংলা দেশ, একটা ছুটো প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারলেই বুদ্ধি-জীবী হিসেবে নাম হয়ে যেতে বাধ্য। অসাধু আমি, প্রবঞ্চক আমি, ছুধ ও ভামাকে সমান আগ্রহবান আমি সেই নামের বেলাতি করছি বিবেককে বিলাসব্যসনের নিচে চাপা দিয়ে। তবে এখনো বোধহয় মাঝে মাঝে চকুলজ্জা থেকে ভুগি, গাড়ি হাঁকিয়ে সমাজতন্ত্রের সমস্যার উপর বক্তৃতা দিতে যাই, কিন্তু সভাস্থের থেকে খানিকটা দূরে গাড়িখানাকে দাঁড় করাই, তারপর বাকিটা পথ হেঁটে যাই।

নিজের কেচ্ছা গাইলাম এতক্ষণ ধরে, তার কারণ, অবিনয়ের মতো শোনালেও বলতেই হয় বাঙালি বুদ্ধিজীবীর এই ধরণটি তথুই আমার একার নয় আমার সমসাময়িক এরকম আরো অনেকে আছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্র ছিলেন, আন্দোলন করেছেন, শ্লোগান চেঁচিয়েছেন, নতুন সমাজের নীলিমা ছাওয়া গল্প কবিতা লিখেছেন, ১৯৪৫-৫০ এর অন্তর্লীন বিপ্লবের ঘোর লাগা বছরগুলিতে দু'একবার দু'এক সপ্তাহ করে কারাবরণ করে-ছেন পর্যন্ত। কিন্তু কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই; আমার মতোই, সবাই ভদ্র, সঁবাই সভ্রান্ত। কেউ সদাগরি দপ্তরে বড়ো সাহেব, কেউ ব্যবসাতে ফেঁপেছেন, কেউ মস্ত সরকারি চাকুরে। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণাঞ্চলে আমার কাছাকাছি থাকেন, ছেলেমেয়েরা ইংরেজি ছুলে শাসিত উচ্চারণ ও মার্কিনী কেতা শিখছে, বাড়িতে বাংলাভাষায় কথা বলার পাঠ প্রায় উঠে যাওয়ার মতো, স্ত্রীরা অফুরন্ত বাড়তি সময় নিয়ে কী করবেন ভেবে পান না। মার্কেট থেকে মার্কেটান্তরে কেনা-কাটা করার পরে হয়তো তাঁরা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যান, নয়তো গলফ্ বল করতে শুরু করেন। সন্ধ্যার প্রতি ফ্ল্যাটে চকচকে ঝকঝকে জনসমাগম, বসালো আড্ডা, প্রাচুর্যে উপচে-পড়া বিলাস।

মাত্র কুড়ি বছরে এতটা পরি-বর্তন সম্ভবপর সেটা প্রথম ধাক্কায় বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষে হয়তো মুশকিল। যাঁরা পরিবর্তিত হয়েছেন তাঁরা হয়তো মানতেও চাইবেন না কোনো কিছু বিশেষ বদলেছে। তাঁরা সগর্বে বলবেন, তাঁদের বিবেক আছে, লুকিয়ে চুরিয়ে দু' দশ টাকা তাঁরা এখনো বামপন্থী আন্দোলনের জন্য দিতে প্রস্তুত। 'সাংস্কৃতিক' ও 'সাহিত্যিক' পত্রিকার তাঁরা সব সময়েই প্রবন্ধ লিখছেন, সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব খুঁটছেন, অতি বামপন্থিরা কত অপবাদসাধক তা প্রভূত ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন, তাছাড়া দেশের এবং সমাজের কথা ভেবেই পরিবার নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তগত প্রসার, এ ধরনের 'গঠনমূলক' কাজে প্রবল উৎসাহ

অশোক মিত্র

নিজেদের—এমন কি স্ত্রীদের পর্যন্ত—নিয়োগ করছেন। এখনো তাঁরা বই কেনেন, সাধ্য বেড়েছে তাই বেশি করেই কেনেন, বামপন্থী বইও কাতারে-কাতারে কেনেন, বসবার ঘরে সবাইকে সগর্বে দেখান সে-সব বই। কুড়ি বছর আগে উগ্র বামপন্থী ছিলেন, অধিক মহলে সেটা তাঁরা সগর্বে প্রচার করেন—এই প্রচারে বিপদের আশঙ্কা বর্তমানে শূন্য, প্রচারলব্ধ গৌরবের পরিমাণই বড়ো। অনেক দপ্তরে মার্কিস মশাইরা প্রাক্তন বামপন্থী পুষে আমোদ ও আনন্দের খোরাক পান; চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় উন-বিংশ শতকে আমাদের অধিদারেরা হাতি পুষতেন, সাথি পুষতেন, ওস্তাদ পুষতেন, শিল্পপতিরা তেমনি এখন তাঁদের খেয়াল মেটাচ্ছেন নির্বাপিত বামপন্থী পুষে।

দন্তনখবিহীন আমরা, স্ত্রীবত্বের চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছি, এভাবে পোষ-মানা যে গ্লানিকর সে বোধ পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশের অন্তর্হিত। সজ্ঞলতার মতো থাকা সমাজতন্ত্রের প্রতীপধর্মী সেটা আমরা মানতে রাজি নই। অনেকে আবার এমন শান্তিত যুক্তিও ব্যবহার করেন, ব্যবসাবাণিজ্যে রাষ্ট্রচালনায় আমরা দক্ষতা শিখছি, এ-সমস্তই ভবিষ্যতে কাজ দেবে, আমাদের দক্ষতা নতুন সমাজের মুষ্ঠু নির্বাণে কাজে লাগবে; সমাজতন্ত্রের আদর্শ আমরা ছেড়ে যাইনি, সমাজতন্ত্রের জন্যই তো আমাদের এই ভালো থাকা ভালো পরা ভালো গাড়ি চড়া।

কেন এমন হয়? বুদ্ধিজীবীদের কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা? বিশ্বাস-ঘাতকতার পরেও কেন তাঁদের এত-খুব পা প বো ধ ল না তা? একদা কিশোর চেতনার যে বপ্রের অঙ্কুর ছুঁয়েছিল, তাতে কোনো ফাঁকি ছিল না। আমরা সবাই-ই একদা ত্যাগে বিশ্বাস করতাম, সাম্যের স্বপ্ন শুদ্ধগত ভবিষ্যে আহুতি করতাম, আস্থা ছিল দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করতে পারবো, কৃষক মজুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো, তাদের মধ্যে যতদিন সংহতি ও প্রেমচেতনা আসছে না, পাশে পাশে থেকে আশ্বাস দেবো, আশ্রয় দেবো, অভয় দেবো, একসঙ্গে জলে ভিজবো, রোদে পুড়বো, কাদায় মাখামাখি হবো। আন্দোলনে চুকে, প্রথম প্রথম কয়েক বছর অন্তত, আমাদের আদর্শের সঙ্গে অভিব্যক্তির, ইচ্ছার সঙ্গে কর্মের, কোনো অসদ্ভাব দেখা যায়নি, প্রথমাবস্থায় তো আমাদের চেষ্টার অধ্যবসায়ের ত্রুটি হয়নি। তবে তিরিশের প্রান্তে পৌঁছে চিঢ় ধরলো কেন? চোবের মতো সন্ধের পালিয়ে এলাম কেন? আমাদের আদর্শের শেষ বিবেকটুকু আজ কেন নেহাতই সামান্য কটি ছেলেভুলানো বক্তৃতায় আর বাগাড়ম্বরসর্বস্ব প্রবন্ধে পর্যবসিত?

স্বীকার করতেই হয়, যা হল, যা হয়েছে, তার বেশু বক্তে, শ্রেণীগত ই শা রা য়। শৈশব কৈশোরের বাল্য বর্ধমানের মধ্যে না। মধ্যেরাত্রির সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ত্রাসিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত মানসে ব্যক্তিস্বার্থের প্রচ্ছন্ন আকুলি-বিকুলি প্রভাব ছড়ায়। তত্ত্ব যাই বলুক, অন্তত অবলীলার সঙ্গে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করা সম্ভবপর নয়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অনেক রকম বিভ্রান্তি হতাশায় অভিভূত হতে হয়, নানা বঞ্চনাপথ, বহু মোহভঙ্গ। এমন অনেক মুহূর্ত আসে, কোনটা খাঁটি কোন্‌টা মেকি তা পর্যন্ত ঘোলাটে হয়ে পড়ে, সন্দেহ হয় যে নেতাদের এতদিন অন্ধের মতো অনুসরণ করে এসেছি, তাঁরা ভুলও, তাঁদের নিজেদেরই আদর্শ সম্বন্ধে অঢেলো নেই। কীসের জন্য তাহলে আমাদের তিতিক্ষা, কেন কৃচ্ছ্র-সাধন, আমরাই বা কেন ধিয়াচরণে ধিয়ামান থাকবো? এমন যারা যুক্তির সন্তর্পিত প্রয়োগে যে হৃদয়-দৌর্বল্যের প্রথম প্রকাশ, তাই আস্তে আস্তে প্রগাঢ় রূপ নেয়, আদর্শের প্রতি বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে, ভারপর শ্রেণীস্বার্থের বজ্র আঁটনিতে বন্দী হতে হয়। সে অবস্থায় বিবেক-দংশনের বালাই আর থাকে না, বরঞ্চ অন্তর থেকে বনের ঘোর তাড়ানো বন্ধবগুলির জন্য অনুশোচনা জাগে। বন্ধগণ উৎসাহে বন্ধত-সাধনায় নিজেদের তখন থেকে আমরা নিযুক্ত করি, প্রথমদিকে যা হারিয়েছি, এবার তাহিঁপূরণ করে নিতে হবে। তাছাড়া আদর্শের বিকৃত ফাঁদে পা দিয়ে যে বাচ্ছন্ধ্য প্রাচুর্যবিলাস সম্ভোগ থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছিলাম, আমা-দের সন্তানাদির আনন্দের মধ্য দিয়ে সেই ভোগের দম্পূর্কি হোক। আমাদের ছেলেমেয়েরা তাই মার্কিনী আদর্শে বড়ো হয়ে ওঠে, স্ত্রীরা বাংলাভাষার কথা বলতে প্রায় ভুলে যান।

আসলে, বাঙালি ভদ্রসমাজের আমরা, বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনে ঘোগে ঠিক নই। নেতাদের আদর্শ-স্খলন ঘটে থাকে সেটা ঠিক, কিন্তু নেতারা এবং আমরা একই সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর প্রণালী বেয়ে এসেছি, তাই ব্যাধিটাও এক। দুঃখকষ্ট সহ্য করার ত্যাগের বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার রোমান্টিক অভীপ্সাটি বহিপৃথিবীর রূঢ় আঘাত খুব বেশি-দিন সামলাতে পারে না, কিছুদিন বিপ্লব-বিপ্লব খেলা খেলে আমরা তাই সরে পড়ি। বিবেকটাকে যদি পুষো বশ করেও অসহ্য হয়, তাহলে সুখী জীবনের নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করে মাঝে-মাঝে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখি, নয়তো ঘরোয়া বৈঠকে বক্তৃতা দিই। মধ্যবিত্ত বিবেক অল্পেই তুষ্ট হয়, তুষ্ট হয়ে পাশ ফিরে ঘুমোয়।

অনেকে হয়তো বলবেন, ক্ষতি কী যদি ঠিক এমনই হয়? মনের সংবেদনশীল মুহূর্তে কয়েক হাজার উজ্জীবিত ঘরের ছেলেরা অনেকে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেবে, তাদের বেশির ভাগই দু'দশ বছর বাদে শ্রেণীস্বার্থের হাতছানিতে, আন্দোলন পরিত্যাগ করে জাগতিক সাফল্যের নিরাপদ দুর্গে ফিরে যাবে, কিন্তু যদি দু'একজনও টেঁকে, তাতেই লাভ। তাছাড়া, যাদের ঘরে রাখা গেল না, অন্তবর্তী সময়ে তারাও তো বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য কিছু কিছু কাজ করেছে, তার মূল্য তো কম নয়। আন্দোলনে তারা, কয়েক বছরের জন্য হলেও, বুদ্ধির প্রখরতা এনে দিয়েছিল, এনেছিল চাতুর্য, দীপ্তি। যারা আন্দোলনে রইল না তারাও অন্তত কয়েক বছর তো কৃষকদের সঙ্গে মিশেছে, মজুরদের বুদ্ধিবার্তা

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

রাজনীতি মধ্যবিত্ত সাধের সংস্কৃতি

কালিদাস কুণ্ডু

মধ্যবিত্তের জীবনে আজকের রাজনীতি অনেকটা যেন পাশ্চাত্যভাবের মতোই। খেলে শরীর রসস্থ হয়। কেমন যেন একটা আলোর নেশায় পেয়ে বসে। পাশ্চাত্যভাবের যুগ চলে গেছে সেই কবে। এখনতো বাসি রচির যুগ। তবুও উপমাটি এসে গেল এই জন্য যে, পাশ্চাত্যভাব শরীরের গতিকে যেমন শ্লথ-মন্থর করে তোলে আজকের রাজনীতিও যেন তেমনি শ্লেষ্ঠা মধ্যবিত্ত সমাজটাকে ধীরে ধীরে একটা নিশ্চিন্ত মন্থরতার মধ্যে টেনে এনেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তের সব গিয়েও যা কিছুটা অবশিষ্ট ছিল তাহল তার রাজনীতি এবং সংস্কৃতি। সেটা কেন সম্পত্তি, নিশ্চিত কিংবা নির্ভুল প্রতিষ্ঠা মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে ছিল কিনা আমরা কখনও ভেবে দেখিনি। ভেবে না দেখার- কারণটা ছিল বাঙালী মধ্যবিত্তের মানসিকতার মধ্যে—যে অন্তর্ভুক্ত মানসিকতা বিশ্বাসের উচ্ছৃঙ্খলতে উসলাই না হয়েই কিছু একটা পেতে চেয়েছিল এবং এই কিছু পাওয়ার কাঙ্গারটা খুলতে অর্থনৈতিক ভূমিকা তার সাংস্কৃতিক দিকটি নিয়েও বিচারের কোন মানদণ্ডই।

উনিশ শতকের জাগরণ—যা ছিল প্রকৃতিগত মধ্যবিত্তের এলাকার—যা ছোঁয়াতেই আমাদের জনসাধারণের নিজস্ব জীবন ধারাকে স্পর্শ করেনি আজকে সাংস্কৃতিক মূল্যপ্রতিষ্ঠার গরমকে সৃষ্টি করে ছিল নিজেদের। এক তারই নিশ্চিত ফলশ্রুতিরূপে দেশপ্রেমের ঢেউ এসেছিল জাতীয় আন্দোলনে। সেই উত্তাল ভাবতরঙ্গের শীর্ষে গীতা উপনিষদ তত্ত্বকে-হিংসা-অহিংসা ও আত্মবাদ কখনও পাশাপাশি দেখেছে—কখনও ওরা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে ধর্ম-রাজনীতি ও জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে একই ঝাণ্ডার তলায়। বাঙালী আন্দোলনের ইতিহাসে এমন একজন নেতাকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যাঁর দেশপ্রেমের জন্মভিতে বাণী স্রোত প্রস্রুত হয়নি। অর্থাৎ রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বা আধ্যাত্মিকতার নিশ্চিন্ত পদক্ষেপ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শুধু একটি লক্ষ্মণীয় রেখাই নয়—কোথাও খোঁজও সেই রেখা শক্তিশালী অগ্রগতিরোধ প্রেরণার মতো।

এই প্রেরণা ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে প্ররোচিত করেছে সাম্প্রদায়িকতা বোধ এবং তারই হাত ধরে অখণ্ড ধারতবর্ষের ধারণা পরিচ্ছন্ন ও সুনির্দিষ্ট রাজনীতির স্বারা পরিমার্জিত হওয়া তো দূরের কথা হিন্দু সভ্যতা পুনরুজ্জীবনের প্রবল স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এর পরিণাম হয়েছে মারাত্মক। মুসলিম লীগের পত্তন হয়েছে। অখণ্ড মুসলিম মাইনোরিটি পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে আলাদা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পেতে চেয়েছে। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়েছে অদৃষ্টের লিখন খণ্ডিত হয়নি। এসব কিছু ইতিহাসের নিয়মে হয়নি—হয়েছে আমাদের অসংযমে। আমরা ইতিহাসের অনুবর্তী হইনি। এই অসংযম—শৃংখলাহীনতা বিগদ ডেকে এনেছে মধ্যবিত্তের মানসিকতার—বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার।

বিগত কয়েক দশকের ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করে যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের চেয়েও পরকে বেশী ভালবেসেছে। নীতির চেয়েও রাজনীতিকে বেশী। এবং তথাকথিত সংস্কৃতিকে সবার চেয়ে বেশী। ফাঁকিটা তার নিজের কাছে ধরা পড়ে নি। কিন্তু, তার রাজনীতি ছিল না—সংস্কৃতি ছিল না। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের তথা মধ্যবিত্তের ভাগ্যের ট্রাজেডি। রাজার নীতিকে সে নিজের নীতি ভেবেছিল। বিত্তবানদের বাজারের সংস্কৃতিকে সে নিজের সংস্কৃতি করে নিয়েছিল। তাই উনিশ শতকে চেগোর-মাল্লিক-দেবরাও পরিবারের সংস্কৃতি—মর্মগতভাবে যে সংস্কৃতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং ইঙ্গ বেঙ্গলীয় বিদেশী সংস্কৃতি মিলে মিশে নব্য বাবু সংস্কৃতির যে ধারা সৃষ্টি করেছিল আজও সেই ধারাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে অব্যাহত আছে।

অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যতার ঘনো হইনের দেশেরে ছুটে ছুটে আমাদের মধ্যবিত্ত গ্রামগুল পার হয়ে যাবুটি সেজে পাপ্ত দু পরেছিল। আজ তা পালিশ করার প্রয়সা নেই তার। হাফসোল করার সম্পত্তি নেই। ঘরে তার যাদ্দনী রাতের ছবি, সেই পতুল কৃষ্ণনগরের। ছেলে তার দুলী ফিলের লাইনে দাঁড়িয়ে। ভূতপূর্ব পিতা "সভ্যতার সংকট" পড়ছেন আরাম কেদারায় বসে। আর রকে বসে জলপাইয়ারী ছেলে ঝাঁবারে গার্লের এ্যানাটমি পড়ে শোনাচ্ছে বন্ধু সাথীদের। ঠিক এই-খানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কৃতবিদ্য বিভার্থী আমাদের প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত সমাজ। এখানে দাঁড়িয়েই আজ তাকে নিরত হতে হবে আত্ম-সমীক্ষায়। করতে হবে বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যতের রূপটির অঙ্কন। ব্যর্থ হলে বলে দেওয়া ভাল সামনে একটা পর্দা ঝুলছে তাতে বড় করে লেখা আছে "মহাশূন্য"।

মানবের বচার ইতিহাসে এটা হতে পারে না। আর হতে পারে না বলেই, অসংখ্যবান চলবে—চালাতে হবে সেই পথের যেখানে শতাব্দীর একটি সুচেতসংঘর্ষ—পরিণামের দিক নির্দেশক।

মধ্যবিত্তের রাজনীতি ছিল না—সংস্কৃতি ছিল না। ওটা তার দরকার নেই। পরের ধনে পোদ্দারী দরকার নেই। তবে নীতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, সেই নীতির প্রতিষ্ঠা চাই। সংস্কৃতি নয়—রাজনীতি নয়—একটা ছোট্ট নীতি —আমাদের আশি টাকা ভাড়ার একটা ছোট ঘরের মতো একটা ছোট নীতি —সেটি হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারী করবো না। এই একটা মাত্র নীতির ভিত্তিতে মধ্যবিত্তের জাগরণ সম্ভব। মধ্যবিত্ত ঘুমিয়ে থাকলে এদেশের ভবিষ্যত নেই।

কিন্তু, বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? বড় ছেলে পাশ্চাত্য সভ্যতের সমকক্ষতায়। দর্শনের অফিস ফেরৎ অধ্যরাত্রি পর্যন্ত রেকর্ড বাজান —হাই—লো লো. . .

চৌরঙ্গী ফেরৎ ছোট ছেলে শিস দিয়ে ঘরে ফেরে—আর রাত্রা মনে রোচে না। কলেজে-পড়া মেয়ে রাত্রি জেগে কবিতা পড়ে "শান্তি চার্টেজের"। বলে, চোখ বুজে দম-বন্ধ করে কী বাস্তবধর্মী!

আপনি কি করবেন? আপনার কোন অল্প নেই—কোন দীক্ষা নেই, অতএব, আপনার কিছু দেওয়ার নেই।"

রাজনীতি। পেটভরাবার রাজনীতি অতল শিকি হয়ে পড়ে আছে লক্ষ্মীর কাঁপিতে। সংস্কৃতি গতর খাটিয়ে পরের বাড়ী ঝি-গিরি করে বেড়াচ্ছে উন্নয়ন্ত।

এমনটি কেন হোল? জাগরণের শুরুতে ধরেনি। তাই জাতীয়তাবোধ কি আন্তর্জাতিকতাবোধ সংটা আমাদের বোধগম্য হয়েছে তার চেয়েও বেশী হচ্ছে বোধরুদ্ধ।

আমাদের উচ্ছল সব শরৎ শরৎচন্দ্রকেও বড়তে চাননি। "মহেশ" ঝড় তুলেছে। সে সব দামী পলাশীর মুদ্দিজীবীদের ভিতের ওপায় টমাস মন. জাঁ পল সার্ত্রে, মার্কিন বাড়ুজ্জে তারাও কেমন বেঁচে প্রমাণ করতে বদ্ধ হয়ে পড়েছেন—শরৎচন্দ্র আমাদের ঘরের লোক।

প্রমাণ হিসেবে ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ুক "মহেশ" গল্পটি। গফুর জোলার সর্বহারা হওয়ার কাহিনীতে অভিভূত আমরা একবার ভাবিওনা—গল্পটির নাম মনুষ্যেতর না হয়ে মনুষ্যেতর হোল কেন?

বোঝার প্রয়ত্ন নেই। মহেশের প্রতিকূলতা করেও লাভ নেই। কিন্তু ভেবে পাইনে, স্বভাবের ঘরে চুরি কতদিন চলে? "দুই বিঘা জমি" কিংবা "মহেশ" স্বপ্ন সম্ভব প্রকল্পে ডিপোজিট রেখে মধ্যবিত্তের "বাড়ন্ত" হচ্ছে কতদিন চা ফুটবে?

মধ্যবিত্ত আজ অন্তর্মনস্ক, তাকে কে বলবে—এটা চালাকী—নিজেকে চোখ ঠারানো। এটা না রাজনীতি না সংস্কৃতি। এটা আত্মসন্তোষরূপী সেই বঞ্চনা যে বঞ্চনায় দিন কাটায় "হৃষিকেশের ভেক কথা জন্তুরের রূপে।"

একসরা অঞ্চলে উন্নয়ণের কাজ হচ্ছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া জেলার একসরা অঞ্চলে উন্নয়নের কাজ কিছুই হচ্ছে না প্রায় পঁচিশ বছর। লিলুয়া থানার একসরা অঞ্চল সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী অঞ্চল। এখানে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। লিলুয়া থেকে একসরা বাদ্যবন্দর পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা হবার কথা ছিল, হয়নি অজানা কারণে। এই গ্রামে ত্রিশটি বস্তিবল আছে। প্রতি জলে দশজন লোক কাজ করে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা হলে বস্তিকলের মত ক্ষুদ্র শিল্প আরও উন্নত হতে পারতো। বিদ্যুৎ এলে সুতাকল এবং লেদ বসতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ গ্রামের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধতর হবে। গ্রামের চার হাজার লোকের মধ্যে বছরে দশটি মামলা মোকদ্দমা হয়, মারপিট লেগেই আছে। তিনজন মাত্র গ্রাজুয়েট। একটি স্কুল। ছেলেরা স্কুলে যায় না। বস্তিকলে কাঁচা পয়সা রোজগার করে।

সম্প্রতি হগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাব পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা গেছে এই সব তথ্য। ক্লাব দপ্তর কে, আহমদ জানিয়েছেন একসরা গ্রামে ডাকঘর দরকার। চার মাইল দূরে চাবরাইলে একটি ডাকঘর আছে। তাই সন্ধপুর পাকুড়িয়া একসরা খালিয়া খড়াগিরি এলাকার জন্য একটি ডাকঘরের দাবী করেন। তাছাড়া একসরা বাদ্যবন্দর থেকে লিলুয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের পোল পোঁতা আছে। বিদ্যুৎ আসে নি। সি, এম, ডি, এ কোণা চাবরাইল এবং অন্য এলাকায় বেশ প্লেট বা পোষ্ট দেয়নি। জল সরবরাহ সমস্যা না থাকলেও কাছাকাছি সি, এম, ডি, এ জলের ট্যাঙ্ক তৈরী করছে অথচ এখানে অন্য কোনও সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না।

হাওড়া জেলার একসরা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এক সাধারণ সভায় ব্লেডজন সমিতি ও ওয়ার্লড ফোডারালিস্ট সমিতির সাহায্য নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নিবিড় প্রচার অভিযান চালানো এবং স্থানীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হয়। সভায় স্থানীয় শিক্ষক বলেন কাঁচা পয়সার কারখানার কাজ করে ছোট ছেলেরা প্রচুর রোজগার করছে। অভিভাবকরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে চাচ্ছে না।

স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যাও দিন দিন কমছে। কামরুদ্দীন আহমদ ঐ একসরা গ্রামে বছরে বেশ কয়েকটি ফালতু মামলা মোকদ্দমা এবং অপ্রাপ্তি বৃদ্ধির ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে আরও তৎপর হতে বলেন। যুব নেতা বদুর আলী একসরা খালিয়া অঞ্চলের প্রচুর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষিত হলেও বাইরে থেকে সমাজ বিরোধীদের এনে ঐ সব জায়গায় বসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। স্থানীয় লোকেরা এবং স্থানীয় গৃহহীন ব্যক্তিরা কেউই পতিত জমি পাচ্ছে না। হুগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষ থেকে অবাঙ্গবর অনুষ্ঠানে আদিবাসী ও নিম্নবর্গ মানুষকে পরিবার সীমিতকরণ ব্যবস্থা বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এবং পরিবার ছোট করার সংজ্ঞায় বিলি করা হয়। যাদীবরার পঁচিশ বছর পরে কলকাতার ছ মাইল দূরে অবস্থিত এই একটি মাত্র গ্রাম একসরা কি অজানা, কারণে অবহেলিত। বাস্থাকেন্দ্র নেই ডাকঘর নেই।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

স্বদেশ প্রকাশ চাসনালার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মুক্তিসংগ্রামে লাল কাপড়ে মুড়ে আশুন্ত স্বজনের শেষ দেখার পর শুলিদের ট্রাকে চাপিয়ে গোরু বা দিতে শোওয়ানো দামোদরের তীরে নেয়া হবে।

* *

শ্রীমতী গান্ধীর শাসনের দশ বছর পূর্তিকে প্রদেশ কংগ্রেস 'প্রগতির দশক' বলে বর্ণনা করেছেন।

* *

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীবনশীলাল জানাচ্ছেন, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিনই তিনি শ্রীমতী গান্ধীর পদি অনুগত থাকবেন। ....তিনি তাঁর যে-কাজেরই ভার দেন তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন।

* *

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশি জরুরি অবস্থা বলবৎ রাখা হবে না।

* *

নির্মলা সেন, বর্ধমান। আমি দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল নিয়ে একটি বড় উপন্যাস লিখেছি। কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছে চিঠি লিখেও কোনো জবাব পাইনি। আমার উপন্যাসটি কী কোনোদিন ছাপা হবে না?

উত্তর ॥ সম্ভাবনা কম।

* *

অরুণ চৌধুরী, রাঁচি। প্রগতিশীল গল্প-উপন্যাস ছাপার কী কোনো প্রকাশনা আছে?

উত্তর ॥ প্রকাশনা নেই, দোকান আছে। আপনার প্রগতিশীল রচনা ছাপা হলে এদের বিক্রির জন্যে দিতে পারেন।

* *

চান্দ্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা। যৌবনতা লাহিড়ীকদের এত প্রিয় বিষয় কেন?

উত্তর ॥ এই একটা বিষয় যেখানে অভিজ্ঞতার কিছু দরকার হয় না। পাঠকও নিশ্চিন্তে পড়তে পারেন।

চান্দ্রেয়ী ॥ প্রেমের উপন্যাস আজকাল বড় দেখিনে?

উত্তর ॥ বড় শক্ত বিষয়। কে অত খাটতে যায়?

চান্দ্রেয়ী ॥ এই সব লৈগ লেখকেরা কী বোঝে না যে ঘরের বউ-ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাদের ঘৃণা করে?

উত্তর ॥ বাড়ির লোকেরা ওদের লেখা পড়ে না তাই ওরা বেঁচে আছে।

গোরা সামন্ত, কুচবিহার একটা কিছু করা যাক?

উত্তর ॥ করলেই আসি।

গোরা ॥ মানে, প্রগতিশীল মানুষেরা জোট বেঁধে···?

উত্তর ॥ কী? শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় সমাবেশ?

গোরা ॥ বৃহত্তর মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে···?

উত্তর ॥ বাস্তব পরিকল্পনা দিন। আমাকে সঙ্গে পাবেন।

* *

প্রকৃতি চক্র, বেলঘরিয়া ॥ চির তরুণ থাকার উপায় কী?

উত্তর ॥ কম্যুনিস্ট হওয়া। কারণ এঁদের মধ্যে নতুন নিয়মের জন্যে। কোনো সাচ্চা কম্যুনিস্টকে আপনি বুড়ো হতে দেখেছেন?

যুবরাজ ভট্টাচার্য, যাদবপুর কাজে ও কথায় আমাদের মিল হবে কবে?

উত্তর ॥ যখন কথাকেও কাজ ভাবতে শিখব।

যুবরাজ ॥ এই দুর্দিনে সঠিক নেতৃত্বের বড় অভাব বোধ করছি।

উত্তর ॥ এই অভাব বোধ যখন সর্বজনীন হবে তখন এর ভেতর থেকেই নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

যুবরাজ ॥ পথ কী?

উত্তর ॥ তত্ত্ব ও প্রয়োগে সঠিক মার্কসবাদ।

বকুল নন্দী, শিউড়ি পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালি-সংস্কৃতি কি ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে?

উত্তর ॥ ডকোরেই কথা প্রথা।

বকুল ॥ মুক্তির উপায়?

উত্তর ॥ মনে প্রাণে আমরা যাঁটি বাঙালী হতে পারি, তাহলেই ভারতীয় হতে আমাদের আটকাবে না।

বকুল ॥ আচ্ছা পশ্চিমবঙ্গের নতুন নামকরণ বঙ্গপ্রদেশ না কী হওয়ার কথা হয়েছিল?

উত্তর ॥ সব কথাই কী কাজ দিদি?

বকুল ॥ হাঁড়ির কী?

অমল সংকার ওপার বাংলার রবীন্দ্র কবি বিকাশদের আধুনিক বোধ সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কী?

অথবা কবি হারাধন মাহুদ

উত্তর ॥ বিকাশদার সাহেব কয়েক মাস আগে অসুস্থ হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মাহুদ সাহেব সম্প্রতি মূল বর্ণমিছন থেকে দেশে ফিরে বরেণ্য কর্তৃম করেছেন

অমল কবি চন্দ্র সাহার কী নতুন কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে

উত্তর ॥ হাঁ। বিনি কাব্যগ্রন্থ : বিশ্বের বরেণ্যপ্রেমী। প্রকাশ করেছেন বঙ্গ প্রকাশনা ১০ রানী রাসমণি রোড, কলিকাতা-১৩। প্রাথমিক কবিতাটি এই রকম : দার্জিলিঙ ও সাবে পাহাড়ের | কালো মাংসের | বিশাল হাত | ঐশ্বর্যবন্ত | অকস্মাৎ | লাল ফুল ফোটা | দু'চোখের চোটা | গর্জন করে | তরঙ্গর | সিলেট পাহাড়ে | চট্টগ্রামে | তীব্র ঝড়।

দেশ এগিয়ে চলেছে

যাঁদের নিজস্ব বাসস্থান নেই তাঁদের জন্য বহুতল বাড়ী

গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কর্মীরা এখন জমি পাচ্ছেন; বাড়ীর জন্য 32,42,408টি জমি ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। কুড়ি-দফা কার্যসূচীর আওতায় আরও জমি দেওয়া হবে।

নয়টি সামাজিক গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 6.8 লক্ষ বাড়ী তৈরীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 6.43 লক্ষ বাড়ী ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে।

দৃঢ় সংকল্প
ও
কঠোর পরিশ্রম
আমাদের
এগিয়ে নিয়ে যাবে।

dawp 76/453

পর্তুগালে গৃহযুদ্ধের সূচনা ?

(দর্পণের সম্পাদকীয়)

পর্তুগালে রাজনৈতিক আবহাওয়া আবার গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। নতুন পর্তুগালের "রূপকবীর" নায়ক "রূপ-করে"র প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর কারাগারোহণ ২৭শে জানুয়ারী পর্তুগালের বর্তমান সরকার গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি নভেম্বরে বর্তমান সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পর্তুগালের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই চাইছে পর্তুগালের প্রগতিশীল গতিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে। এই দক্ষিণপন্থীদের মদত দিচ্ছে পর্তুগালের সমাজতন্ত্রীদলের দক্ষিণপন্থী অংশ। এবং তথাকথিত পপুলার গণতন্ত্রী দল। পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি পর্তুগালে প্রগতিশীল গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করছে। বিশেষ করে, নতুন পর্তুগাল যাতে সমাজতন্ত্রী পথ নেয় সেদিকে রয়েছে তাদের চোখ। ফ্যাসিস্ত শাসন অবসানের পর পর্তুগালে যে প্রগতিশীলতার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তাকে রক্ষণ করার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া তৎপর। এবং যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী নায়কবৃন্দের সেই পুরনো অভিযোগ, কমিউনিস্টরা যুক্তফ্রন্টের নামে নিজেরাই বাকি পুরো ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। স্যাটোচক্রের অর্থপুষ্ট হয়ে সমাজতন্ত্রী নেতাদের কেউ কেউ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যথারীতি মানুষকে উস্কাতে থাকেন। এমন কি পর্তুগালের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট বিরোধী শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। কমিউনিস্ট কর্মীরা অবশ্য ধৈর্য ধরে গৃহযুদ্ধকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

পর্তুগালের কমিউনিস্ট নেতা কুনহাল বার বার বলছেন যে, তাঁরা যুক্তফ্রন্টে বিশ্বাসী। এখনো মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্টরা রয়েছেন। ইতিমধ্যে নভেম্বরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া চক্র কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিকদের শেষ করার জন্য একটী অভ্যুত্থানের চেষ্টাও করেছে। এই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থতাল করার জন্য কারখানায় কারখানায় গড়ে ওঠে শ্রমিক প্রতিরক্ষা বাহিনী। তাদের প্রতিজ্ঞা: পর্তুগালে আর ফ্যাসিবাদ নয়।

তাদের প্রচারে কিছু কিছু সৎ ব্যক্তিও বিভ্রান্ত হন এবং কারগুলোকে কণ্ঠকন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মন্ত্রিসভারও বহু রদবদল হয়। এই অবস্থায় দক্ষিণপন্থীরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে হয়।

এই গোলমেলে পরিস্থিতিতে কারগুলোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা এখন চাইছে মন্ত্রিসভা থেকে কমিউনিস্টদের দূরে সরিয়ে দিতে। তাই তারা অভ্যুত্থানের অলীক গল্প রচনা করে এই ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিকে জড়াতে চাইছে। কমিউনিস্ট পার্টি এই জঘন্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফ্যাসিস্ত শাসনের অবসান ঘটানোর প্রধান কৃতিত্ব ঐ কণ্ঠকনের। বিশেষ করে কারগুলো ও অন্যান্য তরুণ সামরিক অফিসারবৃন্দ যাঁরা চান পর্তুগাল সমাজতন্ত্রের পথে গড়ে উঠুক।

কারগুলোর গ্রেপ্তারে পর্তুগালের পরিস্থিতি একটু জটিল হবে সন্দেহ নেই। তবে, ইতিমধ্যেই শত শত তরুণ বামপন্থী রাস্তায় নেমে পড়েছেন পর্তুগালে গণতন্ত্র রক্ষায়। তাদের প্রতিজ্ঞা: পর্তুগালে আর ফ্যাসিবাদ নয়।

পল রবসন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাষ্ট্রে ফিরে "শো বোটে"র চলচ্চিত্র রূপায়ণে অংশ নিলেন। তিরিশের দশক তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় তুলল। প্রায় ব্রিটেনে যেতে লাগলেন সঙ্গীতের আসরে মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অংশ নিতে। যদিও সম্মানের প্রাচুর্য। আট্‌লান্টার মোবহাউস্ কলেজ থেকে তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করা হল।

কিন্তু এই চূড়ান্ত গৌরবের দিনগুলি তাঁর কৃষ্ণমন্তীর্ণ রইল না। বর্ণবিদ্বেষের নিদারুণ বোঝের শিকার হতে হ'ল তাঁকে বারংবার। "আন্-অ্যামেরিকান অ্যাক্টিভিটিজ কমিটি" তাঁর পিছনে অভিযোগ আবল। আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁকে শপথ নিতে হল যে তিনি কখনই কমুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। ১৯৪৯ সালে ভয়েস ইণ্ডিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ফিনিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়াতে গানের দরুণ বিপুল খ্যাতি অর্জন করে বসলেন তিনি। কিন্তু সেখানে আবার ফুটল বিদ্বেষ।—তাঁর শ্রোতাদেরও। এমন কি, তাঁর গানের রেকর্ডগুলোও বাজার থেকে তুলে নেওয়া হ'ল। ১৯৫০ সালে লণ্ডনে গেলেন গাইতে। কিন্তু তাঁর পাসপোর্ট নাকচ করে দেওয়া হ'ল। দীর্ঘ আট বছর তিনি বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেলেন না। এবার যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। তারপর আরও কয়েক বছর বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতানুরাগী এই মানবপ্রেমিক গায়কের কণ্ঠ শোনবার সুযোগ পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বের দশ বছর পল রবসনের গান আর শোনা যায় নি। তবাট, তরুণী গলায় "মাই ওল্ড কেনটাকি হোম" গেয়ে এক নিগ্রো দাসের মাতৃভূমির স্মৃতিচিত্রই তিনি তুলে ধরতেন শ্রোতার মনের সামনে তিনি চলে গেলেন অন্তরালে। তারপর সুদীর্ঘ দশ বছর পর চিরবিদায়।

সারা জগতের খ্যাতি কুড়িয়েও সদা বিনম্র এই গায়ক লাঞ্ছিত নিগ্রোদের ব্যথা বেদনার কথা, অবরুদ্ধ ক্ষোভের কথা লিখে রেখে গেলেন তাঁর আত্মচরিত "বিহার আই স্ট্যাণ্ড"-এ।

আমরা অনেকেই পল রবসনকে দেখিনি। কিন্তু তাঁর গানের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েছি। দেশ কালের উর্ধে সঙ্গীতের মানবিক প্রভাব তাঁকে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সংহোদর করেছে।

ইঙ্কো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্প্রতি রক্ষা করেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করছি, কারণ, বাজারে এই বাবদে প্রত্যাহার করে নেওয়ার গুজব শোনা যাচ্ছে।

সরকারী অধিগ্রহণের পর সর্বক্ষেত্রেই ব্যয় সঙ্কোচনের কথা বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও হয়েছিল। কিন্তু, আসল ঘটনা কি? সংস্থার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও সরকারী অধিগ্রহণের পর প্রায় পাঁচ হাজার লোক নিয়োগ করা হয়েছে যাদের মধ্যে অনেকের সামাজিক পরিচিতি খুব প্রশংসনীয় নয়। উপরন্তু, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এইসব নিয়োগ হয়নি, সেটা হয়েছে গেয়ন দরজা দিয়ে—বেআইনী ভাবে। সরকারী অধিগ্রহণের আগে ইঙ্কোতে একজন পার্সনাল ম্যানেজার ছিলেন মিঃ কামওয়ার, তাঁর অধীনে দুইজন সরকারী ছিলেন মিঃ ডি. সি. সিনহা (জীপ সেকশন) এবং মিঃ এস. সি. বসু (আয়রণ সেকশন)। অধিগ্রহণের পরবর্তীকালে কাউন্সিলার অরবিন্দ রায় প্রেমাংশু চ্যাটার্জীকে চীফ্ পার্সোনাল ম্যানেজার করে আনেন এবং তাঁর অধীনে মিঃ কামওয়ার হলেন গ্রুপ পার্সোনাল ম্যানেজার এবং পার্সোনাল ডিপার্টমেণ্টে হলেন তিনজন ম্যানেজার, ডি. সি. সিনহা, এস. সি. বসু এবং এস. সেন।

অধিগ্রহণের আগে জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন একজন—মিঃ ব্যাকহাকার। বর্তমানে চীফ জেনারেল ম্যানেজার একজন, ওয়ার্কস জেনারেল ম্যানেজার (এডমিনিস্ট্রেশন) একজন, চীফ ইনজীনিয়ার (আগে ছিল না) একজন এবং মাকুন্দা জন পাকাপোক্ত ম্যানেজার। আগে মাত্র কারখানায় ছিল একজন জেনারেল ম্যানেজার এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। এই অফিসার বৃদ্ধির ফলে মাত্র ১৭ জন অফিসারের জন্য বার্ষিক বেতন বাবদ খরচ হয় ৪১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১ শ' ১৯ টাকা। উপরন্তু, চীফ পার্সোনাল অফিসার প্রেমাংশুবাবু কি. এস-এর চেয়ে বেশী বেতন পান। বছরে ৭২ হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রায় ১৫০০ অফিসার আছেন যাদের বেতন মাসিক ৭৮০ থেকে ১৭০০ এবং ৫০০ আছেন যাদের বেতন মাসিক ১৮০০ থেকে ৩৬০০ টাকা। অফিসার আছে, গৌরী সেনের টাকাও আছে, আছে প্রমিকদের আত্মরিততা। কিন্তু, প্রশাসনিক গলদের ফলে উৎপাদন বাড়ছে না। প্লাণ্ট এ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশন স্কীমে ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে বছরে মাত্র ৫ লক্ষ টন।

তাহলে কেন বুদ্ধিজীবী

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছে, স্থানে স্থানে আন্দোলনের নানা ধাপে যেখানে নেতৃত্বে অপূর্ণতা ছিল, সেই সুযোগ নিয়েছে। তারা আন্দোলনে রইল না, তা নিয়ে আক্ষেপ করে কী লাভ, বরঞ্চ তারা যে যন্ত্রকালের অসুক এনেছিলো নিজেই কি তৎক্ষণ থাকা উচিত নয়?

আমি বলবো কিছুতেই নয়, একেবারেই নয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ক্ষণিক প্রেম দিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করেছেন অনেক বেশি। ইদানীং আক্ষেপ শোনা যায়, এই দশকের তরুণরা ছাত্ররা রাজনীতিপরাঙ্মুখ, বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। আমার নিজের সন্দেহ, এই প্রবণতার প্রধান কারণ আমরা, যাঁরা আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কলকাতার রাস্তায় বিপ্লব করেছি, বর্তমানে তাঁরন বরম ভদ্রলোক হয়ে গেছি, উৎকটরকম সভ্য। আমরা আদর্শ স্থাপন করেছি আদর্শনীনতার, নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে হালের ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা দেখাচ্ছি যে বিপ্লবের বুলি বুজরুকির ব্যাপারে আপাতত দুখকর উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটাতে সাহায্য করবে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ-সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে বাড়ি-গাড়ি-টেলিফোন বেতিওগ্রাম রেফ্রিজেরেটরই হচ্ছে আসল। তাই যদি হয়, জাগতিক সাফল্যই যদি সবশেষের সারকথা হয়, তাহলে আর কেন বামপন্থী আন্দোলনে মাথা গলানো, মিছিলে নামা, স্লোগান চেঁচানো, বেতখামারে বা কারখানায় গিয়ে সংগঠন, তার চেয়ে বরং এখন থেকেই শেখা যাক, কী করে ভালো চাকরি বাগানো যেতে পারে, দেখা যাক কোন্ চালাকির মারফত কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বেশি টাকা করা সম্ভবপর।

অন্ত যা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা এর চেয়েও গুরুতর। প্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের সংগঠন তার এতদিন পর্যন্ত 'বুদ্ধিজীবীর দল একচেটিয়া করে বেখেছেন। গালাগাল বুদ্ধিজীবী নানা দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের ব্যাপৃত রাখতে হবে, তাঁরা সংখ্যায় এত যে ছাত্র এবং শিক্ষক আন্দোলনে সকলের জায়গা করা সম্ভবপর নয়। অতএব এ সমস্ত মহামান্য বুদ্ধিজীবীরা কৃষক মজুর সংগঠনে নেমেছেন, কয়েক বছর কাজ করেছেন, তারপর তাঁরা অন্তর্হিত হয়েছেন, নতুন বুদ্ধিজীবীর দল পুনরায় এসেছেন নেতৃত্ব দিতে, কিছুদিন বাদে তাঁরাও খসে পড়েছেন। এই বিচ্ছিন্নতাজাত অবহব বিগর্যয়ের ফলে অনেক অঞ্চলে প্রমিক কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। আরো যা হয়েছে বুদ্ধিজীবী আক্রমণের ফলে মজুর কৃষক শ্রেণীর বামপন্থী হবার প্রয়াস ব্যাহত হয়েছে। বাইরে থেকে তৈরি নেতারা বাইরে গিয়ে ঘুরে বলেছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের ত্যাগের মূল্যভোগের কষ্টিপাথরের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব এবং প্রেরণা সৃষ্টির সৌভাগ্য থেকে মজুর কৃষকদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

শ্রেণীবিভাজন বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্তা নেই। ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্রে যাবতা দিতে পারেন মাত্র, তার বাইরে তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। আধাদের দেশে অন্তত, সমাজ শ্রেণীবিভাগের প্রয়োগে অন্তত্তম প্রথম সূত্র হওয়া উচিত এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নির্মূলন উৎখাত। অন্যথা প্রতি পদে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা।

[লেখকের "সমাজ" সংস্থা নিরালা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

Regd. No. WB/CC-32

PRICE: 40 PAISE

ভক্তিরসাপ্লুত পালাগানের দিন চলে যাচ্ছে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

যাত্রার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ভক্তিরসাপ্লুত পালাগান ক্রমে ক্রমে বিদায় নিচ্ছে। এখন যাত্রাগাড়ায় খুব কম সংখ্যক দলই আছে, যারা শুধুমাত্র ভক্তিরসাপ্লুত পালাগানের বাসিন্দা করছে। শুধু ভক্তিরসের ওপর আর কোন যাত্রাদলই আস্থা রাখতে পারছে না। মরসুমের গোড়ায় যখন নতুন পালার নাম ঘোষণা করা হয়, তখন শুধুমাত্র ভক্তিরসাপ্লুত পালার নাম ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে সামাজিক ঐতিহাসিক পালার কথাও ভাবতে হয়। আজ অনেকেরই অভিমত, শুধুমাত্র ভক্তিরস দিয়ে যাত্রাজগতে টাঁই পাওয়া যাবে না। প্রাচীন ধারার অনুকরণে সঙ্গীত নৃত্যবহুল পালার কদর বেশন কমেছে, তেমনি ভক্তিরসও আর মানুষের মনে ধরছেনা। এটা নিশ্চয়ই শুলক্ষণ।

আজ যাত্রার প্রতিটি আসরে যে বিশাল দর্শকের সমাবেশ ঘটছে, তারা শুধু ভক্তিরসে আপ্লুত হতে রাজী নয়, কেননা তারা কখনই তাদের ঘরোয়া জীবনটাকে ঘরে ফেলে আসতে পারবে না। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নাটকীয় উত্তাপকে তারা প্রত্যক্ষ করতে চান যাত্রায়। বিগত-যৌবন বৃদ্ধাভিনেত্রীরাই তো শুধু আজকের যাত্রার দর্শক নয়, আজকের যাত্রার দর্শকদের অন্যতম বড় অংশ হল যুবশক্তি। এই যুবশক্তিকে অবজ্ঞা করা যাবেনা যাবে না। যাত্রা দলের অধিপতিরাও এ সত্যটিকে অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই ভক্তিরসের পালার পাশে সচেতন সামাজিক পালা রাখতেই হয়। ওরুত অধিকাংশ ভক্তিরসের পালাই ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে নি। ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে দুর করতে পারে যে ধর্মীয় পালা তার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। কেননা কাঁচা দিয়ে কাঁচা তোলার মতো কৌশলী প্রক্রিয়া আর কি হতে পারে।

মানুষ যে তার সৃষ্ট শিল্পে তারই সংগ্রামী অস্তিত্বের প্রতিফলন লক্ষ্য করতে চায় তার প্রকাশ আমরা পেয়েছি স্বদেশী যুগের যাত্রাতেই। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের নাম আমরা কি কেউ ভুলতে পেরেছি? চারণের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করছে চলেছে আজকের যাত্রা। যাত্রা দলের যে সকল অধিপতিমণ্ডলী এই সত্যটিকে বুঝতে চাননা তাদের অচিরেই যাত্রাজগত থেকে বিদায় নিতে হবে। যাত্রাজগতে কার্ল মার্ক্স - লেনিন হিটলার প্রমুখদের আবির্ভাব দেখে অনেক সাংবাদিক কিছুদিন আগে আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এইসব ব্যক্তিদের অন্তস্থান বিশেষ ফলেও এদের সংগ্রামী চেতনায় যে বিশ্ব অনুপ্রাণিত, এ সত্যটি তিনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? তাই যেখানেই ভক্তিরসের বদলে শক্তিরস, সংগ্রামের প্রেরণা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেখা-নেই মানুষ এগিয়ে যাবে—এটাই যাভাবিক এবং প্রগতির লক্ষণ।

'অভিনয়' পুরস্কার

১৯৭৫ সালে কলকাতা ও গ্রাম বাংলার অপেশাদার মঞ্চে প্রযোজিত প্রগতিবাদী নাটকগুলির উৎকর্ষতার মূল্যায়ন করে নিম্নলিখিত সংস্থা ও ব্যক্তিকে "অভিনয় পুরস্কার" দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা: রামযাত্রা (চেতনা)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : পঙ্কজ মুন্সী (শিবের অসাধ্য) থিয়েটার ল্যাভর্স গ্রুপ। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : নবেন্দু গুপ্ত (পশুশ্রম লাহা) থিয়েটার থিয়েটার ইউনিট। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : বেলা সরকার (পরবাস) সুন্দরম। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি : কৌশিক সান্যাল (গুরু ও গণিকা) কলিকাতা নাট-মঞ্চ। মফঃস্বলে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বিসর্গ মধ্যাহ্ন (হালিক, হাওড়া)। হাওড়া)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : সুমন-রঞ্জন গুপ্ত (হে রাজবিদ্রোহী) শৌভক, দমদম। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি : রামলীলা (দীপক সেন) আমরা, উত্তরপাড়া।

সাফল্যের একটি দশক

দেশ এগিয়ে চলেছে

স্বনির্ভর অর্থনীতির পথে

খাদ্যোৎপাদন 114 মিলিয়ন টনের রেকর্ড মাত্রা ছুঁয়েছে
শিল্পোৎপাদন 30 শতাংশ বেশি হয়েছে
বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন শতকরা 100 ভাগ বেড়েছে
মাত্র এক বছরে রপ্তানীর পরিমাণ 3,300 কোটি টাকার মাত্রা ছাড়িয়েছে

সুশৃঙ্খল জীবনধারার প্রতি

সময়নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা লক্ষণীয়
সর্ব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কাজকর্মে চমকপ্রদ সাফল্য
সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ

এবং অধিকতর একতার দিকে

"প্রায় প্রতি বছরেই একটা না একটা সঙ্কট ও সমস্যা সামনে এসেছে...
বহির্আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাতে হয়েছে...
নমনীয় দৃঢ়তা ও আপসের মনোভাব নিয়ে আঞ্চলিক দাবীদাওয়ার নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। বেসরকারী শিল্পপ্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত না করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উন্নয়নের একটা ব্যাপক কর্মসূচী আমরা হাতে নিয়েছি।"

ইন্দিরা গান্ধী

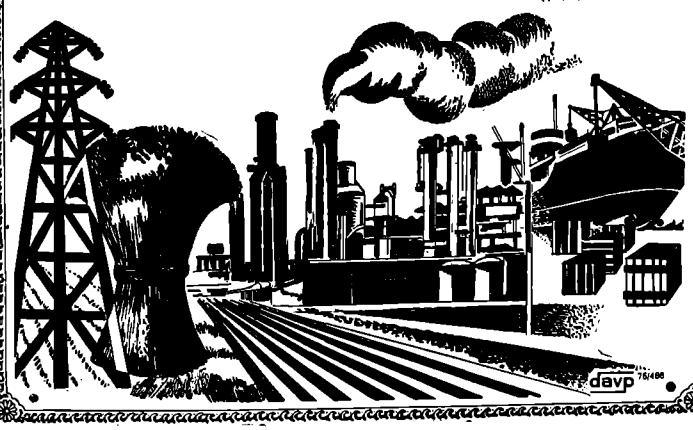

davp 76/486

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী '৭৬ ॥ দাম : ৪০ পয়সা

পাইলট স্কীমে

বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাইলট স্কীম চালু করে রাজ্য সরকার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে অত্যন্ত জটিল ভূমি সমস্যার যে সমাধান আবিষ্কার করেছেন কাগজে কলমে তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য হলেও কার্যতঃ তার চেহারা কি তার কয়েকটি নজির এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, উনসত্তর থেকে একাত্তর সালের মধ্যে সমস্ত হস্তান্তরিত দলিল বা কোবালা বা বন্দোবস্তগুলো প্রত্যেক ব্লকের জন্য নির্দিষ্ট পাইলট টীম পরীক্ষা করে রেকর্ড করবেন এবং কোনটা ঠিক অথবা বেঠিক সে সম্পর্কে মন্তব্য দেবেন। বর্গাদার রেকর্ডের ক্ষেত্রেও এই টীম মাঠ জরিপ করে কাজ করবেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে কলমে নাজরায় তারিখ হচ্ছে এবং অঞ্চল অফিসে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অঞ্চল অফিসগুলোও একটা দারসারা গোছের নোটিশ টাঙিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করছে। ফলে বর্গাদারদের কিছুর জানার কোন সম্ভাবনাই নেই।

ভাগচাষী অফিসে জমি, ফসলের ভাগ এবং উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা করতে গিয়ে যারা এ সম্পর্কে খবর পেয়েছেন তারা উদ্যোগ নিয়ে বর্গাদার রেকর্ডের জন্য পাইলট টিমের কাছে গেলেও এবং দরখাস্ত দাখিল করলেও তা নানা অজুহাতে বাতিল করা হয়েছে। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার রুকিনী গ্রামের হরিপদ ঘোষের দরখাস্ত জমা নেওয়া হয়নি। খৈপাড় গ্রামের লক্ষ্মণ রায়ের ভাগচাষ মোকদ্দমা থাকা সত্ত্বেও তার আবেদন অনেকের কোন তদন্ত করা হয়নি। মাগুর গ্রামের শংকর মালিক তার পিতার নামে বর্গাদার রেকর্ড রক্ষা করা সত্ত্বেও এবং আট নয়জন গ্রামবাসী এফিডেবিট করে তার পক্ষে সাক্ষী দেওয়া সত্ত্বেও কে এল অর ও "কোন সাক্ষী পাইলা না" এই মর্মে মন্তব্য করে তাকে বর্গাদারের অধিকার থেকে খারিজ করে দিয়েছে। এই গ্রামেরই পঞ্চানন দাসের নাম সেটেলমেন্ট রেকর্ডে বর্গাদার হিসেবে লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাইলট টীম এ সম্পর্কে কেন তদন্ত করে মীমাংসা করেনি। পরে সে আদালতের আশ্রয় নিয়ে জমির মালিকের বিরুদ্ধে ১৪৫ সি আর পি সি জারী করানোর ফলে বর্তমানে সেই জমি রিসিভারের অধীনে আছে।

১৯৭৪ সালে গাজিনা দাসপুর গ্রামের পতিতপাবন মণ্ডলের এক জমি সংক্রান্ত মামলায় চুঁচুড়ে, এস ডি ই এর-এর আদালতে পাণ্ডুয়া থানা অঞ্চলে বর্গাদার বলে রিপোর্ট দেয় এবং সে এল আর ও তাকে বর্গাদার ঘোষণা করে সেটেলমেন্টের কাছে সুপারিশ করেন। ১৯৭৫ সালে ঐ জমির মালিক আদালতে বর্গাদারের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা প্রার্থনা করলে মাননীয় বিচারক থানার কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান কিন্তু এইবার থানা পতিতপাবন মণ্ডল বর্গাদার নয় বলে রিপোর্ট দেয়। আদালত সব কাগজপত্র পরীক্ষা করে বর্গাদারের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারীর প্রার্থনাই শুধু নামঞ্জুর করেন না, ভাগচাষীকে জমি থেকে ধান তোলারও হুকুম দেন এবং পাণ্ডুয়া থানার ও সি-কে এবং জে এল আর ও-কে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বিধিমত ধান বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেন। থানা অথবা জে এল আর ও অবশ্য আজ অবধি আদালতের নির্দেশ মান্য করেনি অথচ এই মামলার রায় দেওয়া হয়েছে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। দর্পণের সংবাদদাতা হুগলী জেলার বিভিন্ন থানার গ্রামাঞ্চল ঘুরে এরকম অসংখ্য নজির সংগ্রহ করেছেন। এই হচ্ছে যেখানে বর্গাদারদের অবস্থা সেখানে পাইলট স্কীম সমাজের কোন অংশকে পাইলট করবে তা নিশ্চয়ই প্রশ্নবোধক।

যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটি বারিদবাবুর বক্তব্য মেনে নিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

• প্রদেশ যুব কংগ্রেসের ভেঙ্গে কমিটি পুনর্গঠন নিয়ে যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি বারিদবরণ দাসের বক্তব্য মেনে নিয়েছেন।

জেলা কমিটি পুনর্গঠন নিয়ে অনেক দিনের টানাপোড়েনের পর যুব কংগ্রেস সভাপতি বিভিন্ন জেলার যুব নেতা ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর চোদ্দটি জেলার যুব কংগ্রেসের আহ্বায়কের নাম ঘোষণা করেন জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে। উত্তর চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ সহ সাতটি জেলার আহ্বায়ক মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়। এবং প্রদেশ আহ্বায়ক মনোনয়ন না হওয়া সাপেক্ষে এই সাতটি জেলার যুব কংগ্রেসের কাজকর্ম দেখাশোনার ভার সভাপতি নিজের হাতেই রাখেন।

জেলা কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তের রক্তা যুব কংগ্রেসের অন্তম উপদেষ্টা সুব্রত মুখার্জী সরাসরি বিরোধিতা করেন। সুব্রতবাবু জেলা কমিটি ভাঙার বিরোধিতা করার সমস্ত ব্যাপারটাই এক অন্তর্দ্বিতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। যুব নেতাদের মধ্যে সন্দেহাতীত ঐক্যে সন্দেহের ফাটল দেখা যায়।

ঘটনাটা অকস্মাৎকে মোড় নিতে যাওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় যুব নেতৃবৃন্দ রক্ত যুব কংগ্রেস নেতাদের দিল্লীতে ডেকে পাঠান। বারিদবাবু, উপদেষ্টা-সহ লক্ষ্মীকান্ত বসু, সুব্রত মুখার্জী দিল্লীতে যান। যুব কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় গান্ধী ও সর্বভারতীয় সভাপতি অম্বিকা সোনীর সঙ্গে রাজ্য যুব নেতারা আলোচনায় বসেন। এই আলোচনার সর্বভারতীয় নেতৃত্বে ছিলেন।

বলাবাহুল্য যে,

এই পরিপ্রেক্ষিতে যুব কংগ্রেসের কাজকর্মকে বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক করতে হলে জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা একান্ত দরকার।

সংগঠনের সার্বিক স্বার্থেই পুনর্গঠন করা হয়েছে। সুব্রতবাবুর অভিযোগ জেলা কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে কোন আলোচনা না করেই বারিদবাবু একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ভাঙা বর্তমান জেলা কমিটিগুলি বাতিল করাতে অন্যভাবে বাধা পেতে পারে। এতদিন জেলার নেতৃত্বে ছিলেন প্রিয়-সুব্রত গোষ্ঠীর লোকজন। পুনর্গঠনের পর জেলার নেতৃত্ব বদল হয়ে গেল।

যা হোক উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সংগঠনের স্বার্থে বারিদবাবুর সিদ্ধান্তকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বহাল রাখেন এবং সুব্রতবাবুকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে বলা হয়।

(সেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ বণ্টনে বৈষম্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া হুগলীর ব্যবসায়ী অঞ্চলে পাওয়ারের লক্ষ্মণপুর, গাঁ বিতপুর, শেওড়াবেড়িয়া জলবিদ্যুৎ অঞ্চলে এবং বাগাণ্ডা মৌজার জাতীয় নেতা উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর স্মৃতি ধন্য জন্মস্থান ও আশেপাশে এলাকার বিদ্যুৎ বণ্টন চরম বৈষম্যমূলক। মংক্ষুলিকা বাগাণ্ডা উন্নয়ন সমিতি সম্পাদক কমরুদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন ঐ অঞ্চলে হাওড়া বিদ্যুৎ দপ্তর বাহাত্তর সালে বিদ্যুৎ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর সি গুহ, এডিসনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চিঠির নম্বর অর/ আর ই সি/বাহাত্তর-তিয়াত্তর/একশত পনের/উনচল্লিশ/এইচ জি-এক, তারিখ ২৭ ১ ৭২ বাগাণ্ডা মৌজা স্কীম নম্বর ছিল ১১, সোনাম গুরো ১১৮, লক্ষ্মণপুর ১২৯, শেওড়াফুলী ১২০ লাচবেড়িয়া ১৯২ অদ্দ আজও কিন্তু হয়নি। গোটা অঞ্চলে পঞ্চাশটি শালো টিউবওয়েল আছে কিন্তু শিল্প অধিষ্ঠিত বটে। তিনবার মাপজোক হয়ে কাজ হয়নি। স্থানীয় লোকেরা জনতে চায় কেন জালাপাড়া ও জগবল্লভপুর থানার ঐ সব এলাকায় বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে না, কেনই বা এই হয়রানি। বাহাত্তর সালের এই পেনডিং কেস সম্পর্কে কিন্তু মন্ত্রী কি তদন্ত করবেন?

বেকারের সংখ্যা ৯৩ লক্ষ

বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। জানা গেছে ১৯৭৫ সালের তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে চাকরীপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৩.১৫ লক্ষ। ১৯৭৪ সালে এই সময় বেকারের সংখ্যা ছিল ৮৪.০৩ লক্ষ। তার মানে মাত্র এক বছরের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে নয় লক্ষ। ১৯৭৪ সালের তুলনায় ৭৫ সালে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে চারগুণ হারে। গত চোদ্দ বছরের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৭৫ লক্ষ।

ঋত্বিক ঘটক

চির আচার্য

ঋত্বিক ঘটক ও আমি একই সময় সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করি। সময় এবং বিষয়ের প্রশ্ন পরে। ঋত্বিকের উদ্যোগেই আমার সঙ্গে প্রথমে, নতুন সাহিত্য পত্রিকার যৌথসম্পর্ক। তারই মধ্যে আমাদের সাহিত্যচর্চার দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে প্রতিষ্ঠা। সেই যুদ্ধে সৃষ্টিকে দাবা দিশাভিযোগ শুরুতা। হৃদয়ভারের পর্যায়ের সংগে যুক্ত। দেশবিভাগের কারণ ঋত্বিক উত্তর বাঙলার রাজশাহী থেকে. আমি নিম্নজলপর থেকে উৎসাহ। মাতৃভূমি থেকে চ্যুত হওয়ার বেদনা ঋত্বিক ও আমার একই জাতীয়। দুজনেই উত্তর বাংলার মানুষ বলে আমাদের আন্তরিকতাবোধও কম নয়।

পরবর্তীকালে শিল্পমাধ্যমের পরিবর্তন ঘটলে ঋত্বিক বন্ধে চলচ্চিত্রের সংগে যুক্ত হলেন। বিমল রায়ের "মধুমতী" হৃষীকেশ মুখার্জীর "মেমফিরের" চিত্রনাট্য; তারি রচিত। তখনো পরিচালক হিসেবে তাঁর স্বাধীন প্রকাশ ঘটেনি। যখন ঘটে তখন শিল্পের ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাকেই তিনি বেছে নিলেন। অন্যরা পেলাম আরেকজন প্রতিভাশালী পরিচালককে। তাঁর প্রথম চিত্রকর্ম "নাগরিক" সম্ভাবনাই পরিণেশত না হলেও তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি "অযান্ত্রিকের সমাদর কুড়িয়ে নিলেন। "অযান্ত্রিকের" চিত্রায়ণ ঋত্বিকের পক্ষেই সম্ভব। এর পরে তাঁর "মেঘে ঢাকা তারা" "কোমলগান্ধার" "সুবর্ণরেখা" তাঁর কৃতিত্বকে উজ্জ্বল করে তোলে।

"কোমলগান্ধার" চিত্রকর্মটির উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। আমেচার এক নাট্যকে দলের সম্ভ্রামের বস্তুত চিত্র কুশলী শিল্পঅভিনেতা এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। একটি নতুন ধরণের এক্সপেরিমেন্টাল ছবি। দর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিক্রিয়াশীল তথা ক্ষুদ্র প্রগতিশীল এবং জনসাধারণের গ্রহণক্ষমতার দারিদ্র, এই ছবিটিকে বেশিদিন চলতে দেয়নি।

ঋত্বিকের শেষতম সৃষ্টি "যুক্তি তক্কো গপ্পো" এবং বাঙলা দেশে তোলা "তিতাস একটি নদীর নাম" এখনো সাধারণের দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

মাত্র একান্ন বছরে ঋত্বিকের অকালমৃত্যু। আমরা ঘরা তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আশ্বস্থান ছিলাম। তাদের পক্ষে অবশ্যনীয় ক্ষতি। এন্টারিয়মেন্টের সংগে তাঁর আপস হীনতা শিল্পীসত্তার নিরলস অহংকরেরই প্রমাণ। শিল্পীর এই মর্যাদাবোধ ও অহংকার যা আজ দুর্লভ সংগে আমি এক হয়ে যাবোধ করছি। সেই সংগে আমি একত্ববোধ করছি। সেই? আসন থেকে মৃত্যুও ঋত্বিককে স্খলিত করতে পারবেনা।

চাসনালা দুর্ঘটনা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

কল্যাণ ঘোষ

চাসনালা খনি থেকে একের পর এক মৃতদেহ তুলে আনা হচ্ছে। উদ্ধার করা মৃতদেহগুলিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। যাদের সনাক্ত করা হয়েছে, তাদের দেহ অবিকৃত ছিল না। কাউকে সনাক্ত করা হয়েছে পোষাক দেখে, কাউকে বা মেটাল বেল্টের নম্বর দেখে।

চাসনালা দুর্ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিল। খনি নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা সিরিয়াস রয়েছি। আজ খনি নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রেখে একের পর এক কোলিয়ারী বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। অথচ এই সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা যদি চাসনালা খনির বেলায় নেয়া হত, তাহলে কি এই দুর্ঘটনা ঘটত? জল পরিপূর্ণ একটি পরিত্যক্ত খনির পাশে চাসনালা খনির কাজ এতদিন চলল কেন, এ প্রশ্ন আজ মনে আসা অস্বাভাবিক নয়।

খনি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য দু বছর আগে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটির সুপারিশ আজও কার্যকর হয়নি কেন? খনি নিরাপত্তা ডিরেক্টরেট কোয়ারেল বলেছেন, কাজেই ডাইরেক্টর মহলের আপত্তিতেই কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। খনিতে দুর্ঘটনা ঘটলেই একটি করে তদন্ত আদালত গঠন করার নিয়ম আছে। বেঙ্গল গঠিত হয়েছে কাঁসিয়ারা দুর্ঘটনার জন্য। অতীতেও বারবার এই তদন্ত আদালত গঠিত হয়েছে। কিন্তু অতীত দুঃখের বিষয় সেই সব তদন্ত কমিশন বা কোর্ট অব ইনকোয়ারীর সুপারিশগুলি হারিয়ে গেছে অন্ধকারে যেমন করে হারিয়ে যায় দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকরা। প্রত্যেকটি খনি দুর্ঘটনার পরেই আমরা হয়েছি সজাগ, আবার নিস্তেজ হয়ে পড়তেও সময় লাগেনি। আজও পর্যন্ত খনি দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়নি।

চাসনালা খনির প্রথম স্তর থেকে উদ্ধার কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রথম স্তরে ৩৫৪ জন শ্রমিকের মধ্যে ৪৫ জন শ্রমিককে মৃতদেহ তুলে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে উদ্ধার কাজের প্রস্তুতি চলছে। দ্বিতীয় স্তর থেকে পাম্প করে জল তোলা হবে প্রথম স্তরে, তারপর আবার জল পাম্প করে তুলে ফেলা হবে বাইরে প্রথম স্তর থেকে। কিন্তু এদিকে আবার দামোদর নদীর জল চুইয়ে চুইয়ে চাসনালার আদতে থাকায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খনি নিরাপত্তা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীএস প্রধান। তিনি আরো বলেছেন, দামোদর নদী থেকে চুইয়ে আসা জলের পরিমাণ প্রতি মিনিটে দু হাজার গ্যালন।

ডেড মাস অক্সিজেন্ড্রেজ চললো এখনও উদ্ধার কার্য শেষ হল না। সরকারী হিসেব মত নিখন পাঁচান্তর জন শ্রমিকের মধ্যে খুব কম সংখ্যক শ্রমিকের মৃতদেহই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত শ্রমিকদের মৃতদেহ তুলে আনা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, প্রায় অনেক শ্রমিক পাশে নেবেছিলেন যার কোন রেকর্ড নেই। তাই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, রেকর্ড বহির্ভূত শ্রমিকদের মিলিয়ে খনিমজী শ্রমিকের সংখ্যা সরকারী হিসেবের চেয়েও হবে। উদ্ধারকারী দলের কোন একজন সদস্য আশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, খনির প্রথম স্তরে একটা এয়ার পকেটের সন্ধান পাওয়া গেছে যাতে শ্রমিকেরা কেউ হয়ত বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সে আশাও পরিণত হয়েছে ব্যর্থতায়, এবং যে উদ্ধারকারী এই উক্তি করেছিলেন তিনি একথা অস্বীকার করে বলেছেন, আমি একথা বলিনি. এ সংবাদ বেতার মারফৎ প্রচার করা হয়েছে। এই রকম নানা আশার কথা শুনিয়ে আটক শ্রমিকদের পরিবারবর্গের মনে চরম পরিশাম করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য একটা অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়েছিল।

যখন বিশেষজ্ঞরা এই সব প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ঐ খনিরই অন্যান্য শ্রমিকরা বলেছেন, অসম্ভব, চাসনালাতে এরূপ পকেট হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। খনিগর্ভে কি কি ঘটতে পারে তা উদ্ধার কাজের আগেই শ্রমিকরা বলেছিলেন। কিন্তু তাদের অভিমতকে কোন আমলই দেয়া হয়নি।

চাসনালার দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরেই একটা অদ্ভুত কথা খনির জলের পরিমাণ বার বার বেড়ে চলে। সাতে আটশো ফুট জল এবং গ্যালনের হিসেবে এগারো কোটি গ্যালন। কিন্তু কি ভাবে এই অঙ্ক বলা হল তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। একজন বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের মতানুসারে জলের পরিমাণ যা বলছেন তা একটুও বেশি বা কম নয় এটা কোন হিসেবের ভিত্তিতে বলছেন? উত্তরে বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, জলের হিসেব থেকে। আমরা খনি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে যে তথ্য পেয়েছিলাম সে কথা তাকে বলা হলে তিনি বলেছিলেন—হতেই পারে না, আমাদের হিসাব নির্ভুল। শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আমরা জেনেছিলাম, জলের পরিমাণ এখানো কোটি গ্যালনের অনেক বেশী। শ্রমিকদের সে অভিমত আজ প্রমাণিত। পনেরো কোটি গ্যালন জল তুলে ফেলবার পরেও যে জল এখনও জমে রয়েছে তার পরিমাণ হবে আরো কয়েক কোটি গ্যালন। চাসনালার শ্রমিকরা দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, পার্শ্ববর্তী পরিত্যক্ত খনি এবং চালু খনির দেওয়ালে ফাটল দিয়ে জল ঢুকছিল। যা নজরে পড়েছিল নিরাপত্তা বিভাগের কর্মিক শ্রমিকের। ফলে ২৬শে ডিসেম্বর রাত চারটের সময় ফাটল দেখে উক্ত শ্রমিক নিজের গ্রুপের লোকজন নিয়ে সেই স্থান থেকে চলে আসে এবং ঘটনা খনি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে। আজ কিন্তু শ্রমিকদের প্রত্যেকটি অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। গত ২১শে জানুয়ারী চাসনালা খনির জেনারেল ম্যানেজার উপযুক্ত অভিযোগ বিরত করেছেন সাংবাদিকদের কাছে। শুধু তাই নয়, দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়া সত্ত্বেও খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বেকথাও আজ আর গোপন নেই।

এসব ছাড়াও উদ্ধার কার্য ব্যাহত হয়েছে নানা কারণে। শ্রমিকদের মতকে উদ্ধার কার্য উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া যে খনিটির জলে থাকা জল বেয়ালে তেল করে চাসনালা খনিগর্ভকে প্লাবিত করেছে, গর্ভদ্বারে জলমগ্ন সেই খনির ছিদ্র পথে পাম্প বসিয়ে জল বার করে ফেলার চেষ্টা করা হলে হয়ত উদ্ধার কার্য কিছুটা ত্বরান্বিত হত। চাসনালা খনির যে প্লান উদ্ধারকার্যদের সরবরাহ করা হয়েছিল তা সঠিক না হওয়ায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

চাসনালা দুর্ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত আদালতের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ধানবাদের ধানবাদ এলাকায়। এই তদন্ত কমিশনে সাক্ষ দেবে কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অনেকে। খনিতে এখন জমে থাকা জলের পরিমাণ ২৭১ মিটার।

প্রখ্যাত নদী বিজ্ঞানী শ্রীকল্পিল ভট্টাচার্য বলেছেন, চাসনালা খনি জলমগ্ন হওয়ার মূল কারণই জল দামোদরের উপর মাইথন ও পাঞ্চেত জলধার। দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার সাংবাদিক শ্রীকল্পিলের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শ্রীভট্টাচার্য আরো বলেছেন পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধারের চাপে ধানবাদ অঞ্চলের বহু খনি ভবিষ্যতে জলমগ্ন হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ভূতত্ত্ববিদ ও ভিজলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল মিলিন কুমারের মতামতের উল্লেখ করে শ্রীভট্টাচার্য বলেন—মিলিন কুমার বলেছিলেন বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলের কাছাকাছি দামোদরের উপরে জলাধার নির্মাণ করলেই জলাধারের প্রচণ্ড চাপে ভূস্তরের ফাটলগুলির বিস্তৃতি বিপর্যস্ত হবে এবং ভবিষ্যতে জলাধারের জমে থাকা জল ভূস্তরের ভেতরের সাথ সঙ্গেই ওয়াটার লেভেলের সঙ্গে মিশে নিচের দিকে যাবে এবং এমন একটা সময় আসবে যখন কালাঝরিওলিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হবে। ভূতত্ত্ববিদ মিলিন কুমারের এই রিপোর্ট ডি ভি সি রিপোর্টের মধ্যেও আছে। শ্রীভট্টাচার্য বলেন, চাসনালা খনি কখনই জলমুক্ত ছিল না, তু ফুট জল সব সময়েই জমে থাকতো এবং সেই অবস্থাতেই কাজ চালানো হত। তিনি মিলিন কুমারের মত উল্লেখ করে বলেন, চাসনালা দুর্ঘটনা হয়তো আকস্মিক কিন্তু এই দুর্ঘটনার বীজ পঁচিশ বছর ধরে ভূগর্ভে নিহিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন, জলাধার এবং কয়লা চুটোই মানুষ জীবনে অপরিহার্য, কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। তাই জলাধার নির্মাণ এবং খনি খননের সময় জলস্তরের নিচে এবং খনির চুপাশে পলিথিন দিয়ে ভাল ভাবে বুজিয়ে দেওয়া দরকার। যার ফলে ভূস্তরের ফাটলগুলি ফিকশন শক্তি হারাবে এবং খনিতে জল চুকতে পারবে না। ফলে ভবিষ্যতে এই ধরণের খনি দুর্ঘটনা আর ঘটবে না।

মায়া ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে শ্রমিক ছাঁটাই

বিগত ২৫শে জানুয়ারী কর্তৃপক্ষ একটি নোটিশ মারফৎ মায়া কারখানার ১০জন শ্রমিককে কোন কারণ না দেখিয়ে ছাঁটাই করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মায়া কারখানার মালিক প্রাক্তন জমিদার তার সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব অটুট রেখে বরাল অভিযুক্ত শ্রমিকদের অবাধ্যতত ভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে কর্তৃপক্ষ যখন খুশি শ্রমিকদের কোন কারণ না দেখিয়ে ছাঁটাই করে থাকেন। ইতিপূর্বে এ ভাবে ডিজন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়, যাঁদের মধ্যে দুইজনের মামলা আজও ট্রাইবুন্যালে বিচারাধীন। বিগত ২৪ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিসপিউট বেতন চুক্তি আজও এই মালিক কর্তৃপক্ষ না করে শ্রমিকদের এক অসহনীয় আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ফেলে রেখেছে। তা ছাড়া শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ৩ই, এস আই-এর টাকা জমা না দেওয়ার জন্য তারা প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা ধার বা অগ্রিম এবং চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর উপর আবার বিনা-কারণে ১০জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হল। এ ব্যাপারে শ্রমিকরা ক্ষীরণ ভাবে বিক্ষুব্ধ। সেবার কমিশনার দপ্তরকে ও শ্রম মন্ত্রী মহ সর্বত্র এ ব্যাপারে প্রতিকারের জন্য মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

শোক প্রকাশ

মুর্শিদাবাদ জেলা হকার্স ইউনিয়ন ২৮শে জানুয়ারী আমিমণ্ডলে এক সভায় কমিটি নক্ষ নেতা কমরেড চৌ-এন-লাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও সংকল্প গ্রহণ করেন। উনি মিনিটের সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি সকলে গভীর শোক ও দিন্ন শ্রদ্ধায় দুই মিনিট দণ্ডায়মান থেকে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

বেঙ্গল মিউজিক কলেজে গণ্ডগোল

সর্বাণী গৌতম

কলকাতা গড়িয়াহাটার মোড়ে অবস্থিত বেঙ্গল মিউজিক কলেজকে কেন্দ্র করে আবার রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এই কলেজে দুইটি ডিপার্টমেন্ট, জেনারেল এবং ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের পরিচালনাধীন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এই কলেজের নির্বাচিত গভর্নিংবডি বাতিল করে দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককৃষ্ণ দত্ত, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী ব্যানার্জী এবং প্রসাদ সেনকে নিয়ে একটি অ্যাড হক কমিটি গঠন করে। ভাইস চ্যান্সেলর এই সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়ে অধ্যাপক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়। এবং অতঃপর এই নিয়ে নানাভাবে জল ঘোলা হচ্ছে।

কলকাতার বিভিন্ন সংবাদের এক অংশ কি ভাবে আলোচ্য কলেজের দুর্নীতিপরায়ণ অধ্যক্ষের সঙ্গে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে গাঁটছড়া বেঁধেছেন তার পরিচয় পেতে গেলে পূর্বোক্ত সিন্ডিকেটের সভায় পঠিতব্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর ভূমিকাটি একটু জানা দরকার। ঐ সভা যখন প্রায় শেষ হবার মুখে তখন দিলীপবাবু হঠাৎ বাইরার তরীতে নাকি সভার কাছে আবেগপূর্ণ বক্তব্য করে মিউজিক কলেজের বর্তমান অবস্থা, গভর্নিং বডি বাতিল করে ৬ জনের এ্যাড হক কমিটি গঠনের দাবী জানান। অনুহাত ছিল এই যে, কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছে না এবং পুজোর মুখে বেতন না পাওয়া জনিত করুণ চিত্রটিও তিনি তুলে ধরেন। সদস্যরা প্রায় সকলেই তখন মানসিক ভাবে পৃথা-ভিমুখী এবং সেই জন্যই এই প্রসঙ্গটি নিয়ে খুব আলোচনা না করেই দিলীপবাবু প্রস্তুত ৬টি নামের তালিকা অনুসারেই এ্যাডহক কমিটি গঠন করে গভর্নিং বডি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সদস্যরা সেদিন সাংগঠনিক দিক থেকে দিলীপবাবুর পদমর্যাদার কথা মনে রেখেই তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর এই খবর কলকাতার প্রভাতী পত্রিকা-গুলোতে প্রকাশিত হবার পর গভর্নিং বডির কয়েকজন সদস্য উপাচার্য ডঃ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক তরফা এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে তিনি দিলীপবাবুর বক্তৃতার সারাংশ বিবৃত করেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় পকেট থেকে চলতি মাসের বেতনের চেক বের করে উপাচার্যের কাছে হাজির করলে ডঃ সেন বিস্মৃত কণ্ঠে দিলীপ চক্রবর্তীর ভূমিকার নিন্দা করেন এবং গভর্নিং বডি বাতিল করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথাও জানিয়ে দেন। এদিকে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখেই দিলীপবাবু উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সিন্ডিকেটকে বহাল রাখার জন্য আবার জানাতে থাকেন। সম্ভবত, শিক্ষক হিসেবে আর একজন শিক্ষকের সম্মান রক্ষা করার জন্যই শেষ পর্যন্ত উপাচার্য এ্যাক হক কমিটি বাতিল করে দিয়েও অধ্যাপক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপবাবুর সততার একটি নজির উদ্ধৃত করছি। নেতাজীনগর কলেজের জনৈক অধ্যাপককে বরখাস্ত করার ঘটনা নিয়ে যেদিনই তাঁর উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল কারণ ঐ অধ্যাপককে ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরই চলে যেতে বলা হয়েছিল। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় অধ্যাপক সমিতির বিশিষ্ট নেতা সন্তোষ বিত্তের সঙ্গে যখন দিলীপবাবুর উচ্চকণ্ঠ তর্ক বিতর্ক চলছিল তখন দিলীপবাবু নির্বিকার কণ্ঠে বলেন যে উপাচার্য খুব ব্যস্ত থাকায় সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি। অধ্যাপক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হয়ে তিনি আর একজন অধ্যাপকের জীবিকার প্রশ্নকে লঘু বিবেচনা করলেন, অথচ একজন অতীব দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তির সপক্ষে ওকালতির জন্য প্রায় দুই ঘণ্টা উপাচার্যের সঙ্গে কাটালেন এবং বললেন যে তিনি সিন্ডিকেটের সঙ্গে দেখা হয়নি।

শিক্ষক ও অধ্যাপক সমাজ আমাদের কাছে সাধক জগতের মীরমদনি বলেই বিবেচিত হন। কিন্তু দিলীপবাবু কি সেই শ্রদ্ধ বিশ্বাসকেই নির্মম ভাবে আঘাত করলেন না? বেঙ্গল মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির কাহিনী আমরা বারান্তরে আলোচনা করবো এবং দেখা যাবে যে দুর্নীতি উদ্ধেক করতে গিয়েই বর্তমান গভর্নিং বডিকে সরতে হয়েছে এবং তাতে মদত জোগালেন অধ্যাপক সমিতির নেতা দিলীপ চক্রবর্তী।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

"আকৃতি সংস্কার ব্যানেজিং ডিরেক্টার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হল, অনেক্ষেত্রে নিয়মকানুন কাজকে আরও পিছিয়ে দেয়।" বলেছেন ঘুষনেতা সঞ্জয় গান্ধী।

প্রেরণাদি বহ বিয়ানি।

• •

বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচনে আমরা খুশি। এখন ওনার ভক্তেরা না-চটলেই বাঁচি।

• •

শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি মিসা প্রয়োগের অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে বিরোধীদের আশ্বস্ত করেছেন।

• •

সিগারেটপাত্রীদের জেনে রাখা দরকার, একটি সিগারেটে প্রায় সাতাশ রকমের বিষ আছে, প্রতিটি সিগারেট পানে পনেরো থেকে আঠারো মিনিট আয়ু কমে। অন্যদিকে যে দৈনিক দেড় প্যাকেট সিগারেট খায় সে কুড়ি বছরে কুড়ি হাজার টাকা নষ্ট করে।

আমাদের বিবাহ পরামর্শ সিগারেট না-খেয়ে কুড়ি বছরে ওই টাকায় একটি ছোটখাটো বাড়ি কিনুন।

• •

লোকসভায় আয়ুষ্কাল আরো এক বছর বাড়ানোর জন্যে সরকার শক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। নির্বাচনের অপেক্ষা দেশের প্রয়োজনকেই যে তাঁরা বড় করে দেখেছেন এ-খবরে সব পক্ষই সন্তোষ লাভ করবেন।

• •

শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জানিয়েছেন, ওভারটাইম আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

• •

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিরোধী নেতাদের মুক্তির দিন সঠিক ভাবে ধার্য করা মুসকিল। তবে গরিষ্ঠতা জরুরি ব্যবস্থার পক্ষে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশির ভাগ, এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটি অংশ জরুরি অবস্থাকে যে সমর্থন করেছেন তাতে তিনি খুশি।

• •

বিখ্যাত গায়ক পল রবসন সাতাত্তর বছর বয়সে ২৩শে জানুআরি ফিলাডেলফিয়ায় পরলোক গমন করেছেন। বিশ্বের শোষিত সর্বহারা তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালেন।

সঞ্জয় গান্ধীর মতে, সরকারি সেনসাবসিদি চলবার আগেও কী সংবাদপত্রে এক ধরণের সেনসাবসিপ ছিল না? কা গজেন্দ্র মালিকদের নির্দেশ মতো কী লেখা ছাপা হবে না হবে ঠিক করা হত।

• •

"রবীন্দ্র-বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত তাঁর ছায়াই আশ্রয় নেন—" সন্তোষ ঘোষ জানেন রবীন্দ্র বিরোধিতা করে আর যাই হোক আনন্দবাজারে চাকরি করা যায় না।

• •

সাহিত্য আকাদামি কর্তৃক নিখিল ভারত শরৎচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক আলোচনা চক্রে আনন্দবাজারী সাহিত্যিকরা আহুত হওয়া সত্ত্বেও অংশ নেননি। রবীন্দ্র-বিরোধিতা?

পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং আপাতত পদ্মবিভূষণ সত্যজিৎ রায়ের ঝুলিতে আরও একটি মানপত্র যোগ হল।

• •

সাহিত্য আকাদমি আয়োজিত শরৎ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বক্তৃতার গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

• •

"পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে যে, সরকার একবার বৈরাচারী হয়ে গেলে পরবর্তীকালে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।" ঘুমন্ত সিংহ, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি।

• •

"জরুরী অবস্থা আমাদের যৌথ পরিকল্পনাগুলিকে সফল করবার সুযোগ দিয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলিকে সফল করে আমাদের নির্বাচনে যাওয়া উচিত যাতে জনগণ প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর না করে সফলতাগুলো যাচাই করতে পারে।" সঞ্জয় গান্ধী।

• •

নতুন সংবাদ এজেন্সি "সমাচার"-এর গঠন সম্পর্কে শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা জানিয়েছেন, সরকার এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি।

• •

শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা আশ্বাস দিয়েছেন, নির্বাচনী ইস্তাহার সেনসার করা হবে না।

সরকারী মুখপাত্রের মতে, ভারতের বাঙলা দেশ সম্পর্কে মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ এখনো শত শত বাঙলাদেশী মিলিটারিদের আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছি।

• •

এরপরে ফেব্রুয়ারি সঞ্জয় গান্ধীর কলকাতা আগমন উপলক্ষে দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে আচার্য অবনীশ বসু বোডের মুখ কংগ্রেসের দপ্তর পর্যন্ত ভোরণ, পতাকা, ফেস্টুনে বর্ণাঢ্য করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

• •

দুঃশাসন, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পার্টিগত একদেশদর্শিতার কারণে ন্যায় এবং সততা, যার উপর গণতান্ত্রিক শাসন নির্ভর করে, তার সব কিছুই ভেঙে পড়েছে তামিলনাড়ুর গবর্নরের এই রিপোর্ট অনুযায়ী বাধ্য হয়েই ডি. এম. কে সরকার কে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করা হল।

• •

শীতের শেষে গ্রীষ্মের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ।

"তামিলনাড়ুর পক্ষে রাষ্ট্রপতির সরকার বরদাস্তকর"—শ্রীসুব্রহ্মণ্যম।

সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজে গণ্ডগোল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজে প্রায়ই গণ্ডগোল লেগে আছে। শিয়ালদহ অঞ্চলে দুলাল রায় এবং অশোক দেবের সমর্থকদের মধ্যে ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠি ভাগ হয়ে মারপিট চালাচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজে ইউনিভার্সিটি ১৯৭৪ সালের এল, এল, বি ইকোয়ভিভিলেন্টের নম্বর এবং মার্কশিট পাঠিয়েছে। প্রাতঃকালীন আইন কলেজে গেলে ক্লার্করা ইকোয়ের নম্বর বলতে চান না। তাঁরা এবং একশ্রেণীর কর্মীরা বেআইনী আইক রাখছেন বলে এক ছাত্রনেতা দর্পণকে জানিয়েছেন। এদিকে যাঁরা রিডিউ করাবেন আর দুদিন দেরী হলে ইউনিভার্সিটি নাকচ করে দেবে রিডিউ আবেদন। সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ মার্কশিট না দিলে রিডিউও হবে না। ছেলেরা পড়েছে যহা সঙ্কটে। ইউনিয়ন নেতা ছাড়া বৃত্তিক কর্মীদের কাছে সবাই নাজেহাল হচ্ছেন। ভর্তির ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিদারুণ কাবদুশিও হয়ে গেলো কলেজে।

ভোট দাও ডলার নাও

পরিতোষ পাল

মাত্র কিছুদিন আগে রাষ্ট্রসংঘের এক সমীক্ষায় ধনী দেশের সাহায্য দেওয়ার নীতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল সম্প্রতি মার্কিন ভঙ্গিতে তা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সমীক্ষার বলা হয়েছিল সাহায্যপ্রদানকারী ধনী দেশগুলো গরিব দেশকে সাহায্য দেয় নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভেবেই। তাদের কাছে গরিব দেশের প্রয়োজনটা বিবেচ্য বিষয় হয় না—বিবেচ্য হয় সাহায্যলব্ধ দেশের রাজনৈতিক অভিসন্ধি অথবা সাহায্যগ্রহণকারী দেশের স্বৈরশিল্প নীতি। সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব এই সাহায্য দেওয়ার নীতি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে একথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘে এবং অন্যান্য যে সব দেশ আমেরিকার বিরুদ্ধে ভোট দেবে তাদের ক্ষেত্রে সাহায্য কমানো বা বন্ধ করা হবে। ইতিমধ্যেই মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরী কিসিনজার কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই দেশগুলোর মধ্যে দুটি আফ্রিকার দেশও রয়েছে। এদের অপরাধ এরা 'রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তবে যারা মার্কিনের পক্ষে ভোট দিয়েছে তাদের সাহায্য বাড়িয়ে দেবারও এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকার সাহায্যদানের নীতিটা হলো : ভোট দাও সাহায্য নাও; আর ভোট না দিলে সাহায্যও বন্ধ। এ কাঁপারে জনৈক মার্কিন মুখপাত্রের অভিমত হলো : আমাদের প্রতি অন্য রাষ্ট্রগুলো যে রকম আচরণ করবে, তাদের প্রতি আমাদের আচরণও তারই ভিত্তিতে করা হবে। এটাই আমেরিকার নীতি। এ প্রসঙ্গে নিহত মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির বক্তব্য আরও স্পষ্ট। উনিশটা একবট্টি সালে তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন দেশকে সাহায্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে।

ধনী দেশগুলোর পাণ্ডা আমেরিকারই যেখানে এই মনোভাব, সেখানে অন্যান্য উন্নত দেশগুলোরও যে এই একই নীতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারটা শুধু যে পরহিতব্রত—এ ধরনা কখনোই ধনী দেশগুলোর ছিল না। আর তাই ধনী দেশগুলোর সাহায্য দানের পেছনে কত কর দেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক দ্বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যদানের নীতি সম্পর্কে প্রখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক ফেলিক্স গ্রীন তার "দি এনিমি" গ্রন্থে বলেছেন : কোটি কোটি ডলার মূল্যের সাহায্য, ঋণ অনুদান ও সামরিক সহযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দমননীতি চালাবার তুলনাহীন ক্ষমতা দিয়েছে। সেই সঙ্গে আমেরিকা "সাহায্য"কে ব্ল্যাক মেল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

অথচ গরিব ও সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোকে সাহায্য দানে এগিয়ে আসার সময় ধনী দেশগুলো এমন ভাবে দেখায় যে, গরীব দেশগুলোকে টেনে তুলতেই তারা অগ্রসর হয়েছে। প্রয়োজনে বিস্তর টাকা ঢালতেও। অথচ শেষে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের মতো সর্বাধুনিক জীবন যাত্রার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলো প্রকারান্তরে ঋণের বোঝাই চাপিয়ে দেয় সাহায্য গ্রহণকারী দেশের ওপর। তাছাড়া এই সাহায্য যে পরে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করা হয় সেটা আজ আর অজানা নয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মার্কিনী সাহায্য প্রাপ্ত দেশগুলোই তার প্রমাণ। মার্কিন সাহায্যের পরিবর্তে সেই সব দেশে গড়ে উঠেছে সামরিক ঘাঁটি, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কিনী বলবাহ পুতুল সরকারও। আর সাহায্য যে কিভাবে ঘোরা হয়ে দাঁড়ায়। তার জলন্ত প্রমাণ হলো ভিয়তবর্ষ। খাদ্য ঘাটতি মেটাবার আশায় ভারত আমেরিকার কাছে হাত পেতেছে। আমেরিকাও বদান্যতা দেখিয়েছে। অঢেল সাহায্য এসেছে আমেরিকা থেকে ভারতে। কিন্তু আজ পি এল-৪৮০ নামক সাহায্য চুক্তি পরিণত হয়েছে ঋণের বোঝায়। একরকম ভারত পি এল-৪৮০-এর নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর এই পি এল ৪৮০-ঋণের টাকায় এদেশে মার্কিন স্বার্থ পরিচালিত হচ্ছে, পরিচালিত হচ্ছে পেপ্সি মার্কিন কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভাবে বা দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

কিন্তু কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে কারণ, সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলো সরলমনেই সাহায্য গ্রহণ করে। অথচ সাহায্য প্রদানকারী ধনী দেশগুলো সাহায্য দেওয়ার আগেই রীতিমত হিসেব নিকেষ করে নেয়, কোন দেশে টাকা ঢাললে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ হবে সবচেয়ে বেশী। সেই মতই তারা টাকা দেয়। লাটিন আমেরিকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে প্রদত্ত অঢেল মার্কিনী সাহায্য এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। অবশ্য শুধু আমেরিকাই নয়, কেন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশও সাহায্যদানের ক্ষেত্রে এই একই ধরণের মনোভাব অবলম্বন করে থাকে। তাছাড়া এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের অর্থ সংস্থাগুলোও মেটেই মোহমুক্ত নয় তারাও সাহায্য দেওয়ার আগে রাজনৈতিক স্বার্থের চিন্তা করে। অবশ্যই সেটা ধনী দেশগুলোর স্বার্থ চিন্তা করে। আর তাই যে সব দেশে বিদেশী পুঁজি কম, বা যেসব দেশে বিদেশী সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ না দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে সে সব দেশে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা গুলো সাহায্য দেয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আর মূলতঃ এই সাহায্য দানের পিছনে উন্নতিকামী দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিস্তার ঘটানো নয়া উপনিবেশ শোষণের বহু জাল সম্প্রসারিত করে সে সব দেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠন করার নীতি কাজ করে। সেই সঙ্গে এইসব উন্নতকামী দেশে সাম্রাজ্য বাদীদের কিছু পণ্যের বাজার নিশ্চিত করাও তাদের সাহায্যের মূল লক্ষ্য। এ কাপারে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টেরেসা হেটার তার "এইড এজ ইম্পিরিয়ালিজম" গ্রন্থে কিছু আঁকড়ে ও ধনী দেশগুলোর সাহায্যের স্বরূপ কি, তা উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন সাহায্য কখনোই নিঃসর্ত আর্থিক সম্পদের হস্তান্তর নয়। সাধারণভাবে সাহায্য দানের যে সর্ত বলা হয়, তাতে যারা সাহায্য করছে তাদেরই স্বার্থ সিদ্ধির ইঙ্গিত থাকে। সেই সঙ্গে তিনি এও দেখিয়েছেন, সাহায্য দেওয়ার সময় কি ধরণের চাপ সৃষ্টি করা হয়।

শুধু তাই নয়, ধনী দেশগুলো গরীব দেশগুলোকে সাহায্য দেওয়াটা সামরিক কোন কাপার বলে গণ্য করে না। বরং দীর্ঘকালীন মেয়াদে গরিব দেশগুলোর সঙ্গে তারা তাদের গাঁটছড়া বাঁধে। ফলে এই দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য আজ তৃতীয় বিশ্বের গরিব ও উন্নতিকামী দেশগুলোকে এমন ভাবে কন্টকিত করেছে যে, তা আর বলবার নয়। দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী দেশগুলো সাহায্য দিচ্ছে ঋণ হিসেবে। এর জন্য গরিব ও উন্নতিকামী দেশগুলোকে গুণতে হয় চড়া হারে সুদ। ফলে এই সব দেশের প্রতিবছর রপ্তানীজাত পণ্যের জন্য দুর্বল অর্থনীতিতে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। যার পরিণতিতে অর্থনীতি ভেঙ্গে হয়ার পরিবর্তে ক্রমশ ধনী দেশগুলোর সাহায্যের ওপর তারা আরও বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। বাধ্য পড়ছেন ধনী দেশগুলোর শুণ্ডলে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাই একসময় বলেছিলেন, ভূগোল বা ভূ-চিত্রাবলীর পাতার একটি দেশ স্বাধীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পর্দা ওল্টালে দেখা যাবে এ দেশ অন্য একটি দেশের শৃংখলে আবদ্ধ।

শুধুমাত্র সাহায্য নামক ঋণের মাশুলেই ধনী দেশগুলো গরীব দেশগুলোকে ক্রমবর্ধমান করছে না; আরও নানাভাবে তারা এইসব গরীব দেশগুলোর ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে যেমন তার উন্নতিকামী ও গরীব দেশগুলোকে রপ্তানীর সুযোগ বৃদ্ধি করতে দিচ্ছে না; বরং পরিবর্তে কম মূল্যে তাদের কাঁচা মাল বিক্রী করতে বাধ্য করছে। একথাও ধনী দেশগুলোর স্বার্থে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে গরীব ও উন্নতিকামী দেশগুলোকে একটি প্রতিকূল বাণিজ্যিক সর্তের মুখোমুখি হতে হয়। এ ব্যাপার গত বছরে নেহরু পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ রাউল প্রেবিশ বলেছেন, প্রাথমিক সামগ্রী উৎপাদনকারী দেশগুলো যখন উন্নত ধনী দেশগুলো থেকে বিভিন্ন সামগ্রী আমদানী করে তখন তাদের যথেষ্ট বেশী দাম দিতে হয়। সেগুলো আমদানি করতে হয়। অথচ অন্যদিকে উন্নত ধনী দেশগুলো যখন গরীব ও উন্নতিকামী দেশগুলো থেকে বিভিন্ন জিনিষ আমদানি করে তখন তার যথেষ্ট কম দাম দিয়েই সেগুলো আমদানি করে। এই ব্যবস্থার ফলে আমদানির দাম ও রপ্তানি দামের অনুপাত সর্ব সময়ই গরীব ও উন্নতিকামী দেশগুলোর প্রতিকূলে থাকে। অর্থাৎ বাণিজ্য, সর্ত তাদের বিপক্ষে থাকে।

তাছাড়া নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখতে ধনী দেশগুলো বিশ্বের রপ্তানীজাত পণ্যের দাম বাড়িয়ে চলেছেন। রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখান অনুযায়ী, গত কয়েক বছর তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ গরীব ও উন্নতকামী দেশগুলোর প্রয়োজনীয় পণ্যের দামই বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলো সার আমদানি করে তার দাম উনিশশো তিয়াত্তর সালের তুলনায় উনিশশো চুয়াত্তর সালের জুন মাসে শতকরা একশ ভাগ বেড়েছে, ইস্পাতের দাম বেড়েছে শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ. বস্ত্রপাতির দাম বেড়েছে শতকরা তেত্তিরিশ ভাগ। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের এক পরিসংখানে জানা যায়, উনিশশো চুয়াত্তর সালে তৃতীয় বিশ্বের এই সব গরীব ও উন্নতকামী দেশগুলো আমদানিজাত পণ্যের জন্য দুই হাজার তিনশ কোটি ডলার বেশী দিতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া গত কয়েক বছরে আমেরিকা এই সব গরীব ও উন্নতকামী দেশগুলো থেকে যে সব পণ্য আমদানি করছে তার প্রতিবছর রপ্তানীজাত পণ্যের জন্য দুশো কোটি ডলার করে বেশী অর্থ আদায় করেছে।

এক কথায় বিশ্বের বাজারে রপ্তানীমূল্য বৃদ্ধির ফলে গরিব দেশগুলোকে একই পরিমাণ জিনিষ আমদানি করতে অপের তুলনায় অনেক বেশী পণ্য রপ্তানী করতে হচ্ছে। যার পরিণতিতে গরীব দেশগুলোর সম্পদ ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ধনী দেশগুলোতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বুমেদিন তাই কয়েক বছর আগে স্পষ্টই এক আন্তর্জাতিক অধিবেশনে বলেছিলেন, ইউরোপ ও আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বের সম্পদ লুটে খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সাহায্যের নামে গরীব দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ফাঁদে ফেলে স্বকলমুক্ত তাদের পণ্য বিক্রী করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ কাপারে সুদেনের বিলিখ অর্থনীতিবিদ বিরার সঙ্গেরং-এর অভিমত হলো : গরীব দেশগুলোকে সবসময় ভিক্ষে করতে বাধ্য করা হয়।

ধনী দেশগুলোর এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অবশ্য আজ গরীব ও উন্নতিকামী দেশগুলো সংঘবদ্ধ হতে সুরু করেছে। সাহায্য তারা আর তেমন চায় না। কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে বেশীবেশী সাহায্য নেবার অর্থ তাদের অর্থনৈতিক শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। আর তাই সমস্ত আন্তর্জাতিক আসরে একযোগে গরীব ও উন্নতিকামী দেশগুলো প্রতিবাদ জানাচ্ছে ধনী দেশগুলের শোষণ অব্যাহত রাখার কৌশলী নীতির বিরুদ্ধে। পরিবর্তে দাবী করছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রপ্তানীর সুযোগ বাড়ার। কিন্তু বেহেতু এখনো বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোর আধিপত্যই সবচেয়ে বেশী, তাই অনেক ক্ষেত্রেই গরীব ও উন্নতকামী দেশগুলো তেমন কোন অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারছে না। যেমন, সম্প্রতি কিংস্টন অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে গরীব দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিরোধ করার ব্যাপারে কোন কোন বাস্তব ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। ধনী দেশের প্রধান পাণ্ডা আমেরিকাই এ ব্যাপারে বাধা দিয়েছে। করণ, নতুন ব্যবস্থায় আমেরিকার স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আজ ধনী দেশগুলো সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তাতে একদিন ধনী দেশগুলোকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হবে।

ত্রুটি সংশোধন করা দরকার

(দর্পণের দায়বদ্ধতা)

দাম্প্রতিক অবিশের পর শিলা ধানার ৮নং অঞ্চলের বন্দিচক মৌজাকে সেচ এলাকা বলে গণ্য করা হয়েছে। অথচ গোটা ৮নং অঞ্চলটাই সেচ এলাকার বাইরে। কিন্তু এলাকাটি এখন সেচ এলাকা বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় খাজনা প্রভৃতি দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এলাকাটি বহুদিন যাবত জলে ডুবে থাকার পর এবারেই ধান পাওয়া গিয়েছে।

সরকারের রাজস্ব দপ্তর এই ত্রুটী সংশোধন করলে এলাকার গরীব অধিবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

পাইলট প্রজেক্ট ও কৃষি-শ্রমিকদের স্বার্থ

সাধন গুহ

প্রধান মন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি সংস্কারের প্রতিশ্রুতির অনিবিলম্ব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে যে "পাইলট প্রজেক্ট" পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন এবং ১৯৭৬ সালের ৩১শে যে তারিখের মধ্যে যা কার্যকর করার সরকারী নির্দেশও ইতিমধ্যে জারী হয়ে গেছে তার আন্তরিকতায় কোন উদ্দেশ্য আরোপ না করেও সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তিটি পরীক্ষা করা সঙ্গতই অন্যায় বলে বিবেচিত হবেনা।

পাইলট প্রজেক্ট কার্যকর করার জন্য সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছে যে, ১।৯।৭৬ তারিখ পর্যন্ত দাখিলিকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতেই বাম জারী বা খারিজ বা নাম পত্তনের মামলার বিচার শেষ করতে হবে। নির্দেশাবলীর এই প্রথম পরিচ্ছেদ বিষয়েই আলোচনা করা যাক। এবং এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই Planning Commission—Report of the Task Force on Agrarian Relation 1973 এর সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মন্তব্য থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করছি। এতে বলা হয়েছে,

"A programme aimed at the redistribution of income and wealth in the rural areas cannot succeed unless the beneficiaries can produce evidence of their right. No amount of legislation will help the tenants in the court unless he can produce his tenancy in the form of written documents.

মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জমির বেকর্ড তৈরীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, দুঃখের হলেও সত্যকথা, অদ্যাবধি তা কার্যকর হতে পারেনি। এর কারণ নিঃসন্দেহেই আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা কিন্তু তা বলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের দায়িত্ব লাঘব হয়না, কারণ ভূমিসংস্কারের প্রশ্নে চাষ্ট ফোর্স কমিটির মন্তব্যেই বলা হয়েছে,

"considering the character of the political power structure obtaining in the country it was only natural that the required political will was not forthcoming'

কিন্তু, যদি ধরে নিই যে, প্রধান মন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী ঘোষণার মধ্যে এই রাজনৈতিক সদিচ্ছা বর্তমান তবে তার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রেও বাস্তব পন্থার প্রয়োগই অবশ্য কাম্য। এতদর্থে নাম জারী, খারিজ অথবা নাম পত্তনের প্রশ্নের পাশাপাশি বিচার্য যে, বর্গাদারদের নাম তালিকাভুক্তিকরণের কোন বন্দোবস্ত হচ্ছে কি? এবং, যাতে গ্রাম-অফিসের মাধ্যমে গরীব কৃষক প্রকৃতপক্ষে জমি থেকে বঞ্চিত না হয় তা ভালভাবে তদন্ত করে mutation-এর কাজ করা হচ্ছে কিনা তা ভালভাবে বিচার করা দরকার। অন্যকাল কোন জমির বন্দবস্ত করা হয়না। এক্ষেত্রে সাফ কবলা বিক্রী লিখতে হয়। কিন্তু, ষ্ট্যাম্প কোর্ট কি দিয়ে একটা আনরেজিস্টার্ড ডিড হয় (যাকে বলা যায় মৌখিক শর্তের অনুরূপ) যাতে সময় সীমার মধ্যে গৃহীত ঋণ শোধ করলে জমি ফেরত দেবার কথা থাকে। পাইলট প্রজেক্টে মিউটেশনের জন্য নির্দ্ধারিত আছে ৪৪ দিন। এই বল্প সময়ের মধ্যে এসব জটিল এবং খুঁটিনাটি প্রশ্নের তদন্ত সম্ভব হবে এমন কথা কিন্তু হলফ করে বলা যাবেনা। আবার, এসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা না হলে জমিতে নামজারীর ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন জমিদার এবং জোতদারেরাই রক্ষা পাবে। এসব জমিদার জোতদারেরা আইনের ফাঁক দিয়েই কিন্তু সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। ১৯৭৫ সনের ২রা অক্টোবরের পর রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেন যে, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে আর কোন বাস্তুহীন পরিবার নেই। সরকার কি ভাবে প্রচারিত হয়েছেন তার অন্যথা নজিরের মাত্র ১টি উদ্ধৃত করছি। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার ঘিয়েদ যে মাত্রক একজন পরিচিত জোতদারের যে উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছিল সেখানে পাট্টা দিয়ে যে সব বাস্তুহীনকে বাস্তুভিটা বিলি করা হয়, জিতেনবাবু কোর্টের ইনজাংশন দিয়ে সেখানে বাধা দেন। ফলে, এখন সেই জমির পাট্টা ফেরত দিতে হচ্ছে, মিউটেশন অথবা নামজারীর ক্ষেত্রে তাই খুবই সতর্ক পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ জমির ক্ষেত্রেই বর্গাদারদের কোন লিখিত স্বত্ব নেই। এমন কি, যেসব বর্গাদার জমির ফসলের দেয় সেখানে বসিদ হয় জমির মালিকের নামে। অতএব, বর্গাদারদের জমিতে নামজারী অথবা নাম পত্তনের কোন অন্যায়ত সুযোগ দৃশ্যতঃ নেই। উপরন্তু পাইলট প্রজেক্ট চালু হবার পর সেটেলমেন্টের কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে। ফলে, জোতদার এবং জমির মহাজনরা তাদের তথাকথিত দলিল পেশ করে নামজারী করিয়ে নিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করবেন—এমন আশঙ্কা করাটা হয়তো অসঙ্গত হবে না।

Fourth Five Year Plan—'1969-74—A Draft Outline

নামক পুস্তকের ১৭৪ পৃষ্ঠায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে,

"one of tht important tasks of the Fourth Five Year Plan will be to try to ensure that land reform become a reality in the village and the field

কিন্তু, কার্যত কি সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছেন? সম্ভবত, না। ভূমি সংস্কারের নামে আইন তো এ পর্যন্ত কম হয়নি। এবং, সে সব আইনের ধারাগুলো যথাযথ প্রযুক্ত হলে ভূমি সংস্কারের একটা উজল দিগন্ত বিস্তৃত হতে পারতো না তা নয়। কিন্তু, এই না হওয়ার যে কোর্সকারণই দেখানো হোক না কেন সরকারী আমলাতন্ত্রের একাংশের দুর্নীতিপরায়ণতা এবং সেই সঙ্গে শাসক দলের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রশ্রয়পুষ্ট একশ্রেণীর জমির মালিকই যে আইনের যথাযথ প্রযুক্তির পথে নিয়মিত বাধা সৃষ্টি করে আসছে তা আজ আর লিখে প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। এটা আজ প্রমাণিত সত্য এবং দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

এতদ্‌সত্ত্বেও, পাইলট প্রজেক্ট পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে এ সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সতর্ক আছেন বলে ভাববার মত ভিত্তিভূমি খুঁজে পাচ্ছিনা। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, "বিগ ব্রাদার ডক্ট্রিন" নাম দিয়ে ৬৯-৭০ সালে তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙার নির্দিষ্ট জোতদার জমিদারের বিরুদ্ধে জমি কারফুসির যে অভিযান শুরু করেছিলেন এবং যার ফলে মাত্র এক বছরের মধ্যে তিন লক্ষ একরের মত জমি সরকারে ন্যস্ত হয়ে ছিল, বর্তমান সরকার সেটা বন্ধ করে দিলেন কেন? এবং, এসব জমিতে যেসব ভূমিহীন কৃষকের দখল কায়েম করা হয়েছিল তাদেরই বা উৎখাত করা হল কেন? ১৯৭২ সালের পর গঠিত ভূমি বণ্টন কমিটি তাহলে কৃষকের কল্যাণমূলক কোন কাজটি অদ্যাবধি করেছে? আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে চাষের জমির পরিমাণ হচ্ছে ৪০০ মিলিয়ন একর কিংবা ১২০ কোটি বিঘা। তার মধ্যে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ৬০ লক্ষ বিঘা অর্থাৎ ১ কোটি বিঘাও নয়। দেখা যাচ্ছে দেশের সমগ্র চাষযোগ্য জমির ১২০ ভাগের ১ ভাগও উদ্বৃত্ত জমি হিসেবে সরকারে ন্যস্ত হয়নি এই পরিসংখ্যান কোন বিরোধী বামপন্থী দলের নয়, সি. পি. আই (এম)-এর তো নয়ই। ১৯৭৪ সালের ২৩শে এপ্রিল লোকসভায় বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন যে, ৭৭ মিলিয়ন একর জমি আনুমানিক ভাবে উদ্বৃত্ত বলে ঘোষিত হতে পারে (4-7 million acres of land is estimated to be declared surplus)

এটা সমগ্র জমির মাত্র ১·১ শতাংশ এবং মহৎ হিসেবেই দেখা যায় যে, বাকী ৯৯ শতাংশ জমির সিংহভাগই থেকে যায় জমিদার জোতদারদের দখলে। গ্রামের শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবী মানুষের হাতে আছে সমগ্র জমির ৭ শতাংশ ভাগ এবং শতকরা ৪ জন উচ্চ বিত্তশ্রেণী মানুষের হাতে আছে সমগ্র জমির ৪২ শতাংশ। অতএব, প্রাথোন্নয়ন কিম্বা ভূমি সংস্কারের মূল কথাই হচ্ছে ভূমির যথাযথ বিন্যাস। রাজনীতিগত ভাবে এই রাজ্যের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস দল অথবা কংগ্রেস সরকারের যে মতপার্থক্যই থাক না কেন, প্রয়াত কোঙারের ভূমি সংস্কার পরিকল্পনার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচীর মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তবে, ১৯৫৩ সালের ৭ই মে'র বদলে ভূমি হস্তান্তরের তারিখ ১৯৬৯ সালের ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলো কেন? এক্টেট এক্যুইজিশন এ্যাক্ট অব ১৯৫৩ এর ১৮ (১) ধারায় কে. এল. আর. ওকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল উদ্বৃত্ত জমি দখলের এবং ১৮ (২) ধারার ক্ষেত্রে বিশেষ ৬০ দিনের নোটিশ জারীর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। একথা সবাই জানে যে, ১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারেরা বিভিন্ন কল্পিত নামে এমন কি হাতী ঘোড়া গরুর নামে পর্যন্ত জমির হস্তান্তর ঘটিয়ে সরকারকে প্রতারিত করেছে। হরেকৃষ্ণবাবু নতুন করে ভূমি সংস্কার আইনের যে খসড়া রচনা করেছিলেন তা যথাযথ আইনে পরিণত হয়ে প্রযুক্ত হলে নিশ্চয়ই এই বেআইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করা যেত, কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার ১৯৬৯ সালের ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত জমি হস্তান্তরকে আইন সিদ্ধ বলে ঘোষণা করে রাতারাতি পাইলট প্রজেক্টের নামে ভূমি সংস্কার কাজে অগ্রসর হলেন তখন দেটা কি জমিদার জোতদারদেরই বার্থরক্ষার স্মারক বলে বিবেচিত হবে না? গ্রামে বর্গাদারী প্রথানতঃ মৌখিক শর্তেই চলে আসছে। সেখানে ভূমিতে বর্গাদারের কার্যতঃ এবং আইনতঃ কোন অধিকারই থাকে না। আইনের নামেই জমিদার জোতদারদের এই বেআইনী কার্যকলাপ এ পর্যন্ত চলে আসছে। অগ্রসর দেশে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ভারতে ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উনক (লেদ্‌জিন্স্কী এক আন্তর্গার বলেছেন,

'Perhaps as many tenants havt lost their tenancies as have been made secure on the land through deliberate rather than accidentally faulty legislation'—. (Report of the Conference on Productivity and Innovation in Agriculture in the under-developed countries —Centre for International studies. Massachusetts Institute of Technology—page 85-86—Ed. David Hapgood).

তবু তা-ই নয়, আইনকে পদদলিত করেই যে একদল রাঘব বোয়াল জমির মালিক জমি থেকে ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করছে প্রানিং কমিশনের টাস্ক ফোর্স কমিটি রিপোর্টের ২৫ পৃষ্ঠাতেও তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

"It has been found that very often the land owners short circuit the provisions of the tenancy law affording protection to share croppers by having recourse to preventive sections of the code of criminal procedure or to litigation in civil courts."

এ সব মন্তব্যাবলী বিশ্লেষণ কোন বিরোধী দলের নয় যে রাজনৈতিক মতান্ধতার অজুহাতে তাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়)

প্রায় দুই দশকের ঐতিহ্য নিয়ে 'দর্পণ'-এর জয়যাত্রা আজও অব্যাহত।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক বাইশ টাকা
ষাণ্মাসিক এগারো টাকা
ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
৬১নং মুর লেন
কলিকাতা-৬০০২৯

সাফল্যের একটি দশক

কৃষি

এই দশকে উদ্ভাবিত কৃষি-নীতি হরিৎ বিপ্লব এনেছে ✦ ✦
বড় বড় সেচ-পরিকল্পের অধীনে আরও জমি
অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছে

শিল্প

লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি উদার ও সরল হয়েছে
বহু ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা গিয়েছে

কাঁচা মাল আরও সহজে পাওয়া যাচ্ছে
ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আরও উৎসাহিত করা হয়েছে

পরিবহন ও যোগাযোগ

রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
আগের তুলনায় আরও অনেক ও ভালো সড়ক হয়েছে
ডাক ও তার বিভাগের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে
টেলিফোনের সংখ্যা বেড়েছে

সমাজ কল্যাণ

গ্রামের স্বাস্থ্যের ওপর লক্ষ্য রেখে একই সঙ্গে চিকিৎসা ও
স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে ✦ ✦
ডাক্তার, নার্স এবং হাসপাতালে শয্যার
সংখ্যা বেড়েছে ✦ ✦
বহু রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা
অবৈতনিক করা হয়েছে

মহিলা ও যুবকল্যাণে
উন্নয়ন-মূলক কার্যসূচীর
সূত্রপাত করা হয়েছে

উন্নয়নের বুনিয়াদ
হয়েছে পাকা
আর অর্থনীতি হয়েছে
স্থিতিশীল

✦

একটি দশক
অতিক্রান্ত
বহুমুখী কর্মব্যস্ততায়

বামপন্থী লেখক

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে বামপন্থী ছোট গল্পের লেখকদের পরিচয় সম্বলিত প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধের শুরুতে বিশেষের নাম করা লেখকদের উল্লেখ করে তুলনামূলকভাবে বাংলা ছোট গল্প যে তাদের স্তরে পৌঁছয়নি সে সম্বন্ধে আক্ষেপ করেছেন লেখক। বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ইত্যাদি শব্দগুলি দেশের বিশেষ বিশেষ সময়ে লেখকের অবস্থান এসট্যাবলিশমেন্টের বিপক্ষে, পক্ষে বা

প্রকাশক চাই

আমি কিছু বই প্রকাশ করতে চাই। আর্থিক অভাব এবং অন্যান্য কারণের জন্য প্রকাশ করতে সমর্থ হইনি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পত্রিকায় লিখেছি। ছাপাও হয়েছে। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত আমার কিছু কবিতা এবং গল্প প্রকাশ করতে চাই। প্রকাশকের সন্ধানে আছি। তবে নিজের সেবার মত টাকা খুব কম। যদি কোনও সজ্জন প্রকাশক যোগাযোগ করেন খুশি হবো। এই সংগে গ্রামের অতীত এক অবহেলিত লেখক যার পাণ্ডুলিপি চুরি করে প্রকাশক নিজেই যত্রা মনস্থ করছেন বেনামীতে তিনিও বই প্রকাশে উৎসাহী।

জানিনা ব্যাঙ্ক বই প্রকাশে কোনও ঋণের ব্যবস্থা আছে কিনা। গ্রামের লেখক এবং অবহেলিত কবি ও শিল্পীদের কিছু বই প্রকাশ করার জন্য আমরা চেষ্টা চলাবো। এ ব্যাপারে মতামত জানালে খুশি হবো।

সাজেদুল হক চৌধুরী
সভাপতি, হুগলী বিজ্ঞান ক্লাব

কলের পটভূমিকায় লেখককে বিচার করে বিস্তৃত আলোচনা করলে আমরা যারা ওপপনার, পাঠকার পাঠক উপকৃত হতাম। তিনি শরৎচন্দ্র থেকে যাটের দশকের বামপন্থী লেখকদের একটা পরিচয় দিয়েছেন। এ পরিচয় যেমন অসম্পূর্ণে তেমনি পক্ষপাতদুষ্টে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে নিন্দুর শরৎচন্দ্র বামপন্থী। তখন সাম্রাজ্যবাদই প্রধান শত্রু, দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাহিত্য হিসাবেই পথের দাবীর মূল্য। নইলে বিনীত ভাবে বলতে চাই ওই পথের দাবীর বিশ্লেষের পথ মার্কসবাদ বিরোধী। পথের দাবী থেকেই অনেক উক্তি তুলে দেওয়া যায় যা বামপন্থী চিন্তা-

মতামত

ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে না। অবশ্যই তার সুস্থ নজীরও বিদ্যোহিনী (পথের দাবী বাদে)।

আমি বলতে চাই যে পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র বামপন্থী সেই যুগের বিচারে তারাশংকর (প্রাক স্বাধীনতা কালের) বামপন্থী হবেন না কেন? বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ইত্যাদির নামোল্লেখ করেছেন দেখি। তাঁরা বামপন্থী কি দক্ষিণপন্থী?

সাধনবাবু বামপন্থী গল্প লেখকদের পরিচয় দিতে এক নাগাড়ে অনেকগুলি নামের উল্লেখ করেছেন যাঁদের অনেকেই হয়ত সুদূরে অতীতে বামপন্থী ভাবনার শরিক ছিলেন, কিম্বা যারা মোটেই কোনো রাজনৈতিক পক্ষে কিছুটা পক্ষে তাই সূচিত করে। তাই যদি হয় তবলে নাঁচক করতেন না। তিনি উল্লেখ করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম। ফসিলের লেখক সুবোধ ঘোষ বাদ গেলেন কেন? সমরেশ "কিমিলিস"-এর জন্য বামপন্থী, "বিবর" "প্রজাপতি"র লেখককে কি বলবো? অবাক আধুনিককালের এমন অনেক লেখকের পরিচয় দিয়েছেন, দুঃখের বিষয় যাঁদের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই (যেমন চিত্ত ঘোষাল)। সময়েসময়ে যদি বামপন্থী বলে চিহ্নিত করতে সাধনবাবুর রুচিতে বাধেনা তবে এক সময়ে "তুতুকোম" কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত সৌরী ঘটক কি অপরাধ করলেন, তিনি ত এখনো বামপন্থী শিবিরেই অবস্থান করছেন। যদি সাধনবাবু সি পি আইকে বামপন্থী বলেন। আবার যাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে থেকেই বামপন্থী অভিমুখকে অবলম্বন করে গল্প লিখে চলেছেন, যথা কৃষ্ণ চক্রবর্তী রামকুমার চৌধুরী, বিষ্ণু চক্রবর্তী, ছবি বসু এঁরা কি ইচ্ছা করেই অনুল্লেখিত থেকে গেছেন?

যাই হোক, আমার বক্তব্য এই ধরনের আলোচনা পূর্ণাঙ্গতা হওয়া বিধেয়। তা না হলে পাঠককে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

রতি গুপ্ত
বর্ধমান

ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক মারা গেলেন—ইদানীংকার শুভানামা চলচ্চিত্র পরিচালকের ঋত্বিক ঘটক, অতীতের গগনাটে শিল্পী, গগনটের নাট্যকার ঋত্বিক ঘটক। এবং দুঃখের যোগফল প্রণত ঋত্বিক ঘটক।

ঋত্বিক ঘটকের একতন বন্ধুজন তাঁর উপর অসন্তুষ্ট, নিজেকে তিনি ধ্বংস করেছেন বলে, সপে সপো তারা শোকার্ত এত বড় একটা প্রতিভা অকালে শেষ হোল বলে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনমুতে কবি নজরুল, এঁদের সারিতে কৃতুর্জন ঋত্বিক। কোথায় যেন একটা মিল আছে-এঁদের মধ্যে। মিলটা খুঁজতে যাওয়ার কথনো আছে। কিন্তু ভাবতে কেমন ভাল লাগে।

কোমল গান্ধারের ঋত্বিক সুবর্ণরেখর জীবনধর্মী পরিচালক, জীবনের বস্তুর রূপায়ণের চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গিয়ে সফলের যে চাবিকাঠিটি হস্তগত করলেন যে চাবিকাঠিটির নাম অভিজ্ঞতা নয়, নিশ্চয় নয়, সে চাবিকাঠির নাম হৃদয়মনভূতি। অভিজ্ঞতা ঋত্বিকের সমসাময়িকদের অনেকেরই ছিল, শিল্প দৃষ্টিভঙ্গিরও অভাব ছিলনা তাদের, কিন্তু অনুভূতির জগতে তারা পিছিয়ে পড়া মানুষ।

ঋত্বিক ঘটক জীবনের এক অনুভূতি—যে অনুভব চলচ্চিত্রের পর্দায় রূপায়িত। সে অনুভূতির অমৃতে তাঁর চেতনা জারিত। সেই অমৃতের কুণ্ডে ক্লান্তি জীবনে হলাহলের সাধন, এটা কি প্রক্সিমিক, বিচ্ছিন্ন, পরপর বিপরীত ঘটনা? ঋত্বিক ঘটক তাই এক জিজ্ঞাসা, অনুলুপ্ত জিজ্ঞাসা, ঋত্বিক ঘটক তাই অনুল্লেখ্য, অনুচ্চারিত।

ব্রহ্ম চক্রবর্তী

পাইলট প্রজেক্ট

(এর পৃষ্ঠার পর)

আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চাষযোগ্য জমির অধিকার থাকার বিরুদ্ধে সতর্ক করে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সভাপতিও বলতে বাধ্য হয়েছেন.

Despite the political and administrative difficulties involved governments should pursue land policies which help disperse the benefits of agricultural progress widely gather than fillowing them to go to only a segment of the population' — (Indian Express—New Delhi 8. 9. 72).

লক্ষণীয় যে, ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের আদমসুমারীর কৃষি শ্রমিক সংক্রান্ত সংখ্যার পার্থক্য সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে কৃষকের সংখ্যা কমে গিয়ে সারাদেশে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৩২ থেকে ৪৮ মিলিয়ন যেড়ে গেছে এবং বেকার কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাতো বাড়ছেই। বেসরকারী হিসেব এখানে আরো উচ্চতর কতছি না।

এমতাবস্থায়, হঠাৎ সেটেলমেন্টের কাজ কার্যত: ১ বছরের জন্য বন্ধ রেখে পাঁচ বছর সরকার পাইলট প্রজেক্ট চালু করে তবে কার উদ্দেশ্যে করছেন তার জবাব কিন্তু রহস্যাবৃতই থেকে যাচ্ছে। আগেই বলেছি যে, বিগ রায়ত কেস (BigRyat Case) তদন্ত সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। উপরন্তু ৭১ সালে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে সিলিং আইন সংশোধন করে মাথা পিছু ৭৫ বিঘার পরিবর্তে পাঁচ সর্বাধিক অনেচ ১৭৫০ একর এবং মেচ ১২'৫০ একর করা হয়েছে। এত জমিতেও কিন্তু সরকারী হিসাব মত অতিরিক্ত ২ লক্ষ একর জমি ন আরে বর্তমানের তথা বলতে বন্ধুর আইনের প্রয়োগে ১৯৭৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সরকার চলচ্চিত্রায়ণ জমি দখল নিয়ে বন্টন করেছেন মাত্র ১১ হাজার একর। পাইলট প্রজেক্টে উদ্বৃত্ত বেনামী জমিতে ভাগচাষী ও দখলকারী প্রকৃত কৃষকের অধিকার কায়েমের কোন সুযোগই থাকবে না এবং কৃষকের দখল ও ভাগচাষীর নথি রেকর্ড করারও কোন সুযোগই থাকবে না। কারণ, সেটেলমেন্টের কাজ ১ বছর বন্ধ থাকবে।

পাইলট প্রজেক্ট চালু করার জন্য সরকারী নির্দেশের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে ৭(ক) বিধির মর্মের বিধান শিথিলের শেষ করতে হবে এবং যেতেতু এই বিধির ফর্ম সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত হবে সেইহেতু এই বিধির দাখিলের শেষ তারিখও বর্দ্ধিত হতে হবে। প্রথম সিলিং আইন পাশ হবার পর বছর নয় পেরিয়ে জমি হস্তান্তরের। এটাতো প্রায় প্রকাশ্য সত্য যে, জমিদাররা বেনামে জমিও সরকারে ন্যস্ত করতে চেয়েছে তা-ও গোপন রেখে সাধারণ কৃষকের কাছে বিক্রী করে একদিকে বেআইনী ভাবে সরকার ও কৃষক উভয়কে প্রতারণা করেছে এবং এখনই সময়ে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে আবার অন্যদিকে তাদেরে নানা কৃষকের জটিলতা সৃষ্টি করেছে। টাস্ক ফোর্স কমিটি রিপোর্টের ৫৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

"As a result of the high level of ceiling, large number of exemptions from the law, malafide transfers and partitions and poor implementation the result achieved has been meagre."

এর পরও বিটর্ন ধারাদের নতুন পরিচয়ে দেয়া সম্ভবত জমিদার জোতদারদেরই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হতে পারে। প্রা. নিং জমিদার রিপোর্টেই দেখা যাবে, "Exemptions were available for plantations, sugar cane farms, cattle breeding farms, orchards and grores, iraing lands, efficient farms, mechanised farms, religious and charitable institutions and trusts and co-operative farms etc".

যদিই বাহুল্য বে, এইসব সিলিং সম্পত্তি অব্যাহতির সুযোগ নিয়ে বৃহত্ত জমিদার দল বানামেতে সিলিং আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে। এই দেশের বৃহৎ পুঁজির বিশ্বস্ত মুখপত্র "স্টেটসম্যান" কাগজের নয়া দিল্লী সংস্করণের ২৩শে আগষ্ট ১৯৭৪ সংখ্যাতেও বলা হয়েছে ...

'...inevitably because the ruling class were economically and substantially related to land and could not therefore be expected to commit class suicide.. The legislative gaps that existed were wide enough to allow the ex-feudatories to "salvage" massive chunks of their estates and ensure their economic preservation, perfectly legally, by distributing them among the individual members (including the minors) of the family'।

এই সব প্রেক্ষিত বিচারের পর মনে হতে বাধ্য যে, পাইলট প্রজেক্ট কার্যতঃ কৃষক, ভাগচাষী কিম্বা কৃষি প্রমিকদের মানুষের সামনে কোন আশার কিরণ তো তুলে দেবেই না, বরং, জোতদার দলিল ধারীদের সুযোগ নিয়ে তারাই জমিতে দখল কায়েম করবে জমিতে যারা শ্রম নিয়োগ করে না। এই আশঙ্কা আরও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠেছে যে, পাইলট প্রজেক্টের সরকারী শিবির জমি জমিপের জন্য যা ঠ না গিয়ে অফল পক্ষপাতের অফিসে বসেই কাজ করবে এবং সন্দেহ থাকতে পারে যে, সেখের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ঠিক মত খবর নাও পেতে পারে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE : 40 PAISE

'সম্রাট' ঃ সমকালীন জীবনের বাস্তব চিত্র

(দর্পণের সমালোচক)

গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত "সম্রাট" ছবিতে (চিত্রনাট্য ঃ মৃণাল্কণেখর রায়) সমকালীন জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক জীজত লাহিড়ী এবং কতকাংশে তিনি সফলও হয়েছেন। ছবির মূল উপজীব্য রাজনৈতিক আদর্শের টানা-পোড়েন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পস্থ জীবনের অভিঘাত যার ফলশ্রুতি স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ। নিঃসন্দেহে এই বিষয়বস্তু আমাদের পক্ষে মেটামুটি পরিচিত এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে লেভেলাঁর। "সম্রাট" ছবিতে অমর নামীয় যুবক (অনিল চট্টোপাধ্যায়) একদা ছাত্রজীবনে বামপন্থী আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ উদীয়মান নেতা ছিল এবং সেই সময় একই মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ সহপাঠিনী মীরা (সুপ্রিয়া দেবী) তার প্রতি অনুরক্ত হয়। তারপর কুড়ির বিবাহ। কিন্তু দুজনে একই ছাদের তলায় জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তাদের পথ আলাদা হয়ে যায়। কারণ অমরের চোখে

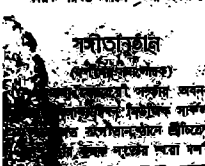

সম্রাট অনুসন্ধান

[illegible] শ্রেণীসংগ্রাম [illegible] শ্রেণীবিলোপের [illegible] সর্বহারা [illegible] শ্রেণীচেতনা [illegible] সংগ্রামে [illegible] পরিচয়, হেন [illegible] চৌরুরী। তুলনায় [illegible] আদর্শে [illegible] লেভেলবদল [illegible] উপলব্ধির [illegible] শেখর বিবর।

কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বধর্মচ্যুত আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন ধারণ পদ্ধতিও পরিবর্তিত। অথচ অধ্যাপিকা মীরা সেই পুরনো আদর্শই আঁকড়ে ধরে অজস্র গণ-আন্দোলন সামিল এবং এই কারণে অমরের তীব্র বাঙ্গের শিকার। শ্রীলাহিড়ী টুকরো টুকরো ঘটনা ও তীক্ষ্ণ সংলাপের মধ্যে দিয়ে এই দ্বৈত জীবনের অনুরাগ ও সংঘাত বেশ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন, বিশেষ করে অমর যেখানে প্রাক্তন সখী জীবনে ফিরে যাওয়ার তীব্র বাসনা প্রকাশ করছে। অনিল ও সুপ্রিয়া দেবী বহু পরীক্ষিত শিল্পী। অতএব এই দুই চরিত্রে তাদের সাফল্য স্বতঃস্ফূর্ত।

এর পাশাপাশি তিনটি বিপথগামী কিশোরের কাহিনী উপস্থাপিত। বস্ত্র মধ্যে প্রধান চরিত্রটি অমরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তার নামেই ছবির নামকরণ। এই অংশের বিন্যাস দুর্বল এবং খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ কিশোর শিল্পীদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। চেহারা ও আচার আচরণ কোন দিক দিয়েই তারা জমে যায় কাটেনি।

কালীপদ সেনের আবহ সংগীত সন্তোষজনক।

ভ্রমসংশোধন

গত সংখ্যার দর্পণে যাত্রা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের বদ্ধ অন্তর পৃষ্ঠায় নায়কদের ছবির তৃতীয় সারির দ্বিতীয়টি ছবি তপনকুমারের, প্রমক্রমে ছাপা হয়েছে স্বপনকুমার।

আগুন জ্বালাবার পর

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

মানুষখানে আমি একদিকে ফুল অন্যদিকে বেশ্যা
এ দুটিকে সঙ্গী কোরে, যুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব
জানেনই, শুদ্ধ ও তাজা রক্তঝরা বেশী ভক্তি এখন,
আচ্ছা লক্ষ্য করেছেন কি, ফুলে আর সে গন্ধ নেই,
থাকে না।।

আমার মনে হয়ঃ ফুল আর বেশ্যা দুটোই নিরক্ত শরীর।
আলবৎ বদ্ জন্তু প্রস্তুত

বিশ্বাস রাখুন
আমার প্রয়োজন কিছু বারুদ, কিছু আগুন।
হ্যাঁ, প্রদীপের মতো দুটি হাত জোড় করুন, নম্রতায়
আমি সেই আগুনের উদ্বোধন করবো।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-পরবর্তী স্বতন্ত্র যে সাহিত্যগোষ্ঠী বাঙলা সাহিত্যে পুষ্পপত্র করেছিলেন, জন-প্রিয় ভাষার বন্ধের কল্লোল গোষ্ঠী বলা হয়, তার অন্যতম প্রধানরূপে অচিন্ত্যকুমার নিঃসন্দেহে বিরাজ নিলেন। নৈলজানন্দের বিয়োগব্যথা জন্মেছেতে না জড়োতেই অচিন্ত্য-কুমারকে এত দ্রুত হারাতে হবে কে ভেবেছিল।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন বহুমুখী প্রতিভা আর কারুর ছিল না। অচিন্ত্যকুমারের লেখনী শেষ দিন পর্যন্ত নবনব সৃষ্টিতে অক্লান্ত ছিল। তার আশ্চর্য শব্দনির্মাণ ও ভাষার দক্ষ, পরিমিতিবোধ দীর্ঘকাল আমাদের বিস্মিত করবে। অনায়াসে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-জীবনী উনাস। রম্যরচনা— কোথায় না তার প্রতিভা স্পর্শ করেছে!

প্রবীণ বয়সে তাঁর "ভস্মছাড়া" কবিতা রচিত হয়ে আজ তরুণদের মুখে মুখে। কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তির রেকর্ড কবিতাটিকে অমর করে রাখবে বলে বিশ্বাস করি। ক্রিকেটের উপর তাঁর গল্প বা রম্য-রচনাগুলি ক্রীড়ারসিকদের প্রভূত আনন্দ দেবে।

অপূর্ব রচনার গুণে তাঁর "কল্লোল যুগ" যেমন জনপ্রিয় তেমনি গোষ্ঠীগীতির নিদর্শন।

জীবনী-উপন্যাসে অচিন্ত্য-কুমার একক। "পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" তো বটেই, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, নজরুল, যীশু-কেন্দ্রিক তাঁর জীবনী উপন্যাসগুলি অতঃপর জনপ্রিয়।

এই বহুমুখী ক্ষমতা তাঁকে সাহিত্যের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখায় নিয়ন্ত্রে না রাখলেও উপন্যাসে এবং বিশেষত ছোট গল্পে তাঁর অবদান কম নয়।

মন্বন্তর দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক তাঁর "অতর্নাবধি" "বাঁধবাজি" শীর্ষক গল্পগুলি সমাজসচেতন আগামী গল্পলেখকদের প্রেরণা হতে পারে।

যাকে শিল্পীর নিজস্ব জীবন-দর্শন বলা যায় বহুমুখী সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণেই তা অচিন্ত্য-কুমারের রচনায় পাওয়া যায় না। না-পাওয়া গেলেও শিল্পীর অক্ষু-মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যে তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বসী ছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি তথাকথিত রাশ্ট্রীয় মর্যাদা পাননি। সাহিত্যিক বা দক্ষ রাজনীতির দলদলির মধ্যে তিনি নিজেকে জড়াননি। আজকের দিনে শিল্পীর এই আত্মমর্যাদাবোধ নানাবিধ কারণে যখন ধর্ষিত তখন তাঁর এই কঠিন চরিত্রবল এন্ট রিল-মেণ্ট-বিরোধী লেখকসত্তার আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাই।

লেখকসত্তার সঙ্গে আরেকটি সত্তাও তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল। তা হল প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক-সুলভ ভাষায় বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা।

যুব কংগ্রেস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিল্লী থেকে ফিরেই বারিদবরণ প্রদেশ কমিটির সভা ডাকেন। সভায় সভ্য ছাড়া বাকি চোদ্দ জন সদস্য বারিদবাবুর জেলা পুনর্গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। বীরেন মজুমদার, সৌম্যেন্দ্র রায় সহ সাতজন সদস্য কেবল তাদের বিরোধিতা লিপিবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। বীরেনবাবুরা বলেছেন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ হবে। ওরা বারিদবাবুকে সব ব্যাপারে সাহায্য করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বাকী সাতটি জেলার আহ্বায়ক মনোনয়ন নিয়ে এখনও ঐকমত হতে পারেনি। এক একটা জেলা থেকে দুটো তিনটে করে নাম আসছে। প্রত্যেকের পেছনেই উপ-দলীয় নেতৃত্বের সমর্থন রয়েছে। ফলে কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা হবে এই হল সমস্যা। এ ব্যাপারে বারিদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান খুব তাড়াতাড়ি বাকী সাতটি জেলার আহ্বায়কদের নাম ঘোষণা করা হবে।

কবরস্থান দখলের চেষ্টা

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার মশাট গ্রামের কাছেই মুচিয়া গ্রামে মাটির লাইট রেলওয়ের পাশে পীর তলা নামক আউলা ও কবরস্থান জোরপূর্বক দখল করার জন্য একদল কংগ্রেসী উঠে পড়ে লেগেছেন। কংগ্রেসী বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্থানীয় এম, এল, এ মহম্মদ সফিউল্লাহ সাহেবের কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন করেছেন বলে মুচিয়া কালচারাল সোসাইটির কার্যিক হোসেন দর্পণকে জানিয়ে-ছেন। অঞ্চল খুব সংবেদনশীল হওয়ায় মহম্মদ ঘোষ একদল সমাজবিরোধীকে দিয়ে জোর করে কবর স্থানে মন্দির তৈরি করার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মশাট শিয়ালা এবং আঁইরা অঞ্চলে পঞ্চত জমি আছে। দখল নিয়ে বেশ কিছু সমাজবিরোধী কাজ করেছে। ভাগ্যক্রমে কবর স্থান সমস্ত তারা গ্রাস করতে চায় জরুরী অবস্থার ভয় দেখিয়ে।

ANIL Plugs the foreign drain through import substitution of made to order Hardened and tempered Steel Strips for every industrial use.

Various end-uses of ANIL's Hardened and Tempered High Carbon and Alloy Steel Strips: Automobile Clutch Plate Cushions, Industrial Knives, Typewriter Parts, Clocks, Toys and other Industrial Springs, Drop Wires, Saws Feeler Gauges, Measuring Tapes, Roller Bearings, Piston Rings, Springs for Rolling Shutters, Gramophones, Teleprinters, Flapper Valves, Plates for Compressor and Shock absorbers, Liners for Grinding Wheels and Refractory Moulds — to name only a few.

In technical collaboration with Messrs. HOESCH WERKE HOHENLIMBURG-SCHWERTE A.G. OF WEST GERMANY and with a most modern plant in Jaipur, ANIL — has been producing Hardened and Tempered Steel Stripes to the best international Standards.

ANIL STEEL & INDUSTRIES LTD.

Head Office : 27A, Camac Street, Calcutta-700016.
Regd. Office & Works : P. O. Meenawala, Kanakpura, Jaipur.

BRANCHES :

36/37, Mittal Chambers, Nariman Point, Bombay-400 02 .
909, Ansal Bhavan, 6, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001..
N. L. Trust Building, Opp. Krishna Cinema, Relief Road, Ahmedabad-380 001.
Hindusthan Chamber of Commerce Building, 8, Kondi Chetty Street, Madras-600 001.

দর্পণ-সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৭৬ ॥ দাম ৪০ পঃ

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসে ঠাণ্ডা লড়াই

যুব কংগ্রেসের উচ্চ গোষ্ঠীর মধ্যে এখন রীতিমত ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। তবে যুব কংগ্রেসের অন্তত উপরেতলা লড়াই বহু কুটনানি হলে যথা কলকাতা যুব কংগ্রেসীদের সমাবেশে বিস্ফোরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীযুত যুব কংগ্রেসীদের ঐ সভায় বলেছেন, যুব কংগ্রেসের "পরিত্রাতা" নেতারা অত্যন্ত "প্রশংসনীয় ভাবে" তাঁদের সর্বতাকারীর যুব-নেতার বিরুদ্ধে "ষড়যন্ত্র" রচিয়ে বেড়াচ্ছেন এ জিনিস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধ না হলে জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে তিনি হুমকী দেন।

অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতৃত্ব বর্তমান নেতৃত্বের কার্যকলাপে বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ। প্রথম থেকেই তারা এই দিল্লী থেকে চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারেন নি।

প্রথমে যখন রাজ্য যুব কংগ্রেসের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় তখন মোটামুটি কয়েকজনকে বাদ দিলে বাকী সবাই যদিও সংযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছিলেন কিন্তু জেলা কমিটি পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করেই মনোমালিন্য আবার মাথা চাড়া দেয়। যুব কংগ্রেসের অন্তত উপরেতলা সুব্রত মুখার্জী জেলা কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে একমত হন নি। আর সেই থেকে যুব কংগ্রেসের সমস্ত ব্যাপারেই তিনি নিষ্ক্রিয়।

সম্প্রতি গান্ধীর কলকাতা সফরের কার্যসূচী ব্যাপারে সুব্রতবাবু বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। দমদম বিমান বন্দর থেকে কংগ্রেস অফিস পর্যন্ত যাত্রাপথে রুদ্রবাবুর পাশে সুব্রত-বাবুর থাকার কথা থাকলেও সুব্রত-বাবুকে দেখা যায় নি। মাদ্রাসের সমাবেশে সুব্রতবাবু তার নির্দিষ্ট সময়ের ভাষণ শেষ করেই এক পরিত্যাগ করেছেন। যদিও প্রিয় বুলীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুব্রতবাবু প্রকাশ্যে যুব কংগ্রেসের বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে মামলে নি, তবু বর্তমান যুব কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে নিজেকে তিনি অনেকখানি সরিয়ে নিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, জরুরী অবস্থার অবসানে বিভিন্ন কর্মসূচীর অবতারণার মুলকে শ্রীমতী গান্ধীর যুব নেতা রূপে আবির্ভাব অত্যন্ত দ্রুত। কিছুদিন আগেও তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুতী ইন্দিরা গান্ধীর কমিষ্ঠ পুত্র রূপে পরিচিত এবং এরকম বিদেশে ফেরত ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে ছোট মোটর গাড়ির প্রকল্প হাতে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর তিনি ভারতের রাজনৈতিক গগনে উদয় হলেন আর প্রায় রাতা-রাতি সর্বতাকারীর যুব নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তাঁর এবং তাঁর মাতা ও ইন্দিরাপার্থ মুখার্জী বঙ্গীসালের বিরুদ্ধে "ষড়যন্ত্র" গেয়ে-ছিলেন বিরোধী নেতারা। সজ্ঞ নিজ ক্ষমতা বলে তাকে অভিজ্ঞক করে সর্বতাকারীর বেতার পদে অভিষিক্ত। অনেকটা যুবরাজদের অভিষেকের মত।

সর্বত্র তাঁর সম্বর্ধনা অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় এবং পূর্বতন সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। পাটনা ও কলকাতায় তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীরা বিমান বন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বিশেষ বিমানে ভ্রমণ করে-ছেন। তাঁর জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না। কলকাতায় তাঁর সম্বর্ধনার জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করা হয়েছে। এবং সম্বর্ধনার আয়োজনে শিল্পপতিরা অকুণ্ঠ সহ-যোগিতা করেছেন।

ডেভিড ও চৈলিভিনের সঙ্গেও সরকারী পদাধিকারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রচারিত সংবাদের অনেকাংশেই তাঁর অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। টে লি ভি শ নে বিভিন্ন সময়ের পরে দীর্ঘস্থায়ী সজ্ঞের সফরের বিবরণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী প্রচার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার সত্ত্বেও বাটা শ্রমিকদের মনোবল অক্ষুণ্ণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মূল বেতন কিংবা মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি অথবা কোন নতুন দাবীতে নয়, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এ পর্যন্ত বাটার শ্রমিকরা যে বোনাস পেয়ে আসছিলেন বোনাস অডিন্যান্সের অজুহাত দেখিয়ে বাটা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেই চুক্তিগুলির প্রতিবাদে এবং প্রাপ্ত অধিকার রক্ষার দাবীতেই বাটার শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। অধিকার রক্ষায় বাটা শ্রমিক বদ্ধপরিকর। এই ধর্মঘট আন্তর্জাতিক বাটা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

বাটা মজদুর ইউনিয়নের ডাকে গত বিশে ফেব্রুয়ারী বিকেলে বাটা-নগর ইউনিয়ন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে উপরোক্ত ঘোষণা করেন বাটা মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিন্‌হা (সি, পি, আই, এম)। শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের তৃতীয় দিবসে অনুষ্ঠিত এই সভাটি ছিল কোলোসিত জনসমুদ্র।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন সভাপতি শৈলেন পাল (ফরওয়ার্ড ব্লক)। ধর্মঘটের পরিস্থিতি ও কর্তৃপক্ষের অনমনীয়তা বিশ্লেষণ করে সাধারণ সম্পাদক রবীন সিনহা বলেন যে, বাটার শ্রমিকরা এ পর্যন্ত যে বিশ পারসেন্ট বোনাস পেয়ে আসছেন তা কোন-দিনই উদ্বৃত্ত ভিত্তিক ছিলোনা, সেটা দেওয়া হতো উৎপাদন এবং উৎপাদন মূলক কাজের ভিত্তিতে। সিন্‌হা বলেন যে, ১৯৭২ সালে বাটা শ্রমিকের বোনাস মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টেও এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, চুক্তিতে সালের ব্যালান্স সীটে বাজেয়াপ্ত লক্ষ টাকা লোকসান দেখানো সত্ত্বেও বিশ পারসেন্ট বোনাস দিয়ে কোম্পানীই প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাটা শ্রমিকের বোনাস উদ্বৃত্ত ভিত্তিক নয়, অতএব বোনাস অডিন্যান্সের অজুহাত দেখিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল করা যাবেনা।

সহ সভাপতি পরিমল চৌধুরী (আর-এস-পি) ধর্মঘটের যথার্থতা বিশ্লেষণ করে বলেন যে, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে শ্রমিক নিজ অধিকার রক্ষা করবেই।

ওয়ার্কস সেক্রেটারী মনোজ চ্যাটার্জী (সি পি আই) বলেন, এই ধর্মঘট সরকার কিংবা জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে নয় বাটা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার রক্ষার দাবীতেই এই ধর্মঘট।

কার্যকরী সমিতির সদস্য নীলরতন কাঞ্জিলাল (কংগ্রেস) বলেন যে সমস্ত ঘড়যন্ত্র তুচ্ছ করে বাটা শ্রমিকের জয় অনিবার্য।

সভাপতি শৈলেন পাল বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইউনিয়নকে লেখা কোম্পানীর চিঠির উল্লেখ করে বলেন যে এটা কোম্পানীর সময় ক্ষেপনের ভাঁওতা মাত্র। তিনি শেষেমেষ অব ওয়েজ এ্যাক্টের ৩৩ (১) এবং বোনাস অডিন্যান্স ৩১ (ক) ধারার বিরোধ করে বলেন যে, বাটা শ্রমিক আইনের মুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করেই তাঁদের দাবী উত্থা-পিত করেছেন বলেই কোন রূপ চালুরী দিয়ে এই একাবদ্ধ সংগ্রামে ভঙ্গ করা যাবেনা।

বাটা জুতা কারখানার ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থী ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাটানগরের (পাটনা-দিঘা) ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ঐ কারখানার ধর্মঘট অব্যাহত। শ্রমিকদের মনোবল অক্ষুণ্ণ।

বাটা দোকান কর্মচারীদের সভা

২৬শে ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় ফ্রেন্ডস বলে বাটা দোকান কর্ম-চারীদের এক সভায় বাটা কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই রাজ্যের বাটার ছুতোর দোকান-গুলোতে একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় ভাষণ দেন সুধীর মুখোটি, শৈলেন পাল ও জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির আক্রোশে হয়রাণি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অন্যায় ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে না পেরে কলকাতা পৌর-সভার কর্তৃপক্ষ কি ভাবে জনৈক ভদ্রলোককে অযথা হেনস্থা করছেন তার বিবরণ দর্পণের গোচরে এসেছে।

জনৈক ভদ্রলোক ২২।২ গড়িয়া-হাট রোডে একটি বাড়ী তৈরী করার অনুমতির জন্য বাড়ীর নক্সা সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পৌরসভায় যথাযথ জমা দেন। কাগজপত্র পরীক্ষা করে পৌর কর্তৃপক্ষ পঁচাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে বাড়ী তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন। এর সঙ্গে প্লেনেজ প্লানও অনুমোদিত হয় (অনুমোদন নং ৩০১)

পঁচাত্তর সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারী তারিখে পৌর কর্তৃপক্ষ উক্ত ভদ্রলোকের ওপর এক নোটিশ জারী করে বাড়ীর কাজ কর্ম বন্ধ রাখতে বলেন এই যুক্তিতে যে, স্কেচার কেন ও ম্যাপেনাইন ফ্লোর অনুমোদিত প্লান অনুযায়ী হয়নি। যদিও প্লানে কিছু পরিবর্তনের কথা কর্তৃপক্ষকে আগেই জানান হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে মিটি আর্কিটেক্ট-এর সুপারিশক্রমে ডেপুটি কমিশনার বিমল রায় গত ২৪-৬-৭৫ তারিখে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন।

পৌরসভার অনুমতি পেয়ে বাড়ীর কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়। ১৪-৫-৭৬ তারিখে কারাড়া রাস্তের সঙ্গে বাড়ীর মালিকের এক চুক্তি হয় এবং রাস্ত ঐ বাড়ীর একতলা ও দোতলা লীজ নেয়। রাস্ত বাড়ীর মালিককে অগ্রিম হিসেবে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দেয়।

এদিকে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে বাড়ীর দোতলার কাজ শেষ হওয়ার কথা যথাযথ ভাবে পৌর কর্তৃপক্ষকে জানান হয় এবং বাড়ীর প্লেন পৌর স্তরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৪-৯-৭৫ তারিখে পৌর সভ এ্যাসেসর বাড়ির নির্মিত অংশের মূল্য নির্ধারণ করেন বাৎসরিক ২৩২৯ টাকা।

জুন মাসে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি ২২।২ গড়িয়াহাট রোডে আসেন এবং বাড়ীটির তিনতলার একটি ফ্ল্যাট নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাড়ীর মালিক এ ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেন। উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি বাড়ীর মালিকের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হন না।

সাতই নভেম্বর তারিখে বাড়ীর মালিকের ওপর আবার এক নোটিশ জারী করে বাড়ীর কাজ বন্ধ করতে বলা হয়। যদিও এই নোটিশের কোন আইনসঙ্গত ভিত্তি ছিল না একমাত্র আক্রোশ মেটানোর ইচ্ছা ছাড়া। এই নোটিশ পাওয়ার পর বাড়ীর মালিক ২৮শে নভেম্বর তারিখে আপিলের মাননীয় বিচারপতি মহাশয় ১৯-১২-৭৫ (শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

প্রমীলা ক্রিকেট একটি প্রহসন মাত্র

লোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের শেষ লগ্নে এই লেখাটা পড়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই হয়তো ক্ষুব্ধ হতে পারেন। আমি নিরুপায়।

প্রমীলা ক্রিকেট সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমি ক্রিকেট সম্বন্ধেই দুচার কথা বলে নিতে চাই। বর্তমান পৃথিবীর জনপ্রিয় প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। আধুনিক বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে দিয়েছে এই গতি। মানুষ এই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই খেলাধুলার জগতেও এই গতির প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গত খেলাধুলার মান উন্নত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রঙিন জামাকাপড় দেশে তার একমাত্র ব্যবহারও ঘটনা নয়। টিভে তাদের খেলাধুলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। খুবই স্বাভাবিক। ক্রিকেট হচ্ছে সেই ধরনের খেলাধুলা যার মধ্যে একটা আয়েসী আবেগী ভাব লক্ষ্য করা যায়। সারাদিন ধরে বাইরজন খেলোয়াড় একটা মাঠের মধ্যে খেলা করে। কতসময় কত ভাড়াগায় অপচয়। ভাবুন একবার কলকাতার যে কোন ক্ষেত্রের সমস্যার কথা। পাঁচদিন ধরে যে কি উত্তেজনা। ছেট্ট চলন্তকালীন পাঁচদিন রাস্তাই কলকাতার সমস্ত কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। খেলাধুলা কি সমস্ত কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না সব কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটা চিন্তার বিষয়।

ক্রিকেটের জন্ম ব্রিটেনে ইংল্যাণ্ডে। রাজা মহারাজাদের মনোরঞ্জনার্থে এই বিলাস-বহুল খেলার সৃষ্টি। আজ পৃথিবীতে রাজতন্ত্র প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গেছে। ধনতন্ত্রও ধুঁকছে। দেশে দেশে মানুষ আজ মুক্তির দিন গুনছে। সমাজতন্ত্র। ধারপ্রান্তে সারা বিশ্ব আজ মুখে মুখ। রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে খেলার সৃষ্টি ধনতন্ত্র যার লালন-পালন সমাজতন্ত্রের প্রাঙ্গণে সে খেলার মূল্য আজ কতটুকু। পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক দেশই ক্রিকেট খেলে না। এমনকি ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি র্গ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও এ খেলার চলন নেই। কারণ সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া খেলা করে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করার তারা পক্ষপাতী নয়।

এটুকু পড়ে বক্তব্যটুই প্রশ্ন জাগে তবে কি ক্রিকেট বন্ধ করে দেওয়া উচিত? ক্রিকেটের জন্ম অধিক রাজতন্ত্রের গর্ভে। কিন্তু তা আজ শুধু ধনিক শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এ খেলা বর্তমানে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই বিস্তার লাভ করেছে। একদিন ক্রিকেট ছিল রাজার খেলা, আজ সামান্য মজুরের ছেলে টেস্ট প্লেয়ার তার দৃষ্টি পদক্ষেপে বিচ্ছুরণ করছে। ক্রিকেট খেলাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে—অন্তত যেসব দেশ ক্রিকেট খেলে, গেঁথে গেছে' খেলাতে সাধারণ মানুষকে উত্তেজনা উদ্দীপনা তোগায় তা তল শরীরের সঙ্গে মনের প্রশান্ত ঘটালো। ক্রিকেট ছাড়া আর কোন খেলাতেই বা এরূপ মানসিক উদ্যতা দেখা যায়। তাছাড়া, টেস্টের সময় সংক্ষেপণ ভস্ত এখন নতুন করে এখেলা সম্পর্কে ভাবা হচ্ছে, যার জন্যপ্রতি ম'চ ওভার ব্যাপী প্রত্যেক দিনের ওভারলিট কাপ ক্রিকেটের প্রবর্তন। ফলে খেলার গতি অনেকগুণই বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু প্রমীলা ক্রিকেট কি আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব, যেটা আজ শুরু হয়েছে? আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো যা, সেখানে মেয়েদের অবস্থান যে জায়গায়, সেখানে মেয়েদের ক্রিকেট খেলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। এদেশের প্রধানমন্ত্রী যদি একজন মহিলা, কিন্তু এদেশের নারীদের বাস্তুত এখনও পুরুষ সমাজ দ্বারাই শাসিত রাখা হয়েছে। কি ঘরে, কি বাইরে মহিলা স্বাধীনতা এখনও এদেশে খুব অল্প। ঘরের নারীরা চাকরি-বাকরি, লেখাপড়া জীবনের বহুস্তরেই পুরুষের পাশাপাশিই সমান তালে এগিয়ে চলেছে, তথাপি পুরুষদের সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই নারীদের ইচ্ছাকৃত ভাবেই পৃথক করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার প্রমীলা ক্রিকেট হঁলে আমাদের দেশে সম্ভব নয় কেন? উত্তরটাও ঐ একই ওদের দেশে হচ্ছে বলেই আমাদের দেশে সম্ভব নয়। অনুসরণ করা ভালো, অন্ধ অনুকরণ করা কখনই কাম্য নয়। ওদেশের মায়েরা তাদের কিশোরী কন্যার বাগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বন্ধ দিল দিয়ে যেন অন্ধাবিছে, এটা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? না এটার অনুকরণ করাটা যুক্তিযুক্ত? এদেশের নারীদের এখনও একটা পৃথক মর্যাদা রয়েছে।

তা বলে নারীরা কি কোন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করবেন না? তাদেরও কি প্রয়োজন নেই মনোরঞ্জনের? আমি সে কথা বলছি না। খেলাধুলা তাদের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক গঠন কার্যকরী হয় দেহগঠনের খেলাধুলায় তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা একটা জীবন ঘটির ব্যাপার। যদিও পণপ্রথা আইনত উচ্ছেদ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রায় সব ঘরেই এখনও সেটা ঘাঁগণভাবেই বিরাজ করছে। মেয়েরা যদি ক্রিকেটের মত খেলাধুলায় সারাদিন রোদের মধ্যে খেলা করে, তবে তার দেহের লাবণ্টুকু নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। লালিত্যহীন মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা বাপ মায়ের আরও এক বোঝবরূপ হয়ে দাঁড়াবে। আজ মেয়েদের ক্রিকেটের প্রতিযোগিতা কম, ফলে খেলাও অনেক কম। যখন এ খেলার প্রসার বাস্তবে মেয়েদের অনেক বেশী ম্যাচ খেলতে হবে তখন তাদের চেহারার ছিরিটা কি দাঁড়াবে। মাঠেরাও যে খেলেন সেটাও কি সম্ভব? মাঠেরে খেলাধুলার প্রয়োজন যথেষ্ট। অন্তত তারা খেলাধুলায় আগ্রহী হঁলেও তাদের সন্তানদের মধ্যে সেটা জানিয়ে তুলতে পারবেন।) নানা কাজকর্ম করে, ছেলে মানুষ করে, সারাদিন ক্রিকেট মাঠে পড়ে থাকা কি সম্ভব? (আমার মনে হয়, এই কারণেই বাংলা এবং ভারতের বির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান সিবিল কিরাস এরকম ক্রিকেট খেলার অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।)

তাছাড়া প্রমীলা ক্রিকেটের বিস্তৃত বাধা। যে দেশের পুরুষরা নারীর মর্যাদা দিতে জানেরা; বাসে ট্রামে ট্রেনে পৃথক লেডিজ সিটের ব্যবস্থা করতে হয়, সেখানে নতুন করে প্রমীলা ক্রিকেটের 'ক্যানান প্যারেড' খোলার দরকারটা কি? হঠাৎ-ই আজ 'প্রমীলা ক্রিকেট প্রমীলা ক্রিকেট' বলে মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে' যের প্রমীলা ক্রিকেট না হলে এদেশের মেয়েদের খেলাধুলার বিকাশ অসম্ভব ঘটে যাবে। কেন এদেশের মেয়েদের সাঁতারের এমন ভাল? কেন আন্তর্জাতিক মানের মহিলা এ্যাথলেটস্ তৈরী হয় না এই নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। মহিলাদের খেলাধুলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হয় না? দোহাই ভেবে আগার জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আসল জিনিস বাদ দিয়ে আজ কর্মকর্তাগণ মহলিস ক্লাব তামাদা দেখবার জন্য প্রমীলা ক্রিকেট নিয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছেন।

এক সময় যেমন বিনোবার খোসলা কমিটির রিপোর্টের চুম্বক শুনবার নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল। যেন ও দুটো জিনিস ছাড়া ভারতের চলতি উন্নতি সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব হতে পড়েছে। বাদ বাকী সব কিছুই তা ঐয় চিন্তে চাপাদেবে দেখানো হচ্ছে। ওটুকুই যা বাদ।

(লেখাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মাসুলী টিকেটের কিছু সুবিধা প্রত্যাহার

লবাণী গোস্বামী

১।৩।৭৬ তারিখ থেকে মাসুলী টিকিটের যাত্রীরা কয়েকটি সহজ ধরে ভোগ করে আসা সুযোগ হারাচ্ছেন। (১) মাসুলী টিকিটে কোন ব্রেক জার্নি চলবেনা (২) মাসুলী টিকিটের কোন এক্সটেনশন হবেনা। অবশ্য প্রথম সুযোগটি এই তারিখ থেকেই তুলে নেওয়া হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সঠিক নির্দেশ এখনও ইষ্টার্ন রেলের টিকেট চেকিং স্টাফ পাননি, কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে, ১।৩।৭৬ তারিখ থেকেই এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

পূর্ব রেল প্রশাসনের মতে দূরাবাহন ট্রেন চলাচলে রেলের ক্ষতি হচ্ছে। উপরন্তু, মাসুলী টিকিট ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সুবিধা বজায় থাকায় রেলের আয়ে ঘাটতি হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে এটা অবশ্যই বিবিধিত নয় যে, মাসুলী টিকিট বিক্রী করে রাজস্বের খাতে যথাযথ আয়ের পথ কখনোই রুদ্ধ। কিন্তু, পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, প্রতি মাসে মাসুলী বাবদ ইষ্টার্ন রেল ৩কোটি টাকার ওপর পায় যেটা এককালীন প্রাপ্তির ফলে মূলধনের পূর্ণ ভুকুল হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ মাসুলী টিকিটের যাত্রীরা নেয়ার রোড্ রের অধিকার দাবী করলেও করতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন বাদ দিলেও রেল আইনের ২৫নং ধারায় ব্রেক জার্নির সুযোগ বন্ধ আছে। তবু তাই নয়, দৈনিক টিকিটে কেউ যে কোন যাত্রা-রাস্তের স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থলের মধ্যবর্তী যে কোন স্টেশনে ইচ্ছে করলে যাত্রা শেষ করতে পারেন। মাসুলী টিকিটের যাত্রারা রেলের আইন অনুযায়ী "যাত্রী" পর্যায়ভুক্ত। এবং, তারা যে মাসুলী ব্যবহার করেন সেটা "কার্ড" পাশ অথবা মাসুলী পাশ নয়—সেটা নিয় মত টিকেট বলা হয় "মাসুলী টিকেট"। অতএব, রেল কোম্পানী আইন সঙ্গত ভাবেই মাসুলী টিকেটের যাত্রাকে নিয়মিত যাত্রা সুবিধা দিতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক গাড়ী কোন কোন স্টেশনে দাঁড়ায়না। তখন কি হবে? যেমন ধরা যাক, কোন যাত্রীর গন্তব্যস্থান থেকে বাণী পর্যন্ত মাসুলী আছে। গন্তব্যস্থ ৮টা, ৮৩২ এবং ৯২৭তে যে সবগুলি ডিনটি ট্রেন দাঁড়ায় তার কোন্টাই বাণীতে দাঁড়ায়না। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে ব্যাতেলে অবতরণ করতেই হবে এবং গাড়ী বদল করতে হবে। এক্ষেত্রে তাহলে যাত্রীর কি কর্তব্য তা কি রেল কর্তৃপক্ষ বলবেন?

তৃতীয়তঃ, ই এম ইউ কোচে পায়খানা প্রস্রবের বন্দোবস্ত নেই। কোন যাত্রী যদি এতজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে মধ্যবর্তী কোন স্টেশনে নামতে বাধ্য হন সেটাও কি রেল প্রশাসনের মতে আইন ভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে? কর্তৃপক্ষ এর কোন জবাব দেবেন কি?

এবার যাত্রা সম্প্রসারণ অর্থাৎ এক্সটেনশনের প্রসঙ্গে আসছি। যে কোন যাত্রীর যে কোন সময়েই যাত্রা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হতে পারে। কেন যাত্রীর প্রয়োজন এবং সময় নির্দ্বিধে রেল কর্তৃপক্ষের নিয়ম নির্দেশ মেনে তাঁর ইপ্সিত হতে পারবেন। যাত্রী সাধারণ নিশ্চই কর্তৃপক্ষ মাল তালুকের প্রজা নয়। বরং যাত্রীরাই রেল করেছে পারেন যে ব্যবস্থার ভাতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও যাত্রীরা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কেন? সুযোবন রেলে ঘটতি হচ্ছে কেন? গাড়ী চলাচলের ব্যয় অনেক কমেছে কাণ্ড, পাওয়ারের মধ্যে বিদ্যুৎ হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা। বিগত দুই বছরে ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে ডিনবার। কোচ বাড়েনি। যাত্রা বেড়েছে ডিন থেকে চারগুণ। যদি পঞ্চমবার ৫০ জনও বিনা টিকিটের যাত্রী ধরে নিই তাহলেও টিকেট বিক্রীর খাতে পঞ্চমবা ১৫০ ভাগ আয় বেড়েছে। এরপরও যাত্রীদের ওপর নানা ছলে অত্যাচার করে কর্তৃপক্ষ কি করতে অবস্থায় অসদ্ব্যবহার করছেন না?

বাটা-শ্রমিকের ধর্মঘট

সাধন গুহ

বুধবার আঠারোই ফেব্রুয়ারী সকাল ছ'টা পঁচিশ্লিশ থেকে বাটা জুতা কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট সুরু করেছেন। মুখ্য বাটানগরের ১২ হাজার, কলিকাতা বাজার সেক্‌শনের ১ হাজার ৪ শ', বোকারো-ঘাট ট্যানারী 'সেকশনের ৬ শ' এবং পাটনা-দিঘা লেদার সেকশনের ১ হাজার ৭ শ' শ্রমিক কর্মচারী অর্থাৎ সামূহিক ১৫ হাজার বেহনতী জন এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। প্রয়োজন হলে বাটা দোকান কর্মচারীরাও এতে শরিক হবেন বলে জানা গেছে। মূলতঃ ধর্মঘটের নোটিশ জারী করেছিলেন বাটা মজদুর ইউনিয়ন এবং পরে তারা তাদের বাটা এমপ্লিয়িজ ফেডারেশনকে এতে সমর্থন করেছেন। এখানে বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য যে, বাটা মজদুর ইউনিয়নের প্রধান শরিক সি. পি. আই. এম হলেও এখানে কংগ্রেস, সি. পি. আই, আর-এস-পি, ফরওয়ার্ড পার্টি, আই. এন. টি. ইউ. সি, সি-পি-আই-টি-ইউ, এন. এল. সি. পি, ইউ. টি. ইউ. সি এবং এ. আই. টি. ইউ. ইত্যাদি বার্গমেতিক দল ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কর্মীরা এবং সি. পি. আই. এম এর কর্মীরা ইউনিয়নের মধ্যে গড়ে তুলেছেন সুদৃঢ় ঐক্যের পরিবেশ। সকলেরই একটি ঘোষণা এবং তা হচ্ছে এই যে, বাটানগরে একটিই দল যার নাম বাটা মজদুর ইউনিয়ন।

বিস্ময়ের কথা এই যে, বাটা শ্রমিকরা ১৯৭৪ সালের বোনাস অডিনান্সের ৩(১) (ক) ধারার যে যথাযথ প্রয়োগের দাবীতে ধর্মঘট করলেন ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় রাজ্যের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপাল-দাস নাগও কিন্তু সেই একই পরামর্শ দিয়েছিলেন বাটার পার্সোনাল ডাইরেক্টর শ্রীঅনিল বাগচীকে। ঘটনাটা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। ১৯৭৪ সালের বোনাস অডিনান্স জারী করে লভ্যাংশের ওপর কোর পার্সেন্ট বোনাস বিধিবদ্ধ করা হয় যার ফলে ১৯৬৫ সালের পেমেন্ট অব বোনাস এ্যাক্ট-এর ৩৪ (৩) ধারা অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলো বাতিল হয়ে যায়। বাটা মজদুর ইউনিয়ন এবং বাটা কর্তৃপক্ষের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও এখন কোম্পানী সরাসরি অগ্রাহ্য করছে। উল্লেখযোগ্য যে, বোনাস অডিনান্স ১৯৭৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জারী হবার পরও কিন্তু কর্তৃপক্ষ অক্টোবর মাসে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী বোনাসের তৃতীয় কোয়ার্টারলির হিসেব মিটিয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁরা ডেকে বলেছেন এবং কোম্পানীর পক্ষ থেকে ইউনিয়নকে লেখা ৩০.১.৭৬ তারিখের চিঠিতে চূড়ান্ত ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ১৯৭৫ সালের দেয় ৪র্থ কোয়ার্টার বোনাস অডিনান্সের ৫ম ধারা অনুযায়ী ঐ সালের উদ্বৃত্ত থেকে দেবার নির্দেশে পরিচালিত হবে। এখানেই সৃষ্টি হলো জটিলতা, কারণ, কোম্পানীর কথা মেনে নিলে অডিনান্সের ৫ম ধারা অনুযায়ী ৪ পার্সেন্ট প্রফিট সেয়ারিং বোনাসের কথাই মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ বাটা শ্রমিকরা এতদিন ধরে যা পাচ্ছিলেন তা থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হয়। বিচার্য, কোম্পানী পেমেন্ট অব বোনাস এ্যাক্টের ৩৪(৩) ধারা বাতিলের অজুহাতে যে প্রস্তাব রেখেছে তা কি যথার্থ? অথবা, শ্রমিকরা পূর্বে প্রাপ্ত বোনাস সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বহাল রাখার দাবীতে অবিচল থাকছেন তা কি সমর্থন? এতদিন ধরে প্রাপ্ত ২০ পার্সেন্ট বোনাসে ডি, এ দ্বারা বাকী অংশের সমস্তটাই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের বোনাসে যে প্রোডাকশন এবং প্রোডাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত তার প্রমাণ ১৯৭৪ সালের এ্যাকাউন্ট ইয়ারের ব্যালান্স সীটে কোম্পানীর ৩২ লক্ষ টাকা লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ২০ পার্সেন্ট বোনাস দেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই সেটা প্রফিট সেয়ারিং বোনাস নয়। অতএব, ইউনিয়ন সঙ্গত ভাবেই অডিনান্সের ৩(১)(ক) ধারার যথাযথ প্রয়োগ দাবী করেছে। এই ধারাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যেখানে অডিনান্স জারী হবার আগে অর্থাৎ ২৫.৯.৭৫ এর আগে যে সব শিল্পে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী দেয়া পাওনার শর্ত গৃহীত হয়েছে অথবা যে শিল্পে বর্তমান অডিনান্স অনুযায়ী লভ্য নির্ভর বোনাসের পরিবর্তে প্রোডাকশন ও প্রডাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত করে বার্ষিক বোনাস দেবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেক্ষেত্রে সেই শিল্পের শ্রমিকরা সেই চুক্তি মতেই বোনাস পাবার অধিকারী থাকবেন—(১৯৬৫ সালের ঐ পেমেন্ট অব বোনাস এ্যাক্টের ১৯৭৪ সালের ১১ নং সংশোধন)। অবশ্য, এ কথাও এই ধারায় বলা হয়েছে কোন মতেই দেয় বোনাস অথবা মজুরীর ২০ পার্সেন্টের বেশী হবে না। ১৯৭২ সালে ইউনিয়নের বোনাস মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের একাংশে বলা হয়েছে, "উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাধারণ বোনাস হিসেবে যা দেওয়া হয় (১৯৬২ সালের ৩০শে আগষ্টের চুক্তির ৬নং ধারা—ই. এস. টি.) তা হচ্ছে বার্ষিক বোনাস যেটা উৎপাদন বা উৎপাদন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং যা লভ্য নির্ভর বোনাসের পরিবর্তে দেওয়া হয়ে থাকে—(লেবার ল জার্নাল-ফলিউম-২-১৯৭২-পৃঃ ১৯৭)। বাটার শ্রমিকরা তাই অবৈধ ভাবে অথবা জরুরী অবস্থাকে অধীকার করে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চান নি। যেখানে অডিনান্সও উৎপাদন এবং সম্প্রসলনে বাটা বস্ত্রানী পুরস্কার পেয়েছে। এরপরও শ্রমিকদের দাবী মেনে না নিয়ে শিল্পে অহেতুক অশান্তি সৃষ্টির দায়ে বাটা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই দায়ী থাকবেন। শ্রমমন্ত্রী ডঃ নাগ নিজে এক্ষেত্রে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে শ্রমিকদের আইনসঙ্গত দাবী আদায়ে সহায়তা করবেন—এটাই আশা করেছিলাম। কিন্তু, ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধান সভায় তিনি যা বলেছেন তা আমাদের নিরাশ করেছে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে বাটা শ্রমিক ধর্মঘট করে ভুল করেছেন। তিনি সহজ সরল ভাষায় বলে দিয়েছেন যে বর্তমান বোনাস আইনে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর নেই। শ্রমমন্ত্রীকে আমরা সবিনয়ে প্রশ্ন করতে চাই, বোনাস অডিনান্সের ৩১ (ক) ধারাভুক্ত শর্তাবলী সংঘন করে বাটা কর্তৃপক্ষ কি সঠিক কাজ করেছেন? বাটা শ্রমিকরাতো নতুন কিছু দাবী করেন নি। বাটা শ্রমিকরাতো ১৯৭২

(সেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

"পরিবার ছোট হলে প্রত্যেকটি সন্তানের আরও একটু যত্ন করা, আরও একটু প্রয়োজন মেটানো মা বাবার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। আর তাতে সমগ্র দেশও তার সহায়-সম্পদ আরও একটু ভালো ভাবে কাজে লাগাতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন সূচীর অত্যাবশ্যক অঙ্গ। আমরা সর্ব প্রকারে এই কার্যসূচী রূপায়িত করতে কৃতসংকল্প।

ইন্দিরা গান্ধী

শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জয়া কর্তৃপক্ষের নতুন চক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জয়া কারখানার কর্তৃপক্ষ আবার শ্রমিক-কর্মচারীদের আয় ও অধিকার হরণ, ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের হুমকা দিতে শুরু করেছেন। তাদের নতুন পরিকল্পনা হল—এক, শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা এক হাজার কমাতে হবে। দুই, মাথাপিছু কাজের বোঝা বাড়ানো হবে, কিন্তু মোট উৎপাদন বাড়ানো হবে না; তিন, শ্রমিকদের বর্তমান সুযোগ সুবিধা ও আয় ছাঁটাই করা হবে। কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, এই প্রস্তাবে ইউনিয়নগুলো রাজি না হলে লেলাই মেসিন কারখানা তারা বন্ধ করে দেবেন। জানা গেছে, জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে অন্য দুটি ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছেন।

এই ভাবেই স্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা লেলাই মেসিন কারখানাকেই হ্রাস করা হয়েছে ৬০৪ জন এবং বদলী শ্রমিক ১৭৬ জন। লেলাই মেসিন কারখানায় ১৯৬৯ সালে স্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। আজ তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫১৮ জন। ১৯৭৪ সালেও সেখানে বদলী শ্রমিক ছিল ২৬৭ জন আজ তার সংখ্যা মাত্র ৯১ জন। কনভেয়ারের মাধ্যমে নিরোজিত কয়েক শ' শ্রমিককেও অনুরূপ ভাবেই পথে বসানো হয়েছে।

ত্রিপাক্ষিক বেতন চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমন কি শ্রমিকদের অজ্ঞাতে গড় আয়ও বজায় রাখা হচ্ছে না। বাৎসরিক বোনাস কমিয়ে চার শতাংশে এনে ঠেকিয়েছে এবং লোকসানের ঘুষা তুলে ভবিষ্যতে বোনাস না দেওয়ার কথা ভাবছে। বিভিন্ন চুক্তি এবং প্রচলিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং আয় হ্রাস করা হয়েছে। আধুনিক মেসিন বসিয়ে সাবলাস ঘোষণা করে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে এবং বহু শ্রমিককর্মচারীকে বদলী করে লেলসমেত উক্ত কারখানার কর্মীদের হয়রান করা

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

"আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি তা বীর হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনার থেকে কোনও অংশে কম কঠিন নয়।"—

ইন্দিরাজী।

• •

মহাত্মা গান্ধী অবতার করেছেন, ভারতে 'রাজবংশ'— তৈরি হতে যাচ্ছে না। কারণ, গণতন্ত্রে তার মন্দির নেই।

• •

একটি নতুন ছড়া। তোমরা যে যা বলো ভাই/আমার বৈতাল পাখা চাই। লেখক নয়—রবীন্দ্রনাথ।

• •

দিগন্তত অন্ধ্রোদয়ের রাজ্যপাল শ্রীচাবান জানিয়েছেন, হেয়ার সাহেবের উচ্চশিক্ষা, নগ্নপায়ে তিনি এক অর্থে ছিলেন পরিপূর্ণ শিক্ষাব্রতী।

• •

বসিরহাটে তরুণ কবি সম্মেলনে সম্প্রতি কবি রাম বসুকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

• •

মৌলানা ভাসানী দুই দেশের জনগণের স্বার্থে ভারত-বাঙলা দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আকাংক্ষা করেছেন।

• •

শৃঙ্খলা আমার জন্যেই জরুরি অবস্থা ডাকা হয়েছে কথাটা ঠিক নয়, আসল ঘটনা জরুরি অবস্থার পায়ে পায়ে দেশে শৃঙ্খলা এসেছে।

• •

"আমি রমিনীর কাছে যত পয়সার নিই, ও আমার কাছে তত নেয় না।" সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

• •

আইনমন্ত্রী শ্রীগোখলে জানাচ্ছেন "গণতন্ত্র ও মুক্তি-সম্পর্কে কেতাবী দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া অত্যন্ত সহজ।"

• •

"যে ভাবে বাঙালীকে চাই, আমার মনে হয়, আমি সে ভাবে পাচ্ছি না।" রবি শঙ্কর।

• •

শ্রীনকরা জানাচ্ছেন, "রাজনীতি বা অর্থনীতি, কোনো ব্যাপারেই সোভিয়েত আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে না।"

• •

খবরে প্রকাশ, অন্ধ্রাবধি চাসনালা থেকে ২৩৯ শব উদ্ধার করা হয়েছে।

ডাক্তার কাটলার বিশ্বাস করেন, প্রতি বছর প্রায় বাইশ মিলিয়ান শিশু ভারতে জন্মাচ্ছে, দশ বছরে এই সংখ্যা উঠবে একশো দশ মিলিয়নে।

• •

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীথাকুন বা না থাকুন সেটাই বড় কথা নয়, দেশকে কায়েমিস্বার্থের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই জরুরি ব্যবস্থা।

• •

জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত গরিষ্ঠ সরকারকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে হঠাবার ক্ষমতা বিরোধীদের হাতে তুলে—দেয়া অগণতান্ত্রিক। সরকারি ভাষ্য।

• •

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অকাল মৃত্যুর পর জানা গেল তিনি একজন প্রতিভাশালী চিত্র পরিচালক।

• •

অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর কন্যার বিয়াহে অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল।

• •

জনৈক পত্রপ্রেরকের মতে, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও এবং সেকালে সাম্রাজ্যবাদই মূল শত্রু হলেও, পথের দাবীর 'বিপ্লব' মার্কসবাদ সম্মত নয়। হায়, মার্কসবাদ!

• •

প্রিন্সিপালকুমার রায়ের অভিমত, রবীন্দ্রনাথ-বিজেন্দ্রকাল বিতণ্ডায় তাঁর পিতৃদেবই অন্যায় করেছিলেন।

• •

১৮৬১-এর পুলিশ আইন পাল-টানো হচ্ছে। সম্প্রতি খবরটি প্রকাশিত না হলে আমরা জানতাম না যে স্বাধীন ভারতে এতদিন সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট পুলিশ-আইন চালু ছিল!

• •

বিচ্ছিন্নতাবিরোধী ও উগ্রপন্থা-বিরোধিতার কারণে তামিলনাড়ু মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম কমিটি ডি. এম. কে পার্টিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করবার দাবি জানিয়েছে।

• •

নব্য গঠিত সংযুক্ত তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সভাপতি করুণিপাম মুদানার সংগঠক কংগ্রেসের কর্মীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "এখনো যাঁরা দূরে সরে আছেন, তাঁরা আসুন, কংগ্রেসের জাতীয় মূল-স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হন্।"

জেলমন্ত্রী শ্রীসোহান পাল জানিয়েছেন, যেখানে জলপাইগুড়ি জেলের ক্ষমতা মাত্র ৫৫১ সেখানে বন্দী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮৮।

• •

তামিলনাড়ু ডি. এম. কে সরকারের বরখাস্ত করার কারণগুলি ইন্দিরাজী, জনগণের দ্বারেই, গোপন তথ্য প্রকাশ করে বলেছেন, "কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তারা ফেব্রুয়ারি মাসেই একটা হিংসাত্মক আন্দোলনের ষড়যন্ত্র করেছিল, সে খবর সরকারের হাতে ছিল।"

• •

ভারত-নিউজিল্যাণ্ড তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে বিশেন সিং বেদী যথারীতি আমাদের পুরনো প্রবাদ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেদিন বিজার্ড একটি অমূল্য ক্রিকেট মাঠ।

• •

সহযোগী পত্রিকার ভাষ্যকার : "চীন একটি গোলকধাঁধা।"

এদেরই পুরনো সিরিজ : "লাল চীনকে চিনুন।"

•

শ্রীপ্রবীণ চৌধুরী, সহ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২, তিনি শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত রচনাপঞ্জীর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আবেদন করেছেন লেখক বা পত্রিকা-সম্পাদক উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবিলম্বে তাঁকে পরিবেশন করুন। তাঁর গ্রন্থে এই রীতিতে থাকবে। জ্ঞাতব্য বিষয় : ১. লেখকের নাম ২. রচনার নাম ৩. পত্রিকার নাম ৪. বর্ষ/খণ্ড সংখ্যা ৫. তারিখ ৬. পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭. সংক্ষিপ্ত বিষয়।

একটি জোক।

গান্ধী দেখেছেন?

হ্যাঁ।

পাগল দেখেছেন?

হ্যাঁ।।

গান্ধী পাগল দেখেছেন? উনি ভাই।

বাটায় ধর্মঘট

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

সালের সুপ্রীম কোর্টের রায়কে সামনে রেখে যোনাস অডিনান্সের ৩১ (ক) ধারার যথাযথ প্রয়োগই দাবী করেছেন। এখানেতো কারো পক্ষে অথবা বিপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই আসেনা, কারণ প্রশ্নতো একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে মালিক পক্ষ অডিনান্সের বিরিবদ্ধ ধারাকে মানবেন কি মানবেননা, যদি না মানেন তাহলেও যদি মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন তাহলে বুঝতে হবে, আমরা সত্যি বড় অসহায়। উপরন্তু ডাঃ নাগের ইঙ্গিত অশুভ ভবিষ্যতেরই সূচনা করছে। তিনি বলেছেন যে, এই রাজ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত নেতৃত্ব বারবার শ্রমিক শ্রেণীকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। বাটা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহেই অসমীচিন। এই ধর্মঘটকে নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেছে কংগ্রেসেরই ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা আই এন টি ইউ সি এবং এন এল সি সি। সমর্থন জ্ঞাপন করেছে কংগ্রেসেরই রাজনৈতিক সহযোদ্ধা সি. পি আই দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এ আই টি ইউ সি। ডঃ নাগের মতে এঁরাই কি তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত? মনে হয় বাটা শ্রমিকদের অদৃষ্টপূর্ব দলমত নির্বিশেষে দুর্ভেদ্য ঐক্য কায়েমী স্বার্থকে নাড়া দিয়েছে। ত্রিপাক্ষিক আলোচনা সুরু হয়েছে এবং আমরা এর সাফল্য কামনা করেছি। কিন্তু, সরকারকে মনে রাখতে বলি যে মূল প্রশ্ন আইনের যথাযথ প্রয়োগের। সেখানে মালিকের দায়িত্ব যেন লঘু বলে বিবেচিত না হয়।

দর্পণ

সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক মাইল টাকা

ষান্মাসিক এগারো টাকা

ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা ॥

৬১, মহ সেন, কলি-১৩

ডাকঘর চাই

দর্পণ-এর মাধ্যমে আমরা হুগলী জৈলার চণ্ডীতলা থানার এক নম্বর ব্লক এলাকার দশটি গ্রামের জন্য বাঁধ-পুরে একটি ডাকঘরের কথা উল্লেখ করে যথেষ্ট লাড়া পেয়েছিলাম। ঘুষের কথা জানতা বিনামূল্যে পাবার এবং ব্যবস্থার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েও হুগলী জেলা মুদ্রাধিকেন্দ্রের অত পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের তরফতালীর কি সিদ্ধান্ত নিলেন জানি না। বাঁদপুর ডাক-ঘরের কাজ এগোয়নি। বাঁদপুর, হরিপুর ভিয়াড়া, চক ভিয়াড়া, ভরপাড়া ছোট চৌধরা নিয়ে একটি ডাকঘর অনায়াসে তৈরী হতে পারে। লোকসংখ্যা দশ হাজার। ঘরের বর্তমান ডাক-ঘর আঁকুনী কোন মতেই যথেষ্ট নয়। চিঠি পেতে লাগে তিন চার দিন। এক-জন শিক্ষকের সাহায্য নেই। অথচ বাঁদপুর ডাকঘর বালালে লোকসানও হবে না এ গ্যারান্টি গ্রামবাসী দেবে। তাই নতুন করে তথ্য করার জন্য পোস্ট মাস্টার জেনা-রেলকে অনুরোধ করি। আঁকুনী ডাকঘর মোট বিক্রির চাহিদা মেটাতে পারছে না। গ্রাম ও পোস্ট-কার্ড যা সারা দিনে বিক্রি হয় আঁকুনী ডাকঘরে শ্রীরামপুর হৈয়ারী তা সবরাহ করে উঠতে পারছেন না। গ্রামবাসীরাও গ্রাম পোস্টকার্ড পাচ্ছেন না।

জালালউদ্দীন আহমদ
সুনীল মল্লিক

ওয়াজের আলী

"সেই ট্রাঙ্ডেন সামনে চলছে" পঙক্তির রচয়িতা বিখ্যাত আইনজীবী মরহুম এস ওয়াজের আলী সাহেবের স্মৃতিরক্ষার কোনই ব্যবস্থা হয়নি। এই বিখ্যাত লেখক হুগলী জেলার বড়তাজপুর গ্রামে ১৮৯০ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার রচিত পুস্তকের নাম মনুকের দরবার, আকবরের রাষ্ট্র সাধনা, ভারতবর্ষ ওসমানি, দরবেশের দোওয়ার ও গ্রামোফোন শেখ বীর ইত্যাদি। সম্প্রতি তার স্মৃতিরক্ষার জন্য আত্মারী কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্পাদক এ-এক কামরুদ্দীন আহমদ, সভাপতি বড়তাজপুর মাদ্রাসা সম্পাদক ডাঃ আবরাক হোসেন এবং সহ সভাপতি এ বাকু। ওয়াজের সাহেব বিভিন্ন গুলিস্তা সওগাত এবং মোহাম্মদীতে লিখতেন। তার রচিত বহু পাণ্ডু-লিপি অনেক আত্মীয়স্বজনের কাছে থেকে গেছে। তাঁর সম্পর্কে যে কোনও তথ্য জানাতে পারেন। তাঁর দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহকার চেষ্টাও চলছে। যোগাযোগের ঠিকানা নীচে দেওয়া হল।

ডাঃ সাজেদুল হক চৌধুরী
ওয়ার্ড কেভারালিস্ট অফিস
১৫ পার্ক স্ট্রীট (প্রথমতল)
কলকাতা-৭০০০১৬

রেল স্টেশনের চেহারা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত রেল স্টেশন রয়েছে তাদের চেহারা অত্যন্ত হতাশাজনক। কড়-লাইনে কিংবা সি. সি. আর. এ সর্বত্রই রেল স্টেশন এক একটি বস্তি বাড়ী হয়ে গেছে। বালি, বেলুড়, ডানকুনি, উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর একই চেহারা। ডানকুনি স্টেশনের অবস্থা খুবই খারাপ। এখানেও স্টেশনের গায়ে মলমূত্র মুক্তি ভর্তি। স্টেশনের আশেপাশে রেলের মাল লোহা, লক্কড় ডাঁই করা। স্টেশন থেকে মুগমারী বাস এবং বিভিন্ন পরিবহন প্রায় এক মাইল দূরে দাঁড়ায়। যাত্রীরা রাত্রির অন্ধ-কারে বিদ্যুৎহীন রাস্তায় স্টেশন পৌঁছায় ভয় ভয় বক্ষে। অনেক লেখা-লেখির পরও বাসগুলিকে ডানকুনি স্টেশনের পাশেই খোলা জায়গায় আনা গেল না। এঁদের অন্যান্য বহু স্টেশনে যেওয়া বিল সাহিত্য পত্রে এই চিত্র ফোটানোর লেখা তরুণালার মান সম্মান নামক গল্পটি নিয়ে যেওয়ার বাসনা হয়েছিল। যাকে নিয়ে এত তোলপাড় তার নাম যদি রতি গুপ্তর কাছে অশ্রুত-পূর্ব হয়ে থাকে তবে বলার কিছুই থাকে না। শুধু কাজতালীর যোগা-যোগের বহস্যটাই এক্ষেত্রে ঘনীভূত হয় মাত্র। উদয়ন, সাধনবাবুর লেখা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ শরৎচন্দ্রকেই বা তিনি টানলেন কেন? এটাও রহস্যজনক বৈ কি।

প্রাবন্তী চৌধুরী
দেওঘর
বিহার

মতামত

উদ্যানদের আড্ডা সরিয়ে দেওয়া উচিত।

এই সঙ্গে প্রতিটি স্টেশনে শৌচা-গার পরিষ্কার রাখা খুবই জরুরী। এ বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেল, পূর্ব রেল ও বি. এন. আর কর্তৃপক্ষ এবং জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে অনুরোধ তারা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমাদের রেল-পাসেঞ্জার কংগ্রেস এ বিষয়ে বার বার লিখেছে। উপরুক্ত লোকাকে রেল-পাসেনজার কল্যাণ্টেইড কমিটিতে সদস্য করা হোক। আমাদের সমিতি সবরকম সাহায্য করতে বাজী আছে।

এ. এ. গুলজানউদ্দিন আহম্মদ
সহঃ সম্পাদক অল ইণ্ডিয়া রেল পাসেঞ্জার কংগ্রেস।
৩৫ নম্বর চাঁদনীচক স্ট্রীট (প্রথমতল)
কলিকাতা-১৩

রামপন্থী সাহিত্যিক

ইতিপূর্বে দর্পণ-এর পাতায় তরুণ কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায় লিখিত রামপন্থী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে একটি লেখার সমালোচনা করে রতি গুপ্ত নামে অনেক পত্র লেখক (অথবা লেখিকা) কয়েকটি নামের উল্লেখ করে বলেছেন যে, এইসব নামগুলো সংধনবাবুর লেখায় থাকা উচিত ছিল। আমার মনে হয় এটা শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য প্রণো-দিত ভ্রান্তি নয়। সম্ভবতঃ স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে নাম কয়টি বাদ পড়ে গেছে। ভুলটা অনি-চ্ছাকৃত।

শ্রী অথবা শ্রীমতী গুপ্ত তার পত্রে তার নাম না জানা অথবা শোনা লেখকদের মধ্যে চিত্ত ঘোষা-লের নামটি যেভাবে বিশেষ করে চিহ্নিত করেছেন তা কিন্তু কৌতূ-হলোদ্দীপক। তার কথাতেই প্রকাশিত হয় যে, তিনি 'চতুষ্কোণ' কাগজের নিয়মিত পাঠক। তা যদি হয় তবে চিত্ত ঘোষালের নামটি তো তার কাছে অজানা থাকার কথা নয়। অন্য কাগজ ছাড়াও, একমাত্র "চতুষ্কোণ" কাগজেই তো চিত্তবাবু খুব কম করে হলেও দুই ডজন গল্প লিখেছেন। উপরন্তু, এই কাগজেই তার ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হয়েছে। রতি গুপ্ত তার লেখাতেই প্রমাণ করেছেন যে তিনি একটি বিশেষ রামপন্থী দলাদলির শরিক। অতএব, তার তো না জানার কথা নয় যে, একটি রামপন্থী দলীয় মাসিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনও পত্রিকা বা কাগজে চিত্ত ঘোষাল লেখা পাঠান না। তবে কি তিনি ইচ্ছা করেই এই তথ্যটি গোপন করে গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকরা নিজেরাই খুঁজে নেবেন।

সুবীর মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৬

চিত্রের জন্য

স্বাধীনতার পর আমাদের গ্রামীণ সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল না গ্রাম বাংলার উৎপীড়িত দুর্বল মানুষ। আগে গ্রামাঞ্চলে ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। তার পরিবর্তে পঞ্চায়েত সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আগে ইউনিয়ন বোর্ডে বিচার আদালত থাকত। ঐক বিচার বিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার মীমাংসা হত। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিচার বিভাগ নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অভিযোগের বিচার উঠে গেছে। গ্রামীণ লোকেরা দুর্বলদের দমনের জন্য ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। গ্রাম-কলের খেটে খাওয়া মজুরগণ থানায় বা মহকুমা আদালতে অভিযোগ করতে ভয় পায়। বিচারের জন্য অঞ্চল আদালতের বিশেষ দরকার। হয়ত কোন কারণ বশতঃ সরকার পঞ্চায়েত ভাঙ্গ করতে পারছেন না। কিন্তু যেখানে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান চলু আছে সেখানে যদি গ্রাম পঞ্চায়েত আদালত বা অঞ্চল পঞ্চা-য়েত আদালত খোলার ব্যবস্থা হয় তাহলে নিরীহ গ্রামবাসীগণ বিশেষ উপকৃত হবেন।

কাজি মোয়াজ্জেম হোসেন
হুগলী

প্রমীলা ক্রিকেট

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ঠিক সেইসময় আজ এ দেশের খেলা-ধুলা তদারকের কর্তৃকর্তারা, কাগজ-ওয়ালারা অনেকেই কী খেলা-ধুলার পবিত্র অঙ্গনে কেজার হাট বসাতে চাইছেন। তারা প্রায় যখন গাছে বাঙার রঙীন ফোড়ন দিতে চাইছেন। ঘুষের বিষয় তাতে মাছ নাচে না; জল হাওয়া, কোচুর আর সাপের প্রয়োজন যেখানে সেখানে রঙীন ফোড়ন কল্পিত হোক।

খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্যটা কী? সর্বস্তরের মানুষ যেন মুক্তভাবে শারী-রিক ও মানসিক দিক থেকে গঠিত হতে পারে। জাতিগত ঐক্য-বোধের পরিপ্রেক্ষিত হল খেলার জগৎ। প্রমীলা ক্রিকেটে কারা যেন করে অংশগ্রহণ করতে পারবে? কজন মহিলা আমার আপনার মত সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘর থেকে আসবে এ খেলা যেতে? কলকাতার পুকুরের মাঠের অভাবে যেখানে এপ্রিল-মে মাসে ১০৮ ডিগ্রী গরমে খেলাধুলা চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, সেখানে পৃথক ভাবে মেয়েদের খেলার মাঠ কোথায় পাওয়া যাবে? দর্শক কল-কাতার বহুকটি পার্কে হতো এর আসর বসবে; ঔতিহ্যের মূর্তোয়াদ্রেনীর হাই সোসাইটির, পার্ক স্ট্রীট, ডোভার লেন, এসপ্লি পার্কের বেল বটম, মুক্তি, উল্লট মিনি-স্যার্ট পরিহিতা উদ্ভাসিক মহিলারা অসমন (?) করবেন মাঠে। তাতে দেশের কি লাভ? খেলাধুলার উন্নতি হবে তাতে কত-টুকু? যেখানে প্রমীলা ক্রিকেটের ছোঁয়া ই-ল্যাণ্ডেও তেমন কিছু চল নেই এ খেলার, সেখানে আমা-দের মত দেশে কতটুকু এর প্রয়ো-জনীয়তা অথবা এর প্রসারই বা সম্ভব কতখানি? তবু তবু যদি তারাদা সৃষ্টিকারী খেলাধুলার জন্য করবই স্পোর্টসকে আমরা বাধা চলে না। তত বিস্তর অর্থ নয় অপচয় করা হবে বিদেশ সফর? কি লাভ খেলাধুলার অঙ্গনকে সঙ্কুচিত করে?

ভাল ছাপার জন্য
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪১৯৪৩

জয়ীয় চক্রান্ত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে এবং চাকুরীর সর্তাবলী লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই ভাবেই উৎপা-দনের খরচা কমাবার নাম করে কাজের বোঝা বৃদ্ধি তথা মুনাফা বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকরী করা হচ্ছে।

ব্যবসায়ে মন্দা এবং লোকসানের ঘুরা তুলে মালিকপক্ষ প্রমিক কর্ম-চারীদের উপর নতুন নতুন জুলুম করছে। অথচ তারা কারখানার ১৯৭৪-৭৫ সালের ব্যালেন্সশীটেও দেখা যায় কে স্পানীর বিক্রয় বেড়েছে ১০ কোটি টাকা এবং প্রতি প্রতিটি ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার কম দেখানো সম্ভব হয়নি। (১৯৭৩-৭৪ সালে যা ছিল ৯১৮২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ৮১৮২ লক্ষ টাকা।) ১৩ কোটি টাকা এস প্রতিটিও হয়েছে বিবিধ খাতে ১৫৬৯ লক্ষ টাকা খরচ দেখানোর পর। বিবিধ খাতে খরচ বস্তুত কি তা সকলেই জানেন। অথচ এর ব্যাখ্যা বা হেলেনটেও অনুপস্থিত। তবুও আজ লোকসানের ঘুরা তুলে মালিক-পক্ষ শ্রমিকদের ক্ষতি করার এক পরিকল্পনা কার্যকরী করতে চলেছে।

পরিশেষে শ্রীমালাকার তথা কারখানার তিনটি ইউনিয়নের ঐক্য-বদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE : 40 PAISE

নতুন পালার ভাবনায় মাথা ধরছে

(দর্পণের প্রতিনিধি)

ডিসেম্বরের যাত্রাপাড়ায় এখন নতুন বছরের সুর আওয়াজ। আগামী বছরের জন্য সবাই বইপত্র জাল বুনছেন। বেশীরভাগ সকলেই কোমর বেঁধে প্রস্তুত চালাচ্ছেন। বাণিজ্য—প্রতিযোগিতা—ব্যাপার—সকলে একই লক্ষ্যে ছুটে চলেছেন।

সাধারণ যাত্রামোদী দর্শক শুধু জানতে পারছেন আগামী বছরের বিভিন্ন দলের কিছু সম্ভাব্য পালার নাম। সকলেই চান মালার গন্ধ রাখতে, দলের নাম দর্শকের নজর আকর্ষণে থাক, তা কারুরই কাম্য নয়। তাই এক দল নতুন পালার নাম ঘোষণা করলেই অপর দলও বসে থাকেন না।

কিন্তু সব নামই নাম মত্ত, সব ঘোষণাই ফলের শেষ ইচ্ছে নয়। তাই কেউ কেউ একটি দুটি নতুন পালার নাম ঘোষণাতেই তৃপ্ত নন, কেউ কেউ নামেই দর্শকের প্রতিক্রিয়া যাচ বইয়ের জন্য কিছু কিছু নতুন পালার নাম প্রচার করে থাকেন। মনেকে উপযুক্ত অভিনেতার সন্ধান না পেলে, কিংবা রোগা সুজিনেতাকে দিয়ে দলে ভারী পার্টকে পালনে ব্যর্থ হয়ে অন্য পালার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

তাই নিউ প্রভাত অপেরা 'আলাদীন' পালার বদলে 'হো চি মিন' পালার নাম ঘোষণা করেছেন। ভারতী অপেরা 'গুরু-শুক্র' বাদ দিয়ে আপাতত 'ভক্তকবি জয়দেব'-এর মধ্যেই তাদের প্রচার সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তরুণ অপেরা 'পিয়ারিডেভ'র বদলে আবার 'জুলিয়াস সীজারে'র কথা ভেবেছেন। আনন্দলোক 'হেলেন অফ ট্রয়' ছেড়ে 'ক্লিওপেট্রা'র দিয়ে মুখ ফিরিয়েছেন। প্রবীণ অপেরা ও নাট্যভারতী এ পর্যন্ত নতুন নাম ঘোষণা করেননি। তার সঙ্গে নাকি বাতিল হতে পারে।

কয়েকটি দল এখনও নতুন পালার নাম ঘোষণাই করেন নি। তারা কি নাম দিয়ে দর্শককে সচকিত করবেন জানি না।

যাঁরা দল বদল করে নতুন পালার নাম ঘোষণা করেছেন, তাঁর মধ্য দিয়ে যাত্রাভিনেতাদের অভিনয়কলার চিত্তাকর্ষক কোন নতুন রীতি ফিরেছে কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আসেনি। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা আপাতত মনে কোন আশার সুর সঞ্চার করে না।

একটি যাত্রাদলের অনেক অধিনায়ক, আগামী বছরের নতুন পালা নির্বাচনের সমস্যা নিয়ে মনের কথাটি খুলে বললেন। তাঁর ভাষায় : আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না মশাই। ভাবনায় মাথা ধরে যাচ্ছে। নাচ গান আর মাত্রাকে ঘিরেছোরী ফাঁক দিয়ে কতদিন চলতে পারে। মানুষের কাছে পৌরোহাত্য আসল চাবিকাঠিটা এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। বিজ্ঞাপন আর ফলীর ঐতিহ্যের, খ্যাতির মোহে দর্শকও জুটে যায় প্রতি বছর, কিন্তু বিবেকটা মাঝে মাঝে অন্য কথা বলে।

এর জবাবে আমি নরম্ভঙ্গীতে বললাম, আপনার বিবেক বস্তুটাতো আকাশ থেকে পড়েনি। ওটা এই সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরী হয়েছে। তে ভাল দা দে'র মতো ঐ বিবেকটাকে অবহেলা করেন কেন? যাঁরা আপনার পালা দেখে পয়সা দেন, তাদের বিবেককে ভোঁতা করে দেবার কি অধিকার আছে আপনার? ওরা যাত্রা ভালবাসে, বিশেষ অভিনেতার অভিনয় ভালবাসে, লোভার্ত হাতে টিকিট কেনে, তবু মাচ গান দৈ চুরোড়ের মেশায় তার জীবন যন্ত্রণাকে আড়াল করেন কোন সাহসে?

আমি ভুল করেছিলাম, সর্বজ্ঞের বেজাজ নিয়ে আমার বাণী দেওয়াটা ঠিক হয়নি। অন্তর্লোক মুহূর্তেই তাঁর বিবেককে টান রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ মালিকি বেজাজ নিয়ে নিজস্ব ব্যবসায়ী খাঁচাটির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বললেন : জ্ঞানগর্ভ বাণী না দিয়ে যাত্রা করে প্রমাণ করুন না, বাবুন না দেখি আপনার বিবেকের মর্যাদা।

আমি বললাম, আপনার এই যাত্রাপাড়ার অন্ধ-দলগুলোর দিকে আপনার বিবেকের তৃতীয় চোখে একটু দৃষ্টি দিন, দেখবেন, দু একটা দল বিবেকের মর্যাদা রাখতে পারছে কি না? তারা আপোষকামী, তারা পুরস্কারের জোড়াতা করে না। তারাও শেখারাণী, তাদের বাণিজ্যেও শিল্পী ও কলাকুশলীর জীবিকা নির্ভর করছে। এই সময়, এই সমাজ, নিষ্ঠুরিত মানুষ তার বিবেকটাকে উলঙ্গ করলে নাচ গান, গোয়েন্দা-কাহিনী, ভক্তিরস, নাচের সঙ্গীত আর খলনায়কের বোকাই মার্কা দাপট ছাড়া কোন প্লটই খুঁজে পাবেন না।

একটু চোখ কেরান, চাবিকাঠি খুঁজে পাবেন।

বাটা শ্রমিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদিবে মামলার রায় দেন। রায়ের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল :

The defendants and their officers and men be restrained from interferring with or obstructing the construction work of the petitioner suit property covered by the sanctioned plaintiff the disposal of the plaintiffs petition U/O 39 rl. The plaintiff shall however construct the remaining portion of the building according to sanctioned plan and shall demolish any unauthorised portion in the said construction as and when ordered by the court.

ষোলই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি বাড়ীর মালিককে ডেকে পাঠান এবং তিন তলার ১৪০০ স্কোয়ার ফুট মত জায়গা তাঁকে লিজ দিতে বলেন। বাড়ীর মালিক এ ব্যাপারে আবার তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেন। এতে উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি খুব রেগে যান এবং পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর ষোলই ডিসেম্বর বেলা ১১টা নাগাদ ডেপুটি কমিশনার (মিন্টো) সিটি আর কি চেট্টি এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট ওভাটার ওয়ার্কস সহ বাঘা বাঘা অফিসাররা ২২।৮ গড়িয়াহাট রোডের বাড়ীতে আসেন এবং বাড়ীর কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলেন। তখন বাড়ীর মালিক আদালতের আদেশের একটা অনুলিপি পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে দেন। তখন অফিসাররা ঘটনা স্থল ছেড়ে চলে যান।

ঐদিন বিকেলে পৌর আইনের ৩১৪ ধারা অনুযায়ী একটি নোটিশ বাড়ীর মালিকের নামে জারী করা হয়। সেদিনই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত বাড়ির জল ও ড্রেনের লাইন কেটে দেওয়া হয়।

বাড়ীর মালিকের অভিযোগ যে, তিনি আক্রোশের শিকার হয়েছেন। এবং সে আক্রোশ তাঁকে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তিনতলার একটা ফ্ল্যাট দিতে না পারার জন্য। বর্তমানে চুক্তি অনুযায়ী কন্ট্রাক্ট ব্যাঙ্ক তাদের দখল নিয়েছেন। এ দফে বাড়ীর জল ও ড্রেনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবুও তা করা হয়েছে। বাড়ীর কাজও বন্ধ রাখা হয়েছে। চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ে বাড়ীর মালিক মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন নেতৃত্বন্দের কাছে মুহুরার দেখেছেন।

তরুণ অপেরার
জুলিয়াস সিজার
আসর অবদান
রচনা/সঙ্কু বাগ
নির্দেশনা ও নাম ভূমিকায়
শান্তিগোপাল

অরুণ অপেরা প্রযোজিত
অনন্য দুটি পালা
জবচার্ণক
রচনা : সত্যপ্রকাশ দত্ত
কৃষ্ণাজুন
রচনা : মহেন্দ্র গুপ্ত
বায়নার জন্য যোগাযোগ
১১৭, রবীন্দ্রসরণী। ৫৫-৭৫৫২

নটলীলা প্রযোজিত
জনপ্রিয় দুটি পালা
সাজাহান
ও
দুর্গেশনন্দিনী
যোগাযোগের ঠিকানা
১১৭, রবীন্দ্র সরণী-এর ৭৫৫২

আগামী ৪ঠা মার্চ ১৯৭৬
মিনার্ভা থিয়েটারে
বেইমান
প্রযোজনা : নাট্যভারতী
স্রে : শেখর মাখুলী, অমর ব্যানার্জ
ভক্ত মল্লিক ও সবিতা ব্যানার্জী
হলে টিকিট : ৭, ৫, ৪, ৩, ২
ফোন : ৪৫-৮১১৮ ও ৫৪৪৮১৯

সুশীল নাট্যকোম্পানী প্রযোজিত স্মরণীয় পালা
স্ত্রীর শেষ পত্র
রচনা ও নির্দেশনা
নির্মল মুখার্জী
অর ভাঙার খেলা
সুর। পঞ্চানন মিত্র
১১৩, রবীন্দ্র সরণী কলকাতা-৬

ভোলানাথ অপেরার
লক্ষ লক্ষ দর্শকের প্রশংসায় এগিয়ে চলেছে
স্বামীর কোলে মৃত্যু
আগামী বছরের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক
নির্মল মুখার্জীর রচনা
সংসার গেল ভেসে
নূতন পরিকল্পনায় অভিনব সৃষ্টি
পালাসম্রাট ব্রজেন দে
ওয়ারেন হেষ্টিংস
শ্রেষ্ঠাংশে—সন্তু বন্দ্যো কবিতা চক্রবর্তী
তা ১ ভট্টাচার্য (নবরাগ) নলাই ব্যানার্জী (গুরু)
প্রধান সচীব শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১১৩, রবীন্দ্রসরণী কলকাতা

প্রচারের আবশ্যক নয়
বিচারে প্রমান নয়
নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার
সতী না অসতী ?
চলছে ৮১-তম হিট পালা
সোনাডাঙার বৌ
স্রে : ত-প-ন-কু-মা-রে
সঙ্গে : গোরাশশী, সাধন, গৌতম, লতিকা, সীমা, শর্মিলা
১১৭, রবীন্দ্র সরণী কলকাতা ৬
পরিচালক : সুদাম চক্রবর্তী
৫৫-৭৪২২

দলপতি—হরিবন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীতে আবার লড়াই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠী আবার লড়াইয়ের আসরে নেমেছে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন) ও ছাত্র পরিষদ (সুবেন ব্যানার্জী রোড) উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ প্রশেন কংগ্রেসের অনেক নেতার ভাই সহ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বেশ কিছু দিন ধরেই ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল চলছে। জানা গেছে ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদন) সমর্থকরা সর্বভারতীয় যুব নেতৃত্বে সঞ্জয় গান্ধীর অভিষেক সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ক্ষমতাসীন যুব নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিরূপ মন্তব্য করে চলেছে। ঘটনার দিন ব্ল্যাক বোর্ডে বর্তমান যুব নেতৃত্বের বিরুদ্ধে "মুংসা-বুলক" কথা লেখা হয়। এর প্রতিবাদ করে ছাত্র পরিষদ সুবেন ব্যানার্জী গোষ্ঠীর সমর্থকরা। এই নিয়েই প্রথম গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়।

খবর পেয়ে কুমুদ ভট্টাচার্য ছুটে আসেন। অপর পক্ষে সন্দীপকান্ত বসু ও ছাত্রনেতা সুদিন ভট্টাচার্যও ঘটনাস্থলে হাজির হন। কুমুদবাবু ছাত্রদের নিয়ে একটা সভা করতে চান। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় সভা না করেই তাকে চলে যেতে হয়। অন্যদিকে সন্দীবাবু এক ছাত্র জমায়েতে ভাষণ দেন। সন্দীবাবু বলেন, যারা অপপ্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর লড়াই শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজেই নয় অন্যান্য কলেজেও হচ্ছে। কুমুদ ভট্টাচার্য বিভিন্ন কলেজে ঘুরে ঘুরে নিজেদের গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে সুদিন ভট্টাচার্যও বিভিন্ন কলেজ ঘুরে নিজেদের প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছেন। সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা মোহন গোপালের ছাত্র পরিষদ ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার পর উভয় গোষ্ঠীর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা ও শতবাবুর মধ্যে সমঝোতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার কংগ্রেসী রাজনীতিতে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শচ) ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার মধ্যে মোটামুটি একটা সমঝোতা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

উত্তর কলকাতার রাজনীতিতে অজিতবাবুর সঙ্গে শতবাবুর বিরোধিতার বহু দিনের। এই বিরোধিতার জের হিসেবে উভয় গোষ্ঠীর সমর্থকরা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। এতদিন অজিতবাবু রাজ্য রাজনীতিতে প্রিয়ব্রত গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন।

অজিতবাবু ছাড়াও অনন্ত ভারতী, ইলা রায়, নন্দ ব্যানার্জী ও উত্তর কলকাতার শতবাবু ও বারিদবাবুর প্রভাব খর্ব করার জন্য চেষ্টা-রত প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এমন কি শত-বারিদ গোষ্ঠীর বিরোধিতার পাল্টা জেলা কংগ্রেস অফিসও খোলা হয়েছিল।

কিন্তু এখন পট পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেও শত-বারিদ গোষ্ঠী আগের থেকে অনেক জোরদার। অজিতবাবু এবং নন্দ ব্যানার্জী তাঁদের পুরনো সঙ্গীদের ছেড়ে শতবাবু ও বারিদবাবুর সঙ্গে সমঝোতায় এসেছেন। জানা গেছে উত্তর কলকাতার রাজনীতির ব্যাপারে অজিতবাবু এখন থেকে শত-বারিদ গোষ্ঠীর সঙ্গে চলবেন।

এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের মধ্যে অনেক বৈঠকও হয়েছে। ফলস্বরূপ শতবাবু ও বারিদবাবুকে প্রায়ই অজিত পাঁজার কটুর সমর্থকদের কাঁধে হাত রেখে হেসে হেসে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। অজিত পাঁজা ও নন্দ ব্যানার্জীর সমর্থকরা এখন জেলা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের ব্যাপারে শত ঘোষ ও বারিদবরণ দাসের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে চলেছেন।

ছাত্রনেতার দাবীতে পিতা নাজেহাল

১৯শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ইং মার্চ '৭৬ ॥ দাম ৪০ পঃ

প্রাচীন সৃষ্টির আধুনিক বিবাহ পদ্ধতিতে অনভ্যস্ত হওয়ায় কন্যাদায়-গ্রস্ত এক পিতা চূড়ান্ত নাজেহাল হলেন। কলকাতার কোন এক অভিজাত পল্লীর বাসিন্দা ঐ ব্যক্তি হিন্দুস্থানায় মোলো আনা বিশ্বাসী। কন্যার বিবাহের জন্য এদেশের চিরাচরিত সামাজিক প্রথা অনুযায়ী এগুচ্ছিলেন। কিন্তু সে পথে বাদ সাধল এক ছাত্র নেতা। সম্প্রতি এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংবাদ বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সুপরিচিত সমাজসেবী এই ব্যক্তির উক্ত কন্যার দাবীদার হয়ে উপস্থিত হল তাঁরই স্নেহে লালিত, পুত্রবৎ ঐ যুবক। শোকাহত, বিমূঢ় পিতা এই অকাল্যের প্রতিবিধানে দরজায় দরজায় ঘুরলেন। অপর পাত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের দিন-ক্ষণ স্থির। শিল্পের নির্বাচিত পাত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠিত, উপার্জনক্ষম। পাত্র পক্ষকেও জানান হল, নির্দিষ্ট দিনে এই শুভ কাজ সম্পন্ন হবে।

প্রতিবেশীদের আশ্বাস আর পরিজনের ভরসায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। কিন্তু যেখানে তাবড় তাবড় নেতারা পর্যন্ত ঐ যুবকের পরিমণ্ডলে ত্রাস্ত, সেখানেনেরী সেখানে কাম চায়। পূর্ব নির্ধারিত পাত্রের সন্ধান চলল। তাঁদের বাড়ীতে শানাই দেওয়া হল। পাত্র পক্ষের এবং উদ্বাহ সম্পর্কেও নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তদ্ভব সমবায় সমিতিগুলিকে একত্রিত হয়ে প্রধানত এ উদ্যোগ নিতে হবে। সরু ও মোটা সুতোর বুনোন, পাড়ের নক্সা, নূতন নূতন পাড়, কাপড়ের

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গ এত পিছিয়ে কেন ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভারত থেকে তন্তুজাত দ্রব্যের রপ্তানী যখন বেড়েই চলেছে তখন তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এত পিছিয়ে কেন, এ প্রশ্নটি এখন ওয়াকেফাল মহলের মুখে মুখে।

রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের শুরুন অফিসাররা নিজেরাই বিশেষ আগ্রহী হয়ে তন্তুজাত দ্রব্য এই রাজ্য থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠানোর জন্য নানা পরিকল্পনার কথা ভাবছেন। তাঁদের মতে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ফুলিয়া, ২৪পরগণা, বেগমপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইত্যাদি অঞ্চলের শাড়ি ও তাঁতবস্ত্রের আধুনিকীকরণ করা হলে এই রাজ্য থেকে কয়েক লক্ষ জোড়া শাড়ি বিদেশে প্রতি বছর পাঠানো যেতে পারে।

শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের শুরুন অফিসাররা যে পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন তা হলো কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তাঁত শিল্পের একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন। এই কেন্দ্র থেকে বলেছে এবং বিদেশে বিক্রী, তাঁতশিল্পের উপর গবেষণা

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

কৃত্রিম বনভূমি সৃষ্টির প্রকল্প ধামাচাপা কেন ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দমদম এয়ারপোর্টের সন্নিকটে যে 'কৃত্রিম বনভূমি' সৃষ্টির পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেছিল তা এখনো কার্যকর হচ্ছেনা কেন? দমদম এয়ারপোর্টের কার্যকরী ডিরেক্টর কে, কে, ওসাটি পরিকল্পনাটি সার্থক করে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংস্থার হেডকোয়ার্টারে বহু আবেদন নিবেদন জানান। পরিকল্পনাটি ছিল শিল্পসমৃদ্ধ, সৌন্দর্যমণ্ডিত। প্রস্তাব ছিল দমদম এয়ারপোর্টের সন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লাগানো হবে দামী দামী ফুলের গাছ। গড়ে তোলা হবে কৃত্রিম জলাশয়, ছোট ছোট ছোট পাহাড়। শিশুদের জন্য মনোহারী দোলনা, কাঠের ঘোড়া এবং বহুবিধ শিশু উদ্যান। ছোট ছোট কোণের আড়ালে ছোট ছোট বেঞ্চোরা এবং লাল সুরকির মেঠো পথ। থাকবে একটি পক্ষী নিবাস। পৃথিবীর দেশ বিদেশের পাখির ডাক সকাল সন্ধ্যায় সৃষ্টি করবে এক মনোরম পরিবেশ।

এই জাতীয় একটি কৃত্রিম বনভূমি গড়ে তোলার বিশেষ উদ্যোগ অবশ্যই ছিল। তা হলে দেশী বিদেশী আকাশযাত্রী যাঁরা দমদমের ওপর দিয়ে ওঠানামা করেন তাঁরা অল্পক্ষণের জন্যই হয়তো থাকেন এয়ারপোর্টে, অনেকে মাত্র কয়েক-ঘন্টার জন্য শহরের মধ্যে ঢুকতে চান না। সেক্ষেত্রে এই বনভূমি আকাশী যাত্রীদের এক আনন্দ মধুর স্মৃতির কারণ হয়ে থাকবে।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংস্থার ডিরেক্টর অফ প্ল্যানিং শ্রীবৈদ্যবিমাল পরিকল্পনাটিকে ব্যাপক জানিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে মঞ্জুর করার জন্য বিশেষ নোট দেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান এয়ারমার্শাল ওয়াই. ভি. মালসে প্রস্তাব রেখেছিলেন দমদম এয়ার-পোর্টকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিমানবন্দরে দীর্ঘ সময় জুড়ে তার-তীয় বিভিন্ন রাগ রাগিণীর রেকর্ড বাজানো হোক।

তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লে হোসেন খাঁ প্রমুখের নামোল্লেখও করেছিলেন। এছাড়া তাঁর ইচ্ছা ছিল দমদম এয়ারপোর্টের আন্তর্জাতিক টার্মিন্যাল ভবনের দ্বিতলে পূর্বভারতীয় শিল্পীদের সমকালীন এক স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনীর। এ ছাড়াও তাঁর প্রস্তাব ছিল প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর মাধ্যমে দমদমকে বিমানযাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা। এ প্রস্তাবগুলি এখনো কেন কার্যকর হচ্ছে না, এ সমস্যা, এ জিজ্ঞাসা দমদম এয়ার-পোর্টের অগণ্য কর্মীর।

ডেভিড হেয়ার ঃ জীবন ও কর্ম

১৭৭৫ সালে ডেভিড হেয়ার জন্মগ্রহণ করেন স্কটলাণ্ডে এবং ১৮৪২ সালে ১ জুন তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতা শহরে, ৬৭ বছর বয়সে। ১৮৭৫ সালে তাঁর বিনত জন্মবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ডেভিড হেয়ারের যে প্রতিচ্ছবি আজ জীবন থেকে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, সেটা খুব প্রীতিকর নয়।

১৮২৬-২৭ সালের কথা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, তখন নিজেদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য এদেশের লোকেরা এমন ব্যগ্রতা বেড়েছিল যে তাঁরা তাঁদের ছেলেদের নিয়ে, বর্তমান হেয়ার স্ট্রীট-কলেজাথাট অঞ্চলে, হেয়ার সাহেবের বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমন ভিড় হত যে হেয়ার সাহেবের পক্ষে পাল্কি করে বাড়ি থেকে বেরুনো কঠিন হত। প্রাত্যহিক ভূল-পরিবর্তন ও অন্যান্য কাজকর্মের জন্য হেয়ার পাল্কি করে বেরুতেন এবং দলে দলে ছেলেরা me poor boy, have pity on me, me take in your school? বলতে বলতে তাঁর পাল্কির চারিদিকে ছুটত। পরিষ্কার বোঝা যায়, 'me poor boy' ইত্যাদি শেখানো বুলি, অভিভাবকরা নিজেদের অশুদ্ধ ইংরেজিতে বালকদের শিখিয়ে দিতেন এবং হেয়ারের গাল্কির সঙ্গে দৌড়তে বলে দিতেন। 'poor' অর্থাৎ দরিদ্র বলতে আমরা যা জানি, বিশেষ করে আমাদের দেশের দরিদ্রদের, এরা আদৌ সেই শ্রেণীর বালক নয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু আগে আমাদের দেশের দরিদ্র বালকদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য সাহেবের পাল্কির পিছনে দৌড়ানোর এরকম তাজ্জব দৃশ্য কল্পনা করা যায় না, বিশেষ করে কলকাতা শহরে। আজকের দিনেও যদি কোনো হেয়ার সাহেব, অথবা এদেশীয় কোনো 'সাহেব' (অর্থাৎ অভিজাত বড়বাবু যাঁদের শিক্ষক-দেরারাও আজও 'সাহেব' বলেন) ইংরেজি-শিক্ষার অবতার সেজে রাস্তায় গাড়ি করে বেরোন, তাহলে আর যাবাই তাঁর গাড়ির পিছনে 'me take in your school' (আধুনিক ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল) বলে ছুটুক না কেন, দরিদ্র বালকরা কখনও ছুটবে না। তারা হয়ত 'give us this day our daily bread' বলে ছুটতে পারে।

অতএব একথা অতিসত্য যে হেয়ারের পাল্কি ঘিরে যে বালকরা দৌড়ত তারা কেউ দরিদ্র নয়, সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তান, যাদের অভিভাবক বাবা-খুড়ো-জ্যাঠারা 'me poor boy'-এর মতো ইংরেজি বিদ্যার জোরে তখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং অর্থের সঙ্গে ইংরেজির সম্পর্কের মাহাত্ম্য মর্মে মর্মে বুঝেছেন। ইংরেজি বিদ্যা মানে ওয়ার্ড বুক মুখস্থ-করা বিদ্যা। শিবনাথ শাস্ত্রী 'নবীন' নামে এক সাহেবের বাঙালী কর্মচারীর কথা উল্লেখ করেছেন। নবীনবাবু বোজ সাহেবের ঘোড়ার দানা চুরি করে বেচে দিতেন। সাহেব জানতে পেরে একদিন তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন: 'নবীন, তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানা চুরি করে বেচে দাও?' নবীনবাবু মাথা চুলকে বলেন: 'yes sir, my house morning and evening twenty leaves fall, little little pay, how manage?' অর্থাৎ 'বাড়িতে সার আমার সকালে সন্ধ্যায় কুড়িখানা পাতা পড়ে (মানে কুড়িজন খায়), মাইনে কম, কি করে চালাব, স্যার'।

এই ইংরেজি শিক্ষার জোরেই তাঁরা সেকালে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে মধ্যবিত্তের উচ্চস্তরে আরোহণ করেছেন এবং সামাজিক মর্যাদালাভ করেছেন। এই নবীনবাবুদের ছেলেরাই তখন হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে দৌড়ত। হেয়ার সাহেব দয়ালু বটে, তবে একদিন-দু'দিন নয়, বেশ কিছুদিন এই বেচারী বালকদের দৌড় করিয়ে তিনি হয়রান করতেন, তারপর দু'একজনকে বেছে নিয়ে তাঁর বাড়ির কাছে মিষ্টির দোকান থেকে মেঠাই খাওয়াতেন এবং স্কুলে ভর্তি করে নিতেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে ভাল বেরাবী ছাত্ররা হিন্দু-কলেজে পড়তে যেত, তাদের সংখ্যা শতকরা দু'একজনের বেশি নয়। এই ছাত্রদের মধ্যে রমাবল্লভ রামতনু লাহিড়ী এ কজন। কৃষ্ণনগরের রাজাদের দেওয়ান বংশের সন্তান রামতনু, নিশ্চয় দরিদ্র তাঁকে বলা যায় না। রামতনুকে কি ভাবে ও কতদিন হেয়ারের পাল্কির সঙ্গে দৌড়তে হয়েছে, তার একটু বিবরণ শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" থেকে দিচ্ছি। রামতনু তখন ছাতিয়াগাঁয়ে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে রোজ সকালে, কিছু আহার করে, অথবা অনাহারে বেরিয়ে, তিনি হেঁটে হেয়ার সাহেবের বাড়ি আসতেন, তারপর পাল্কির সঙ্গে সারা দিন দৌড়তেন। হেয়ারের পাল্কি নানাস্থানে যেত, এবং এক-এক স্থানে অনেকক্ষণ থামত। রামতনু সর্বত্র যেতেন ও অপেক্ষা করতেন।

শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন: "এইভাবে প্রায় দুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার বুঝিলেন, এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে ইহার অভিশয় আগ্রহ। তখন তাঁহাকে ফ্রি বালকের দলে লইতে বীকৃত হইলেন।" আসলে হেয়ার সাহেব এদেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানদের ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহের কঠোর টেস্ট পরীক্ষা নিতেন তাঁর পালকির সঙ্গে বালকদের দিনের পর দিন দৌড় করিয়ে। অভঃপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হত, এবং সেই দয়া থেকে তাদের মেঠাই খাওয়ানো, অদূরে-বিদূরে দেখানো করা, ওষুধপত্র দেওয়া ইত্যাদি আরম্ভ হত। তা ছাড়া, মনো-

বিনয় ঘোষ

বিজ্ঞানীরা বলেন, যাঁরা চিরকুমার, হেয়ার সাহেবের মতো, বালকদের প্রতি তাঁদের অনুরাগের একটু আতিশয্যই থাকে। ওটা কিছু নয়।

এই হল হেয়ারের দয়ার কথা। দানের কথা বলি। দান ধ্যানে হেয়ার তেমন বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। ঘড়ির ব্যবসাতে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হন কলকাতা শহরে, যেমন তাঁর সমকালীন আরও অনেক ইংরেজ হয়েছিলেন। ১৮২০-এর দশকের লটারি কমিটির প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, ব্যাঙ্কশাল অঞ্চলে বাড়ি ও অনেক জমিজমার মালিক ছিলেন হেয়ার। ধনকুবের রামদুলাল দে সরকারের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল এই অঞ্চলে। হেয়ারের সঙ্গে রামদুলালের সম্পত্তি নিয়ে চিঠিপত্রের আদান প্রদানও হত। লটারি কমিটির নগরোন্নয়নের সময় অনেক ভূসম্পত্তি হেয়ার কেনেন, তার মোট মূল্য তখনকার কালে প্রায় এক লক্ষ টাকা। যতদূর জানা যায়, মৃত্যুকালে তিনি তাঁর কোনো সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে, অথবা তাঁর মেঠাই-খাওয়ানো ফ্রি-পড়ানো অথাকথিত 'দরিদ্র' বালকদের দান করে যান নি। তাঁর ঘড়ির ব্যবসাটি তিনি ১৮২০ সালে তাঁর সহকারী ইংরেজ বন্ধু গ্রে-সাহেবকে অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেন, বিদেশী বা এদেশী কাউকে দান করেননি। ১৮২৪ সালে পটলডাঙা হোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশে ৫ বিঘে ৭ কাঠা জমি কেনা হয়, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের গৃহ নির্মাণের জন্য। এর মধ্যে দু' বিঘে জমি ছিল হেয়ার সাহেবের। তিনি কাঠা-প্রতি ৫০০ টাকা মূল্যে এই জমি কলেজের জন্য বিক্রি করেন। তাঁর দানদাতাগুণ মুগ্ধ চরিতকারেরা লিখেছেন 'বরমূল্যে' 'নামমাত্র মূল্যে' বিক্রি করেন। লটারি কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, উদ্বয়নের পরে, এই সময় পটলডাঙা অঞ্চলে ৩০০ - ৪০০ টাকা কাঠা জমি বিক্রি হয়। কাজেই বরমূল্যে তো নয়ই, বরং কিছু বেশি মূল্যেই তিনি কলেজ-ভবনের জন্য জমি বিক্রি করেন। অতএব দানাদানের ইত্যাদি মধ্যযুগীয় চরিত্রগুণের জন্য, আমাদের চরিতকারদের ভাষায়, হেয়ার 'মহাত্মা' ছিলেন না। এদিক দিয়ে তিনি তাঁর কালের, উদীয়মান ধনতান্ত্রিক মানসতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন, প্রকৃত ঘড়ি ব্যবসাদী। আমাদের মানসতা যেহেতু মূলত ও প্রধানত মধ্যযুগীয় তাই কোনো ব্যক্তির এই জাতীয় গুণাবলী নিয়ে আমাদের মধ্যে myth বা পুরাণ-কথা রচনার প্রবণতা অত্যধিক, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার আমরা এখনও অভ্যস্ত নই। হেয়ারের পাল্কির চারিদিকে মধ্যবিত্ত বালকদের দৌড়নো, হেয়ারের মেঠাই খাওয়ানো, অথবা বিদুখে ভূত খাওয়ানোর যে চলচ্চিত্র, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে কলকাতা শহরে, আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা খুব প্রীতিকর নয়। কারণ সেটা হল, আমাদের ঔপনিবেশিক দাসত্ব ফ্রাংসাসি কাঙালীপনা, এবং সবার উপরে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের ইংরেজ সাহেব ভজনের একটি গ্রাম্য-কর চিত্র, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হেয়ার একজন বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন অন্যান্য কারণে। তার মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য হল, তাঁর ব্যবসা এবং ঘড়ির ব্যবসা। ব্যবসা অবশ্যই ইংরেজ এদেশে করেছেন, কিন্তু এরকম আধুনিক কারোপযোগী ব্যবসা তাঁর কালে আর কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। ধনতন্ত্রের যৌবনকালের যত প্রকারের যান্ত্রিক প্রভৃতি আছে, তার মধ্যে 'ঘড়ি' শ্রেষ্ঠ, কারণ এই যুগের মর্মবাণী 'Time is Money' এবং কাজকর্মে 'as regular as clockwork'-এর প্রতিমূর্তি ঘড়ি। আমাদের দেশে এই ঘড়ির আদি এবং সম্ভবত প্রথম, ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার। লুইস মামফোর্ড তাঁর বিখ্যাত Technics and Civilisation গ্রন্থে ঘড়ির যুগকৃদ্ধিকা সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করে শেষে বলেছেন— "To become as 'regular as clockwork' was the bourgeois ideal, and to won a watch was for long a definite symbol of success".

এ হল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের কথা। উনিশ শতকের প্রারম্ভেই হেয়ার কলকাতা শহরে ঘড়ির ব্যবসা করতে এদেশে এসেছেন। তার আগে ইয়োরোপ থেকে ঘড়ি এদেশে এসেছে, কিন্তু ঘড়ির ব্যবসাটি কেউ এদেশের বলে আমার জানা নেই। হেয়ারই মনে হয় এদেশের প্রথম ঘড়ির ব্যবসাদী, অর্থাৎ এদেশে ধনতান্ত্রিক যুগবাণীর যান্ত্রিক প্রতিমূর্তির প্রথম প্রচারক। আমাদের দেশে তখন অবশ্য ইয়োরোপের মতো ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ হয়নি, কিন্তু নব্যধনিক এক আধা-ফিউডাল অভিজাত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে, কলকাতা শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে। কলকাতা শহরের এই নব্য অভিজাতরা হলেন ইংরেজ শাসক-বণিকদের দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি সরকার মুনশী প্রভৃতি এবং গ্রামাঞ্চলের নব্য অভিজাতরা হলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উত্তরকালের হঠাৎ-জমিদারশ্রেণী, যাঁদের অধিকাংশই অজ্ঞাতকুলশীল। আমাদের দেশের এই হঠাৎ-বড়লোক অভিজাতরাই ছিলেন হেয়ার সাহেবের ঘড়ির ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা ক্রেতা, যাঁরা 'to own a watch and clock'-কে 'definite symbol of success' বলে মনে করতেন এবং 'status-symbol' ও মনে করতেন। এরকম অভিজাত-পরিবারে, কলকাতা শহরে ও গ্রামে, এখনও অনেক সেকালের নাবারকমের ঘড়ি দেখা যায়, তার মধ্যে হেয়ার সাহেবের দোকানের ঘড়ি থাকাও আশ্চর্য নয়। এদেশের এই নব্যধনিকদের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের প্রথম পরিচয় হয়, ঘড়ির ব্যবসায়ের মাধ্যমে এবং সেই পরিচয়ের সূত্রেই তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা হয়, স্কুল সোসাইটিতে, হিন্দুকলেজে, মেডিকাল কলেজে। একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের দানের কথা শিক্ষাব্রতীরা সকলেই জানেন, কাজেই তার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। ১৮১৮-১৯ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিমলা, আহিরীটোলা ও পটলডাঙা স্কুলের মধ্যে, শিমলা পাঠশালা হেয়ারের নিজস্ব ছিল, পটলডাঙা স্কুল প্রথমে কলকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮ সালে স্থাপিত)

(লেখাংশ পরের পৃষ্ঠায়)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নতুন হামলা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মার্কিন জঙ্গী বিমান নিয়ামরীপ শহরের ওপর হঠাৎ বোমা বর্ষণ করায় ১৫ জন কাম্বোডিয়াবাসী খুন ও চল্লিশজন আহত হয়েছেন। সমপেনের বেতিও শুক্রবার মার্কিনী হামলার খবর দিয়ে বলেছে যে, তিনটি মার্কিন জঙ্গী বিমান (এক ১১১ রবশের) বুধবার সকালে প্রথম হানা দেয়, দ্বিতীয়বার আসে দুপুরে। নিয়ামরীপ হল ইতিহাস প্রসিদ্ধ আঙরভটের আট কিলোমিটার ও রাজধানী সমপেন থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বোমা বর্ষণের পর বিমানগুলি থাইল্যাণ্ডের দিকে চলে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য যথারীতি এই বোমা বর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাম্বোডিয়ার বুকে মার্কিনী হামলার ঘটনা নতুন নয়, পূর্বেও এ রকম হয়েছে। এটা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণবাদের ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। নতুন করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নাক গলাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

নিয়ামরীপ শহরের ওপর বোমা বর্ষণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়াকূটচালের সঙ্গে এটা জড়িত। সম্প্রতি দিয়াগো গার্সিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের একটি নয়া চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে গ্রেটব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। প্রথম চুক্তি হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। ১৯৭৪ সালে অন্ত একটি চুক্তিতে ঐ দ্বীপে বিমান ও নৌ-বহর নির্মাণের স্বীকৃতি দেয় গ্রেট ব্রিটেন। দিয়াগো গার্সিয়ার মার্কিন সামরিক ঘাঁটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নয় স্বাধীন দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক।

অন্তদিকে খবর, ফ্রান্স ভারত মহাসাগরে আরো দুটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। এই যুদ্ধ জাহাজ দু'টি বিমান বিধ্বংসী রকেট ও ক্ষেপনাস্ত্রে সজ্জিত। কিছুকাল পূর্বে ফ্রান্স দু'টি সাবমেরিন পাঠিয়েছিল ভারত মহাসাগরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে ফ্রান্সের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা আঠারো।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তিন প্রধানের (মার্কিন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) এই তৎপরতা নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলে যুদ্ধের বিপদ ডেকে আনছে। বিশেষ করে, এ ঘটনা যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে নতুন বিপদ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, শুধু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদরাই নয়, তাদের সঙ্গে ধনিক দেশগুলোকে সন্ত স্বাধীন দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রবোচনা দেওয়া হচ্ছে। নিয়ামরীপে বোমা বর্ষণের পূর্বে, ২০শে ফেব্রুয়ারী থাইল্যাণ্ড ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। থাইল্যাণ্ডের একটি জাহাজ কাম্বোডিয়ার সাগরে প্রবেশ করলে সামরিকৌজ ওটা ডুবিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য থাইল্যাণ্ড এখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। যদিও থাইল্যাণ্ডের বুক থেকে মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে নেয়ার প্রবল দাবী করছে দেশবাসী। গত নভেম্বর মাসে নতুন কাম্বোডিয়ার সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর। এই প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের পেছনে মার্কিনী হাত রয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মনে করেন।

পায়ের পাতায় বিচিত্র রোগ

হুগলী জেলার মগরা এক নম্বর ব্লক এলাকায় বাঁধনুরে প্রোগ্রেসিভ কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত এক সভায় স্থানীয় লোকের পায়ের পাতায় বিচিত্র ঘা ও ক্ষতের সমস্যা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন এম, এল, এ মহম্মদ সফিউল্লাহ। মীনাখন্ড সরকার কলেজের ডাঃ এস দাসরায় ঐ রোগ সম্পর্কে যথাযথ পরীক্ষার আশ্বাস দেন। সম্পাদকীয় পত্রে এ. এফ. কামরুদ্দীন আহমদ। চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প সম্পর্কে বলেন ডাঃ অমল হাজরা। পায়ের পাতার ঘা অন্ত্রোপচার করার শিবির খোলা হবে ঐ অঞ্চলে।

সভার পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। সভাদান দেন অনিরুদ্ধকুমার মুন্সী। স্থানীয় সুচিয়া ক্রিয়াড়া, মগরা, রাজবল হাট, ইত্যাদি অঞ্চল থেকে প্রায় একশত রোগী আসেন তাদের পায়ের বিচিত্র ক্ষত চিকিৎসা করাতে।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

"সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি কিংবা সংসদ ঠিক করবেন, জরুরি কালে বাকি স্বাধীনতা থাকবে কি থাকবে না। এ ব্যাপারে আদালতের কথা আসতেই পারে না।" শ্রীনীরেন দে।

• •

"বঙ্কিমের ছবির বড় ভগ্ন, সেই। বাঙালী ছবি। বঙ্কিম আমার চেয়ে ঢের বেশি বাঙালী পরিচালক।" শ্রীসত্যজিৎ রায়।

• •

সংবাদে প্রকাশ, কলকাতার দেড় লক্ষ মানুষ ফুটপাথে বাস করে, হকারের সংখ্যা প্রায় বাট হাজার, কাগজ কুড়িয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।

• •

নজরুল বাঙলা দেশের 'সম্মানজনক নাগরিকত্ব' পেলেন। তিনি এখনো চাকাতেই আছেন।

• •

এখন জানা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় খনি গবেষণা কেন্দ্র চাসনালা খনি দুর্ঘটনার বার পাঁচেক আগেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

• •

"জরুরি অবস্থাকালেও ভারতের রাষ্ট্রশক্তির সংবিধানের ৩৫৯ (ক) ধারা অনুযায়ী কোনো নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার সীমাহীন, অনিয়ন্ত্রিত ও বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা নেই।" কৌসুলী ডি. মাখাকৃষ্ণান।

• •

ইন্দিরাজী জানিয়েছেন, "কুক্ষুতার ব্যাপারে নিজের আচরণের দ্বারা তিনি অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তবে সে দৃষ্টান্ত কতজন অনুকরণ করেছেন তিনি জানেন না।"

•

খবরে প্রকাশ, চীনের বাহাত্তর কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রীর বার্ষিক বেতন ৫০০ ইয়ান অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ১,৩০০ টাকা। এবং তিনিই চীন দেশে সর্বোচ্চ বেতন পেয়ে থাকেন।

• •

সংবাদে প্রকাশ, 'ফুটবলের রাজা' পেলে নিখোঁজ। নাইজিরিয়ায় যে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল, তিনি তার শিকার হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

• •

সাহিত্যে পুরস্কারের ব্যাপারে প্রেমেন্দ্র মিত্রই চ্যাম্পিয়ান। সাহিত্য আকাদামি, রবীন্দ্রস্মৃতি, শরৎস্মৃতি, কেন্দ্রীয় সরকারের শিশু সাহিত্য, আনন্দবাজার, যৌচাক, এমন কি সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার পর্যন্ত তিনি একাই কুড়িয়ে নিয়েছেন। যতদূর মনে হয় এগুলি তাঁর সাহিত্যকৃতিরই পুরস্কার।

• •

সভ্য-জায়া মেনকা প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছেন, "সাম্যবাদ কী করেছি? বিশেষ কিছু না। উঠেছিলাম মিসেস রায়ের বাড়িতে। খেয়েছিও তখানেই। চিংড়ির মালাইকাবিটা দারুণ।"

•

তুষারকান্তি ঘোষ বলেন, "হ্রেহ-ভাজন সভ্যের বন্ধ বুদ্ধি, বাস্তববোধ, দেশপ্রেম ভারতের পুনর্গঠনে সহায়ক হবে এ বিশ্বাস আমার আছে।"

রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবীণ ভট্টাচার্য বলেন, আজ পশ্চিম বাঙলার বুকে নতুন এক ইতিহাস তৈরি হল।"

রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি বলেন, "বাঙলার নানা অঞ্চল থেকে আজ লক্ষ লক্ষ যুবক এসেছে, তাদের অন্তরের বেতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

• •

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, রাধাপদ চৌধুরীর 'বরবারী' গল্প-গ্রন্থটির মাত্র কয়েক বছরে চোদ্দটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। অবশ্য প্রতি সংস্করণ মুদ্রণে না পাঁচশো করে ছাপা হয়েছিল, সেটা জানা যায় নি।

• •

খবরে জানা গেল, সন্তবাবুর বুদ্ধিজীবী সমাবেশে গৌরোহিত্য করেন ডঃ সত্যেন সেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ভাষণ দেন সুদিন ভট্টাচার্য। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে বলেন শ্যামল ভট্টাচার্য।

• •

যুব কংগ্রেস নেতা বাসবেবরণ খাস বলেন, "পুলিশ তাঁকে জানিয়েছে শহীদ মিনারে এত বড় জমায়েত তারা এর আগে দেখেনি।"

• •

খবরে প্রকাশ, ভারতীয় প্রসাধন দ্রব্যের বড় বাজার হাতেনিয়ে।

• •

শ্রীবংশীলাল জানিয়েছেন, বিরোধী নেতারা জেলে বেশ আরামে আছেন। এমন কি বাড়িতেও এমন চমৎকার ব্যবহার তাঁরা আশা করতে পারেন না। একজন প্রবীণ নেতাকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বেস হাউসে আটক রাখা হয়েছে। রোজ তাকে দুই কিলোরও বেশি গোরুর দুধ দেওয়া হচ্ছে। নিত্যকার খাবের সঙ্গে ফল, বাদাম ইত্যাদিও দেওয়া হয়। এই নেতার শিয়নে দৈনিক সরকারী খরচ প্রায় সত্তর টাকা।

• •

"আমি জানী নই, বুদ্ধিজীবীও ন ই"—ইন্দিরাজীর আ ত্ম স মালোচনা।

• •

"সেনসারের কাজ গণতন্ত্রের গাত্রীগিরি করা, কবর খোঁড়া নয়। ক্ষমতাসীন পার্টির সমালোচনা করার অধিকারই মুখ্য আবশ্যক। সৃষ্টি করবে।" বঙ্গে হা হ কো র্টে র অভিমত।

• •

জানা গেল, হুগলি নদীতে দ্বিতীয় সেতু তৈরির পথে আর বাধা নেই।

• •

নৃতত্ত্ববিদ সাংকালিয়ার মতে, উত্তর ভারতেই ছিল রাবণের লঙ্কা।

• •

"কোনো অস্থায়ী আইনের সাহায্যে স্থায়ী আইনকে বাতিল করা যায় না।" শান্তিভূষণ।

• •

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হিসাবানুযায়ী বেকারের সংখ্যা আশাতত দাঁড়িয়েছে ৮৩১৫ মিলিয়ান।

• •

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে ১৯৭৭ থেকে পরীক্ষার ফলাফল সময় মতো প্রকাশ করা হবে।

• •

হরিণ, বাঘ—কেউই বাঙলা দেশে যেতে চাইছে না বলে খবরে প্রকাশ।

• •

শান্তিপুরে সাহিত্যসাধক মোজাম্মেল হকের কবর ধ্বংস হয়েছে বলে প্রকাশ।

দর্পণ

সচিত্র সাপ্তাহিক

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

ষান্মাসিক প্রায়োগ টাকা

ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

চট্টগ্রামের ও চট্টগ্রাম পাঠানোর ঠিকানা ॥

৬১, নয়া চেলে, কলিঃ-১৩

পথের দাবী এবং মার্কসবাদ

"বামপন্থী লেখক" শিরোনামে জনৈক পত্রপ্রেরক রতি গুপ্ত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, যদিও পথের দাবী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রচনা এবং যদিও সে যুগে সাম্রাজ্যবাদই প্রধান শত্রু, তথাপি পথের দাবীর বিপ্লবের পথ মার্কসবাদ বিরোধী।

রতি গুপ্তরা চিরকাল মার্কসবাদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, তাঁরা কোনোদিনই জানবেন না এই সত্যটা যে, সমসাময়িক মূল দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করাটাই সুস্থবুদ্ধির মার্কসবাদ।

এই বিচারে 'পথের দাবী' মার্কসবাদী দৃষ্টিকেই প্রয়োগ করেছে। অথচ কৌতুকের বিষয়, এ দেশে পার্টির সাইনবোর্ড টাঙিয়ে যাঁরা মার্কসবাদের চর্চা করেছেন তাঁরা কোনোদিনই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে মার্কসবাদের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনেই করতে পারেননি। তাঁদের কর্মধারা আজো পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিকের অর্থনীতিক দাবি দাওয়ার মধ্যেই আটকে রয়েছে। তাই, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মার্কসবাদী পার্টিগুলির কোনো দিনই কোনো ভূমিকা তো নেই-ই, বরং এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কসবাদী পার্টিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা করেছে।

রতি গুপ্ত 'পথের দাবী'র বিপ্লবের পথে মার্কসবাদ দেখতে পাননি, তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক পুষ্ট সেউলিয়া বুদ্ধিজীবী বাসনে তা দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। আরো একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতেন ওই 'পথের দাবী'তেই শরৎচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে রাজনৈতিক পর্যায়ে উন্নীত করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত করে গেছেন।

রতি গুপ্তের অজ্ঞতা এতদূর গেছে যে, তিনি পথের দাবী থেকে উদ্ধৃতি তুলে শরৎচন্দ্রের মার্কসবাদ বিরোধিতার নজির দেখাতে চান।

রতি গুপ্তের মতো মার্কসবাদে-শান্বিত তত্ত্বলোকেরা চক্ষুদান করলে উপলব্ধি করতে পারতেন এ দেশে বিপ্লববাদ, যা সাম্রাজ্যবাদী পরিভাষায় সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা পেয়েছে, অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই জন্ম নিয়েছিল, এটিও একটি ঐতিহাসিক স্তরও বটে।

যেমন একদা রাশিয়াতে নিহিলিস্ট আন্দোলন আকার নিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্যন্ত এর গৌরবময় অধ্যায়।

কোনো জঁদরেল মার্কসবাদীও এই বিপ্লবী আন্দোলনের তাৎপর্যকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লঘু করে দেখতে পারেন না। আবার এই আন্দোলনপরিকারী বিপ্লবীরাই পরবর্তী পর্যায়ে মার্কসবাদী পার্টিগুলোতে যুক্ত হয়ে এ দেশে মার্কসবাদী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

একদা বিপ্লবী, পরবর্তীকালে মার্কসবাদী নেতৃবর্গ কোনোদিনই এই যোগসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে

সত্যাগ্রহ

ভালোবাসেননি। যে হেতু এ দৃষ্টিভঙ্গি হত খণ্ডিত, পরশ্রমজীবী।

রতি গুপ্ত 'পথের দাবী' থেকে নিজের প্রয়োজনে চের চের উদ্ধৃতি চয়ন করতে পারেন। কিন্তু মূল সত্যটা তাঁর জানা দরকার। সেটা এই, জন্মসূত্রেই কেউ মার্কসবাদী পরিভাষায় প্রলেতারিয়েত নন, প্রমিক মাত্রেই নয়, কৃষক মাত্রেই নয়। কারণ পেটি-বুর্জোয়া দর্শন শ্রমিক-কৃষকের মধ্যেও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শ্রমিক-কৃষককেও সচেতন ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন আয়ত্ত করতে হয়, প্রলেতারিয়েত হতে হয়। তবে শ্রেণী হিসেবে সচেতন হলে এঁরা যত দ্রুত 'শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনকে' আয়ত্ত করতে পারেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, দুই বিরাট শক্তির মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থানের জন্যে, তাদের পক্ষে 'শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন' আয়ত্ত করা একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। কাজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীও যে সচেতন হলে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার নায়কে পায়েন না, সেটাও ঠিক নয়।

শরৎচন্দ্র কৃষক শ্রেণীকে বিপ্লবী মনে করেননি, কারখানার শ্রমিককে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সচেতন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কোনোটাই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত নয়।

লেনিন, মাও সে তুঙ, হো চি মিন কেউই সাক্ষাৎ শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসেননি, কিন্তু তাঁরা সচেতন ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনকেই গ্রহণ করেছেন। কাজেই কথাটা হচ্ছে এই, এই দর্শনকে কে আয়ত্ত করছেন, এটাই সঠিক সূত্র। তা তিনি জমিদার-জোতদার-মিল মালিকের ছেলেও হতে পারেন আবার বাবুশ্রেণী হতে পারেন, কি শ্রমিক-কৃষকও হতে পারেন, সে প্রশ্ন অবান্তর।

মিহির আচার্য

বালী ষ্টেশনে একমাসে ১০০ ছিনতাই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্ধমান হাওড়া মেন লাইনে বালী উত্তরপাড়া এবং শেওড়াফুলি ইত্যাদি স্টেশনের দুরবস্থা যেমন বাড়তে তেমনি চুরি ছিনতাইও বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া রেল প্যাসেনজার্স কংগ্রেস দাবী করেছে যে শুধুমাত্র কোম্পগর থেকে বালী পর্যন্ত রাস্তায় টেনে ছিনতাই হয়েছে গত দু মাসে একশতটি। পকেট মারার ঘটনা ঘটেছে সত্তর জনের।

বালী স্টেশনে প্রকাশ্য দিনের আলোয় ছুরিকাহত হয়েছেন ডানকুনির অজিত চট্টোপাধ্যায় গত মাসে। নন্দনপুরের মৃণাল চক্রবর্তীর হাতঘড়ি ছিনিয়ে বেওয়ার সময় বালী স্টেশনের ওভার ব্রীজের তলায় দাঁড়ানো পুলিসরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাওড়া জেলার বালী এবং মেন লাইন এলাকায় পঁচিশ ডাকিল নম্বর বাস যেখানে দাঁড়ায় সেই রাস্তার উঁচু ঢিপি থেকে নীচে লাইনে নেমে বালী স্টেশনে যেতে গেলেতিনতর বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। বিশ হাত উঁচু রাস্তা থেকে স্টেশনে নামতে হলে কোন মতে উঁচু থেকে ব্যালেল করে পা চালাতে হয়। ঐ স্লাবটিতে সিঁড়ি তৈরী করলে সহজে নীচে নামা যায়। বালী স্টেশনে টিকিট কাটতে গেলে হাত ধরে ছুরায় বসায় একদল গুণ্ডা। তারা টাকা কেড়ে নেয়। এই গুণ্ডা ও ফেরেববাজরা বালী স্টেশনে বসেই আছে সব সময়। এদের গায়ে হাত দেওয়ার অধিকার নাকি হুগলীর কোনও পুলিশের নেই। তাই হু বছর ধরে এদের দৌরাত্ম্য চলছেই। বালী স্টেশনের জন প্রতিনিধি সাহেবও ঐ সব গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে পারছেন না বলে বিক্ষুব্ধ যুব কংগ্রেস নেতা শেখর সর্দার দর্পণ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন। প্রকাশ্য রাস্তায় বালী স্টেশন চত্বরে খুন জখম চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা জরুরী অবস্থাতেও এক চুল এদিক ওদিক বা পরিবর্তন হয়নি বলে শ্রীসর্দার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

ডি ভি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হুগলী জেলার এবং বর্ধমানের কিছু কিছু অঞ্চলে ডি. ভি. সির খালের জল নিয়ে চরম রাজনীতি চলছে। ডি. ভি. সির খালের দুর্গাপুর থেকে হুগলীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অসমতল অমসৃণ শীর্ণকায় বেগে খাল কোথাও কোথাও আপন গতি পথ হারিয়ে ফেলেছে। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ১নং ব্লক এলাকায় হরিপুর, জগন্মোহনপুর এবং বাঁধপুরে খালের উপর তিনটি ছোট্ট কাঠের পুল বানানো জরুরী। বাঁধপুর, গোপালপুর এলাকার মাঝখানে একটি লকগেট অবশ্যই দরকার। এই লকগেট তৈরী করলে প্রায় ১৪০০ বিঘা জমি চাষ হতে পারে। বাঁধপুরের খালে চলাচলের পুলের জন্য ডি. ভি. সির ইঞ্জিনীয়ার পরিদর্শন করেও গেছেন। তাঁদের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত ডি. ভি. সি. খাল রক্ষা করছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জল পরিবহন দপ্তর অর্থাৎ ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটার্স ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ তাড়াতাড়ি তদন্ত করুন এবং হাওড়া হুগলীর চাষীকে বাঁচান। অবিলম্বে পুল ও লকগেট তৈরী করুন।

সাজেমুল হক চৌধুরী
শিয়াখালা-

গ্রাম সমীক্ষা

অবহেলিত বেগমপুর জনাই গ্রাম

হুগলী জেলার মধ্যেই পড়ে। ধাবা চণ্ডীতলা। বড় লাইনে হিল হল করে ট্রেন থেমে যায় বেগমপুর। যমরাই? গাঁয়ের নাম। বেগমপুর রেল স্টেশন থেকে হেঁটে যান দেখা পাবেন ছোট গাঁয়ের। জনাই অবশ্য আরও দূরে। হুগলী জেলা সমিতির ব্যাণ্ডার্ডি বাবুর আমন্ত্রণে জনাই আসা। যমরাই গাঁয়ে আবদুল জব্বার সাহেব মুক্তোর ব্যবসা করেন, কারখানা আছে। তিনি বলেছিলেন আসলে অসুবিধা নেই। যমরাইয়ে নামবেন, লালবাড়ী ভ্যাবেন হয় নম্বর বাস কতাকাটাকে। হাঁ! দুর্ভাগ্য! ছয় নম্বর বাসের বাকি সময় জিজ্ঞাসা করতে নেই। পাঁচ নম্বরের অবস্থাও তথৈবচ। এরা কোথা থেকে আসে? কেন, উত্তরপাড়া থেকে। তিন ঘণ্টা অন্তর বাস মিলসেও সৌভাগ্যের কথা। জনাইয়ের শেষপ্রান্তে ইংরাজ সাহেবের নামের রাস্তার অবস্থা জঘন্য। জনাই হাটপুকুরের ছোট্ট স্কুল বাড়ী ভেঙে পড়ছে দিন দিন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে নিরক্ষরতা বাড়ছে।

বললাম, হ্যাঁ মশাই, মুসলমানরা বাকি সংখ্যায়ই করবে চারটে বিয়ে করে? গাঁয়ের লোক চ্যাংগেজ করলেন সত্তররা দুজনও চারটে বিয়ে করে না। আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং? খুঁজে দেখুন গাঁয়ের বেশীর ভাগ মুসলমানই পরিবার সচেতন। ভিতরে ভিতরে অনেক অপারেশন হয়েছে। তবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে নয়। পাশেই তো বাস্থাকেন্দ্র, খুব ভালো নাড়া চারদিকে। যমরাই থেকে আর একটু দূরে ন-পাড়ার মধ্যে গাঁয়ের বৃদ্ধ মানুষটি বললেন আমাদের সঙ্গে সভ্যজগতের যোগাযোগ কতটুকু বলতে পারেন? বেগমপুরে শিক্ষার হার কত? সংখ্যালঘু আদিবাসীদের মধ্যে অশিক্ষা বেড়েই চলেছে। গাঁয়ে স্কুল প্রাইমারী। পাশের দু মাইলের পরে বকতাজপুর মাদ্রাসা মিলবে। হুগলী জেলা বিজ্ঞান ক্লাবের ছেলেরা গ্রামে ঘুরে সমীক্ষা করছে। তাদের সুপারিশ বেগমপুরে ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্র চাই। অন্তত নিবারণের জন্য ভিটামিন এ বড়ি বিতরণ করা দরকার। একটি নাইট স্কুল করতে হবে। গ্রামের তাঁতা মসজিদ মেরামত জরুরী। বিজ্ঞান ক্লাব এখানকার কিছু কিংবদন্তী ও গল্প সংগ্রহ করছে।

বাঙালী উপাচার্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন একুশে ফেব্রুয়ারী যাবতাল হলে সভায় গান্ধীর আলোচনা সভায় নিজের পরিচিতি রাখলেন পুরোপুরি বাঙালী হিসেবে। এদিন বেলা দেড়টায় নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সভায় গান্ধী এসেছিলেন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। এই সাক্ষাৎকারেই সভাপতি হিসেব ডঃ সেন খাঁটি বাংলায় বললেন, সভায় গান্ধী কলকাতায় এসেছেন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে। তিনি কিছু বলবেন এবং আশা করি তিনি নূতন কিছু শোনাবেন। এই কয়েকটি কথাই তিনি বলেছেন এবং বলেছেন নিজের মাতৃভাষায়।

ঋত্বিক ঘটকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উমিশ'থ তিরিশ সাল থেকে ষাট দাল পর্যন্তও বাংলা ছবি হলি-উডের প্রভাব কাটাতে পারেনি, কিন্তু আশ্চর্য যে একটি মানুষকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি এবং তিনি হচ্ছেন ঋত্বিক ঘটক।

সত্তরোই ফেব্রুয়ারী সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত ঋত্বিক ঘটক-স্মৃতিসভায় এই কথা বলে প্রয়াত শিল্পীর প্রতি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ঋত্বিকের বহুমুখী প্রতিভা ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শিল্পবোধের ওপর পর্যালোচনা করে তিনি বলেন যে, ঋত্বিক ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালী।

ঋত্বিক ঘটকের নিকটতম সুহৃদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন যে, ঋত্বিক ছিল বেপরোয়া। এবং অসহিষ্ণু—ফলে তার মনের চাহিদার সঙ্গে প্রচলিত ব্যবস্থার একটা সামঞ্জস্য বুঝাপড়া করে নিতে পারেনি। শ্রীসেন ব্যক্তিগত জীবনে ঋত্বিক-সান্নিধ্যের অনেক ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে ঋত্বিক যা ভাবতো। তাই বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইতো। স্থান কাল পাত্রের বিচার তার কাছে তাই সময়িক গুরুত্ব পায়নি।

প্রখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বলেন যে, ঋত্বিকের বুকে ছিলো সার্থক শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করার অনন্ত জ্বালা। এই জ্বালার দাবাগ্নি দহনেই সে পুড়ে মরলো।

সভায় ঋত্বিক ঘটকের রচনা সঙ্কলন প্রকাশ এবং তার সমস্ত ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

এরপরে ফেব্রুয়ারী মহাবোধি সোসাইটি হলে বিজন ভট্টাচার্যের সৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক স্মৃতি সভায় ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট কবি ও সুবক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র এবং অভিনেতা গোবিন্দ চক্রবর্তী।

দর্পণ

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেন্ট্রাল) রুলস্-এর ৮নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বিবৃতি—

১। প্রকাশের স্থান—
৬১, মট্ লেন, কলি-১৩

২। প্রকাশকাল—সাপ্তাহিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৪। প্রকাশকের নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৫। সম্পাদকের নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৬। লভ্যাংশকারীর নাম—
হীরেন বসু
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—
১৩।১ জহরলাল দত্ত লেন
কলিকাতা ৪

৭। অংশীদারদের নাম—
কোন অংশীদার নেই

আমি ঘোষণা করছি যে, উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মত সত্য।

স্বাক্ষর ঃ
হীরেন বসু

পিছিয়ে কেন ?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জদির নানা রূপান্তর ইত্যাদির দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। কলকাতার কেন্দ্রীয় বিক্রয় কেন্দ্রই বিদেশের টেণ্ডারের দিকেও নজর রাখবে। যে যে দেশের টেণ্ডারে সফলতা লাভের সুযোগ আছে সেই সেই দেশের মত করে কাপড়ের বুনোন ও পাড়ের দিকে নজর রাখতে হবে। এ ছাড়া সিল্ক ও তসরের ক্লাফ', অস্ত্রান্ত সুতী ও সিল্কের বাহারী জামা কাপড়ের ওপরও নানা দেশের নজর উল্লেখযোগ্য। কে, এল, এম এয়ারলাইনসের অনেক মুখপাত্র বলেছেন, ইউরোপের ক্রান্তি-নেভিয়ান দেশগুলিতে প্রতি বছর সিল্ক ও তসরের চাহিদা এত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে যে তা যোগান দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমেরিকার বাজারে মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি, শান্তিপুর ও টাঙ্গাইলের দর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বালিয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতেও পশ্চিমবঙ্গের শাড়ির চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

এই অবস্থার সুযোগ নিতে এই রাজ্যের শিল্প দপ্তরেরই এগিয়ে আসা উচিত। অন্তত শিল্প দপ্তরের দুরদৃষ্টি সম্পন্ন তরুণ অফিসাররা চান পশ্চিমবঙ্গের তন্তুজ শিল্পীদের শিল্প-কর্ম পৃথিবীর দেশে দেশে পৌঁছে যাক যাতে এই শিল্পীদের অভাবও মেটে, অন্তদিকে এই রাজ্যের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও সহজ হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার মুইবাবী হলে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির৩ঃ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকেই এই সম্মেলনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য পঞ্চানন মণ্ডলকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সুশীল দেবরায়, যুগ্ম সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য ও ব্রজগোপাল মুখার্জীকে নিয়ে কিতাবিং কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ও প্রতিনিধিরা দু-মিনিট নীরবতা পালন করার পর সাধারণ সম্পাদক গত ২৯া নভেম্বর বিশেষ সম্মেলনে গৃহীত রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন এবং উপস্থিত প্রতিনিধিরা তা অনুমোদন করেন।

এই সম্মেলন সমিতির গঠনতন্ত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় পরিষদ ও জেলা পরিষদের প্রথম সভায় কর্মকর্তা সহ কমিটি নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পিত হয়, কেন্দ্রে ও জেলায় কার্যকরী কমিটি ছাড়াও সেক্রেটারিয়েট গঠন ও সদস্য চাঁদা দুই টাকার স্থলে তিনটাকা ধার্য করা হয়। এছাড়া সম্মেলনে শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধানের দাবীতে শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ২৩ দফা দাবীতে এবং সাংগঠনিক প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

সম্মেলন স্থলে নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম সভায় ১ জন কর্মকর্তা সহ ২২ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

পিতা নাজেহাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্তার কপালে ভুইল অশেষ লাঞ্ছনা।

সর্বশেষ সুসংবাদ : ভাষাবাগিশ সিদ্ধান্ত মশাইদের পরাস্ত করে আধুনিক পাঠ আশ্চিক জয়ের পতাকা উড়িয়ে ছে। বহুজনের আশীর্বাদধন্য ঐ যুবকের তেত্ত ২৯শে ফিব্রুয়ারে বিবাহ পণ্ড হয়েছে।

এর সঙ্গে যুক্ত মহলের সংবাদে প্রকাশ, যুব-ধ্বংকের ভয়ে আতঙ্কিত উল্লিখিত পাত্রের বৃদ্ধ পিতা-মাতা পুত্রের জীবন রক্ষার এই বিবাহানুষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ানোরই প্রেত্র মনে করছেন। ঘটনাটি নাকি পুলিশের দৃষ্টিতেও আনা হয়েছে।

ডেভিড হেয়ার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ও হেয়ার সাহেবের অধ্যক্ষতাধীনে পরিচালিত হত, পরে সোসাইটি তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পাঠশালাটি পরবর্তী সময়ে হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়েছে। স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠাকালে হেয়ার কমিটির একজন সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮২১ সালে তিনি সোসাইটির দেশীয় পাঠশালা বিভাগের সম্পাদক এবং ১৮২২ সালে স্থায়ী ইয়োরোপীয় সম্পাদক হন। স্কুল সোসাইটির একটি উদ্দেশ্য ছিল, নিজ ব্যয়ে মেধাবী ছাত্রদের হিন্দু কলেজে পড়ানো। কলেজের ইয়োরোপীয় সম্পাদক আরুথিন সোসাইটির কলেজীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের ভার নেন। ১৮২৪ সালে তাঁকে হিন্দু কলেজের একজন ভিজেটর রূপে দেখা যায়। হিন্দু কলেজের উন্নতির জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। ১৮৩৪ সালে মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে হেয়ার নানাভাবে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন এবং মেডিকাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ব্রামলির ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুর পর হেয়ার মাসিক বেতনে কলেজের সে ক্রে টা রি নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ সালে কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল স্থাপনেও তিনি অগ্রণী হন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এগুলি হেয়ারের বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি এবং এদেশে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর দান অবধীকার্য। তাঁর উপার্জিত অর্থের কিয়দংশ তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি, যদিও দানধ্যানের পুণ্যকর্মে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না।

হেয়ার সাহেবের স্বাধত্ত বিদ্যা কতদূর ছিল তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। আধুনিক কালোপযোগী শিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজি পাশ্চাত্য-বিদ্যা ও বিজ্ঞানশিক্ষার-প্রতি তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। এদিক থেকে তিনি উদারনৈতী ছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষাধার্মিক বা শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন বলে মনে হয় না। যে-অর্থে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। ১৮৩১ সালে, ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনে, হিন্দুকলেজের ছাত্ররা, বিশেষ করে ডিরোজীয়ানরা, তাঁকে একটি মানপত্র দেন। তার উত্তরে হেয়ার যা বলেন তা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি বলেন,

A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindoos happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India; and with the sanction and support of the government, and of a few leading men of your community, I endeavoured to promote the cause of educatoin.

হেয়ারের এই কথাগুলির ওজন ও নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণের শিক্ষার জন্য হেয়ার স হেব অনেক কিছু করেছিলেন, এইসব উক্তি এদেশীয় চরিতকারদের বক্তব্য-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র, facto নয়, ইতিহাসও নয়। সাধারণের জন্য শিক্ষার কথা বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও চিন্তা করতে পারেননি, তাঁরও শিক্ষাচিন্তা মধ্যবিত্তের ওপর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কেশবচন্দ্র সেন খানিকটা করেছিলেন। তাছাড়া হেয়ার পরিষ্কার বলেছেন যে শিক্ষা প্রচেষ্টায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন 'with the sanction and support of the Government' and 'of a few leading men of your country' —অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক ও নৈতিক পোষকতায় এবং তার সঙ্গে হিন্দু-সম্প্রদায়ের 'few leading men'-এর সহযোগিতায়। এই 'few leading men' কলকাতার কয়েকজন নব্যবনিক পরিবারের বংশধর, যাঁদের সঙ্গে হেয়ারের পরিচয় হয় ঘড়ির ব্যবসায়ের সূত্রে। সেকথা আগে বলেছি। শিক্ষাক্ষেত্রে হেয়ারের প্রচেষ্টা এবং তার পরিধি, উভয়েরই সীমাবদ্ধতা তাঁর নিজের এই উক্তির মধ্যেই পরিস্ফুট, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবান্তরক। শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে হেয়ারের নিজের কোনো বক্তব্য ছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে উদারবর্ণী পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন দেখা যায়। কাজেই তাঁকে, ব্রিটিশরাজের প্রথম পর্বে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রধান সহায়-সম্বলরূপে, আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'এলিট-শ্রেণী' গড়ে তোলার কাজে প্রথম উদ্‌যোগী ইংরেজ পুরুষ বলা যায়। এবং যেহেতু এদেশীয় এই ইংরেজি-শিক্ষিত এলিটশ্রেণী, আমাদের দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিন্ন সীমাবদ্ধ স্তর, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে খানিকটা দরায় হয়েছেন, সেইহেতু এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE : 40 PAISE

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলি আকবরের জবাব

(দর্পণের সঙ্গীত সমালোচক)

আলি আকবর কথা বলেন সঙ্গীতের ভাষায়। অন্য ভাষায় তিনি বাক্‌পটু নন। কিন্তু সেদিন (মহীশূর অ্যাসোসিয়েশন হল, ২৩ ফেব্রুআরি) তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন একটা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। সংখ্যাধিক্য প্রচারিত কোন বাংলা দৈনিকের মালিকগোষ্ঠী আলি সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুকাল যাবৎ একটা কিসফিস প্রচার চালাচ্ছেন যে, আলি সাহেব সম্প্রতি বাদক প্রদাদাৎ অভিত জিন্ন হয়েছেন এবং তাঁর মৈত্রিক অপকর্ষ ঘটেছে। বাক্‌চাতুর্যে এবং বাদকপ্রতিভায় আলি সাহেব কেন, তাবড় অনেক সাহিত্যিকই ঐ কর্তাবাবুদের সমকক্ষ নন। আলি সাহেব স্বীকার করে নিলেন যে, আধ্যাত্ম জিভের চেয়ে মস্তিষ্ক এবং অঙ্গ চালনার সাধনা অধিক করায় চারু বচন প্রয়োগে তিনি তেমন দক্ষ নন। সারা জীবন ধরে সুর সৃষ্টির নৈপুণ্যই তিনি অর্জন করেছেন, বচনবাগীশতা নয়। কাজেই আঙুলের তুলনায় জিভটা তাঁর চলে কম।

খাঁ সাহেবের বাগভঙ্গির জড়তা নিয়েও উক্ত পত্রিকার কর্তারা সভ্যতা ইঙ্গিত করেছেন এবং তাঁর চোখের রক্তিমতাকে সাক্ষী ডেকেছেন। খাঁ সাহেব পরিষ্কার জানালেন যে, ইঙ্গিতটি অভিসন্ধিমূলক, কেন না, সম্প্রতি পায়ের ব্যথার জন্য তাঁকে যে ওষুধ ব্যবহার করতে হচ্ছে তাতে কিছু চড়ুসিক ওণ আছে। সেই কারণে হয়তো তাঁর চোখ রক্তাভ দেখায়। তবে তিনি যে ঐ কর্তাবাবুদের মত গুরুদেব গোবাবাঁ এমন দাবি তিনি করেন নি। মদ্যপান ওদের মত অত না হলেও কিছু কিঞ্চিৎ তিনিও করেন কিন্তু বাজনার আগে কখনও করেন না।

খাঁ সাহেবের সাঙ্গীতিক জবাবটি সেদিন হয়েছিল আরও লাগসই। ছায়ানট রাগে তাঁর আলাপের স্মৃতি রসিক শ্রোতার মনে বহুকাল উজ্জ্বল থাকবে। ক্রুদদার মীড়, গমক ও আলাপ অংশে কোমল নিয় ব্যবহার যেমন সীমিত তেমনি সংযত, আয়ার খ্যালাজ ঘোড় এবং তান অংশে অপেক্ষাকৃত বেশী। যে গা মা রে-গ্রহের দ্বারা বিভিন্ন পরিবারে নট অঙ্গের উন্মোচন তাঁর মত প্রথম শ্রেণীর আলাপিয়ার হাতেই সম্ভব। তবে পরবর্তী দেশের গৎ ফেকালে আবেদনপুষ্ট সেকালে পূর্ববর্তী ছায়ানটের আলাপটি ছিল বুদ্ধি দিয়ে উপভোগ্য। উক্ত সংবাদপত্র কর্তাদের পেটোয়া বাদকটি যদি আলি আকবরের কাছে কিছুকাল তালিম নিতেন তাহলে ক্রুদদার আলাপ আর খ্যালাজ বা গায়কী আলাপের পার্থক্য বুঝতে পারতেন।

বিজয় বর্ষ ১৩৮২

জনতা অপেরা

নিবেদিত

পেয়ে হারানো

হারিয়ে পাওয়ার নাটক

স্ত্রী

আরো একটি ভয়াল ভ য়ঙ্কর

রহস্যে ভরা

কালপুরুষ

শ্রেঃ জনসমুদ্রের মহান নায়ক

স্বপনকুমার

শ্রোআপ নায়িকা

স্বপ্নাকুমারী

ফোন : ৪৪-০৭৯২

যাত্রাদলে ম্যানেজারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

"যাত্রাদলের প্রকৃত পরিচালক বলতে গেলে আমরা, দলের ব্যবসায়িক সাফল্যের চাবিকাঠি বলতে গেলে আমাদের হাতেই।"—একটি জনপ্রিয় যাত্রাদলের ম্যানেজার তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কথাটি উপহার দিলেন।

নাদা বাংলায় 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' কিংবা বাজার চলতি 'জনঅরণ্য' ছবির জনৈক ব্যবসায়ীর ভাত অনুযায়ী 'পালপিন থেকে হাতী' বিক্রী পর্যন্ত অনংখ্য অলিখিত দায়-দায়িত্ব রয়েছে যাত্রাদলের ম্যানেজারদের।

মনে করুন দলের আজ রাতে পালা গাইবার কথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোসাবায়। বায়নাদারদের সঙ্গে চুক্তি মত দল শো-এর দিন সকালেই সেখানে গিয়ে হাজির। অতএব শিল্পীদের খাওয়া দাওয়া এবং নির্দিষ্ট বিশ্রামের ওপর নির্ভর করবে পরের দিনের পালার সাফল্য। আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাপারে দায়ী থাকেন, দলের সঙ্গে ঘোরার জন্য নির্দিষ্ট ভ্রাম্যমান ম্যানেজার। তা সত্ত্বেও 'গদি ম্যানেজারের' দায়িত্ব কোন সময়েই চলে যায় না। শিল্পীদের বিশ্রাম ও খাওয়া দাওয়া যাতে সুষ্ঠু হয় বায়নাদারদের সঙ্গে সেই রকম চুক্তি করতে হবে ম্যানেজারকে। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে, তা রক্ষণল সহরই হোক বা অন্ত পাড়াগাঁ-ই হোক, একটা বস্তু ধারণা থাকা দরকার। যেখানে বায়না দেওয়া হচ্ছে, সেখানকার পথঘাট, পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা কতটা আছে, আর্থিক দিক ছাড়াও সেদিকটা ভাবতে হবে প্রথমে। তা ছাড়াও ঐ একই জায়গায় কোন্ দল কবে এর আগে বা পরে এবং পূর্ববর্তী বছরগুলিতে কি পালা অভিনয় করেছে, এবং জনসাধারণ তা কতটা কি ভাবে নিয়েছে এবং কি পরিমাণ টিকিট বিক্রী হয়েছে, উক্ত বায়নাদারদের ইতিপূর্বে টাকা 'চিট্' করার কোন ইতিহাস আছে কিনা, তার দলের সঙ্গে আর কোন্ কোন্ দলের 'গান' হচ্ছে, কাকে কোন দিন দেওয়া হচ্ছে, প্রথম দিকে বড় দলের গান দিলে তার দলের পালা মার খাবে কিনা—স্মৃতিশক্তি আর বুদ্ধির এত খেলা খেলতে হয় যাত্রাদলের ম্যানেজারদের।

মনে রাখতে হবে, আমি ম্যানেজার বলতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে যিনি সবরকম কাজের কেন্দ্রীয় কর্তা তাকে বোঝাতে চাইছি। এই তো যাত্রার এ বছরের মরশুমে তাঁর ধরার সময় হয়ে এলো। এখন চিৎপুরে নতুন পালার ফুরফুরে গন্ধ ছাড়ছে। এখন ম্যানেজারদের হাতে অনেক বাড়তি দায়িত্ব। তা ছাড়া চেতনা, বুদ্ধি, বিবেচনা, শিল্পবোধ—ইত্যাদি ব্যাপারে কোন কোন ম্যানেজার সরেস বলেও মালিকের কাছে তাঁর কদর বেশী। সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া আছে ম্যানেজারের হাতে। বাৎসরিক শিল্পী নির্বাচন, পালা নির্বাচন, নির্দেশক নির্বাচন, মুহরার নির্বাচন —এর সবটাই করতে হয় ম্যানেজারকে। বছরার শুরু কর পরনায় ঘর দেখতে হবে। কাজ করলে সব কাজই ম্যানেজারের।

অবশ্য যে দলে ম্যানেজার এতটা দায়িত্ব পালনে অক্ষম, কিংবা অধিনায়ক ম্যানেজারকে অতটা স্বাধীনতা দিতে রাজী নন, সেখানে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম রয়েছে।

'পাবলিক রিলেশন' বা জনসংযোগের কাজটিতে যে যত আধুনিক রুচির পরিচয় দিতে পারবেন, তিনি ম্যানেজারের কাজে তত দক্ষ। বিজ্ঞাপন ছাড়াও, রুচিসম্মত পাবলিক রিলেশনই যাত্রা পাবলিসিটি। অমুক দলের ম্যানেজারের আচরণটি দেখবার মতো—এই কথা সাধারণ মানুষকে কানে টানে। ম্যানেজারেরা এই আচরণটির ওপর কতটা গুরুত্ব দেন জানি না, তবে কিছু সংখ্যক দলে কিছু কিছু ম্যানেজার তার ব্যবহার দিকে তাকিয়েও এই রুচিটা আয়ত্ত করতে চান না।

একথা মানতেই হবে, যাত্রাদলে একজন প্রথম সারির অভিনেতার চাইতে ম্যানেজারের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম সম্মানের নয়।

তরুণ অপেরার

জুলিয়াস আসর

সিজার অবদান

রচনা/অম্বু বাগ

নির্দেশনা ও নাম ভূমিকায়

শান্তিগোপাল

প্রচারের আড়ম্বর নয়

বিচারে প্রবেশন নয়

মিউ য়ুয়েল বীণাপাণি অপেরার

সতী না অসতী ?

চলছে ৮১-র হিট পালা

সোনাডাঙার বৌ

শ্রেঃ ত-প-ন-কু-মার

সঙ্গে : গোরাশশী, সাধন, গৌতম, প্রতিমা, সীমা, শর্মিলা

১১৭, রবীন্দ্র সরণী কলকাতা-৬

পরিচালক : দুলাল চক্রবর্তী

৫৫-৭৪২২

আগামী ১২ই মার্চ, ৭৬

মিনার্ভা থিয়েটারে

জনতার অনুরোধে

জনতার দরবারে

ফুলেশ্বরী

পরিবেশনা : প্রদীপ অপেরা

হলে টিকিট

দিগ্বিজয়ের বিজয়গর্বে

হৃদয় মথিত দুটি পালা

পবিত্র পাপী

সোনার হরিণ

পরিবেশনা

নবরঞ্জন অপেরা

একটি দুঃসাহসিক বিষয়ের উপস্থাপনা

নবতম সীমান্তিক প্রযোজনা

লখিন্দরের লাশ

নাটক। নির্দেশনা : চিরঞ্জন দাস

৭ই মার্চ, রবিবার, সকাল ৯-৩০

রঙমহল

শোর দিন হলে টিকিট

শুভ্রীল নাট্যকোম্পানী প্রযোজিত স্মরণীয় পালা

স্ত্রীর শেষ পত্র | রচনা ● নির্দেশনা

নির্মল মুখার্জী

ঘর ভাঙার খেলা | সুর। পঞ্চানন মিত্র

১১৩, রবীন্দ্র সরণী কলকাতা-৬

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১২ই মার্চ '৭৬ ॥ দাম ৪০ প:

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসে আরও দুজন উপদেষ্টা নিয়োগের সম্ভাবনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীমতী যুব কংগ্রেস উপদেষ্টা মণ্ডলীতে আরও দুইজন উপদেষ্টা নিয়োগ করার জন্য কোন কোন মহল থেকে সঞ্জয় গান্ধীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটি গঠনের পর থেকেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নতুন কারদায় মোড় নিয়েছে। দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে যা হয়ে মেলধ্যেও হচ্ছে। যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বর্তমান ক্ষমতাসীন যুবুনেতাদের সঙ্গে পুরোপুরি অসহযোগিতার পথ নিয়েছেন।

রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি বারিদবরণ দাস ১৪টি জেলা কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন এ্যাডহক কমিটি গড়ে দিলেও এখনও সাতটি জেলার নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। এর কারণও কিছু যুব নেতার অসহযোগিতা।

বারিদবাবু সাতটি জেলার নতুন কমিটি ঘোষণা করার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচনা করছেন। গঠনতন্ত্র অনুসারে সভাপতি এক সিদ্ধান্তে জেলা কমিটি ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা একতরফা সিদ্ধান্তের কোন ঝুঁকি বারিদবাবু নিতে চান না। বরঞ্চ কৌশল হিসেবে বারিদবাবু বিপক্ষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছেন।

বারিদবাবু নানাভাবে নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করারও চেষ্টা করছেন। এর ফলে প্রিয় ব্রত গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে। অবশ্য বারিদবাবুর এই নয়া কৌশল কতটা সার্থক হবে তা এখনই বলা সম্ভব

(সংবাদের পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

শঙ্কর ঘোষ দিল্লীতে মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রভাব খর্ব করার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে রাজ্যসভায় নিয়ে যাচ্ছেন। শুধু রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার জন্যই শঙ্করবাবুকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা শঙ্করবাবু নিশ্চিত ভাবেই কেন্দ্রের "মন্ত্রীসভার যোগ দেবেন। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা অথবা অর্থ-দপ্তরে তাঁকে নেওয়া হবে।

রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে নিয়ে শঙ্করবাবুকে দিল্লীতে পাঠানোর পেছনে সিদ্ধার্থবাবুর একটা উদ্দেশ্য আছে। বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের তিন জন মন্ত্রী আছেন। এর মধ্যে দুইজন রাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এবং এক-জন উপমন্ত্রী। দুইজন রাষ্ট্রমন্ত্রীই একদা সিদ্ধার্থবাবুর আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন। এবং কেন্দ্রে রাষ্ট্রমন্ত্রী দুইজনের বর্তমান প্রভাবের পেছনে সিদ্ধার্থবাবুর অবদান ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

রাজ্য কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে দুই রাষ্ট্রমন্ত্রী ব য় সুখে চলেছেন। এবং এই চলাটা অনেক সময়েই সিদ্ধার্থবাবুর পদ-দুসারে হয়নি। ফলে রাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় সিদ্ধার্থবাবুর বিরাগভাজন হয়েছেন।

সিদ্ধার্থবাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এমন একজন যোগ্য ব্যক্তি চান যিনি তাঁর খুব বিশ্বস্ত হবেন। কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী শঙ্কর ঘোষকে সিদ্ধার্থবাবুই রাজ্য মন্ত্রিসভায় নিয়ে এসেছেন।

শুধু মন্ত্রী হিসাবেই নন একজন তাত্ত্বিক হিসেবেও শঙ্করবাবুর বেশ খ্যাতি আছে। চণ্ডীগড়ে গত এ আই সি সি অধিবেশনে অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর ওপর শঙ্করবাবুর বক্তৃতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রশংসা পায়।

এবার রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে শঙ্করবাবুর মনোনয়নের পেছনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনেকেরই সমর্থন ছিল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা শঙ্করবাবু মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন। এবং সেক্ষেত্রে অন্তঃদলের প্রভাব কিছুটা খর্ব হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

ভুত তাড়াতে দেবী রায়ের ডাক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভুত তাড়াতে সাধারণতঃ ওঝা ডাকা হয়ে থাকে। কিন্তু এবার ওঝার বদলে ডাক পড়েছে গোয়েন্দা দেবী রায়ের। সংবাদে প্রকাশ বিউ আলিপুরের অনেক অফসর প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট ভূতের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোয়েন্দা দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন।

জানা গেছে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর লোকজন যখন তখন ভূতটির দর্শন পাচ্ছেন। কখনও কখনও ভূত বাড়ীর লোকজনকে এটা সেটা ছুঁড়ে মারছে। যার ফলে কয়েকজন আহত হয়েছেন। যদিও এখন ভূতটি জিনিষপত্র ছুঁড়ে মারা বন্ধ করেছে তবুও তার উৎপাত অব্যাহত আছে।

গোয়েন্দা হিসেবে দেবী রায়ের খ্যাতি আছে। দেখা যাক এক্ষেত্রে তাঁর গোয়েন্দাগিরি কতটা কার্যকরী হয়। প্রীয়ার বর্তমানে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট।

নো হট ড্রিঙ্কস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্লেন চালাতে যাবার আগে পাইলটদের 'প্রি ফ্লাইট চেক' নামে একটি মেডিক্যাল চেকে যাবার যে নিয়ম ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে এয়ার চিফ মার্শাল পি. সি. লাল চালু করেছেন তাতে পাইলটেরা পড়েছে বেজায় মুস্কিলে। আগে পাইলটেরা দলবেঁধে এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে বসে হইস্কী, জিন, রাম আর বিয়ারের ফোয়ারা ছোটাতো, এখন সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চা বা কফি। প্লেন চালানোর আগে 'হট ড্রিঙ্কস' খেলে কি কাবেলা হতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা এখন বেশ ওয়াকিবহাল। দমদম এয়ারপোর্টে চব্বিশ ঘন্টার জন্য দুজন ভাক্তার ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনেসের মেডিক্যাল রুমে অপেক্ষা করেন পাইলটদের জন্য। একটি ছাপানো ফর্ম নিজে হাতে লিখিত ভাবে পূরণ করতে হয় পাইলটদের। তাতে থাকে বিভিন্ন বিষয়ে বৃদ্ধির সব প্রশ্ন। এবং সবগুলি সঠিক ঠিকমত পূরণ হলে তাকে শারীরিক পরীক্ষাও দিতে হয়। এবং সব মিলিয়ে যদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয় তাহলেই ডাক্তার লিখবেন "এই পাইলট এখন নেশাগ্রস্ত নেই।" এবং এই ছাড়-পত্র ছাড়া কোন পাইলটেরই প্লেনে কম্যাণ্ড নেবার অধিকার নেই।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের মেডিক্যাল অফিসাররা মনে করেন পাইলটদের 'প্রি ফ্লাইট চেক' চালু করার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম আপত্তি করলেও পাইলটরা এখন বেশ লক্ষ্মী ছেলের মত 'মেডি-ক্যাল চেক' করে আসে যাতে মাসের শেষে অন্য কারেলা না হয় —সে প্যাকেটটি ঠিক মত বাড়িতে পৌঁছে।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা সাবধান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শিয়ালদহ রেল পুলিশ একটি মামলা নিয়ে খুব ব্যস্ত। মামলাটি অতি সাধারণ একটি ছিনতাইয়ের মামলা হলেও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে আর একটি রঙ্গ ঘটনা। যার নায়ক এক দুর্দর্শন যুবক। যুবকটি ষ্টেশনে অপেক্ষমান এক মহিলা যাত্রীর কানের দুল ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে। ধৃত যুবকটিকে পুলিশের হাতে দেয়া হয়। ঘোষা যাওয়া কানের দুলের মালিক মহিলা যাত্রীটি পুলিশের কাছে এজাহার দিয়ে গিয়ে ধৃত যুবকটিকে দেখে চমকে ওঠেন। এরপর মহিলাটি যা বলেন তাতে আরো একটি অপরাধের ভয়ঙ্কর কালো পর্দা সরে গেল। মহিলাটির বিবৃতি অনুযায়ী এই যুবকটি বেশ কিছুদিন আগে তাদের বাসস্থান সোদপুরে যায় এবং তার বাবাকে বলে, আমি বামবাই থেকে এসেছি, আপনার ছেলে আমাকে পাঠিয়েছে। আপনার মেয়েকে দেখবো। তাড়া-তাড়ি ব্যবস্থা করুন। বেল ষ্টেশনে বহু ছেলেমেয়েকে রেখে এসেছি। যুবকটির বক্তব্যে গৃহস্বামী অর্থাৎ অভিযোগকারিনীর পিতা ব্যস্ত হয়ে বলেন. সেকি কথা, ষ্টেশনে কেন, এখানে নিয়ে এস। অতঃপর যুবকটি ষ্টেশন থেকে তার ছেলেমেয়ে এবং বউকে নিয়ে অভিযোগকারিনীর বাড়ীতে আসে।

যথারীতি মেয়ে দেখা পর্ব সমাপ্ত হল। মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে তাই মেয়ের বাড়ী থেকে অনুরোধ করা হল যুবকটিকে এক রাত্তির থেকে যাবার জন্য। যুবকটি রাজী হলেন থাকতে। আদর আপ্যায়ন কোন কিছুরই ত্রুটি হল না। আনন্দে কেটে গেল একটি রাত। কিন্তু পরদিন সকালে গৃহস্বামীর মাথায় হাত। যে ঘরে যুবকটিকে সসমি-ব্যবে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেই ঘরেই গৃহস্বামীর সর্বস্ব ছিল। যুবকটি সব কিছু নিয়ে তখন পলায়ক।

ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত যুবক-টিকে সেই ঘটনার নায়ক বলে অভি-যোগকারিণী সনাক্ত করেন এবং এই মহিলাটিই সেই ঘটনার পাত্রী থাকে দেখতে এসে যুবকটি তাদের সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিশ শুরু থেকে. ধৃত যুবকটির নাম জানাবো হয়নি, কারণ নাম প্রকাশ হলে ধৃত যুবকের সাথীদের খুঁজে বার করতে অসুবিধা হবে বলে পুলিশের ধারণা।

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সাহিত্য-ঐতিহ্য ঃ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরাজ-শাসকের সহযোগী একটি মধ্যশ্রেণীর তৈরী করল না শুধু তার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া কী ভাবে আমাদের রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্যশিল্প তাবৎ উপরিতলকে জব্দ করে নিল, সে দুরন্ত ঘটনাটাও স্মরণ করতে হবে। উনিশ শতকে কোনো বুর্জোয়া রেনেসাঁস আমাদের দেশে হয়নি, সামন্ততান্ত্রিক কঠামোকে আঁকড়ে ধরে' আধনিকতার নাম করে' ইংরেজিয়ানাকে অঙ্গে মতো মকশো করেছি। তথাকথিত রেনেসাঁস-ওয়ালারা নিজেদের সাহেবদের জুনিয়ার পার্টনার হিসেবে ভেবে এমন সব সংস্কার নিয়ে মাথাব্যথা শুরু করলেন বেঙলো খোদ 'ব্রিটিশ প্রজার' কাজ। অর্থাৎ ধরে নেয়া হল ইংরাজ-শাসন ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং নেটিভদের পরম সৌভাগ্য যে ইংরাজকে প্রভু হিসেবে পেয়েছে। এই ধারণা থেকে মূল ইংলণ্ডে বসে সেখানকার প্রজা যে সব সংস্কার নিয়ে সেদিন মাথা ঘামাচ্ছিল এখানকার প্রজারাও তারই অনুকরণ করতে শুরু করলেন। আসল কথা ইংরাজ প্রজার দৃষ্টিভঙ্গিতেই এদেশে 'নেটিভ প্রজা' সমস্যাগুলোকে ধরতে চেষ্টা করলেন। এ দেশটা যে একটা কলোনী এবং এখানকার মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজ সরকারের যে তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক, এই বোধ প্রশ্নটাই ভুলে যেতে ভালোবাসলাম আমরা।

বলা বাহুল্য ইংরাজ-শাসক মনে-প্রাণে এমনি একটি মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল বলতেই হবে। যেমন করে এই বুদ্ধিজীবীর মনোযোগ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সরে গিয়েছিল তেমনি তাঁরা ভুলবার্তে জড়িত থাকার কারণে তো বটেই, অধিকন্তু তাঁদের আশ্রিত বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে জমিদারি ব্যাপারটার শ্রেণীচরিত্রটি আড়াল পড়ে গিয়েছিল। যথা পরনা যেমন করে বাজারে চালু হয়ে যায় তেমনি জমিদারির মতো। একটা গর্হিত ব্যবস্থা সমাজে দিব্যি জলচল হয়ে গেল। এই ব্যবস্থা দ্বারা যারা উপকৃত তাঁরা তো বটেই, এমনকি যারা এ-দ্বারা শোষিত তাদেরও তোলাবার ব্যবস্থা হল। দিনগতে শোষিত কৃষকটিও একদা এই ধাঁধাটা আবিষ্কার করতে পারল না যাঁর সঙ্গে জমির শারীরিক কোনো সম্পর্কই নেই তিনি কোন্ অধিকারে তার সম্পদ দাবি করেন? ক্রমে সূর্য যেমন সত্য জমিদারও তেমনি সত্য হয়ে উঠলেন। চাষির দুরবস্থার জন্য কোনো জমিদারই দায়ি নন, দায়ি তার কর্মফল, তার অদৃষ্ট। এক-যোগে চাঁড়ো পেটালো হল পল্লীর যা কিছু উন্নতি জমিদারের জন্যই। 'সৎ' জমিদাররা গ্রামে ইস্কুল খুলেছে, ডাকঘর খুলেছে, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে, জমিদারের উদারতায় গ্রামে 'গুড উলস' হয়, প্রজা-বিদ্রিবিদে সকলের সেখানে বিশ্রাম।

কাজে কাজেই জমিদার থাকাটা জরুরি, গ্রামের সার্বিক উন্নতির জন্যে। 'অসৎ' জমিদার গ্রামের সর্বনাশের কারণ।

একটা 'অসাধু' ব্যবস্থাকে এই ভাবেই গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেবার আয়োজন।

চাষি যদি সচেতন হত তবে বুঝতে পারত 'সৎ' জমিদারের তথাকথিত ভালো কাজগুলির খরচ-নির্বাহ প্রজাদের উপর আইনী-বেআইনী আদায়ের দ্বারাই গৃহীত। জমিদার যেমন পারতপক্ষে জমির জন্যে এক কাঁদিও খরচ করেন না তেমনি গ্রামের ভালো কাজগুলির খরচও তিনি বহন করেন না। খরচ আসে প্রজাদের কাছ থেকেই কোনো না কোনো প্রকারে।

এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রচারে যেমন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে' ইংরাজের চিত্তপ্রসাদের কথা বলা হয়, শাসক হিসেবে এদেশে তাদের সহিত্যুতার কথা বলা হয়, এমন কি কেউ কেউ 'ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ' ভাবতেও ভালোবাসেন তেমনি 'সৎ' 'অসৎ' জমিদারের কথাও প্রচার করা হয়। অথচ সমাজ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে তাবৎ জমিদারি ব্যবস্থাও অন্যান্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, শোষণই যার মূল কথা, সেখানে সৎ অসতের কোনো প্রশ্নই নেই। সেই জমিদার মহাত্মাই হোন কা মহাধির হোন্, চেহারাটা একই। ব্যাপারটা চরমে দাঁড়ায় যখন ইস্কুল-পাঠ্য কেতাবে 'পুণ্যাহে' রবীন্দ্রনাথ কেমন আভিজাত্যের ঝেড়া ডিঙিয়ে প্রজাদের সঙ্গে এক আসনে বসে জমিদারের আদর্শ নিদর্শন বেখে-ছিলেন বলে' গুণকীর্তন করা হয়। আসলে এই পুণ্য দিন কার? খাজনা আদায়ের এই মহরৎ নিশ্চয়ই দুঃখ প্রজার কাছে আনন্দের দিন নয়। রবীন্দ্রনাথ এই 'পুণ্যাহ' ব্যাপারটাই যদি তুলে দিতে পারতেন তাহলেই তাঁর পক্ষে সত্যিকার আদর্শ কাজ হত। এই পুণ্যাহের আয়োজনটাও যথেষ্ট আইন সঙ্গত ব্যাপার বলে' ধরা যায় না। আইনের বাইরে জমিদার যে কত কৌশলে বেআইনী আদায় করেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। পাবনার অলন্ত কৃষক-বিদ্রোহ তার প্রধাণ। মহর্ষি জমিদার দেবেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত।

রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ জমিদারের এই চিরস্থায়ী অধিকারকে স্বাভাবিক বলে' গণ্য করল। এবং তাবৎ মানুষকে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত করল। দীর্ঘ দুই শতাব্দী এই প্রধান বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল না। জমিদারি আশ্রয় করেও মনীষীগণ 'ভারত পথিক' মহাত্মা, আদরের 'প্রিন্স', মহর্ষি ইত্যাকার উজ্জ্বল বিশেষণে ভূষিত হয়ে উঠলেন। ভূস্বামী ও তাঁর আশ্রিত সমাজ-ব্যাখ্যাতারা এই কিম্বদন্তীকে সইয়ে দিলেন।

মিহির আচার্য

একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাকে চাকতে গিয়ে সেদিন থেকে মধ্যশ্রেণী যে দু মুখো নীতি গ্রহণ করলেন তার ফলে আমাদের সামাজিক ইতিহাস অর্থনত্য বা অর্ধ বিথ্যার ঘুলিয়ে উঠল।

জমিদারের শ্রেণীদর্শন ব্যাপক জনগণের দিক্‌নির্দেশ হয়ে উঠল।

জনগণের কাছে প্রভাবশালী হাতিয়ার হিসেবে সাহিত্য,এই শ্রেণীর তুলণি বহন করতে এগিয়ে এল।

বঙ্কিমচন্দ্র তার ভগীরথ। মাইকেলের ঐশ্বর্যধান্য কবিত্ব ব্যাপক পাঠককে অভিভূত করতে পারেনি। 'বাংলার কৃষক' দীর্ঘকালিবদ্ধে বাঙ্গের কৃষক সমাজ সম্পর্কে আশ্চর্য বস্তুবাদী উদ্‌ঘাটন থাকা সত্ত্বেও শ্রেণী-আত্মগতাকে তিনি পরিহার করতে পারলেন না। সামাজিক উপস্থানে তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি জমিদার, কিন্তু শ্রেণীগত নীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র—তাঁদের কারুর সঙ্গেই কৃষকের বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। কারণ তাঁদের 'চরিত্র' হিসেবেই ভাবা যায়, জমিদার না হলেও ক্ষতি নেই। এই প্রসঙ্গে 'নীল দর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' সম্পর্কে বঙ্কিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত 'ভালো জমিদার' 'মন্দ জমিদার'-রূপ বিদিনে তাঁর অপূর্ব দৃষ্টিকে বন্ধক দিয়েছেন। এবং একই শ্রেণীস্বার্থে এ দেশে ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদের জয়গান করেছেন।

এক বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করেই তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চরিত্রের এই দোটানা আবিষ্কার করা যায়। যিনি 'বাংলার কৃষক' লেখেন, যিনি কমলাকান্তের দপ্তরের তীক্ষ্ণ সরস বর্ণনায় লোক চরিত্র-সহ 'বিড়ালের' মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্রের' আদর্শের আদর্শ বিশ্লেষণ করেন তিনিও শ্রেণী-দায়িত্বে 'বিপ্লবের অমুমোদক' হতে পারেন না। একেক সময় মনে হয় বঙ্কিম আত্মবর্শন করছেন। সে যুগে বঙ্কিম এ বিষয়ে সচেতন, আত্মপাপী বলেও ভুল বলা হয় না।

গল্পে আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলার মালা রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিয়ে সাহিত্যে কবিকেই তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ক'রে গেছেন। গল্পের সত্য-মিথ্যা যাই থাক না, এটাকে প্রতীক হিসেবে নেয়া যেতে পারে। শ্রেণী-গত স্বার্থেই বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করবেন, এইটেই স্বাভাবিক। পিতৃপিতামহসূত্রে প্রাপ্ত জমিদার-পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য পুত্রের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার প্রতিভাকে তা বি ক করেছেন। স্বাধনা আশ্রয় করতে রবীন্দ্রনাথ মহলে মহলে ঘুরেছেন, যা নাকি গ্রাম্যপ্রকৃতি ও মানুষ সংযোগে তাঁর চেতনার প্রকৃতি,ও মানবপ্রেমের বক্তা বইয়ে দিয়েছিল। জমিদারি ও কবি-সত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে অন্তত সুসমঞ্জস করেছিল তাঁর মনোভঙ্গিকে। 'সৎ' জমিদারের দানে গ্রামের উন্নতির ধিয়োরি কবির মনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। জমিদার ও প্রজা দুইই স্বাভাবিক নিয়মের ফল, রবীন্দ্রনাথ দুইয়ের মধ্যে শ্রেণী-গত বিরোধের সত্যকে অস্বীকার করেছেন। বরং যাঁরা সরল, নিরীহ প্রজাদের উনকানি দিচ্ছে তাঁদের সম্পর্কে 'রায়তের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন "ইদানিং পশ্চিমে বলশেভিজম্, ফাসিজম্ প্রভৃতি যে সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্য-কারণ, তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, ওগুণ্ডিয়ের আবড়া জমল।" বলে' রায় দিলেন "রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।" রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন "আমি জানি জমিদার জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।" স্বীকার করেও জমিদারি ছাড়তে পারেন না কেন? রবীন্দ্রনাথের যুক্তি: "প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড় জমিদারের আওতায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে।...মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানেনা। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তথাদক যাবক রায়তের ফুরা যে কত-সর্বনোশ তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অহংকারেরই অটলপ্ত দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-আলানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিদ্যেকিতায় তাদের সংকোচ নেই।" দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, এই সব অবিযুক্তের কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ রায়তের হাতে জমিদারি ছেড়ে দিতে রাজি নন্। এই ভূমিকাটির রচনাকাল ১৯২৬। যতদূর স্মরণ করতে পারছি, ১৯৮৮এ প্রজাদের বার্থে আইন পাশ করবার চেষ্টা হলে মুষ্টিমেয় মুসলমান সভ্য বাদ দিলে তাবৎ হিন্দু জমিদার ও বঙ্গীয় আইন সভায় বরাজ্য পার্টির সভ্যরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি আমাদের পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ক যোগ করেছিল। যেহেতু এর সঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলমান কৃষকদের বার্থ জড়িত ছিল সেহেতু নেতাদের এই বিরুদ্ধাচরণকে তারা সুনজরে দেখতে পারেনি। উত্তর-কালে জাতীয় আন্দোলনে যেকে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সরে যাওয়ার ইতিহাস এইভাবেই রচিত হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজের মনে এই সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভবিষ্যতের সম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

বিশাল রবীন্দ্র-রচনার 'বিশ্ব-মুখীনতা' 'মানবতাবাদ' জাতীয় উচ্চ আদর্শের জয়গান রয়েছে, কিন্তু জমিদার-প্রজার খাত-খাদকের বাস্তব সম্পর্কের বিশ্লেষণ নেই। 'দু বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের শোষণকে তিনি "এ জগতে হায় সেই বেশি চায় যার আছে ভূরি ভূরি" জাতীয় দার্শনিকতার আলোকে দেখাতে চেয়েছেন। উৎপীড়িত 'উপেনের' মনস্তত্ত্বে তিনি নিজের মানসি-

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তার পর শিল্পী সাহিত্যিকদের তর্কবিতর্ক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার কতখানি ফারাক সৃষ্টি হয়েছে তা বোঝা গেল প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সম্প্রতি রাজভবনের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলনে। প্রায় দেড়ঘণ্টা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তার পর রাজভবনের গেটের কাছে বেরিয়ে এসে একদল তরুণ লেখক শিল্পীদের ওপর ভেঙে পড়ে ওঁরা কোদাল, বালতি কিছুই পান না। তাই তাদের চুল্লির ছাই ফেলতে অসুবিধে হয়।

• •

চীফ সেক্রেটারি বি. আর গুপ্ত জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের অবস্থা শান্ত। মুখকিল হয়েছে কী, ওখানে কি ধরণের অশান্তি হয়েছিল তাই আমাদের জানা নেই।

• •

"বিচার বিভাগের উপর আস্থা হারালে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে"—জানিয়েছেন ডঃ জগন্নাথ মিশ্র।

• •

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, "বিয়োগীদের স্তরে পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যাতে জরুরি অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ওঁরা ঘাপটি মেরে রয়েছেন, সুযোগ পেলেই হিংসাত্মক কাজ শুরু করবেন।"

• •

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় ঘোষণা করেন, "প্রমিক স্বার্থে এ-সরকার যে কাজ করেছে আর কোনো সরকার তা করেনি। যাঁদের কথা বলার কেউ নেই, যাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেউ নেই, তাঁরা আজ বুকভে পেরেছেন ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের পাশে আছেন।"

•

জানা গেল, শ্রীসঞ্জয় সেনের সমস্যা হাড় নিয়ে। অনুধাবন যুবে হাসিটি লেগেই আছে, কথাগুলো তেমনি চোখা।

• •

"গণতন্ত্রের অর্থ ভোটের রাজনীতি নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের রাজনীতিতে ভোটের ভূমিকাই সব থেকে বড়।" সঞ্জয় গান্ধী।

মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীসখারাম খাণ্ডেকর ১৯৭৪-এর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কারের মূল্য যথারীতি এক লক্ষ টাকা।

ফরাসি কমুনিস্ট পার্টি ভবিষ্যতে মস্কো লাইন বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে হবে বলে' ফরাসি প্রতিনিধি সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসেই জানিয়ে দিয়েছেন।

•

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গে সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে জানিয়েছেন, "তাঁর পার্টি প্রতিক্রিয়াচক্র ও ফাসিবাদের সংগ্রামে পুরোধা, তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল কর্মধারার সমর্থক।"

•

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওয়ের মতে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখনো পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করছে, এই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে।

•

"প্রধানমন্ত্রীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।"—বাজা আব্বাস।

•

"ডাক্তারের ছেলে বলেই রুগীকে চিকিৎসা করার যোগ্যতা গজায় না। উত্তরাধিকার ভালো, কিন্তু রাজনীতিতে নয়।" পত্রাংশ, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি।

•

জানা গেল, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে প্রায়ত অধিক ঘটকের পত্নী সরমা ঘটককে দশ হাজার টাকা দান করা হয়েছে।

মওলানা ভাসানী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। জানা গেল, তাঁর অবস্থা সন্তোষজনক।

•

"জনগণের প্রতিনিধিদের চেয়ে কী করে বিচারকরা বেশি জানবেন, কোনটা জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক!" আইনমন্ত্রী শ্রীগোখলের জিজ্ঞাসা।

•

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড কিসেল কানটোকে "আন্তর্জাতিক দস্যু" সম্মানে ভূষিত করেছেন। যেহেতু কানটো অ্যাংগোলার গৃহযুদ্ধে বারো হাজার সৈন্য পাঠিয়েছেন।

•

কেন্দ্রীয় যুব কংগ্রেস জাতি গঠনের কাজে দেশের যুবকদের শতকরা ৫ ভাগকে নিযুক্ত করবেন বলে' জানা গেল। শ্রীমতী সোনিয়া মতে, বিরোধীরা এতাবৎকাল এদের ভুল পথে চালিত করছিলেন।

•

বিদেশী সহযোগিতায় ভারত তার প্রথম উপগ্রহটি আকাশে উৎক্ষিপ্ত করবে বলে' জানা গেল।

•

সুইডেনে বাঙলা দেশের আশ্রয়প্রার্থী আবদুর রাজ্জাককে ধরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও ইতিপূর্বে রাজ্জাক সাহেব পদত্যাগ করেছেন বলে' খবর এসেছিল।

•

রাজ্যপাল চেন্না রেড্ডির মতে, হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা এবং সে-সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই।

• •

খবরে প্রকাশ, 'হাম দোনো হামারা দোনোরা' বাস্তব রূপ নিতে আইন হচ্ছে।

রাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফার হোসেন জানিয়েছেন, ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ন হাজার সাঁইত্রিশ জনকে মিসায় ও ভারত-রক্ষা আইনে আটক করা হয়েছে।

•

দর্শকদের বিবরনীতে জানা গেল, পুত্রের জনপ্রিয়তা থেকে মা ইন্দিরা গান্ধীর সভায় লোক বেশি হয়েছে।

পি. এল. টি-র নতুন নাটক : সেদিন কোথায় ?

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, চল্লিশ বছর পেরোয়নি এইসব লেখক, যথা অলোকরঞ্জন-তরুণ সান্যাল-বীণের বন্দ্যো-সুনীল-শীর্ষেন্দু-নিমাই প্রমুখ ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর রাজভবনে নিমন্ত্রিত লেখক।

• •

প্রগ্রেসিভ পাবলিশিটি মারফিসের মৌজন্যমূলক বিজ্ঞাপন :

গ্রামে চলো পণ নিও না
নগর দেয় নির্দেশ।
ওরেই আবার বাঁচবে জাতি
গড়বে আবার দেশ।

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

খবরে প্রকাশ, ভারত মুদ্রাস্ফীতি রোধ করেছে।

• •

পয়লা মার্চ থেকে ডাক ও তারের অনেক কিছুর মাশুল চড়েছে।

• •

"কেরলমাত্র কর বসিয়েই সমাজতন্ত্র আনা যায় না।" বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবেড্ডি।

• •

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযোষের কাছে শ্রমিকদের ডোমেরা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা কোদাল, বালতি কিছুই পান না। তাই তাদের চুল্লির ছাই ফেলতে অসুবিধে হয়।

• •

চীফ সেক্রেটারি বি. আর গুপ্ত জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের অবস্থা শান্ত। মুখকিল হয়েছে কী, ওখানে কি ধরণের অশান্তি হয়েছিল তাই আমাদের জানা নেই।

• •

"বিচার বিভাগের উপর আস্থা হারালে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে"—জানিয়েছেন ডঃ জগন্নাথ মিশ্র।

• •

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, "বিয়োগীদের স্তরে পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যাতে জরুরি অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ওঁরা ঘাপটি মেরে রয়েছেন, সুযোগ পেলেই হিংসাত্মক কাজ শুরু করবেন।"

• •

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় ঘোষণা করেন, "প্রমিক স্বার্থে এ-সরকার যে কাজ করেছে আর কোনো সরকার তা করেনি। যাঁদের কথা বলার কেউ নেই, যাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেউ নেই, তাঁরা আজ বুকতে পেরেছেন ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের পাশে আছেন।"

•

জানা গেল, শ্রীসঞ্জয় সেনের সমস্যা হাড় নিয়ে। অনুধাবন যুবে হাসিটি লেগেই আছে, কথাগুলো তেমনি চোখা।

• •

"গণতন্ত্রের অর্থ ভোটের রাজনীতি নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের রাজনীতিতে ভোটের ভূমিকাই সব থেকে বড়।" সঞ্জয় গান্ধী।

মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীসখারাম খাণ্ডেকর ১৯৭৪-এর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কারের মূল্য যথারীতি এক লক্ষ টাকা।

ফরাসি কমুনিস্ট পার্টি ভবিষ্যতে মস্কো লাইন বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে হবে বলে' ফরাসি প্রতিনিধি সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসেই জানিয়ে দিয়েছেন।

•

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গে সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে জানিয়েছেন, "তাঁর পার্টি প্রতিক্রিয়াচক্র ও ফাসিবাদের সংগ্রামে পুরোধা, তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল কর্মধারার সমর্থক।"

•

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওয়ের মতে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখনো পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করছে, এই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে।

•

"প্রধানমন্ত্রীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।"—বাজা আব্বাস।

•

"ডাক্তারের ছেলে বলেই রুগীকে চিকিৎসা করার যোগ্যতা গজায় না। উত্তরাধিকার ভালো, কিন্তু রাজনীতিতে নয়।" পত্রাংশ, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি।

•

জানা গেল, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে প্রায়ত অধিক ঘটকের পত্নী সরমা ঘটককে দশ হাজার টাকা দান করা হয়েছে।

মওলানা ভাসানী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। জানা গেল, তাঁর অবস্থা সন্তোষজনক।

•

"জনগণের প্রতিনিধিদের চেয়ে কী করে বিচারকরা বেশি জানবেন, কোনটা জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক!" আইনমন্ত্রী শ্রীগোখলের জিজ্ঞাসা।

•

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড কিসেল কানটোকে "আন্তর্জাতিক দস্যু" সম্মানে ভূষিত করেছেন। যেহেতু কানটো অ্যাংগোলার গৃহযুদ্ধে বারো হাজার সৈন্য পাঠিয়েছেন।

•

কেন্দ্রীয় যুব কংগ্রেস জাতি গঠনের কাজে দেশের যুবকদের শতকরা ৫ ভাগকে নিযুক্ত করবেন বলে' জানা গেল। শ্রীমতী সোনিয়া মতে, বিরোধীরা এতাবৎকাল এদের ভুল পথে চালিত করছিলেন।

•

বিদেশী সহযোগিতায় ভারত তার প্রথম উপগ্রহটি আকাশে উৎক্ষিপ্ত করবে বলে' জানা গেল।

•

সুইডেনে বাঙলা দেশের আশ্রয়প্রার্থী আবদুর রাজ্জাককে ধরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও ইতিপূর্বে রাজ্জাক সাহেব পদত্যাগ করেছেন বলে' খবর এসেছিল।

•

রাজ্যপাল চেন্না রেড্ডির মতে, হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা এবং সে-সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই।

• •

খবরে প্রকাশ, 'হাম দোনো হামারা দোনোরা' বাস্তব রূপ নিতে আইন হচ্ছে।

রাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফার হোসেন জানিয়েছেন, ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ন হাজার সাঁইত্রিশ জনকে মিসায় ও ভারত-রক্ষা আইনে আটক করা হয়েছে।

•

দর্শকদের বিবরনীতে জানা গেল, পুত্রের জনপ্রিয়তা থেকে মা ইন্দিরা গান্ধীর সভায় লোক বেশি হয়েছে।

পি. এল. টি-র নতুন নাটক : সেদিন কোথায় ?

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, চল্লিশ বছর পেরোয়নি এইসব লেখক, যথা অলোকরঞ্জন-তরুণ সান্যাল-বীণের বন্দ্যো-সুনীল-শীর্ষেন্দু-নিমাই প্রমুখ ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর রাজভবনে নিমন্ত্রিত লেখক।

• •

প্রগ্রেসিভ পাবলিশিটি মারফিসের মৌজন্যমূলক বিজ্ঞাপন :

গ্রামে চলো পণ নিও না
নগর দেয় নির্দেশ।
ওরেই আবার বাঁচবে জাতি
গড়বে আবার দেশ।

হিসাবে ১১ লক্ষ টাকার গরমিল

(দর্পণের প্রতিনিধি)

আশানসোলের বিধানচন্দ্র কলেজের অডিট রিপোর্ট থেকে জানা গেছে উক্ত কলেজের হিসাবপত্রে প্রায় এগারো লক্ষ টাকার গরমিল রয়েছে। এত টাকা কি ভাবে এবং কোন খাতে খরচ করা হয়েছে তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ কলেজ কর্তৃপক্ষ দিতে পারেন নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রায় এক বৎসর আগে দর্পণে উক্ত বিধানচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সংবাদ দর্পণ প্রতিনিধির কাছে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে পরিবেদন করেছিলেন বিধানসভা সদস্য শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সংবাদে কলেজের হিসাবপত্রে কারচুপি রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

বর্তমানে এই হিসাবের কারচুপি প্রকাশিত হওয়ার ফলে কলেজের ছাত্ররা দাবী তুলেছেন, অধ্যক্ষ এবং হেড ক্লার্কের পদত্যাগ চাই। চাপে পড়ে হেড ক্লার্ক অবশ্য পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজেও আসছেন না বা এ ব্যাপারে কোন স্তর উচ্চবাচ্যও করছেন না। ছাত্ররা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অসাধীন আচরণের অভিযোগ তুলেছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় খুব কম সংখ্যক দিনই কলেজে আসেন বলেও অভিযোগে প্রকাশ। জানা গেছে যে, অধ্যক্ষ মহাশয় একটি স্পনসর্ড কলেজের অধ্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও অন্যত্র লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত আছেন, একটি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, অন্য একটি কলেজ পরিচালনার যুক্ত এবং

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ফ্যাসিস্ত হামলা সত্ত্বেও রোডেশিয়ার সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত সরকার মরিয়া হয়ে সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র মোজাম্বিকের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে। ফ্যাসিস্ত সরকারের অভিযোগ, মোজাম্বিকের বুক থেকে নাকি মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা রোডেশিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে গোলমাল পাকাচ্ছে। এই অভিযোগ যে কত মিথ্যে তা না বললেও চলে। দীর্ঘকাল ধরে, রোডেশিয়ার (জিম্বাবে) দেশপ্রেমিক মানুষ সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। জিম্বাবে মুক্তিফ্রন্টের দখলে এখন বিরাট ভূখণ্ড। আলোলা, মোজাম্বিক, গিনি বিসাউর সফল সংগ্রামের পর দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম আরো জোরদার হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে ওয়াশিংটন চক্র আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে দমন করার জন্য নতুন নতুন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের একটি অঙ্গ হচ্ছে যে, আলোলার স্বাধীন সরকারকে ধ্বংস করার জন্য এম-পি-এল-এর বিরুদ্ধে পাল্টা ভুয়াবাহিনি "মুক্তি বাহিনী" গঠন করা হয়। যারা এখন আলোলায় সরকারের দাবীদার। এম-পি-এল-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা, রোমানিয়া, ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে বেশীর ভাগ সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল দেশ। এমন কি এম-পি-এল-এ সরকারের অস্তিত্ব কিছু কিছু পুঁজিবাদি দেশও স্বীকার করতে পারছে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এম-পি-এল-এ বিরোধী তথাকথিত দুই মুক্তি বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সুবিধে করতে পারছে না। তাই হতাশ হয়ে সেদিনই অর্থবাদ্য না করার কথাও ওরা বলছে। এম-পি-এল-এ সরকারের পক্ষে এখন গড়ে উঠেছে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড, যাতে রয়েছে মোজাম্বিক, গিনি বিসাউ, কিউবা ও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মানুষ। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যভাবে মুক্তিকামী আফ্রিকানদের জব্দ করার পথে নেমেছে। এবার রোডেশিয়াকে দিয়ে মোজাম্বিকের প্রগতিশীল সরকারকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা চলছে। সুখের বিষয় মোজাম্বিকের সরকার, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি সামোরা মিশেল ধার্থহীন ভাষায় এই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মোজাম্বিকের সরকার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আফ্রিকার প্রতিটি সত্যকার স্বাধীন দেশ, এবং আফ্রিকান সংহতি সংগঠন। আফ্রিকান সংহতি সংগঠনের সভাপতি উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতিতে কিউবা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে সক্রিয় ভাবে মোজাম্বিকের পেছনে এসে দাঁড়াতে অনুরোধ করেছেন।

রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী সরকার জনগণ থেকে কত বিচ্ছিন্ন তার প্রমাণ মেলে রোডেশিয়ার সামরিক কার্যকলাপের মধ্যে। সম্প্রতি লণ্ডনের ডেলী মিরর পত্রিকার ২২ বছরের শ্বেতাঙ্গ যুবক টম মাকার্বি রোজাম্বিক রোডেশিয়া সীমান্তের এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। ডারউইনের ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে মাডাহাডোরা গ্রাম। সেখানে নাকি একদো গেরিলা লুকিয়ে আছে—এই সংবাদ পেয়ে রোডেশিয়ার ফ্যাসিস্ত কৌজ ওখানে যায়। ওখানে গিয়ে ওরা বাইজল গ্রামবাসীকে খুন করে। নির্বিচারে শিশুদের গুলি করে মারা হয়। মেয়েদের সামনেই তাদের খুন করা হয়। পরে অবশ্য মায়েরাও রেহাই পায়নি। টম এই সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এই গণহত্যা সহ্য করতে না পেরে তিনি লণ্ডনে পালিয়ে এসে উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা দিলে সভ্য সমাজ চমকে ওঠে। ইংলণ্ডে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল আকার ধারণ করে। সুখের বিষয় মোজাম্বিকের সরকার, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি সামোরা মিশেল ধার্থহীন ভাষায় এই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মোজাম্বিকের সরকার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আফ্রিকার প্রতিটি সত্যকার স্বাধীন দেশ, এবং আফ্রিকান সংহতি সংগঠন। আফ্রিকান সংহতি সংগঠনের সভাপতি উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতিতে কিউবা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে সক্রিয় ভাবে মোজাম্বিকের পেছনে এসে দাঁড়াতে অনুরোধ করেছেন।

জন অরণ্য

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জন-অরণ্য' ছবিটি নিশ্চয়ই একটি আত্ম-সমর্পণের ছবি। তাতেও কষ্ট লাগে, তবু এটাই হল নির্মম সত্য। ছবিতে একাধিকবার একই সংলাপ উচ্চারিত: এটা মেনে নেওয়ার যুগ, মেনে নেওয়ার কাল। যা কিছু অন্যায়, অবিচার, অসংগতি সব কিছুই মেনে নিতে হবে। মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। যে-অসহায়তা বোধ থেকে এই মেনে নেওয়ার সরল মুক্তিটাকে বার করে ছবির পর্দায় দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে, তাতে শুধু হতাশার শূন্য-তাই যে সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, দর্শক মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়। ছবিটির সংলাপের কিছু অংশও বেশ স্থূল, রুচিকে যা আহত করে। এমনটা কিন্তু সত্যজিৎবাবুর আগের কোন ছবিতে আর দেখা যায়নি।

সত্যজিৎবাবু এযাবৎ কোন ছবি-তেই একালের সমস্যাকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরে চিত্রবর্ণিতায় অগ্নিগর্ভ বাস্তব করে তুলতে পারেন নি। তিনি নিজস্ব রোমান্টিক মানসিকতার সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। 'অরণ্যের দিন রাত্রি' 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'সীমাবদ্ধ' ইত্যাদি ছবিতে এ যুগের বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি বাস্তবধর্মী পরিচালক রূপে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। পরন্তু তিনি সমকালের জটিল বাস্তব সমস্যার মধ্যেও রোমান্টিক রূপে ধরা পড়ে-ছেন বার বার। আলোচ্য 'জন-অরণ্য' ছবিতেও এর ব্যতিক্রম নেই, উপরন্তু এই ছবিতে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি না হ'তে সমস্যার কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যে-হতাশার সুর ফুটেছে, তেমনটির মাঝাখে তাঁর আগের আর কোন ছবিতেই পাওয়া যায়নি। তাই মনে প্রশ্ন জাগে: কেন এই আত্মসমর্পণ?···এই অসহায় আত্মসমর্পণের ছবি দিয়ে দার্শা-রণকে তিনি চেতনার স্তরে নাড়া দিতে কি পেরেছেন? অবক্ষয়ের চেহারার মধ্য দিয়ে ছবির মূলসুর যেখানে বেরিয়ে আসে—সব কিছুই মেনে নিতে হবে, সেখানে মেনে না নেওয়ার প্রতিবাদের শক্তিটুকুও হারিয়ে বসে নাকি? মৈরাশ্যের উপাদানসহ সেই প্রচণ্ড জোর আর শুধুতা যদি থাকত, তবে বিক্ষো-ভের শক্তিও তার মধ্যে নিহিত থাকত। কিন্তু তা বুঝি হবার নয় রোমান্টিক সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে।

অবসর প্রাপ্ত পিতার পুরনো মূল্যবোধের সঙ্গে সন্তানের নতুন মূল্যবোধের সংঘাত দেখাতে গিয়ে ছবিতে পরিচালক নিয়ে এলেন যেন নেওয়ার আপোষমূলক নীতি, এবং নায়ক চরিত্রটির ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। অন-হায় দুর্বল নায়ককে বর্তমান অব-ক্ষয়ের শিকার দেখাতে গিয়ে তার চারিত্রিক অধঃপতনের যে ছবি ফুটিয়েছেন তিনি শান্ত মোহনিয়া হয়ে, তাতে 'পলিটিক এক্কেই' কিছু ফুটে ওঠার কথা নয়। সেখানে অসহায়তাই শেষ কথা। মেনে নেওয়া নীতির হাঁড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া যেখানে গত্যন্তর নেই দেখানো হয়েছে অটল ধৈর্যে, সেখানে বিপরীত আবেদনে ঘটার সম্ভাবনা কোথায়? ছবিতে দেখি, অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ক'রতে নেমে নায়ককে অন্যায় পথ নিতে হয়েছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ব্যবসা জমাবার জন্যেই, এমন কি মেয়েদেরে ভেটে দিয়ে অর্ডার পেতেও পিছ পা হয়নি, যদিও সঙ্কোচ আর দ্বন্দ্ব তার মনে ছিল। শেষ পর্যন্ত এই ঘৃণ্য কাজের বিনিময়েও অর্ডার সংগ্রহ দেখিয়ে পরিচালক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রমনীতার প্রতি দর্শক মনে চরম ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন কি?···এ জঘন্য কাজ অবশ্যই কেউ সমর্থন করে না—কিন্তু বিবৃত্ত তো কিছু নেই—নেই কোন শিল্পী সুলভ ইঙ্গিতও, শুধু মেনে নিতে হবে—সবই মেনে নিতে হবে—কোন উপায় নেই!···মন্দাক্রান্তা ছন্দে সেই প্রশান্ত আপোসের সুরই শুধু ছবিতে ভেসে উঠে মনকে বিদ্রোহী না ক'রে কেবল আচ্ছন্নই ক'রে ফেলে!···

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

নবাবপুর সিংহজোড় গ্রামে বিদ্যুৎ চাই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া জেলার শেষ প্রান্তে এবং হুগলীর মধ্যে পড়ে এমন সব জায়গা নবাবপুর সিংহজোড় ভগবতীপুর অঞ্চলের সমস্যা বাড়ছে। চণ্ডীতলা থানার আলীপুর গ্রামের শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পোস্ট এসেছে অথচ এখানে বিদ্যুৎ নেই। নবাবপুর গ্রামে তিনটি প্রাইমারী স্কুল, ডাকঘর ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কি সব রাজনৈতিক দলাদলির জন্য বিদ্যুৎ আসছে না।

নবাবপুরের আটলক্ষ বিঘা বিরাট মাঠ। বাস যোগাযোগ মাঠ। বছর বছর মাঠ জুড়ে ধূ ধূ মরুর বিবর্ণতা। উঁচু জমিতে চাষের জলের ব্যবস্থা নেই। এখানে যোগা-যোগের টুঁমাঠে বিদ্যুৎচালিত গভীর জল-কূপ বানানোর দাবী রেখেছেন অঞ্চল প্রধান শ্রীগণেশ নিয়োগী।

পাকুড় থেকে নবাবপুর বাজার-ছোঁয়া সিংহজোড় হয়ে যে রাস্তাটি শীর্ণ কায়া নিয়ে পুকুর পাড়ে মুখ থুবড়ে মাঠের মধ্যে মুখ্যড়িয়ে কীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলাচলের অযোগ্য হচ্ছে তার পাকা হওয়ার দাবী অনেক কালের।

সিংহজোড়ের কামাল আহমদ বললেন বাসুয়াটি থেকে আগত মেটেখাল ভগবতীপুর পর্যন্ত ছুটতে গিয়ে রাস্তার কখনও বা হয়েছে অবস্থা। মজে হয়েছে ধুসর নিঃসঙ্গ ব্যাবাকাশের রুক্ষেগুড়ালা বাহু জমি। একক্লাবে আলীপুরের গ্রামে ট্রুইন গেট ছিল। তার জল পম্প স্টার্লল করে তুলতো সব আশেপাশের জমি। অথচ আজ ট্রুইন গেট ভেঙে গেছে বা মেরামত একান্ত দরকার।

সিংহজোড় গাঁয়ে বাধীনতার পরে আজও একটি গ্রাজুয়েট হলো না। গাঁয়ে ম্যাট্রিক পাশ ক'জন? স্বাস্থ্যকেন্দ্র—তাও নেই। নেই ডাক-ঘর। পাকা রাস্তা? হো হো হেসে ওঠে কালবন। একটা স্কুল শোক-ভজান প্রাইমারী বিদ্যালয়। তার অনুমোদন মিললো না পঁচিশ বছর ধরে। পাশাপাশি পাল্টা স্কুল খুল-ছেন কিছু বাস্তুঘাঘু। ফলে দুটো স্কুলই অনুমোদন হীন হাওয়ায় হিলছে। তিন হাজার লোক সিংহ-জোড় গাঁয়ে। একটাও স্কুল নেই এখন। দু চৌ ই বন্ধ। ম্যাট্রিক এক্জন। ঐ যৌ আর বিদ্যুৎ আসেনি। গোটা গ্রামে একটি টিউবওয়েল। দুটি কল আগে ভাগে জল বন্ধ। পাশাপাশি নবাবপুর পশ্চিমপাড়া তিনটি এবং পূর্বপাড়া দুটি ও ভগবতীপুরে নাতটি কল মেরা-মত হীন অকেজো। দারুণ গ্রীষ্মে ডেউটার ছাতি ফাটে। পি, ডি ডি কিংবা বি, ডি, ও অফিস কিছুই করছে না?

গাঁয়ের লোকের উত্তর—না বাবু কংগ্রেসীদের দুটি গোষ্ঠীর দুই সুর। তাই মাঝখানে দুঃখের নদী ঐ বয়ে যায়।

সত্যজিৎ

হিসাবে গরমিল

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র, যার ফলে তিনি বিদ্যাচন্দ্র কলেজের প্রশাসনিক কাজে মনো-যোগ দিতে পারছেন না। উক্ত অধ্যক্ষ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা-চার্যের সহোদর ভ্রাতা বলে জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, বর্ধমানের জেলাশাসক কলেজের নিরাপত্তার স্বার্থে কলেজ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেছেন এবং ছয় জনকে কলেজের সীমানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। ছাত্রদের অভি-যোগ এই কলেজে দীর্ঘ দিন ধরেই গণ্ডগোল চলছে যার ফলে পড়া-শোনা হয় না বললেই চলে। কিন্তু পরিচালক সমিতি এ সম্পর্কে অব-হিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব।

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সাহিত্য ঐতিহ্য

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কতাকেই চাপিয়ে দিয়েছেন। যেন উপনেতার সমস্যাই 'সৎ' জমিদারের মহামুভবতার উপরই নির্ভর করেছিল। 'অসৎ' জমিদারের দাদ্যি তো রবীন্দ্রনাথ নিজের কাঁধে নিতে পারেন না। সততা বা অসততার উপরই কৃষকের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে। 'সৎ' জমিদার রবীন্দ্রনাথকে এ-সমস্যা পীড়িত করেনি। তাই যে ফিউডালিজমের উপর জমিদারি-ব্যবস্থা টিকে রয়েছে রবীন্দ্র-রচনায় বার বার সেই পল্লী-প্রীতি, পথরের বল-কারখানা-লোহা-লক্কড়ের বাইরে, অথবা হাতুড়ানি দিয়ে ডাকছে। পল্লীপ্রকৃতির ছায়ায় গড়ে-ওঠা তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রাচীন কালের তপোবনে ফিরে-যাওয়ার আকুতি।

রবীন্দ্রনাথের অজস্র গল্প-কবিতায় পল্লীজীবন আবহ সৃষ্টি করেছে, কখনো সখনো চাষিজীবন উঁকি মেরেছে, কিন্তু কৃষক-জমিদারের মূল অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্র নেই। কারণ অর্থনীতিকে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক বলে' রবীন্দ্রনাথ কখনো মনে করেননি। এক জাতীয় ভিক্টোরিয়ান হিউম্যানিজম দেশ-কাল-মানুষের উর্ধ্বে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের মতো তাঁর সাহিত্য-কর্মকে বসিয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

যুব কংগ্রেস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছেবা। তবে ইতিমধ্যে তিনি কিছু কিছু জায়গায় বিপক্ষগোষ্ঠীর নেতাদের নিজ দলবলে নিয়ে আসতে পেরেছেন বলে তাদের দাবী।

বাকি সাতটি জেলার যুব কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা আগামী পনেরোই মার্চের মধ্যেই করার কথা। এই কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষিত হওয়ার পর গোষ্ঠীগত ভারসাম্য চূড়ান্ত রূপ নেবে।

এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন যুবনেতা চান উপদেষ্টা মণ্ডলীতে আরও অন্তত দুইজন সদস্য নিয়োগ করা হোক। বর্তমানে লক্ষ্মীকান্ত বসু ও মুব্রত মুখার্জী এই দুই জন উপদেষ্টা মণ্ডলীতে আছেন। কিছু কিছু যুবনেতার বক্তব্য যুব কংগ্রেসে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আরও দুইজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা উচিত। এ ব্যাপারে সঞ্জয় গান্ধীর কাছেও দরবার করা হয়েছে।

সংঘর্ষ কখনো তাঁর ব্যক্তিত্বে বা রচনায় দেখা যায়নি। তবু, এই রবীন্দ্রনাথই ১৯০৫-এর লর্ড কার্জনের গর্হিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদের আন্দোলনে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাও বল্পস্থায়ী। কারণ ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর কোনো কালেও উৎসাহ ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই কংগ্রেসের মধ্যে ২২ম-স্থী-চরণপন্থীর বিভেদ সৃষ্টি হল. আন্তে'সেন্টে উদ্ভূত যে বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠল, সাম্রাজ্য-বাদের পরিভাষায় যার নাম সন্ত্রাস-বাদ, তার তাৎপর্যও রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তিনি অচিরে রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী হলেন। অবশ্য ১৯১১ সালে কংগ্রেসের অধি-বেশনে সভাপতি হিসেবে ইংরাজ সম্রাট জর্জের ভ্যাকডোনাল্ডকে (পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) না পাওয়ায় গেলেন রবীন্দ্রনাথ "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি রচনা করে দিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করে নেয়ার জন্যে অধিবেশন থেকে ইং-রাজ সরকারকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করা হল।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে এই বক্তব্য সূত্র-হীন মনে হলেও সচেতন পাঠকদের বিষয়টি বুঝতে হবে। সেটা এই, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করলেও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-বাদের প্রকৃত চরিত্রটিকে হয় তাঁরা ধরতে পারেননি অথবা সহযোগীর স্বার্থে সে বিষয়ে নিশ্চুপ। ছোটো ইংরেজ বড় ইংরেজ-রূপে বিদিসে ব্রিটিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ-শাসকশ্রেণীর কাছেই দরবার করেছি। এবং বড় ইংরাজের অনুগ্রহে দরবার সার্থক হলে অকুণ্ঠে তাদের বদান্যতাকে অভিনন্দিত করেছি। আগেই বলা হয়েছে এই শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী সমাজের শ্রেণীদর্শন তাবৎ নাগরিক মধ্যশ্রেণীকেই আচ্ছন্ন করে রাখার ফলে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথা ভূস্বামী বিরোধী হতে পারেনি। এবং এই সাহিত্যই দীর্ঘকাল ধরে পাঠক লেখক আনুকূল্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সৌভাগ্যের কথা, এই সাহি-ত্যের ফলশ্রুতি সাবিক নিরক্ষরতা ও নগর জীবন থেকে দূরে থাকা বৃহত্তর গ্রামীন মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করতে পারল না। বৃহত্তর মানুষ এই একপেশে সাহিত্যের আওতা থেকে নিরাপদ থাকল।

এই সাহিত্যকে কী "কলোনিয়াল সাহিত্য" বললে ভুল বলা হবে? অথচ আমেরিকা, যা একদা ইংলণ্ডের কলোনি ছিল, সেখানকার সাহি-ত্যের ঐতিহ্যও সাম্রাজ্যবাদ বিরো-ধিতায়, আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের কেন এমন হল? উত্তর একই, আমাদের মধ্য-শ্রেণী বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজের শাসনে-শোষণে ভূমিষ্ঠার পাটনা বের সৌভাগ্যেই কৃতার্থ হয়েছে। বরং রবীন্দ্রনাথও পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন "তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য ইউরোপের চিত্ত-প্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। ইউরোপীয় চিত্তের জয়শক্তি আমাদের স্বাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে" ইত্যাদি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি "ইউরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল।" (কালান্তর, ১৩৩৩)। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রতি বুদ্ধি-জীবী শ্রেণীর এই গুণগ্রাহিতাই এ দেশে ব্রিটিশকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে সাবাজিক, আর্থিক, রাজ-নৈতিক সাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট নাগরিক বুদ্ধিজীবী নিজের একটি ভাবজগত তৈরি করবার প্রেরণায় এমন একটি আদর্শ খুঁজছিল যার প্রতীক হলেন রবীন্দ্রনাথ, যার নাম হল 'রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতি,' গৌরবে যার ব্যাপ্তি হল "রবীন্দ্র যুগে"। ক্রমাগত প্রচারে এই সত্য জন হওয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ স্বাভাবিক বলে' কীর্তিত হল এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হল রবীন্দ্র-চর্চা মানেই বাঙালীর জীবনচর্চা।

কবি দুর্গাদাস সরকারকে

ভাই দুর্গাদাস, এমন তো কথা ছিল না!
কথা ছিল জীবনকে জীবন দিয়ে
ছিনিয়ে আনতে হবে।
চল্লিশেই এ-ক্লান্তি তোমার সাজে না।
এই তস্কর, খোজাদের দেশে
আরো বেশি কবিকে সামিল হতে হবে।
যুদ্ধের মাঝখানে বলভঙ্গ
সে কেমন কথা?
তুমি কী জানোনা
কবি ছাড়া আমাদের সব জয়
হয়ে যাবে বৃথা?

মিহির আচার্য

গাড়ি চালকদের প্রতি আবেদন

BEWARE CROSSING

অহেতুক প্রাণহানি ঘটাবেন না

যেসব লেভেল ক্রশিং-এ গেটম্যান নেই, সেখানে
- থামুন
- দেখুন
- তারপর পার হয়ে যান

পূর্ব রেলওয়ে

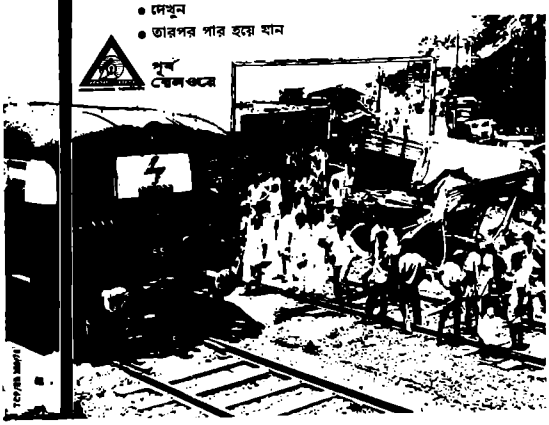

Regd. No. WB/CC-32

PRICE : 40 PAISE

বিদায় বিদূষক

(দর্পণের প্রতিনিধি)

যাত্রা জগতের প্রখ্যাত হাস্য-রসিক প্রায় বাট বছর বয়সে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিলেন। যে সমস্ত অভিনেতা মঞ্চ থেকে এসে যাত্রার আসরে নিজেদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় বহু পরিচিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন শ্রীশির ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ নন্দীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র শিবব্রাবু তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৬ সালের ১৬ই জুলাই। খুব ছেলেবেলা থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে ক্রমশঃ নাট্যানুরাগী করে তুলেছিল। বাবার ডিস্পেন্সারী ছিল বিডন ষ্ট্রীটে। মনোমোহন থিয়েটারের মালিক ছিলেন বাবার বন্ধু। বাড়ীতে রোজ বিকেল বেলা মাষ্টার আসতেন পড়াতে। সন্ধ্যায় বসে বসে প্রায়ই দাদীবাবু, চুনীলাল দেব, আশ্চর্যময়ী, শশিমুখী প্রভৃতি সকলের অভিনয় মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। সকাল বেলা বন্ধুদের সঙ্গে বাগবাজার তেলোয়ার নিয়ে অভিনয় করতেন, জয়দেবের কাপালিকের পার্ট।

নবম শ্রেণীতে উঠে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে তিনি টালা ট্রু ষ্টালিগঞ্জ সংঘের থিয়েটারে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। এ সময় তাঁর অভিনয়ের প্রচুর প্রশংসা বেরিয়েছিল। পরিণত বয়সে মঞ্চে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। নাট্য নিকেতন, মিনার্ভা, রঙমহল প্রভৃতি মঞ্চে তিনি অংকালীন প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করেন।

আর্য অপেরার 'বাঙালী'তে সত্যপীরের ভূমিকায় তাঁর যাত্রা-অভিনয়ের সুরু। কম বয়সে নবরঞ্জন, আর্য, নিউ গণেশ, নিউ রয়েল বীণা-পাণি এবং তরুণ অপেরায় অভিনয় করেন। বর্তমানে তিনি তরুণ অপেরার ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত আছেন। অফিসের শ্রীভট্টাচার্য যাত্রার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সময় অনেক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের অভিনয় শিক্ষা গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন। যাত্রার উপর তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা তথ্যসমৃদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য নিবন্ধও রচনা করেছেন।

এখন প্রায়ই তরুণ অপেরার গদী ঘরে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যায়। যাত্রার প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি তাঁর স্বভাব রসিকতায় পরিবেশন করেন পুরনো দিনের গল্প। কথার ফাঁকে বার বার কবে পড়ে হারানো যুগের আমআঁকার সংলাপ। একটু রাত হলেই তাঁকে খুব মন্থর পায়ে হেঁটে যেতে দেখা যায় বিডন ষ্ট্রীট পেরিয়ে চাটুবাবুর বাজারের কাছে বাসস্থানের দিকে। এই বিদায়ী বিদূষককে অভিনন্দন জানাই।

তরুণ অপেরার

জুলিয়াস সিজার

আসর অবদান

রচনা/শম্ভু বাগ

নির্দেশনা ও নাম ভূমিকায়

শান্তিগোপাল

দিগ্বিজয়ের বিজয়গর্বে

হৃদয় মথিত দুটি পালা

পবিত্র পাপী

সোনার হরিণ

পরিবেশনা

নবরঞ্জন অপেরা

প্রদীপ অপেরার ফুলেশ্বরী

(দর্পণের সমালোচক)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিত্তদহল কাহিনী 'ফুলেশ্বরী'র পালারূপ দিয়েছেন জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত পালাটিতে কি গান, কি অভিনয়—সবদিক থেকেই যাত্রাধর্মিতার ছাপ স্পষ্ট। প্রযোজনার সামগ্রিক বিচারে পালাটি সফল।

ফুলেশ্বরী নারী এক দামাল মেয়েকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর সুরু, সেই মেয়েটিরই প্রেম জীবনের এক দুঃসহ অপরিপূর্ণতা দিয়ে কাহিনীর শেষ। গ্রাম্য যুবতী ফুলেশ্বরী তার দুর্বার জীবনযাপনের মধ্যে নতুন ঝুমটিয়ান বৃন্দাবনের আবির্ভাব খুব স্বভাব অহঙ্কার দিয়েই সরিয়ে দিতে চেয়ে, আরও গভীর ভাবে বৃন্দাবনের ভাবুকতা ও সকীতপ্রিয়তার দিকে আকর্ষণ অনুভব করেছে, যদিও তার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আসলে বাইরের এক আপাত অবহেলার ভেতরে সে নিজে নিজে উদ্বেলিত হয়েছে। এই অবহেলা আর উদাসীনতা বৃন্দাবনের জীবনকে আরও বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ফুলেশ্বরীর দাদা অভিরামের ইচ্ছা ছিল, ছদ্মছাড়া বৃন্দাবন আর দুর্বিনীতা ফুলেশ্বরীর মিলন ঘটাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুলেশ্বরীর হৃদয়কে খুব স্বাভাবিক ভাবে বেরে নিতে পারেনি বৃন্দাবন। সে ফুলেশ্বরীর কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

এই বিয়োগান্ত কাহিনীটির শেষের দিকের দৃশ্যগুলি খুবই আকর্ষণীয়। বিশেষ করে নির্দেশক অভিনেতা শান্তনু ঘোষ অভিরামের চরিত্রটিকে বেশ সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। বাইরের কাঠিন্য আর অন্তরের সারল্যের দিকটি তার অভিনয়ের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তেই বেশ জীবন্ত। বিপরীত দিকে রসিক মহাজনের চরিত্রে মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বাইরের সারল্য আর অন্তরের ক্রুর ছলনাকে বেশ বিশ্বস্ত করে তুলেছেন। বৃন্দাবন চরিত্রে রাজা ভট্টাচার্যের গানগুলি খুবই সুগীত, কণ্ঠও প্রশংসনীয়। বৃন্দাবনের ভাবে পাঁচুর ভূমিকায় কিশোর অভিনেতা অশোক মিত্র অত্যন্ত উপভোগ্য। নাবু গাঙ্গুলীর গগনহরি রসমধুর। যাত্রার সীতাহরণ পালার নির্বাচিত অংশটি তাৎপর্যময়।

স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত দুর্গা। শেফালী দে চরিত্রটিকে স্বাভাবিক, সুন্দর এবং নিখুঁত করতে পেরেছেন। তরুণী সুলতা বিশ্বাস এবং নিস্তারিণীর আবাত মায়া চরিত্র দুটিও বেশ সুঅভিনীত। ফুলেশ্বরী চরিত্রটি অভিনয়ে বিশ্বস্ত করে তুলতে কল্পনা নায়েকের প্রচুর আন্তরিক এবং তা সফল। সুবকার অলোক বাগচীর সুর প্রশংসনীয়।

যদিও সন্ধ্যা

ইউনিটি থিয়েটার্স কর্তার প্রযোজনীত নাটক "যদিও সন্ধ্যা" মঞ্চস্থ হল মুক্তাঙ্গনে গত দশই ফেব্রুয়ারী। আলোচ্য নাটকটি আজকের যুগের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে অবদমিত যুবসমাজ কিভাবে লোভের ঘৃণকাষ্ঠ এবং শোষকশ্রেণীর চক্রান্তের শিকার হচ্ছে সেই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নাট্যকার রাধাবরণ ঘোষ বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছেন। কি ভাবে শ্রমিকদের সম্ঘবদ্ধ আন্দোলন ভেঙে দেয়া হয় তাও দেখান হয়েছে এই নাটকে। নাটকটি উপভোগ্য। নাট্য সংস্থা দাবী করেছেন যে, এই নাটকটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা কোথায় হয়েছিল সে কথা সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়নি এবং আমাদেরও জানা নেই। অভিনয়াংশে শঙ্কর পালুই, অনিল ভট্টাচার্য এবং কুসকুস চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটির নির্দেশনায় রয়েছেন বিশু গাঙ্গুলী।

চন্দ্রভারতীর বৃন্দাবন অনুষ্ঠান

(দর্পণের সংগীত সমালোচক)

চন্দ্রভারতীর উদ্যোগে (কলা মন্দির, ২৮ ফেব্রুয়ারি) বৃন্দাবনের 'গঙ্গা' বেশ ভাল উৎরেছে কেবল পঞ্চাংপটের ভাষাব্যক্তি ছাড়া। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। সোনার তিমির যদি চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে হয় তাহলে তাকেই বলে রসহানি। একে বৃন্দাবন বা কনসার্ট না বলে অর্কেষ্ট্রা বলাই সঙ্গত। হারমনি বা বহু সুরের মিল ভালই ছিল; কাউন্টার পয়েন্ট বা বিপরীত পদবিন্যাস কিছু ছিল। নিরীক্ষা রূপে খুবই প্রশংসনীয় কাজ, বিশেষত বিষয়ের নতুনত্ব। তবে পশ্চ যন্ত্রের বদলে ভারতীয় ষড়-যন্ত্র আরো বেশি সংখ্যায় নিলে পারতেন। তালবাদ্যও কমান দরকার। রচনাংশে গতের চেয়ে আলাপ পদ্ধতিরই অর্কেষ্ট্রায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত মনে হয়।

'দেবদাসী' নৃত্য নাট্যটিও নতুনত্বের দাবি করতে পারে।

সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলার সঙ্গীতে বহুকাল যাবৎ অবক্ষয় চলছে। কানু ছাড়া গীত নেই আর রবীন্দ্র ছাড়া নৃত্য বা গীতিনাট্য নেই যা ভদ্রলোকে দেখতে পারে। হরপ্পার দেবদাসীকে নিয়ে বিষয়বস্তুটিও চিত্তাকর্ষক। এ নিয়েই একটা পুরো পাঁচ অঙ্কের নাটক হতে পারে। এর সঙ্গে সুলতান মামুদের প্রসঙ্গ ঢোকানোর প্রয়োজন ছিল না। বৃত্তা-রচনায় কথাকলিকে বর্জন করলে আরো ইতিহাসাগুণ হত বোধহয়। গীতাংশে সুলতান মামুদ অংশে ঠুংরী গান ইতিহাসের অনুরূপ ঘটেছে কারণ শুনয় কেন, তার পাঁচশ বছরের মধ্যেও ঠুংরীর উদ্ভব হয়নি। তবু এই সাধনী নিরীক্ষার জন্য এদের সাধুবাদ জানাতে হয়।

সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুতেও যা পোকে না তা হলো মানুষের মন। পরিচালক অরুণ কুমার সেই শক্ত মন নিয়ে আবার কাজে নেবেছেন। যে অভাবিক সাধন ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে 'সম্রাজ্ঞী নুরজাহান' ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে প্রথম সতেরোটি অভিনয়েই মানুষের মন কেড়েছিল, ইলটিটিউটে আগুন লেগে তা ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকের ক্ষতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু অরুণ-কুমারের মনের আগুন আরও বেড়েছে। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছেন, এ নাটক তাঁরা আবার সাধারণ মানুষকে দেখাতে সুরুদ্ধর। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে তাঁরা মিনার্ভা থিয়েটারে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার 'সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের' অভিনয় করবেন। এ ছাড়া আগামী জুন মাসের পর থেকে তাঁরা রবীন্দ্রসদনেও 'সম্রাজ্ঞী নুরজাহান' অভিনয় সুরু করবেন। এই রাজ্যের বিভিন্ন মফঃস্বল শহরের ডাকেও তাঁরা সাড়া দেবেন।

মোট একশোজন শিল্পী নিয়ে এই ইউনিটটি তৈরী করেছেন অরুণকুমার।

মেদিনীপুরে যাত্রা

মেদিনীপুরে শ্রীরঞ্জবিন্দ (হরিজন) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ কল্পে ১০ই এপ্রিল থেকে ১৪ই এপ্রিল পাঁচদিন ব্যাপী যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতার যেসব দল অংশ নেবে তাদের নাম হল—সত্যবর অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, গগনচাঁ, তরুণ অপেরা, নট কোম্পানী। এদের অভিনেয় পালা-গুলির নাম যথাক্রমে একদিন রাত্রে, বাঈর কোলে মৃত্যু, নন্দপাল, ক্রীতদাস ও নটি বিনোদিনী।

বিজয় বর্ষ ১৩৮২

জনতা অপেরা

নিবেদিত

পেয়ে হারানো

হারিয়ে পাওয়ার নাটক

স্ত্রী

আরো একটি ভয়ঙ্কর

রহস্যে ভরা

কালপুরুষ

শ্রেঃ জনসমুদ্রের মহান নায়ক

স্বপনকুমার

শ্রোঃ আপ নায়িকা

স্বপ্নাকুমারী

ফোন : ৫৫-০৭২২

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল আসন্ন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য মন্ত্রিসভা কিছুটা রদবদল হবে বলে ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা গেল। অর্থমন্ত্রী সত্তর খোষ রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হওয়ায় অর্থমন্ত্রীর পদটি শূন্য হচ্ছে। সেই সূত্রেই রাজ্য মন্ত্রিসভার সামান্য রদবদল হবে। মন্ত্রিসভায় একজন নতুন মন্ত্রীও নিয়োগ হতে পারে। শোনা যাচ্ছে রাজ্যসভার অনেক গুরুন সদস্যকে রাজ্য মন্ত্রিসভার নেওয়া হতে পারে।

অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ওপর। সিদ্ধার্থবাবু হঠাৎ দু দিনের জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর এই দিল্লী সফরের ওপর রাজনৈতিক মহল কিছুটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা সিদ্ধার্থবাবু দিল্লি তে রাজ্য মন্ত্রিসভার রদবদলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

তবে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় মন্ত্রিসভার রদবদল হবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করেন না। রদবদলের ব্যাপারটা রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন সমাপ্তির পর ঘটবে বলে এই মহলের ধারণা।

অম্লান দত্ত অর্থমন্ত্রী হতে পারেন

(দর্পণ প্রতিনিধি)

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অম্লান দত্তকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী রূপে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে, দর্পণের প্রতিনিধি নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই সংবাদ জানতে পেরেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী সত্তর ঘোষ বিধানপরিষদের অর্থমন্ত্রী-রূপে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে, দর্পণের প্রতিনিধি নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই সংবাদ জানতে পেরেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী সত্তর ঘোষ বিধানপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীঘোষ এপ্রিল মাসে এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর যোগদান সুনিশ্চিত।

সত্তরবাবুর রাজ্যসভায় মনোনয়নের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসী মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। মন্ত্রিসভার কয়েকজন নবীন ও প্রবীন সদস্য এ নিয়ে সংঘের শুরু করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর মন্ত্রিসভায় ভাঙনটি উচ্ছন্ন করার জন্য শক্তিশালী কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসার পক্ষপাতী। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই নাকি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় অম্লানবাবুর কথা চিন্তা করেছেন। প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে অম্লানবাবুর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনাও সেরেছেন। শ্রীদত্ত ঐ প্রস্তাব গ্রহণে তাঁর সম্মতির মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

অর্থনীতির নামকরা ছাত্র অম্লানবাবু বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এর আগে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের (অর্থ) কাজ চালান। ছেলে পড়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাগ্মী হিসাবে তিনি সর্ববিদিত। তবে মুখ্যমন্ত্রী যদি এই সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন, সি-পি-আই সর্বশক্তি দিয়ে একে বাধা দেবে বলে স্থির করেছে। অম্লানবাবুর নাম সোনারাত্র সি-পি-আই মহল তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্র প্রকাশ।

এক উচ্চ পদাধিকারীর সাকরেদের কীর্তি কাহিনী

১৯শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৯শে মার্চ '৭৬ ॥ দাম ৪০ পঃ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়ার নূপেন মজুমদার সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে বলে কিছু দিন আগে খবর বেরিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই নূপেন মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের অনেক উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তির খুব কাছের লোক। এর কিছুদিন আগে অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রভাবিত করার চেষ্টা, চাকরী ও সিনেমার নামনোর প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের নিয়ে কুৎসিত করা, ওষুধাদী ইত্যাদি সহ অভিযোগ জমা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতির কাছে নূপেন সম্পর্কে অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতা মীর বসির আলেদ।

অভিযোগ যে, নূপেন পূর্বোক্ত উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তির প্রভাব খাটিয়ে শিলুয়া থানার ও সি ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্যকে বদলী করায় যেহেতু নূপেনের অপকর্মের সহযোগী ইন্দুবাবুর হস্তক্ষেপ। তাঁকে বদলীর নির্দেশ দেবার পরই তিনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিটপিটিশন পেশ করে বলেন, নূপেন ও তার দলবল সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নেওয়াতেই তার প্রতি বদলীর এই নির্দেশ। বলকাতা হাইকোর্টে ইন্দুবাবু নূপেন ও তার দলবল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করেন। এই মামলা রয়েছে বিচারপতি শ্রীঅমিয় মুখার্জীর আদালতে। শ্রীমুখার্জী ইন্দুবাবুর অনুকূলে ইনজাংশন জারী করে বদলীর আদেশ কার্যকর করা আপাততঃ স্থগিত রেখেছেন।

হাইকোর্টে যে সব রিটপিটিশন পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ডায়েরী। এর সব কটিতেই নূপেন প্রমুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ রয়েছে। শিলুয়া থানার জি ডি ই ৬৪২ (২৩.১১.৭৪) জি ডি ই ৬০৯ (২২.৩.৭৫) জি ডি ই ৬৮৭ (১৩.৩.৭৫) জি ডি ই ৪৬৬ (১৪.৩.৭৬) ডায়েরীতে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলেও পুলিশ অফিসার সহ পাড়া প্রতিবেশীদের বানাভাবে হেনস্থ করেছে।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

যুব নেতারা দিল্লী যাতায়াত করছেন

রাজ্যের যুবনেতাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য সঞ্জয় গান্ধী পরামর্শ দিয়েছেন। বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠন নিয়ে যেসব মতবিরোধ দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে বেশ কয়েকজন যুবনেতা দিল্লীতে সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য দিল্লীতে গিয়েছিলেন।

যুবনেতা সোমেন মিত্র মার্চের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। সোমেনবাবুর সঙ্গে সঞ্জয় গান্ধীর যুব কংগ্রেস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা গেছে সোমেনবাবু সঞ্জয় গান্ধীকে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সঞ্জয় গান্ধী সোমেনবাবুকে ঐক্য বজায় রেখে নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এবং এ কাজে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাসও দিয়েছেন।

সুব্রত মুখার্জীও একই সময় দিল্লী গিয়েছিলেন সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। সুব্রতবাবু বর্তমান রাজ্য যুব নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছেন।

এরপর গত সপ্তাহে রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি বারিদবরণ দাস ও সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় ব্যানার্জী সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। বারিদবাবু কি কি অসুবিধার মধ্যে কাজ চালাচ্ছেন তা বিস্তারিত ভাবে শ্রীগান্ধীকে বলেন। দুই জন সাধারণ সম্পাদকের পূর্ণ অসহযোগিতার কথাও বারিদবাবু বলেন।

এদিকে গত পনেরোই মার্চের মধ্যে নাম ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু তা হয় নি। সুব্রতবাবু জেলাগুলোতে তার মনোনীত ব্যক্তিদের নাম না দেওয়ার এই বিলম্ব। তবে বারিদবাবু জানিয়েছেন এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সমস্ত জেলার পুরো কমিটির নাম ঘোষণা করবেন। এর মধ্যে যদি সুব্রতবাবু তার গোষ্ঠীর লোকদের নাম দেন তাল না হলে সুব্রতবাবুর কোটা বাদ দিয়ে বাকি নামগুলো ঘোষণা করা হবে। ঐকাসূত্র অনুযায়ী জেলার একজন সাধারণ সম্পাদক ও দুই-সুজনকে কমিটি সদস্যের নাম সুব্রতবাবু দেবেন।

হলদিয়া সার কারখানাকে বিরাট করে গড়ে তোলা হচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হলদিয়া সার কারখানাকে ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার কারখানা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন বলে এখানে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী পি সি সেঠি সম্প্রতি নামরূপ থেকে দিল্লী যাবার পথে যে সময়টুকু কলকাতার ছিলেন সেই সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হলদিয়ার অগ্রগতির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কেও নানা তথ্যসংগ্রহ করেন।

হলদিয়া কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই নাকি জানান যে, যে জমির ওপর হলদিয়া সার কারখানা স্থাপিত হচ্ছে সেই জমির অবস্থা খুবই খারাপ। এছাড়া উপযুক্ত জল সরবরাহের অভাবও হলদিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত করছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এবং অতি আধুনিকতম একটি সার কারখানা তৈরীর আনন্দে হলদিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্মীরা এই প্রকল্প দ্রুত শেষ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছেন। সার কারখানা তৈরীর শতকরা ৬০ ভাগ কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৭ সালের শেষাশেষি অথবা ১৯৭৮ সালের গোড়ার দিকে এই কারখানার উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। উৎপাদনের স্বার্থে এখানকার কোন কোন ক্ষেত্রে ইটালীয়ান, জাপানী, পোলিশ ও ডেনিশ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। জানাবেস অয়েল থেকে এখানে সার তৈরী হবে। দেশের কৃষির প্রয়োজনে তাল রেখে ১১০ হাজার টন নাইট্রোজেন, ইউরিয়া ও এন পি কে কমপ্লেক্স সার এই কারখানা থেকে প্রতি বছর উৎপাদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লক্ষিত ও দৃষ্টিত

গত ৯।১১।৭৩ তারিখের দর্পণ পত্রিকার ৮ম পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে "দুর্গাপদ প্রমোদ বিস্তার" শিরোনামায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পুলিশী সূত্রে আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি এই সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা। অতএব এই সংবাদ প্রকাশের জন্য আমরা লক্ষিত ও দুঃখিত।

চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

[১৯৭১ সালে চীনপরিদর্শনের সময় জনাবদের এডগার স্নোকের গ্রন্থের লেখক উইলিয়ম হিন্টন চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে পাঁচ দফা সাক্ষাৎ-আলোচনা করেন। একটি সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন তখন পিকিংয়ে হাজির ৭০ জন আমেরিকান। অন্যগুলো ছিল ছোট ব্যাপার এবং তাতে উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘকাল চীনবাসী আমেরিকান। একটিতে হাজির লোকেরা ছিলেন কেবল হিন্টন পরিবারের সদস্যগণ। এই বিবরণটিতে আছে সমাজবাদী যুগে শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি। নিউ চায়না নামক আমেরিকান সাময়িকীতে এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল।]

হিন্টন : সর্বত্র সমাজবাদের অগ্রগতি এবং সমাজবাদের জন্য উৎসাহ দেখে আমরা খুশি। কিন্তু রাজনৈতিক সংঘাত এখনো চলেছে কেন?

চৌ এন লাই : শান্সির কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষাসফরে যে সেকেলে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা কখনো তবেছেন কি? তা কি আপনারা অনুসন্ধান করেছেন? শান্সির লোকেরা এখনো একটা কুপ্রথা অনুসরণ করে থাকে। প্রসবের প্রসূতিকে একটা কাপড়ের উপর শোওয়া দলে থাকতে হয় এবং তাকে কিছুই খেতে দেওয়া হয়না। এভাবে বসে থেকে অনেক স্ত্রীলোকের পিঠ বেঁকে গেছে। প্রাচীনকালে মেয়েদের এমনিতেই প্রচুর শক্তিক্ষয় হয় কিন্তু শান্সিতে তাদের কোন পুষ্টিকর খাবার দেবার প্রথা নেই। এমন কি শোয়াবিনের দুধ পর্যন্ত নয়—দু একটা ডিমের কথা তো বাদ্যনা। তাকে দেওয়া হয় কেবল সামান্য ভাত বা বাজারের খাদ্য।

এ ঘটনা শোনেন নি? তাহলে আমি বলতে বাধ্য যে, আপনাদের অনুসন্ধান খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়।

সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্যে শান্সির জনসংখ্যা বেড়েছে সব চেয়ে কম। আজ পর্যন্ত তা দু কোটি অতিক্রম করেনি। গণমুক্তির আগে যেসব প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল দু-কোটির নীচে যেমন ফু কেন, কোয়াংসি ইউনান কোয়ই চৌ, সেন্সি এবং শান্সি। এর কারণ এ নয় যে, শান্সির লোকেরা ভাল ভাবে জন্ম নিরোধ করেছে, বরং একমাত্র এই কারণ যে, যদিও অন্যান্য শিশু সেখানে জন্মায় তবু তাদের বহুলাংশ বাঁচেনা। শিশুমৃত্যুর হার শান্সিতে এখনো খুব বেশি। এ ব্যাপারে আমরা অনেক কাজ করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাইনি।

প্রাচীন প্রথা বদলান খুব কঠিন ব্যাপার। পশ্চিম শান্সি হল সব চেয়ে খারাপ। একটা অঞ্চলে-কোনানের বহিরাগত 'লোকদের দ্বারা তৈরী একটা ব্রিগেড আছে। তারা হাস্পাবিবির প্রতি খুব দৃষ্টিদান। তাদের শিশুরা বেঁচে থাকে এবং সুস্থ ভাবে বাড়ে। কিন্তু চারপাশের শান্সির গ্রাম লোকেরা এই বহিরাগতদের কাছে কোন শিক্ষা নেয় না। পরিবর্তে তারা হোমানীদের হেয় জ্ঞান করে।

গত কয়েক বছরে তাদের কাছে আমি কয়েকটা ভাক্তারী দল পাঠিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকটি গণমুক্তি ফৌজের দল আর বাকি নিয়মিত সংকারী দল। আধুনিক পদ্ধতি যখন তারা হাতে কলমে দেখার তখনকার লোকেরা মনোযোগ দেয় কিন্তু যেই মাত্র এই দলগুলো সেখান থেকে চলে আসে অমনি সেখানকার লোকেরা তাদের পুরাতন অভ্যাসে ফিরে যায়। কেউ কেউ অসুস্থ হলে ওরা দেখায়। শান্সিতে এখনো কিছু ওঝা আছে। আগের দিনে ঐ সব পালোতে অন্তর কট আমি থাকত। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ (১৯৩৭-৪৫) বা গণমুক্তিসংগ্রাম (১৯৪৬-৪৯) কোন সময়েই তারা এদের সংযোগ হারিয়ে ফেলেনি। দেশের সামগ্রিক মুক্তি পর্যন্ত তারা বিপ্লবীদের হাতে ছিল। তবু এই সব সেকেলে কুপ্রথা এখনো আছে।

এখন কিছু আপনারা আবিষ্কার করেছেন কি?

কার্গা হিন্টন : তখন লোকেরা হয়ত আমাদের ভিত্রাম্বেষী বলত।

চৌ এন লাই : যেমন আপনি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে যাচ্ছেন। যতই বলি না কেন, কুসংস্কার-মূলক ধারণা হাজার হাজার আছে। কিন্তু এদের আপনি যে চোখেই দেখুন না কেন, চীনের সমাজ এগিয়েই চলেছে। আমার বিশ্বাস আপনারা সবাই একথা স্বীকার করবেন। কিন্তু এই অগ্রগমন কালের মধ্যেই এই সব পশ্চাদমুখী ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ নয়। কয়েক হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্যানধারণা লোকের মনে চেপে আছে। তেমনি আছে পুরানো শ্রেণীগত অভ্যাসগুলো। গ্রামাঞ্চলে যদিও আগেকার গরিব এবং গরিব মাঝারি চাষকেরাই এখন সংখ্যাধিক এবং পুরানো জমিদার এবং ধনী কৃষকরা এত সংখ্যালঘু যে, তাদের গড় শতকরা ৭ এর কাছাকাছি মাত্র, তবু এই সব পুরানো শোষকেরা আজ পর্যন্ত টিকে আছে। তাদের চিন্তাধারা অন্যদের প্রভাবিত করে। এরা এমন একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তৈরী করে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবশ্য প্রয়োজন।

সমাজবাদের অধীনে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব এখনো আছে। অবশ্য অতগুলো বিশেষ জায়গা আছে যেখানে পুরানো শোষকেরা সংখ্যায় সমধর্মা যা আদৌ নেই। শান্সি প্রদেশের তাগাইয়ে জমিদার বা ধনী কৃষক বেশী নেই। হোপী প্রদেশের শাংসিইতে আপনারা গেছেন। প্রথমে আমরা যখন কাজে নামলাম তখন সেখানকার সব লোকই ছিল তিথিরি। কাজেই আজ সেখানে পুরানো জমিদার বা ধনী চাষী দেখতে পাবেন না। তবু একথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব আর নেই। কারণ এই সব অঞ্চলের চাষপাশে এমন জনসমাজ আজে যাদের মধ্যে পুরানো শোষক বহু আছে। অধিকাংশে ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কার হয়েছিল ২০ বছর আগে (১৯৪৯-৫২)। কাজেই পুরাবো জমিদার এবং ধনী চাষী বহুল সংখ্যায় সর্বত্র আছে।

এই শোষকদের পুত্রকন্যাদের যদি যদি গণভূমির সময়ে ঘরে থাকে তাহলে তারা কোন শোষণকার্যে অংশ নেয়নি। এদের কিছু হয়েছে ছাত্র আর কিছু শ্রমিক। তবু তাদের উপরে তাদের পিতামাতার প্রভাব সঞ্চার হতে পারে।

এই গড় যদি শতকরা ৭ বলে ধরে নেন এবং ৬০ কোটি গ্রামবাসীর সংখ্যাটা যদি ভুলভাবে করেন তাহলে দেখবেন যে, এই সব প্রাক্তন জমিদার এবং ধনী চাষীদের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এদের অর্ধেকও যদি পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাহলে অপরিবর্তিতদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি এবং এই ঘটনাই সমস্যার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করবে। কারণ এই অবশিষ্টাংশের পরিবর্তন সাধন সহজ নয়।

সং বো গ্রামে এ ধরণের কোন লোক আছে কি?

হিন্টন : সামান্য কজন।

চৌ এন লাই : কাজেই শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব এখনো আছে যদিও প্রাক্তন শাসকদের ক্ষমতা আর নেই বরং তাদের উপর খবরদারি করে আমাদের গণশক্তি।

সমাজোচকদের পক্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী শ্রেণী সংগ্রাম আরো পরিষ্কার ছিল। একটা বুর্জোয়া শ্রেণী লাভজনক ব্যবসাগুলির মালিক এবং পরিচালক ছিল। অন্তর্বর্তীকালে (১৯৭১-৫১) আমাদের নীতি ছিল 'ব্যবহার করো, নিয়ন্ত্রিত করো এবং পরিবর্তিত করো'। তারপর ১৯৫৬ সালের শেষদিকে এবং ১৯৫৬ সালের বসন্তে এই বুর্জোয়া গোষ্ঠী ঢালু পিচিয়ে আর করতাল বাজিয়ে হাত ধরাধরি করে সমাজবাদী সমাজের দিকে শোভাযাত্র করে চলে গেল। কেউ কেউ তাদের সংস্থা ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণের হাতে তুলে দিল, কেউ কেউ সরকারী-ব্যক্তিগত যুক্ত উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করল আর অন্যরা সমবায় আন্দোলন সুরু করল যেমন হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে। এ সমস্ত কালেকটিভাইজেশনের রূপে ঘটেছে এবং উন্নততর সমবায় আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে এগিয়ে গেছে।

সমাজবাদী মালিকানার দিকে এই পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুঁজিপতিদের সুদ মকুব করলাম তাদের সম্পত্তির হিসাবীকৃত মূল্যের অনুপাতে। যতটা যত আমাদের হৈরি হিসাবেই একটু করের দিকেই ছিল। সর্বহারা (প্রমিক) শ্রেণীর পক্ষে পুঁজিপতিদের সম্পত্তির মূল্য বেশী করে না দেখাই স্বাভাবিক। সে সময় ব্যক্তিগত মালিকানার ভাতে যোট পুঁজির হিসাব আমরা করেছিলাম ২ বিলিয়ন ২০০ মিলিয়ন ইউয়ান বা ১০০ মিলিয়ন ইউ. এস ডলার। শতকরা ৫ হিসাবে আমরা প্রাক্তন মালিকদের বার্ষিক দিতে দিলাম ১১০ মিলিয়ন ইউয়ান বা ৫৫ মিলিয়ন ইউ-এস ডলার। ১৯৫৬ সন থেকে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত দশ বছর অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম বছর নাগাদ আমরা এই টাকা দিয়ে দিয়েছি। তার পর টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের এই টাকা দেওয়া যে ঠিক দশ বছরের জন্য হয়েছিল—কমও নয়, বেশিও নয়—তাকে বলা যায় কাকতালীয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ ক্রয় করে আমাদের শিল্প এবং বাণিজ্যনীতির যে সূচনা হয়েছিল তা আপনারদের সবারই জানা আছে। কাজেই এই বিষয় আমি পল্লবিত করব না। কিন্তু যে বিষয়টার উপর আমি জোর দিতে চাই তা হচ্ছে প্রথম দিকে পুঁজিপতিদের যে সাহায্য দিয়েছিলাম তার কথা। গণমুক্তির ঠিক পরেই কাপড়ের কলগুলো তুলো পেত না কাজেই তাদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। আমরা তাদের চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলাম যাতে তাদের শ্রমিকরা মালিকের ঠিক মত মাইনে পায় এবং চাকরি বজায় রাখতে পারে। পুঁজিপতিরাও অবশ্য এই ধারা উপকৃত হয়েছিল। তার পর সুদ হিসাবে তারা তাদের নিয়োজিত পুঁজির অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ মিলিয়ন ইউ. এস ডলার পেল। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত সকল ক্ষেত্রে খাটে না। কিছু লোক তাদের পাওনা সুদের টাকা নিতেই আসেনি। অন্যরা 'গণতন্ত্রবাদী' হয়ে উঠল এবং তাদের কজের জন্য প্রাণা মাইনে মঞ্জুর নিল। কোন সুদ নিতে তারা রাজি হল না। কেউ কেউ টাকা নিতে অস্বীকার করল কারণ তাদের অংশ ছিল খুব সামান্য। একবার সুদ নাবে কিছু দিলেই লোকে বলবে তুমি পুঁজিপতি। কারব কারব কাছে একে মজুরি পোষাল না। কাজেই পুঁজিপতিদের পাওনা টাকার পুরোটাই কার্যত দেওয়া হল না।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ফেটে পড়বার পরে জনগণ ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যক্তিগত পুঁজির সুদ হিসাবে আর কোন টাকা দিতে রাজি হল না। এই সময় পুঁজিপতাগত টাকা ধারি করতে সাহস পেল না। কাজেই টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তবু এই সব লোকেরা এখনো একটা বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত। তারা এখনো আছে। সংখ্যা তাদের সংখ্যা বেশ বড়ো। শহরে এদের শতকরা গড় গ্রামাঞ্চলের জমিদারদের চেয়ে বেশী হতে পারে। পরিবারের সমস্ত লোককে ধরে হিসেব করে আমরা এক কোটির মত একটা সংখ্যা পেয়েছি।

আর এক বর্গের বুর্জোয়া আছে—পেটি বুর্জোয়া। যেমন গ্রামাঞ্চলের উচ্চমধ্যবিত্ত চাষী। ভূমি-সংস্কারকালে" তারা তাদের জমি রেখেছে। তারা নিজেরা কাজ করেছে, তারা কমিউনের সদস্য হয়েছে কিন্তু এখনো তাদের মধ্যে ধনী বা উচ্চমধ্যবিত্ত চাষীর চিন্তাধারা কাজ করছে। চাষীদের যদি তিনটি বর্গে ভাগ করা যায় যেমন উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন তাহলে মধ্যবিত্ত চাষীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগতত্ত্ব চিন্তাধারা দেখা যাবে। এটাই হল পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারা। এমন কি সাধারণ একজন গরিব চাষীর পর্যন্ত বিলক্ষণ পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারা থাকে। আগে তাদের কোন আর্থিক মর্যাদা ছিল না বলে তারা ছিল আধা-সর্বহারা। কিন্তু ভূমি-সংস্কারের পরে কিছু কাল তারা নিজস্ব জমি পেয়েছে এবং চাষ

(শেষাংশ পরের পৃষ্ঠায়)

উইলিয়ম হিন্টন

* ফানশেনের এই গ্রামে হিন্টন সমীক্ষা চালিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ

৫ই মার্চের দর্পণে প্রকাশিত মিহির আচার্যের পত্রখানির তীব্র উষ্মার মধ্যেও তাঁকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি। 'পথের দাবী'র একটি সাম্প্রতিক নাট্যরূপ দেখে আমার মতো অনেকেরই বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো যে, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দর্পণে গড়া মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম দলিল হলো এই শরৎকাহিনীটি, মার্কসবাদী শিবিরের কাছে যার প্রচার-দাবী বহুবার উল্লেখিত হয়ে এসেছে দারুন অসন্তুষ্টভাবে। শরৎচন্দ্র নাকি অবাঞ্ছনীয় শিল্পী।

অথচ এদেশী মার্কসীয় পণ্ডিতেরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাতঃস্মরনীয়তা মেনে নিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের অসীম অবদান আছে স্বীকার করি; কিন্তু ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল তাঁর অবদান অনুরঞ্জিত হতে পারাতো কি? তিনি কি মূলতঃ ইংরেজেরই দক্ষ আমলা নন? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মুসলমান সম্প্রদায় ও নিচুজাতের হিন্দু, তাদের শিক্ষার পথ সুগম করবার কোনো চেষ্টাই কি তিনি সচেতনভাবে করেছেন? তার থেকেও বড়ো অভিযোগ এই যে, তিনি নানাভাবে বহু নাবালিকা কনে জুটিয়ে বৃটিশ-আইনের মানরক্ষার এমন সময়ে বিধবা-বিবাহের বৈ-বৈ আন্দোলন করেছেন, যখন সাঁওতাল-বিদ্রোহ নিপাহি বিদ্রোহের তাপে দেশের মর্মরাবোধ জাগতে শুরু করেছে, বাঙালী কবি গেয়ে উঠেছেন—'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে!' অথচ মুসাসনের কৃতিত্বে ইংরেজ রাজপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে 'ক্রিয়মন্বীয়'রূপে পূজিত হয়েছেন। তিতুমীর থেকে নীল-বিদ্রোহ বা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠা অবধি কোনো স্বদেশী-সংগ্রাম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কখনও সংঘ ধ্বনি। অবশ্য বিধবা-বিবাহ-কে স্রেফ নাইকে তাঁর প্রিয়-পাত্রেরা বিপাহী-বিদ্রোহীদের মুণ্ডপাত করেছে বিদ্যাতই নির্লজ্জভাবে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও কি পরাধীন জাতির বঞ্চনা-বিদ্রোহের কোনো প্রতিচ্ছবি আছে? তাঁর 'বোধ ও রোঝ' তো শরৎ-সাহিত্যের 'জন-অরণ্যে'র মতো এদেশের নাধারণ মানুষের ওপর মুকৌশলে সীমাহীন অবাস্তব জ্ঞান করেছে। 'পথের দাবী' নিয়ে যখন মার্কসবাদীদের অনেকেরই আশার বড়, তখন বৃটিশ-শক্তির পরাধীনে পরাধীন জাতিকে সচল হয়ে ওঠার কৌশল 'অচলায়তন' নিয়ে তাঁদের আধাগরিভাব! 'চার অধ্যায়ে'র মতো শানকুণ্ঠিত সাহিত্য যদিও বিশ্বে বিরল, এদেশে তা নিয়ে লিখের অন্তত 'দেরা' নাইক হয়, সৎ-মাইক হয়—প্রগতিশীলেরাই করেন! তালিয়ানওয়ালাবাগের ইংরেজ-নৃশংসতার প্রতিবাদ-প্রতিশোধে উধম সিংয়ের আত্মোৎসর্গের কথা বেমালুম চাপা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তুচ্ছ নাইটহুড-ত্যাগের নাম-কিত ঘন্টানাদিকে যতো করে তুলি তুলে ধরে সেই বহুল্য যা তাঁকে জাতীয় 'বড়ো ইংরেজে'র ঘণ্টি-ভার গণ্ডীতে ধরে রাখলো, 'স্যার মৈগেন্দ্র' পদবিটিকে ভোগ-অভিলাষে কুণ্ঠিত দিলো। পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিকার রবীন্দ্রদত্ত প্রীতির অভিনন্দনের সহ বার নেতা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে কার্ল মার্কসের ওপরে নাহলেও পাশে স্থাপন করে দিয়েছেন, ১৯। যে আর ২৫শে বৈশাখ

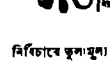

নির্বিচারে ভুলামূল্য করে ফেলেছেন। এই অপচেতনার ঐতিহ্য অনুসরন করেই ভবিষ্যৎ কালিদাস কবি ৩০শে জানুয়ারীর দর্পণে মধ্যবিত্ত মানুষকে অথবা গালমন্দ করতে গিয়ে একটি আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছেন—"দাদার তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কস দুইই দূর অতীতের বস্তুত হয়ে রইলো।" এক পত্র মাধ্যমে ২০শে ফেব্রুয়ারী আবার তিনি তরুণদের অভিযুক্ত করেছেন সুবীল-শক্তি-প্রচারিত অপসংস্কৃতির ভক্ত হিসেবে, কিন্তু এ সংস্কৃতি যে মার্কসীয় সংস্কৃতির বিপরীত ফ্রেকে অবস্থিত রবীন্দ্রসংস্কৃতিরই রসপুষ্ট সংগাতা, তা কি অস্বীকার করা যাবে?

আসলে সমস্ত প্রগতিশীলতা-সত্ত্বেও আমরা ভেতরে ভেতরে 'আমাদের লোক' বলে যাদের প্রচার করতে চাই তাদের তেমন অবস্থানটাই ভুল মেরে দিই। একই সঙ্গে ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের সংযোগী আর পরাধীন ভারতের প্রগতিশীল প্রতিনিধি হওয়ার মতো পরস্পর বিরোধী কর্ম করা যে অসম্ভব ছিলো, তা ২৩শে ফেব্রুয়ারীর বিধির আচরণের মুনাহারী প্রসঙ্গটি পড়েও স্বীকার করতে ইচ্ছুক করি। আমাদের এই অস্থিরতা অসততাই আজকের উদ্ধুমনার জন্মদাত্রী নয় কি? অতএব শরৎ-মূল্যায়নের অসততার আশ্চর্য হই না।

নির্মল নাহা

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

খবরে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ছাত্রীদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে নাচ-গান প্রদর্শন করবার প্রস্তাব করলে ছাত্রীরা নাচতে-নাচতে সংঘের গান ধরলেন: বাড়িয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে।

• •

"ইংরেজের কারাগার ছিল সভ্য সমাজের আতঙ্ক। এমন কোনো বর্বরতা নেই যা সেখানে অনুষ্ঠিত হত না।" সম্পাদকীয়, যুগান্তর, ৩১া মার্চ।

• •

খবর শুনে দেশবিদেশী মাত্র দুঃখিত হবেন, পশ্চিম বাঙলায় আট হাজার টি. ভি. সেটও বিক্রি হয়নি।

• •

জানা গেল, ভারতীয় প্রথায় কৃষ্টিতে এবার রুশগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়।

• •

প্রগতির পরিসংখ্যানে জানা গেছে ২,৪০০ গ্রামে টি. ভি অনুষ্ঠান চালু হয়েছে।

• •

শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগ জানিয়েছেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে ১৯৭৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি কারখানা লে-অফ'এর ফলে চার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন।

• •

"পুলিশের অত্যাচার উৎপীড়ন বন্ধ করতে হবে।" শ্রীবেঙ্কটা।

• •

নাস্তিকদের "ভালো মানুষ" নটনটীরা অবশেষে বাস্তায়।

প্রকাশ, বহুনাম মালিকগণ ওঁদের ঘেরিয়ে দিয়ে নিজেদের "বঞ্চনাটকে" আরও দিয়েছেন।

• •

"বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেত্রী, ইন্দিরাজী আমা--আপনার-সকলের নেত্রী।" শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

• • •

সারা বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সংবাদপত্রকে জানিয়েছেন, বাদেদদর ফি প্রাই-মারি বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্যোতিশ্চন্দ্র দে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি অনাহারে মারা গেছেন। তিনি যা সামান্য মাইনে পেতেন তাঁর পরিবারের সংসার চলত না। তদুপরি মৃত্যুর আগে তিনি দু মাসের বেতন পাননি বলেও জানা গেছে।

মাত্রাজ শ্রীকাঁন কলেজের ছাত্রদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা গেল, তামিলনাড়ুর শতকরা ষাটজন লোক অক্ষরি অবস্থার পক্ষে।

• •

আনন্দ সংবাদ। "বুকুমার রচনা সংগ্রহের" তিন নম্বর প্রকাশক হিসেবে আবার অভিযোগ জানালেন জাতীয় সাক্ষরতা সমন্বয় সমিতি। ইতিপূর্বে এশিয়া ও আনন্দ পাব-লিশার্স রচনা সংগ্রহটিকে করেছেন।

• •

"চলুন রাত্রির রবীন্দ্রনাথ" কেতাবে নেহরু ও প্যাটেলকে "পতন" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। "এই বইকে কোনো ক্রমে দেয়াই উচিত নয়...যেহেতু বাজার মাত্র কববার একমাত্র উদ্দেশ্যই এই বই লেখা হয়েছে" আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন শ্রীবরণ সিং।

• •

সোভিয়েত অভিযোগ করেছে, চীনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পঁচিশতম অধি-বেশনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে।

• •

রাষ্ট্রমন্ত্রী মোতাফার হোসেনের মতে, দেয়ালে লজ্জা শোস্টার লিখে রাজনীতি করার দিন আর নেই। এখন কাজের মাধ্যমেই মানুষের মন জয় করতে হবে। এই সিদ্ধান্তে পশ্চিম বাঙলার দেয়ালে লিখন নিষিদ্ধ হল।

• •

শোষণের প্রতীক হিসেবে মধ্য-বিত্ত শ্রেনির বেস্তারুত্তির ব্যবহারের সাম্প্রতিক ক্যাপানের চিত্র লজ্জাজি-রূত জনজনগণ।

• •

দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও সামকপাটি ও বিরোধী পক্ষ উভয়ই সংবিধানের সংশোধনের পক্ষপাতী। অবশ্যই বৃহত্তর জন-গণের স্বার্থেই এই তাগিদ।

• •

শ্রীবরণ সিংয়ের সদ্য-মুক্তির খবর সংবাদপত্রে পরিবেশিত হলে পর আমরা জানলাম তিনি এতদিন কারেদী ছিলেন।

•

"রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে উদাসীন থাকা পাপ, এবং সব পাপের মতোই এটা সংক্রামক। কিছু সংখ্যক লোক এ বিষয়ে বিপজ্জনক ভাবে অক্ষিত এবং কিছু সংখ্যক আরোগ্যের বাইরে চলে গেছে।" শ্রীলালকি-ওয়ালা।

• •

শেষ সংবাদ। সর্বভারতীয় নেত্রী শ্রীমতী অম্বিকা সোনি পাঞ্জাব থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচনে পেয়েছেন।

জাপানে শ্রমমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কোন মারণিকতা থেকে একটি জাতি বড় হয়ে ওঠে সেই গল্প শুন-ছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ তাঁর সহকর্মীদের কাছে। দমদম এয়ারপোর্টের ডি. আই. সি কমে বসে তখন রাজ্যের অর্থ-মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ শুরুদ্দ খান, পূর্ত-মন্ত্রী তোলা সেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যরা। সবাই বসে আছেন প্লেন্ট যাবার অপেক্ষায়। ডাঃ নাগ তাঁর জাপান সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, জাপানের ছেলেই মটোর তৈরীর কারখানায় যেন্ডি। যেখি প্রতিকা কাজ করছে। কিন্তু হাতে বাঁধা লাল ফিতে: উই আর অন স্ট্রাইক! জিজ্ঞেস করলুম, স্ট্রাইক করছো তাহলে আমার কাজ করা কেন? ওরা হেসে উত্তর দিল, যেমুন আমরা স্ট্রাইক করছি আমাদের দাবী দাওয়া নিয়ে তাই বলে দেশের উৎপাদন বন্ধ করবো কেন? আমরা মানে মাইনে পাই ৬৮০ ডলার। কিন্তু বছরে বোনাস পাই ৪৮ হাজার ডলার। স্ট্রাইক করছি বলে যদি উৎপাদন বন্ধ করি নিজা মা তৈরী করছি তার মান খারাপ করি তাহলে বাজারে তার চাহিদা কমে যাবে এবং আমরাও এত সোনার দানী করতে পারবোনা। বালিকরা আমাদের হাতে মাল দেখেই আলাপ ঠালোচনায় ডাকবে কিংবা আমরা কারবারের বাইরে গিয়ে স্লোগান দেবো। কিন্তু তাই বলে উৎপাদন বন্ধ রাখা যা জিনিষের মান কমিয়ে আমা আমাদের দায়ী হবেনা।

ডাঃ নাগ বললেন, শুধু এই ঘটন টুকুই আমাকে লজ্জে বুঝিয়ে দিয়েছিল জাপানীরা কেন এত বড় জাতি হতে পেরেছে।

সাহিত্য তৃতীয় পক্ষ

লাবন চট্টোপাধ্যায়

সৌন্দর্য প্রীতি, চিন্তার বিস্তার এবং সামাজিক চেতনার বিকাশ বিশেষেই লেখকের কীর্তি পাঠকদের মনের দরজায় হাজির হয়। লেখনী ছাড়া অন্য মাধ্যম যা কলাকৌশল তার আয়ত্তে নেই। শিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা—প্রত্যেকেই যার যার নির্দিষ্ট মাধ্যমেই মনের ভাব বা বক্তব্য ব্যক্ত করে থাকেন। সুতরাং শিল্প বা সাহিত্যে দুই পক্ষের—লেখক ও পাঠক, শিল্পী ও দর্শক-এর পারস্পরিক সম্পর্ক শিল্প ও সাহিত্যের বিবর্তনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সামাজিক পরিস্থিতি রাজনৈতিক প্রভাব এবং সমাজের মূল কাঠামোর অন্যান্য সমস্যাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেই সাহিত্যে বা শিল্পের ক্রমবিকাশে লেখক পাঠকের পারস্পরিক সম্পর্কে কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রতিটি লেখকই বিজয় পাঠক সৃষ্টিতে মনোযোগী এবং সাধারণ একজন সমালোচকের বক্তব্যকেও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। এক কথায় ব্যাপক পাঠকের রুচির বিন্যস্ত লেখক এবং লেখকের অভিভাবক অসংখ্য পাঠক—উভয়ের মেলুয় বন্ধন হল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের নানা রূপ বা কর্ম। সাহিত্যে এই দু পক্ষের যাবতীয় এক-জাতীয়—পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বক্তব্যের নতুনত্ব। তবুও অবশ্যম্ভাবী রূপে, সাহিত্যে একটি তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়—প্রকাশক। প্রকাশকরাই লেখকের সৃষ্টিকে পাঠকের কাছে হাজির করেন মুদ্রণ, বিপি ব্যবস্থা এবং প্রচারের মাধ্যমে। সাহিত্য প্রীতি ছাড়াও আর্থিক লাভালাভও তাদের একটি অন্যতম বার্থ। সুতরাং সাহিত্যে এই তিন পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকাটা একটু বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার।

প্রকাশক ও লেখকের সম্পর্ক কোন কালেই মধুর ছিল না। বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে লেখকদের বরাবরই প্রকাশকের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। বৈশ্য-বুদ্ধির ছলা-কলায় সে সর্বদাই পরাভিত—ব্যতিক্রম কিছু থাকলেও থাকতে পারে তবে প্রচলিত রীতিটা এতই ব্যাপক, অনায়াস উদাহরণ টানতে কারও পক্ষে বিশেষ অসুবিধে হবে না। বিপরীত পক্ষে, নতুন নতুন লেখক সৃষ্টি করে আর্থিক ঝুঁকি, মূল্যবান বিদেশী পুস্তকের অনুবাদে উৎসাহ, শিল্প-সাহিত্যের প্রসারে কয়েক দশক আগেও প্রকাশকদের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা অস্বীকার করলে চলবে না। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজ-রোষ চিহ্নিত হওয়ার ভয়কে উপেক্ষা করেও প্রকাশক বইটি ছাপতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই প্রকাশকদের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিভাশালী লেখকদের সন্ধান পেয়েছে, তাদের ভাল ভাল গল্প সংকলন, উপন্যাস ও প্রবন্ধের প্রকাশের কৃতিত্বটুকু প্রকাশকরা দাবী করতে পারেন বিশেষ করে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য-সেবী কিছু প্রকাশক বিশ্ব সাহিত্যের বেশ কিছু ভাল বইয়ের অনুবাদ বাঙালী পাঠকের উপহার দিয়েছিলেন।

তিন পক্ষের একটি সীমারেখা তখন বর্তমান ছিল। লেখক যেমন প্রকাশকের দ্বারে হাজির হতেন, প্রকাশকরাও সাহিত্যের গুণাগুণ, রুচির প্রশ্নে লেখকদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মুনাফার প্রশ্নটা সেখানে থাকলেও, পাঠকদের চিন্তার বিকাশ ও রুচির প্রশ্ন লেখকদের বক্তব্যকে প্রকাশককে মেনে নিতে হত। সম্ভবত, এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্যই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ফল-ফুলে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল।

পরবর্তীকালে, সমাজের মূল কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে তিনটি পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের আমূল রূপান্তর ঘটে। লেখক পাঠক সম্পর্ক, সমাজের রুচির প্রশ্ন এবং সাহিত্যের প্রাথমিক আকুটুকুও ভেঙে, প্রকাশকরা 'একেশ্বরবাদে' বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। পাঠকদের রুচি, লেখকদের বক্তব্য কিংবা সাহিত্যের ভূত-ভবিষ্যৎকে দলিত-মথিত করে, অর্থ ও ক্ষমতার একমাত্র প্রভু হয়ে উঠলেন। আজ লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের মত। নতুন ও মাঝারি লেখকদের পকেটস্থ বটেই। নামজাদা লেখকদেরও আজ নির্দেশ মত লিখতে হয় অন্যথায় বাগপ্রস্থ বা অজ্ঞাতবাস। কারণ, সাহিত্য আজ এত প্রচার মুখাপেক্ষী যে সেখানে প্রভুর সুরের বৈশম্য ঘটলে, হতভাগা লেখক সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। আজ খুশি মত প্রকাশক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন ফলে পাঠকদের রুচিও এক শ্রেণীর লোকের ইঙ্গিতাপেক্ষে বন্দী। কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে হারেমের কেচ্ছা, কখনও রাজনৈতিক গোল-গল্প, কখনও বা যৌন ও রক্তাক্তমূলক ডিটেকটিভ কিংবা টেক্স সমধর্মী বইয়ের অঢ়েল পাঠকদের গিলতে বাধ্য। রুচি বা চিন্তার বিকাশ এখন প্রকাশকদের হাতে। নিছক টিকে থাকবার তাগিদে সাহিত্যিকরা নির্দেশ মত কলম চালাচ্ছেন কিংবা বিবেকবান সাহিত্যিকরা প্রকাশের অভাবে অন্তর্মুখীনতার ভুগতে ভুগতে নিঃসঙ্গে পাঠক দর মন থেকে যাচ্ছেন হারিয়ে।

আজ নাকি কবিতা, জীবন ধর্মী গল্প এবং সৃষ্ট উপন্যাস অচল—বলছেন প্রকাশকরা। এদেরই অঙ্গুলি হেলনে বাংলা ছোট গল্পের নাভিশ্বাস। সারা বছরে যত বই মুদ্রিত হয়, ছোট গল্পের সংখ্যা শতকরা কোন হিসেবেই পড়ে না। ফলে গল্প লেখকদের কাছে কিছু পত্র-পত্রিকা ছাড়া বেঁচে থাকবার কোন পথ নেই। আমি জানি, এমন কিছু গল্পলেখক আছেন, যাদের শতাধিক গল্প বিভিন্ন উচ্চমানের পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে কিন্তু এখনও দু মলাটের মধ্যে আসতে সক্ষম হয়নি। এ পরিস্থিতি নিশ্চয়ই সাহিত্য-বিকাশে স্বাভাবিক নয়। বিদেশী সাহিত্যেও বটেই, আমাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও—অসমীয়া, হিন্দী, গুজরাটী, তেলেগু, মালয়ালাম, উর্দু ইত্যাদিতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার নিয়মিত পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে, ছোট গল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিংবা বক্তব্যে—বলতে দ্বিধা নেই—অন্যান্য ভাষার লেখকরা বর্তমানে বাঙালী সাহিত্যিকদের উৎকর্ষতায় ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এখানে 'ছোট গল্প পাঠক নেই না'—প্রকাশকদের এই উদ্দেশ্যমূলক ফতোয়া তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত গল্পকারেরা কলম পরিত্যাগ করে। উপন্যাসের নামে বৃহৎ বস্তুর বিস্তৃতিকিমাকার এক সাহিত্যকর্ম নিয়ে মেতে উঠলেন; ফলে বিলাস-ব্যসনের কিছু আর্থিক বচ্ছলতা এল কিন্তু সাহিত্যের এতবড় ঐতিহ্য আজ মুমূর্ষু-প্রায়। 'একা রুদ্ধ রক্ষা করে…'—কিছু বিবেকসম্পন্ন লেখক কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব ব্যয়ে বা আংশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েই গল্প-সংগ্রহ বের করতেন, কেরি করবার দায়িত্বও তিন লেখকের নিজস্ব। এত বড়-বড় স্বীকার করেও কিছু কিছু গল্পের ইঁ পাঠকরা উপহার পেত তখন, কিন্তু মুদ্রণ খরচা, কাগজ এবং প্রচারের সুযোগ-সুবিধার অভাবে শেষ চেষ্টাও আজ প্রায় বন্ধের দিকে।

কবিতার কথা উল্লেখ করে বেদনার পুনঃপ্রকাশ করতে চাই না কারণ ছোট গল্পেরও বহু পূর্বে প্রকাশকের কোষদেশে শুকেছিল। 'সমুদ্র পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়!'—কবিদের মনের অবস্থা আজ এই। কোন কালেই তারা প্রকাশকদের

(লেখাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

চৌ এন লাই

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

করেছে। সমবায় এবং কমিউনে যোগ দেওয়ার পরে তারা নিজেদের জমি একত্র করেছে এবং সকলে মিলে মালিকানা বজায় রেখেছে কিন্তু তবু প্রত্যেক পরিবার অন্ততঃ একটা নিজস্ব জমি আলাদা করে রেখেছে। তাছাড়াদের সব জায়গা যেখানে কারো কোন ব্যক্তিগত জমি নেই তার সংখ্যা কম। লং বোতে এমন কিছু আছে কি ?

ফিউন : আছে তবে তা যুক্তভাবে চাষ করা হয়।

চৌ এন লাই : যে সব ব্রিগেডের ব্যক্তিগত জমি নেই তারা সংখ্যালঘু এবং তারা সামষ্টিক ভাবে অগ্রসর। সংখ্যাগুরু ব্রিগেডের ব্যক্তিগত জমি আছে। আমরা অবশ্য লোবিয়েং উইনিয়নের মত নই যেখানে ব্যক্তিগত জমির উপরেই কৃষি উৎপাদন কেন্দ্রভূত। সামবায়িক কৃষিতে সেখানকার লোকেরা সামান্য শ্রম নিয়োগ করে। বেশীর ভাগ সময় তারা খাটে তাদের ব্যক্তিগত জমিতে ফলে সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্যশস্য সরকার প্রায়ই কিনতে পারে না। অথচ খোলা বাজারে শস্য সর্বদা কিনতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জমির ব্যবহারে আমরা লোবিয়েং দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি না কিন্তু এখনো ব্যক্তিগত জমি রাখার প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। চাষীদের উদ্যোগ এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন উৎসাহ দেবার জন্য আমরা এখনো ব্যক্তিগত চাষের কথা বলি যাতে সামষ্টিক উপার্জনের উপরেও এই খাতে চাষীরা কিছু বাড়তি উপার্জন করে তাদের খাদ্যসূচীকে একটু বৈচিত্র্যময় করতে পারে। যেমন আমাদের শূকর উৎপাদনের সবথায় আছে আবার লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবেও তা করতে পারে। আমাদেরও খোলা বাজার আছে কিন্তু সেখানে শস্য তুলা এবং আরো কয়েকটা জিনিষ বিক্রি করা যায় না। দু'একটা ডিম বিক্রি করলে অবশ্য কিছু এসে যায় না। আমাদেরও মেলা আছে। ওগুলো খোলা বাজার বটে কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণে।

সাইগাং কাউন্টিতে কোন খোলা বাজার আছে কি ? (উপস্থিত চীন সরকারী কর্মচারীরা চৌ এন লাইয়ের এই প্রশ্নের কোন জবাব দেন নি—ভব্লু এইচ)

আপনাদের বিরাট পর্যালোচনা করুন। আপনাদের আজ যথেষ্ট ঘুমুনো হয়নি।

যে কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই তা হল এই যে, গ্রামাঞ্চলে পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারা এখনো বিস্তৃত ভাবে বিরাজমান। মাঝারি দৃষ্টিতে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর দোসর, সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণীর নয়। শহরাঞ্চলে ছোট ব্যবসায়ী এবং দোকানীরা সমবায়গুলির মধ্যে তাদের উদ্যোগকে মিশিয়ে দিয়েছে কিন্তু তবু এমন সব লোক আছে যারা বোঁচকা কাঁদে ঘুরে ঘুরে রাস্তার সবথায় থেকে পাইকারী দরে কেনা তাদের জিনিষ লোকের কাছে খুচরো দরে বিক্রয় করে এবং এখনো এমন ঘরোয়া সরাইখানা বেড়োঁয়া এবং দোকান আছে যাদের আমরা খানিস্ত্রীর সরাই বা দোকান বলি।

এ থেকে দেখা যায় যে, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যা বিরাট। সংগে সংগে শ্রমিক বা প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যা খুব কম। আমাদের শ্রমিকের সংখ্যা কত ? আমাদের কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ৩ কোটির বেশী নয়। শ্রমিক ডাক্তার শিক্ষক অর্থাৎ সমস্ত বেতন এবং মজুরিভোগীদের সংখ্যা যদি হিসাব করি তাহলে এখন পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ৫ কোটি। মাত্রের সংজ্ঞানুযায়ী বিক্রয়ের বস্তু উৎপাদক রূপে প্রকৃত শ্রমিকের সংখ্যা যদি গণি তাহলে তাদের সংখ্যা ৩ কোটির বেশী হবে না। এদিক থেকে দেখলে আমেরিকায় শ্রমিকের সংখ্যা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশী এবং যে আশানে শ্রমশিল্প দ্রুত বেড়ে চলেছে, শীঘ্র তার শ্রমিকসংখ্যা আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই ৩ কোটি হল প্রত্যেক চাকুরি-রত শ্রমিকের সংখ্যা। তাদের পরিবার, পোষ্যবর্গ এবং সন্তানদের যদি ধরি তাহলে অবশ্য সংখ্যাটা একটু বাড়বে।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী চীনে সবাই কাজ করে। কখনো কখনো বাড়ীর মহিলা বাড়ীতেই থাকে কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বাসী স্ত্রী দুজনেই কাজ করে। অতএব ৫ কোটি শ্রমিক মানেই ৫ কোটি পরিবার নয়। সংখ্যাটার ঝোঁক ডিগুণ হওয়ার দিকে।

আমাদের হিসাবে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা ১৮ কোটি আর গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা ৬০ কোটি।

বোঝাই যাচ্ছে বেতন এবং মজুরি ভোগী ৫ কোটি শ্রমিকের সকলেই শহরবাসী নয়। তা হলে তারা শহরবাসী সংখ্যার অর্ধেক হত বা অসম্ভব। (শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য পোষ্যরা প্রায়শঃ যে কোন জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী হয়ে থাকে)।

আমার মৌলিক প্রতিপাদ্য প্রশ্ন হল চীনের সমাজবাদী সমাজে এখনো শ্রেণী সকল বর্তমান। এমন লোক আছেন যারা এই প্রশ্নে দ্বিমতও। কিন্তু একবার যদি বাস্তব ঘটনাগুলো দেখিয়ে দেয়া যায় তাহলে তা কী করে তারা খণ্ডন করতে পারেন ?

উপরে যে সব সংখ্যা দিলুম তার ভিত্তিতে একথা অনস্বীকার্য মতাদর্শগত ভাবে সর্বহারা শ্রেণীর শাসন মানে সংখ্যালঘুর শাসন। সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের হুকুম করছে। কিন্তু শ্রেণী সমবায়ের দৃষ্টিতে প্রশ্নটা যদি বিচার করি তাহলে দেখব ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আমাদের সংখ্যাগুরু শ্রমিক এবং কৃষক সংখ্যালঘু প্রাক্তন শোষকদের উপরে হুকুম চালাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিক এবং কৃষকদের এই মহাসমবায়ের মধ্যে সর্বহারা চিন্তা সর্বত্রবীন নয়। এখনো প্রচুর পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারা বয়ে গেছে।

এই সম্বন্ধে দু ভাবে বলা যায় :

(১) চীন এক সমাজবাদী সমাজ। আমরা যে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি তাতে দু রকমের মালিকানা আছে—সৌকিক এবং রাষ্ট্রীয়। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, এই সমাজ শ্রমিক-কৃষক-প্রধান সমাজ। এটা একটা সমাজবাদী সমাজ। এ প্রতিষ্ঠিবিধি করে সেই সংখ্যাগুরুর যারা সংখ্যালঘু প্রাক্তন শোষকের উপরে হুকুম চালায়।

(২) শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত ব্যাপারে নেতৃত্ব করবে। তার অর্থ সর্বহারার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সবার উপরে প্রভুত্ব করবে। এটা তাহলে সংখ্যালঘু নেতৃত্ব।

কাজেই আমার দেখছি চীনের সমাজবাদী সমাজে শ্রেণী সকল আছে, তাদের অস্তর্দ্বন্দ্ব আছে এবং লড়াই আছে।

আন্তর্জাতীক হেতুর দ্বারা প্রভাবিত। আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা পুঁজিবাদী, শোধনবাদীদের দ্বারা পরিবৃত। এই শোধনবাদী ভাবধারা বিশেষ ভাবে ক্ষতিকর। কাজেই কে ও যদি বলেন যে, চীনে কেবলমাত্র মতাদর্শগত লড়াই আছে—প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ তা হলে বলব তা ভুল। প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার অর্থ ই হল শ্রেণীসংগ্রাম। এমন কি প্রমজীবী মানুষদের মধ্যে এমন পশ্চাৎপদ চিন্তা আছে যার মধ্যে শোষক শ্রেণীগুলির চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। আমরা যখন কোন সংগঠনে যুক্ত করিনি তখনি যাও নে ভুং বলেছিলেন যে, শ্রেণী সকল তখনো থাকবে এবং ভবিষ্যতে চিরাং কাইশেকের পরাজয়ের পর লড়াই হবে শ্রমিক আর বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে। তখন বোঝে, আমরা কোন পথ নেব সে সমস্যার সমাধান প্রকৃত পক্ষে হয়নি। লড়াই আজ পর্যন্ত সমানে চলে আসছে। ১৯৫৯ সনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগেই যাও সে ভুং এ সব কথা বলেছিলেন।

(চলবে)

সাকরেদের কীর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাননীয় বিচারপতির ভাষে ইন্দুবাবু জানিয়েছেন নৃপেন 'এ' ক্যাটিগরীর রাফ। তার বিরুদ্ধে তিনটি সীটিও রয়েছে। দাঙ্গা হাঙ্গামার দায়ে নৃপেন বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছে।

জানা গেছে, চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেও নৃপেন ও কালো মজুমদারের বিরুদ্ধে একটি চৌদ্দদাগী মামলা রুজু হয়েছে। মামলাটি করেছেন কেন্দ্রের সরকারের জনৈক পদস্থ অফিসার।

কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করা কাগজপত্র থেকে দেখা যায় ইন্দুবাবু ১৯৭৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের ডায়েরীতে (কি. ডি. ই. ৬৪২) অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ঐদিন নৃপেন তাঁকে রশিদ সাহেবকে মিসা করার জন্য নির্দেশ দেয়। এতে নাকি জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি খুব খুশি হবেন। রশিদের একটি ফটোও ইন্দুবাবু হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে ইন্দুবাবু আদালতে জানান। তিনি বলেন নৃপেনের এই নালিশ তিনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ একটি ডায়েরীতে ২ নং এল্গিন রোডের যত্নলাল অভিযোগ করেন যে, নৃপেন ও কালো মজুমদার, শান্তি নন্দী প্রমুখ তাঁকে পাড়া থেকে উঠে যাবার জন্য শাসিয়েছে। এরপর আরও অনেক ডায়েরী রয়েছে। এর প্রত্যেকটি নৃপেন ও তার দলবলের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় এসে প্রতিকার চেয়েছেন।

সরকারী কাগজপত্রেই প্রকাশ, নৃপেন '৭৫ সালের ৮ই মার্চ হাওড়া জেলা শাসকের কাছে রিভলবার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে। এই আবেদনপত্রে "বিজনেস" কলমে দেখা যায়—নৃপেন লিখেছে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ও তার কাজ ট্রেড ইউনিয়ন করা। জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্য লোকাল থানার ও. সি. ইন্দুবাবুর কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। ইন্দুবাবু রিপোর্টটি যথাসময়ে জেলার পদস্থ অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেন। আদালতে তিনি এই রিপোর্টও পেশ করেছেন। এতে দেখা যায়, ইন্দুবাবু ঐ রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, "In returning herewith the attached petition I beg to report that the applicant is an 'A' catagory rough and a history sheeter of this. He was arrested several times in several cases particularly in rioting and offences against property. In this circumstances I do not received his case for granting licence to posses a revolver. He is also a hot headed man."

ইন্দুবাবু আদালতে জানান, নৃপেন শিলুয়া থানা থেকে তার বিরুদ্ধে মিথ্যুক সমস্ত কুকীর্তির রেকর্ড রচনা করার জন্যও ইঙ্গিত করে। নৃপেনের বাবা ইন্দুবাবু যেন তার সমস্ত ক্রিমিনাল রেকর্ড থানা থেকে সরিয়ে দেন। এ সম্পর্কিত ডায়েরী ও পদস্থ অফিসারদের কাছে বিবাহী ইন্দুবাবু তখনই জানিয়ে রাখেন। সমস্ত কাগজপত্র আদালতের গোচরে আনা হয়েছে।

'৭৫ সালের জুন মাসের দেরো তারিখে নথিভুক্ত একটি ডায়েরী উল্লেখ করে ইন্দুবাবু আদালতে জানান যে, ১২ই জুন রাত্রিতে একটি সভা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত থাকে নৃপেন মজুমদার, কালো মজুমদার, শান্তি নন্দী, বিল্টু নন্দী, চকল চক্রবর্তী, তারক সাহা, ভুবনেশ্বর মজুমদার। সভায় উপস্থিত দুই ব্যক্তর যাবৎকে তিনি জানতে পারেন যে, ঐ সভায় তাকে শিলুয়া থানা থেকে বদলী করার ব্যাপারে নানা কথাবার্তা হয়। নৃপেন এই বদলীর ব্যাপারে কি কি করা হয়েছে তা সবিস্তারে জানায়। পরে ১০ই জুন নৃপেন কয়েকজনের উপস্থিতিতে ইন্দুবাবুকে শাসায়। এ সবই ডায়েরী করা ছিল। ১২ই জুন সভা হবার কয়েক দিন পর পুলিশ দপ্তর তাঁকে বর্ধমান রেঞ্জে বদলীর নির্দেশ দেয়।

ইন্দুবাবুর বক্তব্য—কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোককে প্রশ্রয় না দেওয়াতেই তার প্রতি এই বদলীর নির্দেশ। বিস্তারিত তথ্য তিনি ইলপেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে জানিয়ে এই বদলী আদেশ বন্ধ করার আবেদন জানান। ইন্দুবাবু এই আবেদনে বলেন, সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তিনি সাধারণ পদ থেকে আজকের এই পদমর্যাদায় আসীন। চাকুরীর খাতায় তার কোনও দাগও নেই। ছেলে তার অধুষ্ঠ। অন্যায় ছেলেরা পড়াশুনা করছে। অথচ তাকে তবুও বদলী করে দেয়া হচ্ছে। তার একমাত্র অপরাধ আইন ও প্রশাসনের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু দুষ্কর্মের নির্দেশ মত কাজ করেন নি। এই আবেদনে সাড়া না পেয়ে ইন্দুবাবু শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হ'ন। মাননীয় বিচারপতি ইংরেজদের জাতি করে ইন্দুবাবুকে শিলুয়া থানাতেই কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। সমস্তদিক বিচার করে বিচারপতি এ সম্পর্কে পরে তার চূড়ান্ত রায় দেবেন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE : 40 PAISE

মোহন অপেরার 'যোগবিয়োগ' পালার একটি দৃশ্যে মিতা চ্যাটার্জী ও মোহন চ্যাটার্জী

যাত্রাদল নিগৃহীত

গত ২৫ মার্চ মিঠে রহুলে বীণাপাণি অপেরার কলাকুশলী বর্গকে অভিনয় করতে দিয়ে আয়োজক অর্থপক্ষের হাতে নিগৃহীত হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আয়োজক সংস্থাটির নাম ছিল শিবাজী সংঘ। তার ফেরিতে যাত্রাদলের অভিনয়ের সময় পরিবর্তন, তাদের প্রাপ্য অর্থ না দিয়ে দলের ম্যানেজারের কাছ থেকে অবশ্য অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া, দলের গাড়ীর চাকা খুলে নেওয়া, অশ্লীল গালিগালাজ এবং রিভলভার দিয়ে ভয় দেখানো ইত্যাদি বহুবিধ অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বহুলে বীণাপাণি অপেরা পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শোকায়ত প্রণতি

আগামী ২০শে মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় বিবার্ড মঞ্চে প্রবীণ অপেরা পালাকার ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র স্মৃতিসভার আয়োজন করেছেন। যাত্রামুরাগী সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই সংস্থা। স্মৃতিসভার পর প্রবীণ অপেরার পরিবেশনায় 'ভুলেম্বরী' পালাটি অভিনীত হবে।

তরুণ অপেরার
জুলিয়াস সিজার
আগন্ত অবদান
রচনা-অজু বাগ
নির্দেশনা ও নাম ভূমিকায়
শান্তিগোপাল

সম্রাট বিদায়

যাত্রা জগতের অন্যতম প্রাণপুরুষ ব্রজেন্দ্রকুমার দে গত ১২ মার্চ সকাল ৮-৪০ মিনিটে মহা কলকাতার একটি নার্সিং হোমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন যাত্রা সংস্থার পক্ষ থেকে এবং নাট্যজগতের তরফে 'অন্তিম' শ্রদ্ধা-ঘর্ঘ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন।

অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার গরাণদহী গ্রামে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীদে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলাতেই যাত্রা-নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন। শিক্ষক রূপে পেয়েছিলেন নট নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীকে। ছাত্রাবস্থায় রচিত 'বর্ণলতা' পালাটি ১৯২৮ এ বেলেঘাটার বাণী নাট্য সমাজ অভিনয় করে। পেশাদার যাত্রার প্রথম পালা 'রক্তরাগ' ১৯৩১-এ গণেশ অপেরা অভিনয় করে। তারপর একে একে লীলাবসান ('শূন্য জমার ঘর' দিয়ে আমি অবহেলিত দক্ষিণ মজুমদের বিক্ষোভের রূপ দেবার চেষ্টা 'কবেকিলায়'—সাক্ষাৎকার। অভিনয়, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা), চাঁদের দেশে ('এই পালাটিতে প্রথম Short Dialogue ব্যবহার করেছিলাম'), রাজনন্দিনী, দেবতার গ্রাস, সমাজের বলি, আকাশের দেশ, মায়ের ডাক, বাঙালী, যাদের দেখে না কেউ, প্লাবন, দেবী কে? ধর্মর বলি, সোনার বৌদি, জনতার মুক্তি, চঁদবিবি, কৃষ্ণ শকুনি, নটী-বিনোদিনী, বিদ্রোহী নজরুল, প্রভৃতি প্রায় ষেভশো পালা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পালার মোট সংখ্যা ১৯৩।

তিনি কথা ভাষার যাদুকর

শিব ভট্টাচার্য

[তরুণ অপেরার বর্তমান ব্যবস্থাপনাদের অন্যতম শিব ভট্টাচার্য প্রবাদ পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমারের অনেক পালাতেই অভিনয় করেছিলেন। সেই সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমারের তিনি যথেষ্ট কাছের মানুষও ছিলেন। বর্তমান রচনা তাঁরই সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ।]

যাত্রার এক সময় ছিল কিংবোস-প্রসাদের যুগ, তার ভাষার বাঁধুনি ছিল অন্যরকম। "বসন্তের কলুষিত বায়ুর স্পর্শ দেবার জন্যে চিরভাগরের জন্যে অনন্ত খুঁজছে।" এই ছিল কিংবোদবাবুর লেখা। আবার পঙ্কজ কবিরত্ন বা কবি রায় ছিলেন আরেক-রকম। তিনি লিখতেন, আকাশ্যন্তে অভীর মাধুর্য, ভোগেতে তৃপ্তির শান্তি যখন গাছে থাকে ফুটন্ত গোলাপ, তখনও মধুরতা তার স্পর্শ বা আঘ্রাণে, শুভ মঙ্গলার মনে সার্থকা কোথায়?" ('নারী স্বর্গ'/স্বপ্ন কবিরত্ন)। কিন্তু ব্রজেনবাবু অলঙ্কার আর বিশ্লেষণ বর্জন করে পালার সংলাপে সহজ ভাষা প্রয়োগের সার্থক রীতি চালু করলেন, "তাহলে মাথাটাই রেখে যাও সিংহাসনের" (বাঙালী)।

এই সহজিয়া ভাষা যাত্রার আবো প্রাণ সঞ্চার করলো। অভিনেতাও অভিনয়ে প্রাণ পেলেন। আমার দীর্ঘ দিনের অভিনয়ে আমি এই সত্যটি অনুধাবন করেছি যে ব্রজেন্দ্রকুমার যে যেমন বৈচিত্র্যময় ঘটনা অবলম্বনে পালা লিখেছেন তেমনি কথা ভাষার প্রয়োগ সম্বেও সংলাপেও বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট।

সবাই তাকে একবাক্যে 'পালা সম্রাট' বলেন। কথাটা একদিক থেকে মিথ্যে নয়। ব্রজেনবাবুর পালা অভিনয় করেন নি, এমন যাত্রাদল যাত্রাপাড়ায় প্রায় নেই বললেই চলে। হাল আমলে যাত্রা-পাড়ায় নতুন নাটকার কলাকুশলী, নতুন অভিনেতা আনাগোনা। এক সময় ব্রজেনবাবুই পালাকার হিসেবে যত্রতত্রতার হাল ধরে বেশী পালা লিখেছেন তিনি।

ব্রজেনবাবুর রচনারীতির অন্য আকর্ষণটি ওণ হল তাঁর পালার আকর্ষণীয় নাট্যদ্বন্দ্ব। দর্শকের মেজিডেকের উনি কাছে লাগাতে জানতেন। ফলে বহুদক্ষ অভিনেতাও ব্রজেনবাবুর সুচারু সংলাপ এবং সুতীব্র নাট্যদ্বন্দ্বের জোরে জনপ্রিয় হতে পারতেন। আজকের অনেক বিখ্যাত অভিনেতা তার প্রকৃত নামের চাইতে ব্রজেনবাবুর পালার চরিত্রের নামেই বেশী পরিচিত। অভিনেতার চেহারা, ক্ষমতা এবং রুচির দিকে চেয়েও তিনি নাটক লিখতে জানতেন। এক সময় তাঁর 'বাঙালী' নাটকের 'সত্যপ্রীত' চরিত্রে আমি প্রচুর অভিনয় করেছি। 'সত্য-প্রীত' নামেই সবাই আমাকে চিনতো। একবার 'গণনাট্য' দলের দিলীপ চাইজোকে 'ভাবনাওয়ালা' বলেই গ্রাম বওড়ার অনেক দর্শক মনে রেখেছেন। তিনি ব্রজেনবাবুর 'লোনাই বাহিনী'তে ঐ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

আমি এ রকম একজন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার জন্য গর্বিত। যাত্রার প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভালবাসা আমার মনে-বরাবর উৎসাহের সঞ্চার করেছে। তবু এমন ব্যক্তিত্বকে হারাবার বেদনা সহজে ভুলতে পারি না।

[আগামী সংখ্যায় অভিনেতা শান্তিগোপালের স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হবে।]

কবি দুর্গাদাস সরকার

নীলমণি দাস

দুর্গাদাস চলে গেলেন। কবি দুর্গাদাস সরকার ঠিকেন ঠিক সেই ধরনের মানুষ যারা আত্ম প্রচারণার ধার ধারেন না। সাপ্তাহিক বসুমতির সম্পাদকীয় দপ্তর, সত্যযুগের রবিবাসরীয় অফিস, বাঙলাদেশের আত্তানায় দুর্গাদার উঁকি ঝুঁকি মারার সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। কেউ টেরই পেতেন না নীরবকায় সাদাসাটা মানুষটা মজুমদের অন্তরালে ঢুকে বড় তুলতে পারেন তার লেখনীতে। এর হাত দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে "শ্মশানে ধুনোর গন্ধ" "ঝিনুকের সঞ্চি" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। "মৃত সৈনিকের ভায়েরী" তারই লেখা।

দুর্গা দার প্রতিটি লেখাই ছিল মানুষকে নিয়ে। গায়ে গতরে খেটে খাওয়া জনবনিয়ির জন্য ওর প্রাণ কাঁদত।

কতদিন দেখেছি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা মিছিলগুলোর দিকে ওঁর তাকিয়ে থাকা। সহীদ মিনারে সমাবেশ বিকেলে। দুপুর না পড়তেই দপ্তর থেকে উঠে এসে দুর্গাদা জানলার মুখ বাড়িয়ে বসে থাকতেন। বড় মিছিল হলে ওর কি আনন্দ। বলতেন, দেখো, দেখো কত বড় কত বিরাট। চোখ দিয়ে আনন্দ যেন জল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইতো।

দুর্গাদা অসুস্থ অনেকদিন। গলায় কষ্ট। কথা বলতে পারেন না। জল খেতেও যেন দম বেরিয়ে যায়। হাসপাতালে যেতে কোনদিনই রাজী নন। শেষে প্রায় ধরে বেঁধেই হাসপাতালে আনা হল ১৮ই ফেব্রুয়ারি। ডাক্তাররা দেখে তো অবাক। বললেন, কবেকের কি? এতো প্রায় শেষ। দুর্গাদার কিন্তু এতে হুঁসও নেই। দেখা হলেই একটুকরো কাগজে লিখে দিতেন, হাঁ হাঁ। বেশ ভাল আছি। বেশ ভালো। ১৬।৩ তারিখে আমি খোঁ-খোঁ হয়ে উঠলো। গলার কত দিয়ে রক্ত আর রক্ত। অপারেশন চলে। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও আকারে ইঙ্গিতে এক কথা, হাঁ ভালো আছি, ভালো। বলা গেলো, দুর্গাদা আপনি কেবিনে থাকুন। উত্তর—না, সবার সঙ্গে আনন্দে আছি। ওদের সঙ্গেই থাকবো। কিন্তু কি আশ্চর্য, লিভার মস্ত মানুষটার এই মিনতিটুকু কেউ রাখলো না। বৃহস্পতিবার ভোর রাতেই সবার অলক্ষ্যে সবার মায়া কাটিয়ে দুর্গাদা একাই চলে গেলেন। ভাবতে ভালো লাগে না, এওদিন ভালো লাগে না কলকাতার আবার মিছিল আবার সহর মিছিল নগরী হয়ে উঠবে, কিন্তু দুর্গাদা সেদিন তার সুরের মিছিল আর দেখবেন না। দেখবেন না কোনও দিন।

সাহিত্যে তৃতীয় পক্ষ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ কৃপা পাওয়ার, আজ এই মুদ্রণ সঙ্কটের দিনে তাই তাদের কোন বিলাপ নেই। বরাবরই গাঁটের কড়ি খরচ করেছে, আজও তাই। দু চারটে পুরস্কার প্রাপ্ত বা সংবাদ-পত্রের শিরোনামাধারী কবিদের কথা বলছি।

চিন্তাশীল প্রবন্ধ কিংবা উপন্যাসের ভাগ্যও এক কক্ষিনে চাকা পড়ছে। এককালে এই বাংলা সাহিত্যেই মাঝি মল্লা, শ্রমিক, কৃষক ফুলে ঘন্ঠা, কাঁহার—অর্থাৎ দেশের বিচিত্র জীবন ও জীবিকার ছবি সাহিত্যে প্রতিভাত হত। আমরা পাঠকরা ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদন পেতাম। চরিত্র চিত্রণ বক্তব্য বা প্রকাশভঙ্গিতে, নানা মত থাকতে পারে কিন্তু তা প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছন দরকার। নইলে যাবতিবরোধ বা বিচার চলবে কি করে। মনে হয়, সাহিত্যের এটা সুস্থ লক্ষণ এবং প্রকাশকদের তরফ থেকে আদিক বে কদাবেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তাবা বললেও পাঠক নাকি শুধু উচ্চ মধ্যবিত্তের ঘৌন কেচ্ছা, মুখ-সাকি এবং খুন খারাপির রোমহর্ষক কাহিনী পড়ক করেন। ফলে 'লেগে পড়' ধরণে লেখকরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সুতরাং আজ প্রতিটি বিবেকবান লেখক, শিল্পী, গবেষক, পণ্ডিত—এক কথায় শুভ্‌ভমান ব্যক্তিরই উচিত এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

তুরীয় আনন্দলাভের সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা কানপুরের আই আই টি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

তুরীয় আনন্দে বিশ্বজয় লাভ করতে হলে কানপুরের আই. আই. টিতে যাওয়া ছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের এখন আর কোন উপায় নেই। এখানে রাজভ ও রাজকোতার শ্রেণী মিলিয়ে ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। ছাত্রীদের সংখ্যা একশো জনও নয়। দিনে বা রাতে যে কোন সময় যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী অন্য ছাত্র বা ছাত্রীর হোস্টেলে যেতে পারে যে কোন কারণেই। আর এল, এম, ডি, ম্যানেজমেন্ট কিংবা আরও কিছু তাও পেতে অসুবিধে নেই এখনই। এক আশ্চর্য আনন্দে বিশ্বজ্ঞান লাভের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের। এখানে এলে আমেরিকান হিপিদের কোন ক্রিজোন না ভারতবর্ষ—বিশ্বিত হয়ে এ ভাবা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আপনার।

প্রধানমন্ত্রী 'জনঅরণ্য' দেখবেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিকতম বিতর্কিত চলচ্চিত্র 'জন অরণ্য' প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দিল্লীতে দেখানো হবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। চিত্রটি ভারতবর্ষে মুক্তি পাবার আগে গত ৫ই ডিসেম্বর লন্ডনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম প্রদর্শিত হয়। জানা গেছে, লন্ডন চিত্র উৎসবে 'জন অরণ্য' নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিশেষ আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবেও এই চলচ্চিত্র আমন্ত্রণ প্রাপ্ত করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, কিছু দিন আগে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীকে 'ওপী গাইন বাঘা বাইন,' 'অশনি সংকেত' ও 'সোনার কেল্লা' চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে। সত্যজিৎ রায় নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বহুরূপী রুশ বিমান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জলে স্থলে সমান ভাবে গবেষণার কাজে চলতে পারে এমন বিমান বের করে রুশ গবেষকরা এখন মহাসন্ধে গবেষণার কাজ চালাচ্ছেন। ইউক্রেনের একটি কারখানায় বিমানটি তৈরী হয়েছে। সমুদ্রের অভ্যন্তর সর্বদের মাঝখান্ত অবলীলাক্রমে ছুটে যেতে পারে এমন ক্ষমতা এ বিমানের আছে। জমানো বরফের স্তূপ, বড় গাছের গুঁড়ি, জলস্তম্ভ বা খাড়াপাহাড় আবহাওয়া ভেদ করে ঘণ্টায় কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার বেগে উড়ে চলার ক্ষমতা বিমানটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছে। ফল যেসের উত্তর অঞ্চলে সমুদ্র গর্ভে ও সমুদ্র পাড়ে যে বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চলছে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উড়ন্ত বিমানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বানারেশ থেকে এই বিমান কেনার জন্য তাড়াহুড়ো সুরু হয়ে গেছে।

ছাত্রকে চড় মেরে ওসির ফ্যাঁসাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার বেকার হোস্টেলের একটি ছাত্রের গালে চড় মেরে তালতলা থানার ও সি ফ্যাঁসাদে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সেই ছাত্র আবদুল নাসারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়।

জানা যায় গত সপ্তাহে হোস্টেলে একদল ছেলে যখন ফুটবল খেলে ফিরছিল তখন এক সময় তাদের বল গিয়ে পড়ে তালতলা থানার ও সি বেচারীর এলাকায়। বলটি ও সি'র ছোট ছেলে কুড়িয়ে নেয়। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবদুল সালাম বয়স দিয়েক বয়েসের ওই ছেলেটির কাছে বল চাইতে যায়। ও সি সাহেব তখন রাগের মাথায় ছাত্রটিকে একটি চড় কষিয়ে দেন। "এত বড় আস্পর্ধা, আমার কোয়ার্টারে বল চাইতে এসেছ।" লাঞ্ছিত ছাত্রদের ছেলেটি চড় খেয়ে চুপচাপ ছিল। কিন্তু হোস্টেলের অন্যান্য ছাত্ররা থানায় গিয়ে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং প্রতিকারের প্রার্থনা জানায়।

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসে বিরোধ চরম পর্যায়ে

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৬শে মার্চ '৭৬ ॥ দাম ৪০ পঃ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যুব কংগ্রেসের বিরোধ এখন চরম পর্যায়ে। বিরোধ মেটাতে সুব্রত মুখার্জীকে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সুব্রতবাবুর বক্তব্য শোনার পর যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রায় তিন মাস আলাপ আলোচনার পর গত সোমবার রাজ্যের ষোলটি জেলার যুব কংগ্রেস কর্মকর্তাদের নাম বাবিদবাবু ঘোষণা করেন। জেলা কমিটি ঘোষণা করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রণব মুখার্জীকে এ ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। গত শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত নিজাম প্যালেসের তিন নম্বর ঘরে দফায় দফায় বৈঠক বসেছে ঐকামত্যের তালিকা তৈরী করার জন্য। অবশেষে বাবিদবাবু সোমবার ১৬টি জেলা কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। কেবল প্রতি জেলার একজন করে সম্পাদকের নাম খালি রাখা হয় সুব্রত মুখার্জীর মনোনীত প্রার্থীর জন্য।

রাজ্য যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাপতি বাবিদবরণ দাস কমিটি ঘোষণা করার পরই সুব্রতবাবু মঙ্গলবার মহাজাতি সদনে সমস্ত জেলার প্রাক্তন যুব কংগ্রেস কর্মকর্তাদের এক সভা ডাকেন। সভায় সুব্রতবাবু নিজ গোষ্ঠীর লোকদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। এবং প্রাদেশিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন জেলা যুব কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের আগের মতই কাজ চালিয়ে যেতে বলেন।

সুব্রতবাবু রাজ্য যুব কংগ্রেসের অন্যতম উপদেষ্টা। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেসী মহলে দারুণ বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কিছু দিন আগেই সুব্রতবাবু দিল্লীতে গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তার কয়েকদিন বাদেই বাবিদবাবু দিল্লীতে গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

তারপর বাবিদবাবু রাজ্যের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর পরামর্শ নিয়ে জেলা কমিটির নাম ঘোষণা করেছেন। এর পর সুব্রতবাবুর পাল্টা সমাবেশ এবং পাল্টা কমিটি গঠনের ঘোষণায় রাজনৈতিক মহলে খুব বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

যাই হোক বর্তমানে সুব্রতবাবু, বাবিদবাবু, পঙ্কজ ব্যানার্জী সবাই দিল্লীতে। সকলেই ওদের দিল্লীতে থেকে ফেরার অপেক্ষায় আছেন।

কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন হতে পারে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন কি আসন্ন? এই রকমই জল্পনা-কল্পনা এখন কংগ্রেসী মহলে চলছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং এই নির্বাচন এই বছরেরই শেষের দিকে করার কথাও বলেছেন। সিদ্ধার্থবাবুর এই ঘনিষ্ঠ মহলে এই মন্তব্যের পরই কংগ্রেসী মহলে এ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

গত ৭২ সালে পৌর সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাতিল করে দেওয়ার পর এ পর্যন্ত সরকারী আমলারাই পৌর কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। মাঝখানে কাউন্সিলারের পরিপূরক হিসাবে এম. এল. এ-দের নমিনিদের একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল পৌর পরিচালকদের কাছে নিজ নিজ ওয়ার্ডের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার বিধান করা।

তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। প্রথম দিকে এম. এল. এ-র প্রতিনিধিরা যতটা তৎপর ছিলেন এখন আর সে তৎপরতা দেখা যায় না। আগে কাউন্সিলার ক্লাব রুম ওদের ভিড়ে জমজমাট থাকত। এখন প্রতিনিধিরা প্রায়ই অনুপস্থিত।

নতুনের নাগাড় নির্বাচন হলে কলকাতার নাগরিকরা চার বছর বাদে আবার তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ পাবেন।

রাজ্য সরকারকে টেক্কা দিয়ে ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার বিজয় বৈজয়ন্তী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে টেক্কা দিয়ে ভারতীয় পর্যটক উন্নয়ন সংস্থা রাজ্যে রাজ্যে তাঁদের বিজয় বৈজয়ন্তী ঘোষণা করে চলেছেন। কলকাতার দমদম এয়ারপোর্টে হোটেল তৈরী করা ছাড়াও তাদের টানসপোর্ট ইউনিট ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শিলিগুড়িতে সেবক রোডের কাছে পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা নিজই একটি হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট ইউনিট চালু করবে বলে জানা গেছে। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে নীতি-তাল নিয়মিত কোচসার্ভিস গত জানুয়ারী মাস থেকেই সুরু হয়ে গেছে। আসামের কাজিরাঙ্গার বনাঞ্চলে যে পর্যটন বাংলো আছে সেটি বর্তমানে ভারতীয় পর্যটক উন্নয়ন সংস্থার হাতে আসবে বলে সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে। পাটনাতে পর্যটন উন্নয়ন দপ্তর দেশি ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য যে হোটেল তৈরী করার কাজ সুরু করেছিল তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের নীট লাভ হয়েছে ৭৩'৪৪ লক্ষ টাকা। পর্যটকদের সুবিধার জন্য তারা কলকাতা থেকে দার্জিলিং সরাসরি কোচসার্ভিস সুরু করছে আগামী তিন চার মাসের মধ্যেই।

চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষৎকার (২)

হিউন : সুযোগ সুবিধা তো গুণী পুঁজিবাদের পথিক নবজাত বুর্জোয়া শক্তিগুলি সম্বন্ধে আপনার মত কি? কেউ কেবল যদি প্রাক্তন শোষকদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকে তাহলে এই নবোদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা নেই কি?

চৌ এন্ লাই : হাঁ, ঠিক ঐ কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। এতটা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ দিয়ে আলোচনায় সূচনা করে বলছিলাম যে, কতগুলি শ্রেণী এখনো আছে। দ্বিতীয়ত বলছিলাম যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি পেটি বুর্জোয়া এবং প্রমিক শ্রেণীগুলিকে প্রভাবিত করছে। তৃতীয়ত বুর্জোয়া চরিত্র নতুন করে জন্মাবে। আজ পর্যন্ত সমাজবাদের যে বিকাশ হয়েছে তাতে শিল্পের পরিচালকেরা অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ইঞ্জিনীয়ার, ম্যানেজার প্রভৃতি যদি তাদের বিশেষ সুবিধাগুলিকে বাড়িয়ে নিতে এবং স্থায়ী করতে পারে তাহলে নতুন একটা সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হবে এবং তার সদস্যরাই হবে পুঁজিবাদের পথিক যার কথা আপনি এই মাত্র উল্লেখ করলেন।

কাজেই আমার আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, শ্রেণী সকলের অস্তিত্ব আছে। সংগ্রাম যদি আমরা না করি তাহলে দেখব যে, নিত্য নতুন বুর্জোয়া চরিত্র গজাচ্ছে। আর বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি আমরা না করি তাহলে প্রমিক শ্রেণীর অভ্যন্তরে এ ঘুণ ধরিয়ে দেবে। কাজেই আমরা দেখছি—

১) এখনো চার পাশে পুরানো শোষক দল।

২) নতুন গজানো বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি।

৩) মতাদর্শগত প্রভাব এবং মরচে ধরা।

এই শেষেরটা অর্থাৎ অতীত দিনের উল্লিখিত সেকেলে অভ্যাস প্রথা এবং ব্যাবহারাদি বহুবিস্তৃত। শোষকদের ছেলে-মাওয়া এই ধারাপ জিনিষগুলি সম্বন্ধে লেনিনের একটা বিশেষ ঘৃণা ছিল। শান্‌সিন শিশু প্রসবের সেকেলে প্রথা যে সম্বন্ধে গোড়ার আলোচনা করেছি, তা এই ছেলে যাওয়া ধারণা জিনিসগুলির একটি। শিল্পোন্নত দেশে এ ধরণের জিনিস সচরাচর বা বদাচ দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের মত পশ্চাৎপদ দেশে এই ধরণের জিনিস হামেশা দেখা যায়।

কাজেই শ্রেণী সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা সেটাই হল সব চেয়ে গুরুত্বের। শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজন থাকার করা রাজনৈতিক নীতির প্রশ্ন।

লিউ শাও চি ভেবেছিলেন যে, তিনটি বিরাট রূপান্তরের পর) কৃষির শিল্পের এবং বাণিজ্যের (শ্রেণী সংগ্রাম লোপ পাবে। এটা হল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা। অবশ্য এই প্রশ্নে তিনি একক ছিলেন না। চেন পো—তার মতও ছিল। সমাজবাদী বিপ্লবের কৃড়িরও বেশী বছরে এই ধরণের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াই খুব তীব্র হয়েছে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামকে যদি আমরা না মানতাম তাহলে আমাদের কাজ চালাতাম কি করে?

কোন্ নীতি আমাদের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করত?

হিউন : মাও সে তুং কি নিজেকে ছাড়া মাথায় একজন সন্ন্যাসী বলে বর্ণনা করেছেন?

চৌ এন লাই : লাইফ ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে (৩০ এপ্রিল, ১৯৭১) এডগার স্নো মাও সে তুংয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু তথাকথিত কিন্তু ভুল বোঝার দরুণ তাতে কয়েকটি ভ্রান্তি ঘটেছে যেমন 'ছেঁড়া-আলা ছাতা মাতা বিশ্বপরিত্রাতক সিংগল্ সন্ন্যাসী' উক্তিটি।

মাও বলেছিলেন, 'আমি হলাম ছাতার তলার সন্ন্যাসীর মত—'উ ফা, উ ডিয়েন' (চুল নেই, আকাশ নেই)। এটা হল যুগ্ম শ্লেষ। সন্ন্যাসীর মস্তক মুণ্ডিত বলে তার মাথায় চুল থাকে না। ছাতার তলায় থাকার দরুণ সে আকাশ দেখতে পায় না, কাজেই তার বর্ণও থাকে না। কিন্তু ফা-য়ের অপরার্থ হল আইন আর ডিয়েন কথাটার অপরার্থ হল বর্ণ অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা। অতএব ছাতার তলায় একজন সন্ন্যাসী হলেন এমন মানুষ যিনি আইনকানুন বা সীমার অধীন নন—মনুকের মত একজন বিপ্লোহী (যিনি সন্ন্যাসী ক্রিশিটকের কিংবদন্তীমূলক ভারতযাত্রার সঙ্গী ছিলেন) যিনি শাবিধ বা অশাবিধ কোন প্রচলিত নিয়ম, প্রথা বা আচারের নিগড়ে আবদ্ধ নন।

প্লোর সঙ্গে মাও কথা বলেছিলেন ১৯৭০ এর ১৮ ডিসেম্বর। তাঁর মন্তব্যের পটভূমি ছিল মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। আমরা সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করেছিলাম এবং তারা পুঁজিবাদের পথিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। মাও সে তুংয়ের ভাবধারার সম্মিত হয়ে তারা সমালোচনা করতে এবং বলপ্রয়োগে বাধা হয়ে উঠেছিল, রাজনীতিকে নেতৃত্বে বসিয়েছিল, উৎপাদন বিকশিত করেছিল, যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তুতি করেছিল এবং সব কিছুকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এটা হল সদর্থক দিক, প্রধান স্রোতোধারা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা প্রতিকূল ধারাও দেখা গিয়েছিল।

সবচেয়ে খারাপ জিনিস, মাও যেটাকে সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করতেন, হল চরম বিমূর্তির প্রবণতা —চিন্তা এবং বক্তব্যের অনপেক্ষ

উইলিয়ম হিণ্টন

প্রবণতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাও সে তুং সম্পর্কে কিছু বলার সময় যে চারটি 'মহান' অভিধা ব্যবহার করা হয়—মহান কর্ণধার, মহান নেতা, মহান শিক্ষক এবং মহান সর্বাধিনায়ক। এই চার মহান কথাটা প্রথম চালু করেছিলেন চেন পো তা। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপের তিনি ছিলেন প্রধান কিন্তু আগষ্ট ১৯৭০ যে পার্টির নবম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনকালে তিনি সমস্ত পদ থেকে অপসারিত হন।

চেয়ারম্যান মাও বললেন যে, 'শিক্ষক' কথাটাই যথেষ্ট। কিন্তু এই চার মহানকে বাতিল করে চাবুকে একে কমিয়ে আনা সহজ নয়। এই রকম দাবি এক সময় ফলপ্রসূ হয়নি। এটা বলতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। এর জন্য প্রচুর পবিশ্রম আমাদের করতে হয়েছে। এখন আমরা এই উপাধিগুলিকে 'মহান নেতা' বা 'মহান শিক্ষকে' নামিয়ে আনতে পেরেছি। মাও সে তুং মহান কথাটাও বাদ দিতে চেয়েছিলেন। সাধারণ 'শিক্ষক' শব্দে তাঁর চলে যেত। কিন্তু তা সহজ নয় কারণ অগণিত সাধারণ মানুষ তা মানতে রাজি নয়। কোটি কোটি মানুষ এই কথাগুলি প্রতিদিন আবৃত্তি করে। একদিনে তা আমরা বাতিল করতে পারি না।

'মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারার পরম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করো' স্লোগানটার কথা ধরা যাক। এটা পুরোপুরি ভুল কথা। পরম অধিকারে কখনো কোনো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি কি? কোন কোন বিষয়ে মাও সে তুং অধিকারী হতে পারেন কিন্তু যে সব বিষয় তাঁর একিত্রাবের মধ্যে তার সম্বন্ধে অধিকারী তিনি কী করে হতে পারেন? তাছাড়া সময়েরও একটা প্রশ্ন আছে। তাবৎ ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। আজ আপনি কোন বিষয়ের অধিকারী হতে পারেন কিন্তু তাতে কি একথা বোঝায় যে কালকেও আপনি অধিকারী থাকবেনই? মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারাকে যদি আপনি পরম বা অপরিবর্তনীয় বলেন তাহলে তাবী বিকাশের তো আর কোন সুযোগ থাকে না। এ রকমের ভুল সামাজিক অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করে তোলে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এ পথ নিলে আমাদের পরিণতি হত নিষ্ক্রিয়তা।

তা ছাড়া অধিকারের একমাত্র স্বীকার্যকর্তা হল বৃহত্তর জনসাধারণ যারা তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এর উপযোগিতা পরখ করে নেয়। অন্য কেউ কী করে এমন অধিকার স্থাপন করতে পারে? একমাত্র জনসাধারণের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এটা আসতে পারে। অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সমস্ত ধারণা ভুল।

তার পর আছে সময় এবং পারিপার্শ্বিকের বিবেচনা না করে মাও সে তুংয়ের যে অনেকগুলি ছবি টাঙানো এবং মূর্তি বানানো হয়েছে সারা দেশ জুড়ে তাদের ব্যাপার। এটাও ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হয়। এর মাত্রাধিক্য ঘটছে।

মাও এটাকে ভাও ইয়েন অর্থাৎ একটা আপদ বলে মনে করেন। এ ধরণের আড়ম্বর অকৃত্রিমতা নয়, মর্যাদাপূর্ণও নয়। মাও বলেছেন, 'দেখ না, ওখানে দাঁড়িয়ে আমি কেমন হাওয়ায় কাঁপছি, বৃষ্টিতে ভিজছি। কী দুঃখের কথা।' তার পর রো জবাব দিয়েছিলেন যে, তিনিও ভাবতে পারেন না কেন মাও ওখানে একা দাঁড়িয়ে হাওয়ায় কাঁপবেন আর বৃষ্টিতে ভিজবেন।

শিকিং হোটেলের যে কাউন্টার থেকে জিনিসপত্র বিক্রি করা হয়, তার উপরে চেয়ারম্যান মাওয়ের একটা ছবি আছে। সংশ্লিষ্ট কেরানিকে আমি বললাম, 'কাউন্টারে আপনাদের হয়ে জিনিস বিক্রি করবেন বলে কি এখানে মাওয়ের ছবি টাঙানো হয়েছে?' লিফ্‌টেও মাওয়ের একটা ছবি আছে। 'মাও কি আপনার হয়ে লিফ্‌টের-বয়ের দায়ি করছেন?' অপারেটরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। এ সমস্তই বাড়াবাড়ি এবং ক্ষতিকর।

অনেক মূর্তি বসানো হয়েছে যা তুলে দেওয়া উচিত। আপনারা দেখেছেন যে, গ্রেট হল অফ্ দ পীপল থেকে এগুলিকে সরানো হয়েছে।

হিউন : অন্যান্য জায়গায় এগুলি অজস্র দেখা যায়।

চৌ এন্ লাই : হাঁ, মূর্তির সীমাসংখ্যা নেই। লোকেরা নিজে থেকে যদি এগুলি না সরায় তাহলে আমাদের একমাত্র করণীয় হল এগুলোকে সরানোর জন্য সরকারী আদেশ জারি করা।

স্ট্যালিনের ভূমিকা

অবশ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে এই প্রশ্নের দুটো দিক আছে এবং সে সম্বন্ধে মাওয়ের বক্তব্য শোধনবাদীদের থেকে পৃথক। প্রতিটি শ্রেণীরই নিজ নিজ অগ্রগামী, দল এবং নেতৃবর্গ থাকে। 'বামপন্থী সাম্যবাদ' বইয়ে লেনিন এদের কথা বলেছেন। যে কোন শ্রেণীদের লোকেদের নেতৃত্ব দরকার। কিন্তু ক্রুশ্চেভ এই সত্যটা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সমস্ত সমস্যাটাকে তালগোল পাকিয়ে তাতে তিনি 'ব্যক্তিপূজার' লেবেল সেঁটে দিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল স্ট্যালিনের প্রভাব খর্ব করা। কিছু কিছু ভুল করে থাকলেও স্ট্যালিনের ওপরদী তার দোষগুলিকে বহু গুণে ছাপিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমি রেউনের (নিউ ইয়র্ক টাইমসের পর্যবেক্ষক জেমস রেউন) সঙ্গে আলোচনা করেছি। সন্দেহ নেই যে, স্ট্যালিনের কর্মপদ্ধতির সমর্থন তিনি করেননি। কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, হিটলার যখন পূর্ব দিকে অভিযান করেছিল তখন স্ট্যালিন ছাড়া আর কেউ তাকে বাধাতে পারত কি? স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোবিয়েত ইউনিয়ন তিন বছর যাবৎ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল। তা না হলে লালমাওতে সৈন্যাবতরণ সম্ভব হত না। ইংলণ্ডের পক্ষেও হয়তো হতে পারত। স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ছাড়া রুশ জনসাধারণ কী করে এ রকম বুহদ্ধ হতে পারত?

রেউন এ কথা অস্বীকার করতে পারেননি।

এই ভূমিকা পালন করতে স্ট্যালিন কী করে সমর্থ হলেন তার রহস্য এই যে, লেনিনের মৃত্যুর পরে তিনি বহু ভ্রান্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং সমাজবাদী সমাজ গঠনের পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরই জন্য সোবিয়েত জনসাধারণ এবং তাদের পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শুধু এই রূপেই তারা ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে

(শেষাংশ পরের পৃষ্ঠায়)

দক্ষিণ কোরিয়ায় ফ্যাসিস্ত শাসন উৎখাতের আহ্বান

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

দক্ষিণ কোরিয়ার পাক জুং হির একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমেই মানুষ সরব হচ্ছেন। রাজধানী সিওলে দেয়াল লিখনে বা পোস্টারে ফ্যাসিস্ত শাসনের অবসানের আহ্বান জানানোর ঘটনা এখন এক পরিচিত ব্যাপার। ছাত্রদের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর পথেঘাটে প্রায়ই বিরোধ হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি এখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। ভিয়েতনামের দায় উর্দ্ধমুখী। যেসে অবশ্য জরুরী অবস্থা। সভা, সমিতি বাতিল; বেআইনী। সেনসরের দাপটে সত্য সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা নেই; একমাত্র সরকারী প্রচার ও সরকারী নেতার প্রশংসাই এখন সংবাদ। এর কোন হেরফের হবার জো নেই। এ ছাড়া, নিত্য নতুন আইন বেঁধে স্বাধীন কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে দেশে বাকিন জাপানী পুঁজি দক্ষিণ কোরিয়ার এক চমৎকার লুণ্ঠনের মৃগয়া ক্ষেত্র পেয়েছে।

পাক জুং হির ফ্যাসিস্ত পুলিশ রোজই বিভিন্ন মহল্লায় হানা দিয়ে গণতন্ত্রী মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, নানাভাবে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শিখেছে দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ। অসংখ্য গোপন প্রচারপত্র ও ইস্তাহারে দেশটা ছেয়ে গেছে। ক্রমেই মানুষের মন উদ্ধত কোরিয়ার গণতান্ত্রিক শাসক ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

এ অবস্থায় পাক জুং হি বাকেই বিরোধী মনে করছে তাকেই গ্রেপ্তার করছে। সম্প্রতি পাক জুং হির সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কিম জুং সহ দশজন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া, বিশিষ্ট বিরোধী নেতা চিয়াং ইল হিয়াং কে সস্ত্রীক আটক করা হয়েছে। উল্লিখিত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁরা নাকি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করে গতমাস মার্চ এক ইস্তাহার বিলি করেছেন। ইস্তাহারে নাকি পাক জুং হি সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রকাশ, বিরোধীপক্ষরা নাকি ক্ষমতা দখলের জন্য বিক্ষোভের আহ্বানও জানিয়েছেন।

পাক-জুং-হির নতুন হামলার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ আর নীরব নয়। প্রকাশ, দেশের সর্বত্র হাজার হাজার ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া গীর্জা, ওস্তাদ প্রার্থনা সভায় ঐ প্রচারপত্র কৌশলে পড়া হচ্ছে। অভিযোগ যে সিওলের বিখ্যাত গীর্জার (বিয়র দোং-এ) নাকি ঐস্তাহারটি পড়ানো হয়। ইস্তাহারে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে দেশের দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা পাক জুং হি এবার জবরদস্ত মোকাবিলার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও সংশ্লিষ্ট বিরোধী নেতৃবৃন্দের বিশেষ প্রভাব আছে। এবং সেকারণে পাক-জুং-হি আতঙ্কগ্রস্ত।

একটি হাসপাতালের কথা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেতড়ুক পরিচালিত তাঁতীডাঙ্গার ভগবতীপুরের ছোট্ট হাসপাতালটি সমগ্র অঞ্চলে চিকিৎসার একমাত্র ভরসা। অথচ বারো মাইল বিস্তৃত আদিবাসী ও সংখ্যালঘু এই সব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই।

এই ছোট্ট হাসপাতালটির বারো বছর বয়স হলেও তিন বছরেও নাবালকত্ব ঘোচাবার আশা নেই। সম্প্রতি প্রোগেসিভ কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত বাস্থ সম্মেলনে অধিবেশে ঐ হাসপাতালটি পুর্ণাঙ্গ করার দাবী ওঠে।

হুগলী জেলা সি. এম. এইচ দর্পণের সংবাদ পাঠ করে একবার সিওড় ছিলেনীওধাবে। ঐ পর্যন্ত। উন্নতি হয়নি। এদিকে ভগবতীপুরের সভায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপী করার এম, এল, এ মহম্মদ সফিউল্লাহ দাবের দ্বিতীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থাপী অযৌক্তিক বলেছেন। তাই ঐ হাসপাতালের উন্নয়ন দরকার। জনাব সাজেদুল হক চৌধুরী বলেন আশেপাশের বহু আদিবাসী মুসলমান পরিবার পরিকল্পনার অপারেশন করতে এসে ফিরে যাচ্ছে। মহিলা মণ্ডল বলেছেন এখানকার হাসপাতালের ওষুধ চুরি চলছে।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

সংবাদ দুঃসংবাদ

সূর্য আদিত্য

বিক্ষিপ্তভাকাশী ডি. এম. কে সরকারের পর শুভবাট মন্ত্রিসভারও পতন ঘটল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হীরেন্দ্র দেশাই আমাদের জানিয়েছেন, এর জন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবেন না। চিমনভাই প্যাটেল আশা প্রকাশ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে গুজরাটে নব যুগের সূচনা হতে চলেছে।

আমার রুমমেট ভোলা নন্দী মন্তব্য করলেন, এই জন্যেই আমরা বারবার বলছি কেন্দ্রের হাত শক্ত করতে।

•

জাতীয় কৃষি কমিশন আশা প্রকাশ করেছেন, বিশ শতাব্দীর মধ্যে ভারত হবে খাদ্যের দিক থেকে উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র।

ভোলা নন্দী এবারও মন্তব্য করলেন, মুদ্রাস্ফীতির মতো কঠিন ব্যাপারটাই যখন আমরা ঠেকিয়েছি তখন খাদ্যেও এই কৃতিত্ব আমরা অবশ্যই দেখাতে পারব।

• •

"বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভ ও হিংসার দিন গত হয়েছে।" যুব মেলার মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ।

ভোলা নন্দী জানালেন, কংগ্রেসের এম. এল শ্রীঅসমঞ্জ দে-কে অবশেষে জামিনে ছাড়া হয়েছে।

• •

আনন্দবাজারে রেডিয়ো কোটৌতে দেখা গেল। শ্রীমান্ অতীক সরকার তথ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীবরুবীর সিংহের হাতে একটি রৌপ্য ট্রফি তুলে দিচ্ছেন।

ভোলা নন্দী কোমো মন্তব্য করলেন না।

• •

ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের সঙ্গে খেলায় ভারতীয় স্পিনারদের ভোবানোর কৃতিত্ব ফিলডারদের ওপর বর্তেছে বলে জানা গেল।

ভোলা নন্দী বললেন, ভাগিস মাঠ খারাপ ছিল না।

• •

শ্রী আই. কে গুজরাল অবশেষে মস্কোর রাষ্ট্রদূতের পদটি পেয়েছেন।

ভোলা নন্দী আশুত গলায় উচ্চারণ করলেন, তাঁর পদমর্যাদা মন্ত্রীর সমতুল্যই থাকবে।

• •

আনন্দ সংবাদ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীবংশীলাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় প্রবেশ করেছেন।

ভোলা নন্দী বললেন, রাজনীতি থেকে দেশপ্রেম যে অনেক উচ্চ। আদর্শ আরেকবার প্রমাণিত হল।

• •

ভৈরব হালদার, আমতা ঃ বিভিন্ন বৃত্তিতে যোগ্যতার মাপকাঠি রয়েছে, রাজনৈতিক পেশার মাপকাঠিটি কী?

উত্তর ঃ সম্ভবত দেশপ্রেম?

• •

জয়প্রকাশ নারায়ণের 'অ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট' সংস্থাটি প্রধানত আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানী থেকে অর্থ পেত বলে সরকারী সূত্রে প্রকাশ।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

• •

ডাকাতি, লুঠপাট এবং হত্যাকাণ্ডে বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল রেকর্ড করেছে বলে ১১ মার্চ 'যুগান্তর পত্রিকার খবরে জানা গেল।

• •

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে জানা গেল, "বিরোধীদের আন্দোলন কখনও জাতীয় পর্যায়ে ছিল না। দু'খানেক কি হাজার খানেক লোক নিয়েছিল এই সব আন্দোলন।"

ভোলা নন্দী দুঃখ করলেন, এই মুষ্টিমেয় লোকদের জন্যেই সমস্ত ভারতবাসীর বাক্-স্বাধীনতা হরণ।

• •

সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত।

• •

"এখনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যা অভিজ্ঞতা বহু তাতে আর মেরুদণ্ডীতে বাঙ্ময়ের পঙ্কে অভিজ্ঞানের বলে আমি মনে করি।"

বিচারপতি অমীভূষণ চক্রবর্তী।

• •

পুর্বেন্দু পত্রীর হালফিল গবেষণা: "বাঙলা সাহিত্যে বলা নেই।"

ভোলা নন্দী বললেন, আশা করা যায়, ক্রমে ক্রমে তিনি চারপিকে ও ছুঁচোতে পৌঁছবেন।

• •

খাদ্য আন্দোলনের আত্মসমীক্ষা: "আমরা বিশ্বের নিকৃষ্টতম উদ্ভাসিক।"

• •

"ছেলেবেলা থেকেই পিছু হটা কাকে বলে আমি জানি না। বরং দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি প্রচুর পুরস্কার লাভ করেছি।"

ইন্দিরাজী।

শ্রীভোলানাথ সেন জানাচ্ছেন, কলকাতায় শতকরা তেত্রিশ জন লোক বস্তিবাসী।

ভোলা নন্দী বললেন, সংখ্যাটা যে কমতির দিকে, এটাই উল্লেখযোগ্য উন্নতি।

• •

সরকারি সূত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী চালনালা ঘনিগর্ভে আটক কর্মীদের সংখ্যা ৩৭৫। অথচ অদ্যাবধি সংবাদ অনুযায়ী উদ্ধারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১৬।

ভোলা নন্দীর মতে, কাগজে-কলমে রিপোর্টের সঙ্গে বাস্তব ঘটনা কোনো কালেই মেলে না।

• •

মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বে জানিয়েছেন পশ্চিম বাঙলার সমস্ত বাস্তুহীন মানুষকে জমি দেওয়া হয়েছে। খবরটা ভুল ছিল তার প্রমাণ, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসাংগোরী বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন প্রায় ছিন্ন লক্ষ বাস্তুহীনকে জমি দেওয়া হয়েছে।

ভোলা নন্দী বললেন, সরকার এবার তাদের বাড়ি তৈরিতেও সাহায্য করবে, এইটেই আনন্দের কথা।

সংবাদে প্রকাশ, রবজি ট্রফির সেমি-ফাইনালে বাঙলার সঙ্গে বম্বের খেলার সময় বাঙলার খেলোয়াড়িরা প্যাভেলিয়নেই কুস্তিতে মেতে-ছিলেন এবং তাঁদের মন্তপানের খরচ খুগিয়েছিল বম্বে সি. এ. বি।

মন্তব্য বর্জনীয়।

•

"জরুরি অবস্থার এই আট মাসের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষে নতুন শৃঙ্খলাবোধ এসেছে, যে অরাজকতার, উচ্ছৃঙ্খলতার, সন্ত্রাসে, রক্তপাতে, তাণ্ডবাবিতে ও শুণ্ডাবিতে দেশ একেবারে উজাড়ে যেতে বসেছিল···"

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

• •

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় জানাচ্ছেন- ১৯৭৩ এপ্রিলে বিলিফ ও রেহেবিলিটেশন ডাইরেক্টরেট থেকে অবসর নিয়ে এই বয়স ডিঙ্গিয়ে বহু কর্তাব্যক্তিদের কাছে হাঁটাহাঁটি করেও গ্র্যাচুইটি ও পেনসনের টাকার ব্যবস্থা করতে পারেননি।

• •

নলিনী চৌধুরী, আমাদের ঃ ENGLISH শব্দটা ব্যবহার করতে পারেন?

উত্তর ঃ পারি। E-তে ইংরাজ, N-এ নেহরু, G-তে গুলজারি লাল, L-এ লালবাহাদুর, I এ ইন্দিরা, S-এ সঞ্জয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

• •

সাহিত্য-ঐতিহ্যে ফাটল ও শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্র-সংস্কারে যখন নিশ্চিত নাগরিক বাঙালী স্থায়ী নিরাপত্তা ও আরাম বোধ করছেন তখন এই মধ্য শ্রেণীর নীচের স্তর থেকে যৌবন প্রায় উত্তীর্ণ করে' রুগ্‌ণ দীর্ণ শরৎচন্দ্র দীর্ঘ কয়েক বছর প্রবাসে কাটিয়ে ১৯১৬-তে পাকাপাকি ভাবে দেশের সাহিত্য-বাতাবরণে অবতীর্ণ হলেন। কী-ব্যক্তিগত জীবনে কী-সাহিত্যাদর্শে রবীন্দ্র-চালচিত্রের বাঁধনে তাঁকে আটকানো গেলনা। প্রচলিত বিবাহ-সংস্কারকে সহজেই অস্বীকার করে তিনি জীবন সঙ্গিনী বেছে নিয়েছেন। বহির্ভারতে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সংযোগ, বিশেষ করে' নিম্ন, বিত্ত, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে মানুষের অসহায়তার পক্ষে শারীরিক-মানসিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ এই লোককে তৎকালীন মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন করল। এতদিন সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ তথা দাসত্বতত্ত্বের পক্ষে যে দুর্বলতা গ্রাস করেছিল শিক্ষিত নাগরিক চরিত্রকে, এই লেখক যেন সচেতন ভাবে এই দুর্বলতাকে চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর সৃষ্টিকে নিযুক্ত করলেন। লেখক এটা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন ঔপনিবেশিক ভোগান তাঁর থেকে নাবিয়ে দিতে না-পারলে যার্থক সাহিত্যের অনুকূলে উপযুক্ত মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবেনা। তাই দেশের বৃহত্তর মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের যার্থেই তিনি নিজের যার্থকেও যুক্ত করে নিলেন। সাহিত্যের ভেক্ ছেড়ে তিনি নিরিবিলায় রাজপথে নেবে এলেন। আমরা তাঁকে দেখলাম মুখ্যত রাস্তালাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি ভঙ্গাত্মিরারী করতে নেবে গেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেবার পবিত্র সংকল্পে হাওড়ার কংগ্রেসের সভাপতি। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী। কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশ, অগ্নিযুগের বীরদের প্রতি, এমনকি এদেশে সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছে।

সবসময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কবি নজরুল ছাড়াও আরেক জন লেখকের উল্লেখ করা কর্তব্য হবে। তিনি শরৎচন্দ্র-অনুরাগী এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধেই "প্রেম চাঁদ" ছদ্মনামটি গ্রহণ করতে হয়। "পথের দাবী" সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বীভৎস মূর্তিটিকে যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে তা সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক কর্ম। শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষণই নয়, স্বাধীনতার আন্দোলনে নন-ভায়োলেন্স বা ভায়োলেন্স কোনোটিতেই শরৎচন্দ্রের এলার্জি ছিল না, তাই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং কংগ্রেসের ঘোষিত প্রধান নীতি "অহিংস" হলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে বিপ্লববাদকে সমর্থন করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মপ্রণালীকেও আন্দোলনের অংগবিশেষ বলে' তিনি চিনিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নটিই যখন আলোচিত হচ্ছে তখন ইংরেজি ভাষায় লিখিত হলেও মূলত্ রাজ আনন্দের 'কুলি' ও 'মুটি পাতা একটি কুঁড়ি'-দীর্ঘক উপন্যাস দুটিকেও ঐতিহাসিক সর্তে মনে রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্রেই প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

একটি ঘটনা সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। রাজনীতির বাস্তু মানুষ স্বয়ং গান্ধীজি সে কালে তাঁর সেক্রেটারি শ্রীদেশাইকে নির্দেশ দেন, অবিলম্বে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গুজরাতি ভাষায় তর্জমা করবার জন্যে। কারণটা কী এই নয় যে, গান্ধীজি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের সংগ্রামী ভূমিকাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন?

পথের দাবীর কী-ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল তার প্রধান বহন তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার কলসন স্বয় লেখককে বলেছিলেন "শরৎবাবু, আপনি পথের দাবী লিখে আমাদের কী ক্ষতি করেছেন জানেন? আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরছি, সেখানেই দেখছি তাদের সকলের কাছেই একটি করে' গীতা ও একটি করে' পথের দাবী। আপনার পথের দাবী বিপ্লবীদের কী ভাবে মাতিয়েছে একবার দেখুন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীগত দুর্বলতায় পথের দাবীর ভূমিকাটাকে অধীকার করে' অবান্তর ইংরাজের 'সহনশীলতার' গুণকীর্তন করেছেন এবং বুদ্ধিমানের মতো এই গ্রন্থের দায়িত্ব শরৎচন্দ্রের উপর চাপিয়ে দায় সেরেছেন। একই কারণে নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কবি হয়ে কারাত্তরালে গেলে কবি সে ভূমিকার গুরুত্ব পরিহার করে' টেলিগ্রাম পাঠালেন: অনশন ধর্মঘট ছেড়ে দাও। আমাদের সাহিত্যে তোমাকে চাই।'

আরও বিস্ময়, শরৎচন্দ্র যখন পথের দাবীকে সন্যাসীর জবানীতে বলেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে নিয়তিদত্ত পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর যরূপ যোঝা ত' শক্ত নয়, বোন।" তখন রবীন্দ্রনাথ "রাজত্বের কথার" ভূমিকায় জমিতে রাজত্বের বহু প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'বলশেভিজমের' গন্ধ পান। এবং হাস্যকর যুক্তিতে রাজত্বের হাতে জমিদারী ছেড়ে দিতে ভরসা পান না।

শরৎচন্দ্র আরও স্পষ্ট করে বলেন, "Permanent Settlement এর জন্যই জমিদার। তালুকদার ও অন্যথা মধ্যবিত্ত middleman সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি।···জমি কেনা ও বেশি সুদে দাদন কারবার করা এই হচ্ছে বাঙালার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"

বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারিত্বের সম্পর্কে এই তাঁর সুস্পষ্ট মতবাদ। তাঁর সাহিত্যকর্মে এই

মিহির আচার্য

সঙ্গতই তাঁকে পূর্ববর্তী লেখকদের বিরুদ্ধাচারী করেছে। অথচ যার উপর বঙ্কিমের মন্তব্য, আমাদের মধ্য শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে। এই নির্ভরতা ভেঙে গেলে এতদিনকার মুণ্ডারস্ট্রাকচারের বনেদটাও ধ্বসে পড়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থই বৈপ্লবিক। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় কী ব্যক্তিগত জীবনে এর সঙ্গে আপস করেন নি। এমনকি গ্রামে বাড়ি তৈরি করলেও তথাকথিত মনীষীদের অনুকরণে জমিদারি কিনতে ঘৃণা বোধ করেছেন। শরৎ-সাহিত্যের এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আড়াল করবার জন্যে স্বাভাবিক কারণেই এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী লেখকের ভিন্ন মূল্যায়নের নামে অপব্যাখ্যাও করেন।

মূর্খ শরৎসাহিত্য-আলোচক কলেজের মাষ্টার এমনও মন্তব্য করেন পথের দাবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব না কি শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেন নি, না কি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের মতো ছিল না!

এই প্রশ্নটা নিয়েই আপাতত আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে একবারই মাত্র সক্রিয় রাজনীতিতে বল্লায় হলেও অংশ নিয়েছিলেন। সেটা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উষা লগ্নে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে এবং 'বিপ্লববাদ' চাঙা দিয়ে উঠলে কবি আচরে আন্দোলন থেকে সরে দিয়ে শান্তিনিকেতনের স্বামী বাসিন্দা হলেন। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার বিরুদ্ধে "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্তনার প্রয়োজনে যখন জাতীয় নেতৃত্ব ইংরাজের গোলামখানা থেকে ছাত্রদের বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার তাৎপর্য না মেনে "শিক্ষার মিলনে" য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রবলতার উদ্বেল হয়ে উঠলে শরৎচন্দ্র তার উত্তরে "শিক্ষার বিরোধ" রচনায় সাহসের সঙ্গে য়ুরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে তুলে ধরলেন। ইংরাজি শিক্ষা যে এদেশে সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়ক হাতিয়ার ছিল এ কথা কী নতুন করে' বোঝবার প্রয়োজন রয়েছে? অগ্নিযুগের অসহযোগের মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ক্যাপিতে বসে' 'চার অধ্যায়' যখন কলংকিত করলেন, ঠিক সেই বছরে সূর্য সেন সাম্রাজ্যবাদের জল্লাদের হাতে আত্মাহুতি দিলেন। 'চার অধ্যায়' ঘটিতি সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা Asia তে তর্জমা হয়ে গেল। শত শত কপি 'চারি অধ্যায়' জেলখানার পাঠানো হল বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার জন্যে।

এই হল কবির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যা শরৎচন্দ্র অনুধাবনই করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় অভিযোগ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান নায়ক-নায়িকা জমিদার। যদিও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এ-অভিযোগ ধোপে টেঁকেনা। 'প্রেমিক' জমিদার বা জমিদার-নন্দনই হোক তাদের বড়লোকী যে প্রজার শোষণে গড়ে-ওঠা এ-সত্যকে তিনি গোপন করতেও চেষ্টা করেন নি। ইতস্তত এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচ্যুতি যদি কোথাও ঘটে থাকে তার জন্যে একা শরৎচন্দ্রকে দায়ী করা চলেনা, মনে রাখতে হবে জমিদারি-প্রভাবিত যে শিল্পীটান মধ্যশ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানকে দীর্ঘদিন চিকিয়ে রেখেছে শরৎচন্দ্র একক-চেষ্টায় তার সর্বগ্রাসী সংক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন, এমন চিন্তা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যায়।

তৃতীয় অভিযোগ, শরৎচন্দ্রও বঙ্কিমের মতো বিধবা বিবাহ দিতে পারেন নি। এ-ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের যুক্তি স্পষ্ট, সমাজকে আঘাত দিয়ে সমাজের বীকৃতির মাধ্যমে যদি এ বিবাহ না ঘটে তাহলে কলমের ডগায় তিনি হাজার বিধবা বিবাহ দিলেও তা সার্থক হবে না। সামাজিক বীকৃতির বৈতে রমা-রমেশের যে বিবাহ হতে পারল না তার ফলে মুটো মানুষের জীবনই নয়, একটা পল্লীসমাজের গৌরবময় সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ অভিযোগ, শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তাই তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি ব্র-কথা। কথাটা উল্টো করে বললে কী এই দাঁড়ায়না যে, হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলি তথাকথিত ব্রাহ্মণেরাই ধরে রয়েছে, সেই চরিত্রগুলির মাধ্যমেই শরৎচন্দ্র গোটা হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন? প্রতিহিংসাপরায়ণ সমাজ শিরোমণিদের একযোগে লেখককে আক্রমণ কী এটাই প্রমাণ করেনা যে, লেখকের উদ্দেশ্য সঠিক ছিল?

বিরুদ্ধবাদীদের এই সকল অভিযোগের ফাঁদে পা দিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। উপরন্তু সচেতন পাঠকের প্রণিধানযোগ্য প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্রের সচেতনতা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততান্ত্রিক স্ট্রাকচারের উপরই নিবদ্ধ রইল না, তস্য প্রতিক্রিয়াজাত সুপার ষ্ট্রাকচারের দিকেও তিনি কামান দাগলেন। পথের দাবীর পর তাঁর প্রধান সাহিত্য কর্ম শেষ প্রশ্ন। এখানে তিনি আমাদের সনাতন ধ্যানধারণাপুষ্ট চিন্তার গভানুগতিকতাকে সচকিতভাবে ঘা মারতে শুরু করলেন। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, আশ্রম, অধ্যাত্মসাধনা, মায় সতীত্ব, একনিষ্ঠ প্রেম-জাতীয় ভারতীয় লেবেল-মারা অগভল্ল ভাব বা বাঁধা চর্চাকে কেন্দ্র করে' যুক্তিনিষ্ঠ, গতিশীল বস্তুধারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। ভাববাদের বিরুদ্ধে শেষ প্রশ্নের এই তাত্ত্বিক যুক্তিনিষ্ঠা বস্তাবতই ঐতিহ্যপন্থী, রক্ষণশীলদের মনঃপুত হয়নি। সমাজে চরকা, প্রার্থনাসভা ঠিকমতো করতে লাগলে, শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার অগত্যুতি ঘটেছে। কোনো কাহিনী নেই, কথন শুধু কথাসর্বস্ব, ভাব কথায়-আচরণে মিল নেই, ইত্যাদি। মূর্খেরা বোঝেনা 'শেষ প্রশ্ন' একটি তত্ত্বমূলক গ্রন্থ, কাহিনী-বচনার পটু লেখক এখানে তথাকথিত বহুল কোনো কাহিনী বুনতে চেষ্টা করেন নি। 'বিপ্লববিনী' কমল যেটুকু ছুঁয়েমাত্র দেখিয়েছে সে কনসেশনটুকু না-দিলে এ-গ্রন্থ তথাকথিত ভদ্রলোকদের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারত না। এই ছিদ্রান্বেষী ভদ্রলোকদের লেখক ভালো করেই চিনতেন। এ যেন ধর্মের ঘরে ঘুঁদি ভারতীয় জনসাধারণের মন কাড়বার জন্যে গান্ধীজীর রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশোনোর কৌশল।

অথচ এ-কনসেশনটুকু দিয়েও

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র

(২য় পৃষ্ঠার পর)

শরৎচন্দ্র তার উদ্দেশ্য হাঁসিল করে নিয়েছেন।

'শেষের দাবী' যদি রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে তাহলে 'শেষ প্রশ্ন' এক-জাতীয় সাংস্কৃতিক নিষ্ক্রিয়তের নান্দীমুখ।

ধর্ম-আশ্রয়-অধ্যুষিত দেশে এই বহুদূল সংস্কারগুলোকে আঘাত করা যে কী বৈপ্লবিক কাজ, তা সবাই স্বীকার করবেন। কারণ এরি উপর আমাদের সমাজচিন্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই নতুন ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী সাহসকে সাধবার কারণে শরৎচন্দ্র প্রথমাবধি সমাজের গুরুতর সন্দেহভাজন হয়ে পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী তো বটেই, এমনকি ছাত্র দলকেও।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারণার বিপরীতে দেখিন যে নতুন শক্তিমান সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল শরৎচন্দ্র তাঁদের কারণেই তাঁর সাধনা গ্রহণে উৎসুক হয়। কারণ এঁদের সত্য বারবার তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এমন আশা তাঁর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শরৎচন্দ্রের একক চেষ্টায় যে যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী সাহিত্য ঐতিহ্য গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেদিনকার নতুন সাহিত্যিকগোষ্ঠী যেন্দের বৃহত্তর সমাজকে উপেক্ষা করে' যখন উদ্ভট যৌনসর্বস্বতার নেতে উঠলেন তখন শরৎচন্দ্র নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন। ফলে শরৎচন্দ্রের একক চেষ্টায় যে বস্তুবাদী ধারা গড়ে উঠতে চাইছিলো, পরবর্তী লেখকদের ক্যাপাস-সর্বস্বতায় তা আবার ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। এবং সাহিত্যের পুরনো ঐতিহ্যই আবার সমাজ শরীরকে অন্ধযুগের করে তুলল।

'বঙ্গবাণীতে' বারাবাহিক প্রকাশিত পত্রের দাবীর প্রেস কপিতে ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এ শরৎচন্দ্রের মন্তব্য কম ইঙ্গিতবহ নয়। তিনি লিখেছিলেন, "পত্রের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে এই কামনা করি।"—ল

শরৎচন্দ্রের এই অসমাপ্ত কাজের ভার কী কেউ নিলেন?

যে-শরৎচন্দ্র মন্তব্য করলেন 'পথিক লেখা পড়লে প্রত্যহ আমার মাথা ঘুরে আসে' এবং যিনি বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যত যে রাশিয়ান সাহিত্যের মতো নীচুতলার মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, সে-আশ্চর্য বাস্তব ইঙ্গিতটির কী কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেদিন?

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণকালে বানি কোন্ কারণে অদূর গর্কিকে দেখবারও সময় করতে পারলেন না। অথচ ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণের আগেই ১৯২৪-এ "পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি" পত্রিলিটে ২৭ সেপ্টেম্বর গর্কির "টলস্টয় স্মৃতি" সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে কটাক্ষ করেছেন "...গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত।" আসল ব্যাপার গর্কির "সর্বহারার মানবতাবাদ" রবীন্দ্রনাথের "শ্রেণীনিরপেক্ষ মানবতাবাদের" সঙ্গে মেলেনি। রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদার ১১ জুলাই ১৯৩৬ তারাবীপুরে আগুতোষ মেমোরিয়াল বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রেরণের ঘটনার কী প্রমাণ করতে চেয়েছেন তিনিই জানেন। নেপালবাবু যথা যথ বাণীই উদ্ধৃত করে দিতে পারলে আমাদেরও অনেক পক্ষপ্রর বাঁচত! "কবিগুরু" রুডিয়ার্ড কিপলিঙের মৃত্যুতেও বাণী পাঠিয়েছেন যার মধ্যে কিপলিঙের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের পরিচয় নেই! অথচ রাজনীতিক ও কবি সরোজিনী নাইডু সে সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটিরও উল্লেখ করতে ভোলে নি।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

১৯৩৬-এর গোড়া থেকেই তাঁহার অসুস্থ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবন খণ্ডিত হল। ১৯৩৮-এ তাঁর জীবনাবসান ঘটল।

যুরোপে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে।

দর্পণ

সাপ্তাহিক

বার্ষিক বাইশ টাকা

ষান্মাসিক এগারো টাকা

ত্রৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার

ঠিকানা-এ

৬১, মহী লেন, কলি-১৩

চৌ এন লাই

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

পেরেছিল। অবশ্য তত্ত্বগত কাজ এবং নেতৃত্বদানের পদ্ধতিতে স্ট্যালিন কিছু কিছু ভুল করেছিলেন। ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিন-বিরোধিতা- ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষা প্রসূত। স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে 'বাবা' ডাকতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রুশ্চেভ একটা গোপন প্রতিবেদন করলেন এবং তা অচিরাৎ আমেরিকায় প্রকাশিত হল। ধনগত আশুগতোর কথা ছেড়ে কেবল ব্যক্তিগত নৈতিকতার দিক থেকে বিচার করলেও বলতে হয় যে, ক্রুশ্চেভ নিজের শোচনীয় পরিচয় দিয়েছেন।

ক্রুশ্চেভ সাহেব 'বিরোধিতা' করছেন বলেই আমরা নেতার প্রতি সম্মান দেখাব এবং মহৎ বোধকে বিসর্জন দিতে পারি না। যে কোন নেতাকে মানুষ প্রথম যে প্রশ্ন নিশ্চয় করবে তা হল: আপনি সম্মানের যোগ্য কিনা। দ্বিতীয় হল: আপনি কি অসংখ্যাধারণের বীরত্ব নেতা, না কি আপনার ভাবমূর্তি কৃত্রিম ভাবে তৈরি? একথা অনস্বীকার্য যে, মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন ওয়াশিংটন। তাঁকে বাদ দিয়ে আপনারা আমেরিকানরা ১৯৭৬ সনে 'আপনাদের স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারতেন?

মহত্ত্ববোধের কথা বলতে গেলে বলা যায় এদিক থেকে ওয়াশিংটনের নাম খুব বাবহৃত হয়। মার্কিন রাজধানী এবং এরটি গোটা রাজ্য তাঁর নামাঙ্কিত। এ ছাড়া আরো বহু জায়গা এবং জিনিস তাঁর নামে আছে। একে আপনি কৃত্রিম বলতে পারেন না। এটা খুবই স্বাভাবিক বিকাশ। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী যখন বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করবে তখনো তারা যদি অতীত ইতিহাস বিচার কাজে যায় তাহলে তারা ওয়াশিংটনের ভূমিকা অস্বীকার করতে পারবে না। ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। রোবসপীয়রকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সত্য কিন্তু তার অবদান তখনো জিল প্রভৃত যা কোনদিন মলিন হবে না।

সেই জন্য এই ব্যক্তিপূজার প্রবণতা সম্বন্ধে মাও সে তুং আলোচনা করেছেন কাজের কথার মত। একজন নেতাকে বিদায় হতে হয় তার মানে হল দৈবনিক ঘটনা এবং মার্কিন কায়দায় পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া।

(চলবে)

হাসপাতালের কথা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বার ইতালীয়ান, রুশ, জার্মান সাহেবরা কি দেখতে আসেন? সাতো বছরের ব্যাথতা? চউতলায় ভগবতীপুর দিংহদোড় শান্তুর নবাবপুর জলামাহুল চাবুন্দী, কানাইডাঙার লোকের অসল ঐ হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেঝাইনী একটি টিমটিমে কমিটি কই করে নাকি কোন ও মতে কাজ চালাচ্ছেন। তগলী জেলা মেডিক্যাল দপ্তরের গ্রাণ্ট ও কমছে রেডক্রশ দপ্তরের উৎসাহ ও ভাঁটা। অথচ স্থানীয় লোকের জমিতে বুকের রক্ত জলকরা ঘর বাড়ীর ঐ হাসপাতাল অজানা কারণে চির অবহেলিত।

বড় পুরস্কার জিতে নিন

● এক লক্ষ টাকা আপনার হতে পারে

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কে এপ্রিল 10, 1976-এর টাকার কম না হয়। এই সর্ত মেনে চললে আগে 200 টাকা বা তার বেশি দিয়ে একটি জমার খাতা খুলুন। পুরস্কারের জন্যে যত দিন আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হবে, ততদিন আপনার খাতায় শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ জমা পড়বে। আপনি ঐ খাতার টাকা জমা দিতে বা তুলতেও পারেন, শুধু দেখতে হবে যে সেপ্টেম্বর 30, 1976 পর্যন্ত খাতায় বাকীর পরিমাণ যেন কখনও 200 টাকার কম না হয়। এই সর্ত মেনে চললে আপনি 1977-এ জানুয়ারী মাসের 'ড্র'-এ আপনি পুরস্কারের জন্যে যত দিন সামিল হতে পারবেন। আপনি নিজের নামে, বিভিন্ন ডাকঘরে, একাধিক খাতা খুলতে পারেন। তাছাড়া আপনার পরিবারভুক্ত যে কোন প্রাপ্তবয়স্কের নামে, এমন কি নাবালক/নাবালিকার নামেও অনুরূপভাবে একাধিক খাতা খুলতে পারেন।

মোট 20.50 লক্ষ টাকার 11,116 টি পুরস্কার

বছরে দুটি ক'রে 'ড্র'

পুরস্কার

একটি প্রথম পুরস্কার 1,00,000 টাকা	দশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি 20,000 টাকা	এক হাজারটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি 500 টাকা
পাঁচটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি 50,000 টাকা	একশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি 5,000 টাকা	দশ হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি 50 টাকা

প্রণিধানযোগ্য

যদি আপনি 1977-এর জানুয়ারী 'ড্র'-এ কোনও পুরস্কার না-ও পান, মনে রাখবেন যে যদি আপনার ঐ জমার খাতায় বরাবরই অন্তত 200 টাকা বা তার বেশী থাকে তাহলে ভবিষ্যতে দব ক'টি 'ড্র-এ' পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

সঞ্চয় ক'রে আজই খাতা খুলুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পোস্ট বক্স নং 96, মাগপুর

dsvp 76/b90

R-gd. No. WB/CC-32

PRICE : 40 PAISE

জয়ন্তী বসেরায় স্ত্রী পালায় ঘনশ্যামসুন্দর ও বঙ্গাকুমারী

ব্রজেনবাবু আমার শিল্পী জীবনের প্রেরণা

শান্তিগোপাল

আমার প্রাণশক্তিরূপে যা পাওয়ার যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে ব্রজেন দে একজন। আমার চোখে অবশ্য তিনি বিশেষ একজন। কারণ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, তাঁরা আমার ভালো চাইতেন, আমার ভালো করতে চাইতেন, কিন্তু ব্রজেনবাবু আমার ভালো করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি যাত্রার আগাগোড়া ইতিহাসে আমার অভিনয় পদ্ধতিতে এই দু'জন প্রধানতই উৎসাহের জোয়ার এনে দিয়েছিল।

ছাত্রপুর অনেকদিন অনেক যুগ অনেক কল্পনাকে অতিক্রম করেছি। বলতে গেলে প্রায় যাত্রার ভেতর দিয়ে যার কয়েছি। তাই লোকে বিচার ই কি বা সে ব হাতে রেখে দিলেও যাত্রায় এখনো বিশেষ যোগাযোগ, একটা বিশেষ দার্শনিক মনোভাবে মানুষে রেখে কাজ করার চেষ্টা করছি। একাজে ব্রজেনবাবুকে যতটা বিশেষ ভাবে পাইনি, কিন্তু আ যা সে ব প্রযোজিত পালাগুলির প্রতি তাঁর ব্যবহার একটা নমীক্ষের ভাব সত্য করেছি। এটা আমাদের উৎসাহ দিয়েছে এবং পালাকার হিসেবে তার মধ্যে প্রশংসাবাদই প্রমাণিত হয়েছে। শম্ভু যাগকে পালাকার হিসেবে তাকে প্রশংসা করতেও শুনেছি।

তাঁর কাছে যাত্রা সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি কখনো আমাকে ফেরাতে পারেন নি। পালা প্রযোজনার দিক থেকে আমরা যখন আমাদের সঙ্কটে পড়েছি, তখন তিনি পালাকার হিসেবে যা করেন নি সেই সেক্সপীয়রের নাটক যাত্রায় রূপান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আজ ওই ধেনাই বাবে বাবে অনুরোধ করে যে, একজন পালাকার হিসেবে তাঁর সঙ্গে মেজাজে কলাকৌশলে মানসিকতা নিয়ে নতুন করে পালা লিখতে চেয়েছিলেন, তার সে ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

পশু সেন মশাই-কে ব্রজেনবাবু উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করে ছিলেন : 'এ ছেলেটিকে কোথেকে জোগাড় করলে হে? যেন অভিনয় করেছে তো!' তাঁরপর থেকেই আমি ব্রজেনবাবুর বিশেষ স্নেহ পেয়ে বিসাম। সত্যি কথা বলতে যাত্রার আগাগোড়া ইতিহাসে আমার অভিনয় পদ্ধতিতে এই দু'জন প্রধানতই উৎসাহের জোয়ার এনে দিয়েছিল।

ছাত্রপুর অনেকদিন অনেক যুগ অনেক কল্পনাকে অতিক্রম করেছি। বলতে গেলে প্রায় যাত্রার ভেতর দিয়ে যার কয়েছি। তাইলোক বিচার ই কি বা সে ব হাতে রেখে দিলেও যাত্রায় এখনো বিশেষ যোগাযোগ, একটা বিশেষ দার্শনিক মনোভাবে মানুষে রেখে কাজ করার চেষ্টা করছি। একাজে ব্রজেনবাবুকে যতটা বিশেষ ভাবে পাইনি, কিন্তু আ যা সে ব প্রযোজিত পালাগুলির প্রতি তাঁর ব্যবহার একটা নমীক্ষের ভাব সত্য করেছি। এটা আমাদের উৎসাহ দিয়েছে এবং পালাকার হিসেবে তার মধ্যে প্রশংসাবাদই প্রমাণিত হয়েছে। শম্ভু যাগকে পালাকার হিসেবে তাকে প্রশংসা করতেও শুনেছি।

তাঁর কাছে যাত্রা সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি কখনো আমাকে ফেরাতে পারেন নি। পালা প্রযোজনার দিক থেকে আমরা যখন আমাদের সঙ্কটে পড়েছি, তখন তিনি পালাকার হিসেবে যা করেন নি সেই সেক্সপীয়রের নাটক যাত্রায় রূপান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আজ ওই ধেনাই বাবে বাবে অনুরোধ করে যে, একজন পালাকার হিসেবে তাঁর সঙ্গে মেজাজে কলাকৌশলে মানসিকতা নিয়ে নতুন করে পালা লিখতে চেয়েছিলেন, তার সে ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

তরুণ অপেরার

জুলিয়াস সিজার আসর অবদান

রচনা শম্ভু বাগ

নির্দেশনা ও নাম ভূমিকায়

শান্তিগোপাল

দুটি যাত্রা সম্মেলন হচ্ছে

কলকাতার বুকেই আবার দুটি যাত্রা সম্মেলন হতে চলেছে। একটি শুরু হচ্ছে আগামী ২রা এপ্রিল উত্তর কলকাতার উল্টোডাঙায় ডি-আই পি রোডের পাশে। অন্যটি শুরু হচ্ছে ১৪ই এপ্রিল শিয়ালদা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে গিরিশ পার্কের কাছে। যাত্রাজগতের শীর্ষস্থানীয় দলগুলিই এই দুটি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করছে।

ব্রজেন ধের স্মরণ সভা

পালাকার ব্রজেন ধে-র স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলেন প্রবীণ অপেরা গত শনিবার বিকার্ড ঘরে। উপস্থিত ছিলেন মন্মথ রায় (সভাপতি) ও প্রবোধবন্ধু অধিকারী (প্রধান অতিথি)। শোকসভায় ব্রজেনবাবুর নামে একটি গ্রন্থাগার, যাত্রা কেটিডায় এবং চিৎপুরে রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরের দিন রবিবার সকাল সাড়ে ৯'টায় রবীন্দ্র সদনে অনুরূপ আরেকটি শোকসভার আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন। বিভিন্ন যাত্রাদলের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় যাত্রা কেটিডায় ছাড়া অনুরূপ প্রস্তাবগুলিই গৃহীত হয়েছে।

হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

(দর্পণের সঙ্গীত সমালোচক)

'যুবযুব রসেকধি' চক্রের উদ্যোগে (কলামন্দির, ১৯ মার্চ) হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটী ঘরানাদ্বয়ের একটি যুগ অনুষ্ঠান আকর্ষক হয়েছিল।

শুদ্ধ কল্যাণ রাগে বিলম্বিত এবং দ্রুত খ্যাল গান গাইলেন শ্রীমতী সুমিত্রা গুহ (বাসু)। অল্পের মেয়ে হলেও তিনি শ্রীমতী বালিকা কানসের ছাত্রী। শ্রীমতী গুহর কণ্ঠ এক সপ্তকে আবদ্ধ হলেও সুরেলা। শীতলোবিন্দের দুটি পদের পরে তিনি হংসধ্বনিতে একটি ছোট খ্যাল শোনান। কবীয়ের একটি ভজন গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।

তরুণ গায়ক ডঃ বালমুরলীকৃষ্ণ ভাগবতারের একটি কৃতি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে যুবচিত সংমোহিনী রাগে আলাপ্তি গান করেন। রাগটির পূর্বাঙ্গ হিন্দুস্থানী দরবারী কানাড়া এবং উত্তরাঙ্গ ভৈরবীর মত। খরাজ এবং দরবারী কাহি তাঁর গমক এবং মীডের কাজগুলি সুপরিস্ফুট হয়েছিল।

শিল্পী পৃথ্বীশের নতুন ছবি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

তাঁর ছবি দেশলাইয়ের কাঠির মতো ফস করে জ্বলে ওঠে আবার ফস করে নিভে যায়। অন্ধকার আরো ঘন আর গাঢ় হয়। দাহ্য পদার্থ এত কম যে ভাওয়ার ভেতর থেকে বারুদের গন্ধ নাকে লাগেনা।

একজন সমালোচক শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি এ রকম কথা লিখেছেন। দীর্ঘদিন বাদে নূতন নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পৃথ্বীশ ইতিমধ্যেই আর একটি চিত্রপ্রদর্শনীর কথা ভাবতে সুরু করেছেন। কথা-শিল্পী কমলকুমার মজুমদারের একটি উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয়—বপ্র দেখিবার ব্যাধীনতা যেমন আমরা কোনক্রমেই হারাইবনা, যেমন আমরা ইহলৌকন আকাশ ধরিতে বন্ধিত হইব না, যেমন সান্ধ্য দিয়া গায়ত্রী শোনা আমাদের আলিঙ্গনে ভরাক্রান্তিত ভোরের নিমিত্তে নিশ্চয়ই প্রস্তুত করিবে, তেমনই খরই বন্ধিরবেণা বিস্তার সোহাগ আমাকে আপনাকে বন্ধুরদের সাক্ষাতে আনিবে। নিশ্চয়ই বপ্র আমরা আবিষ্কার করি এ কথাই প্রাথমিক। এমন কতক গুলপ্রকে নইয়া পৃথ্বীশবাবু কাজ করতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কাগজের চরিত্র রঙের অদ্ভুত রহস্যজনক প্রসার-বর্ধকে (যারা বপ্র) লইয়া তিনি চিত্র রচনা করিয়াছেন।

আগামী এপ্রিল মাসে পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার সর্বশেষ অবস্থা দর্শকদের সমুখে উপস্থিত করিতে বদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর ইচ্ছা শিল্পের এক বরণের নিজস্ব দর্শক থাকে শুধুমাত্র তাঁরাই যেন পৃথ্বীশের ছবির প্রধান দর্শক না হয়। চিত্রিতাধ্যায় নিয়েরে খাঁচার সমুখে যদি ছবির প্রদর্শনী করা যায় তাহলে অতি সাধারণ মানুষেরও তা নজরে পড়বে এবং শিল্পীকে নূতনভাবে মূল্যায়নের এক চেষ্টা দর্শকদের চিত্র-সুন উন্মেষের কারণ হবে, এরূপ ভেবেই পৃথ্বীশ নূতন নূতন ছবির সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত সপ্তাহে দর্পণের প্রথম পৃষ্ঠায় "ওস্তাদ দত্ত অর্থগ্রন্থ হতে পারেন"—এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে শ্রীওস্তাদ দত্তকে ভবরুদ্ধঃ কলাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দিষ্ট প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য।

নতুন ছবি

দীর্ঘদিন পরে চিত্র পরিচালক শ্রীতারক মুখোপাধ্যায় "পরিণীতা" নামে একটি ছবির কাজে হাত দিয়েছেন জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে। গল্পটির লেখক, চিত্রনাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, শিল্প নির্দেশক ও পরিচালকের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে শ্রীনরেশ পাধ্যায় ছবিটি সর্বাঙ্গে সুন্দর করার ও অর্থের রঙীন আলিঙ্গনে সাহিত্যরসের গল্পের প্রয়োজনের ধারিতে। ছবিতে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমমত ঘটক নতুন নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পীদের দিয়ে গান গাইয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন নির্মলে চক্রবর্তী, কণিকা ভট্টাচার্য, বিজয়া দাস, প্রতিমা চক্রবর্তী, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ও অপনা রায়চৌধুরী। পর পর কয়েকদিন ইন্দ্রপুরীতে একটানা শুটিং করে পরিচালক ছবির কাজ শেষ করে এনেছেন। অবি মাত্র দুয় সাত দিনের কাজ বাকি যা ফেব্রুয়ারীতেই শেষ হয়ে যাবে। এ ছবির চরিত্রে আছেন শর্মিষ্ঠা, সঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা, সবুজিৎ সরকার, ছেলেমিময় লাল, সেবা চৌধুরী ও আরো অনেক নতুন শিল্পী। আলোক চিত্রশিল্পের আছেন শ্রীননী দল।

স্তালিন

ডাকযোগে বই সংগ্রহকারীরা ছাড়া যাঁরা ১১শ ও ১২শ খণ্ড আগামী ২৫ এপ্রিল ১৯৭৬ এর মধ্যে সংগ্রহ করবেন না, তাদের ঐ তারিখের পর থেকে প্রতি খণ্ডের জন্য প্রতি রাজ্যে অতিরিক্ত ১·০০ (এক টাকা) করে দিতে হবে। বিঃ দ্রঃ উক্ত খণ্ডগুলির মধ্যে যদি কোনটি উল্লিখিত তারিখের পর অপ্রকাশিত (Out of print) হয়, তাহলে তাদের পরবর্তী মুদ্রণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং তজ্জনিত বর্ধিত মূল্য দিতে হবে।

নবজাতক প্রকাশন এ ৬৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলি ৭

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

সম্পাদকের সবিনয় নিবেদন

বিশেষ কারণে গত ২রা এপ্রিল থেকে দর্পণ প্রকাশ করা যায়নি। অনেক চেষ্টার পর বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। আগামী ২২শে অক্টোবর থেকে দর্পণ আবার নিয়মিত প্রতি সপ্তাহ বেরুবে যদি অনিবার্য কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। সামনে পূজার উৎসব ও আনন্দ। আমরা দর্পণের পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই।

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ॥ বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ॥ দাম এক টাকা

সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী প্রশ্ন

নারায়ণ চৌধুরী

ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে বিধিবদ্ধ হয়। তারপর এই ছাব্বিশ বছরের কিছু বেশী সময়কাল মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের অনেকবার সংশোধন বা রদবদল হয়েছে। সংশোধন বা রদবদলের যে প্রয়োজন ছিল না এমন নয়, কেন না সংবিধান কার্যকর করতে গিয়ে বারে-বারেই দেখা গিয়েছে যে, সংবিধানে আক্ষরিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে তাৎক্ষণিক বাস্তব অবস্থার মিল নেই, প্রগতিশীলতা ও সামাজিক সুবিচারের আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে রূপদান করবার পথে সংবিধানের একাধিক ধারা-উপধারা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরকম হবার কারণ এই যে, ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা গণপরিষদের সদস্যরা ভারতীয় জনসাধারণের মাত্র ১৩ শতাংশের ভোটে নির্বাচিত হয়ে গণ-পরিষদে এসেছিলেন, তাও সরাসরি ভোটে নয়, পরোক্ষ ভোটে। তার উপর আমাদের রাজনীতি ও সমাজ-অর্থ-নীতির বিশেষ গড়নের ফলে যাঁরা এইভাবে নির্বাচিত হয়ে গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়নের অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সবলেই কমবেশী কায়েমী স্বার্থ ও স্থিতাবস্থার প্রতিনিধি, সমাজের নির্যাতিত-শোষিত অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বের বরাত নিয়ে তাঁরা কেউ আসেননি। ফলে তাঁদের প্রণীত সংবিধানে স্বভাবতই জনগণের সত্যিকারের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে এবং 'নির্দেশক নীতিসূত্রের' ঘোষণার বেশ কিছু ভাল-ভাল কথা থাকলেও এবং আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা নাগরিকের অধিকার রক্ষায় কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি ওই সংবিধান বহন করলেও, কার্যকালে বিভিন্ন ঘোষণা ও ঘোষণার রূপদান চেষ্টার মধ্যে এমন সব বিরোধের সৃষ্টি হতে লাগলো যে পূর্বোক্ত বড় বড় বুলিগুলি একাধিক ক্ষেত্রে কথার কথা হয়েই রইলো।

সুতরাং সংবিধান সংশোধনের যে প্রয়োজন ছিল ও আছে তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংশোধন হবে এবং কী ভাবে হবে সেইটেই হলো প্রশ্ন। যদি দেখা যায় যে, সংবিধান সংশোধনের নামে পূর্বতন সংবিধানে যে-সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা-গুলি বর্তমান ছিল সেগুলিকে বিলুপ্ত না করে আরো বেশী সংকুচিত করার আয়োজনের সূত্রপাত হয়েছে এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করবার অভিপ্রায়ে গণতন্ত্রের মূলেই কুঠারাঘাত করবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ আছে বইকি। সংশোধন নিশ্চয়ই কাম্য, তবে সে-সংশোধন জনসাধারণের আরও বেশী অধিকার বিস্তৃতির অভিমুখে হওয়া বাঞ্ছনীয়, আরও অধিক প্রগতিশীলতার মনোভাব সংশোধনের ভিতর পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ এদেশে রামদহী শক্তি বলে যাঁরা পরিচিত

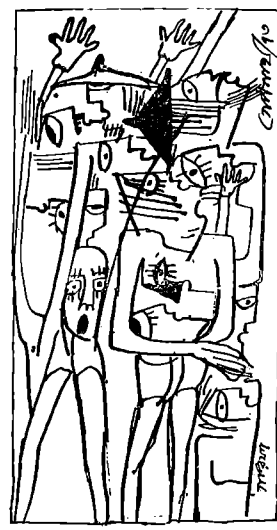

তাঁরা অনেক কাল থেকেই এই পথে সংবিধানের সংশোধন দাবী করে আসছেন। তাঁদের দাবীর ভিতর সামাজিক সাম্য ও সুবিচারের যুগোচিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তাঁদের দাবীর স্বাধ্যতা প্রতিপাদন করেছে। কিন্তু এখন যেভাবে সংবিধান সংশোধনের কথা চলছে তাতে সামাজিক সুবিচারের নীতিকে জোরালো করার বদলে তাকে আরও দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। পরিবর্তনের হাওয়া উল্টোমুখে বাঁক নিতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত সংশোধনের মধ্যে কোথায় অর্জিত অধিকারগুলির আরও বেশী সম্প্রসারণ ঘটবে, তা নয়, তাদের আরও খর্ব করার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। হয়ত লোকসভার এই অধিবেশনেই এই সব সংশোধন অপোভন ব্যস্ততায় সাত-তাড়াতাড়ি করে পাশ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু কেন এই নিদারুণ অস্ত-ব্যস্ততা কেউ তা জানে না।

সাংবিধানিক গণতন্ত্র আমাদের দেশে এখনও তার শৈশব দশা অতিক্রম করেনি। তার কোমরে এখনও নেংটি জড়ানো, মুখে দুধের ঝিনুক। আমাদের সংবিধান কর্তারা যত অসম্পূর্ণ আর খণ্ডিত ভাবেই হোক, এই গণতন্ত্রকে একটা কার্যকর রূপ দেবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করে গেছেন। তাঁদের শ্রেণীস্বরূপ সম্পর্কে আমাদের মনে অভিযোগ থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের অনেকেই যে গভীর আইনজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হঠাৎ কী এমন ঘটলো যে তাঁদের প্রণীত সংবিধানের ন্যাজামুড়ো শুদ্ধ বদলাবার প্রয়োজন হলো? আর ন্যাজা-মুড়ো শুদ্ধ বদলাবার প্রয়োজন দেখা দিলই যদি, তবে তার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত হওয়ার অবকাশ দেওয়া হলো না কেন, উপযুক্তরূপে জনমত যাচাইয়েরই বা ব্যবস্থা হলো না কেন? ইমার্জেন্সী চলতে থাকাকালেই বা কেন সংবিধানের এই সুদূরপ্রসারী সংশোধনগুলিকে আইনের ছাপ দিয়ে সংবিধানে গ্রথিত করবার জন্য শাসক পক্ষ আদাজল খেয়ে লাগতে গেলেন?

প্রথম কথা, যে-লোকসভাকে দিয়ে এইসব সংশোধন পাশ করাবার উদ্যোগ চলছে সেই লোকসভার স্বাভাবিক মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, অভিনন্দ বলে তার আর কৃত্রিমভাবে বর্ধিত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধন উপলক্ষ্যে মত প্রকাশ করবার কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু নানা বাধা-নিষেধের দ্বারা ওই স্বাধীনতা পদে পদে খণ্ডিত। এমন নামমাত্র অধিকার নিয়ে কি সংবিধানের মত ভারতীয় জনসাধারণের জীবন মরণতুল্য ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত একটি জরুরী প্রশ্নের প্রতি সুবিচার করা চলে, না, তার আবহ দেশে উপস্থিত?

কংগ্রেস দল ১৯৭১ সালে যখন বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসেন তখন নির্বাচকের সামনে সংবিধান সংশোধন কোন ইস্যা ছিল না। এই 'ইস্যা' উপস্থাপিত করবার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল বিগত ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে, যখন কংগ্রেস পক্ষ ইচ্ছা করলেই যেসে নির্বাচনের ডাক দিতে পারতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁরা সে সময়ে নির্বাচনের অনুষ্ঠান করেন নি, আগামী ফেব্রুয়ারি তক্ পেছিয়ে রেখেছেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতেও নির্বাচন হবে কিনা তার কিছু স্থিরতা নেই, তবে ফেব্রুয়ারি সমাগত হতে আর বেশী দিন বাকী নেই তখনই বোঝা যাবে শাসক দলের ইচ্ছা। ওই সময় নির্বাচন হোক চাই না হোক, ওই বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে না দিয়ে, এখনই কেন স্বরণ সিং কমিটির সুপারিশকে সংবিধানবদ্ধ করবার জন্য এই অধীরতা? শাসক পক্ষের এই অধীরতার মধ্যে কি জরুরী অবস্থার সুযোগে লোকসভার 'ক্রুত মেজরিটির' হীন-রোশায়ের সাহায্যে লোকসভার অজান্তে যৎসামান্য যে-

২৮ পৃষ্ঠায়)

সংবিধান সংশোধন

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

বিপক্ষতা আছে তাকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে কার্যসিদ্ধিকর একটা অদ্বৈতিক 'মতক্য' লাভের মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে না? নির্বাচন যখন প্রত্যাসন্ন, অন্ততঃ দৃশ্যতঃ প্রত্যাসন্ন, তখন আর মাস পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো? শাসকদলের কেন এই অস্থিরতা তার কারণ রহস্যাবৃত।

॥ দুই ॥

সংবিধানের তিনটি বাহু—বিচার বিভাগ, আইন-প্রণয়ন বিভাগ ও প্রশাসন। সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন বিভাগেরই অন্য নাম লোকসভা। এই লোকসভার প্রবন্ত ম্যাণ্ডেট বলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শাসন-কার্য পরিচালনা করে থাকেন। যে কোন দেশের সংবিধানেই এই তিন বিভাগের সংস্থান আছে এবং নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও ভার-সাম্যের ('চেকস্ এ্যাণ্ড ব্যালান্সেস') সাহায্যে তাদের পরস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা বিদ্যমান। আমাদের সংবিধানও এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাঁদের প্রতিটি কাজের জন্য লোকসভার কাছে দায়ী, আর সংবিধান তথা লোকসভার কালে কালে গৃহীত আইনসমূহের বৈধতা ও ব্যাখ্যার ভিন্নতা দন্দ্বকে চূড়ান্ত মতদানের অধিকার বিচার বিভাগের। বিচার বিভাগ সংবিধানের বিশুদ্ধি রক্ষার সদা-সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত এবং ওই উপায়ে শাসনতান্ত্রিক স্বৈরাচারের এক ফলপ্রদ প্রতিষেধকের ভূমিকায় সমাসীন।

এই তিন বিভাগের মধ্যে আপাতবিচারে লোকসভার স্থান সর্বোচ্চ। কিন্তু লোকসভাও নিরঙ্কুশ নয়। তার উপর-ওয়ালা দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ, যাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমবায়ে লোকসভার কলেবর গঠিত হয়েছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে লোকসভাকে যতই কেন না শক্তিশালী বলে মনে করা হোক আর এই বাবদে খার্থ সংশ্লিষ্ট মহল থেকে যতই কেননা উদ্বেগ প্রণোদিত প্রচার অভিযান চলুক, কর্তারও কর্তা আছে। সেই কর্তা আর কেউ নয়, দেশের বিপুল-বিশাল জনগণ। বস্তুতঃ পক্ষে, সংবিধানের তাবৎ ক্ষমতা জনগণ থেকে আহৃত। সংবিধানের তিন বাহু জনসাধারণের অভিপ্রায়ক্রমে এবং তাদেরই প্রতিনিধিরূপে কার্যকারকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন মাত্র, ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে জনসাধারণ তাদের যে কোন একটি বাহুকে অথবা সব কয়টিকেই এক দমে ধুলায় টেনে নামাতে পারেন।

কাজেই পার্লামেন্টই সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর বলে যে বাহ্যাস্ফোট করা হচ্ছে তা সত্য নয়, সত্য হলেও তা সত্যের অর্ধাংশ মাত্র। আসলে এই ত্রিসির তোলা হয়েছে বিচার বিভাগকে টুঁটো করবার মতলবে। বিচার বিভাগকে পঙ্গু করে লোকসভাকে সর্বক্ষমতা নিয়ন্তা বানাবার অভিসন্ধি থেকেই এই জিনিসের উদ্ভব। এই অভিসন্ধি হাসিল হলে প্রশাসনের দুশ্চিন্তা করবার আর কোন কারণ থাকে না।

এমন বলব না বিচার বিভাগ কখনও অন্যায় বিচার করেন না বা বিচারকালে শ্রেণী-পক্ষপাত দেখান না কিন্তু লোকসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের পথে তাঁদের প্রতিষ্ঠান বাধাস্বরূপ কিংবা তাঁরা প্রগতির অন্তরায় এমন ঢালাও অভিযোগ তাদেরবিরুদ্ধে করা চলে না। সংবিধানের বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে তাঁদের কাজ করতে হয়, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং তাঁদের হাত পা অনেকাংশেই বাঁধা। স্বয়ং রিট ও হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্তের মাধ্যমে তাঁদের কাছেই একমাত্র জনগণের সুবিচার পাওয়ার পথ খোলা রয়েছে। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত হলে বা হবার উপক্রম দেখা দিলে তাঁরা প্রতিকারের জন্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? প্রশাসনের দরজায় কি? লোকসভার কাছে কি? প্রশাসন আর লোকসভার মধ্যে খার্থের গাঁটছড়া বাঁধা হলে কে কাকে ঠেকায়, কে কার অজান্তের প্রতিবিধান করে? অতএব বিচার বিভাগই একমাত্র জনগণের রক্ষাকবচ। সেই রক্ষা-কবচটিকেও স্বরণ সিং কমিটির সুপারিশের মধ্য দিয়ে পাকা-পাকি ভাবে নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। একবার এইটি আইনসিদ্ধ হয়ে পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যথেচ্ছ শাসন চালানো যাবে, বিরুদ্ধতার আর কোন হেতুই রইবে না।

আর শুধু কি বিচার বিভাগের ক্ষমতার সংকোচন আর লোকসভাকে সর্বেসর্বা করে তোলার আয়োজনেই পরিবর্তনের প্রস্তাব সীমিত রয়েছে? এছাড়াও আরও অনেক পিলে-চমকানো সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রপতির হাতে প্রভূত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদের বিলোপ ঘটিয়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারের আওতা থেকে বার করে আনা, জনগণের ভোগ্য অধিকারের পাশে পাশে করণীর কর্তব্যের তালিকা সংযোজন, ১৯ অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত 'সপ্তধর্ম স্বাধীনতা'র অবসান, নিবর্তনমূলক আটকের বিরুদ্ধে রক্ষা-কবচের অবলুপ্তি, সরকারী কর্মচারীদের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের দ্বারা আত্মরক্ষার সুযোগ অপহরণ, বিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে 'জাতীয়তা-বিরোধী,' 'সমাজ বিরোধী' প্রভৃতি অপবাদ দিয়ে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রশাসনের উপর অর্পণ, ভারত-রাষ্ট্রর যুক্তরাষ্ট্রীয় ফেডারেল ধারার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় এককেন্দ্রিক (ইউনিটারী) শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ, ইত্যাদি।

যাই হোক, গণতন্ত্রের সুরক্ষার নামে গণতন্ত্রেরই এক প্রধান অঙ্গের ছেদ, যে-ডালে বসে আছি সেই ডালই কাটবার সামিল। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, সংবিধান সংশোধন কর; কিন্তু দোহাই, গাঙলার জলের সঙ্গে গামলার শিশুটিকেও ছুঁড়ে ফেলো না। গণতন্ত্রের অপহরণ ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে যেয়ো না।

বিপ্লব তত্ত্ব

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এই যুববিদ্রোহ পুঁজিবাদী শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত।

প্রসঙ্গক্রমে মারকিউজের আরও কিছু মূল্যবান বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। মারকিউজ বলছেন, মানব-সমাজের মুক্তি প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে আসতে পারে না। স্থিতাবস্থার গুণাগুণ যতই থাকুক না কেন টেকনোলজির উন্নয়ন ও তার ব্যবহার যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, রাষ্ট্রব্যবস্থার অধিষ্ঠিত বুরোক্রেসী কিংবা সম্পন্ন সমাজের ক্ষমতাশিল্প কর্মধারণার প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষের দাসত্ব-বন্ধনকে জিইয়ে রাখে। সুতরাং তিনি সমাসনি এস্টাব্লিশমেন্টকেই দায়ী করছেন। একে উচ্ছেদ না-করলে শোষণ, দাসত্ব ও অবদমনের হাত থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবেনা। এই সমাজের মানুষ বিংশত্ব, যন্ত্রের দাস, মিথ্যা খাধীনতার ইলিউসনে কাজ করে। তিনি আরও বলছেন, শিল্পোন্নত সমাজ সমকালীন পৃথিবীতে এত দূর এগিয়ে গেছে যে সে আজ ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদ অর্থের সাহায্যে, প্রযুক্তি বিভার কলাকৌশলে ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে তৃতীয় দুবনে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, সম্পদ সংগ্রহ করছে, বাজার দখল করছে এবং তৃতীয় দুবনকে নিজের অধীনে রাখার চেষ্টা করছে। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুনর্বার কিউবার বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি অন্য কোথাও ঘটুক তা সহ্য করবেনা এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে, অর্থ সাহায্য দিয়ে তৃতীয় দুবনে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দমন করবে।

মারকিউজের উপরোক্ত বক্তব্য অতি বাস্তব সত্য। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যস্বাধীন তৃতীয় দুবনে ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদী অগ্রপ্রবেশ ঘটেছে এবং তৃতীয় দুবনের দেশগুলিও অনগ্রসরতার দরুন ও নিজদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে আর্থিক, প্রযুক্তি বিজ্ঞাভিত্তিক ও কৃষ্টৈবিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকছে। কিন্তু সমকালীন পৃথিবী শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশেরই একচেটিয়া কর্তৃত্বের নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর্থিক ও প্রযুক্তি বিজ্ঞার সাহায্যের উপরেও বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাছাড়া তৃতীয় দুবনের দেশগুলিও আজ আর শক্তিহীন নয়। সেই কারণে ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যতটা একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদের শক্তিতে যেসব বলবান ছিল, আজ আর ততটা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদের শক্তি খর্ব হয়েছে। সুতরাং মারকিউজের আশংকা সত্য হলেও আজকের দুনিয়ায় তৃতীয় দুবনে কিউবার বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবন্ধক দূর হবেনা, সেকথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তা যদি হত, তাহলে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ সফল হতনা। ভিয়েতনাম সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের আলোকবর্তিকা, সংগ্রামী মানুষের পথের দিশারী। তাছাড়া তৃতীয় দুবনের দেশে ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেসব সংগ্রাম ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকেও একেত্রে মনে রাখতে হবে।

কিন্তু মারকিউজের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হচ্ছে যে, তিনি যদি মনে করেন আজকের দুনিয়ার প্রধিক শ্রেণীর আর বিপ্লবী চরিত্র নেই এবং সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদ সর্বপ্রকার বিপ্লব-বিপ্লেহকে দমন করতে পারে, তাহলে তিনি ছাত্র ও যুববিদ্রোহের তত্ব হাজির করলেন কেন? এদের বিপ্লব কি সফল হবে কিভাবে? এদের বিপ্লব কি তাহলে ধনবাদ- সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট হবে? ধনবাদী শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রনায়কেরা এদের হাতে কেন বা কিসের খার্থে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে? যদি না-দেয় তাহলে কিভাবে যুব সম্প্রদায় প্রচলিত এস্টাব্লিসমেন্ট উচ্ছেদ করবে ও মুক্ত দুনিয়া প্রতিষ্ঠা করবে? এরা কি শুধু শাসকগোষ্ঠীর বদল ঘটাবে; না, সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করবে? এই যুববিদ্রোহ কি স্বয়ং চালিত সংগ্রাম; না, এর জন্য একটি দলের অস্তিত্ব প্রয়োজন? এসব প্রশ্নের জবাব তাঁর বিশ্লেষণে নেই। এবং না-থাকলে স্বভাবতঃ এবম্বিধ বিপ্লবতত্ত্ব ইউটোপিয়ার কিম্বা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শিকারে পরিণত হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে ফলতঃ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও সেই সংগ্রামশীল চৈতন্যের অভাব লক্ষ্য করেই মারকিউজ বিপ্লবের বিকল্প পথ ও মতের কথা ভেবে-ছেন। তাঁর ভাবনা যতই সৎ ও বিপ্লবী হোক না কেন স্থিতাবস্থার বারক-বাহক ও রাষ্ট্র বিধারকগণ মারকিউজের বিপ্লবতত্ত্বে যেটুকু ফাঁক রয়েছে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অগ্রপ্রবেশ করে শুধু আমেরিকার নয়, তাবৎ দুনিয়ার ছাত্র যুবসম্প্র-দায়কে যাবতীয় মাদকতা, যৌন ব্যভিচার, অশালীন আচরণ ও উৎকট পোশাকের জোয়ারে এমন মাতাল করে রাখবে কিম্বা উগ্রপন্থার ভ্রান্তনীতিতে এমন অন্ধ করে দেবে, যার দরুন তাদের সচেতন প্রজ্ঞাশীল বিপ্লবী চরিত্র দূরে থাক, মানবিক চেতনা বিবর্জিত অমানাজিক প্রাণীতে যেন তারা রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর এই চেতনাশূন্য প্রাণী সম্প্রদায়কে কোথাও বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, কোথাও বা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হয় হিসেবে এবং কোথাও বা অবজ্ঞাত জড়পিণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা সহজ হবে। এ কালের দুনিয়ায় তাই হয়েছে। এই হল তাঁর সবচেয়ে বেদনাদায়ক পরিণতি।

পাশাপাশি মার্কসের ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী সমাজ দর্শনে আস্থাশীল, সমাজ বিপ্লবে অংশগ্রহণে আগ্রহী মানব সম্প্রদায় সমসাময়িক কালে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের হাত থেকে কতটুকু বাঁচাতে পারছে এবং কতটুকু তাদের সমাজ বিপ্লবের সার্থক সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সে প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে জাগে।

মার্কসবাদ ও হার্বার্ট মারকিউজের বিপ্লব তত্ত্ব

বৈদ্যনাথ সাহা

বিগত একশ' তিরিশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই মার্কসবাদ নিয়ে বিপুল গবেষণা ও বিচার-বশ্লেষণ চলেছে। সমাজ-বিপ্লব ও মানুষের মুক্তি আন্দোলনে মার্কসের সূত্র ও ধ্যান-ধারণাকে নিছক জ্ঞান-চর্চার বিষয় হিসেবে না-ধরে, বরং তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়ে মার্কসবাদের প্রয়োগের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে সমসাময়িককালে পশ্চিম দুনিয়ার পেশাদার বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষতঃ মার্কিন মুলুকেই মার্কসবাদকে আচ্ছাদানিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে রূপায়িত করার যৌক প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যার ভিত্তির দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকের দুনিয়ার মার্কবাদের সারবত্তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবথা ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মার্কসবাদ প্রধানতঃ উনিশ শতকের মতবাদ। মার্কস উনিশ শতকে বুর্জোয়া সমাজের চেহারা ও অর্থনৈতিক শোষণ দেখে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে-কথা বলেছিলেন, সমকালীন দুনিয়ার আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ প্রাগ্রসর সমাজে মার্কসের তত্ত্ব, সূত্র ও বিশ্লেষণের সেইসব স্বাভাবিক অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সুতরাং মার্কস-বর্ণিত শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার ভাবাদর্শ বা ভত্বাশ্রয়ী মডেল এখন ইউটোপিয়ায় পরিণত হতে চলেছে। এই ধরণের আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জর্জ লিখট হাইম, মেয়ার ও সিডনি হুকের নাম উল্লেখযোগ্য। ধনবাদী পশ্চিমী দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি রেখে যাঁরা কিঞ্চিৎ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সি রাইট মিলস্, ড্যানিয়েল বেল ও হার্বার্ট মারকিউজ প্রতিনিধি স্থানীয়। এঁরা ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পোন্নত সমাজ-ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে মৃদু কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু এঁরা যে ধনবাদী শাসন ও শোষণ চক্রের উপর সরাসরি আঘাত হানতে চেয়েছেন, কিম্বা শ্রেণী শাসনের পরিবর্তে শোষণহীন সম সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তা নয়। বরং আজকের ধনবাদী পশ্চিমী দুনিয়া শিল্পোন্নয়নে এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছে, যেখানে তাঁরা মনে করেন, মার্কসীয় অর্থনীতির পরিবর্তে আরও উন্নততর কোন বক্তব্যের ভাবনা-এষণায় মনোনিবেশ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে ভাল হত, কিন্তু অল্প পরিসর নিবন্ধে সেই ব্যাপক আলোচনার সুযোগ নেহাত কম। তাই শুধুমাত্র হার্বার্ট মারকিউজের বিপ্লব-চিন্তার একটি দিক নিয়েই আলোচনার পরিধিকে সীমিত করার চেষ্টা করব। হার্বার্ট মারকিউজ একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক, বুর্জোয়া দার্শনিক ও মার্কসবাদ সমালোচক। একালের দুনিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাবনা কী, সাম্প্রতিককালে দেশে দেশে বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মৌল চিন্তার কোন যোগসূত্র আছে কিনা, তার সীমাবদ্ধতা কোথায় তা খতিয়ে দেখা দরকার। বিশেষতঃ মার্কসীয় অর্থনীতি ও চিন্তাসূত্রের সাহায্যে আমাদের দেশে তাঁর বিপ্লব-ভাবনার পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক।

১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে হার্বার্ট মারকিউজের জন্ম। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। নাৎসী উত্থানের সময় তিনি জার্মানি থেকে সুইজারল্যাণ্ডে আসেন এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস করেন। এই সময় থেকেই তিনি দর্শনতত্ত্বের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনি সেই বিপ্লবের প্রবক্তা "যা শুধুমাত্র সমাজ-ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটায়না। মানুষের চিন্তাধারা, তার দৃষ্টিভঙ্গি, সংজ্ঞার বৃত্তি, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটায়।" তিনি বলেছেন, সমস্যাসঙ্কুল সমাজ-ব্যবস্থা দমনমূলক। এখানে যাবতীয় সুখ, সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও নৈতিক স্বাধীনতা নির্যাতনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।

মারকিউজকে নিয়ে একসময় তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। একজন ছাত্রনেতা কার্ল মার্কসকে ভবিষ্যত দ্রষ্টা, মারকিউজকে ভাস্কর ও মাওকে তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সান ডিগো সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, মার্কসবাদী মারকিউজ আমেরিকার স্বাধীনতাকে ইসিউদন্ বলে মনে করেন। প্রাক্তদার মন্তব্য করা হয়েছে, পশ্চিম ইউরোপে মারকিউজের শিষ্যরা শ্রমিক শ্রেণী ও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ছোট ছোট যুদ্ধি তুলেছে। সিডনি হুক বলেছেন, তিনি মার্কসবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে এমন এক ইউটোপিয়ার রাজ্যে পৌঁছেছেন যার সম্পর্কে মার্কস বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। মারকিউজ কার্ল মার্কসের আদিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সোভিয়েত রাশিয়ার সামাবাদ মার্কসবাদের বিকৃত রূপায়ণ এবং তথাকথিত ধনবাদী সমাজব্যবস্থার চেয়েও অধিকতর দমনমূলক ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। তিনি স্টালিনবাদকে মার্কসবাদের বিচ্যুতি বলে মনে করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : Reason and Revolution, Eros and Civilization, Soviet Marxism, One-Dimensional Man, An Essay on Liberation.

মার্কসীয় তত্ত্বের সূত্র টেনে মারকিউজ বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী জনগণই হল বিপ্লবের একমাত্র সামাজিক শক্তি। সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে শ্রেণী-হীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর শোষণমুক্ত সেই মানবিক সমাজ এমন এক ব্যবস্থার পত্তন করে যেখানে মানবিক সংগুণের বিকাশ ঘটে। কিন্তু সমসাময়িক পুঁজিবাদী ও শিল্পোন্নত সমাজ মার্কসের উপরোক্ত ধারণাকে বদলে দিয়েছে, ধনিক-শ্রমিক সম্পর্কের আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে, পরিবর্তিত অবস্থা এক ভাইবেন্‌সন্-ঘটিত ইসিউদন্ সৃষ্টি করেছে। এখন শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংগে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, যার ফলে বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে তার চরিত্র হারিয়ে গেছে এবং বিপ্লবের দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন একটা উন্নত স্তরে দিন দিন পৌঁছে যাচ্ছে যে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের আন্দোলনের পরিবর্তে ধনিক-শ্রমিক শ্রেণী সমন্বয় ঘটতে চলেছে, সর্বহারার আন্তর্জাতিক সংহতির পরিবর্তে জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভেদ ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। তাই তাঁর শিল্প সমৃদ্ধ প্রাগসর সমাজে অটোমেশন মানুষের শ্রমশক্তিকে হ্রাস করে দিয়েছে। মার্কস বলেছেন, শ্রেণী-সমাজের চূড়ান্ত উচ্ছেদের পরেও মানুষের সংগ্রাম অবিরত চলতে থাকবে প্রকৃতির সঙ্গে, অজ্ঞানতাকে জানার আগ্রহে, নসসৃষ্টির উন্মাদনায়। এখানে শোষক শোষিতের অস্তিত্ব নেই, কাজেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু মারকিউজ বলছেন যে, টেকনোলজির অভিনব উন্নয়নের ফলে, অটোমেশনের প্রভাবে মানুষের সমাজে এমন এক প্রশান্তি নেমে এসেছে, মানুষের জীবনযাত্রার ও তার অস্তিত্বে এমন এক স্থায়ীভাব নেমে আসছে যে মার্কসের সেই চিরন্তন সংগ্রামী মানুষের চিত্র ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতির ফলে আধুনিক শিল্পোন্নত প্রাগ্রসর সমাজ এক দিকে যেমন বিশাল পণ্য-ভোগী সমাজে রূপায়িত হয়েছে ও বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ধনী শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত মানুষ প্রচুর ভোগবিলাসের অধিকারী হওয়ার ফলে কোন দিক থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ শোষক ও শোষিতের মধ্যে পার্থক্য আনা সম্ভব হচ্ছেনা এবং শ্রেণী সংগ্রামের সম্ভাবনা ও মানসিকতা দূর হয়ে যাচ্ছে। এই হল মারকিউজের বক্তব্যের মৌল প্রতি-পাদ্য বিষয়। তিনি আরও বলছেন, এই উন্নয়ন নিশ্চয় মুক্তিসংগত। কিন্তু ভোগবিলাস ও পণ্য উৎপাদনের মাত্রা-জ্ঞানহীনতা সঙ্গতিসম্পন্ন সমাজের সামনে এমন এক নতুন ডাইমেনসনের উন্মোচন করছে, যার ফলে ব্যক্তি মানুষ সমাজের দাসে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হল, সমস্ত দিক থেকে শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সকলের সামনে এমন এক পণ্যভোগী বিলাসবহুল জীবনের সুখাভাও সাজানো থাকে, এমন সহজসুলভ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় অস্তিত্বের অঙ্গীকার থাকে, যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনা ও বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ সম-সমাজ গঠনের স্বপ্নাদর্শ ধুয়ে মুছে যায়। এই ধরনের সমাজে প্রত্যেক মানুষই বস্তুগত নানা-কড়ির লোভে, বিবেকহীনতায় ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগে গলা ডুবিয়ে মেতে থাকে। মারকিউজ বলেছেন, সমসাময়িক সভ্যতার এই হল অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বিরোধ। পশ্চিম দুনিয়ার ধনবাদী রাষ্ট্র সম্পর্কে ঘটিত এই মত সমধিক প্রযোজ্য, তথাপি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজবাদী দেশও এর থেকে মুক্ত একেবারেই নয়।

পশ্চিম দুনিয়ার ধনবাদী দেশ সম্পর্কে মারকিউজের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থনযোগ্য। কারণ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শোষণ-ভিত্তিক চরিত্র, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে সম্পদ সৃষ্টি, পণ্য উৎপাদনের

(শেষাংশ চার পৃষ্ঠায়)

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

★ গল্প ও উপন্যাস ★

অনুরাধা, সতী ও পরেশ	৫·৯৫	বড়দিদি	৪·২৫	অরক্ষণীয়া	
বৈকুণ্ঠের উইল	৪·২৫	গৃহদাহ	১২·০০	বামুনের মেয়ে	
চন্দ্রনাথ	৫·০০	চরিত্রহীন	১৪·০০	শুভদা	
ছবি	৫·০০	শেষ প্রশ্ন	১৩·১৫	দেবদাস	
শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)	৮·০০	নববিধান	৪·১৫	শ্রীকান্ত (২য় পর্ব)	
পরিণীতা	৪·০০	পল্লী-সমাজ	৮·৫০	স্বামী	
ছোটদের পথের দাবী	৬·৮০	ছোটদের শ্রীকান্ত	৯·৩৫		
শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	১০·২০	শ্রীকান্ত (চারিটি পর্ব একত্রে)—৩০·০০			

ই ণ্ডি য়া ন অ্যা লো সি য়ে টে ড পা ব লি শি ং কোং প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

[১৯৪০ সনে প্রতিষ্ঠিত]

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৭০০০০৭

গ্রাম : কালচার (বি) ফোন : ৩৪-২৪৪১

মার্কিউজের বিপ্লব তত্ত্ব

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

অতিকায় মাত্রাজ্ঞানহীন প্রসার ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকে, ধনবাদী রাষ্ট্র কাঠামো ও স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্খার দিনদিন এমনভাবে বাড়তে থাকে যে নিজের রাষ্ট্রের পরিধিকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অনগ্রসর ও অনুন্নত দেশকে ক্রমে লুন্ঠন ও শোষণের আওতার ভেতরে টেনে আনে। আজকের যুগে পৃথিবীতে পুরনো যুগের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় এইভাবে অতি সূক্ষ্ম কুশলী, প্রাগসর ও আধুনিক মূলধনী পুঁজি-সাম্রাজ্যবাদ (Finance Capitalistic Imperialism) দেখা দিয়েছে। ফলে ধনবাদী রাষ্ট্রকাঠামো যেমন একদিকে নিত্য নতুন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি ও উৎপাদন করে, তেমনি পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থা ও পণ্যের বিনাশ ঘটায়। এক দিকে উৎপাদন ও চাহিদাপূরণ, অন্যদিকে বিনাশ ও অবদমন এবং শ্রমিক শ্রেণীর দাসত্বের মধ্যেই মুক্তির স্বর্গ রচনার মিথ্যা প্রলোভনে ধনবাদী রাষ্ট্র তার শোষণ ও স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। এর জন্য কিছু কিছু আদর্শগত তত্ত্ব প্রচার করতে হয়, গণতন্ত্র ও মুক্ত দুনিয়ার বুলি আওড়াতে হয়, বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ঘুরে মুছে ফেলার জন্য যৌন চিন্তার আবক্ষ ছড়াতে হয়, ভোগবিলাস, রাজনৈতিক বিভীষিকা, যৌনাচার, অপসংস্কৃতি ও রুচিহীন নাবালক চিন্তাকর্ষ ও আচরণের জোয়ারে মস্তবার দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে এমন ভাবে মাতিয়ে রাখতে হয়, যেন মূল্যবোধ ও মানবিক প্রেরণার ধারণা মনে না জাগে, দাসত্বের বন্ধন যেন চোখে না পড়ে। এককথায় অন্তর্ভূতিকে ভোঁতা করে ও চৈতন্যকে বিবশ করে ধনবাদী রাষ্ট্রের নায়ক ও ভাড়াটে পেশাদার বুদ্ধিজীবীরা সাম্যবাদী শত্রুর লাল ভয় থেকে জনগোষ্ঠীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আশা আকাঙ্খা, ভোগ বিলাস, পণ্য উৎপাদোগের নিরাপদ বাসনাকে জিইয়ে রাখার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মার্কিউজ বলছেন, আধুনিক ধনবাদী রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রের আবরণে আসলে একটা যুদ্ধকামী রাষ্ট্র। একথার তাৎপর্য হল, ধনিক শ্রেণী শোষণকে বজায় রাখতে না পারলে তার অতি উৎপাদন ও মুনাফা বজায় থাকেনা। এই অতি উৎপাদন যে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে তাকে দূর করতে হলে নিজ রাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতরে এবং বাইরে অন্য দেশেও তার শোষণের পরিধি ও বাজারকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়, নচেৎ ধনিক রাষ্ট্রের বাঁচার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। সেজন্য রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সর্বদা একটা যুদ্ধসজ্জার আক্রমণের অলীক ভীতিকে জিইয়ে রাখতে হয়, যেন গণ-মানসে ধনবাদী শোষণের বদলে দেশপ্রেম ও জাতির প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে। আর তাই তাকে শত্রুও আবিষ্কার করতে হয়। পুঁজিবাদের সেই শত্রুই হল সাম্যবাদ। এ ব্যাপারে মার্কিউজ পূর্ব ও পশ্চিম দুনিয়ের তাবৎ শিল্পোন্নত প্রাগ্রসর রাষ্ট্রতন্ত্রিকে প্রায় একই সমান্তরাল রেখায় স্থাপিত করে রাষ্ট্র বিধায়কগণের কায়েমী স্বার্থকে এবং প্রযুক্তিবিভাভিত্তিক স্থিতাবস্থাকে দায়ী করেছেন। অবশ্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি মনে করেন, প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার উন্নত মানের শক্তিই অবশেষে আমলাতান্ত্রিক স্বার্থকে দুর করতে সমর্থ হবে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দুই বা ততোধিক শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এর একদিকে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, জাপান প্রভৃতি মূলধনী পুঁজিবাদী বৃহৎ শক্তিবর্গ; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দোতিয়েট ইউনিয়নসহ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রজোট ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। এছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিল্পবিকাশে অনগ্রসর, দরিদ্র ও অনুন্নত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মূলধনী পুঁজি-সাম্রাজ্যবাদী দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, একচেটিয়া বাণিজ্য নীতি, শোষণকেন্দ্রিক চরিত্র, তৃতীয় দুনিয়ের বাজার দখলের নয়া সাম্রাজ্যবাদী কার্যসূচীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই দেশের রাষ্ট্রনায়কদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দোতিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদন ব্যবস্থা ও তৃতীয় বিশ্বে শিল্পোন্নয়নের সাহায্যদানের নীতি ও কৌশলকে এক সঙ্গে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের রাজনীতিকে (কতখানি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্মত সে সব প্রশ্ন আলাদা) এক সমান্তরাল রেখায় ফেলে বিচার করলে যে ভুল হবে সে সম্পর্কে মার্কিউজ নীরব থেকেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রয়োগ কৌশলের তুলত্রুটিকে এক মাপকাঠিতে যে বিচার করা যায় না সে-সম্পর্কে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেননি। তিনি ধনবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নয়ন, অতি-উৎপাদনের প্রতিক্রিয়া, গণমানসে ভয় ও দাসত্ব বোধকে জিইয়ে রাখার মূল উদ্দেশ্যে সম্পর্কে উল্লেখ করেও মার্কসীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিক বিপ্লবের নীতিকে সমকালের প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করেছেন। আজকের পৃথিবীতে ধনবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভেতরে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার দরুন ধনবাদ পূর্বেকার মত শক্তিশালী নয় তা উল্লেখ করেননি।

সমাজ-বিপ্লব প্রসঙ্গে মার্কিউজ শিল্পোন্নত সমাজের সম্ভাব্য উন্নয়নের ব্যাখ্যা করে বলছেন, উৎপাদনের উপকরণের বিপুল ও সর্বগ্রাসী উন্নতি, প্রকৃতিকে জয় করার নেশা, বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর রঙিন সুখসমৃদ্ধি ও বাসনাকে তৃপ্ত রাখার প্রচেষ্টা, নিত্য নতুন চাহিদাসৃষ্টি ও সুযোগ সুবিধা দানের প্রয়াস ধনবাদী রাষ্ট্রকাঠামোকে দিন দিন এমন এক স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে গণমানসে ভয়, অবদমন ও দাসত্বের মনোভাবকে জিইয়ে রেখে অলীক তৃপ্তি, স্বাধীনতা ও আত্মগত পরিবেশ সৃষ্টি করে মুক্তি সংগ্রাম ও শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে মুছে ফেলার কাজে রাষ্ট্রবিধায়কগণ সফলকাম হচ্ছেন। অতিসমৃদ্ধি ও ভোগবিলাসের বাসনা জনগোষ্ঠীর স্বাধীন মতামত ও মুক্তির আনন্দকে অপহরণ করেছে। এর ফলে সৈনিক, শ্রমিক, শিল্পী, লেখক, সাংবাদিক সকলেই বিপুল ভোগ সুখের বাসনায় স্থিতাবস্থাকে ধরে রেখে স্বেচ্ছাদাসত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে। স্বাধীনতার আকাঙ্খা এখন নিরাপত্তাবোধ ও সুখভোগের উপযোগী রসাল কর্মকাণ্ডে মোহমত্ত উন্নত জীবন যাপনের নেশায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এর মূল্যস্বরূপ জনগোষ্ঠীকে মানবিক প্রেরণার বোধ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এখন কোন ব্যক্তির পক্ষে এস্টাব্লিসমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়, বরং সে এর সঙ্গে যুক্ত হয়, সমর্থন জানায়। কারণ সে জানে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই তার সুখসমৃদ্ধির সহায়ক।

এই অবস্থায় তাহলে বিপ্লবের ক্ষেত্র কিভাবে প্রস্তুত হবে? মার্কিউজ এ-সম্পর্কে পরিষ্কার কোন নির্দ্বন্দ্ব মতামত দেননি। তিনি এই দমনমূলক সমাজের অভ্যন্তরে এমন কোন সামাজিক শক্তি বা গোষ্ঠী খুঁজে পাননি যা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি যাদের উল্লেখ করেছেন তারা ছাত্র, বেকার যুবক, যারা এখনো ভোটাধিকার পায়নি সেই সব অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবজন। সমাজ বিপ্লব সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা, সচেতনতা ও সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর ও কলাকৌশল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এদের না-থাকলেও এরাই প্রকৃত বিপ্লবী, সমসাময়িক অদহ্য অবস্থার বিরুদ্ধে এরা বিপ্লব করবে। কারণ এরা এখনো কলুষ ব্যবস্থার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি, এদের বিপ্লবই একটা যুগের অবসান সূচিত করবে।

অথচ মার্কিউজ শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়, মার্কসের এই উক্তিকে পরোক্ষে মেনে নিয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ফ্রান্সে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, সেই পরিমাণেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্র-শ্রমিক সংযোগিতার অভাবের দরুন সম্ভব নয় বলেই উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী স্থিতাবস্থার প্রতি আস্থাশীল এবং এই ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার আকাঙ্খার উৎপন্ন। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যদি বিপ্লবের অঙ্কুর জন্ম না নেয়, তাহলে ছাত্র-বিপ্লবের পরিণতি কি? এ-সম্পর্কে মার্কিউজ নীরব থেকেছেন। তিনি বলছেন, যুবশক্তি অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, কারণ তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দাসত্ব-বন্ধনে যুক্ত নয়। কিন্তু আমেরিকার যুবশক্তি কিভাবে দাঁড়াবে? তারা কি ভ্যানগার্ড? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যুক্ত না-থাকে তাহলে কি বিপ্লব সংগঠিত হয়? বিপ্লব কাদের স্বার্থে এবং কার বিরুদ্ধে ঘটে? বিপ্লবের মূল উৎস কী? একটা সমাজে বিপ্লব কেন, কখন এবং কিভাবে ঘটে? এসব প্রশ্নের উত্তর মার্কিউজ দেননি। অথচ তিনি পুরোপুরি মার্কস-তত্ত্বকেও গ্রহণ করেননি।

মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিনের মতবাদকে আমরা যদি পথ-নির্দেশক ও বিশ্বদৃষ্টির সহায়ক বলে মেনে নিই তাহলে আমরা জানি যে শোষিত বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর শোষণের প্রতিবাদে শ্রমিক শ্রেণী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমর্থনে সমাজ-বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে যে, ধনবাদী গোষ্ঠী উৎপাদনের উপকরণ ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিনিয়ত বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটার এবং বিশ্বের বাজার দখল করে পণ্য উৎপাদন ও উপভোগের আন্তর্জাতিক চরিত্র খাড়া করে। এদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে রাজনৈতিক সম্পর্ক জড়িত থাকে। ধনবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থেই তা পরিচালিত হয়। ধনিক শ্রেণী সমাজের সর্বস্তর থেকেই তার শ্রমিক সংগ্রহ করে। তারা লেখক, কবি, বৈজ্ঞানিক, আইনবিদ্, ডাক্তার প্রত্যেককেই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভোগী দাস-শ্রমিকে পরিণত করে। পুঁজিবাদী সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক অধিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। অতি উৎপাদনের ফলে যে ভয়াবহ সংকট দেখা দেয় মার্কস তা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সঙ্কট উত্তরণের জন্য কী পন্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করে তাও বলেছেন। সমাজ কখনও ধনবাদী গোষ্ঠীর পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার নিগড়ে বেঁচে থাকতে পারবেনা। কারণ মানুষের উৎপাদন সামাজিক উৎপাদন এবং তার উপকরণ ও পুঁজিও সামাজিক সম্পদ। সুতরাং ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করে পুঁজিকে সামাজিক সম্পদে পরিণত করতে হবে।

মানুষের বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে কিভাবে মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সমাজের আর্থিক কাঠামো রচিত হয় এবং কিভাবে তা মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে ও মনোজগতকে বিঘ্নিত করে—মার্কসের বস্তুবাদী সমাজ-দর্শনের সেই প্রথম স্তরের সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে ধনিক, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্র ও পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, শ্রম, মজুরী, পুঁজির উৎস ও তার চলাচলের গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি তাবৎ বিষয়কে মানুষের আয়ত্তাধীন করার সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্ক্স ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন।

মার্কসবাদী চিন্তাধারার নিরিখে আমরা আরও জানতে পারি যে মানুষ প্রতিনিয়ত উন্নততর ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার তাগিদে প্রকৃতিতে জয় করে, উৎপাদনের উপকরণকে আরও বেশী উন্নত করে। এই উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির ক্রম-বিকাশের সঙ্গে ধাপে ধাপে সমাজে মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর ঘটে। সমাজে পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনের উন্নততর উপকরণের বিরোধ ঘটে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে পুরনো সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনকানুন, শ্রমবিভাগ, শ্রেণী সম্পর্ক, সম্পত্তি ব্যবস্থা

(শেষাংশ তেরো পৃষ্ঠায়)

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে

মিহির আচার্য

বাঙলা দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাগ্রে অনুধাবন করার প্রয়োজন। পাঁচ শতকের গুপ্ত যুগ থেকে এ দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। যথারীতি ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থ সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যদিকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম মুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী আন্দোলনে। তার নাম বৌদ্ধধর্মই হোক, বৈষ্ণবধর্মই হোক কিংবা ইসলামধর্মই হোক।

পরিবর্তিত পটক্ষেপে এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই আবার মুঘল শাসনে সমধিকে উচ্চপদ গ্রহণ করেছে যেমনি হিন্দু বেনিয়া শ্রেণী সরকারের ফিনান্সিয়ার হিসাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের নায়মার হিসাবে প্রচুর প্রভাব খাটিয়েছে।

শতেরো শতকের তুর্কী-আফগান ইসলামী আমলে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এতাবৎকাল অবহেলার স্থানীয় নিম্নবর্গের জনসাধারণ মুক্তির আশায়, বিশেষ করে বিস্তৃত পূর্ব বাঙলায়, দলে দলে ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলামধর্মকে আলিঙ্গন করল। কিন্তু তথাকথিত তুর্কী-আফগান অভিজাত শ্রেণীর ব্যবহার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চেয়ে কিছু বিপরীত বলনা।

শাসক পার্টির শ্রেণী চরিত্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান একীভূত হয়ে তাদের শ্রেণীগত ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করেছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে তখন এই বাঙলাদেশ সমৃদ্ধির চূড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের রাজসভার প্রধান চিকিৎসক ভিনিস, বাঙ্গচীর সাক্ষ্য : "All things are in plenty here, fruits, pulse, grain, muslins, cloths of gold and silk."

১৭০০ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর আমল বাঙলাদেশের গৌরবময় যুগ।

কিছু ভূস্বামিকায়ী ও 'বানিয়া' হিন্দুদের যোগসাজসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথাকথিত "পলাশীর যুদ্ধ" নামক যে ঘটনাটি ঘটালেন তা আসলে, কে. এম. পানিক্কারের ভাষায় "a transaction not a battle, a transaction by which the compradors of Bengal led by Jagath Seth sold the Nawab to the East India Company." পরবর্তীকালে ভারতীয় শাসক শ্রেণী যে-ভূমিকা নেবে তারই ঐতিহাসিক ইঙ্গিত কী এই ঘটনার মধ্যে নিহিত নেই? শাসক হিসেবে ব্রিটিশের নিশ্চিত পদপাত যে তাদের দূরদৃষ্টিতে ছিল এই ঘটনা এবং যখনি যে শাসক এসেছে তারই সহযোগী শ্রেণী হিসাবে এদের গাঁটছড়া বন্ধন, আরেকটি সত্য উদ্ভাসিত করে যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই শ্রেণীর আত্যন্তিক শ্রদ্ধা-প্রীতি-আস্থা তাবৎ উচ্চবিত্ত মানসকে আপ্লুত করে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই জাতীয় নিঃশর্ত ভালোবাসা বিশ্বের ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত কোনো মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রে নেই। এ-বিশেষত্ব সম্পূর্ণ-"ভারতীয়"।

ভূমিরাজস্বকে পাকাপাকি ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে বেঁধে নেবার স্বার্থে, প্রাচীন সামন্ত প্রথাকে নবীকরণের গরজে এবং মুহুর্মুহু কৃষকদের বিক্ষোভ দমনের সংকল্পে এমন একটি জমিদার শ্রেণী গড়ে তোলবার জরুরি প্রয়োজন, যারা কৃষকদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তথা ব্রিটিশ-প্রদত্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় স্থিত হয়ে ইংরাজপ্রভুকে লুটের ভাগ দেবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই ব্যবস্থা।

১৮২৮-এ গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্কের মন্তব্য : "If security was wanting against populas tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, though failure in many other respects and in most essentials, has this great advantage at least of having created a vast body of rich landed proprietors deeply intrested in the continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of the people."

মুঘল আমলে যে মুসলিম ভূস্বামীরা এবং রাজস্ব আদায়কর্তারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের সৌভাগ্যের দিন অস্ত গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চাকরি ও নানাবিধ সূত্রে যে হিন্দু বিত্তশালী সম্প্রদায় সিধানভাজন হয়েছিলেন তাঁরাই এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে "নতুন জমিদারে" পরিণত হলেন অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণ শ্রেণী—ব্রাহ্মণ বৈদ্য-ক্ষত্রিয়।

এই ভূস্বামী স্বার্থ বিজড়িত মধ্য শ্রেণীই উনিশ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাম্পিয়ান হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে আড়াল করে ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতা-শাসন-বিচার-পদ্ধতি যাবতীয় বস্তুর "অনুগত ভাষ্যকার প্রজা" হিসাবে পরম সমর্থক হয়ে উঠল। বিচিত্র কী, মুঘল শাসনে "কার্ণা" সরকারিভাবা হওয়ায় যেসিন এরাই সরকারি চাকরি করজা করতে ছুটে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে এঁরা "ইংরাজি" ভাষারও প্রচণ্ড সমর্থক।

রামমোহন রায় কৃতজ্ঞতা জানালেন এই ভাষায় : Indians are fortunately placed by providence under the protection of the whole British Nation, or that the king of England and his Lords of Commons are their Legislators, and that they are secured in the enjoyment of the same civil and religious privlieges that every Briton is entitled to in England," খ্রীস্টান জনসাধারণের নিকট আবেদনে তিনি আরো জানালেন "the Supreme Disposer of the universe for having unexpectedly deliverd this Country, from the long continued tyranny of its former Rulers, placed it under the Govrnment of the English," ইত্যাদি।

শাসক চরিত্রের বদলের সঙ্গে সঙ্গে এধরনের আনুগত্যের বদল এ দেশীয় সরকারী সহযোগী শ্রেণীরই পক্ষে সম্ভবপর। অবশ্যই ব্রিটিশ শাসনের এই কল্যাণকারী ভূমিকায় গদ্‌গদ হয়ে-ওঠা রামমোহনের পক্ষেই স্বাভাবিক, কারণ এঁরাই সর্বাগ্রে শাসকের কাছে প্রভুভক্তির পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ববর্তী মুসলিম শাসন রামমোহনের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বার্থে কী পরিমাণ দা দিয়েছে পুরোপুরি জানা না-থাকলেও রামমোহন ফার্সী শিখেছিলেন তদানীন্তন সরকারি চাকরির সুবিধে গ্রহণ করবার জন্যেই। এবং সবচেয়ে কৌতুহলের, রামমোহনের যে শির "রাজা" খেতাবে মণ্ডিত তাও মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে প্রাপ্ত।

এবার গোটা পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। উনিশ শতকে মুসলিম মধ্যশ্রেণীর দুর্বলতা আমাদের ইতিহাসে সর্বজন স্বীকৃত। নবাবী, দিল্লি, লাহোর, এই মুসলিম কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি যখন অন্ধকারে ডুবছে তখন ব্রিটিশকেন্দ্র—কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করে উঠছে। সরকারি সহযোগিতার দক্ষিণহস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিকে প্রসারিত হয়েছে—চাকরি, নানাবিধ বৃত্তি এবং স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্যে হিন্দুরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে।

এই অর্থনৈতিক তারতম্য দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন প্রকট হয়ে উঠল যে, ১৮৭০ থেকে তথাকথিত "সাম্প্রদায়িক সমস্যা"-কে সুযোগ মতো ব্যবহার করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠল। এই "ভাগ করো এবং শাসন করো" নীতি ইংরেজের আবহমান এদেশে প্রলক্ষিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের ভাষায় "Communalism needs only to be well started and then it thrives of itself."

ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই যে কাঁটা বিদ্ধ হল তাতে ইসলামী শাসনে সুবিধাভোগী অভিজাত মুসলমান এবং সংখ্যাগুরু দরিদ্র মুসলিম চাষিসমাজ এই বিদেশী শাসককে ও সহযোগী উপরতলার হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং তাদের অনন্ত দুর্দশার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণরূপে গণ্য করেছে।

আমাদের বিশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে ঘৃণিত জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ মাবফত রায়তদের, বিশেষ করে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের স্বার্থে কোনো প্রস্তাবই নেওয়া হয়নি।

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে উপরতলার হিন্দুদের প্রাধান্য থাকার কারণেই দীর্ঘদিন এমন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি ও সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যের ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিকে কৃষকদের স্বার্থ ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কবলিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বরাবর ই জমিদারি স্বার্থেরই পোষণ করেছে। পরবর্তীকালে হিউম সাহেবের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হলেও স্মরণ রাখতে হবে ভাইসরয়

(লেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

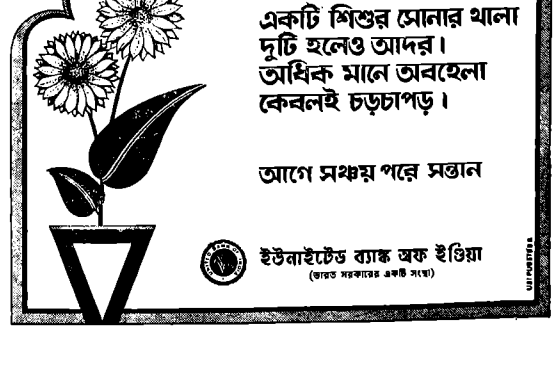

সিয়ার বিভীষিকাময় রাজত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি

যখন আপনি এই লেখাটা পড়ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ সারা লাতিন আমেরিকার প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে তাদের সরকারগুলির স্থায়িত্ব টলিয়ে দিচ্ছে, তাদের গোপন ব্যাপারগুলি হাতিয়ে নিচ্ছে এবং ঘুষ দিয়ে সেখানকার মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটাচ্ছে···

এরা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির দেশী এবং বিদেশী গুপ্তচর। এদের জীবনের একমাত্র ব্রত অপর দেশের ব্যাপারে এমন ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাতে তাদের উপরে ওয়াশিংটনের কর্মনীতি চাপিয়ে দেয়া যায়—এই কথা বলেছেন এজেন্সির প্রাক্তন কর্মচারী ভিক্টর মারচেটি।

ব্যাঙ্কার, সাংবাদিক, লেখক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ অথবা উচ্চ সরকারী আমলা—যে কোন ছদ্মবেশেই তারা আসুক না কেন, তাদের রক্ষাকবচ হল বাইরের মার্কিন দূতাবাসগুলির কর্মচারীদের প্রাপ্য কূটনৈতিক বিশেষাধিকার।

সিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের পরে যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে সব গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং এর কর্মপ্রণালী সম্পর্কে আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে যে সব সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় এই সংস্থার অনুপ্রবেশমূলক এবং অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ প্রতিদিন, অনবরত এবং বিপুল পরিমাণে এই গোলার্ধে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সোনা যাত জন মার্কস এবং ভিক্টর মারচেত্তির অবানঘন্ধী। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সিয়ার যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর কর্ণেল পদবীর সমতুল। তিনি বলেন:

সিয়ার লোকেরা গুপ্তচরবৃত্তি এবং প্রতিগুপ্তচরবৃত্তিতে, প্রচার, অপপ্রচারে (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সংবাদপ্রচারে), মনস্তাত্ত্বিক লড়াই এবং আধা-সামরিক কার্যে আত্মনিয়োগ করে। এরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তাদের স্বকীয় সংগঠন গড়ে তোলে (এদের নাম দেয়া হয় 'সম্পত্তি'); প্রয়োজন বোধে দালাল এবং ভাড়াটে লোক নিয়োগ করা হয়; এদের ঘৃণ্য কাজ হাসিল করার জন্য বিদেশের সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ এবং তীতিপ্রদর্শনের দ্বারা কাবু করা হয়। স্বার্থসাধনের জন্য যে কোন কাজে এদের আপত্তি নেই এবং এর জন্য ঔচিত্যবোধ বা নৈতিক বিবেচনার কোন বিবেকদংশনই তাদের নেই। আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির গোপন আয়ুধ হিসেবে সিয়ার প্রতিষ্ঠা হল, যে সব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে চায় তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করা।

সম্প্রতি ফিলিপ এগী নামক উত্তর আমেরিকান জনৈক ভদ্রলোক, যিনি সি আই এ অফিসার হিসাবে ১২ বছর লাতিন আমেরিকায় কাজ করেছেন, যে সইটি লিখেছেন তাতে আন্তর্জাতিক অন্তর্ঘাতের এই যন্ত্রটির আভ্যন্তরীণ কর্মপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেছে। উরুগুয়ে, এবং মেক্সিকোস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় গুপ্তচর কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত দালাল রূপে সংগৃহীত নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং মেক্সিকো হাভানা এবং প্যারিসের সরকারী মহাফেজখানায় দীর্ঘ চার-বছরব্যাপী গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এগী এই এজেন্সির কার্যধারা বর্ণনা করেছেন তার ইন্‌সাইড দ্য কোম্পানি: সি আই এ ডায়েরি বইয়ে।

এইটির মূল্য আরো বেশী এই জন্য যে, সি আই এর সঙ্গে যুক্ত সকল আমেরিকার সমস্ত ব্যক্তি, শাখা এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এতে দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৭ সালে হ্যারি এস ট্রুম্যানের রাষ্ট্রপতিত্বকালে সিয়া যখন প্রথম সংগঠিত হয় তখন তার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল এমন ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা যাতে আমেরিকা সঠিক ভাবে তার নীতি নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আমেরিকা এই গুপ্তচর সংস্থার সাহায্যে দেশে দেশে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছে—বিশেষ করে সমাজবাদী দেশগুলির এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে। তাদের বিরোধিত নীতি অবশ্য ছিল—সাম্যবাদের জোয়ার প্রতিহত করা এবং তাকে পিছু হঠান কিন্তু ১৯৫০ সালের পরবর্তী তৃতীয় দুনিয়ার যে বিদ্রোহ এবং পরিবর্তনের ঝড়া এসেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সিয়ার কর্মপ্রচেষ্টায় আমূল পরিবর্তন আসে।

হণ্ডুরাস এবং নিকারাগুয়া থেকে একটা ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য সিয়া যেদিন গুয়াতমালায় বেকোবো আরবেঞ্জের নেতৃত্বাধীন জনপ্রিয় সরকারকে হারিয়ে দিল সেদিন থেকেই টের পাওয়া গেল লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের গোপন অস্ত্রের ক্রিয়াকলাপ। তবে এই অঞ্চলে সিয়ার অন্তর্ঘাতী কার্যধারা সীমা ছাড়িয়ে তেজীয়ান হয়ে উঠেছিল ১৯৭১ সালে ছিলের কাজোর নেতৃত্বে কিউবার বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে। রোমান সিবেন্টল অ্যাকইসার তার দ্য সিয়া ইন্ লেক্সিকো বইয়ে লিখেছেন, "এই সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের এই গোপন বাহিনীটি লাতিন আমেরিকায় অনুপ্রবেশের এক নতুন ফ্রন্ট খোলে। আমেরিকা মহাদেশের পথম দমাজবাদী রাষ্ট্রের পতন সামনই এর লক্ষ্য ছিল না,—যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রির কাছে মতি বাকার করবে না যে দেশ তারা সকলেই ছিল এই নীতির লক্ষ্য"।

এই কর্মনীতি, যার নাম দেওয়া হয়েছিল গোল্ড্ ফি এইডো, অনুসরণ করা হয়েছিল আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আতুরো ইলিআর বিরুদ্ধে; ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের হুয়ান বশের বিরুদ্ধে; ইকুয়েডরের জোস্ ভেলাস্কোর ইবারা এবং কার্লোস্ ডুসির আরোসেমেনার বিরুদ্ধে; বলিভিয়ার ভিক্টর পাজ্ অ্যেনেসোরা এবং হুয়ান জে. টরেসের বিরুদ্ধে; ব্রেজিলের জেনিওস্ কাদ্রোস এবং জাওআত গোলার্তের বিরুদ্ধে এবং খুব সম্প্রতি চিলির সালভাদোর আলেন্দের বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

সামগ্রিক সাফল্য সত্ত্বেও সিয়ার এই সব নোংরা কার্যকলাপ তার জীবনেতিহাসের সবচেয়ে চমৎপ্রদ পরাজয় বরণ করল যখন তাদের টাকায় গড়ে ওঠা, সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীটি ১৯৬১ সালে যে অফ্ পিগ্‌সের বেলাভূমিতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিলয় হল। কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিপ্লবকে ধ্বংস করার যে পুণ্য ব্রত সেদিন সিয়া গ্রহণ করেছিল, আজ ১৪ বছর বাদেও তা অরাগ্রস্ত রোগীর দিবাস্বপ্নের মত।

একথা তাকা অবশ্য মূর্খতা যে, সিয়া তার বজ্জাতির খেলা বর্জন করেছে। তা তো নয়-ই, বরং যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ (যাকে রক্ষা করা জন্য সিয়ার উদ্ভব এবং এবং অস্তিত্ব) আজ বিপন্ন, যেখানেই সে তার বাহু বিস্তৃত করতে বাধ্য হয়েছে। পেরুর বিপ্লবী প্রক্রিয়া, আর্জেন্টিনার উত্তেজনা, ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বের জন্য পানামার সংগ্রাম, ভেনেজুয়েলা এবং অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার সংগ্রাম, অভিজাততীয় ব্যবসায় সংস্থাগুলি সম্পর্কে সংসদ প্রশ্ন এবং আত্মশক্তিতে জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রবণতা—এই সব নতুন ঘটনাগুলিকে সিয়া দুর্বল, বিপথগামী এবং ব্যর্থ করার চক্রান্ত করছে। কিউবার পরে সিয়ার তালিকায় শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা, ইকোয়েডর, মেক্সিকো, পানামা, পেরু এবং ভেনেজুয়েলা। যেমন মেক্সিকোর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত যোসেফ লোভাল, ভেনেজুয়েলার স্থাপি প্রোডেম্যান এবং আর্জেন্টিনার রবার্ট হিল সিয়ার লোক বলে জানা গেছে।

গত বছর যেদিন ফিলিপ এগী মেক্সিকোর কর্মরত ৩৭ জন সিয়া চরের নামের তালিকা প্রচার করলেন লণ্ডনে তার পরের দিনই মেক্সিকোস্থ আমেরিকান গুপ্তচর কেন্দ্রের প্রধান এবং উপপ্রধান সে দেশ ত্যাগ করলেন।

আর্জেন্টিনার লোকসভার সদস্য সিলবার্তো মোলিনা অভিযোগ করেছেন যে, পেরুর বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুদ্ধ করার চক্রান্ত করেছে সিয়া। পানামার রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ওবার টোরিজোসকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র সিয়া করেছিল বলে গত বছর খবর ফাঁস হয়েছিল—তিনি তারও উল্লেখ করেন। পেরুর বান এবং যোগাযোগ-মন্ত্রী জেনারেল মেনেসেস্ আরাতা তাদের দেশে ইউ-এস গুপ্তচরদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। ব্রেজিলের দ্বিতীয় বাহিনীর জেনারেল আসমি ক্রুজেল সাংবাদিক নিউটন কার্লোসের নিবন্ধ উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তার দেশে কার্যরত সিয়া চরের সংখ্যা ৩৬,০০০ এর কম নয়। সংবাদ পর্যবেক্ষক হারিলস ত্যালিসবেরি পেন্টাগুন পত্রিকায় তার সাম্প্রতিক নিবন্ধে বলেছেন যে, ব্রেজিলের এক বিশেষ কাহারার নির্বাচনে সিয়া লোকসভায় এগার জন এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ৬০০ জন প্রার্থীকে সমর্থন করে যার ফলে সিয়া খরচ করে ১২ বিলিয়ন ডলার।

লাতিন আমেরিকায় সিয়ার যে মারাত্মক অভিযান শুরু হয়েছিল গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপ্রধান আবেনেজের উচ্ছেদ দিয়ে তার পরিণতি ঘটল বছর দুই আগে প্রেসিডেন্ট আলেন্দের হত্যাকাণ্ডে।

কেবল রাজনীতিতেই সিয়ার কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ নয়,

(শেষাংশ দশ পৃষ্ঠায়)

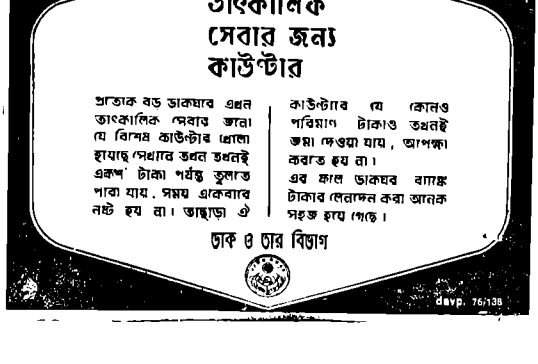

গণসঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য

সাধন গুহ

সম্প্রতি গণসঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা সুরু হয়েছে। অন্যান্য গণসংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোন কোন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সমালোচকও এই বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। স্বভাবতই, প্রসঙ্গটি একটু আলোচিত হওয়া দরকার বলে মনে করি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদি পর্যায়ে সলিল চৌধুরী হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ বিপ্লবী গণসঙ্গীতকাররা গণসঙ্গীতের সুরের কাঠামো এবং প্রয়োগ নিয়ে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন, কিন্তু, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, সেইসব আলোচনাগুলোকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমরা সংরক্ষিত করতে পারিনি।

গণসঙ্গীত বলতে আমরা কি বুঝি প্রারম্ভেই তার একটা সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। অনেকে বলেন, যুদ্ধকণ্ঠে গীত হবার মত সংগ্রামী উদ্দীপনা সমন্বিত সমাজ সচেতন যে কোন গানই গণসঙ্গীত। গণসঙ্গীতের এত সরলীকৃত বিশ্লেষণ খুবই বিজ্ঞানিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশী পর্যায়ের যুগে এমন অনেক গান রচিত হয়েছে যা সংগ্রামী উদ্দীপনামূলক এবং তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তার দর্পণে সমাজ সচেতনও। কিন্তু সেগুলো কি গণসঙ্গীত? সবিনয়েই বলবো—না। গণসঙ্গীত বলতে বুঝি সেই গান যে গান মেহনতী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে শ্রেণী সংগ্রামের ধারাবাহিক পথে শ্রেণীহীন সমাজ এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট লক্ষে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম যখন বিভিন্ন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত উন্নীত হয় বিশ্বব্যী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে তখনই প্রশ্ন আসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের। এই শ্রেণীসংগ্রামের একটি স্তরে গ্রামের কৃষিজীবী শ্রমিক লড়াই করে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। গ্রাম থেকে অর্থাৎ নিজের জমি এবং ভিটে থেকে জমিদার মহাজন জোতদারের কারসাজিতে উচ্ছন্ন হয়ে সর্বহারা কৃষক যখন দুটি মাত্র হাত সম্বল করে শহরে এসে পরিণত হয় শিল্পশ্রমিকে এবং এখনে এসেও মালিকী শোষণের বিরুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া চিত্তে সমবেত হয় সর্বহারার একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টি'র পতাকা লালঝাণ্ডার নীচে তখন সে-ই তার আকলিক ভাষা এবং ঐতিহ্যবহ তার আকলিক সুরে রচনা করে ক্ষমতা দখলের প্রেরণা সমৃদ্ধ গান এবং এই হচ্ছে গণসঙ্গীত রচনার মূল সূত্র। গোটা বিশ্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী আজ সমাজতন্ত্রের দখলে। স্বভাবতই দেশে দেশে আজ নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নিজেদের জীবন জীবিকার তাগিদেই ধীরে ধীরে নেমে আসছে কৃষক শ্রমিকের সাথে সংগ্রামের মুক্ত ময়দানে। আমাদের দেশেও চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই এই লক্ষণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এবং তখন থেকেই নাগরিক বুদ্ধিজীবী কবি সুরকাররাও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেছেন গণসঙ্গীত এবং এভাবেই গণসঙ্গীতের সুরনন্দীর উদ্গমটি সহজ সরল নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সন্ত্রসারিত হচ্ছে শিক্ষিত সমাজের হাতেও। কিন্তু, শর্তটি রইলো নির্দিষ্ট। অর্থাৎ গণসঙ্গীত হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের নির্দিষ্ট লক্ষে পরিচালিত করার গান এবং এতদর্থে শ্রেণী সংগ্রামের অপরিহার্য ধারালো হাতিয়ার। বিশিষ্ট গণসঙ্গীতকার হারল্ড ফ্লিন যথার্থই বলেছেন, "peoples' Songs hear the clean expression of the unbound hatred of the toiling masses of every land on the surface of the earth (wherever the class society exists) against their killers and exploiters with no motif at all of any truce or compromise. As in the field of socio political struggle the working class wages-constant war against the owner or the means of production these songs too stand by the similar cause to emboldon and push forward the fighting masses to their exteme goal, the final fsctory and thus these songs are the indispensable fighting weapons of the proletariats. (Peoples' Song Book—Harold Flinn-N. Y. 1969). খুব সংক্ষেপে এই হচ্ছে গণসঙ্গীতের শ্রেণীস্বরূপ। এখান থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি এবং তা হচ্ছে এই,—

(১) গণসঙ্গীত যেহেতু মেহনতী মানুষের শ্রেণী চেতনা তীক্ষ্ণতর করার অপরিহার্য হাতিয়ার সেইহেতু এর সুরে ঐতিহ্যবহ লোক সঙ্গীতের প্রভাবই বেশী। (২) গণসঙ্গীত যেহেতু শ্রেণী সংগ্রামেরই সাংস্কৃতিক হাতিয়ার সেইহেতু এটা পরিশীলিত শিষ্ট সঙ্গীত নয় এবং এক্ষেত্রে কলাকৈবল্যের প্রশ্ন একান্তই গৌণ (৩) গণসঙ্গীত লোকসঙ্গীতেরই শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক তাৎক্ষণিক সম্প্রসারণ এবং মূল লোকসঙ্গীত মাত্রই যেহেতু working Song অথবা কর্মের গান সেইহেতু গণসঙ্গীতে সেই কর্মের সুরবহ দ্যোতনাই প্রধান। বিখ্যাত লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ টি, এস, ব্রাকলের মতে "The rhythmn of the working song varies according to the nature of job." অর্থাৎ কাজের প্রকৃতিগত বিন্যাস অনুযায়ী গানের তাল নির্দ্ধারিত হয়।

এই কয়েকটি সূত্র আলোচনা করলেই আমরা গণসঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্যটি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। কিন্তু, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, অতি সম্প্রতি একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সমালোচক বর্তমানে গণসংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে খুবই নিবিড়ভাবে জড়িত থেকে মন্তব্য করেছেন যে, সম্মিলিত কণ্ঠে গীত হবার প্রয়োজনেই নাকি গণসঙ্গীতে সহজ সরল এবং সামামাঠা সুরের প্রয়োগ করা হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, সুরবিকৃততার দৈন্য ঢাকার জন্যই নাকি গানে মাঝে মাঝে ঢুনকে চোঁদুনে টেনে নেবার প্রবণতা গণসঙ্গীতে দেখা যায়। এই দীনতা মুছে দেবার জন্য তার প্রস্তাব হচ্ছে গণসঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব বিধৃত হওয়া দরকার এবং গণসঙ্গীতে রাগরাগিণীর আরও ভর থাওয়ানো দরকার। এই আলোচ্য শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কিন্তু আদৌ বুঝতে চাননি যে, গণসঙ্গীত কোন পরিশীলিত শিষ্ট সঙ্গীতধারা নয়। এমন কি, গণসঙ্গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিংবা লোক সঙ্গীতের মত সঙ্গীতের কোন নির্দিষ্ট শাসনও নয়। গণসঙ্গীতের জন্ম সংগ্রামের প্রয়োজনে। অতএব, সংগ্রামই যেখানে প্রথম এবং শেষ কথা সেখানে সংগ্রামের গতিই নির্দেশিত করবে গণসঙ্গীতের সুরের বিস্তার ও বিজ্ঞান। এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রথাসিদ্ধ ধরণে রাগরাগিণী প্রয়োগের প্রভাব কেমন করে আসতে পারে তা আমার কাছে দুর্বোধ্য। গণসঙ্গীতে সহজ সরল ও সামামাঠা সুর প্রয়োগকে পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচক মহোদয় সুরবিকৃততার পর্য্যায়ভুক্ত করলেও তিনি আশা করি অবশ্যই এই সত্যটা অনুধাবন করতে পারবেন যে, গণসঙ্গীতের উদ্দিষ্ট জনরা এই গান প্রয়োগ করেন শত্রুকে খায়েল করার শক্তি অর্জনের জন্য। এবং, নিয়ন্ত্রন সানাই জলসা কিংবা মাইফিলে বসে রাগরাগিণীর অলস রোমন্থনের মধ্য দিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। এই মানুষগুলো সহজ সরল এবং সামামাঠা। তাই তাদের সুরও অবশ্যই সহজ সরল এবং সামামাঠা হতে বাধ্য। আলোচ্য শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সমালোচক যদি গণসংস্কৃতির বহিরঙ্গের রূপান্তিপাষী না হয়ে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে আস্থাবান হতেন এবং সর্বহারা বিশ্ববোধকে নিজের সাংস্কৃতিক দর্পন বলে গ্রহণ করতে পারতেন তাহলে গণসঙ্গীতকে সংগ্রামের ময়দান থেকে টেনে এনে কলাকৈবল্যবাদের নিগড়ে এনে বাঁধতে চাইতেন না। পেত্তিয়ার'এর "জাগো জাগো সর্বহারা" কিংবা আলেকজেন্দ্রোভের "ব্যয়নেট লেবিনের আহ্বান" গান গাইতে গাইতে লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধা শত্রুর মোকাবিলা করে প্রাণ দিয়েছেন। বিখ্যাত ফরাসী লোকসঙ্গীত "মেরী রাইন"-এর ঐতিহ্যবহ সুরে বলশেভী সুর রচেছিলেন "আন্তর্জাতিক" গানের। আলেকজেন্দ্রোভের গানে বিখ্যাত রুশ লোকসঙ্গীত "ভল্গা ভিসন"এর প্রত্যক্ষ প্রভাব। এগুলো যদি সুরবিকৃততা হয় তবে আমরা মনে করি, সর্বত্রিক মেহনতী মানুষের মেহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অর্থাৎ আই, পি, টি, এ'র প্রবর্তিত সঙ্গীতধারাকে কেন্দ্র করেই এদেশে গণসঙ্গীত কথাটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তৎকালীন যে সব গান এদেশে গণসঙ্গীতের ভাণ্ডারে অমূল্য হয়ে আছে তার মধ্যে সাধনা দাশগুপ্তের "যাই দে তোর লালসেলাম", বিনয় রায়ের "ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কানুর বন্ধুরেরে", হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "আমরা তো ভুলি নাই শহীদ" এবং সলিল চৌধুরীর "তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি" ইত্যাদি গানগুলো তুলনাহীন। বর্তমান গণনাট্য সংঘ অবশ্য সংঘের পূর্ব ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রাখতে পারছেন না কিন্তু এই আমলেও দিলীপ সেনগুপ্ত, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং বাসুদেব দাশগুপ্তের কোন কোন গান গণসঙ্গীতের উজ্জ্বল নিদর্শন বৈকি। এরপর কেউ বলবেন না এবং আমিও বলিনা যে, গণসঙ্গীতে রাগ রাগিণীর মিশেল ঘটলেই তা আদর্শচ্যুত হয়ে যায়। অবশ্যই তা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গণসংগীতের সুর নির্দ্ধার করবে তার কথার আবেদনের ওপর। সলিল চৌধুরীর "চেট উঠছে কারা টুটছে" গানটিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রথাসিদ্ধ সুরের আলাপ ও বিস্তারের মজীর স্থাপন করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিলোনা। আবার সলিলের "ধন আমি জন্মেছি মা" গানের প্রথম এবং তৃতীয় চারণে রাগাবলম্বী সুরের প্রয়োগ ঘটেছে অথচ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে "জন ব্রাউনিং লাইন ইন দ্যা ব্রেভ ইয়ার্ড" নামক বিখ্যাত গানের নিগ্রো স্পিরিচুয়াল সুরের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। একটি Art form এবং আর একটি folk form এর। অথচ এই বিশ্লেষণের ফলে গানটি এক অসাধারণ সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর "শঙ্খচিল" গানে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এক আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন। বিখ্যাত মার্কিন গণসঙ্গীতকার শ্রীমতী হোয়েন্স রিস তাঁর সুবিখ্যাত which side> are you on গানে চার্চ সঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছেন। অতএব, গণসঙ্গীতের সুরবহ বৃদ্ধির জন্য রাগের ভর খাওয়ানোই একমাত্র সমাধান বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা ভ্রান্ত। গণসঙ্গীতে কথা হচ্ছে প্রধান। এই কথার মর্ম পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করার জন্য যে কোন সুর যে কোন কায়দায় ব্যবহার করা যায় এবং সেটা অসিদ্ধ নয়। পূর্বোক্ত সমালোচক ঢুনকে চোঁদুনে টেনে নেওয়া হয় বলে যে কথা মন্তব্যটি করেছেন সেটা লোকসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকার ফলেই ঘটেছে। Work son এর yelling স্বাভাবিকভাবেই গণসঙ্গীতে প্রতিফলনও হয়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "লড়ব ছাড়িয়া নাওয়ের দে দুখী নাইয়া" অথবা সলিল চৌধুরীর "ও মোদের দেশবাসীরে" ইত্যাদি অসংখ্য গানে এর সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। গণসঙ্গীতে বক্তব্যের ভাবার্থ প্রকাশের জন্য অনেক সময় রাগ রাগিণীর প্রভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে যায়। আমার "তোমারে দেখেছি মাগো মুক্তির দীপশিখাতে" গানটির দ্বিতীয় অন্তরায় নিজের অজান্তেই "মালকোষ" এর ব্যবহার করেছি। অথচ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে, অসংখ্য

(দেখবার তেরো পৃষ্ঠায়)

কবি সুকান্ত প্রসঙ্গে

রাখাল ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত আজ বেঁচে থাকলে তার বয়স পঞ্চাশ হত। কিন্তু সেই কবি কিশোর আমাদের চোখে চিরদিনই কিশোর, অল্পপ্রসঙ্গে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐক্টিটি মনে পড়ে তার বয়েস এতটুকু বাড়েনি, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয়নি। আর তার কবিতাও চিরকাল কৈশোরের প্রাণ-বন্যায় উচ্ছল হয়ে থাকবে, এবং যা কিছু তার দহনশীলতাকে অতিক্রম করে গেছে তাকে ভাঙ্গবার দুর্বার প্রাণাবেগে উদ্বেল হয়ে দীর্ঘকাল ধরে কিশোর সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার আয়োজিত সুকান্ত ৫০তম জন্মবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্বোধন প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলে-ছিলেন, সমাজের যে পরিবেশে সুকান্তর কবিপ্রতিভা একটি বিশিষ্ট খাতে বয়েছিল, আজ স্বাধীনতা লাভের ২৯ বছর পরেও সেই পরিবেশ এতটুকু বদলায়নি, জমিদার মহাজনদের সেই শোষণ আজও বহাল, বিত্তশালীদেরই কব্জায় আজও সবটুকু ক্ষমতা এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে যে দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত সমাজকে তাদের সেদিনের সংগ্রাম আজও সমানে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই সুকান্তর কবিতার সেই দিন যা প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন আজও রয়েছে।

প্রয়োজন যে রয়েছে তার প্রমাণ সুকান্তর প্রবল জনপ্রিয়তা, বিশেষ পরে তরুণ ও কিশোর সমাজে। একটা গ্রামে গিয়ে দেখেছি সেখানে ঘরে ঘরে সুকান্ত সমগ্র গ্রন্থ। এই সব কারণে সুকান্ত আজ 'বিগ বিজনেস' আর বিগ বিজনেসে'র অনিবার্য সুকান্তর বেলাতেও তাই ঘটে চলেছে। বেকল্প ভেজাল, নকল ও কালোবাজারী।

তাছাড়াও আমাদের মর্মে ও মজ্জায় মিশে আছে আমাদের ঐতিহ্য : আমরা ইতিহাস রচনা করিনি কোনো দিন, ঐতিহাসিক পুরুষ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে পুরাণ রচনা করি আমরা, কাহিনীর মুখ্য চরিত্রকে মনের মত করে দাঁড় করাতে নিঃসঙ্কোচে ঘটনা বিকৃত করি, কাল্পনিক কাহিনী খাড়া করি।

অতি জনপ্রিয় কবি সুকান্তর বেলাতেও নিরুপায় ভাবে তাই করা চলেছে, চলছে এবং চলবে বলেই মনে হচ্ছে। অথচ তার দুই অন্তরঙ্গতম সহকর্মী-সুহৃৎ গতায়ু হলেও তার সমসাময়িক সংযোগীদের অনেকেই আজও জীবিত, জীবিত তার পরিবারের একাধিক বর্ষীয়ান দরদী। তবু জীবনীকার, কি নাট্যকার, কি সুকান্ত-জীবন নিয়ে ছায়াচিত্র প্রযোজক-পরিচালক—কেউই তথ্য সংগ্রহে এতটুকু আগ্রহ দেখান না, আপন মনের ভালোমন্দ পছন্দ-অপছন্দ দিয়েই তারা সুকান্তকে রচনা করে। মাত্র ৫০ বছরেই যখন এই অবস্থা, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ অবহেলিত, তখন শত বর্ষ পরে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের উৎসগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলে কি হবে তা ভাবতেও ভয় লাগে।

একথা যেমন ঠিক যে কবি বলেছেন "কবিরে পাবে না তার জীবন চরিতে", অথচ দিকটিও কিন্তু একটুকু বৈষ্টিক নয় যে, কবির সঠিক মূল্যায়নে ও মানসিকতা গঠনে তার জীবনধারা ও পরিবেশের প্রভাব অন্যতম উপাদান। তাই সুকান্ত মূল্যায়নে চিরকালই তার নির্ভেজাল জীবন কাহিনী জানার প্রয়োজন থাকবে। অবশ্য তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস কোথাও নেই। বিশেষ কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সর্বহারাদের কবি সুকান্তকে সর্বহারা সমাজেরই মানুষ রূপে প্রতিভাত করার প্রয়াস আজও অব্যাহত, তাতে যে সুকান্ত-প্রতিভার বিকৃতি এবং তার অসত্য মূল্যায়ন হবে তা জেনেও, যার জন্য শেষ পর্যন্ত সুকান্ত পরিবারের তথ্যও সরঞ্জামের অভাবে সোচ্চার হতে হয়েছে।

সুকান্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে তা সত্য নয়। সে সুপ্রসর বৃহৎ মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বচ্ছল পরিবেশেই সে মানুষ হয়েছে, তবে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে যে সব আরাম ও বিলাস অপরিহার্য বিবেচিত, সে যুগে তা ছিল বড়োরা অবশ্য সুকান্তর পরিবার দরিদ্র ছিল কি স্বচ্ছল ছিল তার গুরুত্ব সুকান্ত মূল্যায়নে বিশেষ ভাবে থাকলেও পরিবারের মর্যাদা অমর্যাদা তাতে সাড়ে না বা কমেনা।

একটি কথা জানা বিশেষ প্রয়োজন তা হল, সুকান্ত পরিবারে কল্যাণ ও শ্রীর দেবী লক্ষ্মী উপাসিতা না হলেও অর্থের দেবতা কুবের ছিলেন অবজ্ঞাত, আর প্রধানা উপাস্যা ও কুলদেবতা ছিলেন দেবী বাণী, তাই সুকান্ত বেড়ে উঠেছিল কাব্য-সাহিত্য-শিল্পচর্চার পরিবেশে এবং রাজনীতি তথা জনকল্যাণ চিন্তার পরিমণ্ডলে, যদিচ মার্কসবাদ সে যুগে তার পরিবারে বা পরিমণ্ডলে একরত্তিও ছিল না। সুকান্তর জীবনে ও মানসিকতায় মার্কসবাদের অনুপ্রবেশ বাইরে থেকে এবং তার কাব্য প্রতিভা স্ফুরণের অনেক পরে। এইটুকু না বুঝলে সুকান্তের কবিতার উপরে তার রাজনৈতিক সত্তাকে স্থান দেবার প্রবণতা স্বভাবতই প্রবল হয়ে ওঠে।

সুকান্তর প্রথম যুগের রচনায় যে সহজাত কবি প্রতিভার অঙ্কুরকে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেখা যায়, কালের প্রভাবে এবং বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়ের ফলে কালক্রমে সে দুনিয়ার সব কিছুই মার্কসবাদী দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে এবং তার কবিতায় একটা বিশিষ্ট পরিণতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, অবশ্য সুকান্ত বেঁচে থাকলে তার মানসিকতার ও কবিতায় 'রিভিশাম-ইজ্‌ম' কিছু চুকে পড়তো কিনা, তা হলপ করে নিশ্চয়ই বলা যায় না।

আসলে সুকান্ত নিজস্ব দোরিদ্র্যের জ্বালায় জ্বলা অ্যাংগ্রি ও হাংগ্রি পোয়েট নয়, সে চার পাশে অনাহারক্লিষ্ট ও শোষণ জর্জর মানুষদের দেখে সচেতন মনে তাদের দুঃখ জ্বালাকে আপন করে নিয়েই সর্বহারাদের কবি হয়ে উঠেছিল। এই সময় সুকান্ত স্পষ্টভাষায় বার বার ঘোষণা করেছে, আমি আগে কর্মী—প্রাণপণে পৃথিবীর সবারো জন্যে, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—শুধু লেখনীর মাধ্যমে কর্ম নয়, লেখনীটা তখন তার মতে অধিকন্তু, সহকর্মী ও সহযোগীদের এবং জনতাকে ডাক দেওয়ার জন্যই নাকি ছিল তার কবিতা রচনা। অবশ্য উক্তিটা সুকান্তের রাজনৈতিক সচেতনতার উজ্জ্বল মাত্র, তার প্রমাণ, মজ্জায় মজ্জায় কবি সুকান্ত কবিতাকে ছুট দেবার নিদ্রান্তও প্রকাশ করেছে অনবরত কবি-কৃতিতে।

একটি মোরগের কাহিনীর মোরগটির মত খাবারের জন্য মাথাকুটে তাকে মরতে হয়নি, ঘরের সাধা খাবার উপেক্ষা করে প্রকৃত নিরন্নদের অন্নসংস্থান প্রয়াসে তাকে খেটে মরতে হয়েছে, খাদ্যের সারিতে অপেক্ষা করে সে যে বসন্ত কাটিয়েছে, তাও নিজের বা পরিবারের জন্য খাদ্য-

(লেখাংশ চোদ্দ পৃষ্ঠার পর)

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

মেখানেই থাকুন কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই পাবেন। এখানে এলে বুঝতে পারবেন, সঞ্চয় কতো সহজে হতে পারে। সারা দেশ জুড়ে ইউকোব্যাঙ্কের শাখা ছড়ানো, আপনার সঞ্চয় সেখানে নেড়ে উঠে। ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ—

বিশেষ বিবরণের জন্য যে কোন শাখায় চলে যাবুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউনোব্যাঙ্কের সঞ্চয় পরিকল্পনা :

১. সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
এই অ্যাকাউন্টে মাত্র দুশি টাকা জমা, সুদ পাবেন বছরে ৫%

২. রিকারিং ডিপোজিট
এই অ্যাকাউন্টে মাসে মাত্র দশ টাকা জমা, সুদ পাবেন বছরে ৮½ থেকে ৯½%

৩. ফিক্সড ডিপোজিট
এই অ্যাকাউন্টে আপনি বছরে ৯০% পর্যন্ত সুদ পাবেন।

৪. ফিক্সড ডিপোজিটের অঙ্গ রিকারিং
ডিপোজিটে সঞ্চয়
এই অ্যাকাউন্টে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আপনি প্রতি মাসে যে সুদ পাবেন তা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বদলে রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। ফলে আপনি কাম্পাউন্ড সুদ বাবদ পাবেন, যেমন করে ১ বছরে ৯½%।

৫. ডিপোজিট সার্টিফিকেট
এই সার্টিফিকেট মাত্র ১০০ টাকায় কেনা যায়। ১৫ বছরে তা ভাঙালে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

সংগ্রামী শিল্পী ঋত্বিক ঘটক

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

একালের সর্বাধিক কৃতী শ্রেষ্ঠী চিত্র পরিচালকের অন্যতম ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন—এই তিন পরিচালকই নিজস্ব স্টাইলে যা ভঙ্গিমায় যেমন স্বতন্ত্র, আবার আপন মানসিকতায়, শিল্প ভাবনায় ও প্রকাশ মুন্সিয়ানায় তেমনি বিশিষ্ট ও ভাস্বর।

ঋত্বিকের ছবিকে তথাকথিত রাজনৈতিক না ব'লে প্রগতিশীল বাস্তবধর্মী চেতনায় পুষ্ট বলে অভিহিত করলেই বোধকরি অধিকতর সংগত হবে। কারণ ছবি নিয়ে তিনি যেমন কোন রাজনীতি করেননি, তেমনি ছবির বিষয়বস্তুকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীতে তুলে ধরার কোন সচেতন প্রয়াসও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর ছবিতে নাটকীয়তা আছে, নাট্য আবেগ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। নাট্য জগৎ থেকে তিনি চলচ্চিত্র জগতে এসে পড়েছিলেন বলেই হয়তো তাঁর ছবিতে এমন ড্রামার প্রকাশ। ঋত্বিকের ছবিতে 'ড্রামা' কখনো আবেগ আতিশয্যে মেলোড্রামাতেও পর্যবসিত হয়েছে। সেখানে সংযমহীনের দুর্বলতা ঘটখানি, বাস্তবকে উদগ্র করার বলিষ্ঠতাও ততখানি। অন্তরের সংগে কোন দিনই তিনি ছবি করাকে নিছক পেশাগত কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গ্রহণ করেননি। চিত্র-নির্মাণ ছিল তাঁর কাছে Noble mission—just to educate the people and not to entertain them only. তাই বুঝি তিনি এই কটিল অর্থলোলুপ আর্থাৎ চিত্রজগৎ তথা বিশ্বজগৎ থেকেই একান্ত নিঃসঙ্গচিত্তে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন!

ব্যক্তিগত জীবনে ঋত্বিক যতই বিশৃংখল হোন, তাঁর ছবির বক্তব্য প্রকাশে শৃংখলা ভংগের পরিচয় কখনো ফোটেনি। কিছু কিছু অসংগতি ছিল দৃশ্য বিন্যাসে, ছিল কিছু পরিমিতিবোধেরও অভাব। মাঝে মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টির ঝোঁকও দেখা যায় দৃশ্যকে মর্মগ্রাহী করার উদ্দেশ্যে। সেখানে মননের সংগে হৃদয়ের যোগ সাধনের এক আকৃতি। কিন্তু তাঁর আপোষহীন শুদ্ধ দৃষ্টিভংগীর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। দেখা যায়নি বক্তব্য উপস্থাপনে কোন দুর্বলতা, কিংবা হতাশার নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার মূঢ়তা। তাঁর ছবিতে জীবনমুখী চেতনায় মানবতারই জয়গান ঘোষিত। রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলনেও আশার ছবি পাশাপাশি ফুটে ওঠে আশ্চর্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। অপরিমিত সাহসের সংগে সমস্ত দীনতা, জড়তা ও আপোষের বিরুদ্ধে স্নেহাদ্র ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রগতিশীল ধারার বাস্তবধর্মী মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছেন তিনি শিল্পের সত্যকে সামনে রেখে। যদিও একথা ঠিক যে, সংখ্যা দিয়ে নয়, সৃষ্টির গুণগত বৈশিষ্ট্যেই স্রষ্টা স্মরণীয় হন, তবুও ভাবতে অবাক লাগে যে, এযাবৎ মুক্তিপ্রাপ্ত পাঁচখানি মাত্র ছবি দিয়ে তিনি এমন এক সংগ্রামী শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, যার নজির এদেশের ছবির জগতে আর নেই।

ঋত্বিকের প্রাণের বাংলা দুভাগ হয়ে যাওয়ার বেদনা যে কতখানি মর্মমূলে বেজেছিল, তার পরিচয় আমরা তাঁর ছবিতেই পাই। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই এই প্রসংগ এসেছে প্রচুর অভিব্যক্তি তুলে। মানুষকে কত ভালবেসেছিলেন, তাঁর স্বাক্ষরও সেখানে স্পষ্ট। কঠিন বাস্তবের জন্তুর রূপ, তার নিষ্ঠুর দাহিকা শক্তি, সামাজিক অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ বৈশ্লিক দৃষ্টিতে তুলে ধরে তিনি বাস্তব বিভ্রমে যেমন দর্শকদের নাড়া দেন, তেমনি সমগ্র ছবিটিতে আশ্চর্য ভাবদ্যোতনা সৃষ্টি করে এক সামাজিক তাৎপর্যও ফুটিয়ে তোলেন। জীবন ও জীবিকা যেখানে পীড়ন শোষণে জর্জরিত, সেখানে প্রতিবাদে গর্জে ওঠার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, তা যেমন তাঁর ছবি প্রকাশ করে, আবার সংগে সংগে সে ক্রোধ প্রকাশেও যে কি মর্মান্তিক অসহায়তা ও অক্ষমতা, তাও অপ্রকাশিত থাকে না। তাইতো তাঁর ছবি দেখে বিচলিত না হয়ে থাকা যায় না। ক্ষতাশা আর নৈরাশ্য যেমন সামগ্রিকভাবে এসেছে বাস্তবের করুণ বন্ধুর পথ ধরে, তেমনি উপসংহারে পৌরুষ অভিব্যঞ্জনায় আশার ইঙ্গিতও যেচে গেছে। এই তো শিল্পীসুলভ জীবন-বোধের পরিচয়। বাস্তব সত্য ধরে শিল্পের সত্যে উত্তরণই তো শিল্পীর মহৎ লক্ষ্য। আর তাইতো ঋত্বিকের ছবির সমাপ্তি লগ্নে দেখি শিশুর পথ পরিক্রমা অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের দিকে। ঘোষণা হয়—'জয় হোক মানুষের ঐ নবজাতকের!'...

ঋত্বিকের ছবির চরিত্রগুলি পার্থিব জগতের সংগে যেমন যুক্ত, তেমনি তারা স্রষ্টার এক একটা চিত্রাগত ব্যক্তিত্বও প্রকট করে। চরিত্রগুলি ঠিক বাস্তব নয়, অথচ বাস্তবের সংগে তার নাড়ির যোগ। এটা মনে রাখতে হয় যে, ফিল্ম ফর্ম বা অন্য আর্ট ফর্ম একটা মেক বিলিফ ব্যাপার। তবে বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকলে তা অবিশ্বাস্য হ'য়ে উঠে কোন আবেদন সৃষ্টিই করতে পারে না। ঋত্বিক তাঁর ছবিতে পুরাণ বা 'মিথ্' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন মার্কসবাদ-কে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একীভূত করার ঐকান্তিক প্রয়াসে। 'মিথ' ব্যবহারের সপক্ষে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'এর মধ্যে যে জ্ঞান আছে, যে সত্য আছে, সেগুলো জানা আজ প্রয়োজন। আমি যদি সোজাসুজি একটা বক্তব্য রাখতে যাই, তাহলে সেটা alien হয়ে যায়। আমার দেশের মাটির সংগে নাড়ীর যোগ বাধাটা খুবই প্রয়োজন। আমার দেশের মানুষকে তাতে অনেক তাড়াতাড়ি convince করা যায়। অনেক তাড়াতাড়ি জয় করা যায়। কেননা এগুলো রক্তের মধ্যে রয়েছে আমাদের। আমার দৃষ্টির চরিত্র ও ঘটনার দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের ideological base'টা হচ্ছে 'Marxism.' আবার আমার ছবিতে সি, জে, ইয়ুং-এর যে ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে আসে, সেটা হ'ল mother Complex. যেমন তিতাস একটি নদীর নাম ছবিতে ছেলেটি স্বপ্নে মাকে দেখে শুধরবতীরূপে। আমার দিক থেকে এ ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

আগেই বলেছি, ঋত্বিকের ছবি এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ খানি মুক্তি পেয়েছে—'অযান্ত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা।' তাঁর প্রথম তোলা ছবি 'নাগরিক' সম্পূর্ণ হয়েও মুক্তি পায়নি টুডিওর দেনাপাওনা সংক্রান্ত ঝামেলায়। বাংলাদেশে তৈরী তিতাস একটি নদীর নাম এবং এদেশের এক. এফ. সি-র অর্থলগ্নীতে তোলা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবি দুটি সম্পূর্ণ হয়ে এদেশের মাটিতে মুক্তির অপেক্ষায় আজও দিন গুণছে। তাঁর অসমাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে আছে—'বেদেনী' 'কত অজানারে' ও বগলার বন্দদর্শন'। যাই হোক্, মুক্তি প্রাপ্ত ঐ পাঁচখানি ছবিই সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কতবড় মানব দরদী আর ইম্পাতদৃঢ় পরিচালক ছিলেন ঋত্বিক ঘটক।

যান্ত্রিক মোটর গাড়িকে এক অযান্ত্রিক সজীব প্রাণীর চেহারা দেবার প্রশ্নেগ সুন্দরতা যেমন দেখিয়েছেন পরিচালক, তেমনি ধাবমান মোটর গাড়ির যাত্রীদের জীবনের হাসি কান্না গানকেও উপস্থিত করেছেন ও ভাবিয়ে তুলেছেন দর্শকমনকে। জীর্ণ গাড়িটির প্রতি চালকের অন্ধ স্নেহ কি নিদারুণ উৎপীড়নের কারণ হ'য়ে ওঠে, তারও মর্মস্পর্শী রূপ ছবিতে ফুটে উঠে এক আলাদা 'ভাইমেনসন্' সৃষ্টি করে। একটি ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহর কলকাতার এসে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার পরিচয় দিয়ে পড়ে আচথিতেই সমগ্র দর্শক সমাজ। শহরের কদর্যতা ও সৌন্দর্য, নিষ্ঠুরতা ও মমতা ছবিতে ফুটে ওঠে পরস্পর বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনাটুকু নিয়ে। ছেলেটির স্বগত প্রশ্ন: এখানে এত দুঃখ কেন?....এক ঘোটবাহকের মুখের কথা: এ শহরে রাগ বা মানের কোন দাম নেই, এখানে লড়াই ক'রে বাঁচতে হবে।....এই প্রশ্ন আর উক্তিতে ছবিটির বাস্তবতার জীবন-দর্শনই প্রতিফলিত হয়। মেঘে ঢাকা তারার এক অন্যপ্রান্ত পরিবারের মর্মকথা রূপ পেয়েছে আশ্চর্য মর্মস্পর্শী দৃষ্টিকোণে। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা ও মুমূর্ষু নায়িকার বাঁচবার জন্য আকুতি ছবিতে যে ভাব দ্যোতনা সৃষ্টি করে, তা মনকে না ছুঁয়ে পারেনা। ভাঙনের মুখোমুখি হয়েও ঝঞ্ঝাদিগ্ন মানসিকতার অন্ধকারকে পরিচালক বিশ্বস্তকর নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পসম্মত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। ইমোশান থাকলেও ছবিটি পুরোপুরি ইমোশানাল হয়ে তাৎপর্য হারিয়ে বসেনি। চলচ্চিত্রকার নায়িকার কষ্ট ভোগের জন্য তার প্রতিবাদ করার সাহসের অভাবকেই দায়ী করেছেন। ফলে ছবিটি শুধুই একটি মেয়ের অপূর্ণ কামনা বাসনা নিয়ে নিঃশেষ হবার কাহিনী বর্ণনা করেনি, পরন্তু সমাজের অন্যায় অবিচারকে মেনে নেওয়ার যে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা আছে, তার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছে। 'কোমল গান্ধার'-এ একটি নাটুকে দলের ভাঙাগড়া, দেশ বিভাগের বেদনা, ছবির নায়িকা ও নাটকের নায়িকার একাত্মবোধ, শহরের আন্দোলনের প্রতি নায়িকার আকর্ষণ যে পরীক্ষাধর্মী আংগিকে রূপায়িত, তাতে রসসৃষ্টির অবকাশ তেমন না থাকলেও ঋত্বিকের দুঃসাহসী মানসিকতাকে ঢিলে দিতে মোটেই দেরী লাগে না। 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার রূপে সীতার আত্মহত্যার লোমহর্ষক দৃশ্য যেমন রচনা করে, তেমনি জীবনের উচ্ছ্বাসেরও প্রকাশ করে চমৎকার রমণীয়তায়। উদ্বাস্তু সমস্যা, জাতিভেদ সমস্যা ও সর্বোপরি সুস্থ জীবন যাপনের সমস্যা আকীর্ণ ছবিটিতে বৈরাগ্যের ঘন অন্ধকার যেমন দেখি, তেমনি উজ্জ্বল আশার সোনালী রেখাটিও লক্ষ্যে পড়ে বৈকি! হরপ্রসাদের কিছুটা অলংকৃত দার্শনিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে নীতিজ্ঞই সমাজের নগ্নরূপকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ছবির নায়ক উদয়ের প্রতি তীব্র স্নেহও যথেষ্ট অর্থবহ। ছবির শেষপর্বে চিরাগত মানব-সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে শিশুর তাৎপর্যপূর্ণ আবির্ভাব এর ঘোষণার মধ্য দিয়ে।...সভ্যতার মৃত্যু নেই। সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর! এই হচ্ছে শিল্পী ঋত্বিকের Philosophy. আবার তিতাস একটি নদীর নাম ছবিটির base হ'ল হচ্ছে 'অর্থনৈতিক'। তিতাস একটা নদী—যে নদী হচ্ছে Sustaining force, সেই নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীর মধ্য থেকে যে জমিটা জেগে উঠল, তা আর জেলেদের রইল না—চাষীরা এসিয়ে এলো। বাবুদের সংগে মালোদের সংঘাতে বাবুরা মালোদের যে উৎখাত করছে, সেটা শুধু বাসস্থানের মত মেয়েদের রূপ যৌবনের জন্যে নয়, তার একটা economic base আছে। মালোদের টাকা ধার দেওয়া, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, তারপর একদিন বাড়িঘর আলিয়ে দেওয়া—এই economic base টাই মূল কথা। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিটি বলতে চেয়েছে গোটা ব্যবস্থাই বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। সমাজের ব্যবস্তাকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভংগীতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন পরিচালক। কিন্তু কোন পথে এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আসবে বা সমাজের এই ব্যবস্তার সমাধান কিভাবে হবে তার কোন স্পষ্ট ইংগিত ছবিতে নেই। পরিচালক শুধু সমস্যাগুলো তীব্র ব্যঞ্জনায় দর্শকের কাছে হাজির করে সজাগ ও সচেতন করতে চেয়েছেন বেশ বোঝাই যায়। অনেক অপূর্ণতা সত্বেও ঋত্বিকের এই বলিষ্ঠ শিল্পী মানসিকতার স্বাক্ষর অমূল্য এদেশে আর কারও মধ্যে ঠিক পাই কি?

ঋত্বিকের ছবিতে আবহ সংগীতের এক বিশেষ ব্যঞ্জনাধর্মী ভূমিকা থাকে। এখানে শব্দ আর শব্দহীনতা দুইই অদ্ভুত রকম ক্রিয়াশীল। তাঁর ছবিতে কণ্ঠসংগীতও কম থাকেনা। গান যেখানে ছবির ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেখানে গানের ব্যবহারে তিনি অদ্ভুত চিত্ত।

(শেষাংশ-বারো পৃষ্ঠায়)

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই তা গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে একটি বিরোধী পক্ষ সৃষ্টি করা। অস্থির জনতা ও সরকারের একগুঁয়েমির মাঝখানে একটি সেফ্‌টিভাল্‌ভ্‌ তৈরী করা। উল্লেখযোগ্য, সুরেন বাঁড়ুজ্যের ইতিহাস অ্যাসোসিয়েশনের নীতির সঙ্গে এই সদ্যোজাত কংগ্রেসের কোনো মিল ছিলনা। স্বাভাবিক কারণে কংগ্রেসের জন্মলগ্নে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের আহ্বান আসেনি। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় প্রস্তুত করবার ভারে যখন হিউম এসে দেখলেন বাঙলাদেশে এই জনপ্রিয় নেতাদের বাদ দিয়ে কিছু করবারই উপায় নেই তখন বাধ্য হয়ে নেতাদের সাহায্য নিতে হল।

কিন্তু কংগ্রেসের কাজ সবেমাত্র কয়েক দিনের উৎসব আতীর কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ রইল। অধিবেশন দত্ত পরিচয় করে যার নাম দিয়েছিলেন 'তিনদিনের তামাশা'।

ইতিমধ্যে শ্রেণীস্বার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূস্বামী এবং সরকারী পদমর্যাদায় মুক্ত উচ্চ মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা হিন্দু পুনর্জাগৃতির স্বপ্নে এমন বিভোর হয়ে গেলেন যে, ধর্ম-রাজনীতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। বৃহত্তর স্বাধীনতার আন্দোলনের বাতাবরণ পর্যন্ত এই ধর্মের ধূপধুনোর গন্ধে অন্ধকার হয়ে এল।

১৯০৫—১৯১১ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠল তাতে করে দুই প্রধান সম্প্রদায়কে সামিল করবার সুযোগ এসেছিল। দেখা গেল ঢাকার প্রতিক্রিয়াশীল নবাব ছাড়া অন্য মুসলিম নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল রসুল, ময়মনসিংহের আবদুল হামিদ গজনভি, বর্ধমানের আবদুল কাসেম এবং লিয়াকত হোসেন প্রমুখ। এমনকি আলিগড় মুসলিম কলেজের সম্পাদক মোহসীন-উল-মুলক জানাচ্ছেন, তরুণ ছাত্রেরা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাদের আটকে রাখা যাচ্ছেনা। উপরন্তু বিদেশী বস্ত্র বর্জনের পক্ষে এই স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম তাঁতীরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ, সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে বাদ দিলে, আন্দোলনের এই সেকুলার চেহারাটিকে ধরতে চেষ্টা করলেন না। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার প্রথম একটা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হয়ে উঠল যে বঙ্গভঙ্গের ঘোষিত দিন ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে শুরু হয়ে গেল রাখীবন্ধনের ধুম, হিন্দুরা ঘটা করে গঙ্গাস্নানে পবিত্র হলেন, কালীমূর্তির সামনে শপথ নিলেন, বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হল।

জাতীয় আন্দোলনে এ জাতীয় ধর্মীয় সংস্কার অন্য সম্প্রদায়ের আবেগকে বাধা দেবে কি না এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হিন্দু নেতাদের মনেও এলনা। যদিও বরিশালে মুসলিম জনসাধারণ এই স্বদেশী জোয়ারে যোগ দিয়ে গণ সভীতে এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে 'বন্দেমাতরম্‌' 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে পরিস্থিতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তাহলেও এটি স্থানীয় ঘটনা।

এই আন্দোলনের দুর্বলতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাভাবিক ভাবে কাজে লাগাল। ১৯০৬ এর ৩০ ডিসেম্বর আগা খান ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খানের নেতৃত্বে জন্ম নিল মুসলিম লীগ। লীগ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ঘোষণা করল: এতদ্বারা মুসলিম জনসাধারণের মঙ্গল হবে, কাজেই মুসলমানরা বয়কট আন্দোলন বন্ধ করুন।

পূর্ববঙ্গে স্বদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানো হল। কুমিল্লা ও জামালপুরে সাম্প্রদায়িক দাংগার আগুন জ্বলে উঠল। ভাইসরয় লর্ড মিনটো এই সাম্প্রদায়িকতায় উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করলেন "they will be a useful reminder to the people in England that the Bengali is not everybody in India, in fact the Mohammedan Community, when roused, would be a much stronger and more dangerous factor to deal with than the Bengalis."

যাই হোক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙলা দেশকে ছাপিয়ে সর্বভারতীয় জনমতে বিস্তীর্ণ হলে এবং বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচণ্ড গতিবেগে ইংরাজ আতঙ্কিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কাঁটা সমানে বিঁধেই রইল। এই আন্দোলন সার্বিক মুসলিম জনসাধারণের উপর কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারল না।

এই বিষয়টি অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন রয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য আছে। হিন্দু জমিদারদের স্বার্থ ছিল পূর্ববাঙলার জমিদারির অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখা। বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেলে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হত। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রজাদের স্বার্থ জমিদারের সংখ্যাতীত বেআইনী করের হাত থেকে কিছু স্বস্তি পাওয়া। একথা ঠিক জমিদার হিসাবে মুসলিম জমিদারও মুসলিম প্রজাদের প্রতি সদয় নন। কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের ধর্মগত প্রশ্নে স্বাভাবিক উন্মাদনা তাদেরও বাস্তব ঘটনাটা সব সময় বুঝে উঠতে দেয় নি। রাজনৈতিক অজ্ঞতা তো আছেই।

সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতো 'সেকুলার' রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তত পুরোধা এবং বিভিন্ন সময়ে গ্রাম-বাংলার কৃষক অবস্থার প্রতি যিনি সহানুভূতিশীল, তিনিও শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। 'ভারত সম্রাট' সপ্তম এডোয়ার্ডের শোকসভায় তিনিও প্রকাশ্যে নতজানু হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চূড়ান্ত করলেন।

গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটল রাজনৈতিক মঞ্চে। প্রথম থেকেই গান্ধীজি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশেল দিয়ে রাতারাতি 'অবতারে' পরিণত হলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমূহ দুর্বলতাগুলি ঘরে গেল। সম্প্রদায়, বর্ণের বিশিষ্ট সমস্যাগুলির পাশ কাটিয়ে তিনি শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক জনসাধারণের গণআন্দোলনের রূপ নিতে উদ্যত হল। ১৯২১-এ চৌবিটোয়ার নিগৃহীত কৃষক আন্দোলনকারীদের রোষে বাইশজন কনেষ্টবল অগ্নিদগ্ধ হলে গান্ধীজি মাঝপথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ইতিহাসে এর নাম 'বরদলই ব্লান্ডার'। কংগ্রেসের প্রস্তাবে পরিস্থিতিটির চেহারাটা পরিষ্কার "The working Committee advises Congress workers and organizations to inform the peasants that withholding of rent payment to Zaminders is contrary to the Congress resolutions and injurious to the best interests of the country." একই প্রস্তাবে আশ্বাস দেয়া হল "the Zamindars that Congress movement is in no way intended to attack their legal rights, and that even where the ryots have grievances, the committee declares that redress be sought by mutual consultation and arbitration."

গান্ধীজির নেতৃত্বে এদেশে যে গণ আন্দোলন বারবার প্রস্তুত হয়ে উঠেছে গান্ধীজির শ্রেণীগত আনুগত্য এবং গণ-আন্দোলন ভীতি তাকে সার্থক রূপ নিতে দেয়নি। কারণ, গান্ধীজির সীমাবদ্ধ চেতনায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষণ সম্ভব নয়। কংগ্রেসের জমিদার ও কলকারখানার মালিকদের পৃষ্ঠপোষণা হারানো কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। নির্ধারিত কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বনও অসম্ভব। ফলত, কংগ্রেসী আন্দোলন অভিজাত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত শহরে বাবু শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। নীতিগতভাবে জনসাধারণ এই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস করতে শুরু করল।

বিশেষ করে বাঙলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম কৃষক সাধারণ এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠল। বিশেষত্বটি স্মরণ রাখতে হবে এদেশের প্রধান জমিদারগোষ্ঠী হিন্দু এবং এঁরা কংগ্রেসের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

১৯২৮-এ আর একবার সুযোগ এসেছিল। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টে কৃষক প্রজাদের জমির উপর অধিক স্বত্ব প্রতিষ্ঠার কথা উঠলে আইনসভার কতিপয় মুসলিম সভ্য দ্বারা স্বরাজ পার্টি 'হিন্দু জমিদারের' স্বার্থে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল।

এই শ্রেণীস্বার্থের সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষকে একটু একটু করে সমাজদেহের রক্তে সঞ্চালিত করেছিল।

মুসলিম নেতৃত্ব কৃষকদের এই অসন্তোষকে নিজেদের প্রয়োজনে যখন ব্যবহার করতে চাইল তখন মুসলিম বৃহত্তর জনসাধারণ সহজেই বশীভূত হল।

এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্তন বন্ধুরাই আগামী দিনে জন্মলাভ করল। দেশ ভাগ হল।

কাজেই সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যে প্রয়োজনেই কাজে লাগানো হোক না কেন তার বাস্তব অবৈনতিক প্রয়োগে বাস দেয়া যায়না।

সিয়ার বিভীষিকাময় রাজত্ব

(ছয় পাতার পর)

তাছাড়া আছে প্রযুক্তিবিদ্যগত এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রোগ্রাম, এবং অন্যান্য বিনিময়ের মধ্যে মার্কিন-কর্তৃকে আর্থিক এবং ঋণ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সামরিক চুক্তি ইত্যাদি।

সিয়া ব্যতীত আরো দুটি অন্তর্ঘাতী সংস্থা ঐ মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সাধন করে থাকে যারা সিয়ার চেয়ে অল্প-পরিচিত। তারা হল ডি-আই-এ (ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) এবং এন-ডি-আই-এ (ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি)। তাছাড়া নির্ধাতন এবং দৈহিক পীড়নমূলক পুলিশী কাজের জন্য আছে এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভালপমেন্ট। স্বর্গত প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে যে পিস্ কোর গঠিত হয়েছিল তার নামও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে সিয়ার মাথাব্যথা

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ বহুকাল যাবৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে 'চিন্তিত' করে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে এই অঞ্চলের বিরাট মুক্তি সংগ্রামে চকল হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখানকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণমূলক চক্রান্তে সিয়াকে বেশী করে ব্যবহার করে আসছে।

ফিলিপাইনের হাক্‌ গোভিলা এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোকার্ণোকে উচ্ছেদ করার জন্য সিয়ার অপচেষ্টার কথা কারো অজানা নেই।

কিউবার মাংচেজির বই সিয়া অ্যাণ্ড দ্য কাল্ট অফ ইন্টেলিজেন্স-এ তুমাত্রার অন্তর্যুদ্ধ কালে সিয়ার সাহায্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বি ২৬ বোমারু বিমান থেকে বোমাবর্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার সরকারী সেনা এই ধরণের সিয়া-মালিকানাধীন একটি সিভিল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বি-২৬ বিমান গুলিবিদ্ধ করে তার চালক আলেন পোপকে গ্রেপ্তার করেছিল ১৯৭১ সনে জাপানী পত্রিকায় খবর বেরোয় যে, ১৯৫৮ সনে একটি ক্ষুদ্র দক্ষিণপন্থী গ্রামাদ বিদ্রোহকে ব্যর্থ করার জন্য সিয়া লেঃ কর্ণেল আরুকে প্ররোচিত করে ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্রোহ এবং অরাজকতা

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

মণ্ট্রিলের পরে কিছু ভাবনা

শৈলেশ চৌধুরী

কানাডার মণ্ট্রিলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকের ২১তম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে নানান দেশের নানান সাফল্য, বিশ্ব রেকর্ড, সর্বোপরি ক্ষুদ্র একটি দেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানীর বিরাট সাফল্য, পাশাপাশি বিরাট একটি দেশ ভারতবর্ষের নৈরাশ্যজনক ফলাফল—এ সব নিয়েই এখন চুলিয়া জোড়া আলোচনা চলছে। সেই আলোচনা আমাদের দেশেও চলছে। আমাদের দেশে এখন কিছুটা থেমে, কিছুটা চড়ামেজাজে মণ্ট্রিল অলিম্পিকের পর বাদানুবাদ চলছে। ওই বাদানুবাদ মাঝে মাঝে বেশ মুখরোচকও হয়ে ওঠে।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের কোন ভূমিকা নেই—এটা কোন নতুন কথা নয়। যদিও আমাদের দেশ বিরাট, জনসংখ্যা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। সম্পদ এই বিশাল জনসমষ্টিকে নেই একথা হলফ করে বলা যায় না। সম্পদ আছে। সম্পদ থাকলেই সব হয়ে যায় না, তার রক্ষণাবেক্ষণ বা লালন পালন করাটাই বড় কথা। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হলো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই কি শিশুর সব হয়ে গেল? না কি কোন গাছ গাছড়া রোপণ করলেই সে ফুলে ফলে ভরে উঠবে? ওঠে না তাই যত্ন। লালন পালনের পদ্ধতির মধ্যে যদি গলদ থাকে, তা হলে যেমন শিশু বড় হয়ে সম্পদ না হয়ে সংহারক হয়, তেমনি গাছ গাছড়াও যদি যত্ন না পায় তা হলে সে আগাছা হতে বাধ্য।

তাই বলছিলাম জনসংখ্যা ফুলে ফেঁপে উঠলেই সব শেষ হয় না। ঐ জনসংখ্যা থেকে প্রকৃত ক্রীড়াবিদকে খুঁজে বের করে নিতে হয়, তারপর তাকে ঘসে মেজে কালোপযোগী করে তৈরী করতে হয়। সেই দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে গণপ্রজাতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানী। ছোট্ট দেশ। যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত। দেশ দুটুকরো। এক অংশ পশ্চিম জার্মানী, আরেক অংশ পূর্ব জার্মানী, তাই দুই জার্মানীর দুই সমাজ ব্যবস্থা। পূর্ব জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। জনসংখ্যা এক কোটি ৭০ লক্ষ। আর মণ্ট্রিল অলিম্পিকে তার সাফল্য বিরাট, বিশাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—অলিম্পিকে যার ছিল যেখানে প্রতাপ, তার ধারে কাছে কেউ পৌঁছাতে পারে এমন কল্পনা দু যুগ পূর্বেও ক্রীড়ামোদীরা কল্পনা করতে পারেন নি। সেই যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে সোভিয়েৎ রাশিয়া প্রথম স্থান দখল করে বসেছে। সোভিয়েতের এই সাফল্য সোভিয়েতের অলিম্পিকে প্রবেশের পরই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পূর্ব জার্মানী অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরেক ধাক্কায় তৃতীয় স্থানে নিয়ে আসবে এমন কথা ক্রীড়ামোদীরা বোধকরি কল্পনায়ও স্থান দেননি।

পূর্ব জার্মানীর মণ্ট্রিল অলিম্পিকে এই সাফল্য সম্পর্কে যদি একটু নজর দেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে এই দেশটি যেদিন থেকে অলিম্পিকে (১৯৫৬) প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকেই একেকটা ধাপ পেরিয়ে এগিয়ে আসছিল। মিউনিক অলিম্পিকে পূর্ব জার্মানী ২০টি স্বর্ণপদক জয় করে তৃতীয় স্থানে এসে দাঁড়ায়। আর ১৯৭৬ সালে মণ্ট্রিল অলিম্পিকে ৪০টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ সোভিয়েৎ প্রথম স্থান দখল করে ৪৭টি স্বর্ণপদক পেয়ে।

পূর্ব জার্মানীর এই সফলতা কি এবং কেন সম্ভব হলো সেটা আমার আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হলো মণ্ট্রিলের পর বা অলিম্পিকে আমরা কি পেলাম।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের ভূমিকা শূন্যস্থান—এটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা না পারি দৌড়ঝাঁপে এগিয়ে যেতে, না পারি অন্যান্য খেলার মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। এককালের এশীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান ভারত এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, অলিম্পিকে সে ফুটবল দল প্রেরণের কথা চিন্তাই আনতে পারছে না।

ছিল একমাত্র হকি। ভারতের হকি দল নিয়েই যত কল্পকথা বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে। তাও আজ গত। আমি অবশ্য বড় বড় সমালোচক বা যারা ভারতীয় হকির মরণদশা দেখে হাপুস নয়নে কেঁদেকেটে ভারতের মাটিতে বন্যা এনে দিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাতে পারছি না কারণ বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে এমন কোন নজীর নেই যে একটি দল বা দেশ বরাবরই সব বিষয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এটা খেলাধুলার অমোঘ নিয়ম যে আজ যে শ্রেষ্ঠ কাল সে পরাজিত। ভারতীয় হকি দল যতদিন হকি খেলা থাকবে বিশ্বে ততদিনই শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে সোনার ডিমটি পাড়বে এমন কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা আর যাই হক না কেন, বাস্তবকে মেনে চলতে নারাজ।

আমাদের হকি দল সেই ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একটানা বিশ্ব অলিম্পিকে স্বর্ণ ডিম এনেছে বা পেড়েছে। যে শক্তিতে সে পেরেছে ঐ স্বর্ণ ডিম সংগ্রহ করতে সেই শক্তির তো ক্ষয় আছে। সেই শক্তি যখন ক্ষয়প্রাপ্ত তখন কি আমরা ভারতীয় হকি দল নতুন শক্তিতে বা সম্ভাবনাময় হকি খেলোয়াড় বাছাই করে গড়ে তুলতে পেরেছি? প্রশ্ন আজ এখানেই।

বিদেশী খেলা হলেও হকি ভারতের জাতীয় খেলার মর্যাদাসীন। আমরা আমাদের হকিতে গৌরবদীপ্ত ভূমিকার আস্ফালন করতে গিয়ে একটা কথা বারবারই ভুলে যাই যে দুনিয়া গতিমান। শিক্ষানীক্ষায় প্রকরণে আমরা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকলেও দুনিয়া কিন্তু এক জায়গায় থেমে নেই। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় হকির যখন রমরমা, তখন দুনিয়ার কয়টি দেশ হকি খেলতো? আর যারা খেলতো তারা নেহাৎই খেলতো। কাজেই আমাদের হকিতে জয়ের পক্ষে কোন বাধাই ছিল না।

ভারতীয় হকি দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ হয়ে গেল। এক অংশ ভারত, আরেক অংশ পাকিস্তান। এই উপমহাদেশ থেকেই প্রথম ভারতীয় হকি দল বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ ভারত-পাক হকি দলের খেলার পদ্ধতি একই ছিল এবং টোকিও এশিয়ান গেমসে (৫৮ সালে) প্রথম হকির গৌরব হাতছাড়া করে ভারত। প্রতিবেশী পাকিস্তান দলের কাছে আবার টোকিও অলিম্পিকেই ১৯৬৪ সালে ভারত হকিতে অলিম্পিক বিজয়ের গৌরব ফিরে পায়।

ভারতীয় হকি দল আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার আসরে এখন কোণঠাসা হওয়ার কারণ সম্পর্কে ক্রীড়া-মোদীদের বুঝতে অসুবিধা হয়না। ব্যর্থতার মূলে অনেক ঘটনাই রয়েছে। তার মধ্যে যে ঘটনাগুলি আজ আর গোপন নেই তা হলো দল নির্বাচন নিয়ে দলের মধ্যে রেষারেষি।

(শেষাংশ চোদ্দ পৃষ্ঠায়)

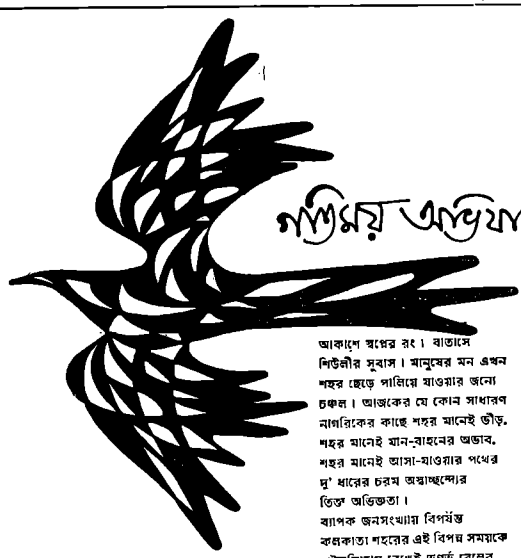

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়, শহর মানেই যান-বাহনের অভাব, শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা।
ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ রেলের ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক গতিময় অভিযান।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

সিয়ার রাজত্ব

(দশম পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট সোকার্ণোর পতন ঘনান্বিত করে পরবর্তী কালের কমিউনিষ্ট ও দেশপ্রেমিকদের গণহত্যা সংঘটিত করেছিল।

ভিয়েতনাম এবং ইন্দোচীনে প্রত্যক্ষ মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের সময়ে থাইল্যাণ্ড হয়েছিল সিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র। ঐ আপানী সংবাদপত্রের মতে ১৫০জন সিয়া চর থাইল্যাণ্ডের সামরিক সাহায্য কমাণ্ডের সঙ্গে, বিশেষত তার গোপন সংবাদ সংগ্রহ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্বোডিয়ার তাদের কর্মজাল বিস্তৃত করেছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩র মধ্যে সিয়া ৫৭ হাজার ভাড়াটে খাটি কর্মী সংগ্রহ এবং শিক্ষিত করে তাদের লাওসের ভিতরে গোপনে ঢুকিয়ে লাওস-বাসীদের বিরুদ্ধে এদের লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনভার গ্রহণ করেছিল। এদের ব্যয় বহনের জন্য একমাত্র ১৯৭২ সালেই অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ ডলার। ভিয়েতনাম চুক্তি সইয়ের প্রাক্কালে ১৯৭৩ সালের গোড়ায় এই গুপ্তচর সংখ্যা সর্ব কালের সীমা অতিক্রম করে বাঁড়িয়ে ছিল ২১ হাজারে এবং তাদের ব্যয়ের পরিমাণ ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলার। আমেরিকার সেনেটের এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, এই খরচ করেছে সিয়া। ওয়াশিংটনে সিয়ার অ্যাকাউণ্টে এই অর্থ পাচার করা হয় এবং সেখান থেকে থাই বাহিনীর অ্যাকাউণ্টে।

কম্বোডিয়ার রাজা নরোদম সিহানুককে সিয়ার পক্ষ থেকে হত্যার চেষ্টা প্রকাশ হয়ে পড়লে মার্কিনদের ১৯৬৫ সালে সে দেশ ছাড়তে হয়। অষ্ট্রেলীয় পত্রিকা ক্রানস্লাল টাইমসে প্রকাশ যে, এর পরে সেখানে সিয়ার কাজের দায়িত্ব বহন করেছিল অষ্ট্রেলীয় ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস। এদের সাহায্যে অরাজকতায় উসকানি দিয়ে মার্কিন তাঁবেদার লন্ নল ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপ্রধানের আসন থেকে সিহানুককে অপসারিত করে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে তাদের ক্রম-বর্ধমান চক্রান্তজালকে কার্যকর করার জন্য সিয়া পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ অসামরিক বিমানপরিবহনকে ব্যবহার করেছে যাদের কর্মচারীসংখ্যা প্রায় সিয়ার সমান। এর মধ্যে এয়ার আমেরিকার মত নাম করা কয়েকটি বিমান পরিবহন সংস্থাও জড়িত। প্যারিসে ভিয়েতনাম চুক্তি সইয়ের প্রাক্কালে মুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহৎ বিমান সংস্থা তাদের নিজস্ব ১২৬টি এবং ভাড়া করা ৪০টি বিমান নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিকাংশ সিয়া মিশন চালায়। ৩০ এপ্রিল তারিখে সায়গনের মার্কিন তাঁবেদার সরকারের আগে পর্যন্ত এই কাত্রিকলাপ বন্ধ হয়নি।

লাওসে কন্টিমেন্টালের সবচেয়ে বড় খদ্দের ছিল আর কেউ নয়—স্বয়ং সিয়া। সিয়ার বর্তমান পরিচালক উইলিয়ম কোলবি স্বীকার করেছেন যে, মুখ্যত ডাকাত জেনারেল ভ্যান পাওয়ের দলবলের সাহায্যে তারা লাওসের লোকদের বিরুদ্ধে সিয়ার চক্রান্তমূলক আক্রমণ মার্কিন কংগ্রেস টের পাওয়ার আগেই বছরের পর বছর চালিয়ে গেছেন। মার্কিন সূত্রে প্রকাশ ওয়াশিংটন লাওসে গভীর ভাবে জড়িয়ে যাওয়ার পর ভ্যান পাওয়ের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ হাজার মেও উপজাতীয়দের সশস্ত্র, সংগঠিত এবং শিক্ষিত করার জন্য সিয়া ৩০ কোটি ডলার খরচ করে। এরা ভাল মাইনে পেত সিয়ার কাছে এবং থাইল্যাণ্ডের মার্কিন রসদ ভাণ্ডার থেকে যোগান পেত। কোলবি অস্বীকার করেননি যে, এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ আক্রমণ বা অন্তর্ঘাতের চেয়ে কম শক্ত।

গত কয়েক দশক যাবত ভিয়েতনাম ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সিয়ার আক্রমণের মূল ক্ষেত্র এবং লক্ষ্য। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন-দিয়েম একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলা এবং শক্তিশালী করার কৃতিত্ব নিয়ে সিয়া একসময় খুব বড়াই করত। দিয়েম-নু ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল তাতে উইলিয়ম কোলবি এবং কর্ণেল স্যান সেডলের মত সিয়া কর্মকর্তারা যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছে তা দুরপনেয়।

কিন্তু মার্কিন ডলার, অস্ত্র এবং চক্রান্ত দক্ষিণ ভিয়েত-নামের বিপ্লবের স্রোত রুখতে যখন পারল না তখন সিয়া দিয়েম-দুয় হত্যার ব্যবস্থা করে বাহন পালটালো। মার্ক-চেরিক মতে সিয়া সাইগনের দেশদ্রোহী সরকারের ৪৫ হাজার সিভিল গার্ডকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের মার্কিন এ্রীন বেরেটদের অধীনে স্থাপন করে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে সিয়া যত রক্তাক্ত অপরাধের অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত করেছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল ওথা-কথিত প্যাসিফেকেশন ক্যাম্পেন যার সাংকেতিক নাম ফীনিক্স এবং যা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত হয়েছিল কোলবির দ্বারা। এটা ছিল একটা পর্যায়ক্রমিক তীতিপ্রদ প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতকংয়ের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ভেঙে দেওয়া কিন্তু যার প্রকৃত পরিণতি হয়েছিল অসামরিক নাগরিকদের পাইকারী নারকীয় হত্যাকাণ্ড। কোলবি কংগ্রেসের তদন্ত কমিটির কাছে নিজেই স্বীকার করেছে যে, এই অভিযানের আড়াই বছরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ২০ হাজার অসামরিক নাগরিককে তারা হত্যা করেছিল। সংখ্যাটা অবশ্য অনেক কম করে দেখানো হয়েছে। গুরেন ভ্যান থিউর পতনের সময়েও সিয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলিতে অনুপ্রবেশ করে মানুষের মনে ত্রাস থাকার সৃষ্টি করে হাজার হাজার নারী এবং শিশুকে মার্কিন প্রভাবিত অঞ্চলে পাচার করে দেয়।

কাউন্টার স্পাই পত্রিকার ১৯৭৪ সনের দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নামের বিপরীত উদ্লিখিত বাজধানীগুলিতে সিয়ার কর্মকর্তা রূপে সনাক্ত করা হয়েছে :—

(১) লা পাজ। ফ্রেডরিক ভব্লু লাত্রাপ
(২) ব্রাসিলিয়া। উইলফ্রেড ডি. কোপ্‌র লাউইজ
(৩) বেসিফ। টমাস জে. ব্যারেট, জুনিয়ার
(৪) রাইও ডি জেনিরো। হ্রীফেন এফ. ক্রীন
(৫) সাও পাওলো। লুই ডি. এবার্ট (৩)
(৬) সান্টিয়াগো। হ্রুয়ার্ট বার্টন
(৭) বোগোটা। নেট্টার ডি সাঁচেজ
(৮) সান জোস। কোমার ডব্লু. গিলস্ট্যাপ
(৯) সান্টো ডামিঙ্গো। টমাস এ. ক্লেটন
(১০) কুইটো। পল ডি. হারউড
(১১) গোয়াকুইল। অব্রাম এম, হেথ্‌কোতো
(১২) সান স্যালভাডোর। কেনেথ আর গুডম্যান
(১৩) গুয়াতেমালা। এডুইন এম. টেরেল
(১৪) তেগুচিগালপা। গ্লেন ও. ক্রাউন
(১৫) মানাগুয়া। থোমেস পিকোলো, জুনিয়ার
(১৬) পানামা যোসেফ। কে. কে কোরোনাগা
(১৭) লিমা। রিচার্ড ডব্লু ওয়েল্‌চ
(১৮) মন্টিভিডিও মাটিন সি হকিন্স
(১৯) কারাকাস। ওডেল ই. টমাস

নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশ সিয়া পর্তুগালের দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলিকে কোটি কোটি টাকা খয়রাত দিয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের সোশাল ডিমোক্র্যাট নেতাদের মারফৎ এই টাকা পাঠানো হয়েছে। এই পত্রিকা আরো জানিয়েছে যে, এই অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা দক্ষিণপন্থী পর্তুগীজ রাজনৈতিক দলগুলিকে অজস্র অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে যার পরমাণ স্থিরীকৃত হয়নি।

ঋত্বিক ঘটক

(নয় পৃষ্ঠার পর)

বিষয়বস্তু অনুসারে ক্যামেরার গতি ঠিক করা, দৃশ্যকে অর্থপূর্ণ করার জন্য Co-incident সৃষ্টি করা, প্রত্যেকমুহূর্তের সৃষ্টিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করা, ক্যামেরা, সাউণ্ড ও এডিটিং-এর সাহায্যে চিত্রটিকে রস সৃষ্টি করা ইত্যাদি আংগিক প্রকরণে তাঁর মুন্সিয়ানা আপন বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় তুলে ধরে। তাঁর ছবির বাস্তবতা যতই ভয়ংকর হোক, নাজনিক শর্তে তা নিয়ন্ত্রিত বলেই তাঁর ছবি নিরবয়ব সৃষ্টিতেও সার্থক। কঠোর বাস্তবতার রূপায়ণে যেমন নির্মম তিনি, আবার কোমল দৃশ্য রচনাতেও তেমনি সংবেদনশীল। তাঁর ছবিতে ধানক্ষেতের পটভূমিতে কীটস্-এর কবিতার আবৃত্তিও যেমন শুনি, আবার মানিজনক আত্মহত্যার বিভীষিকাও তেমনি প্রত্যক্ষ করি। এমনই চলচ্চিত্রকার হলেন ঋত্বিক ঘটক। যেমন 'ডাইনামিক' তেমনি 'পাওয়ারফুল'।

সামাজিক অবক্ষয় আর নৈরাশ্যের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'জন-অরণ্য'কে করে ফেলেন আত্ম-সমর্পণের একটি দলিল। ঋত্বিক ঘটকও 'সুবর্ণরেখা'য় সমাজের অবক্ষয়ের চেহারা ফুটিয়েছেন। নৈরাশ্যের ছায়া সেখানেও পড়েছে। কিন্তু যে তীব্র জ্বালায় ও যে দুঃসহ মর্মপীড়ায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে তো বিক্ষো-রণের শক্তির সাক্ষাৎই মেলে। ঈশ্বর যখন হতাশা তাড়িত হয়ে মদ্যপ অবস্থায় বেশ্যালয়ে ঢুকে তার সেই সীতাকে আচমকা দেখে, সীতাও যখন তার দাসাকে ঐ অবস্থায় অবস্থার দেখে অপরিসীম লজ্জা আর ঘৃণায় আত্মঘাতী হয় তখন দেহে আর মনে রক্তাক্ত হয়ে ঈশ্বরের সেই মর্মন্তুদ লোচ্চার বিলাপ প্রতিটি দর্শক মনকেই প্রচণ্ড নাড়া দেয়। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের তীব্রতা দর্শককে করে তোলে সকলকেই। চারি চ্যাপলিনও তাঁর 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা ভয়াবহ ক'রে দেখিয়েই দর্শক সমাজের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন। সেখানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির কোন ললিত বাণী উচ্চারণের প্রয়োজন হয়নি।

আসলে উপস্থাপনা বা প্রকাশের 'মোটিভ'টাই বড় কথা। 'Negative approach'এও Positive effect' ফুটিয়ে তোলা যায়, যদি সেই 'Negative approach'-কে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়। ভূমিকম্পে যেমন সব কিছু ন'ড়ে ওঠে, তেমনি হৃদকম্পেও সব জড়তা দূর হয়ে মন ও দেহ সচেতন হয়ে ওঠে। 'Negative process' অবলম্বন করলে সেই হৃদকম্প সৃষ্টি করাতো চাই। কিন্তু 'জনঅরণ্য'র আত্মোপায় 'সিরিক্যাল ট্রিটমেণ্ট'-এ হৃদ্‌কম্প সুদূরের কথা, দেহমন অহিকের ক্রিয়ার কেবল আচ্ছন্ন ও অসাড় হয়ে পড়ে।"

ঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি উজ্জ্বল কথা আজ মনে পড়ে—"আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রাম শিল্পী জীবনের নিত্যসঙ্গী ক'রে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাজ করে যেতে হবে। সামগ্রিকভাবে কোন সংকট আচ্ছন্ন করে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপোষের পথে টেনে না নিয়ে যায় অর্থাৎ সংকটের কাছে যেন আমরা বিবেকবুদ্ধি সব কিছু নিয়ে সব কিছু আত্মসমর্পণ না করি।"

আজ আর ঋত্বিক নেই। কিন্তু ঋত্বিকের অক্ষয় বাণী আছে, থাকবে। আর থাকবে তাঁর রূপোত্তীর্ণ অমর সৃষ্টি—জীবনের জয়গান মুখরিত, নবজাতকের জন্য যোষিত সেইসব দুরন্ত অসাধারণ ছবি।"

বিপ্লব তত্ত্ব

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

অচল হয়ে গড়ে। তখনই আসে সমাজ বিপ্লবের সময়, অর্থ-নৈতিক ভিত্তির তখন বদল ঘটে। এই পরিবর্তন কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে সমাজে পুরনো ব্যবস্থার বদল ঘটে, নতুন ব্যবস্থা পত্তনের নবযুগ আসে।

মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানের মৌল সিদ্ধান্ত অনুসারে সমাজ-বিপ্লবের সংজ্ঞাকে সামনে রেখে বিচার করলে দেখা যায় যে উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে অচলায়তন সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটে। কেউ সে পরিবর্তন রোধ করতে পারে না। ধনবাদী গোষ্ঠীর শ্রেণী চরিত্র ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করেও মার্কিউজ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্থায়ী না-করে বরং প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক উন্নততর এক-ডাইমেনসনের সমাজ ব্যবস্থাকে (one Dimentional Society) সুদৃঢ় স্থায়ী করেছেন। শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীই একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী এবং শেষ পর্যন্ত এদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। অথচ মার্কিউজ আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর উপর কোন আস্থা রাখতে পারেননি। এমনকি তিনি তাদের শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণী-সচেতনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ মার্কস মার বার উল্লেখ করে গেছেন যে, মুক্তিসংগ্রামের অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী শোষণ মুক্তির জন্য যে-সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামের ভেতর দিয়েই শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীগত চেতনা আসে। কিন্তু মার্কিউজ বলছেন, এখন নবজাত শ্রমিক শ্রেণী নবাগত বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন এবং অন্যান্য শ্রেণী থেকে আদৌ পৃথক নয়। সুতরাং এদের দ্বারা ভিন্ন ব্যবস্থার কল্পনা বিলাসিতা মাত্র। এখানে প্রশ্ন আসে যে, মনোভাব যেমনই হোক-না-কেন, শিল্পোন্নত সমাজের শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণের আওতা থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব, শ্রেণী চেতনা বা সংগ্রামী চেতনা জন্মলাভ করে লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে, সংগ্রামী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় সংগঠনের ভেতর দিয়ে। মার্কিউজ সংগঠনগত ত্রুটির কথা উল্লেখ না-করে শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসের মৌল প্রতিপাদ্যকেই অস্বীকার করেছেন। এমন কি তাদের নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর কোঠায় ফেলে বিচার করেছেন। অথচ এই উভয় শ্রেণীর চরিত্রগত পার্থক্যের সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনগত সম্পর্ক যে-অঙ্গাঙ্গী জড়িত সেকথা মার্কস বিস্তারিত উল্লেখ করে গেছেন।

ধনবাদের মৌল চরিত্র শোষক ভিত্তিক উৎপাদন, ব্যক্তি মালিকানার অধীনে পুঁজি ও উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের অসম বন্টন—তা সে উৎপাদন ব্যবস্থা যত উন্নত হোক না কেন এবং শ্রমিক শ্রেণী যত ভোগ বিলাসেই জীবন যাপন করুক না কেন,—শ্রমের ভাষ্য মূল্য ও মজুরী থেকে শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিত ও শোষিত হয় এবং সেই উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা থেকে ধনিক শ্রেণী পুঁজি সঞ্চয় করে। পুঁজিবাদের এই মৌল চরিত্র বদলায়না, এই নির্মূঢ় সূত্রকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। এছাড়া আজকের দুনিয়ায় ধনবাদ সেই প্রথম যুদ্ধকালীন ধনবাদ সাম্রাজ্যবাদের মত শক্তিশালী নয় এবং ধনবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা, রেষারেষি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ, স্ববিরোধ ও সাম্যবাদী শক্তি জোটের প্রভাব তাকে ভয়ংকর সংকটের মুখে ফেলেছে এবং এর সংগে অতি-উৎপাদনের সমস্যা যুক্ত হয়ে সেই সংকট আরও তীব্র হয়েছে।

সুতরাং মোটা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে শিল্পোন্নত সমাজের অতি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, উন্নততর উৎপাদন প্রকরণ যদি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্ভর হয়, তাহলে শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পুরনো সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ আর্থিক বনিয়াদ, তার রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন কানুন, প্রশাসনযন্ত্র, শ্রেণী বিন্যাস পরিবর্তনের যে মৌল কারণ মার্কস নির্দেশ করেছেন মার্কিউজ সেই উপাদানকেই সমগ্র সম্পন্ন সমাজের জীবনকাঠি হিসেবে দেখেছেন এবং তাইব শিল্পোন্নত সমাজের ত্রুটি উল্লেখ করে ধার্মিক বস্তুবাদের ভরসে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শকে একালের উন্নত সমাজ পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেছে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন ও মুক্তি সিদ্ধানকে এভাবে উল্টো করে দেখা যা ঝাপসা নজরে দেখা মার্কস এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

॥ দুই ॥

মার্কিউজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের উন্নতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেও বলেছেন, চলতি গণতন্ত্র ভয়ানক কলুষ, কতিপয় ক্ষমতাশিল্প রাজনীতিবিদের (Power Elite) হাতের অস্ত্রস্বরূপ। জনগণ যাকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুক না কেন, সে-ই সমসাময়িক এস্টাবলিশ-মেন্টের সমর্থিত প্রার্থী। বিক্ষোভের মাধ্যমে এর আমূল পরিবর্তন করলে গণতন্ত্রের উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির সীমারেখার মধ্যে তা সম্ভব হচ্ছেনা। এই পদ্ধতি হল এক প্রকারের ছেলেখেলা। আমেরিকার যুব সমাজ এই খেলনা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নয়। ছাত্র বিদ্রোহকে মার্কিউজ ঠিক বিপ্লব বলেন নি, এ হল বিপ্লবের অঙ্গনাত্র। তিনি যুবসমাজকে ঠিক বিপ্লবী বলতে চাননি, এরা বোধা জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজনকে রূপায়িত করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কারণ তারা প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে মাথা বিকিয়ে যেরনি এবং এই ব্যবস্থার অন্যায় ও অসাম্যকে তারা সমর্থন করে না। তিনি মনে করেন এই যুব বিদ্রোহের মাধ্যমে সমাজে কম্পন দেখা দেবে ও চলতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

আমেরিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি বলছেন, সংস্কৃতি হল মার্কিনী সমাজের সাফল্য ও প্রতিপত্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু। সাম্প্রতিক সংস্কৃতি হোঁয়াচে রোগের মত সমস্ত শিল্পোন্নত সমাজের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়বে। এর প্রচণ্ড গতিশীলতা, সাফল্য, অবয়বন ও সর্বপ্রাসী চরিত্র নিয়ে বরং ছড়িয়ে পড়েছে! সেইজন্য তিনি শঙ্কিত বোধ করছেন। মার্কিনী সমাজ ব্যবস্থা সমগ্র দুনিয়ার মডেল হিসেবে পরিগণিত হবে। তিনি বিশ্বাস করেন, এই পথ পরিহার করা সম্ভব। নচেৎ তাঁর ধারণা মানুষ একদিন নিজস্ব প্রয়োজনে শুভবোধ নিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন করবে।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজনীতিতে, প্রশাসনে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ যদি মুক্ত বিবেক নিয়ে জীবনের সংগ্রামশীলতার আদর্শে ও প্রেরণাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন সমাজ গঠনের জন্য এগিয়ে আসেন, তাহলে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে বলে তাঁর বিশ্বাস। ইদানীং যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ বিভিন্ন গঠন কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন, কিন্তু তারা প্রায় প্রত্যেকেই এই স্থিতাবস্থার প্রতি আস্থাশীল। এদের দ্বারা সেই কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না। তাই তিনি যুব সমাজের চিন্তাশীল অংশের উপর আস্থা স্থাপন করেন। এরা আগামী যুগের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তিনি মনে করেন, এরা পৃথিবী থেকে শোষণ, দারিদ্র্য ও শ্রমের কঠোরতা দূর করে মুক্ত সমাজের গঠনকর্মে নিযুক্ত হবে।

মার্কিউজ বলছেন, শিল্পোন্নত সমাজের যুবশক্তির মধ্যে

(পেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

সুকান্ত প্রসঙ্গ

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রহের প্রয়োজনে নয়, যারা অর সংগ্রহের জন্য সারা দিয়েছে, তারা যাতে ঠিক মত অন্ন পায় তাই দেখবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম হিসেবেই ছিল তার সারি দেওয়া। শীতের সূর্যর কাছে রাগ এবং প্রার্থনা জানানোও নিজের জন্য নয়, কারণ তার দুঃখ নিজের নয়, অন্ন হারার হাজার শিশু তরুণের দুঃখ দেখে ও মর্মে মর্মে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সুকান্ত বলেছে : জানোতো আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব! তাই এক টিনতে রোদ দিয়ে ওই উলঙ্গ ছেলেটাকে ঢেকে দাও, হে শীতের সূর্য। বাইরের আহ্বানেই যেমন রাত্রির অন্ধকারে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বিষয় বিবাগী হয়ে পথে পথে ঘুরেছিলেন গৃহের আরাম বিলাস ঐশ্বর্য অবহেলায় ত্যাগ করে, সুকান্তও, বিলাস না হলেও আরাম-বিরাম এবং সেকালের মধ্যবিত্ত সুলভ সংগুপ্ত নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা উপেক্ষা করে উপবাসে থেকে পথে পথে পরিক্রমা করে বেরিয়েছে সেই একই মানসিকতার তাড়নায়, মানুষের দুঃখ চিরতরে দূর করার আগ্রহে ও সংকল্পে।

জ্ঞান হওয়া থেকে সুকান্ত দেখেছে পরিবারে তার প্রিয়-জনদের পরপর মৃত্যু,যার চূড়ান্ত তার মার মৃত্যুতে। সুকান্তর তখন বয়স মাত্র বারো। কিশোর মন স্বভাবতই বন্ধু-সাহচর্য কামনা করেছে এবং বাড়ির বন্ধন উপলব্ধি না করার দরুন তাদের সঙ্গেকেই বেশিঘনিষ্ঠতা দিয়েছে। তারপর আর তার দেখা ধরতে পারেনি পরিজনেরা, সুকান্ত তখন পথচারী ও অনাহারী, বাড়ি গিয়ে আসার সময় কোথায়? অনেক অনেক কাজের দায়িত্ব তার উপর কর্মকেন্দ্রের অগ্রজদের পিঠ চাপড়ানিতে কাজের উৎসাহ বেড়ে গেছে। আসলে কাজটা যে কি ছিল তা আমি আজও জানিনা, প্রশ্ন করলে মৃদুহাস্যে বলত, ভীষণ কাজের চাপ, আর দায়িত্ব তেমন যার আছে সে কি দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে নিজের আহার নিদ্রার প্রয়োজনে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা ছেড়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন, আবার রাজনীতি ছেড়ে কবিতায় ফিরে গেছেন। সুকান্ত কবিতাকে অঙ্গেসঙ্গে জড়িয়ে রাজনীতিতে এসেছেন এবং দুটোর একটাকেওছাড়তে পারেন নি। প্রকৃত কবির পক্ষে কবিতার প্রকাশ যন্ত্রণা যে কী তীব্র তা বলার অপেক্ষা রাখেনা, সেই সঙ্গে মানুষের দুঃখের সমব্যথিত্বের গভীর ও তীব্র বেদনা। আরও তখন তার চোখের ঘুমদৃষ্টি, সে যখন দেখছে জনগণ মুক্ত স্বাধীন, সেই বাঞ্ছিত স্বর্গরাজ্যে সবাইকে নিয়ে ছুটে যাবার গতিকেও সে এতটুকু প্রথতা আনতে পারছে না। এতগুলি আঘাতে আঘাতে জর্জর হয়েই সুকান্ত দুরন্ত আকাশে করে পড়েছিল। এ বিশ্বকে এ মিথ্যা বাসযোগ্য করে যেতে সে পারেনি ঠিকই কিন্তু তার আগন রক্তে শিউটকে যে আশীর্বাদ করে গেছে সেই আশীর্বাদ-ই আজ সহস্র ধারায় বর্ষিত হয়ে, সুকান্তর কাম্য জগতের মাটিকে সরস ও উর্বর করে চলেছে, তা ফসলে ভরে যাবেই একদিন। কবে, তার নিশানা হয়তো আজও মিলছে না, কিন্তু তাতেই তার কাম্য ভবিষ্যৎ ব্যর্থ হয়ে যায় না।

গণ সঙ্গীত

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

গণসঙ্গীতের কবি সুরকার হলেও সঙ্গীত বিজ্ঞানে দখল আমার খুবই কম। এটা খুবে যায় গানের ব্যবসায়ী বিপ্রবী আবেগটুকুকে ঘনীভূত করার আবশ্যিক প্রয়োজনে। পক্ষান্তরে আমার রচিত সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় গান "শোন কাকলীনরে এই চন্দননিঁড়ি শ্মশানে অহল্যা মা'র চিতার আগুন জলেরে" পুরোপুরি লোকসঙ্গীতের সুরে রচিত। বলাই বাহুল্য, "তোমারে দেখেছি মাগো" শহরের বিদগ্ধ শ্রোতার অনুমোদন পেলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু গানটি খুব বেশী নিতে পারেনি অথচ "অহল্যা" ঠিক তার উল্টো। তাই, গণসংগীতের সুর সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায় যে, গানের বিপ্লবী আবেগকে ঘনীভূত করার প্রয়োজনে যে কোন সুরের প্রয়োগেই সিদ্ধ। সলিল চৌধুরী এটা বহুবার প্রমাণ করেছেন। কিন্তু যদি কেউ গণসঙ্গীতের সুষমা বৃদ্ধির অজুহাতে একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবিত পরিমণ্ডলে টেনে নিতে চান তবে তিনি ভুল করবেন।

বিপ্লব তত্ত্ব

(তেরো পৃষ্ঠার পর)

একটা নতুন চেতনা জন্মলাভ করেছে। এই নবচেতনার সঙ্গে যদিও ধকারো রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তথাপি তিনি মনে করেন, স্বিতাবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে তা সহায়ক হবে।

তিনি মনে করেন, নান্দনিক ডাইমেনশনের বিস্তৃতি ছাড়া কোন সমাজে সুন্দরের সাধনা, স্বাধীনতার মূল্য ও নৈতিক মানের চরম আদর্শ রূপায়িত করা যায়না। মুক্ত সমাজের মূল্য নিরূপিত হয় নন্দনতত্ত্বের সামাজিকীকরণের ভিত্তিতে। পৃথিবীকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক শুধুমাত্র পণ্যের বাজার, শোষণের প্রতিযোগিতা ও নিপীড়নের উপর টিকে থাকতে পারেনা।

তিনি মনে করেন, একালের যুববিদ্রোহ নবচেতনা লাভ করছে। পুরনো মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করে সুররিয়ালিজমের ভিত্তিতে ওরা স্বিতাবস্থার উপরেই আঘাত হানছে। এই সুররিয়ালিষ্টিক প্রতিবাদ যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, তিনি মনে করেন, একদিন পরিবর্তন আনবে। হিপি সম্প্রদায়, আনন্দমার্গী ফ্লাওয়ার মেন, কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ—এসব যদিও সামাজিক বিকৃতির প্রকাশ তবুও তিনি মনে করেন, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নতুন চেতনা ও সমাজ-বিদ্রোহের প্রবণতা এসেছে, তার ফলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পাপ, শোষণ, নিপীড়ন দূর করে ভবিষ্যতে স্বিতাবস্থাকে উচ্ছেদ করতে ওরা সক্ষম হবে। আর তারপর ওরা দারিদ্র্য দূর করে পৃথিবীকে সুন্দর, শান্ত ও আনন্দময় ভুবনে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে।

শিল্পোন্নত সমাজে বিপ্লবের প্রকৃতি, যুববিদ্রোহ, আমেরিকার সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও সর্বশেষ সামাজিক জীবনযাত্রার নন্দনতত্ত্বের বিকাশ সম্পর্কে মারকিউজ যেসব বক্তব্য রেখেছেন তা খতিয়ে দেখা দরকার। মারকিউজ যুব বিদ্রোহের সঙ্গে যুবসংস্কৃতি এবং যুবকদের চিন্তাশীল অংশের সঙ্গে সুররিয়ালিষ্টিক কায়দায় যুব আন্দোলনের যোগসূত্র টেনে সাম্প্রতিক যুব প্রতিবাদের একটা সামগ্রিক চেহারা ধরতে চেয়েছেন, যা নাকি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধারক বাহকদের (Power Elite) উচ্ছেদ করে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি সমাজিক স্বিতাবস্থাকে দায়ী করেছেন এবং এই সমাজ ব্যবস্থা বাতাবীয় কলুষতার আধার বলেই উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে মারকিউজের মন্তব্য অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। মারকিউজ মার্কসের মূল্যবান বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে উল্লেখ করেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া প্রলেটারিয়েট শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লব সম্ভব নয়। কারণ শ্রমিক শ্রেণী সমাজের সামগ্রিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে আর মানুষের যাবতীয় উৎপাদন সামাজিক উৎপাদন। মুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে ক্রয় করে, তাথা মজুরী থেকে বঞ্চিত করে এবং উৎপাদনের উপকরণ ও মূলধন সৃষ্টি করে। মুর্জোয়ারা সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকেই শ্রমিক সংগ্রহ করে। এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত পেশাও অবশেষে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, মূলধন উৎপাদনে ও শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। এই সর্বহারা শ্রেণীই একমাত্র মুর্জোয়া শ্রেণীকে বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। মুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বন্দ্বিরোধী অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই শ্রেণী ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ কি মারকিউজ স্বীকার করেন? মারকিউজের ছাত্র ও যুবজন কারা? এরা কি ত্যানলার্ড? স্বশ্রেণী থেকে বিচ্যুত বা De-classed? এরা কি বিপ্লবের প্রথম সারির সৈনিক? শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী? স্বিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব করার জন্য শক্তি, চেতনা, আদর্শ, বিপ্লবী সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও তত্ত্ব-কৌশল এরা কোত্থেকে সংগ্রহ করবে? এদের বিদ্রোহ পুঁজিবাদীসমাজ-ব্যবস্থার কতটুকু আঘাত হানতে সক্ষম হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর মারকিউজের ছাত্র ও যুববিদ্রোহের তত্ত্বে অস্পষ্ট ও অনুপস্থিত।

তাছাড়া শিল্পোন্নত সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর যদি কোন ভূমিকা না থাকে, বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করার পালা যদি শেষ হয়েই থাকে এবং তার জায়গায় ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়কে যদি বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তাহলে স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে যে ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায় কি একটা শ্রেণী? অথচ আমরা জানি যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েট ছাড়া অন্য কোন শ্রেণী নেই, থাকতে পারেনা। মার্কস থেকে লেনিন পর্যন্ত সবাই বারবার সেকথা উল্লেখ করে গেছেন। মারকিউজ বলেছেন, বোবা জনগণের অব্যক্ত ভাষাকে ছাত্র ও যুবজন বিদ্রোহের মাধ্যমে রূপায়িত করবে। এই ছাত্র ও যুবজন কারা? সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ এখনো করেনি, এমনকি এখনো যাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। এদের রাষ্ট্রচেতনা, সমাজ-চেতনা আসবে কোত্থেকে এবং কিভাবে? এরা শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের অব্যক্ত ভাষাকে বুঝবে কি ভাবে? এরা স্কুল-কলেজে কোলাহল করতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায়, প্রশাসনে বলার ক্ষমতা পেলেও এরা কিআদর্শসমাজ গঠনে সক্ষমকাম হবে?

ওকনেরা চিরবিদ্রোহী। আদর্শবোধের প্রেরণায়, ভাবপ্রবণতায় ও রঙিন স্বপ্নে তারা একটা স্বচ্ছ জগত রচনার চিরআকাঙ্ক্ষী। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল্যবোধ, আইন-কানুন, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও বহুব্যবহারে মলিন অচলায়তনকে অস্বীকার করে নতুন পথের আবিষ্কার করাই এদের চিরকালের ধর্ম। ঘাট ও সত্তর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওকনেরা প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রীতিনীতি ও মূল্যমানের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। চিরকালীন ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করে যা কিছু অকল্যাণকর, রুচিবিগর্হিত, অশালীন, বিকৃত ও নোংরা আচরণজাত তাকেই বিচিত্র রঙে নক্সায় সকলের চোখের সামনে তুলে ধরার বিকৃত, বীভৎস ও মনোবিকারজাত আচরণ প্রকাশের মধ্যেই এদের বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ। শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়,

(শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

মণ্টিলের পর

(এগারো পৃষ্ঠার পর)

যে কোন একটি জাতীয় দল যখন বিদেশ ভ্রমণে যেত হয়, তখন সেই দলটির মনোভাব হওয়া উচিত: আমরা এক দেশ, এক জাতি এক পরিবারের মানুষ। এই মনোভাবটাকেই ভারতীয় হকি ফেডারেশন ভেঙ্গে দিয়ে দলের মধ্যে গড়ে তুলেছে প্যান্টা আরেকটি দল। এর শুরু ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিককে কেন্দ্র করে। রোম অলিম্পিকে দলের নায়ক কে হবে এই প্রশ্ন নিয়েই শুরু হলো কোন্দল। দলের নায়ক হওয়ার একমাত্র দাবিদার পশ্চিম বাংলার লেসলী ক্লডিয়াস ক্লডিয়াস ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতীয় হকি দলকে শুধু প্রতিনিধিত্ব করেই আসছিলেন না, ওর সমকক্ষ রাইট হাফ তখনও দুনিয়াতে ছিল না। ক্লডিয়াস যেহেতু পশ্চিম বাংলার সেহেতু তাকে কিছুতেই দলের নায়ক করা হবে না এই জিদই ধরে রইলো হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের একটা অংশ। ওই অংশ দাবি তুললো পাঞ্জাবের উধম সিংকে দলের নায়ক করতে হবে। উধম সিংও সিনিয়রিটির দিক থেকে ক্লডিয়াসের সমকক্ষ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু উধম সিং প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৫৮ সালেই অস্ত গিয়েছেন। তাঁকে আর জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তই করা যায় না। সেই অবস্থায় বলা যায় একজন বিদায়ী খেলোয়াড়কে জোর করেই দলনায়ক করতে হবে বলে জিদ। অবশ্য শেষ, পর্যন্ত ক্লডিয়াসই অধিনায়ক হলেন। উধম সিংও দলে রইলেন। আর তার পরিণতি হলো রোম অলিম্পিকে ক্লাডিয়াসকে দেখানো করার জন্যে ভারতীয় হকি দলকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দেশ ফিরতে হলো।

এই তো দলের মধ্যে দলবাজীর শুরু—আর আজ তার পরিণতি মণ্টিল। মণ্টিলে এক অস্ট্রেলিয়ার কাছে মোট ১২টি গোল খাওয়া কি খুব অস্বাভাবিক ঘটনা? মণ্টিলে শোচনীয় বিপর্যয়ের পর কর্মকর্তারা এখন একটা কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করেছেন এই বলে যেও মণ্টিলে ভারতীয় হকির যে-দলটি পাঠানো হয়েছিল, সেই দলটিই তো এক বছর পূর্বে বিশ্ব কাপ জয় করেছে। কাজেই দল নির্বাচনে কোন ত্রুটি নেই।

এই কৈফিয়ৎ মেনে নেওয়া যায় না। কারণ খেলার জগতের একটা বড় কথা হলো Catch the young. কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে তার উল্টোটা। অর্থাৎ Catch the old men. ভারতীয় হকি দলটির গড়পড়তা বয়েস কি ইয়ং-এর পর্যায়ে পড়ে? অবশ্য কর্মকর্তারা বলবেন, হ্যাঁ পড়ে। কেমন পড়ে তার নজির তো জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে এবং সাঁতারে এবার আমরা দেখতে পেলাম।

ভারতীয় হকি দলে আমরা যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে কয়েকজনকে কলকাতার দশ বছর আগেও বেলতে দেখছি। কিংবা ঐ দশক খেলোয়াড় বাইটন কাপেও গত বছর খেলে গিয়েছেন। ওরা যদি একটা জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান তাহলে ভারতীয় হকি দলের রেকর্ড সংখ্যক গোল খাওয়া কি কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার?

আসলে ভারতীয় হকি দলের নির্বাচকমণ্ডলী হচ্ছে কাঠগড়ার আসামী। ওই নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যরা খেলোয়াড় বাছাই পর্বে শুধু দেখে কে ওদের কতখানি পেটোয়া। পেটোয়া খেলোয়াড় হলেই দলে স্থানলাভ। দক্ষ খেলোয়াড় হলে দলে স্থান পাবে না। তা না হলে মণ্টিলে গিয়েও কোচ গুরুবক্স সিং ঐ রকম লম্ফঝম্ফ করেন।

ওই সব ঘটনা তো আছেই তার সঙ্গে যোগ হয়েছে খেলার মান। হকি খেলায় সর্ট কর্ণার বা পেনাল্টি কর্ণার একটি মোক্ষম জিনিস। কিন্তু আজকাল ভারতীয় হকি দলের ব্যর্থতা এই পেনাল্টি কর্ণার হিটেও। পেনাল্টি কর্ণারের বলটি যিনি পুশ করবেন বা ঠেলে দেবেন, যিনি বলটিকে নির্দিষ্ট আয়গায় ডেডিকেট করবেন এবং যিনি বলটি হিট করবেন—এই তিনটি সমান দক্ষতা না হলে পেনাল্টি কর্ণার যতই পাওয়া যাক না কেন কোন সর্টই কার্যকরী হতে পারে না। বল টেলার মধ্যে যদি ত্রুটি হয়, বল ঠিক ভাবে নামানো যাবে না আর তা না হলে হিটও হবে না—এ কথা জানা সত্ত্বেও আমরা দেখছি—পেনাল্টি কর্ণার হিটে বিরাট ত্রুটি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বল টেলা ঠিক মতো হয় না, হলেও ঠিকভাবে বল থামাতে পারে না। এই ত্রুটি ছিল বলেই গুরুবক্স সিং মণ্টিলে বলে হকার ঠাকুরেন—আমি পেনাল্টি কর্ণার সর্টের নতুন পদ্ধতি নিয়েছি। হায় রে গুরুবক্স সিং। তোমাদের হাতে হকির ভার পড়ে তার কি দশা না হলো।

ভারতীয় হকি দলের চরম ব্যর্থতা নিয়ে অনেক বলার আছে। কিন্তু আজ আর সে সব বিষয়ে বাজি না, শুধু এই কথাই বলবো যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় হকি ফেডারেশনের মাথার মণি হয়ে বসে থাকবে এই মুচক্কীর দল ততক্ষণ ভারতীয় হকি দলের কোন সম্ভাবনা নেই। যতদিন না নিরপেক্ষতাবে দল বাছাই এবং Catch the young না হচ্ছে ততদিন ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎও নেই। মণ্টিলের পর মস্কো, এথেন্স কে কত মণ্টিল-মস্কোতে চরম বিপর্যয় হবে তার হিসেবও করা এই মুহূর্তে কঠিন নয়।

এখন প্রশ্ন হলো—মণ্টিলের পর ভারতীয় হকি দলের কী হবে?

বিপ্লব তত্ত্ব

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

যৌন আচরণে যা কিছু রুচিহীন ও উৎকট তাকেই পৌরবান্বিত ও উচ্চমার্গীয় করে তুলে ধরার প্রবণতার মধ্যেই এদের বাহাদুরি প্রকাশ পায়। মাদকদ্রব্য সেবনে, অশ্লীল বাক্যে ও আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, অভ্রভেদী কোলাহলের ইতর উল্লাসে ও হৈ-হুল্লোড়ে এরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের চেষ্টায় মুখর। হিপি, বীটল ও পপ্, গায়ক, এ্যাংরি যুবসম্প্রদায়, হাংরি জেনারেশন, বীটনিক কবি সম্প্রদায় ও ভারতীয় সাধু সন্তদের শিষ্যসাবকের দল—এরা সবাই সেই বিদ্রোহী সংস্কৃতির শিকার। এই সব তরুণেরা যত সাগ্রহে এই পথ গ্রহণ করছে, সম্ভ্রান্ত পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধায়কগণ ততই উল্লাসে ও আনন্দে বুক ফুলিয়ে বসে আছেন। মার্কিউজ এদের প্রকাশকেই সুররিয়ালিষ্টিক কায়দা বলছেন এবং তিনি ভাবছেন যে এরা প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর আঘাত হানতে সক্ষম হচ্ছে।

কিন্তু আসল ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এইসব ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় বস্তুই এই সংস্কৃতির আঁতুর সেঁটে বাচ্ছে, রাষ্ট্রবিধায়কগণ ওদেই মুখবোচক করছেন। কারণ যে ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় প্রবিধক্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে, তাদের যদি এইসব বিচিকল অভ্যাসে, উন্মাদনায়, উন্মার্গগামিতায়, মাদকতায় ও আনন্দজোয়ারে মাতিয়ে রাখা যায়, তাহলে কল্যাণ ও শ্রেয়সের বোধ এবং সৃষ্টিশীল মননক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে, শোষণ, নিপীড়ন ও ক্ষয়ক্ষের চিহ্ন আসৌ আর চোখে পড়বেনা। দ্বিতীয়তঃ সংগ্রামশীল মানসভঙ্গি একেবারে বিনষ্ট হয়ে সমগ্র যুবশক্তি ভিন্ন ভিন্ন সচল মহল্লাপিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে। অনয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, দৃষ্টিমার্গে নাবালকত্ব যত এদের বাড়বে, বিপ্লবের সম্ভাবনা ততই দূর হয়ে যাবে।

এখানে সংস্কৃতি ও ছাত্রবিদ্রোহ সম্পর্কে উদ্ভট আভাস দেওয়া গেল। সুররিয়ালিজম সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যার পরিসর কম। সংক্ষেপে বলা যায়, সুররিয়ালিজম হল স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি ভাঁ, যা শুধু মানুষের অবচেতন মনেরই আত্মার, যা স্বাধীন, শাসনরহিত ক্রিয়া, যার গতি অদ্ভুত, যা সভ্যতাচার বাইরে, প্রকৃতির নিয়ম যেখানে নির্বাসিত। শিল্প-সাহিত্যে এই আন্দোলন একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে।

এক্ষেত্রে মার্কসের বস্তুবাদী সমাজ-দর্শনের মৌল সিদ্ধান্তকে স্মরণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, মানুষের বৈষয়িক বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের উপকরণ তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক জীবন যাত্রাকে সাধারণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রকরণকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে যে ব্যবহারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিম্বা স্বপ্ন-কল্পনার উপর নির্ভর করেনা, উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণের বিকাশের উপরেই তা নির্ভরশীল; সেই উৎপাদনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সমাজে অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈরী হয়। সমাজের এই অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামো, তার আইন কানুন, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, নন্দনতত্ত্বের ধ্যান ধারণা এবং মানব জগত ও চেতনা গড়ে ওঠে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিশেষ শ্রেণীর অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থকে কেন্দ্র করে তা গড়ে ওঠে।

সুতরাং মার্কিউজ সুররিয়ালিজম, সংস্কৃতি ও যুব বিদ্রোহের যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন তাকে সেই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো শ্রেণীস্বার্থ ও দ্বন্দ্বাবার পটভূমিতে বিচার করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সংস্কৃতি ও সুররিয়ালিজমের তত্ত্ব কি মানুষের বাস্তব জীবন, তার উৎপাদনের সম্পর্ক ও ব্যবহারিক জীবনধারণ নিরপেক্ষ ভিন্ন কোন বস্তু? না, উৎপাদনের সম্পর্কভিত্তিক সমাজের আর্থিক কাঠামোর উপরভিত্ত, যার সঙ্গে মানুষের বাস্তব সমাজজীবনের ব্যবহারিক সম্পর্ক মোটামুটিভাবে জড়িত? তা যদি হয়, তাহলে মানুষের বাস্তবজীবন নিরপেক্ষ, শাসনরহিত, অদৃশ্য ও অসম্ভব স্বপ্নময় জগত মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে কতটুকু পরিচালিত করে? এবং এই বিদ্রোহ কিভাবে বাস্তব সমাজজীবনের গতিপ্রকৃতি ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে বদল করে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে? চলতি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে কতটুকু আঘাত হানতে পারবে? সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিরাচরিত আচরণ রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও শুভবোধের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র এইসব মানসিক বিদ্রোহ মৌন ব্যাভিচার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে শাসীন চালচলনকে অস্বীকার করে' এই উৎকট খাপখোলাদিলনা কতটুকু শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্ত রাজনৈতিক গণসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে আগামী ভবিষ্যতে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সক্ষম হবে? বরং এই বিদ্রোহ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হয়ে সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামকে ধ্বংসের প্রয়োজনে সুচতুর রাষ্ট্রনায়কেরা ব্যবহার করবেন। এমন কি এই বিদ্রোহ বা বিপ্লব যদি খাত বদল করে গুলধম, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সশস্ত্র হামলা ও সন্ত্রাসের আকারে উগ্রপন্থার ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলেও কি সেই বিদ্রোহ স্থিতাবস্থার নায়কেরা পুলিশ, মিলিটারি ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াবাদের জোরে ধ্বংস করতে এবং প্রয়োজনমত প্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠন ও সর্ববিধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পিষে মেরে ফেলার জন্ত ঐ উগ্রপন্থাকে উল্টো দিকে লেলিয়ে দিয়ে কাজে লাগাতে পারবেন না? স্থিতাবস্থার নায়কেরা তার উপরে একটা প্রগতিশীলতা ও মানব-হিতৈষণার আলখাল্লা চাপিয়ে দিলে তো আরও ভাল। ফলত স্থিতাবস্থার গণ্ডীর ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে এই প্রকার যাবতীয় বিদ্রোহ পুঁজিবাদী কাঠামোকে আরও শক্ত জমির উপর খাড়া রাখতে সাহায্য করে।

এই হল একদিকের ছাত্র ও যুববিদ্রোহের কথা।' এর ভিন্ন আরও একটি দিক আছে। সে দিক হল সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক গণআন্দোলনে ঘাট ও সত্তর দশকের সমকালীন পৃথিবীতে দেশে দেশে ছাত্র ও যুবসমাজ কিভাবে সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেইসব আন্দোলন কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কি পরিণতি গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

হাংরি মার্কিউজের শিল্প এবং ক্লাশ ও পশ্চিম জার্মানীর বামপন্থী ছাত্র ও যুব আন্দোলনের নেতা অ্যানিয়েল কোহন বেনডিট্ (রেড অ্যানি নামে সুপরিচিত) এবং গ্রেট বৃটেনের তারিক আলি (টেকনিপন্থী ছাত্র নেতা) —এদেরকে পশ্চিম ইউরোপের ছাত্র ও যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে।

১৯৬৮ সালে প্যারিসে হঠাৎ ছাত্রদের সঙ্গে পুলিসের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। এই ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গে ক্রমের শ্রমিক বিক্ষোভ, আর্থিক সংকট ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দরুণ জনগণের ক্ষোভ সংযুক্ত হয়েছিল। এর পরিণতিতে ডগল্ নেতৃত্বের পতন ঘটলেও, ফরাসী ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্ত এই আন্দোলন শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের সমাজবিপ্লবের সার্বিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি'র নেতৃত্ব সেই বিশাল গণ-অভ্যুত্থানের সুযোগ নিতে পারেনি। সেজন্ত নেতৃত্ব, নেতৃত্বের শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কিম্বা গণ-সংগঠনের অভাব—যাকেই দায়ী করা হোক-না-কেন, এই গণ-অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। এর কারণ যুবক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা, সংগ্রামের প্রস্তুতি, বোঝা পড়া, কলাকৌশলের শিক্ষা, আর্থিক যোগাযোগ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রবিধায়কদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর আঘাত দেবার প্রয়োজনীয়তা ও দূরদর্শিতার অভাবের দরুণ এত বড় বিরাট আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

অথচ এই ঘটনার পাশাপাশি আমরা আরও একটা চিত্র পাই। তা হল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবী গণ সংগ্রামে আস্থাশীল, শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামে প্রত্যয়সিদ্ধ একদল ঘষিবিত্ত ছাত্র ও যুবক কিভাবে কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল, গুপ্ত সংগঠন গড়ার কাজে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং গেরিলাবাহিনী গঠন করে কিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ফাশিস্ত শাসনকে ভেঙে ফেলে কি ভাবে সার্বক সমাজ বিপ্লবের পথে এগিয়ে গিয়েছিল সে উদাহরণ এবং সার্বক যুব-আন্দোলনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। ফলে কিউবা থেকে মার্কিন ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণের কালো হাত অপসারিত হয়ে

(বাকীংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

নজরুলের কবিতা ও গান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

চিন্তা, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর জীবন নিয়ে কথা উঠেছে। "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতায় কবি তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। সেই "আমার কৈফিয়ৎ" তাঁকে মুখবার জানবার সহায়ক এক অবিস্মরণীয় কবিতা হয়ে রয়েছে। কবি অসুস্থ হবার পরেও তাঁকে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সেই বিতর্কের জবাব যদিও তাঁর কাছেই মেলে, কিন্তু তাঁর সুদক্ষ মুদ্রাদফর আহমদ রচিত "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা" বিদ্রোহী কবির আদল পরিচয়টিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। এইভাবে নজরুল মানসকে তুলে ধরতে পারার অনেক ভুল প্রচারের অবসান হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে আবার যেন বিতর্ক তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সে বিতর্ক নজরুল মানসকে বুঝতে সহায়ক তো নয়ই—কিছু ধোঁয়া সৃষ্টি করে মাত্র। তাঁর বিদ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ মানবতার বিশ্বাসী মনটাকে বুঝতে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

আজ তাই নজরুল রচনাবলী সুলভে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বড়ই জরুরী হয়ে উঠেছে। নজরুলের পরিচয় তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পর সস্তা, শোক প্রস্তাব হচ্ছে, আরো হবে। তারপর ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে পড়বে। হয়তো তাঁর স্মরণে স্মৃতিসৌধও নির্মিত হতে পারে। আও হয়তো একদিন নিষ্প্রাণ স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু রচনাবলীর মৃত্যু কখনো ঘটতে পারে না। তাই এই মুহূর্তে যা দরকার তা হলো সরকারী উদ্যোগে সুলভ সংস্করণ নজরুল রচনাবলী প্রকাশ। তাঁর গান, গানের রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাঁর রচনাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। একাজ বেসরকারী ভাবে হবেনা, একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সম্ভব।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE Re. 1·00

নজরুল বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতায় ও গানে

কল্পতরু সেনগুপ্ত

কৈশোরে বছর স্মৃতিশক্তিহীন ও নির্বাক থাকার পর ৩১শে আগষ্ট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শারীরিক মৃত্যু হয়েছে।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই পর্যন্ত কাজী নজরুল অসাধ্য উৎসাহে সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি করে গেছেন। বিশ দশকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে বিদ্রোহের কবিতা নিয়ে, বিপ্লবের গান গেয়ে তিনি কাব্য জগতে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশুপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে সকলের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। দেশের বিপ্লবী যুবশক্তি তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল তাঁর ভাঙার গানের জন্য। এই ভাঙার গানেই ছিল নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম কবি, প্রথম গীতিকার যিনি পূর্ণ স্বাধীনতার রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেছিলেন। নজরুলই প্রথম স্বাধীনতার ঋণ কি হবে সে কথা বলেছিলেন: "রবেনা দরিদ্র, রবেনা অসাম্য। সমান অন্ন পাবে নাগরিক প্রাণ।" নজরুলই প্রথম বাংলা কাব্যে শ্রেণী সংগ্রামের বাণী উপস্থিত করেছিলেন তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতা সমষ্টিতে। তার আগে কোন কবি কোন গীতিকার এমন করে শ্রেণীবৈষম্যের কথা বলেননি। শ্রমিক শ্রেণীর আত্মর্জাতিক গানের এদেশে প্রথম অনুবাদক নজরুল।

অবিভক্ত বাংলায় কবিতা লেখার জন্য কারাদণ্ডিত হয়ে সাহিত্যকে সম্মানিত করেছেন নজরুল। 'আনন্দময়ীর আগমনে' তাঁর রাজদ্রোহাত্মক কবিতাটি কেবল নয়, সেই সঙ্গে আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারকের সামনে যে বিবৃতি তিনি দিয়েছিলেন সেই "রাজবন্দীর জবানবন্দী" আমাদের সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে সাহিত্যিকদের।

একজন নিভিক সাংবাদিক হিসাবেও কাজী নজরুলের ভূমিকা বাংলার সংবাদপত্র জগত স্বীকার করবে। নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল একটির পর একটি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নজরুল। বিদেশী রাজার রোষ, কায়েমী স্বার্থের আক্রমণ উপেক্ষা করে সাংবাদিকতাকে জনগণের সেবায় এমন ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন যার তুলনা এদেশে তেমন ছিল না। অর্থাৎ সেবনতি মানুষের সমস্যা, যারা নীচের তলার মানুষ তাদের কথা নিয়ে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার পথ প্রদর্শক বলা যেতে পারে নবযুগ ও ধূমকেতু, পরে লাঙল পত্রিকাকে।

সঙ্গীত জগতে তাঁর যে অবদান তার জন্য চিরদিন তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এই বহুমুখী প্রতিভা বিশ্বোহী কবিকে দেশবাসী উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে স্মরণ করেছে। বছরে বছরে তাঁর জন্মদিন পালন করেছে। জনগণের আন্তরিক ভালবাসার জন্যই বেসরকারী উদ্যোগে ইউরোগে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশ-ভাগের আগে তিনিই প্রথম কবি যিনি সরকারী ভাতা লাভ করেছিলেন। দেশভাগের পরে দুই দেশের সরকারই নজরুলকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। এই স্বীকৃতি কবি হিসাবে অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

তবু মাঝবের মনে প্রশ্ন উঠেছে তাঁর যা প্রাপ্য তিনি কি তার সব কিছু পেয়েছেন। তাঁর ৪ হাজার গানের সব কয়টি গান খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁর গানের রেকর্ডের সব কয়টি খুঁজে পাওয়া যায়না, তাঁর কবিতা ও গানের বিকৃতি সাধিত হয়েছে। তাঁর গান ও কবিতা প্রকাশকদের ঘরে বন্ধক রয়েছে, যার জন্য তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা কেন্দ্র বিশেষে রয়্যালটি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমন কি তাঁকে যেভাবে রাখা হয়েছিল জাতীয় কবি হিসাবে সেটা খুব মর্যাদা-পূর্ণ ছিল না। এসব সমস্যা, অভিযোগ নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল। কিন্তু লেখালেখিও হয়েছিল। কিন্তু সমাধান হয়নি, অথচ দেশবাসীর সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনী দলগুলির যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই সরকারই প্রথম কাজী নজরুলকে রবীন্দ্র সদন উদ্যানে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানালেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রতি বছর রবীন্দ্রসদন উদ্যানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কবির জন্মদিন পালিত হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার কবির মাসোহারার টাকা বৃদ্ধি করেছিলেন। নজরুলের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে একটি সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। এই সম্পাদক মণ্ডলীর মুখ্য সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত। সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ নজরুল সুহৃদগণ এবং প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহম্মদ। যতদূর খবর জানি ডঃ গুপ্ত তাঁর কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে রচনাবলী প্রকাশের জন্য সরকারের উপযুক্ত দপ্তরের হাতে কাগজপত্র পেশ করেছেন। এই ক'বছরে দেশের রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে। সম্পাদক মণ্ডলীর অনেক সদস্য আজ আর জীবিত নেই। কিন্তু নজরুল রচনাবলী সরকারী উদ্যোগে আজ পর্যন্ত প্রকাশ হতে পারেনি। তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় চেষ্টা করেছিলেন কাজী নজরুলকে রাজভবন সংলগ্ন একটি ফ্ল্যাটে রাখতে এবং তাঁর শোবার জন্য দু জন নার্সও মঞ্জুর করার কথা হয়েছিল। কেন এই প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে নি সে অনেক কথা। এখানে তার উল্লেখ আজ আর না করলাম। পরবর্তী অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার কবির ভবন তৈরীর জন্য নজরুল এভিনিউতে জমি দান এবং ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। আন্তরিকভাবে এই জমিতে ভিত্তি স্থাপনও হয়েছিল কবিকে এনে।

তারপরে রাজনৈতিক আবর্তে ঘটনা অন্যখাতেপ্রবাহিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান কবলমুক্ত হবার পর কবিকে দুই বাংলার বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। সেই থেকে তিনি সময়ে সেখানে ছিলেন। ঢাকায় তাঁর ভিন্নখণ্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তার রয়্যালটির টাকাও কবির উত্তরাধিকারীরা পেয়েছেন শুনেছি। তাঁর অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত বহু লেখা ও গান ঢাকায় সংগৃহীত হয়েছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে এসব কাজ হতে পারে না। আমাদের এখানেও এসব কাজ হতে পারতো। যাঁরা নজরুল সম্পর্কে উৎসাহী তাঁরা বারবার চেষ্টাও করেছেন।

কবি যখন সৃষ্টিশীল ছিলেন তখনও তাঁকে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর

(শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

মুখ চাই মুখ

ট্রেনের কামরায়, বাসের ভীড়ে মুখগুলি লক্ষ্য করেছেন?

বিবর্ণ মুখ, চোখে মুখে চিন্তার রেখা। কখনও কখনও হয়তো হাসির ঝিলিক দেখে ঠোঁটে হাসি আসে, পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। চিন্তা গ্রাস করে আনন্দকে।

এই সব মনের ভেতর পৌঁছতে অনেক মফরৎ দরবার। সিনেমা, নাটক তবু চলে। রাজনীতিও অচল নয়। কিন্তু শহর উন্নয়নের ভাবনা? যার বাড়ীতে শান্তি নেই, তাকে যদি বলা যায় যে সি. এম. ডি. এ. এ পর্যন্ত ২০টি রাস্তা চওড়া করেছে বা ৩ কোটি গ্যালন জল বাড়িয়েছে বা ৭ মাইল ড্রেন তৈরী করেছে, তবে কি আশা করবো যে তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনবেন বা হাসবেন।

হয়তো মনের জ্বালা মেটাতে একটা কটুক্তি করে বসবেন—এমন কি ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেনের নাম করেই গালটা দেবেন।

এটা বোঝা যায়। এটা ঠিক দোষের নয়। মানুষের মনের ভেতর প্রবেশ করতে হলে মনের মত কথা বলতে হয়।

সি. এম. ডি. এ ঠিক মনের মত কথা বলতে পারছে না। তবে কতকগুলি কাজের মত কাজ করছে। আরও করবে।

কলকাতার লোক না হাসলেও আমরা তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে আছি।

মুখরাখি রেডিও

শরৎ এসেছে আলো হাসি গান
আর উৎসবের বারতা নিয়ে
এই আনন্দ-লগ্নে গ্রহণ করুন
মুখরক্ষির শুভেচ্ছা

বেঙ্গল প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ● পাটনা ● কটক ● গৌহাটী ● জামসেদপুর

BEGVAS/787

সম্পাদক—ধীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক নিউ গ্রাফিক প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫ জুকেস লেন কলিকাতা থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৯শে অক্টোবর '৭৬ ॥ ৪০

চাষনালার পর সুদামদিহি

বারবার দুর্ঘটনা কেন ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চাসনালা দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই ঘটল আবার এক খনি দুর্ঘটনা। এবার দুর্ঘটনা ঘটেছে রাজবাড় থেকে মাত্র পনেরো কিলো-মিটার দূরে সুদামদিহি কয়লা খনিতে। এখানে মৃতের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। আহতও হয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক শ্রমিক। কিন্তু চাসনালা খনি দুর্ঘটনার মৃতের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে সুদামদিহি খনি দুর্ঘটনার মৃতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু কিছু আহত শ্রমিকের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। যদিও দুর্ঘটনা মাঝরাত্রিকে কিন্তু সুদামদিহির ঘটনা আরও মর্মান্তিক এবং অঞ্চলবাসী। কারণ, পূজার ছুটির শেষে সেই দিনই শ্রমিকরা আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, সুদামদিহির এই দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত হবে। যেমন হয়েছিল চাসনালার ক্ষেত্রে। সুদামদিহি খনির তদন্তের ভার ইতিমধ্যেই অর্পিত হয়েছে শ্রীএইচ সি সারিনের ওপর। তাছাড়া নিহত ও আহত শ্রমিকবর্গের প্রতি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও বিভিন্ন মহল থেকে শোনা গেছে। কেন্দ্রীয় শক্তি রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে দি পন্থ বলেছেন যে, দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক পরিবারের থেকে একজনকে কাজ দেওয়া হবে এবং আহত শ্রমিকদের জন্য হালকা কাজের ব্যবস্থা করা হবে। এসব প্রতিশ্রুতি মানবিক কর্তব্য। বর্তমানে খনি যখন সরকারী নিয়ন্ত্রণে তখন এসব বিষয়ে কোন প্রশ্ন না ওঠাই স্বাভাবিক। শুধু দেখা দরকার প্রত্যেকে তাদের প্রাপ্য ঠিকমত পাচ্ছে কিনা। একের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ যেন তাদের ঠকাতে না পারে। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে বিগত বছর চাসনালা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে। অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপন্থ শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, অবিলম্বে খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে সরকার প্রখর দৃষ্টি রাখবেন। শুধু দুর্ঘটনায় মৃত্যুতেই নয় নানা অসুবিধাকেও যাতে শ্রমিকরা তাদের মনোবল না হারায় সেদিকেও সরকার দৃষ্টি রাখবেন। শ্রীপন্থের এই আশ্বাস-বাণী শ্রমিকদের কতটা আশ্বস্ত করতে সক্ষম হবে তা নির্ভর করছে সরকারী নীতি নির্ধারণের ওপর। শ্রীপন্থ অবশ্য একথাও বলেছেন, সরকারী নীতি হল, আগে শ্রমিকদের নিরাপত্তা পরে উৎপাদন বৃদ্ধি। যদি শ্রীপন্থের উক্তি সত্যিই বাস্তবে রূপ নেয় তবে হয়ত ভবিষ্যতে আমরা খনি দুর্ঘটনার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার হাত থেকে চিরতরে রেহাই পাব।

কয়লা খনিগুলি যখন বেসরকারী পরিচালনাধীনে ছিল, তখন খনির মালিকদের অব্যবস্থা এবং অবহেলাই দুর্ঘটনার কারণ বলে আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু এখন কয়লাখনিগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে। তাই অবহেলা বা অব্যবস্থার প্রশ্ন না ওঠাই স্বাভাবিক বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু বিগত চাসনালা দুর্ঘটনার কয়েকমাস আগে দুর্ঘটনা ঘটার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সত্ত্বেও এঘটনা ঘটেছে। আবার ঘটল এই সুদামদিহি খনি দুর্ঘটনা।

শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন আছে এবং সেই সব আইন ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্যও আলাদাভাবে একটি দপ্তর আছে। এসব সতর্কতা সত্ত্বেও যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, বিধি ব্যবস্থার কোথাও নিশ্চয়ই ফাঁক রয়েছে।

শ্রীপন্থ অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তদন্তে যদি কেউ দোষী বিবেচিত হন তবে দোষী ব্যক্তিকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের বিগত অভিজ্ঞতার আমরা দেখেছি

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

ব্যাভিচার চক্রান্ত রাজনৈতিক খুন

মার্কিনী সাম্রাজ্যের একটি চিত্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ক্যালিফোর্নিয়ার সুন্দরী, যৌবনবতী এক পোশাকী পতিতা যদি করে বলত যে, আমি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি এবং মার্কিনা গোষ্ঠীর নেতা স্যাম জিয়ানকানা—এই দুজনেরই শয্যাসঙ্গিনী হয়েছি। উল্লিখিত দুজনেই আততায়ীর হাতে নিহত। সেই সঙ্গে সেই পোশাকী পতিতাটিও রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ। নাম তার জুডিথ ক্যাম্পবেল। তবে সন্দেহ করা হয়ে থাকে যে, জুডিথের নামও সেই শক্তিশালী কিন্তু অজ্ঞাত খুনী দলটির খুনের তালিকায় ছিল যারা প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং মার্কিনা সর্দার জিয়ানকানাকে হত্যা করেছে।

কেউ জানেনা জুডিথ জীবিত না মৃত। এ তথ্য অজানা রয়ে গেছে আমেরিকার উৎসুক জনতার কাছে।

কোন কোন মহলের ধারণা যে, মাফিয়া প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যার যড়যন্ত্র বিউরোর গুপ্তচর বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত। এ ঘটনা হল কিউবার গুপ্তচর বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত। এ বিষয়টি ওয়াশিংটনের সিনেট কমিটিকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কমিটি এ বিষয়ে জিয়ানকানাকে প্রশ্ন করবে বলে ঠিক করে। কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন হবার আগেই মাফিয়া সর্দার জিয়ানকানা তার চিকাগোর বাড়ীর অঙ্গনে নিহত হলেন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে।

কে খুন করল জিয়ানকানাকে ? এটা কি সিয়ার কাজ না মাফিয়া গোষ্ঠীর ?

এ বিষয়ে চিকাগোর কুক কাউন্টির জেলা এটর্নির মন্তব্য হল, "এমন কোন তথ্য বা প্রমাণ নেই যার দ্বারা প্রমাণ হতে পারে যে এ কাজ সিয়ার। বরং এই হত্যা মাফিয়া দল দ্বারা হয়েছে একথা বলার মত যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। জিয়ানকানার মৃত্যু যাতে তার প্রাক্তন সহকারী ব্লাসিকে তার সঙ্গে দেখা গিয়েছে।"

ব্লাসি সে কথা স্বীকার করে বলেছে, "আমি আমার প্রাক্তন সহকর্মীর সঙ্গে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছিলাম। আমি যখন যখন চলে আসি তখনও জিয়ানকানা জীবিত ছিল।"

কেনেডি হত্যার পর সিয়ার নির্দেশে জিয়ানকানাকে চলে যেতে হয় মেক্সিকোতে। সেখানে জিয়ানকানা থাকত খুব আয়েসী চালে। সেখান থেকেই সে মাফিয়া গোষ্ঠীর কাজ পরিচালনা করত। কিন্তু তার বোকামির জন্য সে শান্তিতে থাকতে পারল না।

সিয়ার নির্দেশে তাকে ফেরৎ আসতে হল চিকাগোতে। গল্পপ্রিয় জিয়ানকানা অতিরিক্ত কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল। সেই অভ্যাসের কারণে সে ভুল করে দু একটা বেফাঁস কথা বলেই কাজো হত্যার যড়যন্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

এইসব ঘটনার পর সিয়া জিয়ানকানাকে একঘরে করে দিল। তখন জিয়ানকানা পাগলের মত চীৎকার করে বলে বেড়াতে লাগল যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে সে নিজেও জুডিথ ক্যাম্পবেলের দেহ উপভোগ করেছে। আরও যে সব গোপন তথ্য জিয়ানকানার জানা ছিল সেসব ঘটনা ফাঁস করবার আগেই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। অনেক কর্মের নায়ক জিয়ান-কানাকে প্রাণ দিতে হল আততায়ীর হাতে।

সিয়া জিয়ানকানাকে ব্যবহার করেছিল কিন্তু কাজো হত্যা যড়যন্ত্রে। কিন্তু জিয়ানকানা কাজোকে গুলী করে হত্যা করার পক্ষপাতী ছিল না। তার পরিকল্পনা ছিল কোন রকম ভাবে কাজোর খাদ্য বা পানীয়তে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেলা। এবং এজন্য সিয়ার প্রয়োজন বিভাগ এক ধরনের বিশেষ বিষবড়ি তৈরী করে। সেই বিষবড়ি চোরাপথে কিউবায় নিয়ে যায় জনী রোসেলী নামক এক মাফিয়া সদস্য। কিন্তু সিয়ার এই পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে জনী রোসেলীকেও অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়।

সিনেট কমিটি এখন যে প্রশ্নগুলির উত্তর চায় সেগুলি হল—

(১) কাজো হত্যার যড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি মাফিয়াদের অসম্পূর্ণ সহযোগিতা ?

(২) ব্যর্থতার কারণ কি এই যে তারা কিউবার গুপ্তচর বিভাগের কাছে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল ?

(৩) ব্যর্থতার কারণ কি মাফিয়াদলের দুজনো নীতি ? সিয়ার সঙ্গেও সহযোগিতা এবং বিউরোর গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গেও সহযোগিতা ?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত একমাত্র জিয়ানকানা। সে তো মৃত। আততায়ী তাকে পেছন দিক থেকে মাথায় এবং মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য আরও পাঁচবার তার দেহের বিভিন্ন জায়গায় গুলী করে। অকথ্যায় জিয়ান-কানা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এখন সিয়ার একমাত্র ভরসা হল জুডিথ ক্যাম্পবেল নাম্নী পতিতাটি। যদিও তার কোন খোঁজ নেই কিন্তু সিয়ার কাছে এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণও নেই যে সে মৃত। তাই সিনেটের অনুসন্ধানকারী দল ক্যালিফোর্নিয়া তোলপাড় করছে জুডিথের সন্ধানে। যদি তারা জুডিথকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে সফলতা তাদের আয়ত্ত হওয়া করবে। সিয়ার গোয়েন্দারা হয়ত জুডিথের বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ খুঁজে পাবে, কিন্তু আততায়ী থেকে যাবে অজ্ঞাত। ঠিক যেমন জিয়ানকানা বা জনী রোসেলীকে মরতে হয়েছে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সঙ্গে জুডিথের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল গায়ক ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা। তাকেও সিনেটের সন্দেহের তীরে হতে হয়েছে, কারণ লাস ভেগাসে মাফিয়া গোষ্ঠীর জুয়ার স্বর্গরাজ্য সিনাত্রার খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কে জানে হয়ত এই গায়ক ফ্রাঙ্ক সিনাত্রাকেও অকালে প্রাণ দিতে হবে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। যে কারণে মরতে হয়েছে জিয়ানকানাকে, নিখোঁজ হয়েছে জুডিথ। সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে আজ সিনাত্রা।

কৃষি পণ্যের দাম বাড়ছে কেন ?

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ভারতের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। এই অর্থনীতি আজ এমন পর্যায়ে যে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রতিটি নাগরিক "মূল্য কমাও", "মূল্য কমাও" বলে প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ গুঞ্জন করে চলেছেন। পাঁচ বৎসরাধিক কাল থেকে এই প্রবল গুঞ্জনেও কিন্তু কোন কোন জিনিসের মূল্যস্তর ক্রমাগতে বেড়েই চলেছে।

কেন এমন হচ্ছে ? বর্তমান সমাজ কাঠামোকে ভিত্তি করে যে রাষ্ট্রের গঠন তাতে এটাই স্বাভাবিক নয় কি ? তবু এই রাষ্ট্রের পক্ষেও জনগণের কাছে এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ কিছুটা লাঘব করা সম্ভব হবে যদি দুইকোণায় একটু অন্যদিকে নিবদ্ধ করা যায়।

তাতে বর্তমান জরুরী অবস্থা চালু হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই দেখা যাচ্ছে একদিকে সাম্যভিত্তিক ব্যবস্থা দুর্বল করে আনার একটা কঠিন প্রচেষ্টা অপর দিকে শিল্প গোষ্ঠিকে সন্তুষ্ট করে তোলার প্রয়াসে বিশেষে যন্ত্রানি শুল্ক ও যন্ত্রপাতে উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি অনেক তুলে

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য ব্যবসা

শংকর বসু

বইয়ের আড়তদার মহাজনদের যাঁটি এদাকা যে কলেজ ষ্ট্রীট পাড়া বা বইপাড়া একথা হরি বুদি অধি জানেন। বই বোচেবই, ছেড়নীচেড় এবং নানান রচনাবলীর প্রবল বিপুল বক্তাও যে বইওলার তুলা নয় অজ্ঞাবধি এ তথ্য সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। বইওলার নাইক নভেলের এক একটা বইয়ের বিক্রী সম্বন্ধে তৎকালীন লর্ড সাহেবের ভাস্ত ত্রিশ হাজার কপি বিক্রী। এ জাতীয় বইয়ের বাজার সিরিজিতে সাঁওতালদের ছাড়া পরবের মেলা, রওতল গাজীর (এলাচি) বড় গাজীর মেলা (মুটিয়ারী শরীফ) রানের মেলা (বারুইপুর) থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলা মফঃস্বলের নরম মাটি আমরুল অধি। কলকাতা শহর, শহরতলী, বস্তি অঞ্চলে গ্রাম্যমান এই সব 'লক্ষীর পাঁচালী', 'বেহুলা' 'বনীকরণ' 'ধারাপাত'···চাই···ই ··· । সাথে সাথে কপাট খুলে জানলার পাল্লা সরিয়ে বেরিয়ে আসে শাঁখা পরা মেয়েলি হাত, এই লক্ষীর পা যে কোন গ্রাম্য মেলায় রওতল্লে মশাটকে এ জাতীয় বই আপনার নজর কেড়ে নিতে পারে, সেখানে 'আপনি'র স্থলে ছাপা আছে 'কেপনি', 'বেনী' এই শব্দের স্থান বলপূর্বক দখল করেছে 'দুবি'। এ জাতীয় বইয়ের অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা: সতীনের ছেলে, যৌবন এলো যে, সচিত্র কোকশাস্ত্র, লতা পাতার গুণ প্রভৃতি।

এ বিষয়ে অবতারণা শুধু এ কারণে যে সম্ভাবনার অন্ধ দিকেও কি ধরনের অন্ধকার বাইরের মতো চিৎপাত হয়ে ঝুলছে সেটি প্রত্যক্ষ করা! অথচ বটতলার বইয়ের সেই সব পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ অন্নত সাহিত্যের পাঠক হয়ে উঠতে পারতেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। অন্যদিকে অনরুচির কদমাবেশ ঘটে বিচিত্র খিচুরি রচনে অনাসক্ত লেখকদেরও একটা সরল নির্ভরযোগ্য কুল মিলতে পারতো। কিন্তু সে গুড়ে বালি, অশথ্যে অনন্ত মুদ্রণ প্রমাদ সহ ছাপা 'ম্যাজেলের বিয়ে' জাতীয় ধারাপাত সাইজের চারপাতার কাগজ, পায়ে মুতুর বাধিয়ে, সুর করে, কাহিনী ব্যাখ্যা করে ক্যানিং লাইনেতেওার, কৃষক, দিনমজুর, ঠিকে ঝি, আর ক্লাশ ফাইভের ছাত্রের হাতে পৌঁছে দেয় কোন একজন ভোলানাথ।

বটতলার সাহিত্যে থাকে নিষিদ্ধ প্রণয়, অলৌকিক কাণ্ড ভূতুড়ে ব্যাপার, আর কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ার পাকা ব্যবসায়ী কর্তাকে কেরে ছেপে দেয় কয়েন শতকরা ৫০ ভাগ দৈন টানাহাঁচড়া, ১০ ভাগ বিক্রয়, ১৫ ভাগ আবু'নিকতা আর বাকিটা যোজকার গেরস্থালী কথাবার্তার টুকিটাকি। নায়ক নায়িকার জীবন দর্শনের (যা লেখকেরও বটে) গভীরতা না থাকার চেয়ে বড় কথা এমন সব ভাব ভাবনার অনিবার্য উপস্থিতি যা সবরকমের দায়িত্বহীন আচরণকেই সমর্থন করে। এই সব ওড় যা এরা আকছার বাইরে থেকে আমদানি করছেন, কোথাও কোথাও নির্ভেজাল টুকে দিচ্ছেন, সেগুলো অবিশ্যাস্য হয়ে ওঠে এজন্যে যে এসবের কোনটাই সংশ্লিষ্ট লেখকের সত্যিকারের দর্শন নয়, দর্শনের ভাণ মাত্র। দায়িত্বে বয়ানীন অবাগাম প্রত্যেকটি, ছুতাকী দিনের সমর্থক বলে এগুলো সহজে লুফে নেওয়া হয়।

এবছরে হাতে গরম উপন্যাস এক ১৩৮০ সনেই ছাপা হয়েছে ১৯০টি। যার মধ্যে বেশ পত্রিকার (সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১) মতে উল্লেখযোগ্য ৮৯টি। আপাততঃ এ বিষয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে সচেতন শিল্পীর (উন্নততর জীবনের জন্যে যাঁরা সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী) সমস্যা অনুধাবনই লক্ষ্য তথাপি এটুকু বলা অনন্তক যে ব্যাণিজ্যিক লাভ বাদ দিলে এর মধ্যে পাঁচটির বেশী উত্তরোগমি। 'এমন বই লেখা ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠেছে যা একই সঙ্গে ভালো ও জনপ্রিয়।' (কালের পুতুল—বুদ্ধদেব বসু) আমার ধারণায় এই রূপ কাজটিই সচেতন শিল্পীর কৃত্য। এ কাজের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যা আর্টের ব্যাকরণ নিয়ে এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। কিভাবে এ কাজের উপযোগী পেশাদার (বা খোলটাইমার) পেতে পারি সেটিই বিবেচ্য হওয়া উচিত।

একদিন নদী শুকিয়ে যাবে, এই আশঙ্কার কোন একজন মানুষ ক্ষণাগত জল বয়ে আনছিলেন চামড়ার থলে ভরে গ্রামের ভিতরে। কবীরের চোখে ধরা পড়ল কাণ্ডখানা:

"পানি পিয়াওত ক্যা ফিরো
ঘর ঘর সারর বারি
তৃষ্ণাবন্তে যো হোয়গা
পীবৈগা ঝক্‌মারি।"

সব কথার সার হল এই রসবোধ। অনন্ত তিয়াস। এই তৃষ্ণা থাকলে ঘুটা সাচ্চা বাছাই করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। নিছক কারিগরি, নকলনবিশীর দিনও শুবরই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। রসিক, শিল্পী, সমালোচকের প্রাথমিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই তৃষ্ণাটি জাগিয়ে তোলা। যাতে ষ্টাটের ফসফরাস চোখ ধাঁধালেও ধাঁধানিটা আপসেই কেটে যায়। সচেতন দাবী লোহার মতে থাকে প্রয়োজনের উপলব্ধিতে। এখন চতুর্দিক ব্যাপ্ত এক নিষ্ঠুর উদাসীনতা। এই উদাসীনতা হয়তবা খানিকটা বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশজাত। কিন্তু এখানেই প্রজ্বলিত হওয়া উচিত আমাদের নির্ভেজাল ক্রোধ, নিষ্ঠা, মনন।

এই মনোভাবের ভিত্তিতেই আমাদের বিবয়াগ্রস হতে হবে। সম্ভাব্য করে তুলতে এক মহত্তর সৃষ্টি যা এক হতাশাগ্রস্ত জীর্ণ জীবনের মোহপাশ ছিন্ন করে আগ্রহী হবে, ব্যগ্র হয়ে উঠবে জীবনের মঙ্গলমন্ত্র বাজাতে। সমস্ত জীবভার বিরুদ্ধে উচ্চাবিত হবে আমাদের নাড়ি। রোপিত হবে ঋজু কাস্ত শাল বৃক্ষ। এই রোপণ কার্যে মৃত্তিকার উর্বরতা, জলদান, আগাছার নির্মূলীকরণ এসবই আমাদের করণীয়।

মুক্তধার প্রসঙ্গ বদলে নেওয়া যাক। আগের কথার জের টেনে বলা যাই যে শিল্পচর্চার ব্যাপারটিকে প্রথমতঃ নেশা, সখ, খেয়াল ইত্যাদির স্তর থেকে উন্নীত করতে হবে একটি দায়িত্বশীল কাজের স্তরে। এবং ব্যাপারটা মোটেই বধ দেখা এবং বলা বেচার মতো নয়। অনেকটাই অর্জনের লক্ষ্য ভেদের মতো; যে চোখ পাখিটিকেও দেখেনা, দেখে পাখির চোখ। আর একাজ দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হলে একজন লেখককে লিখেই 'বেঁচে থাকতে হবে। তার বেঁচে থাকার সেটিই খনিষ্ঠ প্রকাশ। দেখা যাক এই সম্ভাবনার হাল হালত কি।

বড়বাজারে মাড়োয়ারির খাতার শুধুমাত্র টাকার অঙ্ক বসিয়ে যেতে পারলেই শালিখালাদের সঙ্গে একটা নিয়মিত মাসকাবারী রফা হয়। কিন্তু বাজারের বরাদ্দ থেকে প্রোটিন ছেঁটে ফেলে, কাগজ খালি এবং চা চায়-মিনারের বন্দোবস্ত করে টুপানী বা অন্যকোন উদ্বৃত্তি হাবানের কুঁকি নিয়ে একান্ত ক্লান্ত মস্তিষ্কের অরুণ অপব্যয়ের যে তার শতাংশের কণামাত্র ফুটবে না, এ ভবাজান প্রায় প্রত্যেক কমিটেড লেখকের কাছে বহাল তবিয়তে বর্তমান।'

এই শিরোণা শিরোধার্য করে অগত্যা অগত্যুত্থা, আত্মঘাতী সংগ্রাম, বা অযৌক্তিক একদেশদর্শিতা। পরিত্রাণের অন্য পথ কোরানী বৃত্তি আশ্রয়। প্রথমটির ফল, খনিষ্ট সংবেদনশীল কতিপয় বন্ধুর বিস্ময় এবং বিশদ। এবং বঙ্গজ রুচির কৌলীন্য যেবেতু একমাত্র প্রতিভাধানের প্রাপ্য, সুতরাং অন্যপর 'মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই' জাতীয় ইষ্টসাভই সম্ভব। যদিচ আমাদের শিল্পবোধ ও রুচির উৎকর্ষতা সন্তানবার পিঠে হালকা সমর্থনী চাপড় মারার কখনও কুণ্ঠিত হয়নি। এক মুকাজ এবং একজন মাণিক বন্দোপাধ্যায় দৃষ্টান্ত হিসেবে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। তবে সামাজ চেষ্টাই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যবর্তী সম্ভাবনার প্রভূত নজীর আবিষ্কারে যে সক্ষম হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা স্বল্পে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরম্ভ হয়েছেন অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার তাঁদের তালাক দিলে এই বাম উর্বর মৃত্তিকার গর্ভ যে কেবলমাত্র সম্ভাবনা ধারণেই সিদ্ধ এই অদ্ভুতপূর্ব আহ্লাদে অন্তঃপর শরণাত্মার থৈ ছেটানোই শ্রেয়।

বলা বাহুল্য লেখকের জীবিকার জিম্মাদিতা দেখা এবং লেখকের সর্বনাশের পক্ষেই শ্রেয়ঃ রায় দিয়ে থাকে। জীবিকা হিসেবে লেখাকে গ্রহণ করার প্রশ্নে সন্দিহি ব্যক্তির ক্ষমতার প্রশ্ন শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক নয়, প্রথম অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা জন্মাবস্থায় থাকলেও সেটি বিকশিত হওয়ার অন্তত একটা অনুকূল অবস্থা প্রয়োজন। আপাততঃ কেবলমাত্র লিটল ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য বামপন্থী পত্র পত্রিকা সহ যে ক্ষেত্র সেখানে এই দাবীর ন্যায্যতা এবং সম্ভাবনাই বিচার্য।

অন্ন যে কোন মানুষের মতো খেটে খাওয়ার তার এই দাবীর ন্যায্যতা যে কোন আবিভৌতিক কারণেও নস্যাৎ করা সম্ভব নয় সে নাস্তীজ্ঞান আমাদের সন্দাগ। উপরন্তু বামপন্থায় দর্শনের সঙ্গে দারিদ্রের পরিপূরক সম্পর্ক আমাদের সৃজনশীলতা কোন জন্মে আবিষ্কার করে বসে আছে। সর্বোপরি লেখকের ঘাম এবং দারিদ্রের প্রশ্ন তো আছেই।

যে যুক্তিতে মুনাফাভোজী মালিক মজুরের শ্রমশক্তির যোগান বন্ধকর্ণে নামমাত্র রসদের বন্দোবস্ত করে সেই নির্মম লালসার মুহূর্তপিতা চূড়ান্ত বিচারে ঘৃণ্য। এ সন্দেহে সংগত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজ্ঞতার মহার্ঘ সঞ্চয় এবং মস্তিষ্কের বিপুল নিপুণ চালনা যে বস সৃষ্টি ওরে বিনামূল্যে তার স্বাদ পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মানসিকতা যে অসীম উদার উদাত্ত হবন করে তা লুণ্ঠনের নামান্তর। লেখকের লেখক হিসেবে বেঁচে থাকার, রুটি রুজির ব্যবস্থা করার বিরুদ্ধে সর্বশেষ এবং মোক্ষম অস্ত্র হল অক্ষমতা।

এই অক্ষমতা একমাত্র সম্পাদকের নয়, লেখকের নিজেরও বটে। জীবিকা হিসেবেও লেখাকে নিজস্বনী গঙ্গার তুল্য ভাষার মতো শক্তি এবং সাহসের খাতিত লিটল ম্যাগাজিনের প্রায় সমস্ত বামপন্থী লেখকের মধ্যেই বর্তমান। শক্তির বা ক্ষমতার প্রশ্ন একেত্রে সর্বাগ্রগণ্য নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সংকোচ এবং দ্বিধা, সংশয় জাতীয় কুলবধূসুলভ আচরণ বাদ দিলে আলোচনার সূত্রপাতেই গণ্ডী এবং প্রেক্ষাপট নির্ধারিত থাকার অভ্যপর অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা সম্পাদনা করে থাকেন নিয়মিত এবং অনিয়মিত বহু লিটল ম্যাগাজিন। এবং তাঁদের উত্তর পূর্বনির্ধারিত অক্ষমতা। একেত্রে বক্তব্য এই-মাত্র যে অক্ষমতা মুক্তির পদ্ধাধিকারী নয়। অর্থাৎ, প্রেসের পাওনা এবং কাগজের দাম মিটিয়ে যদি পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহলে বক্তব্যগা লেখকের বেলায় উদ্বৃত্ত হত হতে বাধা কোথায়? আরও আধিক চাপ সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই কিন্তু ভালোত্বের আর একটি ধাপ ভিত্তিতে যাওয়াও সম্ভব হবে। অন্যথায় আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই প্রাচীন প্রবাদে—শিল্পচর্চা এক করে আমীর। আর করে ফকীর।

অন্যদিকে একবার এই দায় স্বীকার করে নিলে পত্রিকা প্রকাশের মানসিক ব্যাধি মুক্তি সম্ভব, নেশা এবং খেয়ালের স্তর থেকে তা অবশ্যই উন্নীত হতে পারে সত্যিকারের একটা কাজের স্তরে যার দায় এবং দায়িত্ব বর্তমান। এক দিকে তাতে যেমন বালখিল্য পাঁচ বন্ধুর ঔক উদ্যোগ, এবং সাতজন পাঠকের অন্তরোধ উপরোধে চলিচ্ছ বোদ্ধা ব্যক্তি

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সৃজনী প্রতিভার আধার মাও সে তুং

মার্কসবাদী

স্তালিন একদা লেনিনবাদকে চিহ্নিত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী যুগের মার্কসবাদ বলে। লেনিনবাদ মার্কসবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো মতবাদ নয়। মার্কসবাদেরই এক বিকশিত সমৃদ্ধ রূপ। মার্কস-এর সময় অনুপস্থিত নবোদ্ভূত এক সমাজব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে লেনিন এই বিকাশ সাধন করেছিলেন। মার্কসবাদকে তিনি তিনটি মূল উপাদানে ভেঙে দেখিয়েছেন। দর্শন অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ—এই বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত বলেও মার্কসবাদ একটি সামগ্রিক রূপের মতবাদ যার উদ্দেশ্য হল শ্রমিক শ্রেণীকে প্রয়োজনীয় 'এমন এক হাতিয়ারে সজ্জিত করা যাতে সে মুক্তি পথের নিশানা না হারায়। কিন্তু এই মুক্তিপথের জয়যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হলে সমাজবিকাশের বাস্তব গতি প্রকৃতিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে এবং গ্রাহ্যের মধ্যে রেখেই তা করতে হবে। আর সমাজবিকাশের ধারা যেহেতু অতি বিচিত্র, অতি জটিল এবং অসমাজিক, তাই স্থানকাল ভেদে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগে তারতম্য দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। এর ফলে সে তত্ত্বের ক্রমবিকাশও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিকাশ সাধন মানে সংশোধন করা নয়। বিকাশ মূল ভিত্তিটাকে অবলম্বন করে তাকেই এগিয়ে চলে, সংশোধন মূল ভিত্তিটাকেই বরবাদ করে দেয় বিকাশের নামে। সাম্রাজ্যবাদী যুগে লেনিন মার্কসবাদের প্রয়োজনীয় বিকাশ সাধনই শুধু করেননি, সেই সংগে বিকাশের নামে সংশোধনের সমস্ত হীন প্রচেষ্টাকেও তিনি যাচাই করে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত এবং চূড়ান্ত রূপের যুগে মাও-সে-তুং ঠিক একই ভাবে মার্কসবাদকে বিকশিত করে তোলেন এবং সমস্ত রন্ধ্রের সংশোধনবাদের মোকাবিলা করে তাকে পথ দেখান।

আসলে মার্কস থেকে মাও সমগ্র চিন্তাধারা এক সূত্রে রচিত। কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই সবটা মিলেই মার্কসবাদের পরিপূর্ণ আধার। মার্কসবাদ যেহেতু এক উঁচু স্তরের বিজ্ঞান তাই আর সব বিজ্ঞানের মতই এই বিশ্বের বিজ্ঞানও প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকতর বিকাশের অপেক্ষা রাখে। মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন স্তালিনের পরে মার্কসবাদের সার্বক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশসাধক রূপেই মাও-য়ের অভ্যুদয়। কাজেই মার্কসবাদের বিশুদ্ধরূপে মাওবাদ বলে একটা ভিন্ন ধারা কল্পনা করতে যাওয়া হাস্যকর। বিষয়টি অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা করে দেখা দরকার।

মার্কসীয় চিন্তাধারা বিকাশের সঠিক হদিস পেতে হলে মার্কস্ এঙ্গেলস্ থেকেই শুরু করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ কমিউনিষ্ট ইশতেহারে মার্কস-এঙ্গেলস অত্যন্ত সাধারণ ভাবে এই সত্য তুলে ধরেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বাগ্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতেই হবে কিন্তু ১৮ ৮৭১ এর মধ্যে ক্রান্সে ঘটে যাওয়া শ্রেণীসংগ্রামগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কস্ এই সত্যেও উন্নীত হলেন যে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করার পূর্বশর্ত হ'ল আমলাতন্ত্র মিলিটারী কলাকল বুর্জোয়া রাষ্ট্র যন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলা। এরপরে প্যারী কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের পর মার্কস্ নিজেই নিজের মতবাদকে বিকশিত করে বললেন, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব যে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াবে সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা পার্লামেন্টারী সাধারণতন্ত্রের জায়গায় প্যারী কমিউনের মডেলের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে। মার্কসের চিন্তাধারা এই ভাবে আরও এগিয়ে চলল বিকাশের পথে। 'ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম'এ মার্কস্ সমাজতন্ত্রের দুই স্তরের অবস্তুজ্ঞাবিভার উল্লেখ করে বললেন, মধ্যবর্তী স্তরের গোটা যুগটা ধরে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী একনায়কত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতেই হবে।

দেখা যাচ্ছে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশ সাধকের ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েছেন মার্কস্ এঙ্গেলস্ নিজেরাই। নতুন সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এদেরই পরাস্ত অনুসরণ করতে থাকেন লেনিন। মার্কস যেকালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেন তখনও পুঁজিবাদ বিকাশের রাস্তায় চলেছে। পুঁজির একচেটিয়া পুঁজিতে উত্তরণের ঝোঁকটা তিনি দেখতে পেলেও সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক ভিত্তি একচেটিয়া পুঁজির সত্যিকারের যুগ সুরু হয় লেনিনের সময়। মার্কসের সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে তাঁরই সাহায্যে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজির আরও বিশ্লেষণ করেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। ফিনান্স পুঁজির দোর্দণ্ড প্রতাপ, পণ্যরপ্তানীর বদলে ফিনান্স পুঁজির রপ্তানীর সমস্ত রহস্য, ফিনান্স পুঁজির জালে জড়িয়ে ঔপনিবেশিক শোষণের অভিনব চরিত্র এই সমস্ত কিছুকে টেনে বের করে তিনি দেখান কীভাবে পুঁজির বিকাশের এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি গোটা দুনিয়াটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে তৎপর হয় এবং কীভাবে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির দল ক্রমে ছোট এবং দুর্বল জাতিগুলিকে নিজেদের পদানত করবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে।

এই ভাবে নতুন এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যকার দ্বন্দ্বের নতুন রূপের সন্ধান দেন লেনিন। এই নতুন অবস্থায় শোষক এবং শোষিত জাতির মধ্যে এক তীব্র দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে। একদিকে বাজার দখল নিয়ে বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ এবং অপরদিকে নিপীড়িত পরাধীন জাতিগুলির মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। লেনিন আরও দেখান যে পুঁজির অসম বিকাশের ফলে সমাজতন্ত্র অসমভাবে বিকশিত হতে বাধ্য এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী জালের যেখানে পুঁজির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠবে সেখানেই আগে ছিঁড়বে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের জাল।

এই বিকশিত তত্ত্বকে রাশিয়ার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে লেনিন এবং স্তালিন একদেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব করে তোলার মধ্য দিয়ে ট্রটস্কীর একঘরে বিপ্লবোত্তর বিপ্লবের অপরিহার্যতার তত্ত্বকে ধূলিসাৎ করে দেন। এ ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কেও মার্কসীয় তত্ত্বকে বিকশিত করে লেনিন বলেন, এই একনায়কত্বের বিশেষ রূপ হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের এক বিশেষ মৈত্রীবন্ধন। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কার্যকরী হতে পারে একমাত্র তার রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে, যে পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে এক বিশেষ চরিত্রের পার্টি হবে। শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীসংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ এমন একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া সেই শ্রেণী তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। এই পরম সত্যকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেও লেনিন মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেন।

মার্কসীয় দর্শনের ক্ষেত্রটিও লেনিনের অবিস্মরণীয় অবদানে বিকশিত রূপ ধারণ করে। দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতির একেবারে গোড়ার কথা, বিরোধী শক্তির ঐক্য ও সংগ্রামের তত্ত্বকে অস্ত্রের করে তিনি দেখান যে বস্তু বা ঘটনার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে অধ্যয়ন করাই হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের মর্মকথা। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের ফলে যখন বিরাট দোরগোল উঠেছিল পদার্থ অদৃশ্য হয়ে গেল বলে, এবং এই অছিলায় সুরু হল বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এক ভাবপ্রসারী মেহাল, লেনিন তখন পদার্থের নির্ভুল সংজ্ঞা উপস্থিত করে মার্কসীয় বস্তুবাদের সপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তার বিশুদ্ধতাই শুধু রক্ষা করেন নি, তাকে অধিকতর সমৃদ্ধির পথেও এগিয়ে দিয়েছেন।

লেনিনের যোগ্য শিষ্য এবং কর্মের সাথী স্তালিন শুধু সমাজতন্ত্র গঠনের বৈষয়িক ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এমন ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। কিন্তু মার্কসবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিকাশ সাধক রূপে স্তালিনের অবদানও সামান্য নয়। জাতি সমস্যা ও আধ্যাত্মিকের মার্কসীয় বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে তিনি মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকশিত এবং প্রসারিত করে গেছেন। এছাড়া এক দেশে সমাজতন্ত্রের গঠন এবং তাকে রক্ষা করার সমস্যার সমাধান করতে গিয়েও তিনি বহু সাধারণ সূত্রের সন্ধান দেন যেগুলো মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়েও মার্কসবাদী তত্ত্বে নতুন এক সংযোজন।

স্তালিনোত্তর যুগে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদী রূপে আমরা দেখতে পাই চীন বিপ্লবের অবিসম্বাদী নেতা মাও-সে-তুংকে। লেনিন সমাজতন্ত্র গঠনকে বহুল মাত্রায় সমৃদ্ধ করে তুললেও দ্বন্দ্ব জিনিষটি নিজেও যে প্রবহমান এবং বিকাশমান এ সম্বন্ধে কোনো তাত্ত্বিক সাধারণ সূত্রাবলী উপস্থিত করে যাননি, মাও দ্বন্দ্ব প্রসংগটি এমন এক তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করেন যেখানে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের আন্তঃ সম্বন্ধ এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্বের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত, এবং জটিল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি দ্বন্দ্বের গতি প্রকৃতি সমস্ত কিছুর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সহজতর হয়ে ওঠে। আধা ঔপনিবেশিক চীনের সমাজ ব্যবস্থা দ্বন্দ্বের যে জটিল রূপ উপস্থিত করেছিল মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোকে তার বিশ্লেষণ এবং সমাধান করতে গিয়ে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করলেন মাও-সে-তুং। সত্তার মূলে রয়েছে দ্বন্দ্ব, পরিবর্তন বা বিকাশের মূলেও রয়ে গেছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমাজ বাস্তবের জটিলতার এত অসংখ্য দ্বন্দ্ব বিরাজমান যে দ্বন্দ্বের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে এমন সূত্র দিয়েই শুধু সে সব সমাধান করা সম্ভব নয়। মাও নতুন আলোকপাত করলেন এমন জায়গাতেই। তিনি দেখালেন দ্বন্দ্বের নির্দিষ্ট রূপের মধ্যেই প্রত্যেক দ্বন্দ্বই আবার বিশেষ রূপ নিয়ে মূর্ত। কাজেই বিশেষ বিশেষ রূপের দ্বন্দ্ব সমাধানের রাস্তাও বিশেষ। যেমন, শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব সমাধানের রাস্তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব; ব্যাপক জনগণের সংগে সাময়তান্ত্রী ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব সমাধানের রাস্তা গণতান্ত্রিক বিপ্লব; উপনিবেশের সংগে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব মীমাংসার পথ জাতীয় বিপ্লব। আবার পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ হল সমালোচনা আত্মসমালোচনা। যোগা মুশকিল নয়, দ্বন্দ্ব তত্ত্বের এই বিকশিত রূপ অসম বিকাশমান এই পৃথিবীতে বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর কতবড় পথ প্রদর্শক।

শুধু বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সমাধানের তত্ত্ব নয়। একস্থান দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যেটা অন্য দ্বন্দ্বগুলোকে, অপরাপর দ্বন্দ্বগুলো থাকে আপেক্ষিক বিচারে গৌণ। প্রথম ধাপে মুখ্য দ্বন্দ্বকে সমাধানের মধ্য দিয়েই এগোতে হয়, মুখ্য দ্বন্দ্বটির সমাধান হলেই এককালের অধ্যয় দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া দ্বন্দ্বে সমাধিষ্ট হই বিরোধী শক্তির মধ্যেও স্থান কাল ভেদে একটি মুখ্যরূপে উপস্থিত থাকে অপরটি থাকে অমুখ্য। বিরোধী শক্তির মধ্যে কোনটি ঐতিহাসিক বিকাশের পথে মুখ্য হয়ে উঠছে সেটাই অধিকতর গুরুত্ব-সম্পন্ন, কোনটি পর্যবেক্ষণের মুহূর্তে বড় হয়ে রয়েছে সেটাই বড় কথা নয়। এমনিভাবেই মাও-সে-তুং সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত এবং দ্রুততরের যুগে দ্বন্দ্ব তত্ত্বকে নতুন আলোকে সমৃদ্ধ করে দেখার বর্তমান পৃথিবীতে বিপ্লবের বটিকাকেন্দ্র কীভাবে বাসা বেঁধেছে এসে এশিয়া আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূমিতে। আর একটি বড় সংযোজন ঘটান মাও-সে-তুং দ্বন্দ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে, কতগুলো দ্বন্দ্বের সমাধান তীব্র সংঘর্ষের পথে আর কতগুলো দ্বন্দ্ব সমাধান হবে পারস্পরিক সমঝোতার পথে এই যার মূল কথা।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে

মিহির আচার্যের "সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধটির পরিপূরক দু-একটি কথা বলতে চাইছি। বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ, মেদিনীপুর প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থে'র অন্যতম সম্পাদক আজাহার-উদ্দীন খানের প্রবন্ধে প্রকাশ, সৈয়দ ইসলাম হোসেন সিরাজী ছিলেন এক সাচ্চা দেশপ্রেমিক, যিনি তাঁর 'অনল প্রবাহ' নামের কাব্য পুস্তিকা রচনা করে ১২১০ সালে হাজারীবাগ জেলে অন্তরীণ হন। 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৪০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বলেছেন : সিরাজী সাহেবের সমগ্র 'জীবন ছিলো অনল প্রবাহ। আমার রচনায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ আছে।" তুরস্কের কামাল পাশা সিরাজীকে আখ্যাত করেছেন 'ভারতের গৌরব' বলে। পাবনার এই মুসলমান সন্তানটির সঙ্গে চারণ কবি মুকুন্দদাসেরও ছিলো হৃদয়ের সম্পর্ক। অথচ এঁকেই মুক্ত হয়ে বলতে হয়েছিলো : "মীরমতি বঙ্কিমচন্দ্র ···ইহাতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই অতি অযত্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত এবং ধর্মবিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।" বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র জবাবে সিরাজী সাহেব 'চায়নসিনা' উপন্যাস লিখেছিলেন। সিরাজী সাহেবের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে হিন্দু সাহিত্যিক সমাজ-নেতাদের সঙ্কীর্ণতাবাদই উস্কানি জুগিয়েছে। তাঁরা আত্মস্বার্থে ইংরেজ তোষণ করতে গিয়ে ভ্রাতৃবিরোধমূলক সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছেন অকাতরে। এঁরা জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজ শাসনকে আক্রমণ করার সৎসাহস দেখাতে পারেন নি; হিন্দুদের শৌর্য-বীর্যের ছবি আঁকতে বসে মুসলমান সমাজকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে হেয় করে ফেলেছেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বিদ্রুপভাবে ব্যবহার করে এক শ্রেণীর হিন্দুর পূজ্য হয়ে উঠলেও বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জনতার অচ্ছেদ্য অংশ মুসলমানকে শত্রু করে তুলেছেন। 'নবীনার দর্পণ' নাটকের ব্যাপারেও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহী জনতা ও নাট্যকার মীর মশার্রফ হোসেনের পক্ষ নিতে পারেন নি।

'বাংলার ইতিহাস' রচনায় বিদ্যাসাগর পর্যন্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—লর্ড বেন্টিঙ্ক 'মহোদয় চিরস্মরণীয়', কেননা তাঁর রাজত্বকাল নাকি 'প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকালেই সঙ্ঘটিত' হয়েছিলো। কিন্তু সিরাজদ্দৌলাকে তিনি বললেন 'অতি দুরাচার নবাব,' আর তিতুমীরের বিদ্রোহের সুখবরটি সম্পূর্ণ চেপে গেলেন। 'অসভ্য' সাঁওতাল এবং হিন্দু মুসলমান সিপাহীদের শোষণ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের মাঝে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজের ঐশ্বরিক আইনের মান রক্ষার বিধবা-বিবাহের সাড়ম্বর আয়োজন করলেন। বেটোপলিটন বিদ্যালয় খুলে তাঁর সংবিধানে মুসলমান ছাত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতেও তাঁর আটকালো না।

বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান—'হে ভারত'-এও মুসলমান ভারত অনাহূত, অবিদ্যুত। মুসলমান শাসনের স্বজাতিসিক্ত ইংরেজ শাসকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মোহও অবিস্মরণীয়। ওঁর গ্রাম্য বা হিন্দু-প্রধান সাহিত্য কর্মের মাঝে স্বজাতির মুক্তি প্রয়াসের নিন্দাকারী অধিকাংশ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' যেমন আছে, তেমনি হিন্দু-ভারতের 'অচলায়তন' ভাঙতে আছে পুরো বিদেশী শোষণগোষ্ঠের দল। এই হীনম্মন্যতা ও বিদেশী প্রীতিবশেই তিনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম—হিন্দু মুসলমানের সিপাহী বিদ্রোহকে দেখেন বাঁকা চোখে। ওঁর 'গোরা'র জনদাত্রী বিদেশী মহিলা নাকি সিপাহীদের নৃশংসতা থেকে রক্ষা পায় এক হিন্দুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে, শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে, ভেড়ে আসা সিপাহীরা যে মুসমমান, তারই একটা আভাস রেখেছেন। অথচ এ গল্পের নায়কের ভারতীয়ত্বে উত্তরণ দেখানোর জন্যে এক হতভাগ্য অনাথ সিপাহীপুত্রকেও তো নেওয়া যেতো।

জীবন ও সাহিত্যে এই জাতীয় ইংরেজপ্রীতি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ উপেক্ষা-বিদ্বেষই জাতি নিয়ে বঙ্গজাতির তথা ভারত ভাগ্যের পথ বেঁধে দিচ্ছিলো। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো বহু মাতৃভাষী বঙ্কিম রবীন্দ্রের চেয়ে মেঘনাদী সৌন্দর্যের মধুস্বদকেই মহত্তর বলে মেনেছেন, খেদ করে বলেছেন, "যেখানে শক্তি নাই, তেজ নাই, সেখানে ধর্মও নাই। যে দেশের অর্দ্ধেক লোক পেট পুরিয়া আহার করিতে পায় না,···ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিয়া মরে, অথচ কোটি কোটি লোক তাহার প্রতিকারে সাধ্যে তেমন কোনই চেষ্টা করে না, তাহারা যদি ধার্মিক বা ধর্মশীল হয়, তাহা হইলে আমি জানি না—অধার্মিক কাহারা।" সিরাজীর কথা শিরোধার্য করেও এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষকের প্রতি দৃষ্টিশ-উপনিবেশ ভারতের তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মধ্য শ্রেণীর এই জাতীয় 'নিঃসর্ত ভালোবাসা'র ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও কিন্তু মিহির আচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে ওকাশ্য ছড়িয়ে বলতে পারছি না যে, "এ বিশেষত্ব সম্পূর্ণ ভারতীয়।" কারণ জাতি বিশেষকে এভাবে চিহ্নিত করা নিশ্চয়ই অমার্কসীয়। তা-না-হলে বিভীষণকে ঘৃণা ছোঁড়ার দর্প নিয়ে মেঘনাদও যে জন্ম নিতো না। আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই ঐতিহ্য ভেদেরও সৃষ্টি হয়েছে এদেশে। এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীই তাই আমাদের কৃষক বিদ্রোহগুলির ক্ষুদ্রিপ্ত পৌঁছে দিয়েছে এ যুগের হাতে, গড়ে রেখে গেছে হাসিক তোরাপ, ঘৃণ্য ইংরেজের প্রতি ছুঁড়ে গেছে নির্মম অভিশাপ। আবার আরও একদল বুদ্ধিজীবী নাগর রাজনীতি ক্ষেত্রে মার্কস-লেনিন-মাওকে, অথচ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে এক গোঁজা-মিলের ঐতিহ্য গড়তে চাইছে। এমন কি কমিউনিষ্ট কবি সুকান্তের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা ও আন্তর্জাতিকতার মূলে ভাববাদী রবীন্দ্রনাথেরই অবদান আছে ভেবে তারা গৌরব বোধ করছে। এমন অবস্থা রিপ্লবোত্তর চীনেও অবশ্য দেখা গেছে। তাই জীবন ও সমাজের অভিজ্ঞতার সমুদ্ভব ব্যক্তিত্ব, মানবেতিহাসের মহত্তম বিপ্লবের অধিনায়ক মাও-সে তুঙকেও দুঃখ করে বলতে হয়েছে : "মার্কসবাদ আয়ত্ত করেছেন বলে খ্যাত কিছু কমিউনিষ্ট যখনই ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ইতিহাস বিরোধী কোনো মতাদর্শের মুখোমুখি হন, তখনই তাঁরা তাঁদের সমালোচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, এবং কেউ কেউ সেই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ তথা তার প্রশস্তি পর্যন্ত করে বসেন। এই প্রশংসাকে সমর্থন বা সহ্য করার মানে হলো চীন জাতি ও চীনের কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ক্ষুৎসাত্মক যে প্রচার, তাকে সমর্থন ও সহ্য করা, অপিচ এই প্রচারকে স্বাগত বলে স্বীকার করা।"

নির্মল সাহা
কলকাতা

শিবদাস ঘোষ

শিবদাস ঘোষ চলে গেলেন। ভারতবর্ষের বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সত্তরদশকের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। ৪২ সালের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচার ও ব্যাখ্যার তাঁর ব্যক্তিগত অবদান নেহাৎ কম নয়। আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। মেঠো বক্তৃতা নয়। পণ্ডিতপূর্ণ, প্রাঞ্জল বক্তৃতা। আমি তাঁর লেখা পড়েছি। নৈব্যক্তিক, গভীর ও মননশীললেখা। তিনি একজন সত্যিকারের তাত্ত্বিক ছিলেন। সমসাময়িক বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে মার্কসবাদের তত্ত্বকে সামঞ্জস্যে বেঁধে দেওয়ার ক্ষমতাছিল তাঁর। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে তাত্ত্বিকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। তিনি তাদের মধ্যে একজন। তাঁর সংকৃতি বিষয়ক রচনাবলীও প্রশংসনীয়। তিনি কম্যুনিষ্টদের আচরণের কথা বলতেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাংস্কৃতিক মানের কথা বলতেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—অনেক সময় সেটাকে আমরা হাল্কা করে দেখি। কিভাবে ভাল কম্যুনিষ্ট হতে হয়—লিউ শাও চির সেই বিখ্যাত বইটি আজ আর কেউ পড়ে না। একদিন ছিল যখন এই বইটির অধ্যয়ন প্রতিটি কম্যুনিষ্টের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। কম্যুনিষ্টরা সমাজটাকে পাল্টাতে চায়। তাদের নিজেদের বিশুদ্ধ হতে হবে। নিজেদের চরিত্রকে পাল্টাতে হবে। কম্যুনিষ্টদের চরিত্রশুদ্ধিকরণের প্রশ্নটি শিবদাসবাবু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। সবাই দেখেন কিনা জানিনা।

দীর্ঘদিনের বামপন্থী আন্দোলনে শিবদাস ঘোষের রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁর একটা আপোষহীন মনোভাব ছিল। অবশ্য এই মনোভাবের জন্য বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাময়িক বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে। তবু বিভ্রান্তি ও হতাশার মধ্যে তিনি মার্কসবাদের কথাই বলেছেন। সমাজের গুণগত পরিবর্তনের কথাই বলেছেন।

জীবদ্দশায় তিনি তাঁর নিজস্ব দলের কর্মী ও নেতাদের কাছে যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন তা দস্তুরমতো ঈর্ষার ব্যাপার। তিনি ছিলেন এস ইউ সির প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বোচ্চ নেতা। শুনেছি এতটুকু কর্তৃত্বমূলক মনোভাব ছিল না তাঁর আচরণে। তিনি আত্মসমালোচনা করেছেন অকপটে, সমালোচনা করেছেন দলীয় কর্মীদের। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা একটি মার্কসবাদী পার্টির প্রাণবস্তু—এই কথাই শিখিয়েছেন তিনি দলের কর্মীদের।

কালিদাস বসু
কলকাতা

মতামত

বেনামী জমির কারচুপি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মগরাহাট : এখানে দুই মৌজা সদাশিবপুর ও খোর্দ মহাদেবপুরে খাস জমির পরিমাণ ৪০ বিঘা। সদাশিবপুর ও খোর্দ মহাদেবপুর, এই দুই মৌজার খাস জমি ভূমিহীনরা প্রায় পায়নি বললেই চলে। পেয়েছে এখানকার কিছু বিত্তশালী ব্যক্তি, এদের মধ্যে দুজনের নাম আইরোব মোল্লা ও খুশী বৈদ্য। সব জমিই এরা বেনামে নিয়েছে।

সরকারের কাছে স্থানীয় পল্লীবাসীদের অনুরোধ, মাননীয় সচিবদ্বয় সরকার যেন সঠিক তদন্ত করে এগুলো বিলি ব্যবস্থা করেন।

স্থানীয় নেতাজী পাঠভবন নামে একটি ক্লাব এইসব কায়চুপির প্রতিবাদ করেছে। এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে মাঠে নামতে চাচ্ছে। কিন্তু তাদের ভয় খুশী বৈদ্য তাদের ওপর হামলা করবে। তারা বলছে ভূমিহীনদের জন্য পাওয়া কি মাঠে মারা যাবে।

মাও সে তুঙের চিন্তাধারা

মধু গোস্বামী

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে যাঁরা আপ্তবাক্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, আর যাঁরা তাকে পুরনো পৃথিবীটাকে পাল্টে দেবার অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এই দুই ধরণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক।

প্রথমোক্ত জনেরা কাজে-অকাজে বিপ্লবী, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রচনাবলী তোতাপাখির মত আবৃত্তি করে তাঁরা তাঁদের সভীত্বপনা জাহির করার মধ্যেই নিজেদের কমিউনিষ্ট ভূমিকা পালনে ব্যস্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তেরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুকে পুঁজি করে দেশ কাল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা হিসাবে রেখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে তৎপর।

লেনিন-স্তালিন এবং জর্জি ডিমিট্রভের পর কমরেড মাও সে তুং হলেন সেই দ্বিতীয়ধারার সবচেয়ে সফল উত্তরসূরী। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ক্ষেত্রে 'মৌলিক চিন্তা' কথাটা আপ্তবাক্যপন্থী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে চরম অপরাধ বিশেষ, কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও মৌলিক চিন্তা করার যে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী হয়ে চলেছে, এ কথাটা ইতিহাসগত ভাবে সত্যি।

এই সত্যিটাকে প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে আপ্তবাক্য-পন্থীদের দেখিয়েছেন সেইদিনকার আপ্তবাক্যপন্থী মার্কসবাদীদের দ্বারা ধিকৃত কমরেড লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে একচেটিয়া পুঁজির আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ বিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিয়ে।

কমরেড স্তালিন তাঁর সর্বশেষ তাত্ত্বিক রচনা "সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমস্যাবলী"র মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্কসের "উদ্বৃত্ত মূল্যের" তত্ত্বকে সামনে রেখে একচেটিয়া পুঁজির শোষণের আগ্রো-আধুনিকতম রূপ সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য উপস্থিত করেন।

বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে সোস্যাল ডেমোক্রেটদের সংগে শুধুমাত্র আদর্শগত দ্বন্দ্ব না চালিয়ে, যুক্ত মোর্চা গঠন করাই যুদ্ধকালীন যুগের প্রধান কর্তব্য—জর্জি ডিমিট্রভের এই মৌলিক চিন্তাধারা, তৎকালীন পুরনো আপ্তবাক্যপন্থীদের হাত থেকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনকে বাঁচাতে সাহায্য করেছিল।

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে দ্বিতীয় ধারার চতুর্থ এবং আপাত শেষ প্রতিনিধি হচ্ছেন কমরেড মাও সে-তুং। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং চীনদেশের বিশেষ পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে "আপ্তবাক্যের" বদলে "সংগ্রামের পথ নির্দেশক" হিসাবে গ্রহণ করে তিনি চীন বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যিনি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সামনে যে মৌলিক চিন্তাধারা উপস্থিত করেছিলেন সেই মৌলিক ভাব-ভাবনাগুলোকেই চীনের কমিউনিষ্টরা মাও সে-তুং চিন্তাধারা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আপ্তবাক্যপন্থীরা এগুলোকে মোটেই মাওদের মৌলিক চিন্তা বলে মানতে রাজী নন। এঁদের একদল বলেন মাওদের মৌলিক চিন্তা "নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের"তত্ত্ব আসলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি বিচ্যুতি, আর এক দলের ভাবটা রবীন্দ্রনাথের "জুতা আবিষ্কার" কবিতার সেই মন্ত্রীর মত: কেমনে ব্যাটা পেরেছে সেটা জানতে।

মাও সে-তুং এর "নয়াগণতন্ত্র" তত্ত্বের সারবস্তুটি কি? কোথায় এর মৌলিকত্ব?

এই তত্ত্বের মৌলিকত্ব হচ্ছে তৎকালীন আন্তর্জাতিক এবং দৈনিক পরিস্থিতির, চীনের শ্রেণী বিন্যেষণের নব মূল্যায়নের মধ্যে। চীনের বিশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন: এই নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবটিকে একদিকে যেমন পুঁজিবাদ-পাশিত, অধুনা-অচল, পুরনো, পশ্চিমী ধরণের পুঁজিবাদী গণতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তা শ্রমিকশ্রেণী শাসিত সোভিয়েত ধরণের নতুনতম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র থেকেও স্বতন্ত্র।

কিন্তু তাঁর তত্ত্ব মত চীনের এই বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তীকালে অবশ্যই এই নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মার্কস কথিত উচ্চস্তরীয়তে এবং নিম্নস্তরীয়তে কমিউনিষ্ট সমাজ এবং লেনিন কথিত কমিউনিষ্ট সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ, বিপ্লবের এই যে পূর্ব-ঘোষিত দুই স্তর, মাওএর নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব নির্দ্বা নিঃসন্দেহে তার থেকে আলাদা একটা নতুন আবিষ্কৃত স্তর বিশেষ। কাজেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা একটা মৌলিক অবদান।

প্রশ্ন উঠতে পারে মর্মবস্তুর দিক থেকে মাও সে-তুং এর এই নতুন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত কি না?

তাহলে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুটি কি? উত্তরে বলা যায়: শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তু।

লেনিন বলেছেন: শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব হল, মেহনতকারী জনসাধারণের অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর সংগে শ্রমিক ভিন্ন মেহনতকারী অন্যান্য স্তরের (যেমন পেটি-বুর্জোয়া, খুদে মালিক, কৃষক বুদ্ধিজীবী ইত্যাদির) কিংবা তাদের অধিকাংশের বিশেষ ধরনের একটি শ্রেণী সংযোগিতা···যার লক্ষ্য হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ।

মাও সে-তুং তাঁর "নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব তত্ত্বের মধ্যে ঘোষণা করেছেন: নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে। নয়া-গণতন্ত্রের পরবর্তী স্তর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক স্তর, অর্থাৎ ধন-তন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই তার লক্ষ্য। তিনি আরো বলেছেন:···চীনের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়ারাই হচ্ছে মূল শক্তি বা যেনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এবং এই মৌর্চা যেোর নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক শ্রেণী। মাওয়ের ভাষায়: চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক, তা হবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী শক্তির মৌর্চ একনায়কত্বের রাষ্ট্র, যার নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক শ্রেণী। দেখা যাচ্ছে, কমরেড লেনিনের ব্যাখ্যা মত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তু হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের ওপরে মাও সে-তুং তাঁর 'নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র ক্ষেত্রে চীনের বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত করে দেননি। কাজেই কমরেড মাও সে-তুং এর 'নয়াগণতন্ত্রে'র তত্ত্ব একবিন্দে যেমন মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের ভাণ্ডারে একটি মূল্যবান সংযোজন, অপরদিকে মর্মবস্তুর দিক থেকে এটি পুরোপুরি ভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত।

একদল আপ্তবাক্যপন্থী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রশ্ন তুলেছেন মাও সে-তুং তাঁর "নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবে"র ওরে জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে অপ্রকট-মূলক দ্বন্দ্ব হিসাবে ঘোষণা করে মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন।

চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ শ্রেণী বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে মাও সে-তুং যে সামন্ততন্ত্র বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াদের কথা বলেছেন অর্থনৈতিক স্তর বিচারে সেই শ্রেণী হচ্ছে "খুদে মালিক শ্রেণী" কমরেড লেনিন যাদের সংগে, এমনকি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেও শ্রেণী সংযোগিতার কথা বলেছেন।

এ ছাড়া মাও সে-তুং এই অপ্রকটাত্মক দ্বন্দ্বের কথা বলতে গিয়ে বাস্তবায় বলেছেন চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে, একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত এদের সংগে সংযোগিতার কথা। তিনি আরো বলেছেন: এখানে বুর্জোয়া শ্রেণী কোন কোন সময়ে এবং কিছুটা পরিমাণে বিপ্লবী।·····বিপ্লবের গতি পথেও সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে কখনও একবারে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না, এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি শোষণের সংগে যুক্ত থাকার দরুন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার শক্তি বা ইচ্ছা তাদের নেই।·····একদিকে বিপ্লবী এবং অন্যদিকে আপসকামী চীনের বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রের এই হল দ্বৈতরূপ। সাধারণ ভাবে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে সেই চিরাগত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্য: জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে শোষিতের দ্বন্দ্ব—প্রকৃতি-গত ভাবে সে দ্বন্দ্ব শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব। কাজেই জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে মাও সে-তুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী ছিলেন এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি একটা সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন: যদি কমিউনিষ্টরা—চীনের কমিউনিষ্টরা এবং যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারে তবে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ পথে হোতে পারে, কিন্তু তা যদি না হয়, আর জাতীয় বুর্জোয়ারা যদি তা মেনে না নেয় তবে এ দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক নিয়মে শত্রুতামূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। পরবর্তীকালে চীনের বুর্জোয়ারা তা মেনে নেয়নি এবং কমরেড মাও সে-তুংও অপ্রকটাত্মক দ্বন্দ্বের চিন্তা থাঁকড়ে থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শকে বিসর্জন দেবার চীনের সংস্কৃতিক বিপ্লবের তার প্রমাণ।

একটি স্টুডিওর অস্তিত্ব সংকট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অত্যন্ত উত্তেগের সংগে জানগাম যে, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে নিম্ন আদালতের উচ্ছেদের ডিক্রী বলবৎ থাকায় টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিও-র গান রেকর্ডিং ও শব্দ সংযোজনা বিভাগের বাড়িটি, অফিস ঘর এবং একটি ফ্লোর উচ্ছেদের সম্ভাবনার রয়ে হতে চলেছে। এর ফলে ওই স্টুডিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে বলে সমূহ আশঙ্কা। এই স্টুডিও বন্ধ হওয়া মানে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট আরও ঘনীভূত হওয়া এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে অভিজ্ঞান মারফৎ আরও বেশী বাংলা ছবি তৈরীর প্রচেষ্টা করছেন, এই স্টুডিও এবং বিশেষ ভাবে শব্দ সংযোজন বিভাগটি (ফোর) যদি বন্ধ হয়, সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। এই ফোরে বিদেশীরে বা শব্দ সংযোজন বিভাগে পূর্ণভারতের সমস্ত প্রদেশের ছবির কাজ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধেক ছবির শব্দ সংযোজন ও গান রেকর্ডিং হয়। এই ফোরে বন্ধ হওয়ার ফলে ঐ সমস্ত কাজ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প অর্থনৈতিক দিক থেকে গভীর সংকটের সম্মুখীন হবে। কলাকুশলীরা বেকার হবে, ছায়াছবির কাজ আরও কমে যাবে।

পঞ্চাশ দশকে কলকাতায় চালু স্টুডিওর সংখ্যা ছিল চোদ্দ। আজ সেই সংখ্যা কমতে কমতে পাঁচ-এ এসে ঠেকেছে। এখন আবার সেই পাঁচটির মধ্যেও একটি স্টুডিওতে দেখা যাচ্ছে অস্তিত্বের চরম সংকট। এমনিতেই ওটি পাঁচটক স্টুডিওকে সম্বল ক'রে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প হাঁপাচ্ছে, ছবি তৈরীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। তার ওপর আর একটি স্টুডিওর দরজা বন্ধ হলে এই শিল্পের কি দুর্গতি ঘটবে, সহজেই অনুমেয়। সরকারী সব শুভ প্রচেষ্টা তখন ব্যাহত হয়ে যেতে বাধ্য।

এই টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওর অতীত বড় গৌরবময়। সেযুগের বিখ্যাত 'কালী ফিল্ম স্টুডিও' হল আজকের এই টেকনিসিয়ান্স্ স্টুডিও। সেকালের কত খ্যাতনামা শিল্পী কলাকুশলী, অভিনেতা অভিনেত্রী এই স্টুডিওতেই একদা ছবির শুটিং করেছেন। সুতরাং এই ঐতিহ্যমণ্ডিত, শিল্পী কলাকুশলীদের প্রাণের ধন এই স্টুডিওটি যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ সরকার হস্তক্ষেপ।

সাম্প্রতিক কয়েকটি বাংলা ছবি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি যে বাংলা ছবিগুলি মুক্তি পেয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই যেমন দুর্বল, তেমনি বিরল। কি বিষয়বস্তুতে আর কি আংগিক প্রকরণে শুধু ব্যর্থতার গ্লানিই প্রকট। যেমন অকিঞ্চিৎকর জোলো বক্তব্য, তেমনি তার অক্ষম উপায়ণ। সিরিয়স ছবি হওতো কেউ কেউ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিষয় নির্বাচনে আর চিত্র রূপায়ণে শুধু অক্ষমতার পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন। ফলে ছবি না বলে পেয়েছে সিরিয়স, না হয়েছে আকর্ষক। আজও দেবি শরৎচন্দ্রের কাহিনী চিত্ররূপের ঝোঁক। একাধিকবার চিত্রায়িত গল্প হলেও পুনরায় ছবি করার অদম্য উৎসাহ। একি শুধুই শরৎ জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি? তাই যদি হত, তাহলে তাঁর যে গল্প বা উপন্যাস সবার মুখে কথনো চিত্রায়িত হয়নি, সে গল্প নির্বাচিত হয়না কেন? বাধা কোথায়? মনে তো হয় যে শরৎ কাহিনী পূর্বে চিত্রায়িত হয়ে বক্স অফিস ধন্য করেছে, সে রকম পরীক্ষিত কাহিনী গ্রহণ ক'রে ব্যক্তিগত করার সহজ উপায় ছাড়া এর আর কিছু নয়! আজও চলচ্চিত্রে যথাযোগ্য রূপায়িত হলে বাংলা ছবির গৌরব মহিমাই বৃদ্ধি পেত।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনেককাল বাদে একটি ছবি পরিচালনা করলেন 'বন্দী বিধাতা'। এখানে বিধাতা বন্দী হলেন কি ভাবে? ভাবতে হাস্যকর মনে হলেও ছবিতে বিধাতা বন্দী হন ধনবান প্রতিপত্তিশালীর হাতে! আসল অপরাধী অধরাই থেকে যায়। বেচারা অনিল চট্টোপাধ্যায় আদালতে অভিযুক্ত হয়ে রীতিমত লড়ালই শুরু করেন। এ সমাজ সংসারে পাপাচার ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা আউড়ে কাঁকা আওয়াজও তোলেন। যেহেতু গোটা ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মেলোড্রামার আবর্তিত আর ক্লাইম্ব ও ভাওোলেন্সে নিয়ন্ত্রিত, দর্শকবৃন্দের সেখানে হতবাক হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! এ ছবি করার উদ্দেশ্য কি, একমাত্র পরিচালকই তা জানেন। কারণ এ ছবি যে দর্শক সমাজ পুরোপুরি খারিজ করে দেবেন সে বোধটাও আজকের পরিচালকের নেই!

যান্ত্রিক গোষ্ঠী দুটি ছবি করেছেন এবং দুটি ছবিই সোচনীয়রকম ফ্লপ্। ছবির নামকরণে হোটেল এবে, ব্যাবারে নাচের বহর দেখিয়ে ও উত্তমকুমারকে আকর্ষণীয় করে ছবি যে মাৎ হয়না, বরং তিক্ততায় হয়ে পড়ে, তারই একটা নজির রাখলেন যান্ত্রিক গোষ্ঠী 'হোটেল ডোরাজ' ছবিটি বানিয়ে। ছবির মধ্যে যদি আকর্ষক কাহিনী না থাকে, তবে মিঠুর ঐ মেদবহুল শরীর দেখিয়ে আর উত্তমকুমারকে অহেতুক আবির্ভাব ঘটিয়ে ছবি যে জমানো যায় না, এ সামান্য জ্ঞানজ্ঞানও যান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেই মনে হচ্ছে। বরাবরেতো দেবীর কাহিনী নিয়ে উক্ত গোষ্ঠী যে ছবিটি করলেন, সেটাও হল অকিঞ্চিৎকর 'মোমবাতি'। ছবির মধ্যে তাবাবেগ সঞ্চারের কোন সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অবান্তর কাহিনীর যুক্তিহীনতায় কোন আবেগই মনে রেখাপাত করে না। অন্যায় আব্দারের এক বালককে কেন্দ্র ক'রে দুটি পরিবারের মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে দুটি পৃথক পর্বে। দুটি পর্বেই রয়েছে কিছু আকস্মিকতার স্টাট আর ছকে বাঁধা পারণতি ফলে মোমবাতি আর শেষ পর্যন্ত আগুনের পরশমণিটুকুও পেলনা!

তবে তপন সিংহের 'হারমোনিয়াম' লড়াই বেজেছে। অবশ্য যে-ওরে বেজেছে, সে সুর ভাল নাও লাগতে পারে, কখনো বেসুরো মনে হতেও পারে। কিন্তু বেজেছে যে, এটা মিথ্যে নয়। তপনবাবু ইদানীং কয়েকটি দুর্বল কাহিনী নিয়ে যে ছবিগুলি করেছেন, সেগুলি তাঁর তপান অক্ষুন্ন রাখেনি। 'হারমোনিয়াম'-এর কাহিনী তাঁর নিজের এবং বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়,কাহিনী হিসেবে এটি মোটেই উল্লেখ্য কিছু নয়। একটি হারমোনিয়ামকে কেন্দ্র ক'রে একাধিক পরিবেশে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তারই চিত্রায়ণ এটি। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে ভাব ঐক্য এখানে তেমন স্পষ্ট নয়। পরিচালক প্রথমে ছবিটিকে প্রহসনধর্মী করেই তুলতে চেয়েছিলেন বোঝা যায়। কিন্তু কেন যে শেষ পর্বে সে ধর্ম থেকে সরে এসে সাসপেন্স আর খুনোখুনির মধ্যে পড়লেন, সেটা ভেবে অবাক লাগে! হাওতো তিনি বুঝেছিলেন, একটু কাইব আর ভায়োলেন্স না থাকলে লোকে ছবি নেবে না। কিন্তু কাইব আর ভায়োলেন্সের সে দুরন্ত প্রকাশ আর তার অবকাশই বা কোথায়? তাঁর মত পরিচালকের এ বোধ কেন এল না যে, এধরণের ছবিতে তপন বক্স শুধু রসাভাসই সৃষ্টি করে। ছবিতে বিচ্ছিন্নভাবে দুটি বক্স রস সৃষ্টি করেছে। একটি মফ্ট্ ব্যানার্জীর হারমোনিয়াম বাদন আর একটি ছায়া দেবীর গান আর গায়ন ভংগী। তপন সিংহ এদুজন সাধুবাদের যোগ্য। কারণ ছবির সংগীত পরিচালকও তিনি।

গুরুণ পরিচালক ইন্দ্র সেনের পর পর দুটি ছবি দেখে মনে হল ছবি তৈরী করার টেকনিক্যালিটি মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারলেও ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার মন্ত্রটি তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে। অজুন আর অনয়র দুটিই নিষ্প্রাণ ছবি। জলছবির মতই শুধু চোখের সামনে আসে আর চলে যায়। মনে কোন রাগ রাখে না। সুবীল গাঙ্গুলীর গল্প নিয়ে 'অর্জুন' ছবিটি লক্ষ্যভেদে যে ব্যর্থ হয়েছে, তার জন্য দায়ী অবশ্যই পরিচালক। কিন্তু কাহিনীকারের দায়িত্বও সেখানে কম নয়। কাহিনীর সমস্যা যখন আজকের সমস্যা নয়, তেমনি সে সমস্যার ভিত্তিও দৃঢ় নয়। উদ্বাস্তু কলোনিতে যে অবিচার আর অত্যাচার, তারই বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে এগিয়েছিল অর্জুন। কিন্তু যে ঘটনা পরম্পরায় ছবির পরিণতি ঘটল, তা কতখানি বিশ্বাস্য মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। রসস্রষ্টার কথা তো সেখানে আসেই না। তবে বিমল করের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'অসময়' ছবিতে রস সঞ্চারের অবকাশ ছিল। কিন্তু পরিচালক সেখানেও ব্যর্থ হয়েছেন। শিবিল পরম্পর্যহীন চিত্রনাট্য ছবিটিকে প্রাণহীন করে তুলেছে। শচীপতির মৃত্যুতীতি শুধুই আশংকা নয়,সত্যেও পরিণত দেখি। এক লম্পট ধনীর সংগে অসহায় মোহিনীর বিবাহ কেমন করে ঘটল, সেটাও একটা রীতিমত প্রশ্ন! সেখানে অমন সন্তুষ্ট ব্যাঠামশাই আর সতর্ক পিতা বিরাজমান, সেখানে এমনটা হবার তো কথা নয়। মোহিনীর পিতা এতই সজাগ যে, শচীপতির বদলে সকলেই খল্লায় বলে সংশয় জেনেও তার সংগে বিবাহের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। বিবাহের এই অদ্ভুত যোগাযোগটা কাহিনীর একটি মূল কেন্দ্র মনে রাখতে হবে। কারণ দুশ্চরিত্র স্বামীর পীড়ন সহ্য করতে না পেরেই মোহিনী স্বামীসুখ চিরদিনের মত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে ও পরবর্তীকালে নিঃসন্তান মোহিনীর জীবনে কৃতীর পুরুষ অবিনের আবির্ভাব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বর মধ্য দিয়ে মোহিনী শেষ পর্যন্ত অবিনকে জীবনে গ্রহণ করে। কাহিনীর এই পরিণতির সেই যুগকেন্দ্রটিই বিশ্বাস্য যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে গোটা ব্যাপারটাই কেমন খেলো হ'য়ে পড়ে। তবে ছবির কিছু কিছু অংশে প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য পড়ে। যেমন মোহিনী ও অবিনের মধ্যে সন্ধ্যালাপের পর্যায়ে দুজনের পূর্বার মুখোমুখি হওয়া) মোহিনীর দরজায় অবিনের নাটকীয় করাঘাত, শঙ্খধ্বনায় মোহিনীর মানসিক সংঘাতকে উচ্চায়িত করা ইত্যাদি। কিন্তু অপর্ণা সেন ও সুরূপ দত্তর প্রাণহীন অভিনয় ছবিটিকে অনেক পরিমাণে নীরস করে তুলেছে। আনন্দসংকরের আবহসংগীত কিছু দৃশ্যকে অর্থবহ করেছে ঠিকই, কিন্তু কণ্ঠসংগীতগুলি মোটেই সুপ্রযুক্ত নয়।

সলিল দত্তর 'সেই চোখ' একটি বিরক্তিকর বিকৃতরুচির ছবি। কোন যুক্তির বালাই না রেখে পরিচালক একটি 'আমদে' ছবি উপহার দিতে চেয়েছেন। ধনবান আর নবরুক্ষ সরাবের লাম্পট্য চালিয়ে ছবির শেষে পর্বে হঠাৎ উদার হয়ে গেলেন। একি উত্তমকুমারের ইমেজ রক্ষার জন্যে? উদ্ভট আজগুবি চরিত্র নবরুক্ষও জীবনে প্রকৃত প্রেমের আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। প্রেমের কাঙাল হয়ে সেই চোখেরই সন্ধান ক'রে ফিরছেন দুশ্চরিত্র নবরুক্ষ এবং শেষে সেই চোখের সন্ধানও মিলে গেল, কিন্তু শুভদৃষ্টি হল না। সেই চোখ যার, সেই মহুয়া তার প্রেমিকটির সংগেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল শেষ পর্যন্ত। একটা লম্পটের প্রতি দর্শক সাধারণের মহাশুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা করাটাই তো শিল্পীর একটা গর্হিত কর্ম বলে জানি। কাহিনীকার-পরিচালক সলিল দত্ত একটা অভিনব উদ্যোগ ছবি করার নেশায় এতই মেতে ছিলেন যে, 'সেই চোখে' আর এদিকটায় হয়তো চোখ দিতে পারেন নি!

বিমল রে প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত 'দত্তা' ছবিটি শিল্পমানে সমুত্তীর্ণ না হলেও আবেগ সঞ্চারে যে কিছুপরিমাণেও সার্থক হয়েছে, তার মূলে আছে শরৎ কাহিনীর নিজস্ব একটি আবেদন। এই 'দত্তা' উপন্যাসকে অবলম্বন ক'রে ইতিপূর্বে দুটি ছবি হয়ে গেছে—ত্রিশ দশকে নিউ থিয়েটার্সে'র 'বিজয়া' আর পঞ্চাশ দশকে সৌমেন মুখার্জী পরিচালিত 'দত্তা'। তিনটি ছবির তুলনামূলক বিচার করলে দীনেশ দাস পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সে'র 'বিজয়া' ছবিটি ছিল রসাবেদন সৃষ্টিতে অধিক সার্থক। চন্দ্রাবতীর 'বিজয়া' আর পাহাড়ী সান্যালের 'নরেন' যে ব্যক্তিগত ও অভিব্যক্তিতে ভাবয়, তেমনটির সাক্ষাৎ সর্বাধুনিক ছবিটিতেও পাওয়া যায়নি। সুচিত্রা সেন অবশ্য অভিনয় মুখোপাধ্যায় 'বিজয়া' চরিত্রটিকে ফুটিয়েছেন। তবুও তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যে পড়ে, যেটা না হলে অভিনয় আরও স্বাভাবিক মনে হত। উৎপল দত্ত 'রাসবিহারী' রূপে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু দুজনের 'দত্তা'-র অধীন্দ্র চৌধুরীর রাসবিহারী ছিল অনবদ্য। অজয় করের ছবিটিতে বিশু চক্রবর্তীর ক্যামেরার কাজ উচ্চ মানের হয়নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনাও গতানুগতিক। ছবির পরিচালনায় কোন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। শুধুমাত্র শরৎ কাহিনীকে অনুসরণ করে ছবিতে গল্প বলে যাওয়া হয়েছে।

তারা মা চিত্রম্-এর 'হংসেরাজ' ছবিটি দেখতে বসে শুধুই গান শুনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এক কিশোর বাউল বীরভূম থেকে কলকাতায় আসে রেডিওর শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার আশায়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা লাভের পথে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলিকে পরিচালক কাহিনীকার অজিত গাঙ্গুলী সুন্দরভাবে করবার কৌশলটায় একই মন্ত্র হয়ে ওঠেন যে, সমস্ত ব্যাপারটি হাসির খোরাক না জুগিয়ে বিরক্তি উৎপাদনই করে। সবই মোটা দাগের এবং সব কিছুতেই আতিশয্য আর বাড়াবাড়ি। কোন সুস্থ বোধ বা পরিমিতি জ্ঞানের কোন পরিচয়ই ছবিটিতে সভ্য নয়। ভাবাবেগের অতিরিক্ত প্রকাশ যে রসসৃষ্টির পথে অন্তরায়—এ চেতনার বিন্দুমাত্র লক্ষণও চিত্র পরিচালনার পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না কোন বাস্তব মানসিকতারও ছাপ। ফলে এটি হাসির ছবি না হয়ে স্রেফ হাস্যকর হয়ে উঠেছে! তবে শ্রীমান অরিন্দমের শিশু-এ ভাবটি মুখার্জীর গানগুলি শুনতে বেশ ভালই লাগে।

শচীন অধিকারী পরিচালিত 'দুইবোন' ছবিটি সেই ত্রিশ দশকীয় অনার জোলো চিত্রকাহিনীর রূপ, যার মধ্যে আজ নতুন কোন তাৎপর্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করাটাও মূঢ়তা মাত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের অভাব অনটন, দারিদ্র্যকে মূলধন করে দর্শক-মনকে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মাওয়ের সৃজনী প্রতিভা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মাওয়ের অবদান অসাধারণ। মানুষের জ্ঞানের সূচনাই কেবল বাস্তব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নয়, তার সমাপ্তিও বাস্তবে সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। বিশদ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মাও এ-সত্য তুলে ধরেন যে, প্রকৃত জ্ঞানের জন্যযাত্রা অনুশীলন থেকে শুরু হয়ে অনুশীলনে এসেই পূর্ণতা লাভ করে এবং এই পূর্ণতার মুহূর্তে আবার নতুন অনুশীলনের মাধ্যমে সে উন্নততর নতুন স্তরে পৌঁছবার জন্য যাত্রা শুরু করে এই প্রক্রিয়ায়। এইভাবে বস্তুজগৎ আর মনোজগতের আন্তঃসম্বন্ধের সাধারণ সূত্র যিনি উপস্থিত করতে পারেন তিনি নিজে কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারেন না। তাই মাওকে আমরা দেখি এক বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা রূপে। চীন বিপ্লবের এই বিরাট কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বলেই মাও মার্কস্‌বাদকে বহুলাংশে বিকশিত করে তুলতে পেরেছেন।

জ্ঞানতত্ত্বের এই বিকাশ ঘটাতে কঠোর অনুশীলনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই চীন বিপ্লবের প্রশ্নে কৃষক সমস্যা মাওয়ের কাছে নিছক ভাবে বরা পড়েছিল। একথা সত্য যে মার্কস্‌ই বলেন প্রথম যিনি এই সত্য তুলে ধরেছিলেন যে পরাধীন অনুন্নত জাতির জাতীয় মুক্তি এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম মূলতঃ কৃষক সংগ্রাম। আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ইতালীর সমস্যা অনুধাবন করে এই মূল্যবান সত্যে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌ এ সত্যকেও তুলে ধরেন যে পরাধীন দেশকে পদানত করে রাখা দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে, তার নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে এই কৃষক সংগ্রামকে অবিচ্ছেদ্যভাবে এথিত করে নিতে হবে। মার্কস্‌ থেকে স্তালিন পর্যন্ত সবাই এই সত্যের উপর নিরবচ্ছিন্ন গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই পরম সত্যটিকে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বে রূপায়িত করেন মাও সে তুং।

মার্কস্‌ প্রদর্শিত সত্যকে বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে মাও চীনা সমাজে অবস্থিত শ্রেণীশক্তিগুলির বাস্তব বিশ্লেষণ করেন। এ সম্পর্কে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধেই গুরুত্বপূর্ণ এক তত্ত্বের অংকুর লক্ষ্য করা যায় যা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পূর্ণাংগ রূপ ধারণ করে ১৯৪০ সালে তাঁর 'নয়া গণতন্ত্র' নামক লেখায়। ১৯২৬-৪০ এই সময় কাল জুড়ে দক্ষিণ এবং বামপন্থী সুবিধাবাদ চীনের কমিউনিস্ট রাজনীতির ক্ষেত্র ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। একটি ঝোঁক কৃওমিনটাং কমিউনিস্ট মৈত্রীর উপর একপেশে জোর দিতে থাকে, অপরটি জোর দেয় শুধু শ্রমিক আন্দোলনের উপর। দুটো লাইনের কোনোটিই কৃষক সমস্যার প্রতি কোনো নজর দেয়নি। এর ফলে চীনবিপ্লবের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন হয়ে যায়। নিরবচ্ছিন্ন তীব্র মতাদর্শের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাও সে তুং এই সমস্ত বিচ্যুতিকে কোণঠাসা করে নয়া গণতন্ত্রের যে লাইন উপস্থিত করেন তাতে মার্কসীয় সিদ্ধান্ত এক তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং সমগ্রভাবে ঔপনিবেশিক আধা ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় প্রযোজ্য এক সার্বজনীন চরিত্র অর্জন করে।

নয়া গণতন্ত্রের এই তত্ত্ব সমস্ত ঔপনিবেশে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার দুই ভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করার পথ সুগম করে তোলে, একই সংগে দুই স্তরের মধ্যে যোগসূত্রটিরও সার্থক সন্ধান এনে দেয়।

(চলবে)

কৃষি পণ্যের মূল্য বাড়ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গিটা এই—আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশী বাজারে সস্তায় অধিক বিকোবে, ফলে বিদেশী মুদ্রা আয় হবে বেশী এবং স্বদেশে উৎপাদন শুরু তুলে দেওয়ার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, বিক্রয় বেশী হবে; উৎপাদন বেড়ে যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। বরং বিপরীতটাই হচ্ছে।

অপর দিকে আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সেটি হচ্ছে দেশে কৃষিপণ্য উৎপাদন হার অতি দ্রুত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পাট ছাড়া অন্যান্য কৃষিপণ্যের দাম কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে ও মাঝে মাঝে দুষ্প্রাপ্যও হয়ে যাচ্ছে। পাটের দাম কমে যাচ্ছে। কারণ শুটার বাজার আমাদের দেশে নয়, বিদেশে। বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। তাই তাদের চাপ আসছে পাট চাষীদের উপর। এখানে সরকার পাটশিল্প মালিকদের সাহায্যে দরাজ হাতে এগিয়ে চলেছেন নানারকম ভর্তুকী অর্থাৎ শুল্ক রেহাইয়ের মাধ্যমে। কিন্তু জনগণের ভোগ্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন সামগ্রীর উপর কোন সাহায্য চোখে পড়ছে না, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যেতে পারে। যেমন জমি, জলসেচ, বিদ্যুৎ, হাল, লাঙ্গল, বীজ, সার, বস্তা নিয়ে একজন ইজারাদার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর উপর যদি বাড়ি পর পর দু তিন বৎসর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভর্তুকী দিয়ে কৃষিপণ্য বাড়িয়ে তুলতে ও কৃষকদলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং মুখ্য ভোগ্য কৃষিপণ্যাদি রাষ্ট্রের দরাসরি নিয়ন্ত্রণে, বন্টনের ব্যবস্থা হয় তবেই কৃষিপণ্যের উৎপাদন-মূল্য দু তিন বৎসরের মধ্যে অনেক নেমে আসতে বাধ্য অথচ ভর্তুকীর ফলে কৃষকের মার খাওয়ার ভয় বা উৎপাদন হার কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছে না। বরং উৎপাদনে উৎসাহ যোগাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের লোকের দুবেলা খেয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ এনে দিচ্ছে। এই কৃষি পণ্যের দাম যদি কমাতে পারা যায় তবেই অন্যান্য সব জিনিষের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে। শিল্পজাত দ্রব্য বেশী উৎপাদন হয়ে গুদামে নষ্ট হবে না, দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কিছুটা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। যদি শিল্পজাত পণ্যের উপর দরাজ হাতে ভর্তুকী দেওয়া সম্ভব হয় তবে কৃষিজাত পণ্যের উপর ভর্তুকী দিয়ে জনসাধারণের খেয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ কেন দেওয়া কি সম্ভব নয়?

সাহিত্য চর্চা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদিত, কতিপয় পত্রিকার মৃত্যু অনিবার্য অন্যদিকে তেমনি এই গুরুভার নিয়েও যাঁরা পত্রিকা করবেন পাঠকের যোগাযোগের অনিবার্যতা তাঁদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে এবং আশা করা যায় প্রগতিশীল গল্প কবিতার রূপ এবং ভাবের ভাতে কিছু অনিবার্য অপরিহার্য সংস্কারও হবে যাতে করে তা আর পেটেন্ট মনে হবে না। অন্তত মনে হলে সে লেখা ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা বিরল, হলেও এক-বারেই কাছি। আর কিছু না হোক তাতে অন্তত এই প্রাপ্তিযোগ ঘটবে যে ভিন্ন মত এবং পথের মানুষ তা পড়বেন, এবং আশা করা যায় ভাববেন। উদ্দেশ্য সাধনের, লেখার মনোরঞ্জনের, বৈচিত্র্য সৃষ্টির কলাধারা উন্মুক্ত হওয়ার এ এক বিপুল সম্ভাবনা যার পূর্ণতাও বিশ্বাস রেখে। এবং আরেকবার প্রদানিত হবে সাহিত্যচর্চায় পণেশের মনোপলি অচল।

সাম্প্রতিক বাংলা ছবি

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

করার যে সচেতন প্রয়াসটুকু লক্ষ্য করা গেল, তাতে শুধু সরুল হাসিরই উদ্রেক করে। কারণ এর ফলে ছবিটি আবেদন সঞ্চারে ব্যর্থতার গ্লানিকেই প্রকট করে তোলে শুধু। অভিনয়ের দিক থেকে একমাত্র উল্লেখ্য হল সুমিত্রা মুখার্জীর বড় বোনের চরিত্রটি। টেকনিক্যাল দিক থেকেও ছবিটি নিতান্ত সাধারণ মানের।

যে ছবির পরিচালক কবেছিয়ান রবি ঘোষ এবং ছবির নাম 'নিবিরাম সর্গার', সেখানে সে ছবিটি যে হাসির ছবি হবে, সেটাই স্বাভাবিক চিন্তায় মনেতে প্রথম আসে। কিন্তু ছবি দেখতে বসে সব ধারণাই উল্টে যায়। পরিচালক ছবিটিকে সাসপেন্স-ধর্মী করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সে প্রয়াস তাঁর 'সার্থক হয়নি। অবান্তব কষ্ট কল্পনায় নিছক উদ্ভট ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমেডিয়ান রবি ঘোষের এটাই হল ট্র্যাজেডি। ছবির নায়ক উত্তমকুমারকে প্রথম গায়করূপে দেখি। তারপর সমাজবিরোধী এক দুই পাপ চক্রকে যায়েল করার জন্য গায়ক নায়ক হয়ে গেলেন দুষ্ট-বেশী নিবিরাম সর্দার। ছেঁক বুদ্ধির প্যাঁচ কষে তিনি শত্রুদলকে জব্দ করলেন। আবার রবিনহুড সুলভ বদান্যতাও দেখালেন দরিদ্র সমাজের প্রতি। এ হেন ছবিতে উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, উৎপল দত্ত প্রমুখ শিল্পী শুধু অসহায় শিকার হয়েছেন।

খনি দুর্ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসব ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের গুরুশাসন লঘুদণ্ড দেয়া হয়ে থাকে। সুদামদিহির বেলায় যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে যেন প্রখর দৃষ্টি দেয়া হয়।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, আমাদের দেশে যেসব খনি দুর্ঘটনা ঘটে, একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেই তার শতকরা নব্বইটিই এড়ানো সম্ভব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, যেসব খনি অতি আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত সেগুলিতেই দুর্ঘটনা ঘটছে। চাপনালা খনি দুর্ঘটনার পর খনি নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ এতদিনে সরকারের হস্তগত হয়েছে এবং সুপারিশের গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

সবিনয় নিবেদন

২রা এপ্রিল থেকে দর্পণ অনিবার্য কারণে প্রকাশ করা যায়নি। দীর্ঘকাল পর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দর্পণের একটি বিশেষ শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব বলেও পূজাবকাশের পরবর্তী অর্থাৎ ২২শে অক্টোবরের সংখ্যা প্রেসের গোল-মালের জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছে। বর্তমান সংখ্যা থেকে দর্পণ নিয়মিত প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করছি।

Regd. No. WB/CC-82

PRICE 40 Paise

রেজেষ্ট্রি বিবাহ অফিস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দক্ষিণ কলকাতার কালী ঘাট অঞ্চলের বাসিন্দা নিশ্চয়ই হলেন পাশেই রয়েছে একটি রেজিষ্ট্রি বিবাহ অফিস। খুব জমজমাট। প্রায় রোজই যেন কিছু যুগল যুবতীর এখানে বিবাহ হচ্ছে। দক্ষিণ কলিকাতায় এই বিবাহ অফিসটির পরিচিতি অনেক দিনের।

কলকাতায় যত ম্যারেজ অফিস আছে তার প্রত্যেকটিতেই কিন্তু ম্যারেজ অফিসারের নাম লিখিত আছে। ব্যতিক্রম শুধু আলোচ্য ম্যারেজ অফিসের ক্ষেত্রে। এখানে এলে দেখা যাবে যে, বড় বড় ফলকে 'ম্যারেজ অফিস' সংক্রান্ত ঘোষণা কিন্তু তার কোথাও ম্যারেজ অফিসারের নামোল্লেখ নেই। অবে কি আমরা ধরে নেব যে, এই ম্যারেজ অফিসটির কোন অভিভাবক নেই? আমাদের কাছে খবর আছে যে এই ম্যারেজ অফিসের প্রাক্তন ম্যারেজ অফিসার শ্রীএইচ এন সেন বর্তমানে তার পদ থেকে অপসারিত। কারণ কয়েক বৎসর আগে আলিপুর চৌরঙ্গীর এবং বেহালার আদালতে বিবাহ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেই বিবাহগুলি এই ম্যারেজ অফিস থেকেই হয়েছিল। এবং আদালতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, উক্ত অফিসের তৎকালীন ম্যারেজ অফিসার শ্রীসেন সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। আদালতের রায়ে এমন কিছু মন্তব্য ছিল যার ফলে ম্যারেজ অফিসার শ্রীসেন অপসারিত হয়েছিলেন। শ্রীসেনের অপসারণ এবং কালিকা সিনেমার পার্শ্বর্তী ম্যারেজ অফিসটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে রাজ্য সরকারের রেজিষ্ট্রার জেনারেল অব ম্যারেজ, ভেদ এণ্ড বার্থ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন সংবাদপত্রে এবং উক্ত সংবাদ আকাশবাণী মারফৎও প্রচার করা হয়েছিল।

সে বিগত কয়েক বৎসরের কথা। তার পরেও অন্তাবধি উক্ত অফিসটি বহাল্‌তবিয়তে বিরাজমান। দিন দিন এই অফিসের প্রসার বাড়ছে বই কমছে না। এখনও উক্ত ম্যারেজ অফিসে শ্রীসেনকে নিয়মিত ভাবে দেখা যায়। তিনি অবশ্য বলে থাকেন যে, তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁর কথাই সত্য বলে আমরা ধরে নি তাহলে বর্তমানে উক্ত অফিসের ভারপ্রাপ্ত ম্যারেজ অফিসার কে?

অর্থঘটিত বিষয়েও অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে যে, সরকার-নির্ধারিত যে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে বিধি মানা হয় না। আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে একশত বা তদুর্ধ্ব হয় বলে জানা গেছে। সরকারী নিয়মে যের অর্থের পরিমাণ ষোল টাকা। তাও আবার একসঙ্গে নয়। নোটিশ দাখিল করবার সময় চার টাকা, রেজিষ্ট্রেশন ফি দশ টাকা এবং মূল সার্টিফিকেটের অনুলিপির জন্য দু টাকা, মোট ষোল টাকা। আবার এই টাকা গ্রহণ করে রসিদ দেবার বিধিও আছে।

আজকাল প্রায়ই ছেলেরা বিবাহে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীদের কাছে শুনতে পাওয়া যায় "ব্যাঙ্কেটে নোটিশ দিলাম, এর জন্য এত টাকা বেশী লাগল।" আসলে কিন্তু এই ব্যাঙ্কেটটাই একটা ভাঁওতা। কারণ ব্যাঙ্কেটের কোন রকম কাঁকই নেই ম্যারেজ এ্যাক্টে। নিয়ম হল, বিবাহের একমাস আগে নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র-পাত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত নোটিশ দেওয়া হয় এবং তা সিয়নকুল মারফৎ নির্দিষ্ট অফিসে পাঠানো হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও একটি বিষয় আমাদের নজরে পড়েছে। দক্ষিণ কলিকাতার পার্শ্বর্তী চক্রবর্তী লেনের প্রবেশ মুখেই একটি সাইনবোর্ড সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেবে। 'বিবাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান', কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, বিবাহের আবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কি? ভেবেছিলাম এটাও বোধ হয় একটা ম্যারেজ অফিস। অনুসন্ধান করে জেনেছি আগে এই ধরনের অনেক সাইন বোর্ড ছিল, এখন একটাতে এসে ঠেকেছে। কারণ কিছুদিন আগে এই বিবাহ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গোয়েন্দা দপ্তর তদন্ত করেছিলেন এবং তার পরেই নাকি সাইনবোর্ড এসে ঠেকেছে একটিতে। তবে জনৈক শ্রীচক্রবর্তী বর্তমানে একটি 'ট্রেড লাইসেন্স' যোগাড় করেছেন। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন জাগে বিবাহের আবার ট্রেড লাইসেন্স কি? তবে কি শ্রীচক্রবর্তী কোন ম্যারেজ অফিসার নিযুক্ত এক্ষেত্রে? শ্রীচক্রবর্তী সম্পর্কে এত প্রশ্নের অবতারণার কোন প্রয়োজনই ছিল না যদি না তিনি নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে জাহির করতেন। পার্শ্বর্তী চক্রবর্তী লেনের মুখে দাঁড়ালেই দেখা যাবে একটি ফলক। হলুদ রঙের উপর নীল রং দিয়ে লেখা—'শ্রীশিতবাস চক্রবর্তী, বিশেষ সংবাদ প্রতিনিধি, দৈনিক বসুমতী এবং আলিপুর বার্তা।'

জিম্বাবোয়ে জনগণের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষণায় আফ্রিকার বুকে জিম্বাবোয়েতে এক বর্বরিষেবী ফাসিস্ত রাজত্ব এখনো কায়েম রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সনদকে ক্যাসিস্ত ইয়ান স্মিথ সরকার কলা দেখাচ্ছেন। অ্যাংলো আমেরিকোর মুক্তি সংগ্রামের বিরাট সাফল্যের পর জিম্বাবোয়ে (রোডেশিয়া) সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের প্রচণ্ডতা বেড়েছে। ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৫১ কিলোমিটার জুড়ে গেরিলা তৎপরতা রয়েছে। জিম্বাবোয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষ্ণকায়দের রাজত্ব কায়েম হবার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য বর্ণবিদ্বেষী ইয়ান স্মিথ সরকার ধরপাকড়, মারপিট, খুনের রাজত্ব চালাচ্ছে। এই বছরের গোড়ায় দেড় হাজার দেশপ্রেমিককে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। আফ্রিকান কমিউনিষ্ট পত্রিকা সবসময় সংখ্যায় জানিয়েছে যে, এই সব দুর্ভাগা বন্দী শিবিরে ৮'লক্ষের বেশি দেশপ্রেমিক আটক রয়েছেন। তবে অন্য একটি হিসেবে এ সংখ্যা দশলক্ষের বেশি। এই সব বন্দীশালায় শিশু, বৃদ্ধ, নারী নির্বিশেষে মানুষ নির্মম অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে ধরনের বর্বরতা চালিয়েছিল সে ধরনের বর্বরতাই এখানে চলছে। এই বর্বরিষেবী সরকারকে সদর ঘোগাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিস্ত সংকার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইয়ান স্মিথ সরকারকে অপ্রকাশ্য সাহায্য যথারীতি দিয়ে যাচ্ছে। রোডেশিয়ার চলতির বেশি মার্কিন কার্য রয়েছে। এরা রোডেশিয়ার তেল, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র তৈরীর বড় বড় শিল্পগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দ্যাটো গোষ্ঠিরও নানা স্বার্থ এখানে রয়েছে।

জিম্বাবোয়ের জনসংখ্যা ৬২ লক্ষের কিছু ওপরে, এরমধ্যে কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের সংখ্যা ৫৯ লক্ষ, য়ুরোপীয় শ্বেতকায়দের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৩ হাজার, মেলটিজোর সংখ্যা ১৯ হাজার ১০০, এশীয়দের সংখ্যা ৯ হাজার ২৭। য়ুরোপীয়রা সংখ্যায় কম হলে কি হবে, তাদের দখলে জমির শতকরা ৪৫ ভাগ, ৩ ভাগ রাষ্ট্রের আর বাকী অন্যান্যদের। দেশের সমস্ত সহরগুলো হলো য়ুরোপীয় অঞ্চলে। আর ভালো জমিগুলো শ্বেতকায়দের দখলে। দীর্ঘকাল ধরে জিম্বাবোয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন কারণ ইয়ান স্মিথ সরকার কৃষ্ণকায়দের মানুষ বলেই গণ্য করে না, অন্তত মত কৃষ্ণকায়দের খুন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। কিন্তু আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে, স্বাধীন জিম্বাবোয়ের স্লোগান বাস্তবে পরিণত হতে দেরী নেই।

সজল রায়ের চিত্রপ্রদর্শনী

(দর্পণের সমালোচক)

লন্ডনের নিবিন বিশ্বাসের পর কোন বাঙালি শিল্পী এই প্রথম একক ছবির প্রদর্শনী করলেন। এই বিরল শিল্পীর নাম সজল রায়। চন্দ্রপোতীর সজল রায় পরিণত শিল্পী, দেশে বিদেশে তাঁর চিত্রকর্ম ইতোমধ্যেই রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। তবে, এতদিন আমরা তাঁর দেখি বা তৈলচিত্র হস্তাক্ষার শিল্পকর্ম দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এবার তাঁর চিত্রকর্ম ছবগুলো দেখে এক অপরিমীম তৃপ্তি পেলাম। প্রদর্শনীর জন্য চিত্রকর্মগুলো বাছাই করেছেন তাংতেজ অভিজ্ঞ বিশিষ্ট শিল্পী পরিতোষ সেন। স্থানাভাবে মাত্র ১টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। রবিবার ও ছুটির দিন বাদে অন্যান্য দিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে একটা এবং সাড়ে তিনটা থেকে সাতটা পর্যন্ত ভেতর সার্কিলের আর্টগ্যালারিতে (৩২ চৌরঙ্গী রোড) প্রদর্শনীটি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

বর্তমান শিল্প প্রদর্শনী থেকে রসিকরা একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন, শিল্পী সজল রায় তাঁর ছবিতে এক একটিকে যেমন আশ্চর্য গতিময় বলিষ্ঠতা এনেছেন অন্যদিকে তাঁর বক্তব্যও তেমনি জোরালো, নির্ভীক। যেখানে নির্ভুল টান, রং, ওয়াশ, এবং বক্তব্যের সুষম সমাহারে কখনো কখনো তাঁর কাজগুলো কবিতা হয়ে উঠেছে। যেমন, 'রবিং নিউজ কাটছি'। নীল, সবুজ রেখার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য নতুনত্বের স্বাদ। অথবা বন্ধন, ম্যানিফেস্টেশন; নীল, বেগুনি রেখার খেলায় এক মুরলী এবং প্রসারিত পথ —সব কিছু মিলে যেন আলোয় আলোময় হয়ে উঠছে জীবনের প্রোদ্ভাসন এক দিগন্ত। ভায়োলেন্স, ক্রুটালিটি, ইকো অব লাইফ, ফ্রম দা ডার্ক সেল ইত্যাদির কাজগুলো বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় সুস্পন্দন। বিদ্রোহের বিসম্বেদে একটি প্রতিরোধমূলক বক্তব্য, যেখানে জনতা কোন শয়তানের বিরুদ্ধে সমুদ্যত। ও, ওয়ার্ল্ড ছবিটিতে এক আদম প্রসবার অসহায় আতঙ্ক তাঁর সন্তান সম্পর্কে, পেটের উপরে রাখা তাঁর হাতের রেখায় এক বিশেষ বক্তব্য ফুটে উঠেছে। লালিতা, অ্যাবরিজিনের ক্ষেচ বলিষ্ঠ ও সাবলীল। দি লাস্ট জানি কাজটি রেখা, ওয়াশ ও স্পেডের কাজ, একজন মানব-মানবী যেন ক্রমেই যাচ্ছে আলোর পথ বেয়ে, চোখে-মুখে আলো আঁধারী খেলা। অ্যাংগেটি এবং বাইওমর্ফিক চঙের, ওয়াইল্ড বিষ্ট, প্রিমিটিভ এবার নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ সংযোজন। এক কথায় বলা যায়, সজল রায় প্রত্যয় নষ্ট এমন এক শিল্পী যিনি তাঁর তুলির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় সতত যাত্ব। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা অর্থহীন সৃষ্টি নয়, প্রধান শিল্পকর্মের কিছু নিদর্শন মাত্র।

প্রদর্শনীটি ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

সম্পাদক—বীরেন বসু

সম্পাদক বসুমতী কীর্তনী প্রেস, ১২৭/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ বট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৫ই নভেম্বর '৭৬ ॥ ৪০ পঃ

সম্পাদকীয়

নবেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও শিক্ষা

নবেম্বর বিপ্লবের গুরুত্ব নতুন করে অনুধাবন করার সময় এসেছে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের দ্রুতগ্রসারী তাৎপর্য বাইরের সমকালীন বুদ্ধিজীবি-সহল-অজ্ঞই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, বার্নার্ড শ প্রমুখ কতিপয় সুধী ব্যক্তীত। যারা পেরেছিলেন তাদের মধ্যেভাব লেনিনের সহগামী মার্কিন সাংবাদিক জন রীড মাত্র চারটি শব্দে ব্যক্ত করেছিলেন : টেন ডেজ্ দ্যাট শুক্ দ্য ওয়ার্ল্ড। নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি একাদিক্রমে বিপ্লবী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে বাধা হল। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের কথাই আবার প্রমাণিত হল যে, বাস্তব সত্য অমিত ক্ষমতাশালীর অভিপ্রায়ের চেয়েও অনেক গুণ শক্তিশালী।

৭ই নবেম্বর থেকে ১৭ই নবেম্বর —১৯১৭ সালের দুনিয়া কাঁপানো এই দশটি দিনের অভিঘাত • রাশিয়ার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারে, বর্তন স্ল্যানিটের নীতির প্রবক্তা লন্ডনে অর্জ-জেমার্শো-চার্চিলদের তা কমই জানা ছিল। ফ্রেঞ্চ ফ্রান্স-জাপান-জার্মানী-আমেরিকা প্রভৃতি যে ১৪টি রাষ্ট্র সেদিন দশ দিক থেকে লেনিনের শিশু রাষ্ট্রটিকে ঝাঁকুড়েই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল তাদের অর্থ, অস্ত্র বা লোকবলের অভাব ছিল না। সেই জন্য তারা ইতিহাসের বাভিল সেদিনের নায়ক কোলচাক-ডেনিকিন প্রমুখের শ্বেত প্রতিক্রিয়ার সহযাত্রী হয়েছিলেন; তাদের এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল যে, সশস্ত্র বাহিনীকে যোগাঁচাসা করা যদি বা যায় একটা ভাবধারাকে অবরুদ্ধ করা যায় না।

সামরিক হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরে হস্তক্ষেপকারীরা নতুন কায়দায় নবেম্বর বিপ্লবকে কণ্ঠরুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন আর্থিক, রাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে লেনিনের রাষ্ট্রকে একঘরে করে। এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল ১৯৩৩ সাল অবধি যখন প্রেসিডেন্ট এফ্. ডি রুজভেল্টের প্রথম জানোদয় হল যে, লেনিনের রাষ্ট্র এবং তাঁর ভাবধারা থেকালে অপ্রতিহত সেকালে তারা সেই বলে ভাগ করা সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি একাদিক্রমে বিপ্লবী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে বাধা হল। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের কথাই আবার প্রমাণিত হল যে, বাস্তব সত্য অমিত ক্ষমতাশালীর অভিপ্রায়ের চেয়েও অনেক গুণ শক্তিশালী।

মার্কসবাদী সমাজবাদের সঙ্গে অপরাপর তথাকথিত সমাজবাদের পার্থক্য প্রদর্শনের সুযোগ প্যারী কমিউনের ব্যর্থতার পরে মার্কস আর পাননি; কিন্তু কমিউন নেতৃত্বের ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে গেছেন। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবের সাফল্য প্রমাণ করল যে, মার্কসবাদ কোনো বাঁধা বুলি নয়, তা হল কাজের দিশারী—সবদল পরিবেশ অনুযায়ী তাকে ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করার যুক্তিসঙ্গত চিন্তাপ্রণালী। নবেম্বর বিপ্লব মার্কসের সেই শিক্ষাকে নতুন করে তুলে ধরল যে, শোষক শ্রেণীর সর্বগ্রাসী জবরদাস্তিকে যদি রাষ্ট্র, সবকার এবং সমাজের সকল স্তর থেকে উৎখাত করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শোষকদের উপরে পাল্টা জবরদস্তি ফলিয়েই তা করতে হবে। এ ছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা তথাকথিত মানবতার বুলি সুভাষিত বচনের মাধ্যমে সনাতন নীতিকে আড়াল করার কৌশল মাত্র।

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত আন্তর্জাতিকতা এবং মানবতাবাদের মুখোশ লেনিন অমোঘ ভাবে খুলে দিলেন। প্রকৃত মানবতাবোধের উদ্বোধন করলেন তিনি সামাজিক সবল সম্পদে সমাদের আপামর মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তিনি দেখালেন যে, অভাবের সময় ভিক্ষার ব্যবস্থা করা বা কন্যাসন্তান স্থাপনকে সমাজব্যবস্থা বলে না —সমাজ-

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

আইন সত্ত্বেও ভাগচাষীদের ওপর জোতদারদের অত্যাচার চলছেই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার বা ভাগচাষীরা জানে না যে, জমিতে তাদের পুনরুদ্ধারের চাষের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সামান্য অজুহাতে জোতদাররা তাদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারে না। তেমনি অধিকাংশ ভূ মহীন চাষী এখনো জানে না যে, রাজ্য সরকার তাদের জন্য সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এবথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একটি কমিটি বর্গাদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্টে যেটি গত ১৯শে অক্টোবর তারা বিধানসভায় পেশ করেছেন। ১২ জন কংগ্রেসী এম এল এ কে নিয়ে গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপুরঞ্জন প্রামাণিক বলেছেন যে, বিধান সভায় উপস্থাপিত ৮টি আবেদনের ফলেই ভাগচাষীদের সমস্যা সম্পর্কে অন্তত পর্যালোচনার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, যার একটিতে ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের কথা বলা হয়েছে এবং অন্যটিতে ভাগচাষীদের অধিকার সম্পর্কিত সমস্যা বিচারের জন্য একটি পৃথক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন ছিল। বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাক্ষ্য এবং মেদিনীপুর জলপাইগুড়ি পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলায়—যেখানে বিপুল সংখ্যক ভাগচাষী আছে—তদন্তের ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট।

বিধানসভার কমিটি বলেছেন যে, আইনের সাহায্যে ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তদন্তের সময় বেআইনী ও বলপূর্বক উৎখাতের বহু ঘটনা জানা গেছে। এ ব্যাপারে আইন অমান্য মালিকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনি।

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের বিশেষ সচিবের সাক্ষ্যে জানা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের সংখ্যা ২১ থেকে ৩০ লক্ষ। রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্গাদারদের সংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা শোচনীয়। এই অসহায় অবস্থার প্রথম কারণ সেটেলমেন্ট রেকর্ডে অধিকাংশে বর্গাদারের নাম অনুল্লেখিত। সুস্থার্থরা মালিকরা এর সুযোগ গ্রহণ করে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক ভূমি আইন অধিকাংশে বর্গাদারদের পক্ষে যাওয়ার ফলে এবং উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ মালিকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে জমির মালিকানা বর্গাদারদের নামে স্থানান্তরিত হবে। ফলে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করতে মালিকদের আরো বেশি আপত্তি। তাছাড়া মালিকদের উৎপাদনের "ভাগ" দিয়ে অধিকাংশ বর্গাদার কোন রসিদ পায় যার জন্যে তাদের নাম নথিভুক্ত করাতেও অসুবিধা এবং মালিকরা যখন তাদের বেআইনীভাবে ও নির্বিচারে উৎখাত করে আরও প্রতিরোধ তারা করতে পারে এবং "ভাগ চাষ" অধিদারের কাছে নিজেদের ভাগচাষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতও করতে পারে না।

কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেয়েছে বহু বর্গাদার—যাদের নাম নথিভুক্ত নয়—এখনও মালিকদের সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তারা সেটলমেন্ট রেকর্ডে নাম নথিভুক্ত করার চেষ্টা করলেই মালিকদের কোপের শিকার হয়। আবার মালিকরা ভাগচাষীদের ভাগচাষের মামলায় বুঝিয়ে তাদের জমি দখল করে। "প্রায়ই এরূপ ঘটে যে মালিকরা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারায় বর্গাদারদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে এবং যে জমি তারা চাষ করে সেই জমিতে তাদের প্রবেশ নিষেধ করে আদালতের আদেশ পায়। এই মামলার পরিণতি ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা যাতে বর্গাদারদের উৎপাদিত ফসল বাজেয়াপ্ত হয়। দারিদ্র জর্জরিত বর্গাদারের পক্ষে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রায়ই কঠিন হয়, রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে।

এম এল এর ব্যভিচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিড ষ্ট্রীটের এম এল এ হোষ্টেল থেকে শ্রীঅমর মণ্ডল নামক জনৈক বিধানসভা সদস্যকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। শ্রীঅমর মণ্ডল বর্ধমান জেলার জামুরিয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত শাসক দলের বিধানসভা সদস্য। হোষ্টেল থেকে শ্রীমণ্ডলকে বহিষ্কারের কারণ বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত। শ্রীমণ্ডল বাকি উক্ত হোষ্টেলের কক্ষে তাঁর জন্য নির্ধারিত একটি কক্ষ ছাড়াও অতিরিক্ত একটি কক্ষ নিয়েছিলেন তাঁর পরিবার নিয়ে থাকার জন্য। কিন্তু তিনি সেখানে যাকে নিয়ে থাকতেন তিনি বাকি শ্রীমণ্ডলের স্ত্রী নন। মোদ্দা কথা শ্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয় এবং সে কারণেই তাকে এম এল এ হোষ্টেলের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল পূর্বে এম এল এ হোষ্টেলের শূন্যপদ বজায় রাখার জন্য কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে, কারণ হোষ্টেলের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সেখানে বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

অমর মণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে হোষ্টেলের শূন্যপদ রক্ষা কমিটি শ্রীমণ্ডলকে হোষ্টেল থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেন এবং সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই শ্রীমণ্ডল হোষ্টেল থেকে বহিষ্কৃত হন।

কলকাতার হাসপাতালে ৩০০ ফ্রি বেড খালি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কিছুদিন আগে শেঠ শুকলাল কানোনি হাসপাতালে সি, এম, ডি, এ এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানা গেছে যে, কলকাতার হাসপাতালগুলিতে দৈনিক ৩০০ ফ্রি বেড খালি থাকে। এই বেডগুলির খরচ বহন করেন রাজ্য সরকার। কিন্তু যে প্রচোদনে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে খরচা হচ্ছে, সে প্রয়োজন কি মিটছে?

অনেক গরিব রোগী হাসপাতালে ফ্রী বেডের অভাবে নিজেদের চিকিৎসা করাতে পারছেননা। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আমাদের অনুরোধ, হাসপাতালগুলিতে যেন ফ্রি বেডের তালিকা ঝোলানো হয়। কতগুলি ফ্রি বেড খালি আছে, দপ্তর করা ফ্রি বেডগুলি কবে খালি হবে, এ সম্পর্কে একটি করে তালিকা যদি প্রবেশপথে হাসপাতালে রাখা হয় তবে রোগীরা উপকৃত হবেন।

গ্রামে কৃষি উন্নয়নের নয়া দিক অ্যাজোব্যাকটরের ব্যবহার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রবিখন্ডে জীবাণু সার অ্যাজোব্যাকটরের ব্যবহার সম্পর্কে নানা মহলে ব্যাপা আলোচনা চলেছে। চার পাঁচ টাকা প্যাকেটে র অ্যাজোব্যাকটর ব্যবহারে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন কমে যায়। জমি খরচে বেশী ফসলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পশ্চিমবাঙলার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নতুন ধরণের জীবাণু সার অ্যাজোব্যাকটর এখনও গ্রামে গঞ্জে চাষীদের পুরানো ধ্যান ধারণা পাল্টাতে পারছে না সম্পূর্ণ ভাবে। অথচ সম্ভাবনাময় এই স্বদেশী সার নিঃসন্দেহে সাড়া জাগিয়েছে। দরকার চাষীর ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

বোরো ধান গম আলু আখ তৈলবীজ পেঁয়াজ, তুলকপি বীষাকপিতেও ভালো ফলন দেয় জীবাণু সার। জমি তৈরীর সময় একর প্রতি গমের ক্ষেত্রে দশ কেজি ইউরিয়া, একশত পঁচিশ কেজি সুপার ফসফেট আর তেত্রিশ কেজি মিউরেট অফ পটাশের সঙ্গে তিন প্যাকেট জীবাণু সার দিতে হয় কাদা করার সময়। দ্বিতীয় প্রয়োগও তিন প্যাকেট রোয়ার সময়। সঙ্গে সঙ্গে চাপান সার হিসাবে পঁয়ত্রিশ কেজি, ইউরিয়া পঁচিশ দিন পরে এবং পঁয়ত্রিশ কেজি ষাট দিন পরে ব্যবহারে ভালো ফল অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি 'বাওলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিকসেশন' শীর্ষক এক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন আলোসিয়েশন অফ মাইক্রোবাইওলজিস্টস্। বহু বিজ্ঞান মন্দিরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সার ব্যবসায়ী চাষীদের ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রী। জানা গেছে জয়া ধানে পঁচিশ কুইন্টল ধান প্রতি একর থেকে চৌত্রিশ কেজি নাইট্রোজেন দশ কেজি ফসফেট আর আঠাশ কেজি, পটাশের শুদ্ধ তা তৈরী করে। এক একর জমির জন্যে চব্বিশ কেজি নাইট্রোজেন, ষাটো কেজি ফসফরাস আর চব্বিশ কেজি পটাশ দরকার। অথচ চাষীর সে সামর্থ্য নেই। তাই চাই সস্তা দরে সার অ্যাজোব্যাকটর।

ল্যোভান্ট আর্টিস্টস সার্কেলের চিত্র প্রদর্শনী

(দর্পণের সমালোচক)

ল্যোভ-ন্ট আর্টিস্টস্ সার্কেলের আট জন তরুণ শিল্পীর এক চিত্র প্রদর্শনী সম্প্রতি আকাদেমী অব্ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়। এই আট জন শিল্পীর সাত জনের বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে, একজন এঁদের চেয়ে কিছু বড়। শিল্পীরা সবাই ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র। বয়সে খুবই তরুণ হলেও নিজ নৈপুণ্যে কেউ কেউ পরিণত শিল্পীর মর্যাদা টুপেতে পারেন সন্দেহ নেই। সবচেয়ে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, এই প্রদর্শনীর প্রত্যেকে নিজস্ব এক বক্তব্যে উজ্জ্বল; অঙ্কন পদ্ধতি, তৈল রং ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এঁদের বিভিন্নতা। নিঃসন্দেহে এই শিল্পীরা প্রতিশ্রুতিশীল। তবে বয়স কম হওয়ার জন্যে কিছু কিছু ছবিতে পূর্বসূরীদের কিছিৎ প্রভাব থাকা অবধারিত।

শিল্পী সুনীল রায়ের স্টেড্ডী ড্রীম চিত্রটি একটি বলিষ্ঠ নিদর্শন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে রঙের সুষম ব্যবহার ও টোতাল একেই উল্লেখ। শিল্পী রায়ের স্পীড ও সন্তায় দু'টি কাজও সুন্দর। সজল দে-র দি হাংক ও আদোনি বেশ ভালো কাজ। শৈবাল দত্তের আপেল নয় জিনটি কাজ, অশোক আদকের ইমপ্রেশন ইন ব্লোয়াইট, দিলীপ ভট্টাচার্যের ইয়ারমিং ব্লেসিটন অ্যাণ্ড দি ভালচার, দীপক দাসের টুয়ার্ডস হোম, ক্যাথোড্রেল, রাধাবল্লভ মণ্ডলের ভিটার্ব ব্রুস বা কেয়ারি ল্যাণ্ড, এবং অরুণ সধাকারের দুটি কাজ (কম্পোজিশান ১ই এবং তিন) বলিষ্ঠ শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ বনিষ্ঠ শিল্পী নিরঞ্জন চৌধুরী। প্রদর্শনীতে মোট ২৮ টি কাজ ছিল।

পৃথ্বীশ সেনের চিত্র প্রদর্শনী

তরুণ শিল্পী পৃথ্বীশ সেনের কিছু কাজ ইতিমধ্যে রসিক জনদের দৃষ্টি করেছে। আকাদমীতে প্রদর্শিত ১৫টি কাজ (টেম্পারা, ওয়াশ, এবং ইঙ্ক ও ওয়াশ-এ) আকর্ষণীয়। বিশেষ করে, অ্যান অ্যাউল, ভারগুলিন ডে আফটার টু-মরো, চুনার ফোর্ট নিঃসন্দেহে শিল্পীর বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর।

সুনীল হালদারের প্রদর্শনী

সুনীল হালদার কোন আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষা নেননি। ছবি আঁকা তাঁর নেশা। তাঁর আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে নৈসর্গিক বিষয়ক চিত্রগুলো বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। অবশ্য আলিঙ্গন চিত্রটি সুন্দর কাজ।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে দুর্নীতির অভিযোগ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

দরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড দুর্নী ওর আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকায় গত বহু ছাত্র হতাশ হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ উপর তলার আমলারা এ পুণবাদি করছে, এবং তারই শিকার ছাত্ররা। তাদের এই উক্তির কারণ দেখাতে গিয়ে তাঁরা বলেন, হাজিয়াড়া হাই মাদ্রাসা গত বৎসর ভাল ফল করেছিল; কয়েক শত ছেলের মধ্যে মাত্র ৬/৭ জন ফেল করেছিল। এবৎসর শতকরা ৯১ জন ফেল। কিন্তু রাজারহাট মাদ্রাসার ফলাফল গত বৎসর খুবই খারাপ ছিল তুলনামূলক ভাবে। এ বৎসর এই স্কুলের ছাত্ররা শতকরা ১০ জন পাশ করেছে। বোর্ডের হার যেখানে শতকরা ২৪। রাজারহাট মাদ্রাসার প্রাইভেটদের মধ্যে প্রায় ছেলেই প্রশ্ন কোথা থেকে এলো তাও বরতে অক্ষম, টোকাটুকি হয়েছে প্রবল ভাবে। অধিকাংশ ছেলেই টোকাটুকির আশ্রয় নিয়েছে।

অভিযোগ, কম পাওয়ার ভাল লিখেও অনেকে নম্বর পায়নি; কিন্তু বেশি পাওয়ার আবোল-তাবোল লিখেও অনেকে ভাল ফল করেছে। একজন অভিভাবকের মন্তব্য, নম্বর পাওয়া দেখেই দেওয়া হয় খাতা দেখে নয়। কাল ২৮২ রোল নম্বর ধারী একটি ছেলে পরীক্ষা দিয়েও বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনুপস্থিত হয়ে আছে। উক্ত ছেলেটির অজ্ঞাতে খাতা চুরি যায়, সেন্টার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কথাবার্তায় খাতা জমা পড়েনি, তাহলে সে অঙ্কে নম্বর পেলো কেমন করে? এমন বহু ঘটনা বহু ছাত্রের ভাগ্যে ঘটেছে। একে কি বলবো? বোর্ডের টাকা রোজগারের ধান্দা? যে ২৫ নম্বর করে গ্রেস দেবার কথা ছিল তা নাকি ফেল করা ছাত্রদের ভাগ্যে জোটেনি। এই বিষয়ে ছাত্ররা, শিক্ষামন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে।

মাও সে তুং

· সাধন গুহ

তিনিই বলেছিলেন : দিকে দিকে শতপুষ্প বিকশিত হোক।
সাড়া দিয়ে ব্রোঞ্চত্বিনী পলি দিলো, ঝড় দিলো প্রাণের আবেগ ;
দাঁড়ালো নতুন তেজে সংগ্রামের সাহচর্যে পিষ্ট মানবতা :
প্রতি পুষ্প মূর্ত হলো ঋজুশির সৈনিকের প্রবীপ্ত পৌরুষে।

রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও তিনিতো অনেকবার মুখ দেখেছেন
কখনো নদীর জলে, কখনো বা প্রাকৃতিক দৃশ্য কাব্য পটে,
অথচ ফলের মত শুচিস্নিগ্ধ সে-ই তিনি কঠোর প্রজ্ঞায়
শেখালেন নবমন্ত্রে শ্রেণীযুদ্ধ প্রয়োগের নিপুণ কৌশল।

তিনিইতো শেখালেন ফুলকে ফুলের নামে শুধু ডাকা নয়,
স্বাধিকার অর্জনের শ্রেণীযুদ্ধে ফুল হোক মনের সৌরভ,
কুসুমের পবিত্রতা অস্ত্র হোক রণক্ষেত্রে প্রতি সৈনিকের :
কবিতাও হোক আজ স্থির তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদ শত্রুর শিবিরে।

কবি ছাড়া জয় বৃথা সারা বিশ্বে ধ্রুব সত্য শাশ্বত কালের।
সে কথা নতুন করে প্রমাণিত হোয়াং হোর তীব্র খরবেগে
ইয়েনান থেকে ধীরে সাংহাই নানকিং হয়ে পিকিংয়ের বুকে :
প্রামাণ্য দলিল তার মাও-সে-তুং, আলো-রেখা বিশ্ববিপ্লবের।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইংরাজী শিক্ষা

মিহির আচার্য

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র এক শ্রেণী দ্বারা আরেক শ্রেণীকে দাবিয়ে-রাখার অস্ত্র বিশেষ। শাসকশ্রেণী শুধুমাত্র শাসন পদ্ধতি তৈরি করে নিশ্চিন্ত থাকে না। এ-শাসক-গোষ্ঠী যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ হয় তাহলে তার রাজত্বকে দৃঢ়মূল করতে উপনিবেশেও স্থানীয় লোকদের মধ্যে তাকে সমর্থক ও সহযোগী খুঁজতে হয়। তাগা আদি থেকেই সাম্রাজ্যবাদ প্রসাদপুষ্ট সুবিধেভোগী হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের চিত্তজগৎ পঞ্চমুখ প্রশংসা জুড়ে দেবে।

এই সহযোগী শ্রেণী যত পুষ্ট হবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তত সহায়ক হবে। কাজেকর্মে স্থানীয় সহযোগীদের মূল্যবান সৌহার্দ্যেই সাম্রাজ্যবাদকে নিজের দেশ থেকে লোক এনে শাসক চালনার বাড়তি খরচ সইতে হবে না।

এই উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তাদার বা মুনসীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করবার কালে তাদের সঙ্গেই জমিদারি সূত্রে গাঁটছড়া বাঁধা হল। জমি রাজস্বের আয়ই এদেশে ব্রিটিশের প্রথম পুঁজি, ঔপনিবেশিক সুদোন। এই লুঠনের চিরস্থায়ী ঠিকে দিল জমিদার শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার একটি অবরদস্ত খাঁটি হল জমিদার, যারা জমিদারি শেকলের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের শেকলকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে নিল। দুটি স্বার্থ একই সূত্রে জড়িত হওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনোটিরও বিচার করা সম্ভব নয়।

ব্রিটিশের দ্বিতীয় কাজ হল, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পাহারাদার হিসেবে এদেশে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র তৈরি করা যারা কেরিয়ার তৈরির মুখাপেক্ষী বলিপ্রদত্ত এবং দেশের বৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, জনবিরোধী, অন্ধ, নিষ্ঠুর যন্ত্র বিশেষ।

তৃতীয় কাজ হল, শাসক গোষ্ঠীর ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সম্ভব হলে ধর্মে কালা চামড়ার 'ইংরেজ' তৈরি করা। যারা জমিদার নয়, আমলা নয়, তথাকথিত 'মধ্য শ্রেণী'।

কাজেই এটা একটা পরম সত্য যে, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, আচার আচরণ, সংস্কৃতির 'স্বাধীন' কোনো অস্তিত্ব নেই। তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়ই বিভিন্ন মূল্যে।

সাম্রাজ্যবাদকে মজবুত করবার অভিপ্রায়ে এসব কালে হাত দিতে ব্রিটিশের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সেরেস্তাদার-মুনসী জমিদার চক্রের প্রভুভক্তি জন্মকাল থেকেই, বিশেষ করে বাঙালী সুবিধেভোগী শ্রেণীর মধ্যে, অপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ প্রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। বস্তুত কোনো ঔপনিবেশিক গোলামই এমন করে বিদেশী প্রভুকে এই ধরনের ভালোবাসেনি।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যখন এদেশে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার প্রয়োজন দেখা দিল তখন রামমোহন রায় বিদেশী শিক্ষার প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এলেন। উল্লেখযোগ্য, এই রামমোহনই মুসলমান আমলে তৎকালীন সরকারি ভাষা ফার্সী শিখেছিলেন।

শাসকগোষ্ঠীর বদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইংরাজি ভাষার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

মেকলে সেদিন যে আশা পোষণ করেছিলেন ভারতীয়ের মধ্যে কালাচামড়ার সাহেব তৈরি করবার, যাঁরা আচারে-আচরণে ইংরিজিয়ানায় বুঁদ হয়ে ক্রমে নীচুতলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবেন। এটাই মেকলের infiltration theory. কাজেই ইংরাজি শিক্ষার প্রয়াস সীমাবদ্ধ রইল উচ্চশিক্ষার মধ্যে, পল্লী অঞ্চল থেকে দূরে কতিপয় শহরে মধ্য শ্রেণীর চৌহদ্দিতে। প্রাথমিক শিক্ষার দিকে ব্রিটিশের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। কারণ 'ছোটলোকদের' মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঝুঁকি অনেক। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে শহরে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তাদেরি শ্রেণীস্বার্থকে নিরাপদ করবার প্রয়োজনে।

ইংরাজি শিক্ষার পাথরটা ইংলণ্ডের ছাঁচে ছাওয়া আমাদের সমাজদেহে বসিয়ে দেয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ-ইস্কুলের মজবুত কাঠামোটা গড়ে উঠল। আনুষঙ্গিক দাসি সমাজও পৌঁছে গেল। শিক্ষার মাধ্যম বিদেশীভাষা নির্দিষ্ট হল, পাঠ্যসূচী, গঠন পাঠনের কৌশল ইত্যাদির সমাবেশে এক রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল।

এদেশে ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থার গুণগানে ইংরা পঞ্চমুখ তাঁদের কাছে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, এই শিক্ষার কী ফলশ্রুতি আমাদের ওপর বর্তেছে? একটা কাজের ভালোমন্দ বিচার হবে তার ফলের ওপর। আমাদের তো মনে হয় সাম্রাজ্যবাদ যে-উদ্দেশ্য এ দেশে ইংরাজি চালিয়ে দিয়েছিল তার সে-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। অর্থাৎ বৃহত্তর দেশের মানুষের সম্পর্ক রহিত শহুরে শিক্ষিত (?) মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব, যাদের হাতে নিশ্চিন্তে একদা ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে। ইংরাজি শিক্ষা সার্থক ভাবে আমাদের নিজস্ব অবস্থান, পরিবেশ, প্রয়োজনকে ভুলিয়ে দিয়ে ধার-করা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে আলগাভাবে চাপিয়ে দিল। আমাদের দেশের যা কিছু মূল্যবান উত্তরাধিকার ছিল সবকিছু নস্যাৎ করতে শিখে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যকেই বড় করে দেখলাম। এবং একজন নিষ্ঠাবান 'ভারতীয় প্রজা' হিসাবে এ দেশের সমস্যাকে বুঝতে ও সমাধান করতে প্রয়াসী হলাম। আমরা এসকল ধারণা পোষণ করলাম যে, ইংরাজ আমাদের 'জাতীয়তাবোধ' 'দেশপ্রেম' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথম শিক্ষিত করল। এবং এই ধারণার বুঁদ হয়ে দেশের আসল চেহারা—বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, শ্রেণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধামাচাপা দিয়ে সভ্যোজাগ্রত মধ্যশ্রেণীর শাসকশ্রেণীতে উন্নীত হবার স্বপ্ন দেখতে শিখলাম।

আমাদের 'জাতীয়তাবোধের' একটি চমৎকৃত দৃষ্টান্ত এই: সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ১৮৫৭-এর মূলত কৃষক-সংগ্রামকে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে কলঙ্কিত করলামই শুধু নয়, বাঙালী বুদ্ধিজীবী তার তাৎপর্যকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করল। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' আমাদের ছাত্রেরা আজো পর্যন্ত ঘটনাটিকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে মুখস্থ করছে। এই ইতিহাসই সিরাজদৌল্লাকে নৃশংস সাজিয়েছে, প্রতাপ রায়কে নির্মম বানিয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কল্যাণকর এঁকেছে, ক্যানিংকে 'দয়ালু' বলতে শিখিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কৌতুকের বিষয় আমরা এ সকলকে সত্য মেনে পরীক্ষায় পাশ করেছি।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সাম্রাজ্যবাদী বশ্যতাশৃঙ্খলের মূলোচ্ছেদ করবার চেষ্টা হল। নেতৃত্ব এ দেশের প্রয়োজনে 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তন করবার কথা চিন্তা করলেন। এই 'জাতীয় শিক্ষার' কল্পনা মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা-দোষে-দুষ্ট হলেও এই উদ্যোগেরও একটা মূল্য আছে।

এ কথাটা পরিষ্কার করে বোঝবার শুরুত্ব রয়েছে যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব দীর্ঘকাল আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-অনুরাগী করে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, আইরিশ বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লব—ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে এ-দীক্ষা আমরা কোনোকালেই গ্রহণ করিনি।

অথচ বারবার আমরা ব্রিটিশের কাছে আবেদনের থলি নিয়ে এগিয়েছি, তাদের চিত্তের ঔদার্যের নিকটে অনুরোধ জানিয়েছি। যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব ঔপনিবেশকদের ক্ষেত্রে প্রধান।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইংরাজের সহনশীলতা গুণের যখন নির্মলা প্রশংসা করতে উদ্যত হন তখন আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশে ব্রিটিশের উলঙ্গ বর্বরতার কথা ভুলে যান। ভারতবর্ষে তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা যদি কম হয়ে থাকে তা তার ঔদার্য নয়, তার কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের পুঞ্জ প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদের অকৃত্যাগ শ্রেণীর সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতিতে উগ্রতা চরার প্রয়োজন অকৃত হয়নি। জাগ্রত মধ্য শ্রেণীর এই passivity-ই সাম্রাজ্যবাদকে দীর্ঘকাল এদেশে নিরাপদ করেছে। সিপাহী বিদ্রোহকে' দমন করবার জন্যে ইংরাজ দেশকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে সেই স্মৃতিকে ভুলতে গিয়ে আমরা ক্যানিংকে 'দয়ালু' বানিয়েছি। বুঝিনি ক্যানিংয়ের এই 'দয়া' সাম্রাজ্যবাদী রীতি-ই অন্ত কৌশল মাত্র।

ইংরাজী শিক্ষা প্রসঙ্গে যে ঔপনিবেশিক জাতিনিদান সভ্যতার কথা ওঠে সেটা বিশেষ করে সমগ্র য়ুরোপেরই দান, তজ্জন্য একক গৌরব ইংরাজেরই প্রাপ্য নয়। ইংরাজ ছাড়া ফরাসি কী জর্মান, যে কেউ হলেও বিংশটা একই হত। ইংরাজের জানালা দিয়ে আমরা বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর এতাদৃশ নির্ভরা ভক্তিও আমাদের যেরুদণ্ডহীনতার প্রমাণ। ইংরাজরাজত্ব এদেশের পঞ্চবার্ষিক দুর্ভিক্ষেরই অন্যনাম, কখনোই প্রগতিশীল ভূমিকা বহন করে আসেনি। ইতিহাসের অচেতন ধাত্রী-মাত্র। শিল্পবিপ্লবের সুফলও ইংলণ্ডে হতে পারে এবং প্রধানত ভারতবর্ষই তার প্রণামী জুগিয়েছে এও তেমনি সত্য। কাজেই শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি এদেশে কোনো অর্থনৈতিক বিপ্লবেরই আগিয় দেয়নি বা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীরও সৃষ্টি করেনি। বস্তুত ব্রিটিশের সহযোগ উনিশ শতকে যে-রেনেসাঁসের প্রচার আমরা করি তা সাম্রাজ্যবাদ সহযোগী শহুরে মধ্য শ্রেণীরই নকল রেনেসাঁস যা য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের মতো কোনো গুণগত পরিবর্তনও সূচিত করেনা। তা বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদ পৃষ্ঠপোষণা পুষ্ট ধর্ম বা সমাজ-সংস্কারের কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক চিন্তার কোনো আলো সেখানে বিকীর্ণ হয়নি। কারণ ওতদিনে এই প্রধান রেনেসাঁসওয়ালারা শাসনে ও শোষণে ইংরাজের জুনিয়র পার্টনার হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে কেউ কেউ বলবেন, ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আস্বাদ পেয়েছি। এটা বিশ্বাসের কথা, সত্যের কথা নয়। ইংরাজি সাহিত্যের মতো বিশ্বে জর্মান সাহিত্য আছে ফরাসি সাহিত্যও আছে আছে, (গ্রীক সাহিত্য কোনো দেশের নৈতৃক সম্পত্তি নয় আশা করি।) এবং কোনোটিই কারুর তুলনায় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়! সাহিত্যে এলিজাবেথ বা ভিক্টোরিয়ার যুগকে আমরা পরীক্ষা পাশের জন্যে পড়েছি, ইস্কুলে বা কলেজের পাঠ্যপুস্তকে আমাদের সাহিত্যবোধ কখনোই জাগেনি। শেকসপীয়র মিলটন-বায়রন সম্পর্কে আমাদের বিদ্যা অ্যাকাডেমিক মাত্র। তৎকালীন সমাজে এইসব লেখক সম্পর্কে বস্তুগত বিচারের শিক্ষা আমরা ইস্কুল-কলেজে পাইনি, তা আমাদের ব্যক্তিগত সমাজ দৃষ্টি ও অধ্যয়নের ফল। আমাদের সাহিত্যিকরা অন্যের মতো ইংরাজি সাহিত্যকে যতখানি করেছেন এবং আজো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য মানলে, ভিক্টোরিয়ার যুগকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। সাহিত্যবোধের নামে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার চশমাকেই নাকে চাপিয়েছি। ফলত আমাদের সাহিত্য মূলত কলোনীয়াল সাহিত্য ছাড়া কিছু নয়। শেলী বা বায়রনের সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমাবেগ আমাদের এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তাদের র‍্যাডিকাল চিন্তা ও স্বাধীনতাস্পৃহাকে আবরণ দেয়া হয়েছে। সনাতনী ওআর্ডস্বার্থকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

হ্যাঁ, ইংরাজ আমাদের বিশ্বসাহিত্যের জানালা খুলে

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

বিশ্বরূপার বিবিধভারতী অনুষ্ঠান এবং হরিসাধনের টিফিনখানা

মিত্রেণ

কিছু কিছু মানুষের এজন্মেই হাতী হাতী চেহারা থাকে, লোকটাকে দেখতে ছিল অবিকল সেই রকম। কালো মুখকো মেদালু পরীর। ওপরে বৈদেশ অশ্লীল আকারের আদিখ্যেতা। বড়দের অপছন্দ আর আমাদের কৌতুক থেকে মানুষটার সে সব খবরে অবশ্য কিছুমাত্র দৃক-পাত ছিল না। আজুষ্ট গদাইলস্করী চালে শুরু হ'ত তার দ্বিপ্রাহরিক পদযাত্রা। সঙ্গী বলতে ছিল একটা কাঁধে-ঝোলা কাপড়ের থলে। সেই ঝোলায় থাকত পেল্লাই আকারের মাথাঘোটা অদলবদল চুঁচোবাজি সদৃশ কাঁগজের প্যাকেট। প্যাকেটে আধাসের লোভে ভেজা টকনোনতা চানাচুর, যার অপর নাম, হরিসাধনের টিফিনখানা।

লোকটা জাতে ফেরিওয়ালা কিন্তু নেশায় কবিয়াল। টিফিনখানার ওপর পটাপট তাৎক্ষণিক পদরচনায় তার বড় সুখ ছিল। রাস্তায় লাটু ঘোরাতে দেখে আমাদের উদ্দেশে সে ছড়া কাটত :

হোবি সা-ধনের টি-ফিন্ খা-আ-না আ।
দিদি-বৌদির আঁচল থেকে পয়সা এনে
খোকাখুকুরা খেলতে বেরুতে টি-ফিন কিনে খাও না-আ।

বলা বাহুল্য, বহু মিনতি সত্ত্বেও অমন একটি বেচপ পুরুষ মানুষের হুমো হুমো কণ্ঠস্বরে পাড়ার কোনো দিদি বৌদিকেই পুলকিত হতে দেখিনি কোনোদিন। বরং তাদের রমণী সমাজ ক্রমেই মরমে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। লোকটার গলার আওয়াজ পেলেই খোলা দরজা উন্মুক্ত গবাক্ষপথ থেকে টুপটাপ খসে পড়তেন তাঁরা। অফিস ফেরৎ পুরুষদের কাছেও অনেকে নাকি শেষ পর্যন্ত অভিযোগ কছু করতে শুরু করেছিলেন। আমাদের ওপর হুকুম ছিল, কেউ যেন একটি পয়সাও ঐ লোকের চানাচুরের পেছনে ব্যয় না করি।

কিন্তু সবিশেষ গোল বাধালেন পিন্টুর বড়দি। কিছু দিন যাবৎ তাঁর মনমেজাজ ভালো যাচ্ছিল না। স্বামী হাসপাতালে। উদ্যম দুপুরে জানলার গরাদে গাল চেপে নির্জন টিলের ভাসাভাসি দেখছিলেন। প্রচুর অশান্তির মধ্যে এক টিলতে বিষণ্ণ শান্তি বুঝি খেলার আয়না করে নিয়েছিল তাঁর ক্লান্ত চোখের তারায়। হাতে ধরা এঁটো কাপের চা কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। এমন সময় হরিসাধনের হুম হুমে কণ্ঠের বেসুরো কাব্যামোদ তাঁর চমক ভাঙিয়ে দিল। কানে এলো : জানলায় বসে যার কথা ভাবছেন, তার কথা ভাবতে ভাবতে এই টি-ফিন খান-না-আ ॥

সোনামাত্র পিন্টুর বড়দি মহিমময়ীদিবীর ভূমিকায় জিশুন দাবানোর তাগিদে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন সেই এঁটো চা। আঃ, কী করুণ দৃশ্য। এঁটো-চায়ে-ভেজা মুসকো রোমিওর চেহারা তখন যথার্থ একটি মুহূর্ত-তাড়ানো ভুঁকো হুলোর মতো। দেখে আমাদের যে কী উল্লাস। কৈশোরকাল বাস্তের বিড়ম্বনায় নিষ্ঠুর আনন্দ লাভ করে। আমরা সানন্দে লোকটার পিছু ধাওয়া করে চিরদিনের জন্ত তাকে আমাদের পাড়াছাড়া করেছিলাম। কেবলমাত্র কবিত্বের নেশায় লোকটা তার বাণিজ্য লক্ষ্মীকে অসন্তুষ্ট করেছিল।

আকাশবাণীর বিবিধ ভারতী প্রোগ্রাম ভিন্ন ইদানীং ঘরের লোকেরা আর কিছু শুনতে চায় না। এমত পপুলার বিবিধ ভারতীর হরেকরকমবার মধ্যে বিজ্ঞাপন দাতাদ্বারা আয়োজিত বিশেষ একটি প্রোগ্রাম শুনলে কেন জানি না আমার সেই ছেলেবেলার হরিসাধনের টিফিনখানা-গুলোকেই মনে পড়ে যায়। অদ্ভুত এ্যাসোসিয়েশন, সন্দেহ নেই।

বিশ্বরূপা থিয়েটার আয়োজিত একটি প্রচারানুষ্ঠানের ঘোষক যেই তাঁর ঘোষণা শুরু করলেন, অমনি চমকে উঠি আমি। টিক, টিক।

সেই রকমই হুবহু হুবহু কণ্ঠস্বর। একই ধরনের কর্তব্য-বিভ্রম। অর্থাৎ নাইতে নেমে শিবের গীত। টিফিন-ওয়ালার ছিল কবিত্বের নেশা। এনার নেশা, পাণ্ডিত্য প্রচার। চানাচুর বেচার উদ্দেশ্য ভুলে সে বেসুরো গলায় পাড়া অতিষ্ঠ করত তার স্বরচিত পদাবলীর আঘাতে। ইনি বেচতে চান, বিশ্বরূপা থিয়েটারের টিকিট, কিন্তু বিতরণ করেন এমন এক ধরনের বাগাড়ম্বর, যা আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে ঘণ্টাখানেকের পর লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়। পরিশেষে দেখি, আমার সাজানো লাইব্রেরী ঘরে ঝাড়া পনের মিনিট বিশ্বরূপাইয়া তাণ্ডব ঘটে গেছে। সব কিছুই এলোমেলো আর স্থানচ্যুত। দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে প্রেক্ষে লেখক শ্রীবিমল মিত্রের 'পরশ্রী'। 'পরশ্রী'র সঙ্গে বুদ্ধ খুই চৈতন্ত হুমড়ো হুমড়ি পড়ে আছে বিশ্বরূপার বেতার ঘোষকের কণ্ঠ বিস্ফোরণের হুম হুমে আঘাতে। আবার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'র বিজ্ঞাপনী কলমল ল ইত্রেরী ঘরে ঘটিয়েছে যথার্থ 'বাস্তিলের পতন'। বন্দী অর্থনীতির পুস্তকাবলী যন্ত্রতন্ত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে। ম র্কসবাদী রুশোসেনিন ও ইন্সিরাজীর বিপদফার শোচনীয় দফারফা। সবাইকে আর সব কিছুকে ঘোষক মশাই এলোপাথাড়ি টেনে এনেছেন তাঁর 'কড়ি দিয়ে সব কেনা যায় রে মুখপোড়া' থিওরিকে এসটাব্লিশ করার জন্ত। কী ভয়ঙ্কর উদ্ভাবনী শক্তি সিস সিস করছে, কী প্রাণান্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘোষক দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা, আর কী নিষ্ঠুর পণ্ডিত মশাই তাবৎ শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁর এনসাইক্লো-পীডিয়ার ক্লাসে জবরদস্তি ছাত্র বানিয়ে পাখিপড়া করে শিখিয়ে যাচ্ছেন, বিমল মিত্রী সাহিত্যের ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও অর্থনীতি। যদিও হরিসাধনের টিফিন বিক্রেতার মতো তাঁরও একই সাধু উদ্দেশ্য, কিছু সওদা করা। তাই সমস্ত জ্ঞান বিতরণের উপসংহার হচ্ছে সেই একমএব অদ্বিতীয়ম শ্লোকতত্ত্বে : তাপসের আলো, স্বরেশের দৃশ্যপট, আর মনমাতানো ভেরোনিকার নর্তনকুর্দনের ফিরিস্তি। টিকিট বেচার এহেন এনসাইক্লোপীডিয়ার গীত আমাদের শিক্ষার্থীকার ওপর নিয়মিত বলাৎকার করে চলেছে আকাশবাণীর বিবিধ ভারতীর মতো বহুল প্রচারযোগ্য এক মাধ্যমের মারফৎ।

আশা করেছিলাম, পিন্টুর বড়দি কেপে ওঠবে আগে স্বয়ং বিমল মিত্রই বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবেন, যেন 'কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়' এই দারুণ 'নভেল' ওয়ালি মুখ পোড়াদের বোঝাবার জন্ত এই-রীতিতে সাহিত্য সমালোচনার মুখ না-পোড়ানো হয়। কিন্তু এতোদিন অপেক্ষার পর একবারই মাত্র তাঁকে 'মঞ্চে ক্রতদর্শন রীতি'র বাঁধভাঙা প্রশংসার আসরে হাজিরা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে দেখা গেল না। নিঃসন্দেহে তিনি আজকের অন্ততম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর মতো ওজনে-বৃহৎ একাধিক উপন্যাস আর কেউ রচনা করতে পারেননি। আর তাঁর সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রতিভা হ'ল ঐ বৃহদাকৃতির কনটিনিউটি যথাযথ রক্ষা করার অদ্ভুত ক্ষমতা। অন্ততঃসেদিক থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে উৎপন্ন হতে পারত, কেননা তাঁরই পুরুক ব্যাখ্যায় এক বিজ্ঞাপনী প্রচার-প্রোগ্রাম যে অদ্ভুত এলোমেলো এনসাইক্লোপীডিয়ার জন্ম দান করে যাচ্ছে, বিমল মিত্র আর যা হ সহ্য করুন, এই কনটিনিউটির মাথা-মুণ্ডকহীনতা সইছেন কী করে। তাঁরই সাহিত্য কৃতিকে ঘোষক মশাই যে হাস্যকর ব্যাখ্যানার মধ্যে নিয়ত টানা-টানি করছেন, সেটা বিমলবাবুর স্বয়ং শোনা ও দেখা দরকার।

সাধারণ শ্রোতার কানে প্রোগ্রামটি শুনলেই হরি-সাধনের টিফিনখানা বিক্রেতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন বিমল মিত্র নিজেও। সুস্বরেন, একই বসরৎ-কলা তাঁর ওসারে-মোটা সাহিত্যরাজির কী বিচিত্র চেহারা সাজিয়ে ধরেছে ক্রেতিও শ্রোতাদের কাছে।

হরিসাধনের টিফিন যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মশলাপাতি দিয়ে তৈরী এই তথ্য জানিয়ে টিফিন বিক্রেতা বেরুবো গলায় হাঁকতেন, "এই, কা—র্ণ—ফীর থেকে মশ—লা অ—না। হরি-সাধনের টি—ফিন খা—না। এক পয়সায় কি—নে খান—না।"

কান পাতলে বিমলবাবু এখন শুনতে পাবেন প্রচারকের ব্যাখ্যায় বিমল মিত্রী সাহিত্যে কেমনধারা বিষজ্ঞানের পাক ঘটে গেছে। তাঁর 'সদানন্দে'র মধ্যে বুদ্ধ খুষ্ট চৈতন্ত কী-ভাবে চেতনা হারিয়েছেন। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'র বৃহৎ ওসারে কেমন ভাবে চেপে আছেন মার্কস লেনিন, গান্ধী ইন্দিরা, রুশো ভলতেয়ার, কোপার্নিকস কিংবা মিথেমাক্লে-লোরা। ফ্রান্সের লুই রাজতন্ত্র আর ১৯১৭-র বিপ্লব এই একের মধ্যে একটা, 'কড়ি দিয়ে কিনলামে' একাকার হয়েছে কী অভিনব চাতুরীতে! বিশ্বরূপার প্রচারক হরিসাধনের টিফিনখানার মতো অজস্র মশলায় তাঁর 'কড়ি দিয়ে কিনলামকে' কী নিদারুণভাবে ঠাসছেন।

পিন্টুর বড়দি থাকলে কি করতেন বা বলতেন আমি না। কিন্তু সব শুনে বুঝে বিমল মিত্র কি একবারও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন না, কড়ি দিয়ে সবই কেনা যায় রে মুখ পোড়া সবই কেনা যায়। মাগ, আকাশবাণীর বিবিধ ভারতীতে পনের মিনিটের প্রোগ্রামও কেনা যায়।. কিন্তু ক্রেতার জ্ঞান বেড়ে গেলে যে সর্বনাশ। তখন আর ভেরোনিকার নর্তন দৃশ্যে ১৯১৭-র বিপ্লব দর্শন করার জন্ত টিকিট কেনা যায় না—এই কথাটি কি আবার একটা থানইট কিতাব লিখে বোঝাতে হবে।

মুসলিম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ সম্পর্কে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিবাহ ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের জন্ত এবং ধর্মমতে ইসলামী নিয়ম কানুনে সাধারণ করার জন্ত সরকার মনোনীত মুসলীম কাজী ও ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার থাকেন প্রতিটি জেলায়। এদের নিয়োগ করা হয় ইনসপেক্টর জেনারেল অফ রেজিসট্রেশন (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের) তত্ত্বাবধানে।

ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিয়োগে রাজ্য হজ কমিটির মত একটি গোজামিল কমিটি আছে বলে কলকাতার ইসলাম মিশনের সম্পাদক সাজেদুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন। ঐ কমিটি শুধুমাত্র কলকাতার কিছু অবাঙালী মুসলীম ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই কমিটি ঢেলে সাজানো দরকার।

কলকাতার খিদিরপুর এলাকার ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার হবার ইচ্ছা সকলের। তাছাড়া খিদিরপুরে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের উপায় হয় বেশী। কিছু দিন আগে পর্যন্ত খিদিরপুরের ইব্রাহিম বোডের ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার অফিসে আবদুর রহিম নামে এক ভদ্রলোক চাকুরী করছিলেন। কাজী মাহফুজর রহমান ছিলেন তার আগের রেজিষ্ট্রার। অথচ হঠাৎ আবদুর রহিমের জায়গায় জোর করে নতুন লোক নিয়োগ হবে বলে জানা গেছে। নেপথ্যে ইসলাম 'মিশনের এ. এফ. কামরুদ্দীন আহমদ দাবী করেছেন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিয়োগে অবশ্যই গ্রাজুয়েটদের সুযোগ দেওয়া হোক। আরবী জানাও একটা যোগ্যতা। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিয়োগের দপ্তর জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট এবং তাঁরপ্রাপ্ত মন্ত্রী আবদুর সাত্তার সাহেবকে এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হচ্ছে।

সৃজনী প্রতিভার আধার মাও সে তুং

মার্কসবাদী

গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক এই দুইস্তরে বিপ্লব সম্পূর্ণ করার ভুত্ট্স্কীবাদীদের শেষ আশ্রয়স্থলটিকে চূর্ণবার করে দেয়। সমস্ত রকম বাধনহা সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এ এক অমোঘ হাতিয়ার। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের প্রশ্নে (?) বিশেষ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এই মার্কার সুবিধাবাদ বারে বারেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মাও-এর তীক্ষ্ণ নজর এড়াতে পারেনি এই সমস্যা। তাই তিনি হুঁশিয়ারী দিলেন 'আমাদের সামনে যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন তা পুরনো ধারার পুরনো গণতন্ত্র নয়; এ হ'ল নতুন ধারার এক গণতন্ত্র, নয়া গণতন্ত্র।' এ প্রসংগে মাও আমাদের এই শিক্ষাও দেন যে এমন বিপ্লব সফল করার-দুই মুখ্য অস্ত্র হল যুক্তফ্রন্ট এবং সশস্ত্র সংগ্রাম। এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত এক-নায়কত্বে একটি নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা। শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অপর কোন শ্রেণী এমন বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারেনা বলেই পুরনো ধারার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এ নয়, সর্বহারার বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংগ নয়াগণতান্ত্রিক অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক সমাজ বিপ্লব। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে নতুন ধারার গণতন্ত্র হতে গেলে এ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এক অতি অবশ্য পূর্বশর্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর নেতৃত্ব কার্যকরী হতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির মাধ্যমে। এই জন্যই মাও বলেন, "একটি বলশেভিক চরিত্রের চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া এ বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে না। যে পার্টির দেশভোড়া প্রসার এবং গণচরিত্র রয়েছে এবং মতাদর্শ রাজনীতি ও সংগঠন সকল দিক থেকে সুদৃঢ় ভাবে সংহত হতে পেরেছে। অতএব প্রতিটি কমিউনিষ্টের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এমন একটি কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা।"

বিপ্লবকে সফল করে তুলতে কমিউনিষ্ট পার্টির কী ভূমিকা তা লেনিনই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেন। কিন্তু লেনিন যেখানে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে পার্টি ভূমিকার সমস্যা আলোচনা করেছেন মাওকে সেখানে দুই স্তরের একনায়কত্বের বিষয়ে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হয় এবং প্রথম স্তরের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বর্তমান দুনিয়ার উপনিবেশ এবং আধা উপনিবেশের বিপ্লবগুলো সফল করতে হলে মাওদের এই শিক্ষার দরবারে যেতেই হবে। আবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ আধা-উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম যেহেতু বিশ্ব সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ, সেইহেতু সারা বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের পক্ষেও মাও থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। বোঝা মুশকিল নয়, কেন দেশে দেশে ভুক্ফেস্তের দল কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকাকে খাটো করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাও চিন্তাধারাকে মার্কস্বাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাতে চাইছে।

মাও সে তুং-এর নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যাত্রাপথকেই সুগম করে তোলে এবং এই বিপ্লব মূলত কৃষি বিপ্লব বা সাম্রাজ্যবাদের মূলে প্রচণ্ড বিধ্বংসী আঘাত হানে। কাজেই এমন বিপ্লব একাধারে জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র সম্বলিত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই থাক সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং শোষণ, জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ বা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কৌশলগত দিক যাইহোক না কেন, এমন বিপ্লবে ব্যাপক কৃষক সম্প্রদায়কে সশস্ত্র সংগ্রামে টেনে আনা এক অপরিহার্য অংগ। উপনিবেশ অথবা আধা উপনিবেশগুলোতে বিপ্লবী সংগ্রামে কৃষকের ভূমিকা এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মাও তত্ত্ব থেকে এও আমরা উপলব্ধি করি যে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রয়োজন বলশেভিক চরিত্রের এক কমিউনিষ্ট পার্টি, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী ও গ্রুপের এক যুক্তফ্রন্ট গঠন যার মুখ্য হাতিয়ার।

উপরোক্ত বিষয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে মাওদের পূর্বসূরীগণ যেখানে জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রশ্নটিকে দেখেছেন অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তোলার দৃষ্টিকোণ থেকে, মাও সেখানে সমস্যাটি বিচার করেন সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে উপনিবেশ-আধা-উপনিবেশের বিপ্লব বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংগ এই সত্য এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। আগের তাৎপর্য অনুযায়ী প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছিল এইভাবে যে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিগুলোকে উপনিবেশ আধা উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রামগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে, সক্রিয় সহযোগিতার পথে সেগুলোকে মদত দিতে হবে। মাও প্রবর্তিত তাৎপর্য দাঁড়াল এসে এইখানে যে সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত সার্বিক পতনের যুগে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল অস্ত্র হল উপনিবেশ-আধা উপনিবেশের মুক্তিযুদ্ধগুলো। অতএব বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল উপনিবেশ আধা উপনিবেশের এই মুক্তি যুদ্ধগুলো বিকশিত করে তোলার নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা।

মার্কসবাদকে বিকশিত করে এইভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব উপস্থিত করার সংগে সংগে বিপ্লবী যুদ্ধেরও এক পূর্ণাংগ তত্ত্ব উপস্থিত করেন মাও সে তুং। কারণ বিপ্লব মূলত এক যুদ্ধ যার মধ্যে দিয়ে একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে উৎখাত করে। বিপ্লবী যুদ্ধ সম্পর্কে এই তত্ত্ব হল মাওএর অনবদ্য জনযুদ্ধের তত্ত্ব। মার্কসবাদের দেনিন বর্ণিত তিনটি উপাদানের সংগে এ যেন এক নতুন সংযোজিত উপাদান। মাও-এর সমর-নীতি সম্বন্ধীয় তত্ত্বের সোজার কথা হল, বিপ্লবী যুদ্ধে শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস ব্যাপক জনগণ। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন-ভাবে তিনি এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন যে "বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ। একমাত্র জনগণের উপর আস্থা রেখে জনগণকে প্রস্তুত করেই এই যুদ্ধ চালানো যায়" অথবা "যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঠিকই, কিন্তু তা জয় পরাজয় নির্ধারণের চরম উপাদান নয়। বস্তু নয়, মানুষই হল চূড়ান্ত এ ব্যাপারে।"

মাও-এর শিক্ষা অনুযায়ী বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য ব্যাপক জনগণকে প্রস্তুত করা এবং সংগঠিত করাই হল প্রতিটি বিপ্লবীর প্রাথমিক কাজ। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিয়ে কিছু লোককে উপর নির্ভর করে বিপ্লবী যুদ্ধে সাফল্যলাভ করা যায় না।

কিন্তু জনগণকে জমায়েত করা এবং সংগঠিত করার কাজ এগোবে কী ভাবে? মাও বলছেন একাজ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হুকুমনামাজারীর মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। ব্যাপক জনগণকে বিপ্লবীযুদ্ধে টানতে হলে সর্বাগ্রে জনগণের মধ্যে বিপ্লবের রাজনীতি ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকেই রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু হুকুমনামা জারী করার পথ পরিহার করার অর্থ জনগণের চেতনার মান থেকে নিচু স্তরে নেমে যাওয়া নয়। তেমন করলে জন-গণকে বিপ্লবী নেতৃত্ব দেওয়ার নীতিকেই বিসর্জন দেওয়া হয়। এইভাবে প্রসংগ উত্থাপন করে মাও নেতৃত্ব এবং ব্যাপক জনগণের আন্তঃসম্বন্ধের প্রশ্নে যে উন্নততর শিক্ষা আমাদের সামনে রাখেন তার মর্মকথা হল, "কোনো এক নির্দিষ্টস্থানে জনগণ সাধারণতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে। এক অংশ অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, অপর অংশ অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ; আর একটি অংশ থাকে এই দুইয়ের মাঝা-মাঝি। এই সক্রিয় অংশকে নেতৃত্বের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে নেতৃত্বকে। এদেরই উপর নির্ভরশীল থেকে মাঝারি অংশের চেতনার মান উন্নত করতে হবে এবং পশ্চাৎপদ অংশকে জয় করে নিতে হবে।"

এই কাজ করতে হলে অবশ্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন সম্ভাব্য সকল উপায়ে জনগণের সংগে একাত্ম হওয়া। জনগণের সুখদুঃখের ভাগীদার হয়ে তাদের প্রয়োজনের সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে এমনভাবে নীতি ও কাজের ধারা স্থির করতে হবে যাতে তা স্থান কাল বিশেষে জনগণের মানবিকতা এবং দাবীদাওয়ার সংগে খাপ খায়। অগ্রণায় নেতৃত্ব জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। এই শিক্ষার জের টেনে মাও সে তুং আরও বলেন যে জনগণকে সংগঠিত করতে গিয়ে জনগণের মাথার উপরে দাঁড়াবার চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে ডুবে থাকাই হবে আসল বর্ম। এইভাবে একাকার থেকে তাদের চেতনার স্তরকে সঠিক-অগ্রণায়ন করে তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার মানকে উন্নীত করতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের স্বেচ্ছায় সংগঠিত করতে পারে।

ভাড়াটে সৈন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সঙ্গে জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধের এক বিরাট গুণগত পার্থক্য রয়ে গেছে। বিপ্লবী জনযুদ্ধের প্রাণ হল রাজনীতি, অতএব সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে রাজনীতিকে। এই শিক্ষা যখন মাও সে তুং উপস্থিত করেন তখন একথা মনে করার কোন অবকাশ তিনি রাখেন নি যে বিপ্লবী যুদ্ধে রাজনীতিই একমাত্র সম্বল, অস্ত্র ব্যবহার বা সামরিক নীতির কোন গুরুত্ব নেই। বস্তুত মাও সে তুংই প্রথম যিনি পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে বিপ্লবী যুদ্ধে সামরিক নীতি বা অস্ত্র ব্যবহার প্রসঙ্গে বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন, আসলে রাজনীতি এবং সমরনীতির পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতি তাঁর শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যই যে সামরিক ক্রিয়াকলাপ, যুদ্ধের জন্যই যে যুদ্ধ নয়, এই সত্যকেই তিনি বারে বারে তুলে ধরতে

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দিয়েছে, কিন্তু সে-সাহিত্য সেনবহর, কনট্রোলড, যেন সাম্রাজ্যবাদী নোংরা দাঁতটা না প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ইংরাজ পরম অনুগ্রহে যা পাঠিয়েছে তাই আমরা চরিত-চর্বণ করে কৃতজ্ঞতার চেকুর তুলেছি।

আর, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের দানের কথা? আজো পর্যন্ত আমাদের দেশে বিদেশী বস্তুপাত্রি এসেবর করে' মেড ইন ইংলিশ ছাপ মারতে হয়। বেসিক্ কেমিক্যালস-এর জন্যে বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয়।

আমাদের বিজ্ঞানীদের স্বাধীন গবেষণার ক্ষেত্রে পদে পদে ইংরাজ প্রভু আমাদের বাধাই দিয়েছে। আর দীর্ঘ বহু বা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার কী-অপব্যবহার করা হয়েছে বিচার করলেই বুঝা পড়বে।

আর ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের রাজনীতিচেতনা যে কী-পরিমাণ অন্ধ তর্কাতীত, আজো পর্যন্ত দেশের হাল যা হয়েছে সেটাই চরম দৃষ্টান্ত। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এই রাজনীতি চেতনা ইংরাজীশিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর রাজনীতি যা তাকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী চরিত্রে উন্নীত করে ভবিষ্যতের শাসকশ্রেণীকে রূপায়িত করেছে।

দৃষ্টান্ত না-বাড়িয়ে এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় এদেশে ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদেরই দোসর। স্বাধীনতা-পূর্বার জন্য ইংরাজিয়ানাকে অস্বীকার করেছি।

কোনো সাম্রাজ্যবাদই তার অস্তিত্বের প্রয়োজনের উপনিবেশের মানুষের হাতে তার চূড়ান্ত তুলে দিতে পারেনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও আজ কোন ব্যতিক্রম নয়।

যুদ্ধের খেসারত ঃ একটি হিসাব

আর্নস্ট হেনরি

গত ত্রিশ বছর ধরে মনুষ্যজাতি পারমাণবিক ধ্বংসলীলার বিভীষিকাস্তরে সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১ কোটি লোক প্রাণ দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ কোটি। আজকাল এমনকি বিজ্ঞানীরাও অনুমান করতে দ্বিধা করেন নতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধলে কত লোক মারা যেতে পারে। কিন্তু একটা জিনিষ পরিষ্কার ঃ এরূপ বিপর্যয় নিবারণ করাটা আজকের দিনের মনুষ্যজাতির এক সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কর্ম। আর এ অর্জিত হতে পারে আমাদের জীবদ্দশায়, আমাদের সন্ততিদের জীবদ্দশায়।

আজ পর্যন্ত যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্র বাবদ পৃথিবীকে কত খেসারত দিতে হয়েছে? সুইস বিজ্ঞানী জে. ডে. বেহেল হিসেব করেছেন, গত ৫১০০ বছর ধরে অর্থাৎ আগৈতিহাসিক সভ্যতার সূচনা থেকে ১৯৫ সন পর্যন্ত পৃথিবীতে ছোটবড় যুদ্ধ হয়েছে ১৪৫০০, এতে প্রাণ দিয়েছে প্রায় ৩৬৪ কোটি মানুষ, অর্থাৎ আজকের পৃথিবীর জনসমষ্টির প্রায় সমসংখ্যক মানুষ। তাঁর হিসাবমত, এই কালপর্বে পৃথিবীর সম্পদের ক্ষতি হয়েছে ৫০০ লক্ষ কোটি সুইস ফ্রাঁ।

বিরাট এক পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে পৃথিবীর কত লক্ষ কোটি ফ্রাঁ ক্ষতি হবে? আগে থেকে এ গণনা করা যায় না। তবে আর একটা জিনিষ কিছুটা পরিমাণে জানা আছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ব্যয় নয়, ইতিমধ্যেই যেসব অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে সে বাবদ ব্যয়ের কথা জানা আছে।

১৯৬০-এর দশকে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ না হলে আগামী ২৫ বছরে ৩ লক্ষ কোটি ডলার সামরিক উদ্দেশ্যে খরচ হবে। এর অর্থ কি? এই অঙ্ক গোটা পৃথিবীতে মানুষের প্রমে আজ পর্যন্ত যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার মোট মূল্যের প্রায় সমান। কথাস্তরে একজন মানুষের জীবনের মাত্র এক তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ সময়ে বহু সহস্রাব্দ ধরে মনুষ্যজাতি কর্তৃক পৃথিবীতে সৃষ্ট মোট সম্পদের সমপরিমাণ খরচ হবে শুধু অস্ত্রশস্ত্র বাবদ।

এরূপ অঙ্কের কথা চিন্তা করার পরেই শুধু মানুষ বুঝতে পারে সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের জন্য পৃথিবীকে কত খেসারত দিতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এই অঙ্কও শেষ সীমা নয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার খরচ ষাটের দশকের শেষ থেকে থাকা উর্ধ্বমুখী রয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে নাটো জোটের অভিজ্ঞতার ২৫ বছরে—১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪—এই সামরিক জোট খরচ করেছিল ১৮২ হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ গড়ে বছরে ৭৩ শত কোটি ডলার। ১৯৭৪ সনে এই জোট খরচ করেছিল প্রায় ৩৫ শত কোটি ডলার, অর্থাৎ ১৯৪৯ সনের অঙ্কের ৭ গুণ, এবং ১৯৭৫ সনে খরচ করেছিল ১৪৯ শত কোটি ডলার। ১৯৭৬ সনে কত খরচ করা হবে তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ইতিমধ্যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের খরচ এক বছর থেকে আরেক বছর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ সব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে, বলতে গেলে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার এরূপ দ্রুত, রুদ্ধশ্বাস গতি পৃথিবীতে আর কখনো পরিদৃষ্ট হয়নি।

বিশেষ করে এরূপ গণনাকালে লিপ্ত রয়েছেন অবসর প্রাপ্ত মার্কিন ভাইস-অ্যাডমিরাল হেনরি এল একলিস। তাঁর সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক, ২ হাজার বছর আগে রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার। নিহত প্রতিটি শত্রু পিছু গড়ে ৭৫ সেন্ট খরচ করতেন। ১৮০০ সনে নেপোলিয়ান একই উদ্দেশ্যে খরচ করেছিলেন প্রায় ৩ হাজার ডলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা নিহত প্রতিটি শত্রু পিছু খরচ করেছিল ২১ হাজার ডলার আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২০০ হাজার ডলার। আজকের অবস্থাটা কিরূপ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে একটি আমেরিকান জঙ্গী বিমানের খরচ পড়ত ০৬ হাজার ডলার আর ১৯৭২ সনে ১২ কোটি ডলার—বৃদ্ধির পরিমাণ ২২৯ গুণ। একটি আমেরিকান বোমারু বিমানে খরচ পড়ত ১৯৪০-৪৫ কালপর্বে ২১৮ হাজার ডলার আর ১৯৭২ সনে তা ১৩৮ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ডলার। একটি নতুন রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন রকেটবাহী বি-১ বোমারু বিমানের দাম পড়েছে প্রায় ৮ কোটি ডলার—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি বোমারু বিমানের দামের ৩৬৭ গুণ।

আমেরিকার বলাবলি হচ্ছে যে প্রতিটি নতুন "প্রজন্মের" অস্ত্র বাবদ খরচ পড়ে এর পূর্বসূরী অস্ত্রের দ্বিগুণ। আধুনিক সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লোকদের প্রশিক্ষণের খরচও বাড়ছে। সেই ১৯৬০-এর দশকেই আমেরিকান বি-৫৭ জেট বোমারু বিমানের প্রতিটি পাইলটকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য খরচ পড়ত ৬০০ হাজার ডলার।

পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র

বিশেষভাবে অকল্পনীয় বৃদ্ধি ঘটছে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বাবদ খরচের ক্ষেত্রে। একথা সুবিদিত যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেন্টাগন এরূপ চারটি প্রধান ধরনের অস্ত্রশস্ত্র মজুত ও নিযুক্ত করে তোলার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে; এই চারটি হল আন্তঃ-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ফুইল রকেট, পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন ও রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন বোমারু বিমান। ত্রি-পারমাণবিক শিরবিশিষ্ট মিনিটম্যান-৩ ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, এবং ১২ হাজার কিলোমিটার পাল্লার ২৪টি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ট্রাইডেন্ট সাবমেরিন নিয়ে কাজ চলছে। অল্পদিন আগেও প্রতিটি আমেরিকান পরমাণু সজ্জিত পোলারিস ধরনের সাবমেরিনের খরচ পড়ত ২৪৪ কোটি ডলার, আর একটি ট্রাইডেন্ট সাবমেরিনের খরচ পড়বে ১৫০ কোটি ডলার।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ডেমোক্রাটিক প্রার্থী অ্যাডলাই স্টিভেনসন ১৯৬০ সনে বলেছিলেন যে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা অস্ত্রের ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে গেলে ১৯৮০ সন নাগাদ, হয়ত তার আগেও, বৈজ্ঞানিক প্রগতি এক সম্পূর্ণ বিস্ফোরণের উপায় তৈরী করবে, এবং একবার বোতাম টিপলেই পৃথিবী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এ হবে অতিমাত্রায় আত্মঘাতী কাজ যা খুন করার সকল পদ্ধতিরই অবদান ঘটাবে।

অ্যাডলাই স্টিভেনসন তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর থেকে মার্কিন মুলুকের সামরিক ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সনের ৪৬০৫ কোটি ডলার থেকে বেড়ে এই ব্যয় ১৯৭৩-৭৭ সনে দাঁড়াবে ১১২৭০ কোটি ডলার। এ গোটা মার্কিন ফেডারেল বাজেটের এক চতুর্থাংশের বেশি। এ ব্যয় ১৯৭৩-৭৪ সন নাগাদ ১৪৮০০ কোটি ডলারে পৌঁছবে বলে মনে হয়। পশ্চিম জার্মানিও এ বছর সামরিক ব্যয় বাড়াচ্ছে। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই গত পাঁচ বছরে তার সামরিক বাজেট বাড়ানো দূরের কথা, বরং কিছুটা কমিয়েছে।

আফ্রিকায় মুক্তি সংগ্রাম চলছে চলবে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

ক্রমেই জিম্বাবের (দক্ষিণ রোডেশিয়া) জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। সম্প্রতি জিম্বাবের গণ ফৌজের নেতা সুগাবে ঘোষণা করেছেন যে, চূড়ান্ত জয় পর্যন্ত তাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ইয়ান স্মিথ সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আপস আলোচনায় জিম্বাবের গণ ফৌজ রাজী নয়।

ইতিমধ্যে রোডেসিয়ার ফ্যাসীবাদী সরকার মোজাম্বিকের ওপর হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে নামিবিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী সরকার কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি গেড়েছে। এই ফ্যাসিস্ত বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে ইজরাইল। আফ্রিকার ইজরাইলের এই সরাসরি হস্তক্ষেপ ইজরাইলের যুদ্ধবাজ চরিত্রকে তুলে ধরেছে। অন্যদিকে ষ্টাটোচ্রুক্ত বর্ণবাদীতি দক্ষিণ আফ্রিকাকে মদত দিচ্ছে।

তথাপি নামিবিয়ার মানুষ আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিয়েছেন। ভরষ্টার সরকার সমস্ত দেশে শত শত বন্দী শিবির করে নির্যাতন চালিয়ে নামিবিয়ার মানুষের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ছোট্ট দেশ নামিবিয়া ছিল আগানির উপনিবেশ; ১৯২০ সালে লীগ অব নেশন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাকে শাসনের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে জনমতের চাপে রাষ্ট্রসংঘ নামিবিয়ার স্বাধীনতা দেবার কথা বলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একে মুক্ত করে রাষ্ট্র সংঘের আওতায় আনা হয়। তৎসত্ত্বেও এখনো দক্ষিণ আফ্রিকাই এখানে মাতব্বরি চালিয়ে যাচ্ছে ও একে শাসন করছে।

ডাঃ কোটনিসের জন্মদিন পালন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কানাডার নর্মান বেথুনের মতো আমাদের দেশের এক মহান সন্তানও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনা জনগণের সেবা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চীনে এক মেডিক্যাল মিশন পাঠান। ডাঃ অটলের নেতৃত্বে পাঁচজনের এই জনসেবক চিকিৎসক মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভের গৌরবে ধন্য এই ভারতীয়ের নাম ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস।

ডাঃ কোটনিস ১৯১০ সালের ১ই অক্টোবর মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এবছরে তাঁর ছেষট্টিতম জন্মদিবস উপলক্ষে উত্তরপাড়ার ডাঃ কোটনিস স্মৃতি কমিটি তিনদিনের কর্মসূচী পালন করেন।

১ই অক্টোবর স্মৃতি কমিটির বিভিন্ন শাখা ও কমিটি নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন অ্যাম্বুলাংচোর কেন্দ্রের কার্যকলাপের উপর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এই দিন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে 'ভারতের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা' শীর্ষক আলোচনায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের প্রধান ডাঃ জ্যোতিষ মজুমদার, ডাঃ বিশ্বর্ষ বসু সহ খ্যাতনামা চিকিৎসকরা ভারতের মতো গরীব দেশে মহা চীনের পথ গ্রহণের ইতিবাচক মুক্তি দেখান। শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর চীন সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে সেখানকার জনগণের স্বাস্থ্য ও আবাল বৃদ্ধ বণিতার সদাহাস্য মুখের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এ সবই সফল হয়েছে মাও-সে-তুঙের নির্দেশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায়। সভার শেষে ডাঃ কোটনিস স্মরণে একটি সুন্দর পাঁচালী গান করেন কমিটির সভ্যরা। অ্যাম্বুলাংচোরের উপর একটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের চলচ্চিত্রও দেখানো হয়। শেষ অধ্যায় ১১ তারিখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

মাও সে তুং

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

চেয়েছেন। এই জন্যই একদিকে যেমন তিনি বলেছেন, "আমাদের নীতি হল এই যে পার্টি, বন্দুকের উপর খবরদারি করবে, বন্দুককে কোনমতেই পার্টির উপর খবরদারি করতে দেওয়া হবে না।" আবার বিপ্লবী যুদ্ধও যেহেতু বুলেট-যুদ্ধই, তাই এরই সঙ্গে এও আমরা তাঁর কাছ থেকে শুনি, "জনগণের সেনাবাহিনীকে বাদ দিলে জনগণের আর কিছুই থাকে না" এবং সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা দখল করা, যুদ্ধের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করা এই হল বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য এবং উচ্চতম রূপ। রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তিনি যুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।"

মাও চিন্তাধারা এমনিতে যেই বিপ্লব এবং বিপ্লবী যুদ্ধ সম্পর্কিত ধ্যান ধারণাগুলোকে সমস্ত মাস্তিকতার আবর্জ থেকে মুক্ত করে। বিপ্লবী যুদ্ধের পথ এ্যাডভেঞ্চার বা ষড়যন্ত্রের পথ এমনধারণার যেমন স্থান নেই তেমনি গেরিলা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবীদের অনুপ্রবেশ না ঘটলে বা বেশ কিছু পরিধান অগ্রসর আগে থেকেই জোগাড় করে নিতে না পারলে বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করা যায় না এসব ধারণারও স্থান নেই মাও চিন্তাধারায়। শত্রুকে উৎখাত করতে জনগণের উপর আস্থা স্থাপনই হল একেবারে গোড়ার কথা; আর উপনিবেশ-আধা উপনিবেশে এই জনগণ অর্থ প্রধানতঃ কৃষক সমাজ। এদব অঞ্চলে বিপ্লব সফল করতে হলে কৃষক জনতাকে শ্রেণী সংগ্রামে সামিল করতে হবে, কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম সংঘটিত করতে হবে। কৃষক অধ্যুষিত এই সব অঞ্চলে সারা দেশ জুড়ে একই সঙ্গে চরম এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দ্রুত জয়লাভের তত্ত্ব বাস্তবের সংগে খাপ খায়না। এইখানে বিপ্লবের মার্কসবাদী তত্ত্ব মাও কর্তৃক এমন উপাদানে সমৃদ্ধ হল যা এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার জনগণের পক্ষে এক অমোঘ অস্ত্র। এই উপাদান হল মাও সে তুং এর সুগভীর দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের তত্ত্ব। এ তত্ত্ব নিপীড়িত শোষিত জনগণকে বিপ্লবী যুদ্ধের নীতি ও কৌশলই শুধু শেখায় না, জনগণকে বিপ্লবী যুদ্ধ উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ এবং চূড়ান্ত পতনের যুগে আজ বিশ্ব বিপ্লবের ঝটিকা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এশিয়া আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড। এই সব দেশের প্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিগুলোর সামনে প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্টির শ্রেণীভিত্তি মজবুত করার সংগে সংগে ব্যাপক কৃষক জনগণকে সশস্ত্র বিপ্লবী যুদ্ধে টেনে আনা! এই দায়িত্বপালনে মার্কসবাদের বিকশিত রূপ মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা এক অপরিহার্য হাতিয়ার। বোঝা যুলফিল নয়, মাওকে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের বিরোধীরূপে দাঁড় করাবার তাৎপর্য কোথায় নিহিত।

আরও এক গভীর তাৎপর্য রয়ে গেছে মাও বিরোধিতার। লেনিন স্তালিনের গড়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন করায়ত্ত হয়েছে মার্কসবাদ বিরোধীদের দ্বারা। সেখানকার রাষ্ট্র ও সমাজের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র হনন করে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশেষ করে এই পটভূমিকার মাও প্রবর্তিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুধু চীনের অভ্যন্তরে! পুঁজিবাদের পুনরাগমনের সম্ভাবনা রোধ করেছে তাই নয়, যেসে দেশে মুখোশধারী মার্কসবাদীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছে এবং একাজে চীনের সত্তর/আশি কোটি মানুষকে সচেতন সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। তাই আজ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংগে সংগে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং নানা বর্ণের মুখোশআঁটা মার্কসবাদীরা একজোট হয়ে চীন এবং মাও বিরোধী জেহাদের আসরে নেমেছে। প্রতিটি সাচ্চা কমিউনিষ্টকে পাল্টা হিসাবে তাই এ সভাকে তুলে ধরতে হবে যে মার্কস থেকে মাও এক অভিন্ন ধারা। মাও চিন্তাধারার বিরোধিতা আসলে মার্কসবাদ লেনিনবাদেরই বিরোধিতা। (সমাপ্ত)

সংগীতের মল্লযুদ্ধ

(দর্পণের সমালোচক)

আকাডেমিতে অনুষ্ঠিত স্বরেশসংগীতসংসদের ২২শ অধিবেশনের মুখ্য শিল্পীর তারকোচিত হাবভাব থেকে তাকে অনায়াসে বলা যায় সংগীতজগতের উত্তমকুমার। এ কেবল আমাদের দ্বিপ্রাহরিক নয়, ইঙ্গবঙ্গ ফিরিঙ্গি কাগজে শুক্রবারের দেওয়া খাঁ সাহেবের কেশবিন্যাস এবং চশমার বর্ণনা নিশ্চয় পড়ে থাকবেন। কাজ ছাড়া গীত কোথায়? আমজাদ আলি বিহনে আনন্দবাজার সংস্থার অনুষ্ঠানসূচী অসম্পূর্ণ। আমজাদ হলেন অশোক সরকার মশায়ের পুত্রসদৃশ।

আলিবাবুর গুহার টিপ যে খাবাণ তা নয়। ছাউটিও তৈরি। কিন্তু শিশুর কাছে তালিমের মূল্যোগ তার বেশি হয়নি। ফলে নানান্ ঘরের কুড়ানো-জড়ানো জিনিস দিয়ে বাধ্য হয়েই তাকে ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হয়েছে। তাদের ঘরের বৈশিষ্ট্য ছিল গতকারি। কিন্তু নকল আলাপিয়া হতে গিয়ে তিনি ঘরও হারালেন, বাহিরও পেলেন না।

এরই প্রমাণ নতুন করে পাওয়া গেল তার এ দিনের বিভাব রাগের আলাপে। সবটাই বেভাদিয়ী, বিশৃঙ্খল এবং আভাষী। ক্রমপী শৃঙ্খলা এবং ধ্বনিসিদ্ধতার আমেজ তার মধ্যে অনুপস্থিত। বিভাব যেহেতু একাধিক ঠাঁচে পাওয়া যায় অতএব কোমল বিভাব বলাই সংগত ছিল। হয়তো তার জানা নেই। বিভাবে গুণকেলির ছায়া আসার কী কারণ ছিল আমাদের জানা নেই। একে রাগব্রতীতা ছাড়া আর কী বলব? বৈয়াগীর আলাপ এবং গত শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আমীর খাঁ সাহেবের গানের বাস্তুরণ শুনছি। গান আর গত কি এক? বৈয়াগী না বলে বৈয়াহীর বলাই বোধ হয় সংগত ছিল। তবে কোন তালির ছাড়া তিনি বা বাজান তাতে যে সুর থাকে তা নয়। তবে ছুট এবং তরঙ্গিকের কেরদানি দিয়ে এক শ্রেণীর বিকৃত রুচি (বিজ্ঞেত বললেও ভুল হয় না) পরদাওলা বাবুর শস্তা হাততালি পাওয়া গেলেও প্রকৃত রসিকের কানকে ফাকি দেওয়া কঠিন। কেরদানি আর ওস্তাদি জাহির করে আসর মাটি করতে চায় মাস্তানি কারিগর—শিল্পীরা নয়। শিল্প এবং শিল্পী মাত্রেই সংযত এবং ধ্যানী। এসব মনে রাখলে অতিআধার তরঙ্গিক ঝাড়তে গিয়ে টিনের আওয়াজ বেরোত না।

এই রকম অপেশাদ্রিক পরিবেশে কুমার বসুর মত তরুণ তবলিয়া যে বিশ্বর চালিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? আমজাদবাবুর প্ররোচনায় কুমার বসু তবলা-বাঁয়ায় এমন বর্ণবিধারী আওয়াজ তুললেন যাকে মরবীরের লড়াই ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। হাত তৈরি হলেও শিল্পবোধ অর্জনের প্রয়োজন থেকে যায় এবং তাবজগতের সত্তা হাততালির লোভ সংবরণ করতে হয় এবং তা করতে পারলে সেদিন সংগীতের গঙ্গাযাত্রা এমন স্পষ্ট ভাবে সম্পন্ন হত না। ভাগ্য ভাল কেওড়াতলা কাছেই ছিল।

তুলনায় অপর্ণা চক্রবর্তীর গানে স্ক্র্যামার না থাকলেও থানদানী তালিম এবং সংযমে পরিচ্ছন্ন ছিল। তার গাওয়া কতুরী বাজলী চীজ যদিও আজকাল খুব বেশি শোনা যায় না। অনিল রায়চৌধুরী এবং বাচ্চুলাল মিশ্রর সংগত গানাইগুণ।

বাংলা ছবিঘর এখনও নিষ্প্রদীপ

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী ছবি যে দব সিনেমায় দেখানো হয়, সেগুলি খুললেও বাংলা ছবির বিলিজ চেনগুলি আজও বন্ধ। প্রতি বছর পুজোর আগে প্রমিক কর্মচারীদের দের বোনাসকে কেন্দ্র করে হাউসের মালিক পক্ষ নানা টালবাহানায় দমস্যার জটিলতা সৃষ্টি করেন আবার পুজোর মুখোমুখি এসে সে দমস্যার সমাধানও ক'রে ফেলেন এক আপস রফার মধ্যে। এবমিন এটাই ছিল বাৎসরিক রীতির মত। কিন্তু এ বছর সে-দমস্যার জট শাকিয়ে ওঠে, তা রীতিমত গোলমেলে এবং সহজে তার সমাধান হবারও নয়।

গত বছর সে-হারে কর্মচারীরা বোনাস পেয়েছেন, স্বাভাবিক ভাবেই সেই হারে বোনাস সেবার দাবী তাঁরা তোলেন। কিন্তু সম্প্রতি বোনাস সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় নীতির নির্দেশনামার লাভের অঙ্ক অনুযায়ী সর্বাধিক চার শতাংশ পর্যন্ত বোনাস দেবার রীতি চালু হওয়ায় গোটা ব্যাপারটিতে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। লাভের অঙ্ক কম দেখানোর নানা কারসাজি তো আছেই তার ওপর যেহ বোনাসকে একটা নির্দিষ্ট সিলিং-এ বেঁধে দেওয়ার ফলে কর্মচারীরূপ তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের অন্তিত অধিকার যেমন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তেমনি এই দুর্দিনের বাজারে যন্ত্র বেতনভোগী কর্মীরা আরও অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়ছেন। এই অসহায় অবস্থার মধ্যে পুড়ে তাঁরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন সংগত কারণেই। মালিক কর্তৃপক্ষের পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরা আজ সংগ্রামী চেতনায় সোচ্চার।

দিনেমা কর্মচারীদের 'গো স্লো' নীতি, নাইট শোতে কাজ করতে অস্বীকৃতি, বিক্ষোভ প্রভৃতি হাউস কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করতে না পেরে লক-আউট ঘোষণা করে দেন। এবং শারদীয় পুজোর মুখে সিনেমা দিয়ে দেখা দেয় অচলাবস্থা। আনন্দময়ীর আগমনেও সিনেমা কর্মীদের গৃহ-সংসারে দেখা দেয় নিরানন্দের কালো ছায়া। মুখশেখে দরকার এগিয়ে এলেন। আহ্বান করলেন দুই পক্ষকেই। আলাপ আলোচনা অনেক হ'ল। বৈঠকের পর বৈঠক বসল। অবশেষে স্থির হল ব্যালান্স শীটের ভিত্তিতে বোনাস দিতে হবে এবং যে সব হাউস কর্তৃপক্ষ এখনো ব্যালেন্স শীট তৈরী করতে পারেননি, তাঁরা তাঁদের কর্মচারীদের অন্তিম হিসেবে এখন টাকা দিয়ে রেখেন, পরে সেটা adjust করা হবে। এতেও ফল ফলতে দেখী হ'ল। কারণ ব্যালেন্স শীটগুলোতে গোঁজামিলের ব্যাপার কিনা। মাইলোক প্রথমমন্ত্রী শ্রীগোপালদাস নাগ বারংবার আবেদন জানালেন উভয় পক্ষের কাছেই যাতে গোলমালটা তাঁরা মিটিয়ে নেন। তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় অনেক কড়া কথা শোনালেন হাউস মালিকদের। শেষ পর্যন্ত কিছুটা আশার আলো দেখা গেল। হিন্দী ছবির হাউসগুলি খুলে গেল। ষোড়াতালি দিয়ে তাঁরা একটা মীমাংসা করে ফেললেন। কিন্তু বাংলা ছবির হাউসগুলি যেন খুলেও খুলল না। একটা ছুটো খুলতে না খুলতে আবার সব বন্ধ হয়ে গেল। বাংলা ছবির রাহু যেন কেটেও কাটছেনা। বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতিকল্পে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই। এজন্যে আর কোন মন্ত্রীকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতে সচ্যিই দেখিনি। তাঁর চেষ্টায় কিছু সুফল নিশ্চয়ই ফলেছে। কিন্তু ঐ যে রাহুর দশা। নইলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থরক্ষা করে যে প্রভাব পত্তিবন্ধ মন্ত্রিসভা

(এরপর ৮ম পৃষ্ঠায়)

Regd. No. WB CC-32 PRICE 40 Paise

পশ্চিমবঙ্গ হজ্জ কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম ব্রত হজ্জ পালন। আরবের মক্কায় হজ্জ উৎসবে যোগ দিয়ে পুণ্য অর্জনের আশায় সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মুসলমান আবেদন পাঠি দেন তাতেউঁচ জাহাজে অথবা আকাশপথে। পশ্চিমবঙ্গে এবং আসাম ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে হজ্জ কমিটি আছে। পশ্চিমবঙ্গেও হজ্জ কমিটি স্থায়ীভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে হজ্জ করার নামে একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। মহাকরণে রাজ্য হজ্জ কমিটির দপ্তরে ঘুরে বহু ব্যক্তি নানা সময়ে দর্পণ অফিসে অভিযোগ জানিয়ে গেছেন।

হজ্জ কমিটি থেকে আট হাজার টাকা খরচ দিয়ে প্রতি বছর তিনজন ব্যক্তিকে (অবশ্যই ধার্মিক মুসলমান হওয়া প্রধান দরকার) আরবে পাঠানো হয় হজ্জ যাত্রীদের দেখাশোনার জন্য।

হজ্জ ওয়েলফেয়ার অফিসার নির্বাচনের কোনও সঠিক কর্তা নেই। ফলে কমিটি চেয়ারম্যানের ভাইপো ভাইঝিরা আট হাজার টাকা পেয়ে যায়। এ বছরেও একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার বর্তমান কমিটি চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

এ ছাড়া হজ্জ সরঞ্জামে বোম্বাই পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এক হাজার টাকা খরচ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হয় গোপনভাবে। স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ঠিক নেই। কমিটির সদস্যদের আত্মীয়রাই সুযোগ পায় বলে আমাদের নেবারে হিন্দের মুখমাত্র দর্পণকে জানিয়েছেন।

কমিটির সদস্য সৈয়দ আহমদের জামাতা আশরফ-উদ্দীন সৈয়দ সাহেব বোম্বাইয়ে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন বলে অনেকেই ক্ষুব্ধ।

প্রতিবারই কমিটি সদস্যদের আত্মীয় স্বজনকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষিত মুসলীম সমাজ ক্ষুব্ধ এবং আন্তরিক বোধ করছেন।

হজ্জ কমিটির সদস্য নির্বাচনেও কোনও নিয়ম নেই। এমনকি পুলিশ মন্ত্রী বরাইমন্ত্রী মোস্তাফের হোসেন সাহেবের নির্দেশ মানতে এরা রাজী নন। সম্প্রতি এ ব্যাপারে 'আবদুল বারী বিশ্বাস এম, এল, এ মহাশয় হজ্জ কমিটির সভ্যের তীব্র সমালোচনা করেন। কমিটিতে সারা বছরই লোক নেওয়া হচ্ছে। কমিটি কোনও দিনই হজ্জ ওয়েলফেয়ার অফিসার পাঠাবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন না। এ বছরও হজ্জ ওয়েলফেয়ার অফিসার নির্বাচিত হওয়ার জন্য দুজন এম, এ পাশ এবং আরবী জানা শিক্ষক সমাজসেবী দরখাস্ত করেছেন। তারা সুযোগ পাননি।

পেলেন পুরসভার ভ্যাকসিনেটর। উত্তরবঙ্গ এম, এল, এ মোসলেহউদ্দীন আহমদ এবং জনাব মহবুবুল হক সংঘের সম্প্রতি হজ্জ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁরা জানিয়েছেন হজ্জের কোনও সভায় এখনও যে গ দেওয়ার সুযোগ পাননি। পরপর পাঁচ বছর দরখাস্তকারী সাংবাদিক এ, এফ কামরুদ্দীন আহমদ এম, এ এবং আইন পাশ সত্ত্বেও ওয়েলফেয়ার অফিসার নির্বাচিত হতে পারেন নি। রাজ্য পি ডব্লু ডি বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের দুইজন কর্মী সহ বহু বিশিষ্ট মুসলীম হজ্জ ওয়েলফেয়ার অফিসার হবার জন্য দরখাস্ত করে এবারেও বিফল হয়েছেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ হজ্জে তাবপ্রাপ্ত আমন্ডার সেক্রেটারী শ্রীএ কে রৈন সাহেব ভুয়া স্বেচ্ছাসেবক ধরার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর হুকুম টিকিট দেখাও তবে হাজার টাকা পাবে। এর আগে অনেকে কলকাতার বসে বোম্বাই স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যেতেন বিনা ভ্রমণে।

জমি জরিপে অব্যবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গ্রামে গঞ্জে জমি ভিত্তিতে ভিটে মাটি মাপার যে কাজ এখন পর্যন্ত চলছে তাতে গ্রামের গরীব মানুষের কষ্টই বেশী হচ্ছে। গ্রামে জমি মাপার জন্য আমিন থেকে শুরু করে সার্ভেয়ার সবাই প্রায় নতুন চাকরীতে ঢুকেছেন। তাদের মাপের জ্ঞানও যেমন কম তেমনি মাঠে ঘাটে কঠিন পরিশ্রম করার মানসিকতার প্রচন্ড অভাব। ফলে উল্টোপাল্টা জমি মেপে কিংবা গ্রামের মোড়লের কথা মত রায় দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা এক নম্বর ব্লক এলাকাই তার প্রমাণ। এখানে বাঁধপুর মৌজা একবার মাপ জোক হয়ে গেছে। বহু প্রবাসী ও চাকুরে মানুষ ভিটে মাপ জোকের সময় বাড়ী এসেছিলেন। এখন তাঁরা শুনছেন যে আবার মাপ হবে।

ভূমি ও ভূমির সঠিক ব্যবহারের যে দপ্তর তার অধীন ছোট একটা অফিস হুগলী জেলায় শিরাখালায় আছে। এখানে হঠাৎ শোনা গেল জমির পর্চা দেওয়া হচ্ছে। একদল টাউট শ্রীরামপুর সাধুপুর হরিপুরের গরীব মানুষদের পর্চা এনে দেবে বলে কিছু পয়সা সুটোলো। যারা পায়লো না তাদের জন্যে তদ্বির করার অনুহাতে জে, এল, আর ও অফিসে ঘুর ঘুর শুরু হয়। জমি বিলি, আবোল তাবোল জমির খাজনাবসানো, বর্গাদার রেকর্ড কাটানোর মত হাজার কিসীদের কাজ দুচার টাকার বিনিময়ে দিনরাত্রি প্রকাশ্য ভাবে হচ্ছে। এই যুব যেন সরকারী নিয়ম। গরীব এবং অশিক্ষিত গ্রামের মানুষরা ভাবছে উত্তর সংকট। মাপবাবুরা মাপলেই ভুল করবেন। ভালো মাপলেও কবে কাগজ পর্চা পাবো তার নোটিশ থাকবে না, মোড়লদের পিছনে খরচ করতে হবে। বেগতিক হলেই জে, এল, আর অফিসে গচ্চার চার বাড়বে। উত্তর সংকট।

নবেম্বর বিপ্লব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাদের প্রথম পদক্ষেপ হল সমস্ত মূল ও ভারী শিল্পের উপর মেহনতী মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং অবসরভোগী শ্রেণীর ক্ষমতা বিলোপ করা; সমাজের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে মেহনতী মানুষের ভাবধারা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

নবেম্বর বিপ্লব এবং লেনিনের ভাবনা কল্পনা আজ রুশ দেশের সীমানা পেরিয়ে এশিয়া থেকে লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। গহন রুক্ষ আফ্রিকা পর্যন্ত আজ লেনিনের আহ্বানে উত্তাল। সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার শেষ পাদিপথ হবে লাতিন আমেরিকা। সেখানেও বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের প্রধান সর্দারের ভাগ্য স্থির হবে আজে—সেই পথে তার প্রস্থান ঘটবে যে পথে গেছে আর নিকোলাস, হিটলার, মুসোলিনী।

রুশ বিপ্লব আজ প্রায় ৬০ বছরের পুরাতন ইতিহাস; লেনিনের মৃত্যুও প্রায় ৫৩ বছরের পুরনো ঘটনা। কিন্তু রুশ বিপ্লবের গুরুত্ব এবং তার নায়ক লেনিনের নেতৃত্বের তাৎপর্য অফুরাণ অম্লান। প্রত্যেক দেশে সমাজবাদী ভাবনা অর্থাৎ মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে হবে তার বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী। মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদ এক প্রকারের বিজ্ঞান—যুলি বা তথাকথিত পান্ডিত্য নয়। এর কারবার অপণ্ডিত মানুষদের নিয়ে—তথাকথিত বিদগ্ধদের নিয়ে নয়। তথাকথিত বিদগ্ধরা সমাজে চিরদিনই ছিলেন এবং আছেন; তারা কোনো সমাজবাদী বিপ্লব করতে পারেননি কারণ তারা তা পারেন না—পারার কথাও নয়। নিম্নবীর একমাত্র এবং শেষ আশার এবং ভালবাসার নিবন্ধ হল অন্ধকারের সহিত খেটেখাওয়া মানুষ, তাদের জীবন এবং মন, তাদের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ।

এই মানুষকে সত্যি করে জানতে গেলে তাদের কাছে যেতে হয়, তাদের সুখ দুঃখের আস্বাদ নিতে হয়। লোপা সাজানো পার্টি অফিসে বসে তা হয় না। জনগণকে জানার অর্থ তাদের দিয়ে কেবল সভাসমিতি এবং মিছিল করানো নয়—তাদের মনকে জানা। এর জন্য যেমন চাই বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক তেমনি চাই কল্পনাশক্তি, যা ছাড়া কোন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুধাবন করা যায় না। যদিও শেষ বিশ্লেষণে জনগণই বিপ্লব করে তথাপি কল্পনাশক্তি না থাকলে বৈপ্লবিক ইঙ্গিতও নজর এড়িয়ে যেতে পারে। রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন ছিলেন রুশিয়ার বাইরে সুদূর জুরিখে। কিন্তু দূরে থেকেও যে ইঙ্গিত তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল তখনকার কাছের মানুষ অনেকেরই তা পড়েনি। মূল ভাবে কাছে থাকা মানেই সত্যিকারের কাছে থাকা নয়। গণমনের চৈতন্যের হিসাব রাখা চাই। এটাই হল নবেম্বর বিপ্লব এবং লেনিন-নেতৃত্বের বিশেষ শিক্ষা।

বাংলা চিত্রগৃহ নিষ্প্রদীপ

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

সমর্থন করে পাঠালেও তা কেন্দ্রীয় সমর্থন লাভে অপারগ হয়। বাংলা সিনেমা শিল্পের এই দশা আজ নয়, অনেককাল আগে থেকেই এর দুর্গতির শুরু।

কেন্দ্রীয় প্রমন্ত্রী রঘুনাথ রেড্ডি দেশব্যাপী লক্-আউটের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুরোধও করেছেন রাজ্য সরকারগুলিকে এ ব্যাপারের সমাধানে অবিলম্বে তৎপর হতে। ক্যাপিটালিস্ট কর্তৃপক্ষ এজাতীয় আবেদন এই প্রথমই শুনছেন না। তাঁরা এসব আবেদন কানে রেখেই যথেচ্ছ শোষণ চালিয়ে যান। পরোয়া করেন না। আর এই বেপরোয়া পীড়নের শিকার হয়েছেন আজ মিনার্ভা, বিজলী, ছবিঘর, রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, ইন্দিরা, পূর্ব, প্রাচী প্রভৃতি সিনেমার শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দ। পূরবী হাউস বন্ধ রয়েছে বর্ষাকালী চাটাইয়ের বিদ্রোহের দরুণ। বাংলা ছবির মিলিত চেন বন্ধ হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতে যেটুকু আশার আলো উঁকি দিয়েছিল, সেটুকুও বুঝি আজ মিলিয়ে যেতে বসেছে। এর কারণ এখন একটাই—বাংলা ছবিঘর এখনো নিষ্প্রদীপ।

স্তালিন ও মাও রচনাবলী সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও ধন্য।

স্তালিন রচনাবলী

জীবনীসহ ১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা। যাঁরা ১০০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর শতকরা ২৫·০০ টাকা হারে কমিশন পাবেন নূতন গ্রাহক করা হচ্ছে ও সঙ্গে প্রকাশিত খণ্ডগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে। সমগ্র রচনাবলী ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

মাও রচনাবলী

৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০·০০ টাকা। যাঁরা ৫০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা নির্দ্ধারিত মূল্যের শতকরা ২৫·০০ টাকা হারে কমিশন পাবেন। নূতন গ্রাহক করা হচ্ছে ও সঙ্গে প্রকাশিত খণ্ডগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে। সমগ্র রচনাবলী ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

হো চি মিন রচনাবলী

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ১২·০০ টাকা। ১৫·০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে ১ম খণ্ড সংগ্রহের সময় ২য় খণ্ডের জন্য আরও ১৫·০০ টাকা জমা দিতে হবে। ২য় খণ্ড সংগ্রহের সময় কোন টাকা দিতে হবে না। আজই গ্রাহক হোন, ১ম খণ্ড নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হবে।

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

সম্পাদক—শৌরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৫/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৮৭ বাবার ৬১ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

৪০ পঃ
চতুরঙ্গ
১৩শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১২ই নভেম্বর ৭৩

ম্যাকনামারা যে চেহারা দেখতে পাননি

বৃহত্তর কলকাতার বস্তি দর্শন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা কয়েকদিন আগে কলকাতার বস্তি দর্শন করে তার উন্নয়নে সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। ম্যাকনামারা সাহেব যখন কলকাতায় এলেন তখন কলকাতা ও তার কলুষ বস্তি অঞ্চল শুকনো ঘটঘটে। কিন্তু বর্ষাকালে এই বস্তির কি চেহারা হয় তা দেখলে হয়ত তিনি আতকে উঠতেন। এবং উন্নয়নের জন্য অনেক বেশি অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতেন।

এই বর্ষায় গত ৫ই আগষ্ট প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বিধিরপুর ডক অঞ্চলের এক বিরাট অংশ ৪৮ ঘন্টা বুক-সমান জলের তলায় ছিল। এখান থেকে জলবন্দী মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যথেষ্ট নৌকোর অভাবে একাজে অসুবিধা দেখা দেয়। প্রায় ১০০ বস্তি ভেঙ্গে পড়ে। ৬ই আগষ্ট বৃষ্টি থেমে গেলেও সার্কুলার গার্ডেন রীচ অঞ্চলের একাংশ সাত দিন জলের তলায় ছিল এবং প্রায় মরকভূমে পরিণত হয়েছিল। বাতাসে দুর্গন্ধ। কলেরা ও বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়।

ম্যাকনামারা সাহেব একবার বর্ষাকালে আসুন না। আসুন তবা বর্ষায় বিধিরপুর, একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ ও গার্ডেন রীচ অঞ্চলে—যা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বৃহৎ বস্তি অঞ্চল। বিহারী মুসলীম, বাঙালী উদ্বাস্তু এবং কিছু চীনা ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে পাশাপাশি বাস করে।

বর্তমানে কলকাতা সহরের ১০০ ওয়ার্ডের মধ্যে তিনটি বাদে প্রত্যেকটিতেই বস্তি রয়েছে যেখানে বাস করে সহরের মোট ৩১ লক্ষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আর মেট্রোপলিটান অঞ্চলের ৮৩ লক্ষ জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। এ হল সরকারী তথ্য। এছাড়া "অনহুমোদিত" বস্তি বা ব্যক্তিগত কুটিরও অনেক আছে। সহরের এক-তৃতীয়াংশে বস্তিবাসী কি করে বর্ষা অতিবাহিত করে? বর্ষাকাল তাদের কাছে তিন মাস ঘুটো ছাদ দিয়ে জল পড়া আর মাটির স্যাঁতসেতে মেঝের ভয়ঙ্কর স্মৃতি। তার মানে বাচ্চা আর ছেঁড়া ন্যাকড়া বুকে আঁকড়ে ধরে হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে রাত কাটানো। তার মানে আরও রোগ।

বৃহত্তর কলকাতার অধিকাংশ বস্তি কাশীপুর-পাইকপাড়া বেলগাছিয়া, খিদিরপুর-ওয়াটগঞ্জ-টালিগঞ্জ, ট্যাংরা-তপসিয়া বেলিয়াঘাটা, হাওড়া ও বরাহনগর-কামারহাটি-রিষড়া-চাঁপা দানির নিম্নাঞ্চলে।

কলকাতার বস্তি হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা আশ্রয় নয় অথবা উদ্বাস্তুদের জবর দখল কলোনী নয়। কলকাতায় বস্তির পত্তন সহর গড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতা বন্দরের বাড়বাড়ন্ত এবং শতবর্ষ পূর্বে পাট ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় ও অন্যান্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনুন্নত অঞ্চলে বসি মাথা তুলতে থাকে। বস্তির লোকেরা সেখানে ভাড়াটে। কিছু পল্লীবী শ্রেণীর লোক জমির মালিকের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়ে ঘর তুলে ভাড়া দেয়।

খিদিরপুর ট্রাম ডিপোর কাছে সার্কুলার গার্ডেন রীচ ষ্ট্রীটে কলকাতার এক বৃহত্তম বস্তি অঞ্চল। এখানে কোন কোন পরিবারে ছটা আটটা করে বাচ্চা। প্রতি পরিবারে আয় সপ্তাহে গড়পড়তা ৩৫ টাকা। সবচেয়ে বেশি ৭৫ টাকা যেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনেই রোজগার করে।

এক সময়ে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বস্তি উচ্ছেদ করে বস্তিবাসীদের জন্য এক বামরার ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু একাজ সহজ নয়। সেনানা বস্তি শুধু থাকবার ভাল জায়গার অভাব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে তাদের ইট-কাট-লোহা নির্মিত গৃহে আশ্রয়ের স্থান দেবার চেষ্টা সফল হতে পারে না।

১৯৫০ সালের আগে প্রকৃতপক্ষে বস্তি উন্নয়নের কোন চেষ্টাই হয়নি। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে কলকাতা কর্পোরেশন কিছু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আইনগত বাধার জন্যে তা সফল হয়নি। কলকাতার বস্তি সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জমি ও তার মালিকানা। যেহেতু বস্তি উচ্ছেদ এবং তার অধিবাসীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে গেলে অনেক অনেক টাকার দরকার অত টাকা কি বিশ্ব ব্যাঙ্ক দেবে) এবং সে টাকার সংস্থান আগামী বহু বছরের মধ্যে করা যাবে না সেহেতু বস্তির পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানোই এক প্রধান কর্তব্য। বস্তির জমির মালিক হয় যদি সরকারের তাহলেই এই কাজে অর্থ ব্যয় সহজ হয়।

১৯৭০ সালে সি এম পি ও হিসেব করেছিল বৃহত্তর কলকাতার সমস্ত বস্তির জমি দখল করতে গেলে ৫০ কোটি টাকার দরকার। কিন্তু এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

পঞ্চাশের দশকে পরিকল্পনা ছিল বস্তি উচ্ছেদ করে বহু বস্তি বাড়ি তৈরি এবং সেখানে বস্তিবাসীদের স্থানান্তরিত করা। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয় বলে পরবর্তী কালে বস্তির উন্নয়নকেই নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে সি এম ডি এ সহরের বস্তি উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সি এম ডি এ বলেছে যে, কলকাতা ও হাওড়ার ১৪০০ বস্তিকে তারা এই পরিকল্পনার আওতায় এনেছে। জল সরবরাহ, স্যানিটারী পায়খানা, রাস্তা উন্নয়ন, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতিতে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

কিন্তু জলের কল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ করছেনা। অনেক জায়গায় ট্যাপ উধাও। যে কলে জল পড়ছে তার চেহারা যেমন সঙ্গ তেমনি ক্ষণস্থায়ী। খাটা পায়খানা সরিয়ে স্যানিটারী পায়খানা তৈরীর ব্যবস্থাও বিশেষ হয়নি। খাটা পায়খানা থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। রাস্তা অর্ধনির্মিত। নির্মাণের পরিকল্পনাহীন এবং নিম্ন শ্রেণীর মালমসলা সরবরাহ।

বিধিরপুর, ওয়াটগঞ্জ, একবালপুর ও গার্ডেন রীচ অঞ্চলের বস্তির এই চেহারা। বর্ষাকালে রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর ডুবে যায় কয়েকবার। জল জমে থাকে কয়েকদিন। রোগ ছড়ায়। কোথায় চৌরঙ্গী আর কোথায় এইসব বস্তি অঞ্চল। স্বর্গ আর নরক। দুইই কিন্তু কলকাতা।

চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাঃ কিছু প্রশ্ন

(বিশেষ পর্যবেক্ষক)

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর থেকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে যে বিতর্কের সৃষ্টি-পাত ষাটের দশকে সেই বিতর্ক চরম পর্যায়ে ওঠে এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দুটি সুস্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশলগত প্রশ্নে, ষ্টালিনের মূল্যায়নের প্রশ্নে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতিগত প্রশ্নে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রধান দ্বন্দ্বের প্রশ্নে যে মতানৈক্য উদ্ভূত হয়েছিল তার চরম পরিণতি স্বরূপ দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মাও সে তুংএর নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি এই মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। চরম বিশ্বাসের মধ্যেও চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেখিয়েছে তা বাস্তবিকই কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে একটা নূতন চেতনা ও প্রত্যয়ের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল।

ষাটের দশকে মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সেই চেতনা ও প্রত্যয়কে শক্তিশালী করেছে, নূতন সম্ভাবনার দিগন্তকে উদ্ঘোটিত করেছে।

এমনকি পুঁজিবাদী দেশগুলোর বহু অকম্যুনিষ্ট বিপ্লব জনও ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি সুগভীর দৃষ্টি স্থাপন করেছে।

পুঁজিবাদী ব্যাখ্যাকারদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সংঘাত ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য এবং এই সংঘাত বিপ্লবোত্তর কালেও প্রবহমান থাকে। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরেও দুইটি পথ ও চিন্তাধারার লড়াই অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে।

মতাদর্শগত এই লড়াই কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকেই মৌলিক বিতর্কগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জন-সাধারণের মধ্যে। অধ্যয়ন, আলোচনা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা—এই চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, বুদ্ধিজীবী ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে।

তাৎপর্যের কথা, এত বড় সফল কর্মকাণ্ডের পরেও মাও সে তুংএর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের প্রশ্নে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিট ব্যুরো ও এমনকি সৈন্যবাহিনী মতৈক্যে পৌঁছুতে পারেনি।

নেতৃত্বের যে অংশের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তারা কেউ ফুইফোড় নেতা নন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এদেরই ছিল অগ্রণী ভূমিকা। পার্টির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামে এরাই ছিল সবচেয়ে সোচ্চার।

এরা যদি মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সে তুংএর চিন্তাধারার বিরোধিতা করে থাকেন তাহলে মাও সে তুং বেঁচে থাকতেই এরা চিহ্নিকৃত হননি কেন?

এই সব প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা কোন পার্টির আভ্যন্তরীন ঘটনাবলীর উপর মন্তব্য নয়। ষ্টালিনের মূল্যায়নের প্রশ্নটি যেমন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয় রূপে বিবেচিত হয়নি, চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও শুধুমাত্র চীনের পার্টির নিজস্ব ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যত।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

রামমোহনের ভুটান যাত্রা প্রসঙ্গে

প্রদীপ রায়

রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে নানা কাহিনী সাধারণে প্রচলিত। এমনকি রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনে এবং সাধারণভাবে ভারতীয় মহিলা সাধারণের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায়, "তিব্বতে থাকাকালীন তিব্বতী মহিলার অধঃপতনে লামাতন্ত্রের কোন স্তর থেকে তাঁর প্রাণরক্ষার ঘটনার পরোক্ষ প্রভাব" পণ্ডিত মহলেও আলোচ্য বিষয়। রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে উল্লেখ Encyclopaedia Britannica-য় রয়েছে : 'At fifteen (Rammohun) left home to study Buddhism in Tibet, where his criticisms of Lama-worship gave much offence.' পনের বৎসর বয়সে রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে Dr. Lant Carpenter রচিত রামমোহন জীবনীতে। তিনি লিখেছেন : '(Rammohan travelled) for a time in Tibet that he might see another form of religious faith.' Dr. Carpenter উল্লেখ করেছেন, তিনি রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণের কথা রামমোহনের কাছ থেকে দুবার শুনেছেন—প্রথমে লণ্ডন শহরে, তারপর Stapleton grove (ব্রিস্টল)-এ। অবশ্য ১৫/১৬ বৎসর বয়সে রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য দুটি ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ভর নয়।

১৮০৩ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'তুহফাৎ-উল-মুহদ্দীন' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে রামমোহন লিখেছেন : "I travelled in the remotest parts of the world; the plains as well as hilly lands." তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'Autobiographical Sketch'-এ (যা রামমোহনের নিজস্ব রচনা কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ আছে) তিনি লিখেছেন : "When about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindoos. This, together with my known sentiments on that subject having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels and passed through different countries chiefly within, but *some beyond the bounds of Hindoostan*, with a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India" রামমোহনের নিজস্ব রচনায় তিব্বত ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ না থাকলেও তাঁর রচনায় এ-হেন প্রসঙ্গের উল্লেখ বোধকরি তাঁর তিব্বত ভ্রমণ সংক্রান্ত নানা কাহিনীর উৎস। এই উৎস সন্ধানে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১ জুলাই ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ; To use his (Rammohun's) own words : "This together with my own sentiments on that subject having produced a coldness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels". He travelled through several places of northern India, cultivating theological researches, and spent three years in Thibet, where also his anti idolatrous proclivities excited the anger of the worshippers of Lama 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের স্মৃতিকথা (তৃতীয় স্তবক) অংশে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বক্তব্যও তাঁর তিব্বত ভ্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : "রামমোহন রায়ের তিব্বতাভিগমন সম্বন্ধে অজ্ঞতা স্বীকার করায়, আমি দেখিতেছি একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভালই হইয়াছে। নানাদিক হইতে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে ; সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে তবে খাঁটি চরিতাখ্যান রচিত হইবে। অথচ তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই।"

অন্যদিকে চরিতশোধক রামমোহন যে হিন্দুস্থানের সীমান্ত-প্রদেশে গিয়েছিলেন, তার ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ রয়েছে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন রচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন' নামক গ্রন্থে। তবে সে দেশ তিব্বত নয়, ভুটান। ডঃ সেন অবশ্য ভুটানের দূত নিরপুংগরপার করারনাথায় তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন : "ভুটান তখন তিব্বতের অধীন ছিল। দেবরাজার দূত নিরপুং পেন্‌চা ভুটানকে লামার রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ভুটানের রাজধানী পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া রামমোহনের তিব্বত যাত্রার কথা প্রচার হওয়া অসম্ভব নহে।" ভুটান তখন তিব্বতের অধীন ছিল কিনা বা নিরপুং পেন্‌চার করারনাথায় উল্লিখিত 'লাসার মুলুক' বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে নানা প্রশ্নের অবকাশ আছে। সে সব প্রশ্নের আলোচনা আপাততঃ মুলতুবী রেখেও নিঃসংশয়ে উল্লেখ করা যায় যে রামমোহনের বর্ণিত হিন্দুস্থানের সীমান্তপ্রদেশ পার্বত্যদেশ ভ্রমণের কাল ও তাঁর ভুটান গমনের কাল সমকাল নয়। দুইকালের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে প্রায় ২৬ বৎসর। বিস্ময়ের বিষয় চরিতশোধক রামমোহন তাঁর হিন্দুস্থানের সীমান্তপ্রদেশের পার্বত্যদেশ যাত্রা অথবা ভুটান যাত্রার কথা তাঁর কোন রচনায় উল্লেখ করেন নি, থাকিও তা ইতিহাসের প্রধানত ঘটনা। অন্যদিকে ১৭/১৮ বৎসর বয়সকালে তাঁর উল্লিখিত ভ্রমণের কাহিনী অন্য কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে স্থিত নয় বলেই প্রতিভাত।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি ও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের দেবরাজার সঙ্গে সন্ধির কাল থেকে শুরু করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে ভিন্ন সময়ে কুচবিহার ও ভুটানের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধে সালিশীর ভূমিকায় দেখা যায়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির সর্তানুসারে ভুটানের দেবরাজা চাম্বরচীর (মরাঘাটের) মালিক হয়েছিলেন। কুচবিহার এতে আপত্তি জানায়। কিন্তু ১৭৭৭ সালে দিনাজপুরের কাউন্সিলের বিচারেও মরাঘাটে (চাম্বরচীতে) ভুটানের অধিকার স্বীকৃত হল। তবু চাম্বরচী ও কুচবিহার সীমান্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশের ঘটনা এবং সীমান্ত বিরোধ লেগেই থাকত।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ডিগবি এলেন রংপুরের কালেক্টর হয়ে। সে-সময় চাম্বরচী অঞ্চলে জলঢাকা ও দুধুয়া নদীর মধ্যবর্তী তিটিনহাট ও বারোটি গ্রামের অধিকার কুচবিহারের রাজা দাবী করছিলেন। পারলিং সাহেবের 'বন্দুবস্ত' দেখে ডিগবি সিদ্ধান্ত করেন ঐ স্থানগুলি কুচবিহার রাজের সম্পত্তি। পারলিং সাহেবের 'বন্দুবস্তে'র পর তা ক্রমে ক্রমে রাজার হস্তচ্যুত হয়েছে। কিন্তু ভুটানের দেবরাজা ডিগবির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না সুতরাং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে চাম্বরচী সংলগ্ন কুচবিহার সীমান্ত এলাকায় আবার গোল-যোগ শুরু হল। ডিগবি কুচবিহার ভুটান সীমান্ত অঞ্চলে বিবাদীয় স্থানগুলি বিদ্যমান উভয়পক্ষের মধ্যে সমান ভাগ করে সিলখী নদী উভয় রাজের সীমানা বলে নির্দিষ্ট করলেন। ভুটানের প্রতিপক্ষ ডিগবির সীমানা সংক্রান্ত এই নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না বরং পরবর্তীকালে ডিগবির সীমানা নির্ধারণের পদ্ধতি ও সীমানা সংক্রান্ত বিচারে ভুটানের প্রতি অভিযোগ দায়ের করেন। ইতিমধ্যে কুচবিহারের রাজা বিবাদীয় স্থানগুলি দখল করলেন, যেহেতু কবি ডিগবির বিচারজাত সিদ্ধান্তের পক্ষেই সর্বত্র।

সুতরাং দেবরাজা এবং তাঁর কর্মচারীরা ডিগবির এই অবিচার সম্পর্কে গবর্ণর ও রংপুরের কালেক্টরের কাছে ক্রমাগত পত্র লিখতে লাগলেন। উল্লেখ্য হল ডিগবি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই পর্যন্ত রংপুরের কালেক্টর ছিলেন।

তাদের অভিযোগ পত্রে কুচবিহার-ভুটান সীমানা সংক্রান্ত বিরোধে রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রংপুরে ডিগবি কালেক্টর হয়ে আসার পর 'ডিগ্‌বির দেওয়ান' রামমোহন কিছুদিনের জন্য ডিগ্‌বির সরকারী দেওয়ান পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। দেওয়ান পদে তাঁকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের জন্য জন ডিগবির সুপারিশ সত্ত্বে তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঐ পদে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হন। পুনরায় তিনি হলেন ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত কর্মচারী। বস্তুত ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত এবং উত্তরোত্তর এ-ঘনিষ্ঠতা মনিব কর্মচারীর সম্বন্ধাভিত্তিক নিকট সম্পর্কে সম্পৃক্ত হতে থাকে। ভুটানের দেবরাজার পক্ষে তাঁর দুই প্রতিনিধি চিতা তুযুৎ ও চিত্তাটাসী বাঙ্গালা সাল ১২২২ এর ৮ আশ্বিন তারিখে রংপুরের কালেক্টর ষ্ট সাহেবের কাছে যে তথ্য পেশ করেন তাতে বলা হয় : "তদপর, দেবরাজের রাজ্যে ছত্র সাত বৎসর হইলো রঙ্গপুরের কেলেক্টর ডিগবী সাহেবে ও তাহার দেওান রামমোহন রায় ও মুনসি হেমতুল্যা সহীত কারসাজী করিয়া নটঘটী আমরা হাজির দিয়াম না এবং উকীল রাখীব না থাকাতে তবফফসি করিয়া যে মিথ্যা ডিগারি করিয়াছে তাহা আমারদিগের রাজেন্দ্র রাজী নয় যদি তাহাতে রাজী নয় জদি তাহাতে রাজী হইলে পুন ২ আপনকার নিকটও কৈলকাতাতে শ্রীযুত গবর্ণর জানরেল বাহাদুরের হুজুরে কি কারণ দেবরাজ পত্র লিখিবেন ও আমারদেক পাঠাইবেন। আমরা সন ১৮০৯ সাল ডিগবি সাহেবের ডিগারি রাজী নহী ইহা আরজ করিলাম।"

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন অবশ্য তাঁর 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' নামক গ্রন্থের টীকা অংশে জন ডিগবির তদন্ত সম্পর্কিত অভিযোগ বিষয়ে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন : "১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ডিগবি সাহেবের তদন্ত সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য মনে হয় না। ঐ বৎসরের ২০শে সেপ্টেম্বর জন ডিগবি রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটরী জর্জ ডিউওয়েলের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তদন্তের সময় দেবরাজার দূত ও চামরী দুয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।" ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের উপস্থাপিত উপরিলিখিত তথ্যানুসারে যদি বা জন ডিগবির একতরফা ডিক্রির অভিযোগ খণ্ডিত হয় ; ডিগবি প্রদত্ত ডিক্রিতে ভুটানের প্রতি "অবিচারের" অভিযোগ বা সে ক্ষেত্রে ডিগবি দেওয়ান রামমোহন বা মুনসী হিমাতেতুল্যার সহিত কুচবিহারের রাজার 'কারসাজী' 'নটঘটী'র অভিযোগের নিষ্পত্তি হয় কি ? এ-প্রসঙ্গে পরবর্তী ঘটনাবলী মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ডিগবির সীমান্ত সংক্রান্ত ডিক্রিতে ভুটানের প্রতি অবিচারের অভিযোগের সত্যতা নির্দেশ করে।

জন ডিগবির পরবর্তী রংপুরের কাষ্টেরর ডেভিড ষ্ট সাহেব "দিনাজপুরের কাউন্সিলের রায় দেখিয়া স্থির করিলেন যে ডিগ্‌বির বিচার বাস্তবিকই ঠিক হয় নাই। কাউন্সিলের রায়ের বিষয় বোধ হয় তিনি ভাল করিয়া বিবেচনা করেন নাই। ষ্ট সাহেবের ওহুকে প্রকাশ পাইল যে ২৬টি চালা ঝাড়ীতে সমগ্র মরাঘাটই বহুবার ভুটীয়াদিগের অধিকারে দিল।" ষ্টসাহেব তাঁর এই সিদ্ধান্ত বড়লাটকে জানিয়েছেন। ষ্টের সিদ্ধান্ত সমর্থন

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মার্কসবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

মণি চৌধুরী

বস্তুজগত আগে সৃষ্টি হয়েছে অথবা চেতনা জগত আগে সৃষ্টি হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের দার্শনিকরা দুটি প্রধান শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন। যাঁরা বলেন বস্তু জগত আগে সৃষ্টি হয়েছে এবং তারই ক্রম-বিকাশের পথে মানুষ এবং তার চেতনার উদ্ভব ঘটেছে তাঁরা বস্তুবাদী শিবিরের লোক। আর যাঁরা বলেন এক পরম চেতনা জগতের থেকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের চেতনা সেই পরম চেতনারই অংশ তাঁরা ভাববাদী শিবিরের লোক। বস্তুগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ফলেই কোন বস্তুর উদ্ভব ঘটে। সেই নতুন বস্তুটির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তুটি বিশ্লিষ্ট হয়। কোন বস্তুর উদ্ভব এবং তার বিকাশের দ্বান্দ্বিক গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারলে বস্তুটির পরিণতিও ব্যাখ্যা করা যায়। প্রতিটি বস্তুর উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণতির নিয়ম দ্বান্দ্বিক গতির এক একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধ। পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য বিশেষ দ্বান্দ্বিক গতির প্রক্রিয়াগুলি মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে অসীম বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মের দ্বান্দ্বিক গতির সাধারণ প্রক্রিয়াটি। মানুষ নিজেই প্রকৃতির অংশ। সমাজ এবং মানুষের চেতনা সম্পর্কেও একই কথা।

মার্কস বলেছেন, "মানুষের বস্তুজীবনের উৎপাদন প্রণালীই সাধারণ ভাবে তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক ধারাকে নির্দিষ্ট করে। মানুষের চেতনা তার সত্তা নির্ধারণ করে না, তার সমাজিক সত্তাই তার চেতনা নির্ধারণ করে।"

ভাববাদীরা মানুষের চেতনার উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণতির কারণ অনুসন্ধান করেন তাদের ভাবজগতের কোন এক কল্পিত লোকে। বস্তুবাদীরা সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির মধ্যেই মানুষের চেতনার উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতির কারণ অনুসন্ধান করেন। মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের ফলেই মানুষের চেতনার উদ্ভব হয়েছে এবং মানুষের সামাজিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমাজকে প্রভাবিত করছে। এইভাবে সমাজ ও চেতনা মিলিত হয়ে একটি সাধারণ সামাজিক দ্বান্দ্বিক গতির প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যারা কেবল মানুষের চেতনা জগতের গতিকেই দেখেন বস্তুজগতের গতিকে দেখেন না তারা আত্মগত বস্তুবাদী এবং যারা কেবল বস্তুজগতের গতিকেই দেখেন চেতনা জগতের গতিকে দেখেন না তারা যান্ত্রিক বস্তুবাদী। মার্কসবাদ সামাজিক বস্তুগত অবস্থা বিশ্লেষণ করে মানুষের সামাজিক চেতনা বিশ্লেষণ করার বিজ্ঞান। যারা উভয় জগতের দ্বান্দ্বিক গতিকে বিশ্লেষণ করে উভয় জগতকেই পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন কেবল তারাই মার্কসবাদী।

লেনিন বলেছেন, "কোন বস্তুকে সত্যি সত্যি জানার জন্য আমাদের তার সব দিক, তার সব সংযোগ এবং 'মধ্যস্থতা'কে দেখতে হবে এবং পর্যালোচনা করতে হবে। কোন দিনই এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে পারব না, কিন্তু সর্বতোমুখী বিচার বিবেচনার দাবী করতে হবে, কারণ এটা আমাদের ভুল ও আড়ষ্টতা থেকে রক্ষা করবে।" (পুনরায় ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ট্রটস্কি বুখারিনের ভুল সম্পর্কে, জানুয়ারী ১৯২১)

সমধর্মী বস্তুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে দ্বন্দ্বের এক একটি দিক গঠন করে এবং একটি মধ্যস্থকে কেন্দ্র করে বিপরীত-ধর্মী দিকগুলি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ হয়। মধ্যস্থের উপস্থিতির ফলেই দ্বন্দ্বমান বস্তুগুলি বা দিকগুলি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলতে বাধ্য হয়। একটি প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বগুলির প্রতিটি দিকের যেমন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকে তেমনি মধ্যস্থেরও থাকে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। মধ্যস্থের উপস্থিতি একটি প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বগুলিকে প্রধান এবং অপ্রধান দুটি দিকের দ্বন্দ্বে ভাগ করে ফেলে। প্রতিটি দিকের দ্বন্দ্ব যেমন মধ্যস্থের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করে তেমনি মধ্যস্থ প্রতিটি দিকের দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যস্থ একটি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিপরীত ধর্মী দিকগুলির ভারসাম্য রক্ষা করে। মধ্যস্থের পরিবর্তন দ্বন্দ্বগুলির অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটায় এবং তার ফলে দ্বন্দ্বগুলির প্রধান দিকটি অপ্রধান দিকে এবং অপ্রধান দিকটি প্রধান দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মধ্যস্থের ভাঙনের ফলে দ্বন্দ্বগুলির ভারসাম্যও ভেঙে পড়ে। এই ভাবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মধ্যস্থই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

"কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই সেগুলির মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বটিকে খুঁজে বের করার জন্য সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একবার এই প্রধান দ্বন্দ্বটিকে হৃদয়ঙ্গম করা গেলে সব সমস্যারই সহজে সমাধান করা যায়।" ("মাও সে-তুং—দ্বন্দ্ব সম্পর্কে)

সমাজে শ্রেণীগুলির উদ্ভব এবং তাদের দ্বন্দ্ব বিরোধের ফলেই শ্রেণীগুলির মধ্যস্থ হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়েছে। শ্রেণীগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তিও বিকশিত হতে থাকে। রাষ্ট্রশক্তি যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণীই সমাজে প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিকটি গঠন করে এবং অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা অপ্রধান হয়ে থাকে। অপ্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে এক এক সময় এক একটা শ্রেণী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। সামন্ত সমাজের একস্তরে যেমন সামন্তদের সঙ্গে কৃষকদের দ্বন্দ্বই প্রধান থাকে তেমনি সামন্ত সমাজে পুঁজিবাদ বিকাশের একটা পর্যায়ে সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বই প্রধান, দ্বন্দ্বের দুটি দিককে গঠন করে তখন অপ্রধান দিকের প্রধান ভূমিকায় থাকে বুর্জোয়া শ্রেণী। এই ভাবে সমাজ বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রধান দ্বন্দ্বটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত হয়। শ্রেণী বিরোধ প্রধান দ্বন্দ্বের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী প্রধান দিকের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলে ফলে রাষ্ট্রশক্তির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও তীব্র হয়। বিপরীত ক্রমে প্রধান দ্বন্দ্বের অপ্রধান দিকের শক্তি বাড়তে থাকে। ফলে শ্রেণী বিরোধ শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হয়।

সামন্ত অভিজাত শ্রেণী শাসিত সামন্ত সমাজে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী বাড়তে থাকে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ত অভিজাত শ্রেণীকে পরাজিত করা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে অধিকার করে অন্যান্য শ্রেণীগুলির উপর বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এইফলে সামন্ত অভিজাত শ্রেণী সমেত অন্যান্য শ্রেণীগুলি অপ্রধান দিকে পরিণত হয় এবং বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধান দিকে অবস্থান করে। জার্মানীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবের মাঝখানে সামন্তদের সঙ্গে আপোষ করে শ্রমিক কৃষক এবং জনগণের অন্যান্য অংশের উপর বুর্জোয়া সামন্ত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমে সংস্কারের মাধ্যমে সামন্ত শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে বুর্জোয়া একনায়কত্বকে নিরঙ্কুশ করেছিল। পুঁজিবাদের বিকাশ শ্রমিক শ্রেণীকেও শক্তিশালী করে এবং পুঁজিবাদী সমাজে প্রধান দ্বন্দ্বের অপ্রধান দিকটি শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শক্তিশালী হতে থাকে। এইভাবে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণী দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বের দুটি দিককে গঠন করে। অবশেষে শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে এবং প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিকে পরিণত হয়। স্যালী কমিউনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন, 'শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে দখল করেই কাজে লাগাতে পারে না, শ্রমিক শ্রেণীকে অবশ্যই শোষণের জন্য তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

কিন্তু পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে বিকশিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজি বণ্টনী করে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রধান দ্বন্দ্বের পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের সঞ্চীকৃত পুঁজির শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত দেশের বুর্জোয়া এবং সামন্তরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়াশীল জোটে আবদ্ধ হয়। ফলে এই দেশগুলিতে অর্থনীতি এবং রাজনীতির স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হয় এবং জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের শোষণ ও নিপীড়নের ফলে প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিকটির আভ্যন্তরীণ বিরোধে পরিণত হয় অন্যদিকে দেশপ্রেমিকদের নেতৃত্বে অপ্রধান দিকটি শক্তিশালী হতে থাকে। এটাই সাম্রাজ্যবাদী যুগের বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার সমাজেও একই বৈশিষ্ট্য ছিল। "কেবলমাত্র ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিই নয়, উদাহরণ স্বরূপ, এমন কি রাশিয়ার অর্থনীতির দিক দিয়ে ধনী বুর্জোয়া দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।" (লেনিন—জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ১৯১৪)

সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হবার ফলে সামাজিক চেতনা ও বিভিন্ন শ্রেণীর চেতনাও বিভক্ত থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখা। সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা। পুঁজিবাদী সমাজে অন্যান্য শ্রেণীগুলি নিজেদের স্বার্থ অনুসারে এক এক সময় বুর্জোয়া অথবা সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে। এইফলে পুঁজিবাদী সমাজে প্রধান দ্বন্দ্বের দুটি দিকের একটি শক্তিশালী অপরটি দুর্বল হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিদেশী পুঁজির দ্বারা শোষিত এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের দ্বারা নিপীড়িত দেশে সমাজের শ্রেণীগুলিকে দেশপ্রেমিকদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়। রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের সঙ্গে দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া ও সামন্তদের বিরোধের ফলেই এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে। এই সময় দেশের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থ এবং শ্রেণী চেতনা অপ্রধান হয়ে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় চেতনা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রধান দ্বন্দ্বের অপ্রধান দিকের শ্রেণীগুলির মধ্যে দেশপ্রেমিকরাই তখন মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য হোল দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিদেশী পুঁজির দ্বারা শোষিত এবং নিপীড়িত জার্মানীতে

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ট্রাম-বাসযাত্রীরা সবাই অসৎ নন

মিত্রেন

প্রচণ্ড ভিড়ে ঠাসা ঠাসা হয়ে ট্রামের অন্দর বাহির। চালকের সিঠ বেয়ে বারুদগন্ধী বিদ্যুতের মত যাত্রী ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ঝুলছে। কামরার শেষ প্রান্তে জেনানামহলেও একই রকম আবহেরে। তবু তাতেই উঠতে হয়। যেমন আমাকে, তেমনি আরও দু'পাচজন জেনানাকেও। এবং যাত্রীদের শরীর নিয়মিত চর্চায় সুন্দর স্থিতিস্থাপতা অর্জন করেছে বলেই না হক্ক। খুসি মতো গুণানো যাকানো, দোমড়ানো এবং চেপ্টানো যায়। আমার সংসারে রাতের অধাধা অতিথি হুলো-টাইপ দু'চোটার মতই আমরা। রক্তপথ যতই সংকীর্ণ হোক ঠেলে ঠুলে ঠিকই ঢুকে পড়ছি। এক এক ইঞ্চি থেকে এক এক গণ্ডা যাত্রী জেনানা।

এমনি হামলা হামলির মধ্যে কোনো কোনো ঠাস-ঠাস-লেটেড হাইব্রিডস যাধীন জেনানা হঠাৎ অষ্টাদশ শতকীয় অস্পৃশ্যা বধুনারী বনে যান। সমস্যা তখন দু'দিয়ে গুণীতকে বাড়তে থাকে। এসংক্ষেত্রে পুরুষযাত্রী অসহায় অপরাধী। তিনি দেখলেন, পার্শ্ববর্তিনী তাঁর কামানো ভ্রু বাঁকানো-ধনু ক'রে তুলেছেন। দেখেন তাঁর পালিশ করা মুখের অসন্তুষ্ট চকচকে নাসিকার অবস্থিতি সুকঠিন। ফলত নাসিকা কুঞ্চনটি (ঘ্রাণ ফ্যাশনের নোজ্ রিং) সুস্পষ্ট বিরক্তির ঝঙ্কার সৃষ্টি করছে। পুরুষ যাত্রীটির কাঁধে তখন ভরল রক্তধারা। ভিড়ের চাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা অপেক্ষা অনেক বেশি প্রয়োজন 'হয়ে পড়ে সহযাত্রিনীর অঙ্গ স্পর্শ থেকে আপন শরীর সাবধানে গুটিয়ে রাখা। এমন সংকটে শুধু ভদ্র পুরুষজনই পড়েন। জেনানামহল এই কষ্ট কোনদিনই উপলব্ধি করতে পারলেন।

তা না পারুন মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিনিষ উপলব্ধি করতে চাননা। হয়ত এও এক জেনানাত্ত্বী। কিন্তু প্রায়শ পুরুষ যাত্রীরা এমন সঙ্কটে মনে মনে বিস্ফোভে ধুঁইয়ে থাকেন। হঠাৎ তারই বিস্ফোরণ ঘটে যায় কোনো একদিন কোনো এক রুটে।

সেদিন আমার রুট ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ওয়েলেসলি থেকে জ্যোতি সিনেমা—অর্থাৎ দর্পণ অফিস ভক। আগেছি ট্রামে। অবশ্য আগেই বর্ণনা করেছি। মহিলার বুকের কাছে যুবক যাত্রীটি উদ্ভয় সংকটের উৎপাত সামলাতে পিঠের নিচে আমাকেই একমাত্র সর্বসহ আলোপিলো বানিয়ে যথেষ্ট চেপে যাচ্ছেন। চাপটা প্রত্যেক ইঞ্চে নোতুন বাটবারা চাপিয়ে বাড়ছে। চাপা-চাপির ব্যাপারে আমি দুর্বল প্রাণী। অনেককাল আগেই আমার হাড় পাঁজর স্পঞ্জের মতো নরম হয়ে গেছে। দেখছি, একটা পুরো ট্রামের ভারে চেপ্টা শরীর ছিঁড়ে নিলে রাস্তার ন্যায্য পর দেহাস্থিগুলি আবার যথাকার প্রাপ্ত করে আগের মতোই পটাপট সেট হয়ে গেছে। আমার দেহের এই অসহন স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ট্রামযাসে আমি কখনো গোলমালের মধ্যে যাইনা। কোনদিন আদির পাঞ্জাবী গায়ে দেই না। সুতির জামা কাপড় ট্রামেবাসে জনে জনে আদর করে 'গিলে' করে দেয় বলে টেরিকট টেরিলিন জাতীয় মোচড়সই পোষাকই ব্যবহার করি। এহেন আমি স্পিকটি নট যাত্রী। যুবকটি প্রতি ইঞ্চে অপরের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে ফুঁসে উঠছেন: আর কোথায় সরবো দাদা, জায়গা কি আছে? দেখছেন তো চারিদিকে কেমন এয়ার টাইট প্রেসার!

বেশ বুঝতে পারছি, প্রেসার শুধু দেহেরই নয়, অনেক ঈর্ষাতুর যাত্রীর মন ও চোখের প্রেসারেও যুবকটি রীতিমত কাহিল হয়ে পড়েছে। তার ওপর অতি আধুনিকা সহ-যাত্রিনীর নাসিকা-নল ও গ্রীবা ভঙ্গির তাড়না। অনেক পুরুষচোখে ছেলেটিকে আপদে বেগেছে, সেসব চোখের বক্তব্য খরচাপার, মহিলার পক্ষাচ্ছাদিত বুকের কাছে বুক নিয়ে কিছুমাত্র ফিকিরবাজির চেষ্টা কোরোনা?

অপর যাত্রীদের চোটপাটের ঐ একটাই বিশেষ কারণ আমি টের পাচ্ছি। কিন্তু আমি তো দুর্বল জীব, তাই স্পিকটি নট জেন্টেলম্যান। "ও দাদা, একটু সরে মহিলাকে এদিকে আসার জায়গা দিন না।" অনৈক দীর্ঘকায় যাত্রী জিরাফের গলা পাঁচজনের কাঁধের ওপর টনকে দিয়ে ঈর্ষায় কাঁপছিলেন। রাগে ফেটে পড়েন তিনি। সঙ্গে সমর্থকরাও ব্যাকুল। মহিলাটি তাঁর ঐম মাথানো চোখের পাতা বড় বড় করে আঁখি প্রজাপতির চারিদিকে বেওয়ারিশ ভাবে উড়িয়ে দেন। করুণ সেই প্রজাপতির ওড়াউড়িতে যুবকের বিস্ফে গলার মিছিল গর্জে ওঠে: অনেকক্ষণ তো এ পাশায় পেপটে আছেন। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় মশাই।

আমার মনে হল, সমধর্মাংশ কুরু কণ্ঠের একটিই মাত্র আর্তি, ছেড়ে দিন, ওনাকে এদিকে আসতে দিন এবার। আমরা কি বিনাটিকিটের যাত্রী? বুঝলাম, ব্যাপার বিষম বেগতিক। যুবকটির চেহারাও এমন কিছু মস্ত মস্তানী চেহারা নয় যে ব্যাকুলযাত্রীরা শেষ পর্যন্ত মনের দুঃখ ছাতা পর্যন্ত না এনে এক এক টেঁকে সিলে ফেলবেন। আর মহিলাটির সুবিধের নয়। তিনি আরামে দাঁড়ানর ফিকিরে ক্রমাগত নীরব চাহনির আবেদন জানিয়ে যাচ্ছেন।

ওয়েলেসলি লাইনটা ভালো নয়, ওয়েলিংটনে পৌছানোর আগেই একটা ঝাড়পিট হয়ে যেতে পারে। সহানুভূতিতে আমি নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়ে যুবকটিকে জায়গা দিচ্ছি। কারণ লক্ষ্য করেছি, ছেলেটি ভদ্রতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অথি এটা আমার থেকে আর কে বেশি বুঝবে। সব ধকলটাই যে আমার ওপর। অথচ ছেলেটির সামনে সমূহ বিপদ। সমর্থন পেয়ে জিরাফ গলা উৎসাহে বিস্ফোরিত হওয়ার ভাবভঙ্গি গ্রহণ করেছে।

ঠিক এমনি মুহূর্তে ছেলেটি অদ্ভুত এক অস্ত্র নিক্ষেপ করল। ভাবতেই পারিনি, সামান্য একটি কথা মানের মুখে এমন চমৎকার বেদের বেরুচ্ছের মতো কাজ দেবে। ঐ কথাই যেন হক কথা। গোটা ট্রামের সমস্ত উত্তেজনা ফাঁপা করে ফেলে দেল। দীর্ঘ ক্লান্তি মোচনের লঘু বিনিসে ঠাসা ট্রামটা বস্তির পাটি দাঁত বার করে হেসে উঠল। মুহূর্তে একই যুবক বিরূপ যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র 'বিবেচ' বনে গেলেন। এমন তৎক্ষণিক উল্টো গতি একমাত্র কলের গাড়ির ব্যাক গিয়ারই সৃষ্টি করতে পারে।

অথচ কথাটা খুবই সাদামাটা। বলা যায়, উদ্ভাক্ত যুবকটির ঐ কথাই ছিল সর্বশেষ বিধ্বস্ত উক্তি। চতুর্দিকের লোচ্চার দানিতে অন্তিম দুরুহ সরে গেছেছে, "শাল তো দাদা সবদিকেই। এই ভিড় ভড়কা গাড়ির ভেতর। কণ্ডাক্টর সাহেব গাড়ির মাথায়। টিকিটা পর্যন্ত কাটা হ'ল না। এখন রাস্তায় নামলেই "মোবিল" ধরবে।" (অর্থাৎ মোবাইল চেকিং স্কোয়াড ভ্রাম্যমাণ কর্মচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে)।

ভারি পবিত্র একটা হাসির রোল সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ খেলে গেল। জিরাফ গলাই এক মুখ হেসে বলল,"দারুন দিয়েছেন দাদা মোবিল ধরবে।" "যত দোষ তো শালা, এই সাধারণ মানুষের!" আর একটি কণ্ঠ কোতের হাওয়া ঘুরিয়ে দিল?

"যা বলেছেন। যত নিয়ম পালনিকের জন্যে। বলুন তো, এই ভিড়ে টিকিট কাটা যায়? ও কণ্ডাক্টর দাদা, টিকিট নিন..."

সঙ্গে সঙ্গে যুবকণ্ঠের মিলিত চিৎকার। "টিকিট নিন দাদা মোবিল ধরবে।" এবং হাসি। অদ্ভুত বিষ্ণুক মুখের ক্লান্তিঘন হাসি। আমার সন্দেহ হল, ও জিনিস হাসি, না দুঃখ, বিভ্রম!

দেখলাম, বিরক্ত মহিলার মাথাময় অন্তিত্ব ভুলে গোটা ট্রামে ছড়িয়ে পড়ল সেই কথার আগুন, 'মোবিল ধরবে'! কী অদ্ভুত এক মন্ত্রপুত কথা। যেন শব্দ দুটো উচ্চারণ করেও যাত্রীদের মুখ।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় চেতনা এবং দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটেছিল। জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঠিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে সেই জাতীয় চেতনা এবং দেশপ্রেমের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হবার ফলে বুর্জোয়া পার্টির নেতৃত্বে সেখানে জাতীয় চেতনা উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়ে ফ্যাসিজমের জন্ম দিয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে সমাজতন্ত্র গঠনের পরিবর্তে হিটলারের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণী অন্তর্দেশ আক্রমণ করে নিজেদের পুঁজির বাজার সৃষ্টি করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

কমিউনিষ্ট পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদী হলেও সর্বদা নিজিষ্ট দেশের জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে এবং বিশ্বে একটি মাত্র সর্বহারা মানবজাতি গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে নিজিষ্ট দেশের সর্বহারা শ্রেণীকে সর্বহারা জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। "যেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে,দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উঠতে হবে তাই শ্রেণিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতি যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।" (মার্ক্স-এঙ্গেলস: কমিউনিষ্ট ইশতেহার) সেবাদাসদের দ্বারা নিম্নোক্তি দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি কেবল সর্বহারা শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। সর্বদা দেশ, জাতি এবং জনগণের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের উচ্ছেদ করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি দেশকে সর্বপ্রথম স্বাধীন এবং মুক্ত করে। স্বাধীন এবং মুক্ত দেশে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলে কমিউনিষ্ট পার্টি রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করে।

যে কোন শ্রেণী থেকে আসা ব্যক্তিই কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হতে পারে। সভ্য হবার পূর্বে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দেশের প্রধান সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে পার্টির তত্ত্ব, নীতি, পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। কোন দেশের নির্দিষ্ট অবস্থার একটাই প্রধান সংগ্রাম থাকে। সেই প্রধান সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েই কমিউনিষ্ট পার্টি বিকশিত হয়। একটি প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টির অবশ্যই ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক মার্কসবাদী জ্ঞান থাকতে হবে, সঠিক মতাদর্শগত রাজনৈতিক লাইন থাকতে হবে এবং সর্বদা নিজের ভুল সংশোধন করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। এই রকম একটি কমিউনিষ্ট পার্টি'র সঙ্গেই সত্তর দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে বিদেশী পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দেওয়া।

বাংলার নবজাগৃতির স্বরূপ ও রবীন্দ্র-মানস

কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালী চিত্তামানসে যে নবরূপ দেখা দিল তার ভিত্ হল কলকাতা মহানগর। কলকাতার উদ্ভব ও বিকাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের বিকাশে। তাহতে ইংরেজ শাসনের প্রধান ফল হল সুদীর্ঘ ফিউডাল গ্রাম সমাজের ভিত ভেঙে একটি উন্নততর সভ্যতার বীজ বপন। ভারতের যা কিছু প্রাচীন ও গৌরবের এবং যা কিছু অচল ও অবক্ষয়ের তা ধ্বংস হল এবং এক নতুন সমাজ পরিবেশের ভিত্তি স্থাপিত হল। এর তিনটি মূল কারণ দেখা যায় :

১। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় গ্রাম-সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্ব ছিল বটে কিন্তু তা আইনত নয়। প্রথামত যুগোগে রাজা ও তার নীচে সামন্ত প্রভৃতরা যেমন জমির মালিক ছিল তাহতে তেমন ছিল না। রাজা ও তার অধস্তন কর্মচারী। ছিল কেবল রাজস্ব আদায়ের অধিকার।১ ভারতের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থা যে যুরোপের ফিউডাল ব্যবস্থার মত নয় তার প্রধান কারণ প্রাকৃতিক উর্বরতা ও সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য জলসেচ প্রভৃতি প্রাকৃতিত ভাবে হয়েছে, তার জন্য জটিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়নি, যা যুরোপে প্রয়োজন হয়েছিল।২

২। উর্বরতার জন্য দৃঢ়ভাবে উৎপাদন সম্ভব ছিল বলে প্রকৃতিকে জয় করার সংগ্রাম ও তজ্জাত টেকনলজির অগ্রগতির ও বিকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। যে টেকনলজির বিকাশে যুরোপ-আমেরিকার প্রমকে খাটানর জন্য যন্ত্র প্রথা দেখা দিয়েছিল তাও তখনও ব্যাপক আকারে দেখা দেয়নি। তাই জমিরা উন্নত হয়নি, বিজ্ঞানচর্চা ব্যক্তিগত মনীষার সীমাবদ্ধ থেকেছে। ব্যাপক প্রয়োজনে পরিণত হয়নি।

৩। সমাজবিজ্ঞানী লুই মামফোর্ড বলেছেন যে মহানগর হল মানুষের সচেতন মনের শিল্পরূপ এবং নগরের সর্বজনীন কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির স্বকীয়তা নিয়ে কলাশিল্পের বিকাশ হয়। এইভাবে মহানগর প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানবিক করে তোলে এবং মানবিক আদর্শের উত্তরাধিকারকে সর্বজনীন করে তোলে ৩

ভারতে প্রাচীন গ্রাম সমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাচীন গ্রাম সমাজের ভিত্তির ধ্বংস এবং মুক্ত বহানগর কলকাতার প্রতিষ্ঠা। বিদেশী শাসকদের প্রভাবে যুরোপীয় ধরনের রেনেশাস বা নবজাগৃতির মানসিক পরিবেশ ও শর্ত প্রতিষ্ঠা করল —যা মধ্যযুগের প্রাচীর দেয়া তীর্থস্থান। রাজস্থান (দুর্গ বা রাজদরবার) এবং রাজা ও রাজকর্মচারীর সর্বাঙ্গক শাসনাধীন "নগরে" সম্ভব ছিল না। তাই দিল্লী বা কাশী, ঢাকা বা মুর্শিদাবাদ নয়—কলকাতাই হল নতুন ব্যক্তি চেতনার মুক্তির পীঠস্থান এবং ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। এ যাবৎ ভারতে বহু বিদেশী জাতি এসেছে, কিন্তু তারা ভারতের উন্নততর সভ্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ইংরেজরাই প্রথম আসল এক উন্নততর সংস্কৃতি—তাদের দেশে নতুন রাজপুত্র।

"The British were the first conquerors superior……"৪

তাই বলতে হবে এ নবজাগরণের আলো চন্দ্রের মত ধার করা আলো। তার নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তের শর্ত পুরোপুরি দেশাই দেয়নি—যুরোপের রেনেশাসের মত। যুরোপের রেনেশাস সামন্ত পরিবেশে অবক্ষয় ও ধ্বংসের সূচনায় নবোন্মেষিত ধনবাদের মুক্ত গতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্তদিকে কলকাতা মহানগরীর এই 'নবজাগৃতির' পরিবেশ কী ছিল? সাম্রাজ্যবাদী শোষণের, অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের ও সর্বনাশের পরিবেশ। মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ডে দেখিয়েছেন যে ধনবাদী ইংলণ্ডের ধনবাদের মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের সুযোগ নিয়ে ভারত প্রভৃতি লুণ্ঠনের দ্বারা। ইংরেজরা এদেশে কী বিপুল লুণ্ঠন করেছে তার বিস্তৃত তথ্য রয়েছে রমেশচন্দ্র দত্তের 'Economic History of India'-গ্রন্থে। রমেশচন্দ্রের একটি বাংলা গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ শুধু একটি সুবৃহৎ শস্য প্রসূ ভূমি ছিল না, ভারতীয় শিল্পজাত এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডের নগরে নগরে বিক্রয় হইত। ইংরাজদের স্বার্থান্ধতার ···আমাদের সে শিল্প···নাশ প্রাপ্ত হইল।

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কৃষিকর্ম · জমিদার প্রাপ্য খাজানার উপর শতকরা ৫ হইতে ২০ অবধি ছিল।···১৭৯৩ হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে জমিদারের খাজানার উপর শতকরা ১০ পরিমাণ···ধার্য্য হইয়াছিল।"৫

লুণ্ঠন ও অত্যাচারের প্রথম ফল—গ্রামীণ শিল্পের ধ্বংস সাধন। তাঁতী, রেশম শিল্পী ও রেশম ব্যবসায়ীদের ওপর লুট ও অত্যাচারে ভারতের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র বাংলাদেশে এ শিল্প ধ্বংস হল। অন্তদিকে কেবল ল্যাঙ্কেশায়ের সমদেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীট লাভ হয় ১,৬৪০, ১০০ পাউণ্ড। প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে ১৭৭৬ (১৭৭০-৭১) এর মন্বন্তর হল যাতে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা গেল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের "রিপোর্ট"-এ দেখা যায় যে এই দুর্ভিক্ষের বছরেও "বড়া ব্যবস্থা" নেওয়ায় খাজনা আদায় হয়েছিল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের থেকেও বেশী।

এই "বড়া ব্যবস্থা"র খাজনা আদায় থেকেই জমিদারী ব্যবস্থা ও জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব। কর্ণওয়ালিস "দশ সালা" ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে এই শ্রেণীর হাতেই খাজনা আদায়ের মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ইংরেজ ধনবাদীরা তাদের প্রাথমিক মূলধন তুপ করার জন্য ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতিপ্রধান ভূমি ব্যবস্থার ওপরে একটা অভ্যন্তর ফিউডাল প্রথা চাপিয়ে দিল। পূর্ববর্তী গ্রাম সমাজ ব্যবস্থায় রাজাকে খাজনা দেওয়া ছাড়া বাকি ব্যাপারে গ্রাম সমাজ ছিল স্বায়ত্তশাসিত এবং জমির সংরক্ষণ, দেচব্যবস্থা প্রভৃতি রাজার আনুকূল্যে তারাই চালাত। এই জনকল্যাণ (public works) সম্পূর্ণ বন্ধ হল। ফল হ'ল কৃষির অবনতি, দারিদ্র্য, বেকারী, জলকষ্ট (খাল বিল পুকুর বজে গিয়ে) এবং তা থেকে ভয়ের মহামারী। এ অবস্থায় কুটির শিল্পও ধ্বংস না হয়ে পারে না।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক শাসকশ্রেণী ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে শোষণ চালাবার জন্য এবং নিজের দেশে ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা শিল্পের বাজারের প্রয়োজনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নিল। এর আরেকটি কারণ আমেরিকার উপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রাম এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ তখন আমেরিকায় ও যুরোপে ইংরেজের বাজার দুর্বল করে ফেলেছিল। নববিকাশশীল ইংরেজ ধনতন্ত্রের নতুন বাজার হল ভারত প্রভৃতি প্রাচ্য উপনিবেশ।

ভারতে ইংরেজ মূলধনের বিনিয়োগ প্রথম হল রেলপথ নির্মাণ, তারপর পণ্য আমদানী এবং তুলি, আসাম ইত্যাদি সংগ্রহ।৬ প্রায় ৯ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশ মূলধন ভারতে বিনিয়োগ করা হল।৭ আর এ জন্যই "ভারতের শাসন তার বৃটিশ হস্তে ন্যস্ত হইবামাত্র তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের অবনতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন।" ৮ "১৭৬১ সালে বাঙ্গলার রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরেজের হস্তগত হয়। চারি বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৬৭ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের ১৭ মার্চ তারিখের পত্রে কর্মচারিগণকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন বঙ্গের রেশম প্রস্তুতের ব্যবসাকে উৎসাহিত এবং রেশম বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করা হউক।" ৯

এর ভয়ঙ্কর ফল ইংলণ্ড থেকে কাপড় আমদানীর প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি। রমেশচন্দ্র ঐ গ্রন্থে ১৭৯৪ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত ২০ বছরের কাপড় আমদানীর পরিমাণের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১৭৯৪তে কাপড় আমদানী হয় দেড় হাজার টাকার। আর পনের বছরের মধ্যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তার পরিমাণ হল প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ১০ একজন ইংরেজের মুখেই বাঙ্গালার ফেঁপে ওঠার তথ্য শোনা যাক : From 1824 machine spun twist and yarn began to arrive. In 11 years the value of such imports into Calcutta rose from less than a lakh of Sicca rupees to 33 lakhs" ১১

এভাবে "শিল্পজীবী ভারতবর্ষের সমগ্র মূর্তি পরিবর্তিত হইয়া, গ্রেট ব্রিটেনের কলের জন্য উপকরণ দ্রব্যের (সূতা ইত্যাদি) উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।"১২ "ভারত হইতে বার্ষিক অর্থ শোষণ বিগত ৪০ বৎসরে ২ কোটি টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এ টাকার অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীর উপার্জন। এ টাকা কেনেও আকারে আর তাহাদের ব্যবসায় বা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিতে ফিরিয়া যায় না। বৎসর বৎসর ইংলণ্ডের আয় ও মূলধনের পরিমাণই বৃদ্ধি করিতেছে।" ১৩

পরিষ্কার দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনের ভিত্তি হিসেবেই কলকাতার প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকে এই শোষণ যন্ত্রের স্বার্থে গড়ে ওঠা ভারতীয় শিক্ষায়ন যা হয়েছে তা একান্তই দুর্বল : ১৮৮০ পূঃ পর্যন্ত বস্ত্র, পাট ও কয়লা খনি শিল্প মিলিয়ে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠান—১৩৬টি ; মোট নিযুক্ত শ্রমিক—৮১,৭৭৬।১৪ প্রায় শতাব্দীকাল সময়ে মেড়পর'কম প্রতিষ্ঠান, একজনের কম শ্রমিক !

যুরোপের সঙ্গে তুলনা করলে এ চিত্র কী করুণ। এ সময়ে যুরোপের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা ধনতন্ত্রের দেশ রাশিয়ায় ১৮৭০ তে ছোট বড় সাতাশ হাজারের বেশী কারখানায় শ্রমিক ছিল ৭৬৩,১৫২। আর ১৮৯০-এ শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে হয় ৮,৭৫ ৭৬৪।১৫ আর ভারতের ধনতন্ত্রের সমগ্রিগত ব্যাপ্তির মোটা অংশ গড়ে উঠেছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। (ক) ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ভারতের মোট ৮৯টি ইংরেজ বাণিজ্য "হাউস"-এর মধ্যে ৬২টি ছিল কলকাতায়। (খ) ১৮৩০—৫০-এর মধ্যে ২০টি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় কলকাতাতে। কিন্তু এই শিক্ষায়নের বিস্তার এত সামান্য, এত সীমাবদ্ধ, এত বিদেশী শাসনে সংকুচিত যে তা যুরোপের শিল্পায়ন ও ধনবাদের বিপুল উদ্যমের কণামাত্রও নয়। আর এই শিল্পায়নে ভারতীয় "বুর্জোয়া" শ্রেণীর কী ভূমিকা ছিল—যারা হলেন বাংলার তথাকথিত নবজাগৃতির ধারক ও বাহক?

পলাশীর যুদ্ধের পর পুরনো অর্থবিনিয়োগকারী (finance capital) শেঠদের অবলুপ্তি ঘটল। হেষ্টিংস প্রভৃতির দ্বারা সামন্ত রাজন্যবর্গের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন চলল অবাধে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধস্তন কর্মচারীরা পর্যন্ত অসাধুতা ও গায়ের জোরে ব্যবসা চালাতে লাগল। দেশীয় মূলধন সর্বভারতীয় স্তরে তখন নেই বললেই হয়। বাংলা দেশের খাজনা আদায়কারী জমিদাররা গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে সর্বনাশা শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যে অর্থ সংগ্রহ করত তা গ্রাম থেকে শহরে এসে মহানগরের উচ্ছৃঙ্খল বিলাসে উড়িয়ে দিত এবং প্রায়শঃ জমিদারীটাও খোয়াত। বাংলা দেশে নতুন ধনাঢ্য শ্রেণী হল ইংরাজ কুঠিয়ালদের, বণিক কর্মচারীদের দালালী করে ফেঁপে ওঠা চতুর ভাগ্যান্বেষীর দল। এদের মধ্যে প্রায় সত্তর জন "বেনিয়ান" বা এজেন্টের মধ্যে জনা পনের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন এবং প্রচুর টাকা করেছিলেন। কিন্তু

(শেষ অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)

বাংলার নবজাগৃতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তা কোন স্বাধীন কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে নয়। সবচেয়ে বিখ্যাত ধনী নন্দুয় ঘরের পোক্ত সুখময় দেওয়ানী করতেন ইলাইজা ইম্পের ; মতিলাল শীল ২০ টি ইংরেজ কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন ; রাজা-নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইভের দেওয়ানী করে বিপুল অর্থশালী হন ; বিশ্বম্ভর সেন ২০টি কুঠির দেওয়ান ছিলেন ; ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলারের দেওয়ানী করতেন ; ধনীশ্রেষ্ঠ রামদুলাল দে ফেয়ারলী কোম্পানীর দেওয়ানী করতেন। সেকালের এই তথাকথিত "বুর্জোয়া" ধনিকদের সম্পর্কে সেকালের দুজন প্রখ্যাত লেখকের রচনাংশ উদ্ধৃত করছি :

"কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছুকাল পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ মিনকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে মিনকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান।" ১৬

"তখন মিনক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত।" ১৬ক

বাঙালীর বাণিজ্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুর—তাঁর কর্মোদ্যোগ ও পৌরুষের প্রশংসা সর্বত্র ব্যাপ্ত—তিনিও মিনকের এজেন্ট প্লাউডেনের দেওয়ানী করতেন। পরে প্রচুর টাকা করার পর ইংরেজ বণিকের সঙ্গে মিলে (collaboration) "কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী" গড়েন। তিনি নীল চাষ এবং নীল তৈরীর কাজেও হাত দেন।

একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি শর্ত ও পদ্ধতি হল সঞ্চিত মূলধনের নতুন শিল্প বাণিজ্যে বিনিয়োগ। কিন্তু বাঙালী মূলধন সংগ্রহকারীরা এই সর্ত ও পদ্ধতি কতদূর পালন করেছিলেন ? নতুন বাণিজ্য লক্ষ বিত্তবানরা বিদ্যুদ্বল পড়েই হয়ে পড়েছেন জমিদার। প্রথম যুগের অগ্রণী বণিক মতিলাল শীল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জমিদার হলেন। পরবর্তী কালের অগ্রণী বণিক দ্বারকানাথ ঠাকুরও সারা বাংলা দেশে বিস্তীর্ণ জমিদারী কিনে ফেলেন। তাঁর বংশধরয়া কেউ শিল্পায়নে এগোতে পারেননি। অর্থাৎ এই নব্য বণিকরা প্রথমতঃ ইংরেজ শাসক শ্রেণীর শোষণ ও লুণ্ঠনের কাজেই সাহায্যকারী এজেন্ট হিসাবে প্রচুর বিত্ত করলেন। কেউ কেউ কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে অথবা সাহেবদের সহযোগী হয়ে বাণিজ্য করলেন। কিন্তু তা কখনই শাসক শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করার স্তরে পৌঁছতে পারেননা। তাই এই বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতা জেনেই তাঁরা অর্জিত টাকা আবার জমিদারীতে নিয়োগ করলেন। এভাবে তথাকথিত অগ্রণী বণিক বুর্জোয়ারা আবার ফিউডাল ভূস্বামীতে পরিণত হলেন। ঔপনিবেশিক পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়ক শ্রেণীর এর চেয়ে বেশী অগ্রগতি কি হতে পারে ?

ইংরেজ শাসন ও তার জন্য প্রতিষ্ঠিত মহানগরে কিছু শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যবিত্ত পাঁতি-বুর্জোয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠল যাদের ওপর ভিত্তি করে দেখা দিল এই তথাকথিত নবজাগৃতি। কলকাতা ও ২৪ পরগণার উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ কালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে পরিচয় হাল্টার সাহেব দিয়েছেন তা থেকেই এই শ্রেণীর একটা পরিচয় মেলে। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের এই বিবরণ থেকে দেখা যায় যে এ অঞ্চলে পশুর ডাক্তার ৫ ; গো-বৈদ্য ৭৬ ; কবিরাজ ১২৬১ ; হেকিম ১৪৩ ; ডাক্তার ৬৬৭ ; অধ্যাপক ৩৪ ; স্কুলমাষ্টার ১৮১৪ ; পণ্ডিত ৪৩৯ ; ৩৮ ৩২০ ; মুনশী ২৫৪ ; মৌলবী ৩১ ; ছাত্র ১০,২৮১ ; পত্রিকা সম্পাদক বা গ্রন্থকার ২২ ; ব্যারিষ্টার ২৬ ; এটর্নী ২৭ ; উকিল ৪৩১ ; মুহুরি ৭৫৮ ; কাজি ১১৬ । অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা বাদে শিক্ষিত বৃত্তিযুক্ত মধ্যবিত্তের সংখ্যা ৩৭৩১ । এছাড়া ছিল রাজস্বারী ১৯৭ কেরানী হাইটার ১১৭৬১ ; সওকার ৭০২৬ ; দোকানদার ৩০,৫১৮=মোট ৫০,১২০ । ১৭ এর মধ্যে মুনশী, কবিরাজ, দোকানদার, দরকার প্রভৃতির শ্রেণী বিভাগ খুবই গোলমেলে। ১৮৮১ এবং ১৯০১ এই দু বারের সেন্সাস রিপোর্টে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ বছরের বিকাশের একটা পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৮১তে মোট সরকারী কর্মচারী—প্রায় ৪২০০ ; উকিল ব্যারিষ্টার এটর্নী ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক শিক্ষক ২৭২৪ । ১৯০১এ সরকারী কর্মচারী ১৮১৫০ ;ছোট বড় মিলিয়ে বুদ্ধিজীবী ২২৫৩০ । আর ছোট ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১২৫,৬৭১ ।

অর্থাৎ পুরো উনিশ শতক ধরে মহানগর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের যে বিকাশ ঘটেছে তার বিপুলতম অংশ ছোট দোকানদার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কেরানী, সরকারী নীচুপদের কর্মচারী গুরু মুনশী ইত্যাদি। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির সংখ্যা নগণ্য কারণ যন্ত্রশিল্প ও প্রয়োগবিদ্যার প্রসার হয়েছে বৎসামান্য। হাল্টার সাহেব তাঁর ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাকাউন্টে যে হিসাব দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় যে ১৮৭১ পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস ও বিচার বিভাগে ভারতীয়ের সংখ্যা শূন্য। জনশিক্ষা, রাজস্ব আদায়, আবগারী ইত্যাদি বিভাগে উচ্চপদের ভারতীয় অল্প কয়েকজন। উচ্চপদের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ছোট আদালতের জজ, মুনসেফ ইত্যাদি মিলিয়ে মোট সংখ্যা ৩৮৪। এই কটি পদই শিক্ষিত বাঙালীর পদমর্যাদার সর্বোচ্চ শিখর।

॥ দুই ॥

আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের "নবজাগরণ" যে কখনই তেনিস-ফ্লোরেন্স-ইংলণ্ডের সামন্ততন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া বণিকতন্ত্রের বিপ্লবিজয়ী উন্মাদনার তরঙ্গশীর্ষে ফুটে ওঠা রেনেশাঁস হতে পারেনা তা ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ য়ুরোপের রেনেশাঁস মধ্যযুগীয় সংস্কারের অন্ধত্বদের নিগড়—যা সামন্তবাদের রক্ষার জন্যই তৈরী হয়েছিল—তাকে ভেঙে নতুন মানবতা ও ব্যক্তিবাদের উন্মেষ ঘটিয়ে যুক্তিবাদ ও মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। তার দার্শনিক ভিত্তির জন্য যুক্তিবাদ বা র‍্যাশনালিজমের চর্চা হিসাবে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চার নতুন উদ্যম শুরু হল। এর সঙ্গে যুক্ত হল বিজ্ঞান ও টেকনলজির নব নব আবিষ্কার। কিন্তু আমাদের দেশে অন্তঃস্ফোটের যে প্রাচীন শাস্ত্রচর্চা দেখা দিল তার লক্ষ্য ছিল হিন্দু পুনরুজ্জীবন। তবে যেহেতু তাঁরা আমাদের দেশে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করলেন তাঁরা প্রায় সবাই য়ুরোপীয় চিন্তাধারনে আলোকিত তাই এই হিন্দুধর্মনীর মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবও এসে পড়ল। তবে এই নব্য শিক্ষিত সমাজের আন্দোলন কাদের দ্বারা এবং কাদের জন্য হল ? আমাদের শিক্ষাধারার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে চৌল-পাঠশালা মক্তব মাদ্রাসা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক জনশিক্ষা ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এডাম সাহেব যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখান যে বিহার সহ বাংলা দেশে ঐ ধরণের প্রায় এক লক্ষ বিদ্যালয় ছিল। অবশ্য লিখতে পড়তে জানা ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ । ১৮ ভাগ। সুতরাংই এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল পুরনো পল্লীকেন্দ্রিক সামন্ত গ্রাম্য সমাজের উপযোগী। বণিকতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের বিস্তৃতির পক্ষে এই শিক্ষা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, প্রতিকূলও। এই শিক্ষা ছিল অনড়, প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ। একজন ইংরেজ এর পরিবর্তনের প্রয়োজন অনেক আগেই ধরতে পারেন। এঁর নাম চার্লস গ্রান্ট। ১৭৯২ সালে তাঁর "Observation on the state of society among the Asiatic subject of Great Britain…"নামের লেখায় তিনি ভারতীয়দের জন্য ইংরেজী শিক্ষার সুপারিশ করলেন। মূল উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি বললেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা শাসক ও শাসিতদের মধ্যে বন্ধুত্ব আনবে এবং পরিণামে বাণিজ্য প্রসারিত হবে।১৯ অর্থাৎ এই শিক্ষা শাসক শ্রেণীর ভিৎ দৃঢ় করার জন্যই। পুষ্টিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮১৭ থেকে ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হল ও বই প্রকাশ শুরু হল। এই বছরেই ২০শে জানুয়ারী হেয়ার ও রামমোহনের চেষ্টায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত এবং ইংরেজী পত্রিকার আদর্শে "সমাচার দর্পণ" প্রকাশ শুরু হল। এই সব ঘটনা নব্য ইংরেজী শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা। ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেরকে তাঁর বিখ্যাত "মিনিটস" পেশ করলেন। তাতে ভারতীয় চিন্তা ও সাহিত্যকে চরম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে প্রাচ্য ধারার শিক্ষার সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা নাকচ করে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষার সুপারিশ করলেন। তার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে একটি বিখ্যাত বাক্যে—We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. সোজা কথায় কালো ইংরেজ তৈরি করা চাই। ১৮৩৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে সরকারী চাকরীর জন্য ইংরেজী শেখা আবশ্যিক। ১৮৫৪ সালে উড সাহেবের 'ডেস্‌প্যাচে' ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করা হয় তাতে "মানবতা", ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ জাতির শিক্ষাবিস্তারের "মহান" ভূমিকা ইত্যাদি অনেক মধুর কথা থাকলেও আসল লক্ষ্য ছিল আমলাতন্ত্রের বাহিনী তৈরী করা এবং ইংরেজী পণ্য-বিস্তারের পথ রচনা। ডেসপ্যাচের ৪র্থ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে এ শিক্ষা "secure to us a larger and more certain supply of many articles necessary for our manufactuers and extensively consumed by all classes of our ponulation, as well as an almost inexhaustible demand for the produce of British labour. অর্থাৎ এই কালো ইংরেজ সম্প্রদায় ব্রিটিশ উৎপাদনের বাজার স্থায়ী করবে ও তার জন্য অফুরন্ত চাহিদা সৃষ্টি করবে। (চলবে)

[পাঠটীকা প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হয়ে]

মিহির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮·০০
পৃথিবীর বয়স	১৪·০০
জীবন নিরবধি	১৬·০০
ঘরে ফেরার দিন	৫·০০
দিবস বিভাবরী	৫·০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬·০০
আলোর সহোদর	৪·০০
পারাবারের তীরে	১০·০০

শুকসারী ॥ ১৭২।৩এ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪ ॥ বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী

রামমোহনের ভুটান যাত্রা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

করে ১৮১৭ সালের ১৪ জুন তারিখের পত্রে বড়লাট বিষাক্ত জায়গায় দেবরাজকে দখল দেবার নির্দেশ দিয়ে লেখেন : "His Lordship in Council has accordingly determined that the lands comprehended on the local division denominated Gird Maraghat with the exception of the 28 challas referred to in your letter, the Raja of Cooch Behar's title to which has not been disputed, shall be restored to the Deb Rajah." বড়লাটের নির্দেশ অনুসারে ভুটান ও কোচবিহার রাজ্যের সীমানা নতুন করে নির্দিষ্ট হল এবং চামরাঘাট (মরাঘাট) সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটল। সুতরাং ডিগবির অপবাদের মূলে তাঁর প্রিয়পাত্র রামমোহনের 'কারসাজী' 'নটঘটী'-র ব্যাপার কিছু বিচিত্র নয়।

এদিকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে রংপুরের কালেক্টর ডেভিড স্কট তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী কৃষ্ণকান্ত বহুকে প্রয়োজনীয় পাসপোর্টসহ ভুটান দরবারে পাঠান। কৃষ্ণকান্ত বহু ভুটানের শীতকালীন রাজধানী পুনাখের পথে গোয়ালপাড়া জেলার সন্নিহিত গিরি সঙ্কট চিরাঙদুয়ারে পৌঁছান। ৩০শেএর ১৩ তারিখে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লেখা পত্রে দেবরাজ লিখছেন : "তোমার উকিল চিরাঙদুয়ারে পহুছিয়াছে ইথানে মানুষ হইয়া তাহাকে আনিতে যাহারদী পঠাইয়াছী রাস্তাপথে তুমারি করিয়া আমার এথানে আনিবেক তিনি পহুছিলে তাঁহার বেহরা পশ্চাৎ সিবীর গত্তরাত আপনের মঙ্গলাদী লিখিয়া সান্ত করাইবেন।"

অথচ কৃষ্ণকান্ত বহুকে ভুটানে প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য চিরাঙ দুয়ারে দু'মাসেরও অধিককাল আটকে থাকতে হয়েছে। সে কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে রংপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ডেভিড স্কট ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৬সেপ্টেম্বর এক পত্রে লিখেছেন : "The Deb Rajah mentions in his letter that he had sent passports and people to conduct *The vakeel* deputed by me to the Capital, but I have not heard of *his* arrival there, and from the very great delay which *he* has experienced in obtaining admission into Bhootan (for although furnished regular passports before he left his place he has been detained two months at the cheeran pass), there seems to be reason to believe that his progress has been intentionally obstructed." তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণকান্তকে যে ইচ্ছে করেই চিরাঙদুয়ারে আটকে রাখা হয়েছে এমন অভিযোগ উপস্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঐ বৎসরের ২১আশ্বিন তারিখে লেখা দেবরাজের পত্রে জানা গেল যে তিনি (দেবরাজ) রামমোহন রায় এবং কৃষ্ণকান্ত বসু এই দু'জন উকিলের মাধ্যমে প্রেরিত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্রাদি পেয়েছেন। দেবরাজ লিখেছেন : "Is delighted to receive through the addressee's Vakils Rammohan Ray and Krishnakanta Basu a letter accompanying a present of 5 coats and a telescope……The aforesaid represented that one of them had been ordered to remain with the Raja and the other was to return to Rangpur after informing himself of all the affairs of this place. Rammohan Ray is therefore being sent back and he will verbally inform the addressee for a local enquiry (regarding his possession) then Rammohan Ray may be sent back to him with a clear decision in the matter. Ramprashad Bose (Das ?) will represent further particulars." (Received 12 Nov. 1815) [English Synopsis]

এখানে লক্ষণীয় ১৩ ভাদ্রের পত্রে দেবরাজ চেরাঙদুয়ারে স্কটের প্রেরিত একজন উকিলের উপস্থিতি এবং সেই উকিলকে তাঁর সনদপত্রসহ নিয়ে আসার কথাই লিখেছেন অথচ ২১আশ্বিন তারিখে লেখা পত্রে তিনি দুজন উকিলের নাম করেছেন এবং প্রথম নামটি রামমোহনের আর দ্বিতীয় নামটি কৃষ্ণকান্তের। ২১ আশ্বিন তারিখের পত্রে দেবরাজ বারবার যেভাবে রামমোহনের নাম উল্লেখ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে রামমোহনও পুনাখ দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী সূত্রে কিংবা স্কটের কোন পত্রে দু'জন উকিলের কথা বা রামমোহন যে স্কট-এর নিযুক্ত উকিল হয়ে ভুটান দরবারে গিয়েছিলেন এমন তথ্য অনুপস্থিত। বরং স্কটের ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখাপত্রে একজন উকিলের কথাই বলা হয়েছে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের Capt. R. B. Pemberton এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে Sri Ashley Eden তাঁদের ভুটান দৌত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন কালে শুধুমাত্র কৃষ্ণকান্তেরই নামোল্লেখ করেছেন। রামমোহনের নাম উল্লেখ করেন নি।

উপরিউক্ত তথ্যাদি ও তৎসংক্রান্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ-সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে করা যায় যে রামমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ভুটান দৌত্যে সরকারী প্রতিনিধি ছিলেন না। সরকারী হিসাবে একজন উকিল ভুটানে গিয়েছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণকান্ত বসু। রামমোহন তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাত্র।

ভুটানের দেবরাজা ও তাহার কর্মচারীদের পত্রে প্রকাশ ভুটান ও কুচবিহার সীমানা সংক্রান্ত পূর্ববিধিব্যবস্থার সঙ্গে রামমোহন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের একটি পত্রে রামমোহন যে এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তার উল্লেখ রয়েছে। এই পত্রে বলা হয়েছে : "আমার তরফ মরাঘাটের জমীন একখানা আছিল তাহা পলিদ সাহেব আসিবার কালে একরার সিমানা সরহদ্দ বিসত্র কাজীরা হস্তা এথানকার উবিল লোশ পেণা ভুটা মুডাকে কলীথাতা সেখানে পাঠাইয়া জরথাকা নদী বৈতে সিমহরহদ্দ হস্তাছে দর্শপ্রচান আছে যে সকল রঙপুরের শ্রীযুক্ত কৰ্কেটের সাহেব শ্রীযুক্ত রামমোহন রেওান সাক্ষাতে জানা আছে।" এহেন ওয়াকিবহাল ব্যক্তি, ডিগবির দেওয়ান রামমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকান্ত বহুর সঙ্গে ভুটানে গেলেন সরকারী প্রতিনিধির মর্যাদা ছাড়াই। কেন এবং কিভাবে তিনি ভুটান দরবারে উপস্থিত হলেন তা রহস্যাবৃত। প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণকান্ত বহুকে চেরাঙদুয়ারে কেন দু'মাসের অধিককাল আটকে থাকতে হয়েছিল তার কারণ হয়ত উক্ত রহস্যের সঙ্গে যুক্ত। ভুটানের দেবরাজার পত্রে জানা যায় রামমোহন ও কৃষ্ণকান্তের কথাসূত্রে রংপুরের কালেক্টর স্কট সাহেবকে সমস্ত বিষয় জানানোর জন্য দেবরাজ রামমোহনকে রংপুরে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কবে ফিরেছিলেন তা জানা নেই। তাঁর যে আবার ভুটানে যাবার প্রয়োজন হতে পারে সে ইঙ্গিতও দেবরাজার পত্রে আছে। কিন্তু তিনি আবার ভুটানে গিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। এককথায় তাঁর ভুটান গমন, ভুটান গমনের উদ্দেশ্য ও ভুটানে অবস্থিতিকাল—এ সবই রহস্যাবৃত।

সবাই অসৎ নন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আমার ছেলে এসে গেছে। সম্ভবত দুফটিও। সে মোবিলের ওপর গজরাতেগজরাতে নামায় জন্য দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, এতোক্ষণ যারা তাকে এক্যাঁই দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তিরস্কারে জর্জরিত করেছিলেন, কী অদ্ভুত তৎপরতায় তাঁরাই তাকে নামতে সাহায্য করলেন। তার কাঁধের ওপর হাসি ও খুশির বৃষ্টি আদরের মত ঝরে পড়ল।

ট্রাম বাসে পারতপক্ষে টিকিট ফাঁকি দেই না। সুযোগ পেলে সব আগে ওটি কেনে নেওয়ার নিকা (এইসব 'মোবাইল সংক্ষেপে 'মোবিল ধরার' ঢের আগেই) আমাদের ছেলেবেলাতেই পেয়ে গেছলাম। কারণ সেটা ছিল স্বাধীন ভারত গঠনের যুগ। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রদের ত্যাগাদর্শের মহিমময় সময়কাল। কিন্তু এখন 'মোবিল ধরা'র প্রসঙ্গ সবেও টিকিট করার সুযোগ পেলাম না। কণ্ডক্টর সাহেব ডাইভারের পেছন সারির সিটের কাছে আটকবন্দী। টিকিট কাটতে হলে এস্প্লানেড অবধি যেতে হয় মানে ফের ফিরতে হবে আরও একদফা টিকিট কেটে ফিরতি ট্রামে। কিন্তু অফিস ফেরৎ 'আপ' কারে টিকিট পেতে হলে হয়ত বা আমাকে ফের পার্ক সার্কাস, শিয়ালদহ অথবা গ্রে ষ্ট্রীট পর্যন্ত যেতে হবে (যে ট্রামে উঠতে পারি)। এহেন অবস্থায় 'মোবিল ধরার ভীতি সবেও আমাকে নামতেই হ'ল, সঙ্গে আরো ফৈকেজনকেও। অপরাধ করার বাসনা ছিল না। তবু পাকেচক্রে দেনদার হয়ে রইলাম।

খুশের ভাণ করে টিকিট ফাঁকির ফিরক যাঁরা নিয়ে আসছেন, মোবিল ভীতি তাঁদের কতদূর সচেতন করেছে জানিনা, কিন্তু টিকিট দিতে ইচ্ছুক অথচ অপারক যাত্রীও যে ওগুতিতে কম নেই একথা আমি জোর করেই বলতে পারি। কেবল নিজের দিকে তাকিয়ে নয়, বহু ভদ্র যাত্রী-দের সদিচ্ছায় সন্দেহের কোন কারণ নেই, তা জেনে বুঝেই একথা বলা যায়। প্রথাগ, খল্প ভিড়ে চেকিং করা। প্রথাগ, ঘিনি ও ডিলাক্স বাসের ভ্রমণকারীরা। প্রথাগ, প্রচণ্ড ভিড়েও যে ভদ্র যাত্রীরা সাহসের অভ্র দেখেও ফ্লাসে ভ্রমণ করেন। ধরে নিতে হবে, টকিট ফাঁকির অভিপ্রায় এঁদের নেই।

তবু ফাঁকি থতাবে, বহু ক্ষেত্রে অভাবেও আছে বৈ কি। সমাজের এই স্বভাব নিয়মভঙ্গকারীদের অপরাধ আপাদর জনসাধারণকেই বইতে হয়। একের অপরাধে একশ নিরপরাধ কাঠগড়ায় ওঠেন। প্রশ্ন যদি হয়, টিকিট কাটা যাত্রীদের কর্তব্য, তবে টিকিট যাতে কাটা যায় তারও ব্যবস্থা করার কর্তব্য অবশ্যেরই যোগ্য নয়। প্রাইভেট বাসের দুটো করে দরজা, দুটো করে কণ্ডাক্টর। পরিসর অল্প। ভিড়ের মধ্যেও দুজনে আধা আধিভাবে টিকিট সংগ্রহ করে নিতে পারে। লম্বা ট্রামে মাত্র একজন কণ্ডাক্টর কেন? টিকিট ফাঁকির অভ্র যদি বেশি হয়, তবে দুজন কণ্ডাক্টর কামরা পিছু রাখা হলে এবং সংগ্রহ ঘথাযথ হলে তো লোকসানের কথা নয়। বরং আরও একটি পরিবারের অন্ন সংস্থান হতে পারে বাড়তি কণ্ডাক্টর নিয়োগের ফলে। ষ্টেট বাসে দুজন করে কণ্ডাক্টর থাকতে পারেন। একজন দোরে অপর জন অন্দরে। দোরে যিনি থাকবেন যাত্রী নামার সময় তিনি টিকিট দেখে নেবেন। কাটা সত্ত্বর নাম্বলে টিকিট দেখেন। যাত্রীরাও নামবার সময় টিকিট অথবা পয়সা হাতে নামবেন। নামবার সময় টিকিট অথবা পয়সা হাতে নামবেন। নামবার সময় টিকিট অথবা পয়সা হাতে নামবেন। ভেবে দেখুন, এর ফলে মোবাইল চেকিংএর হুজ্জোত, ইচ্ছুক যাত্রীর টিকিট নাকরতে পারার জন্য মন খচখচানি এবং ফাঁকিবাজের ফিকিরবাজি যেমন বন্ধ হতে পারে তেমনিই দেশে বহু বেকার ছেলে রুজি রোজগারের পথ খুঁজে পায়।

স্বাধীন দেশের নাগরিক মাত্রকেই আমরা সৎ হতে সাহায্য করব, তাঁদের কপালে অসততার চিহ্ন এঁকে দেশের মুখে কালি ছিটোবো কেন?

Regd. No. WB/CC-3

PRICE 40 Paise

মৃণাল সেনের 'মৃগয়া'

ভানুসিংহ

'মৃগয়া' ছবিটিতে সম্ভাবনা ছিল। সম্ভাবনা ছিল বিক্ষেভ সংগঠনের ও জন জাগরণের। সম্ভাবনা ছিল নিপীড়ন ও শোষণের প্রতিরোধে ব্যাপক বিস্ফোরণের। কিন্তু সে-সম্ভাবনার মীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। বিনষ্ট করা হয়েছে গণ সমস্যার অগ্নিগর্ভ কেন্দ্র থেকে বক্তব্যকে ব্যক্তিক সমস্যার সীমিত বিচ্ছিন্নতায় বিচ্যুত ক'রে। দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক জুলুমে আদিম ভাঁড় সাঁওতাল অধিবাসীদের যে চাপা ক্রোধ, তা চাপা দেওয়া হয়েছে স্ত্রী হরণে স্বামীর বদলা নেওয়ার মধ্যে। দর্শকের দৃষ্টি স'রে গেছে অত্যাচারিত অধিবাসীদের প্রসংগ থেকে, আটকে গেছে 'কিডন্যাপ-থ্রিলিং'-এর মধ্যে। পরে অবশ্য ব্যাপারটিতে মহিমা আরোপ করার চেষ্টা আছে। কিন্তু ঘটনাটি মূল কেন্দ্রবিন্দু চ্যুত হওয়ায় পরবর্তী দৃশ্যগুলি বাহ্যিক আবেদন সঞ্চারে ব্যর্থই হয়েছে।

শ্যাম বেনেগালকৃত হিন্দি ছবি 'নিশান্ত'-এও কিডন্যাপ প্রসংগ আছে। কিন্তু এই কিডন্যাপ ব্যাপারটি ছবিটিতে মুখপাত হিসেবেই থেকে যায়। পরবর্তী দৃশ্য পর্যায়ে সামন্ত শ্রেণীয় পরিমণ্ডলে নির্যাতীত ও শোষিত কৃষিজীবিদের মর্ম ব্যথা ও রুদ্ধ ক্ষোভ ও অবশেষে সংগঠিত প্রতিরোধে ও ব্যাপক বিস্ফোরে এবং ফিউডাল লর্ডদের নিধনপর্ব যে বাস্তবায় ও আবেগময়তায় ফুটে ওঠে, তাতে সেখানে ঐ কিডন্যাপ প্রসংগটি গৌণ হয়ে পড়ে। যদিও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়াছেন সেই কিডন্যাপড স্ত্রীর স্বামী এবং তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাই ছিল এই নেতৃত্ব দানের মূলে, তবুও ছবিটিতে অত্যাচারিত জনগণের অবরুদ্ধ ক্ষোভ ও ঘৃণাকে সাংগঠনিক উপায়ে সোচ্চার ক'রে যে অভিব্যঞ্জনার বিস্ফোরের অগ্নুৎপাত সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সংগ্রামী বলিষ্ঠতারই নিদর্শন, সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃণাল সেনের আলোচ্য হিন্দি ছবিটিতে সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় কোথায়? এখানেও তো সেই ফিউডাল প্রথার ক্রিয়াকাণ্ড দেখি। কিন্তু সেই সংগ্রামী চেতনার খাদের তো দেখে না।

হ্যাঁ, ছবির শেষপর্বে একটা প্রশ্ন রাখা হয়েছে। একটা খারাপ লোক একটা ভালো লোককে হত্যা ক'রে ইনাম পায়, আর অমন শয়তানকে হত্যা ক'রে একজন ফাঁসির হুকুম পায়, এ কেমন বিচার?—কিন্তুটা 'ম'সিয়ে ভেহু' ছবির এই চটকদারি প্রশ্নটি তোলা হলেও মনেতে এ-প্রশ্নটাও জেগে ওঠে, স্ত্রী হরণ না ঘটলে নায়ক স্বামীটি শয়তানকে কি হত্যা করত? ছবিতে দেখি, সাঁওতাল যুবক ঘিষ্ণুয়া কিন্তু হ'য়ে ওঠে অত্যাচারী মহাজন গোবিন্দ সর্দারের ওপর তখনই, যখন তার স্ত্রী ডুংরি অপহৃতা হয়। তার আগে মহাজনের খাজনা আদায়ের জুলুম দৃশ্যে সে নীরব দর্শক। অতএব প্রসংগটি ব্যক্তিগত ভাবাবেগে মিয়মিত্র, কোন সামাজিক গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু নয়—একথা বলাটা কি তবে অযৌক্তিক হবে?

ওগবতীচরণ পানিগ্রাহীর মূল ওড়িয়া কাহিনী অনবদ্যে নির্মিত 'মৃগয়া' ছবিটির নামকরণ যথেষ্ট অর্থবহ। এখানে মৃগয়া তথা ফিউডালিজমের শিকার থেকে খাওয়া সর্বহারার দল। ছবির শুরুতেই বন্য জন্তুর কবল থেকে শস্য ক্ষেত্র রক্ষার চেষ্টায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের প্রচণ্ড টিন পেটানোর শব্দ-ব্যঞ্জনা প্রতিরোধের অর্থপূর্ণ আবহ রচনা করে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতিভূ মহাজন গোবিন্দ সর্দারের পাল্কি চ'ড়ে গ্রামে প্রবেশ—সেও যেন মৃগয়ার রাজকীয় পটভূমি তৈরি ক'রে দেয়। বন্ধুজন্তুর দল শস্য হানি করলেও খাজনা মকুবের কোন আবেদনই নির্দয় মহাজনের কর্ণ-কুহরকুলের ওপর পীড়ন ইত্যাদি দৃশ্য পর্যায়ে গণবিস্ফোরণের ব্যঞ্জিত ইংগিতটুকুও পাওয়া যায় আগের দৃশ্যের ক্রমঘনে টিন পেটানোর প্রকট আওয়াজ তোপার পাশ্চর্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আগেই বলেছি, সম্ভাবনা ফোটে ছিল উত্তাল জনজাগরণের, তা ফুটতেই মিলিয়ে গায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবালুতায় ব্যক্তি হত্যার মধ্যে।

বিগ্রহী রাজন্রে হী শলপু চরিত্রটি ছবিতে প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। সে যে শাসককুলের পক্ষে আতঙ্ক, তা শুধু সংলাপেই উচ্চারিত, কোন অ্যাকশনে প্রতিফলিত নয়। কিছুক্ষণের জন্য এই চরিত্রটি পর্দায় এসেছে, আবার চলেও গেছে। অবশ্য কাহিনীর একটা উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধ হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক ডোরা তাকে সরাসরি গুলি ক'রে মেরে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে ইনাম পেয়েছে। এ কাণ্ডটি না ঘটালে নায়ক ঘিষ্ণুয়ার মুখে শেষের ঐ উক্তির প্রশ্নটি যে তোলা যেত না। কিন্তু দর্শক মনে শলপুর হত্যা দৃশ্যটি কিছুমাত্র রেখাপাত করে না। এর কারণ চরিত্রটি স্বচ্ছমিতেই প্রতিষ্ঠিত নয়।

মৃণাল সেন এই ছবিটিতে direct action গুলি নেগথ্যে রেখে শুধু নেগুলির 'effect পর্দায় তুলে ধ'রে যে বিশেষ রীতি অবলম্বন করেছেন, তাতে আর যাই হোক, দর্শক মনে আবেদন সঞ্চারে বাধাই সৃষ্টি হয়েছে। বন্ধুজন্তুর দল শস্য নষ্ট করছে—পর্দায় সেটা দেখানো হয় নি। কিন্তু জানোয়ার তাড়ানোর টিন পেটানো শোনানো হয়েছে। শলপু চরিত্রটির back ground অদৃশ্য থেকেছে। কিডন্যাপ ও মহাজন হত্যার দৃশ্যটিও পর্দার আড়ালে রাখা হয়েছে। ফলে ছবিতে নাট্যরস ক্ষুণ্ণই হয়েছে। এগুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য হলে অতি নাটকীয়তা প্রশ্রয় পেত—এযুক্তি কিন্তু অচল। ছবি দেখতে বসে ঘটনার 'ভিজুয়ালাইজেসন' যদি না দেখি, তবে চিত্রব্যাহিত রস আস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় বৈ কি। আর দেখা-রসাস্বাদন সম্ভব হয় economy of Shots তথা পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয়টুকু থাকলেই। সব সময় কল্পনার বা ধারণার অথবা প্রতীকীময়তার রসগ্রাহী রূপ ফুটে ওঠে না, মনে রাখতে হবে।

ডিভিশনাল কমিসনার সাহেব মস্ত শিকারী বলেই প্রীতি ও সহাভূতির চোখে দেখেন সাহসী শিকারী তরুণ ঘিষ্ণুয়াকে। ঘিষ্ণুয়াও বড়রাজাবাবুর সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ। কিন্তু শয়তান মহাজন গোবিন্দ সর্দারকে হত্যার অপরাধে যখন সে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির, তখন সেই বড় রাজাবাবুর স্বল্প তার চোখে ধরা পড়ে যায়। বড় রাজাবাবু তার ফাঁসির হুকুমের নীরব সায় দেন। ঘিষ্ণুয়া বুঝতে পারে, মহাজন গোবিন্দ সর্দার আর বড় রাজাবাবু মধ্যে কোন তফাওই নেই। একই শোষণতন্ত্রের দুটি যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এই উপলব্ধি তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মধ্য থেকেই এসেছে, কোন সামাজিক সমাজ-চেতনা থেকে আসেনি—এটা লক্ষ্য করতে হবে। যদিও মহাজন হত্যার পরই বাহবারাব সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে—বড় রাজাবাবু, সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরে এনেছি, তবুও Cause of action ভিন্নতর হওয়ায় গোটা ব্যাপারটা বাঞ্ছিত আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। এমন কি শেষ দৃশ্যে ঘিষ্ণুয়ার ফাঁসির উদ্যোগের দূরে পার্বত্য পরিবেশে সমবেত গ্রামবাসীর সূর্যের উদ্দেশে হাত তুলে ঐক্যবদ্ধ উপাসনাও কোন 'ভাইমেমশন' সৃষ্টি করতে পারেনি, যদিও বিচ্ছিন্নভাবে দৃশ্যটি চমৎকারিত্বের দাবী করতে পারে। আরও একটি দৃশ্য অপূর্ণ লাগে যখন সমবেত গ্রামবাসী বিশ্বাসঘাতা ডোরাকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে 'ও ঝুটে বোল্তা' বলছে একে একে ও পরে সমস্বরে, তখন ডোরা সকলের তর্জনী শাসনে যেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে। দৃশ্য গ্রহণ সত্ত্বেই অসামাজ্য। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, হিংস্র সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে এমন একজন বিশ্বাসঘাতক, সরকার বাহাদুরের গুপ্তচর প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে কেমন ক'রে? প্রশ্ন আরও থেকে যায়—সাঁওতাল বিদ্রোহের পর যে এলাকা বৃটিশ রাজত্বে বিতীয়িকা সৃষ্টি করেছিল, কোন সরকারী আইন সেখানে বলবৎ করা ছিল না, সেখানে অমন রাজার চন্ডে মহাজনের প্রবেশ এবং খাজনা আদায়ের জুলুম খাটত কিনা, অমন ক'রে এক সাঁওতালকে ফাঁসির দড়িতে লট্‌কানো যেত কিনা ইত্যাদি। ছবিতে যে সময়ের ঘটনা সেটা তো ইংরাজ রাজত্বকেই সূচীত করে। ফাঁসির মঞ্চে আবার ন্যাপোলিস হুগুন্ড ক্রিয়াকাণ্ড—বিচারের নামে প্রহসন বুঝি ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল কি? ঘিষ্ণুয়ার ফাঁসি হয়ে গেল, কিন্তু মনে কোন দাগ কেলল না। তারপর সূর্য-উপাসনা। অবশেষে ছবির পর্দায় জেগে ওঠে কয়েকটি নির্দেশনামা বাণী—শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর আবেদন—ইংরাজীতে Stand up...ইত্যাদি। আশ্চর্য, গোটা ছবি দেখানোর পরও লিখে জানাতে হয়—দর্শকবৃন্দ, তোমরা সব শ্রদ্ধা জানাও। হয়তো চলচ্চিত্রকার বুঝেছিলেন, ছবিটি আদ্যোপান্ত দেখার পরও কোন দর্শকই সশ্রদ্ধ হয়ে উঠবেন না।

'ভুবন সোম' ছবি থেকেই মৃণাল সেন এদেশে বিশেষ কৃতী পরিচালকের মর্যাদা পেয়ে আসছেন। তাঁর রাজনৈতিক ছবিগুলি ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। তাঁর ফিল্ম টেক্‌নিক এক বিশিষ্ট মর্যাদারই পরিচায়ক। তাঁর ক্রোধ, অস্থিরতা, প্রথাভঙ্গের দুঃসাহসীপনা, বামপন্থী দৃষ্টিভংগী সব কিছু মিলেই তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু 'মৃগয়া'-র সুর ও চড় ভিন্ন। এখানে তাঁর সেই ক্রোধ বা অস্থিরতা নেই, নেই কোন সচ্চিত দৃষ্টিকোণের পরিচয়। তাই সব কিছু যেন গোলমেলে লাগে। বিশ্বয় বা আক্ষেপ এখানেই।

চীনের সাম্প্রতিক ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চীনের যে পার্টি আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃভূমিকা পালন করে এসেছে আজ সে যদি নিজের পার্টির অভ্যন্তরে সংশোধনবাদ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে উদ্যত হয়, তাহলে সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদের হাত দুর্বল হবে, না শক্তিশালী হবে?

যে মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদীদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে তার পুরোধা "শক্তিকে আঘাত করলে কারা উল্লসিত হবে?

ব্যক্তি বিশেষের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। দীর্ঘ সংগ্রামে পরীক্ষিত ব্যক্তিরও পদস্খলন ঘটে। কিন্তু এটা ব্যক্তির প্রশ্ন নয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন, সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ—এই দুটি মত ও পথের দ্বন্দ্ব।

আজ কোন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব নেই। নেই কোন অবিসংবাদী নেতা। আছে শুধু মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন ও মাও সে তুংয়ের অমর রচনাবলী। দুনিয়ার কম্যুনিষ্টদের কাছে এই সব রচনাই পথ নির্দেশক। অন্ধ বিশ্বাসের যুগ বিগত। যে পার্টিই হোক্, যতবড় পার্টিই হোক, সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রবক্তাদের নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হলে সমালোচনার মুখে দাঁড়াতে হবেই।

একদা সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি সোভিয়েতের কম্যুনিষ্ট পার্টি বিচ্যুত হয়ে নিষ্কৃতি পায়নি। আজ বা কাল চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিও যদি বিপথগামী হয়—ক্ষমা নেই।

ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। চীনের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সিঁদুরে মেঘের রং ধারণ করেছে। কেউ কেউ ভয় পেলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে আশার কথা, মাও সে তুংয়ের শেষ বাণী—"The Revolution knows no bounds."

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৬শে নভেম্বর '৭৬ ॥ ৪০ পঃ

পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক পরিবর্ত্তনে অনিশ্চয়তা

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতিতে ও প্রশাসনে পরিবর্তন নিয়ে জল্পনা কল্পনা, সংবাদ প্রকাশ, জনরব প্রভৃতি চলছে শারদীয় পূজার আগে থেকে। দিল্লীতে মফার মফার আলোচনা, রাজ্যের কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীদের ঘন ঘন দিল্লী যাতায়াত, প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ব্যক্তিত্ব-খ্যাত শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠকের খবর মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। কখনও স্পষ্ট ইঙ্গিতে, কখনও বা পরিষ্কার ভাষায় লেখা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক পরিবর্তন আসন্ন। বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক রিংস অক্টোবরের গোড়ার দিকেই লিখে দিয়েছিল যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পদত্যাগ করছেন আর তাঁর জায়গায় আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়। এ খবরে কলকাতার একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু এদের এই উল্লাস বর্তমানে থমকে গেছে। কারণ পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

পৌষাটিতে এই ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এড়িয়ে গেছেন এটা পরিষ্কার। অতএব আবার নতুন করে আলোচনা হবে দিল্লীতে। মঙ্গলবার দৈনিক বসুমতী যে খবর দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতাদের একাংশে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে গোচ্চার। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে নেতৃত্ব বদলে যত বিলম্ব ঘটছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্যমতে তত চিড় ধরছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছেন গত দুমাসের মধ্যে পরিবর্তন না হওয়ার ফলে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের সমর্থকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

দর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে যে, রাজ্যের শিল্পপতিরা শ্রীরায়কে অপসারণের পক্ষপাতী নন। তাঁদের বক্তব্য শ্রীরায় পশ্চিম বঙ্গে "জঙ্গলের রাজত্বের" অবসান ঘটিয়েছেন এবং বামপন্থীদের নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। শ্রীবি এম বিড়লা নাকি প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়ে এসেছেন যে, সি পি এদের লোকেরা সব বি পি এম টি ইউ সির মধ্যে ঢুকে আছে সিদ্ধার্থ রায়কে সরানো হলেই তারা গোলমাল শুরু করবে।

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি শিলিগুড়িতে চা নীলাম কেন্দ্র উদ্বোধন দিবসের ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি আসেন। পথে পথে ফেষ্টুন টাঙিয়ে তাঁকে স্বাগত করা হয়েছিল। ফেষ্টুনে ইংরাজীতে যা লেখা ছিল তার বাংলা হল: "স্বাগত, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়"। চা নীলামের সময় পরিষ্কার বোঝা যায় রাজ্যের শিল্পপতি নয়নে তাঁর জনপ্রিয়তা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (বাণিজ্য) এবং শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় যখন নীলাম ডাকলেন (ব্যাঙ্কি) তখন ২০০ কেজির এক পেটি চায়ের দাম ৩৫ হাজার টাকার বেশি কিছুতেই উঠল না শ্রীমুখোপাধ্যায় তিনি যে ব্যাঙ্কি মন্ত্রী একথা মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। সেই একই পরিমাণ চায়ের যখন নীলাম ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী তখন তার দাম চড়বড় করে ২ লক্ষ টাকায় উঠে গেল। নীলামের পুরো টাকাটা প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য তহবিলে নীলামে ডাকা হল। সেটির দাম লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেল।

এগুলো হল ঘটনা। এর তাৎপর্য যাই হক না কেন; রাজ্যে পরিবর্তন হবে কি হবে না সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ওপর। সে দিক থেকে আগামী দুই কি তিন সপ্তাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। তার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

রাজনৈতিক সঙ্কটের আবর্ত্তে সি পি আই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি. পি. আই. এসন রাজনৈতিক সংকটের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। বছর খানেকের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে, প্রৌঢ় পার্টিটির রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তাই দীর্ঘদিন জাতীয় আন্তর্জাতিক বহু প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বললেও নির্বাচন মিছিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে কিন্তু তারা স্বতন্ত্র সুরে কথা বলছে। আসলে, কুড়িদফা কর্মসূচী রূপায়ণের প্রশ্নে সি. পি. আই. যে ধরণের যুক্ত মর্চা নির্মাণের ঘোষণা দেখেছিল, বাস্তব অভিজ্ঞতা সেই ঘোষণা ভেঙে দিয়েছে। অন্ত প্রদেশ তো দূরের কথা, খাস কেরালাতে যেখানে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে সরকার চালাচ্ছে সেখানেও তারা কোণঠাসা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

এই কোণঠাসা অবস্থাটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরও বেশী চোখে পড়ছে। তাই, সি. পি. আই-এর নেতৃত্ব

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

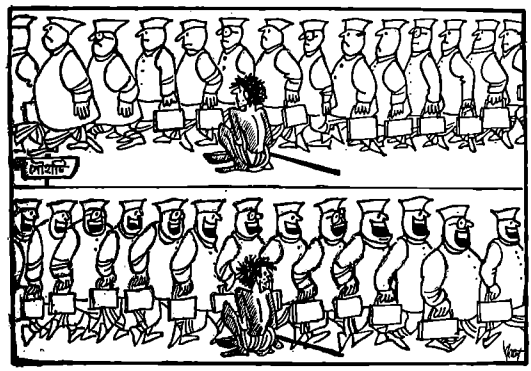

শোন মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

[কংগ্রেস ইকনমিক কাউন্সিলের মুখপত্র "সমসমাজ" মাসিক পত্রিকার গান্ধী স্মারক সংখ্যা থেকে এই লেখাটি উদ্ধৃত করা হল। এই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী সভাপতি শ্রীঅরুণকুমার মৈত্র এবং সংযুক্ত সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ দে।]

জীবনী লিখতে বসিনি আজ—উদবেগাবলীর সংকলন করছি মা। প্রশস্তিপাঠে তোমার মাহাত্ম্য কীর্তন, না, তাও করছি না। শুধু তোমার বিচারধারার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছি। জীবনকে তুমি যেমন ভাবে চিনেছো, সে দেখা, সে চেনার মধ্যে সত্য কতটুকু আছে তা যাচাই করতে চাই কালের কষ্টিপাথরে।

প্রতারণার অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পরীক্ষায় ভাল ফল না করেও অনেক ছাত্রের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার লোভ হয়। এর সুযোগ নেয় কিছু লোক। মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ঘুষ নিচ্ছে কোন কোন লোক এই অভিযোগ দর্পণের দপ্তরে আসছে। একজন ছাত্র তার বাবার জমি বিক্রি করা টাকা ঘুষ দিয়েছিল মেডিকেল কলেজে পড়ার লোভে। সে এখন চরম নৈরাশ্যের মধ্যে। একদল ছাত্র তদন্তের দাবী জানাচ্ছে। তাদের অভিযোগ মধ্য কলকাতার এক ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে চার বছর ধরে ঘোরাচ্ছে। এরা বউবাজার থানায় অভিযোগ লিখিয়েছে।

তুমি বলেছিলে—সত্যই জীবনের ধ্রুবক হবে স্বাধীন ভারতে। আমি দেখছি তুমি ভুল বলেছো—স্বাধীনভারতে কেউ সত্য কথা বলে না, সত্য কথা না বলাটাই জীবনের ধ্রুবক হয়েছে—বিশেষ করে যারা রাজ্য চালায় তাদের কাছে। তাই শ্রীরামপুরের শ্যামাচরণ কর্মকারকে আনা হয় গাড়িতে চড়িয়ে, চুঁচুড়ার বাবাচরণ বটব্যাল হ'য়ে নির্বাচনে দাঁড়াইজার প্রকাশ ঘটাতে।

আমাদের অভিধান থেকে শব্দসংগ্রহের নেশা আছে, ইংরেজী, বাংলা অনেক শব্দ সংগ্রহ করেছি আমরা—Grass root, Havenot, সমস্তরাল, নিরীহ জনগণ প্রভৃতি। গ্রামে গঞ্জে মাচা খাটিয়ে, চোঙ্গা টাঙিয়ে, আলো জ্বালিয়ে মন্ত্রীমশাইরা শব্দকল্পদ্রুমের পাঠ দিতে যান শিক্ষামন্ত্রক নিয়ে সময় পেলে, আবার বিত্তশালীদের অনুগ্রহ নিয়ে বেল ভিউ নার্সিং হোমে পাঁচশো টাকা বোর্ডের ঘরে থেকে চিকিৎসা করান, হেলসিস্কীতে অলিম্পিক খেলা দেখতে যান, মাঝে মাঝে ভেঁপু বাজিয়ে মোটর গাড়ির মিছিল ক'রে জনসেবা করতে বের হন খেয়াল হলে, জেলায় জেলায় আমরণবার বসে। মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী! তুমি বাতুল। তা' না হ'লে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেও মন্ত্রীদের কুঁড়েঘরে থাকতে বলে'ছলে! কুঁড়েঘরে কি এযুগ-কর্তব্যনার আছে? টেলিভিশন খাটানো যায়? যদি না যায়, তবে বুঝতে হবে সভ্যতার আলোর প্রবেশ সেখানে এখনও ঘটেনি। মিঃ গান্ধী, আমাদের পাঠ্য পুস্তক নতুন ক'রে, যুগোপযোগী ক'রে লেখা হচ্ছে শিক্ষাবিভাগ থেকে; বিদ্যাসাগরের প্রথম

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মতামত

চীনের মুক্তিযুদ্ধ ও সোভিয়েটের নীতি

গত ১১ই সেপ্টেম্বর দৈনিক বসুমতীতে "মাও'র চির-বিদায়" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ ও সুলিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত একটি বিষয়ে কিছু তথ্য ও মতামত বসুমতীতে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি পাঠাই কয়েকদিনের মধ্যেই। আজ অবধি ওটি প্রকাশিত হয়নি। ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, সম্পাদক মহাশয় চিঠিটি প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। অনুরোধ সত্ত্বেও ওটি আজ অবধি ফেরৎ পাই নি। বাস্তায় হাতে লেখা বলে নকল করা সম্ভব হয় নি। তবে প্রথমে যে খসড়াটি করেছিলাম তা আমার নিকট আছে। খসড়া এবং বসুমতীর নিকট প্রেরিত চিঠির তথ্যে বা মতবো কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য ছিল শুধু ভাষায়। সেই খসড়াটি আপনাকে পাঠাচ্ছি। প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করলে বাধিত হব।

নতুন দিল্লী, ৯ই নভেম্বর ১৯৭৬।

রণজিৎ রায় দৈনিক বসুমতী সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, আপনাদের পত্রিকায় ১১ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত "মাও'র চিরবিদায়" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অন্ত বক্তব্যর। একটি বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনারা লিখেছেন, "পরাজিত ও পর্যুদস্ত জাপানী সৈন্যরা চীনে যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল সেটাই মুক্তি ফৌজের ত্যাগ ও জীবনদানের পুরস্কার হিসাবে পাওয়া গেল এবং যুদ্ধ শেষে সেই অস্ত্র দিয়েই মাও সে-তুঙের গেরিলা বাহিনীরা চোরাগুপ্ত আঘাত হানলেন চিয়াং কাই শেকের উপর।"

প্রকৃত ঘটনা অন্যরূপ। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানের পরাজয়ের পর চীনে অবস্থিত জাপানী সামরিক বাহিনীর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের অতি নগণ্য একাংশ ছাড়া মাও সে-তুঙের গেরিলা বাহিনীর হাতে কিছুই পড়ে নি, প্রায় সবই তুলে দেওয়া হয়েছিল চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীর হাতে। এর জন্য যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। আমেরিকা যে চিয়াং কাই-শেককে সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করে চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব রুখবার প্রবল প্রচেষ্টা করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নেই। প্রশ্ন হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে।

ত্রিশের দশকে জাপান চীন থেকে মাঞ্চুরিয়া ছিনিয়ে নিয়ে মাঞ্চুকুও নামে একটি তাঁবেদার রাজ্য গঠন করেছিল। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী মাঞ্চুরিয়া। দীর্ঘস্থায়ী চীন-জাপান যুদ্ধের সময় এখানে জাপান যুদ্ধাস্ত্র যোগানের জন্য বহু বড় বড় শিল্প স্থাপন করে। চীনের অন্যান্য অঞ্চল গ্রাসের জন্য মাঞ্চুরিয়াকে বড় ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। কমিউনিষ্ট-বিরোধী চুক্তির অংশীদার হিসাবে জাপানের পরিকল্পনা ছিল এই ঘাঁটি থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করার। সে সুযোগ জাপানের মেলে নি।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় ১৯৪৫-এর আগষ্ট মাসে। ইতিপূর্বে, মে মাসে জার্মানীর আত্মসমর্পণ ঘটেছে। জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নকে এক মাস মাত্র যুদ্ধ করতে হয়েছিল মাঞ্চুরিয়ায়। সেখানে জাপানকে সম্পূর্ণ পদুদস্ত করতে সক্ষম হয় সোভিয়েট ফৌজ।

এর পূর্বে বহু বৎসর ব্যাপী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে মাও সে-তুঙের কমিউনিষ্ট বাহিনী জাপানী সৈন্যদের প্রধান শহর ও শিল্পাঞ্চল এবং বড় বড় সড়ক ও রেলপথেই আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রামীণ এলাকা প্রায় সমগ্র-ভাবেই কমিউনিষ্ট দখলে এসে গিয়েছিল। অন্তত মাঞ্চুরিয়ার চিয়াং কাই-শেকের ফৌজের জাপান বিরোধী কোন অবদান ছিল না। এই ফৌজের প্রধান কাজ ছিল কমিউনিষ্ট অগ্রগতি রোধ করা।

জাপান-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভের অব্যবহিত পরে ষ্ট্যালিন ও চিয়াং কাই-শেক একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির ফলে বহির্মঙ্গোলিয়া সোভিয়েটের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চুক্তির শর্ত ছিল, মাঞ্চুরিয়াকে চিয়াংএর অধিকারে দেওয়ার পরই কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন ওই অঞ্চল ত্যাগ করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার বিশ্বাসই ছিল না চিয়াংকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে মাও সে-তুঙের কমিউনিষ্ট বাহিনী ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে।

জাপানের পরাজয় সত্ত্বেও যখন কোন সন্দেহ আর রইল না, শুধু দিন গুনতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, তখন দূর প্রাচ্যে মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থার একটি আদেশ জারী করেন। আদেশটির মর্ম এই যে, মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী ফৌজ আত্মসমর্পণ করবে সোভিয়েট ফৌজের নিকট এবং চীনের অন্যত্র চিয়াংএর ফৌজের নিকট; "অস্ত্র কাহারও" নিকট জাপানীদের আত্মসমর্পণ নিবেদ করে দেওয়া হয়। এই "অস্ত্র কাহারা" যে মাও-এর কমিউনিষ্ট বাহিনী তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমেরিকা, বৃটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, এই তিন শক্তির যুক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ম্যাকআর্থার তাঁর আদেশ জারী করেন। সোভিয়েট ফৌজ যে চীনের কমিউনিষ্ট বাহিনীকে একেবারেই কোন অস্ত্র দেয় নি তা নয়, তবে বড় বড় অস্ত্রাগার যে সব স্থানে ছিল অস্ত্রশস্ত্র সমেত সে সব স্থানই তুলে দেয় চিয়াং ফৌজের হাতে।

মাও-এর ফৌজ এবং চীনের অবস্থা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাব ওই সময়ে কী ছিল? পরাজিত জার্মানীর পোটসডাম শহরে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স, এই মিত্র শক্তিদের সম্মেলন বসে ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে। সেখানে ষ্ট্যালিন জানিয়ে দেন যে, "লীয়ে চিয়াংএর সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার সম্বন্ধে নয়; ওখানে কমিউনিষ্ট বাহিনী নামে যা আছে তা আদপেই কমিউনিষ্ট নয়।"

চীনে গৃহযুদ্ধ চলুক তা সোভিয়েট ইউনিয়নও চায় নি, আমেরিকাও না। ওই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরামর্শ ছিল মাও যেন চিয়াংএর আতীয় সরকারে যোগ দেয়। মাও এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাবের সামান্য পরিচয় মেলে মস্কো থেকে প্রকাশিত নিউ টাইমস্ সাপ্তাহিকের ১৯৪৫-এর ১লা সেপ্টেম্বরের সংখ্যায়। পত্রিকাটিতে লেখা হয়, "বুর্জোয়িটাং ও কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বন্দ্বই যে অদ্যাবধি চীনের ক্রমোন্নতির অন্তরায় প্রধান বাধা হয়ে আছে সে কথা অজানা নয়। বিদেশে চীনের বহু সন্দেহজনক মদলাকাঙ্খী আছে যারা চীৎকার করছে চীনে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সন্দেহ নেই, গৃহযুদ্ধ চীনের সর্বনাশ ডেকে আনবে। দীর্ঘদিনের জাপানী দখলের ভয়াবহ পরিণতি থেকে উদ্ধারের নিমিত্ত চীনের প্রয়োজন শান্তি। শান্তির এত প্রয়োজন চীনের পূর্বে কখনও ছিল না।"

ষ্ট্যালিন আমলের কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের চীন-নীতির কথা ছেড়ে দিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রচার করত চিয়াংই চীনের নেতা এবং দেশের ঐক্যের প্রতীক। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চিয়াং সোভিয়েট থেকে বহু কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র পেয়েছে। [illegible] তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল চীনের কমিউনিষ্ট এলাকা পুনর্দখল এবং কমিউনিষ্ট বাহিনী নিশ্চিহ্ন করা। অন্যপক্ষে স্বয়ং চিয়াংও অভিযোগ করে নি যে মাও সোভিয়েট থেকে কোন অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রাপ্ত চিয়াংএর উপর মস্কোর ভরসা ছিল অসীম।

জাপান-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়ায় কালক্ষেপণ না করে যে কাজে ব্যাপৃত হয় তা অতীব আশ্চর্যজনক। মাঞ্চুরিয়ায় জাপান কর্তৃক সৃষ্ট কলকারখানা ইত্যাদির মালিকানা তো স্বাভাবিক-ভাবেই বর্তানোর কথা চীনের উপর, সোভিয়েটের উপর নয়। কিন্তু শিল্পে সমৃদ্ধশালী এই অঞ্চল থেকে সোভিয়েট ফৌজ বহু কলকারখানার যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন ও ওয়াগন ইত্যাদি সরাসরি চালান করে দেয় আপন দেশে—যুদ্ধে জেতা লুটের মাল হিসাবে পুরো একটি বৎসর ব্যাপী এই লুট চলে। অন্যরূপ কৃতিত্ব, কিন্তু অনেক বেশি বিপুল আকারে সোভিয়েট ইউনিয়ন দেখিয়েছে পূর্বজার্মানীতে। সোভিয়েট বিপ্লবের সময় লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্টদের একটি স্লোগান ছিল, "দেশ দখলও নয়, যুদ্ধে ক্ষতিপূরণও নয়" ("নো অ্যানেক্সেশনস, নো ইনডেমনিটিজ")। ওটা অবশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ শুরু করলে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয় বলে কমিউনিষ্টরা বলত। জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমাহীন ক্ষতি সাধন করে। যুদ্ধের শেষ দেড় বৎসরে সমগ্র জার্মানীরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। মিত্রশক্তিরা জার্মানী থেকে ক্ষতি পূরণ আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি পশ্চিম জার্মানী থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করত তবে বলবার হয়ত কিছু থাকতনা। কিন্তু মিত্রশক্তি-দের সিদ্ধান্ত মত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ক্ষতি পূরণ আদায় করার কথা ছিল পশ্চিম জার্মানী থেকে (তারা তা করেনি) এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব জার্মানী থেকে। যুদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব জার্মানীতে এবং সেখানে সে কমিউনিষ্টদের সহায়তায় শাসন শুরু করে হিটলারের নাৎসীবাদ-সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে একটি সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ-নিয়ে। ১৯৪৯-এর যে মাসে আমেরিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্স পশ্চিম জার্মানীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র স্থাপনে সহায়তা করে। ওই বৎসরের অক্টোবর মাসে পূর্ব বার্লিন সমেত পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েট সহায়তায় একটি সমাজবাদী রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্থাপনা হয়।

যুদ্ধাবসানের পর থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানী থেকে নানান পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া পূর্ব জার্মানী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশের পরও চলতে থাকে। অর্থাৎ যে জার্মান কমিউনিষ্টরা হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের হিটলারের উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য করে তাঁদেরই দ্বারা পরিচালিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঘাড় ভেঙেছে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন? এই ক্ষতিপূরণ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৬১ সালে। কিন্তু ১৯৫৩ সালে পূর্ব বার্লিন এবং পূর্ব জার্মানীর অন্যান্য কয়েকটি স্থানে সোভিয়েট বিরোধী বিক্ষোভ ফেটে পড়ায় ১৯৫৪-এর ১লা জানুয়ারী থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্ষতিপূরণের দাবী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কত ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছিল ইতিমধ্যে? আমি পশ্চিমী দেশগুলি যে হিসাব দিয়েছে তা উল্লেখ করতে চাই না। ষ্ট্যালিনের একটি চিঠিতে যে তথ্য মেলে তাই যথেষ্ট। যে অর্থের হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে তা ১৯৩৫ সালের মূল্যের হিসাবে, মুদ্রাস্ফীতি মূল্য তার প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি ছিল।

জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের প্রধান মন্ত্রী গ্রোটেভল

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

বাংলার নবজাগৃতির স্বরূপ ও রবীন্দ্র-মানস (২)

কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

কিউন্নাল সমাজে সাধারণ নারীর মূল্য ছিল ভোগ্যবস্তু হিসাবে। সমাজের উচ্চতর রাজা অথবা সামন্ত প্রভুর স্ত্রীর মর্যাদা অবশ্য ছিল তাঁরা প্রভুর অমনীরূপে। ধর্ম্যশূরীয় কবিরা য়ুরোপে রোমান অফ দি রোজ শ্রেণীর কাব্যে এই প্রভুস্থানীয় নারীর প্রতি ভক্তি যেমানো প্রণয়ের রূপক আখ্যান সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নারীর স্বতন্ত্র মূল্য কল্পনাই বিরল থেকেছে। য়ুরোপের রেনেশাঁস ব্যক্তি চেতনার জয় ঘোষণা করায় পথে নারীর মহিমাও উপলব্ধি করল।

বাংলা দেশে নারী প্রগতি আন্দোলনের সূত্রপাত রামমোহনের সতীদাহ নিরোধ আন্দোলনে। ভারতের মানুষের উন্নতির "মহান" ব্রতধারী ইংরেজ শাসকের আগেই শ্রীরামপুরে মিশনারীরা, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজরা এবং চন্দননগরে ফরাসীরা এই কুপ্রথা দূর করতে এগিয়ে এসেছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব এ ব্যাপারে প্রথম আওয়াজ তুলে পরি-সংখ্যান সংগ্রহ করলেন। এরপর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং পরে অন্যরা নিষ্ঠা ও পৌরুষ নিয়ে রামমোহন এগিয়ে এলেন বিতর্ক পুস্তিকা প্রকাশ এবং নানা কর্মপ্রয়াসে। ১৮২৯ এর ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ আইনত শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন বেন্টিঙ্ক।

এরপরও দুই বিধবাদের সাহায্য, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন চলল। জাতি প্রথার পশ্চাদপদ্যতা, জাতিভেদ মেয়েদের বিয়ের অন্তরায় বলে শৈশবতে বিয়ের প্রতি পক্ষপাত—এসব রামমোহনের ধারণাগুলো অবশ্য বাস্তবায়িত করার কোন চেষ্টা দেখা যায়নি। কিন্তু নারী প্রগতির পথে প্রথম আলো তিনি জেলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন রামমোহনের প্রয়াসেরই বিকাশ ও পরিণতি। ১৮৩৪ সালে "সমাচার দর্পণ" এ বিধবাদের জীবনযন্ত্রণা বিষয়ে পত্র বের হয়। পরে "জ্ঞানান্বেষণ" "হরকরা" এবং কিছু ইংরেজী পত্রপত্রিকাতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে তখনকার নিরিখে প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম "তত্ত্ববোধিনী সভা" এবং "ধর্মসভা" এ বিষয়ে নীরব ছিল। প্রচণ্ড আলোড়নের পর ১৮৫৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হল। কিন্তু সমাজ জীবনে ব্যাপকভাবে এই আইনের প্রয়োগ হয়নি। বহু বিবাহ বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি দূর করার যে সব আন্দোলন হয়েছে সমাজ জীবনে তা বড় একটা দাগ কাটেনি। এ সব আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার কারণ নারী প্রগতির আন্দোলন এ সময় করেছেন কেবল পুরুষরাই, নারীর ভূমিকা সেখানে নেই বললেই হয়। এর মূল কারণ আবার অর্থনৈতিক জীবনে নারীর স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ তখন চিন্তার বাইরে আর নারীশিক্ষা সবে শুরু হবার মুখে। ইংরেজ বণিকতন্ত্রের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা মহানগর কলকাতার তাই নারী প্রগতি ও মুক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধ পরিবেশ রেখা দিল বটে, কিন্তু ঔপনিবেশিক নিগড়ে বাঁধা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি হতে পারেনি বলে নারী প্রগতি পিছিয়ে থাকল রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত যুগন্ধর প্রতিভাধর উদ্যোগী নেতা থাকা সত্ত্বেও।

নারী প্রগতির ভূমিকা রচনা করে নারী শিক্ষা। প্রাচীন ভারতের গৌরবযুগে নারী শিক্ষা আদৃত ছিল। কিন্তু কিউন্যাল সমাজের ভিৎ দৃঢ় হলে নারী শিক্ষা পিছিয়ে যায়। উনিশ শতকের মহানগর পরিবেশ আবার বহু শতাব্দী পার হয়ে নারী শিক্ষার পরিবেশ রচনা করলেও সাধারণের মধ্যে তার স্পন্দন জাগেনি। একালেও ইংরেজ মিশনারীরা এগিয়ে এলেন। ১৮১৯ সালে চুঁচুড়ায় মেয়ে স্কুল হল। ১৮১৭ সালে স্কুল বুক সোসাইটিতে নারী শিক্ষার প্রস্তাব উঠল। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চলল এবং "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়" নামে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হল। ১৮২১ এ লণ্ডনের "ফরেন স্কুল সোসাইটি" থেকে প্রেরিত হলেন শ্রীমতী মেরী য়্যান কুক। প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে চার্চ মিশনারী সোসাইটির চেষ্টায় তিনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৮২৪ নাগাদ ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় এই বিদেশিনী প্রায় ৩০টি স্কুল চালাতেন। ১৮২৬ সালে একটি কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৮৪১ সালে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল। মিশনারী আওতার বাইরে ধর্ম নিরপেক্ষ মেয়ে স্কুল স্থাপনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর এগিয়ে আসেন। বেশ কয়েকটি জেলায় স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়িনী সম্মেলনী গড়ে ওঠল। নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে প্রায় ৫৪টি মেয়ে স্কুল হল কিন্তু শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ংএর সঙ্গে মতভেদ ঘটায় বিদ্যা-সাগর সরকারী স্কুল ইন্সপেকটারের পদটি ত্যাগ করলে এ প্রয়াস প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। এই শিক্ষাধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য —

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টায় ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সুযোগ পায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুল কলেজে পরিণত হলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ এল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু প্রথম গ্রাজুয়েট হলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজেও মেয়েরা সুযোগ পেলেন।

তত্ত্বের দিক দিয়ে এবং ওপরে ওপরে দেখতে গেলে এই নারী শিক্ষা আন্দোলন বেশ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু যে সুযোগ এসেছিল তার প্রয়োগ কিন্তু বিস্তৃত হতে পারেনি। নারীশিক্ষা কি বাঙালী নারীজীবনে নতুন তরঙ্গোচ্ছ্বাস আনতে পেরেছিল? পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলবে না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় সারা ভারতে ১৮৮১-৮২তে মোট বিদ্যালয় ২৬৭১ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৭,২৩০; এর মধ্যে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ৮৪,৪৯১; মোটামুটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে ৮৭১৬। সারা ভারতে তখন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নারীর সংখ্যা শতকরা ০·৮৪।

এই হল উনিশ শতকব্যাপী নারী শিক্ষা আন্দোলনের আসল চেহারা।

॥ চার ॥

য়ুরোপে রেনেশাঁস বা নবজাগৃতির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল নব্য ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব এবং পুরনো অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে তার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। রাজনৈতিক দিক থেকে তার ভিত্তি ছিল জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র ভাশ-নাল ষ্টেটের উন্মেষ। মননধর্মের দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য হল মানবিক অন্তিত্বকে ঈশ্বর দেবতা প্রভৃতি বাদ দিয়ে মানব রূপেই দর্শন। যে ক'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল তার প্রায় সবই আমাদের বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনে অনু-পস্থিত। বাংলার নব্য ধনীরা কোন ধনতন্ত্র তৈরি করেনি, ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সেবা ও সাহায্য করে কিছু মুনাফা করেছে মাত্র। দ্বিতীয়ত পুরনো অভিজাত শ্রেণী বলে আর কিছু ছিল না। ক্লাইভ থেকে ডালহৌসী পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনে তারা হয় নির্মূল, না হয় নবদণ্ডহীন। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোন প্রশ্নও এই নতুন ধনীদের ছিল না।

রাজনৈতিক জাতীয় চেতনার উপলব্ধিও য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বল প্রতিধ্বনি হয়ে দেখা দিয়েছে মাত্র। ফলে বুদ্ধিজীবীদের অংশে চেতনায় দেখি চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মিনী উপাখ্যানে" স্বাধীনতার গান লিখেছেন, আবার ভারতে ইংরেজ রাজত্ব খানুক একামনা করেছেন (পদ্মিনী উপাখ্যান, উপসংহার)। ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজ বিরোধী বিদ্রূপ কবিতা এবং "কতই আদর করি দেশের কুকুর ধরি" লিখেছেন, আবার সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙ্গ করেছেন। যে হরিশ মুখোপাধ্যায় নীল-করদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তিনিই সিপাহী বিদ্রোহকালে ইংরেজ পক্ষ সমর্থন করেছেন। অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে বঙ্কিম উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার ও নীল বিদ্রোহ—যা তাঁর সমকালীন ঘটনা—সে বিষয়ে তিনি নীরব।

মননধর্মের দিক থেকে য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের ভাবগত অবস্থান হল মানবজীবন মানুষের গঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা জগৎ—এই ধারণা থেকে সরে না যাওয়া এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধকে (secular human values) প্রধান ও স্বতন্ত্র মূল্য দেওয়া।

উনিশ শতকের বাংলার ধর্মসংস্কার আন্দোলন য়ুরোপের অনুরূপ মেটিরিয়াল কণ্ডিশন বা বাস্তব শর্ত থেকে জাত নয়। ভেনিস ক্লোরেন্সের নতুন বণিক সমাজ পুরনো অভিজাত শ্রেণীর শ্রেণীগত প্রাধান্য খর্ব করার জন্য অভিজাত সম্প্র-দায়ের ধর্ম দর্শনগত বনিয়াদকে আক্রমণ করেছিল—"looked to a sort of intellectual and spiri-tual aristocracy, whose claims to social primacy were no longer based on feudal so-vereign right but rather on superiority of culture," ২২

য়োরোপীয় রেনেশাঁসের আদর্শ ছিল খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসে নয়, intellectual superman. সেইজন্যই খ্রীকধর্মদর্শন নবচর্চার প্রয়োজন হল। "The man of the Renais-sance found available in ancient philosophy sccular view of life independent not only of religious preconceptions but also in a large measure of all metaphysical ideas." ২৩

য়োটো ও অগাস্টাসের "আত্মা" তত্ত্ব এবং "আইডিয়া" তত্ত্বকে এঁরা খৃষ্টধর্মের ব্যক্তি ঈশ্বর খৃষ্ট, পরিত্রাণ প্রভৃতি তত্ত্বের বিরোধিতায় দাঁড় করালেন। খৃষ্টীয় পাপচেতনা থেকে মুক্ত হয়ে, নরক ভোগের ভয়সহ সম্ভাবনা থেকে রেহাই পেয়ে মানুষের ইহজাগতিক ব্যক্তিত্ব এক নতুন আত্মিক মুক্তির সন্ধান পেল (আমাদের বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বে এই ক্লোরেন্টাইন সুপারম্যান তত্ত্বের এবং মধুসূদনের 'রাবণে' পাপচেতনা মুক্ত বিদ্রোহী মানবতার য়ুরোপীয় আইডিয়াই প্রবল)।

উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলন একদিকে পাশ্চাত্য ভাবচেতনা ও অন্যদিকে ইংরেজদের হিন্দুধর্ম বিরোধী প্রচার আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। হিন্দুধর্ম বলতে তখন অবশ্য ব্রাহ্মণ্য রীতি নীতি আচার, মহাযানী, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া আচার, অনার্য আচার কাড় কুঁক ভূতপ্রেত সবই বোঝাত। ২৪ মিশনারীরা এই আচার আবহাওয়াকেই হিন্দুধর্ম বলে দাঁড় করিয়ে তার বিরুদ্ধে খৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হলেন। আর ইংরেজ সাম্রিধ্যে এসে য়ুরোপীয় বিদ্যা মননশীলতার সংস্পর্শে ভারতীয় শিক্ষিত মনে যে মুক্তি চেতনা জাগল তা দিয়ে একদিকে তারা খৃষ্টীয় প্রচার আর অন্যদিকে নিজেদের অন্তর্ভিত্তির ধর্ম বিশ্বাসকে প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদির সাহায্যে মার্জিত করে নেবার কাজে এগিয়ে এলেন। এখানেও কিন্তু শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষ করেই এই ধর্ম সংস্কারকে এগোতে হল। নব-জাগৃতি আন্দোলনের নেতা রামমোহন তাঁর ৪৬ বছর বয়সে ডিগ্বীকে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন "I have found

(এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বাংলার নবজাগৃতি ও রবীন্দ্র-মানস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

the doctrine of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any other which have come to my knowledge"১৫ অথচ এর আগেই তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্তসূত্র অনুবাদ প্রকাশ করেছেন এবং ১৮১৬ থেকে উপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় উচ্চতম দার্শনিক শাস্ত্র পাঠ, চর্চা অনুবাদ ইত্যাদির পরেও খৃষ্টীয় আদর্শই তাঁর কাছে "moral principles" এবং 'rational being" এর পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। অবশ্য রামমোহনের এই খৃষ্টীয় আদর্শ চৈতন্যমেন্টের মিরাকল গল্প বর্জিত খ্রীষ্টের উপদেশ। পাদরী এডামের সহযোগিতায় তিনি unitarian Committee গঠন করেন এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর দেব বেনারীতে "Answer of a Hindu to the question : why do you frequent a unitarian place of worship" রচনায় তিনি যুক্তি দেন যে unitarian দের এক ঈশ্বর তত্ত্ব এবং বেদের তত্ত্ব একই।

পরে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে এলেন এবং ডেভঃ ডাইসন, ডেভঃ লালবিহারী দে প্রভৃতি মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। কেশবের এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিচয় ১৮৬৩-তে The Brahmo Samaj Vindicated" কিন্তু কেশবেরও এই অবস্থান থাকল না। তিনি ক্রমে ভক্তিবাদী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্ম তরুণ সম্প্রদায় য়ুরোপীয় শিক্ষার বেজাজে যুক্তি ও মননশীলতার পরিবেশ চাইছিল। আচার্যরা সৈতা পরবেন কেন? অসবর্ণ বিবাহ হবে না কেন? সমাজের প্রার্থনা সভায় মেয়েরা যোগ দিতে পারবে না কেন? এসব দাবী উঠতে লাগল। এধার দিকে কেশবচন্দ্র তরুণদের নেতা ছিলেন যার ফলে রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে সমাজের সম্পাদক ও ট্রাষ্টী পদ থেকে অপসারিত করেন। কিন্তু সেই কেশবচন্দ্রই ১৮৬৮তে" Jesus Christ Asia and Europe বলে যে বক্তৃতা দেন তাতে খৃষ্টধর্মের প্রতি অহংক্তি অতিমাত্রায় দেখা দিল। পরে অবশ্য তিনি খৃষ্টের সঙ্গে অন্যান্য মহাপুরুষদের আদর্শকে সমন্বিত করে ভক্তিবাদ প্রচার শুরু করলেন। খৃষ্টানদের অনুসরণে পাপচেতনা, শোচনা, প্রার্থনা এবং ব্রাহ্ম উৎসব দেখা দিল। মূল ব্রাহ্ম আন্দোলনের জ্ঞানমার্গ সাধনা থেকে সরে ক্রমে উজ্জ্বলিত ভক্তিবাদের বন্যায় ভাসিয়ে দেন কেশবচন্দ্র। আর New Dispensation এর একটি পত্রে যা লিখলেন তাতে শাসক শ্রেণীর ধর্মাদর্শের কাছে মাথা নীচু করা ছাড়া আর কি আছে?—"Who rules India? you cannot deny that your hearts have been touched, conquered, and subjugated by a superior power. That power, need I tell you, is Christ. It is Christ India and not the British Government."

ব্রাহ্মবাদের প্রতিক্রিয়ার দিক হল উগ্র হিন্দু জাগরণ, হিন্দু রিভাইভাল আন্দোলন। এরা হিন্দু আচারের সব কিছুই সমর্থন করতে লাগলেন। এঁদের নেতা হলেন শশধর তর্কচূড়ামণি। ব্রাহ্মদের মধ্যে বেদ উপনিষদে ভক্তি ছিল প্রবল, কিন্তু সমগ্র হিন্দু পুরাণের প্রতি ছিল প্রবল বিদ্বেষ-বিষ্ণা। এঁরা তাই পুরাণকে প্রবল ভাবে সমর্থন করলেন। এই দুই ধারার মাঝখানে দাঁড়ালেন উনিশ শতকী নবজাগৃতির ভাবনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৭২ এ প্রথম প্রকাশিত তাঁর বঙ্গদর্শনে সাহিত্য ও যুক্তিবাদী চিন্তা প্রকাশই উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মচর্চা নয় : "আমরা এই পত্রকে স্বশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব··· বাঙালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, বহুদর্শন, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক।" ২৬ কিন্তু কালক্রমে বঙ্গ দর্শনে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতির আলোচনা এবং পাশাপাশি মিল, বেন্থাম, কঁৎ এর দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান চর্চা (যেমন "সাম্য") চলল। বঙ্গদর্শনের প্রথম বছরেই কঁৎএর দর্শন নিয়ে অনন্তিদীর্ঘ বিশ্লেষণী রচনা প্রকাশ হয় যেটি বঙ্কিমের রচনা বলে অনুমিত। দুবছর পরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কঁৎ দর্শনের ওপর প্রবন্ধ লেখেন। এসময়ে যুক্তিবাদী শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, আঙ্গিস দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি কঁৎ দর্শনের অনুরাগী পজিটিভিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বঙ্কিমের অবস্থান বদলে গেল। তিনি বিশেষ ভাবে হিন্দু মানসিকতার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, বিশেষ করে ১৮৮৬তে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং ১৮৮৮ তে প্রকাশিত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে। অবশ্য শশধর প্রভৃতির মত অন্ধ আনুগত্য না রেখে তিনি হিন্দু ধর্মকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখিত (rationalise) করে নেবার পর নবীনচন্দ্র সেন, "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", "প্রভাস" (১৮৮৭, ১৮৯৩, এর ১৮৯৬) এই যে মহাকাব্য ত্রয়ী রচনা করেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য পুরাণের কৃষ্ণকে অবতার মাত্র না করে মহামানব রূপায়মান করে তোলা। বঙ্কিমের কৃষ্ণও তাই। রেমন্ডস 'ব্রজসংহারে' পৌরাণিক দেবদানব যুদ্ধকে নব্য জাতীয়তার আলোকে এবং "দর্শনমহাবিদ্যার" শক্তিতত্ত্বকে ইকোলিটিজম তত্ত্বের আলোকে নতুন করে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।

বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে (১২৮২ বৈশাখ) "মিল, ভাবিন এবং হিন্দুধর্ম" গ্রন্থকে জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সর এবং চার্লস ডারউইনের মতব্য আলোচনা করে জগতের "স্রষ্টা, পাতা এবং সংহর্তা" এই তিন পৃথক শক্তির অস্তিত্ব মেনে বলেছেন—"ইহাই হিন্দু ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি।" এবং পরে বলেছেন "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক।" ধর্মতত্ত্বে নানা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "কোমতের মতাভ্যায়ী mathematics, astronomy, physics; chemistry, biology, sociology" প্রভৃতির চর্চা প্রয়োজন ; কিন্তু তারপরই ঈশ্বর জিজ্ঞাসার প্রশ্ন তুলেছেন :

"শিষ্য ॥ তার পর ঈশ্বর আমিব কিসে?

গুরু ॥ হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে এবং প্রধানত গীতায় ।২৭ যে বঙ্কিম প্রথম জীবনে যুক্তিবাদ বা র‍্যাশনালিজমের চর্চা করেছেন সেই বঙ্কিম শেষে বলছেন—"এইটুকু শিখিয়াছি যে বৃত্তির ঈশ্বরানুবৃত্তি-ভাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ।২৮

এ পর্যন্ত ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে 'নবজাগৃতির' নায়কদের প্রয়াসে আমরা কী দেখছি? তাঁরা কি ঈশ্বর, অধিবিদ্যা (metphysics) ইত্যাদি সরিয়ে মানবতা, বস্তুচেতনা ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন? মোটামুটি ভাবে বলা যায়—হননি। কিছু পরিচিতিই এবং ইয়ং বেঙ্গলের অমিতাচারী যুবক ছাড়া আর কারো মধ্যে ঈশ্বর-চেতনা মুক্ত জীবনদর্শনের ছাপ নেই। একমাত্র নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম বিদ্যাসাগর। পাশ্চাত্য রেনেশাঁসের দেশুলার হিউম্যান ভ্যালুজ স্পষ্টতঃফুটে উঠতে পারেনি কোন সংস্কার আন্দোলনেই। স্বয়ং বিদ্যাসাগরকেও সংগ্রাম করতে হয়েছে মানবিক আদর্শকে চূড়ান্ত প্রধান স্বরূপ খাড়া করে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বাংলার নবজাগৃতি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—

১। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক একটি অনগ্রসর দেশে ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আবির্ভাব।

২। সেই আবির্ভাব গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজকে আঘাত করে নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন এক ধ্বংসকারী কিন্তু রচনা করল।

দেশীয় সহায়ক মুৎসুদ্দী বেনিয়ানরা প্রচুর টাকা করল। নতুন বাণিজ্য বিস্তারে নতুন মহানগর স্থাপিত হল।

৪। এই মহানগর মানবতাকির তীর্থ ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পাদপীঠ—যে শোষণের লক্ষ সম্পদ এ দেশে শিল্পায়নে পুনর্নিযুক্ত না হয়ে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিতে চালান যেতে লাগল।

৫। এ দেশের বিত্তবানরাও নতুন অর্জিত ধনকে নতুন শিল্পায়নে নিয়োগ না করে পুরনো কেতায় জমিদার ভূস্বামী হয়ে উঠতে লাগল।

৬। ফলে শহরে বুর্জোয়ার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মধ্যে কখনই পুরোপুরি আসতে পারেনি। ইংরেজে খাভাবিক সমাজ বিবর্তণের সংঘাতের ফল হিসেবে এসেছিল চেতনার রেনাসাঁসের সমৃদ্ধিতে চালান যেতে লাগল।

৭। প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ব্যবস্থার বনিয়াদ রচনায় নিযুক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে দীপ্ত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল দিকগুলি নিজেদের চেতনায় গ্রহণ করতে চাইলেন। পাশ্চাত্য সমাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের রূপগুলি তাঁদের কল্পনাকে আলোড়িত করে তুলল এবং এই পাশ্চাত্য আলোকের প্রতিফলিত রশ্মিকেই আমরা বললাম নবজাগৃতির আলো। বাংলার নবজাগৃতি বাস্তব-পক্ষে কোনদিনই সারা বাংলার হয়নি। ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবা বিবাহ, ইংরেজী শিক্ষা এমনকি পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্যও সমগ্র জনমণ্ডলীর এক ক্ষুদ্র অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—কোনদিনই তা 'জাতীয়' হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের উনিশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাই প্রায় সামগ্রিক ভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিফলন। যাদের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁরা ভারতীয়। তাই এরপ্রকার দুর্বল সময়ের দেখা দিয়েছে যার প্রবলতম দিকটিই হল পাশ্চাত্য মানসিকতা। যেটুকু ভারতীয় তাও আনার রেনেশাঁসের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ থেকে বিচ্ছিন্নীভূত হিন্দু ভক্তিবাদ ও ঈশ্বরবাদ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মিত্রির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮·০০
পৃথিবীর বয়স	১৪·০০
জীবন নিরবধি	১৬·০০
ঘরে ফেরারদিন	৫·০০
দিবস বিভাবরী	৫·০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬·০০
আলোর সহোদর	৪·০০
পারাবারের তীরে	১০·০০

শুকসারী ॥ ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী

ভাগচাষীদের দুঃখের কাহিনী

কল্যাণ চৌধুরী

'আইন করে বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় এবং মালিকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুবই খারাপ।' একথা বলেছে বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি। ভূমি সংস্কার পরিকল্পনার প্রধান কথা চাষীদের চাষের নিরাপত্তা যার অভাবে চাষের কাজে বাধা সৃষ্টি হয় এবং ফলন হ্রাস পায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বর্গাদারদের পক্ষে সাহায্যকারী সমস্ত আইনের কার্যকারিতাকে মালিকরা ব্যর্থ করে দেয় বর্গাদারদের নানাভাবে নাজেহাল করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কমিটি বলেছে, কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে এবং "ভাগ" চাষের ব্যবস্থা চালু থাকলে যে জাতীয় অপব্যয় তা বন্ধ করার একমাত্র উপায় বর্গাদারদের জমির মালিক করে দেওয়া।

"বর্গা" প্রথায় বর্গাদাররা প্রকৃতপক্ষে জমির প্রজা এবং মালিকরা মধ্যস্বত্বভোগী। শুধু এইটুকু তফাৎ যে বর্গাদাররা যে জমিতে চাষ করে সেই জমির মালিকদের তারা ভাড়া হিসেবে টাকার পরিবর্তে উৎপাদনের অংশ দেয়। ১৯৪৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি রাজস্ব আইন বলবৎ হওয়ার পরও "বর্গা" প্রথার অস্তিত্ব থাকাটা ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে অস্বাভাবিক ঘটনা। কেন না ১৯৪৩ সালের আইনে সমস্ত শ্রেণীর মধ্যস্বত্বকে বিলোপ করা হয়েছে এবং সমস্ত প্রকৃত চাষীকে প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের অধীনে আনা হয়েছে।

মালিক ও বর্গাদারদের আইনগত অবস্থা কি? মালিক এখন ইচ্ছে করলেই আইনত জমি থেকে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে পারে না যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে বর্গাদার ১৯৫৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ১৭ ধারায় কোন অপরাধ করেছে। বলপূর্বক বর্গাদার উচ্ছেদ করলে মালিক আইনের চোখে অপরাধী। বর্গাদার যে জমিতে চাষ করে সেই জমিতে তাদের অধিকার পুরুষানুক্রমিক। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেও বর্গাদারের অধিকার শেষ হয়ে যায় না। মালিককে উৎপাদনের ২৫ শতাংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং তারা জমিতে বোঝা স্বরূপ।

বিধানসভা কমিটি তাই বলেছে বর্গাদারদের জমির পুরো অধিকার দেওয়া এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে মালিকদের হাত থেকে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করার উচিত। এর ফলে সামঞ্জস্যহীন ভূমি ব্যবস্থার যে বিরোধ ও বিপুল সংখ্যক মামলার সৃষ্টিপাত তা মিটে যাবে। তাদের সুপারিশের সমর্থনে বিধানসভা কমিটি ১৯২৭ সালের কার কমিটির রিপোর্টের উল্লেখ করেছে যাতে এক শ্রেণীর বর্গাদারকে প্রজার মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাস্তুঘু সরকার ১৯৩৮ সালে যে ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করেছিলেন তারা কার কমিটির সঙ্গে একমত হয়ে সুপারিশ করে যে সব বর্গাদার লাঙল, বলদ ও চাষের যন্ত্রপাতি দেয় তাদেরও প্রজা হিসেবে গণ্য করা হক। ১৯৪০ সালের ফ্লাউড কমিশন ও ১৯৬৩ সালের কেরালা ভূমি সংস্কার আইনেও একই ধরণের সুপারিশ করা হয়।

বিধানসভা কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে, এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের পেছনে পড়ে থাকার কোন কারণ নেই। বর্গাদার যা অধিকারের যে জমি চাষ করে সেখানে তাদের পুরো মালিকানার অধিকার দেওয়া এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রজারূপে আইনত স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। দীর্ঘকালব্যাপী দারিদ্র্য ও সংগ্রাম প্রান্তিক ও ভাগচাষীদের জীবনীশক্তি কেড়ে নিয়েছে যারা অর্থনৈতিক সহায়তা ও কৃষির যন্ত্রপাতির জন্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল। সেইজন্য তাদের দরকার অর্থনৈতিক সাহায্য। অন্যথায় শুধু বেঁচে থাকার জন্য তারা তাদের জমি বেচতে বাধ্য হবে।

কমিটি সুপারিশ করেছে অধিকার সংক্রান্ত নথি সংশোধন করে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অফিসারদের সাক্ষ্যে জানা গেছে যে, ২৫ শতাংশের বেশি সংখ্যক বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়নি। অতএব এই ব্যাপারে লেটেমেন্টের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু করা দরকার যাতে কৃষি জমি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে বর্গাদাররা নিজেরা এগিয়ে এসে নাম নথিভুক্ত করতে পারে। কমিটি পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যদি প্রমাণ হয় একজন কোন এক বণ্ড জমি চাষ করেছে তাহলে তাকে বর্গাদার হিসেবে গণ্য করা উচিত। সেক্ষেত্রে সে যে বর্গাদার নয় সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব মালিকের।

কমিটির মতে ফসলের "ভাগ" পেয়ে রসিদ না দেওয়া অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কমিটি জানতে পেরেছে যে, বর্গাদারদের কাছ থেকে ভাগ নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকরা রসিদ দেয় না। কমিটি বলেছে যে, বর্গা প্রথায় চাষে "ভাগ" নিয়ে বর্গাদারদের যে রসিদ দেওয়ার কথা সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং যদি নথিপত্রে বর্গাদারের নাম নাও থাকে এই রসিদ থেকেই সে চাষের দাবী প্রমাণ করতে পারবে।

কমিটি মনে করে, কৃষি জমি ভাগে চাষের ব্যাপারে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৩৩ বা ১৪৪ ধারার বিরোধ উপযুক্ত ওজন করে মীমাংসা করা উচিত। এমন সব ঘটনার কথা জানা গেছে যেখানে মালিকরা আইনের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে প্রকৃত চাষীকে জমিতে প্রবেশ করতে দেয়নি এবং সমস্ত ফসল কব্জা করেছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৩ ও ১৪৪ ধারায় মালিকরা বর্গাদারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে।

সেই জন্য কমিটির অভিমত এই যে, সংক্রান্ত আইনে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে ভাগ চাষের ব্যাপারে ১৪৩ ও ১৪৪ ধারার প্রয়োগ ঘটলে প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেট সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেন জমি প্রকৃতপক্ষে কার দখলে এবং এই ধরণের তদন্ত করে ও জমি কার দখলে সেটা জেনে তবেই ইনজাংশন জারী করা উচিত।

কমিটি আরও বলেছে যে, সম্ভব হলে প্রতি সাব-ডিভিশনে বিশেষ ম্যাওাটরুনাই গঠন করা উচিত যাতে থাকবেন সিনিয়র বিচার বিভাগীয় অফিসাররা এবং তাঁরা ভাগ চাষ অফিসারদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনবেন। মালিকদের "কারসাজীর" হাত থেকে বর্গাদাররা যাতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে তার জন্য তাদের আইনী সাহায্য ও আইনগত উপদেশ দেওয়া দরকার। মালিকরা তাদের মামলায় জড়িয়ে ফেললেও তাদের আইনগত সাহায্য দেওয়া দরকার। বার বহুল মামলা থেকে বর্গাদারদের রক্ষা করে তাদের প্রতি যদি সুবিচার করতে হয় তাহলে সর্বক্ষেত্রে তাদের আইনী সাহায্য দিতে সরকারের কার্পণ্য করা উচিত নয়।

সিপাহী বিদ্রোহ ও সেকালের বাঙালী ভদ্রলোক

মিহির আচার্য

সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে কলকাতায় ইংরেজ অধিবাসীরা প্রথমটায় সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা তারা ভয়ে ভয়ে জাহাজে আশ্রয় নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করত।

ইংরাজদের এই আতঙ্কিত অবস্থা দেখে "বাঙালী নেতৃবর্গ" শুরুতর কর্তব্যবোধে তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করে এবং প্রস্তাব পাঠিয়ে শ্বেতাঙ্গদের নিরুদ্বেগ করবার চেষ্টা করেন।

"বিশ্বস্ত নাগরিকদের" সভা ডাকা হল "হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের হলঘরে।" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব পাশ করলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৫৭-এর ১৫ মে "নেটিভ সমাজের একটি সাধারণ সভা" ডাকলেন। প্রস্তাবের ইংরেজি তর্জমা ছাপানো হল এবং জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের সেক্রেটারি সমীপে ১৮৫৭-এর ১৩ মে পাঁচ দফার জাহুগত্য জানিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ডি. পি., প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। সেই প্রস্তাবও যথারীতি বাংলায় তর্জমা করে, ছাপিয়ে সাধারণে বিলি করা হল।

এছাড়াও উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, কোতরঙ, কোন্নগর এবং সন্নিহিত পল্লীর জমিদার, তালুকদারগণ হুগলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে তাঁদের বিশ্বস্ততার স্মারক পত্র পাঠালেন। এই স্মারকপত্রের স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ছিলেন উত্তর পাড়ার ধনাঢ্যকুল ভূষামী জয়কৃষ্ণ মুখুজ্যে। এঁরা অধিকন্তু স্থানীয় অশ্বারোহী, পোয়ালা, বাগদি, ডোমদের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবার পরামর্শ দিলেন। যাদের কর্তব্য হবে পলাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের মোকাবিলা করা। সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইংরাজদের সমর্থন করে আরো সভা-সমিতি শুরু হল। বালী দেওয়ানগঞ্জ, বাঁকুড়া, নোয়াখালি, সিলেট, রাজসাহী, শান্তিপুর তথা কলকাতাতেও। কলকাতার দুটি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন পর্যন্ত ইংরাজকে সমর্থন জানাল।

বর্ধমানের মহারাজা, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরো ২২০০ বঙ্গসন্তান লর্ড ক্যানিঙের কাছে তাঁদের প্রস্তাব পাঠালেন।

তৎকালীন ভারত সরকারের সেক্রেটারি সিসিল বীডন উত্তরে লিখে পাঠালেন। "If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like the foremost among you, hold high rank, large hereditary possessions, accummulated wealth and respected social positions."

এই উক্তিই যে সমস্বরে "নয়া ধনীদের" চিত্ত তুলে ধরেছে! অন্ত এক প্রস্তাবে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় তথা "৫০০০ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার" নেটিভদের, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজা জমিদার-তালুকদার-বণিককুল লর্ড ক্যানিঙের কাছে তাঁদের যথোচিত সমর্থন পাঠালেন।

এছাড়াও উৎসাহী ইংরাজ সমর্থকের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে শ্রীরামপুরের পোঁসাইদের, কলকাতার হাজরাদের মল্লিক (এঁর হাতে ছিল প্রচুর সরকারি কণ্ট্রাক্ট), কৃষ্ণনগর বংশীলোচন মিত্র, কলকাতার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, তুলোরাশির রাজা, তাঁদের নায়েব ঘনশ্যাম কুমার পাইন, প্রাণকৃষ্ণ ও জগৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, পাণিহাটির জমিদার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুর্শিদাবাদের নবাব, আনআকিশোর রায়, ঢাকার জমিদার, ঢাকার মৌলভী আলী ও আবরল গনি, রামচন্দ্র, ময়মনসিংহের জমিদার, প্যারিমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ।

শেষোক্ত জন "জন্মী মুন্সেফ"। 'ক্রেড অফ ইণ্ডিয়া' কাগজে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়:

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

'নন্দিতা' বস্তাপচা ছবি

ভানুসিংহ

দুর্বল কাহিনী বিভাস, অসংলগ্ন চরিত্রায়ণ, অতি সাধারণ ও অযথো-চিত পরিচালনা 'নন্দিতা' ছবিটিকে তুলুই বে অকিঞ্চিৎকর ক'রে তুলেছে তাই নয়, তার টেক্‌নিক্যাল মান বিভিন্ন উৎপাদনও করে। যে বেশে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের ছবি হয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়, সে-বেশে এক নীচুমানের ছবি আজও তৈরী হয়ে চলেছে, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। এতদিনেও কি সাধারণ বাংলা ছবি সাধারণত্ব লাভ করল না? বাংলা ছবির শোচনীয় ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে কেবল হাজির হয়েছে 'নন্দিতা'। বর্তমানে এই একটি মাত্র নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পেয়ে শহরে দেখানো হচ্ছে। এবং সে-ছবির হাল এমনই! আজও বাংলা ছবির চেন-হাউসগুলি বন্ধ। আশ্চর্য কাণ্ড!...

কয়েকদিন আগে 'লালসা বন্ধন' নামে একটি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছিল অনেক দিন পর। কিন্তু কোনরকমে এক সপ্তাহ কাটিয়েই তাকে বিদায় নিতে হল ব্যর্থতার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে। 'যাত্রাভিনয়'—এই গালভরা নামে যতই বিজ্ঞাপন হোক, দর্শকবৃন্দ তাকে গারিজ ক'রে দিতে কালবিলম্ব করেননি। যাত্রা-আসরের একটি পালাকে ছবিতে পুরো ধ'রে রেখে যে-বস্তু পরিবেশিত হয়েছে, তাতে না আছে চলচ্চিত্রের ভাষা, না আছে তার গতি। উদ্ভট খেয়ালিপনার অভিনব কিছু হ'য়ে উঠলেও তা যে সব সময় রসোত্তীর্ণ হয়না এবং বরদাস্ত করাও যে যায় না, সেটুকু বোধশক্তিও চলচ্চিত্রকারের নেই—আজকের দিনে এটা ভাবতেও কষ্ট হয় বৈকি। তবু না হয় সেটা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার ছিল—চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পুরো একটা যাত্রা পালা পরিবেশন—'যাত্রাভিনয়' নামে একটা নতুন কিছু প্রবর্তন করার প্রয়াস। কিন্তু 'নন্দিতা'? এতো সেই বস্তাপচা কিরা আংগিক। কাঁকা আদর্শবাদের অক্ষম রূপায়ণ। জোলো দুর্বল নীতিবাদের দুর্বলতর প্রকাশ। অযাচক ও হাস্যকর দৃশ্য পর্যায়ে বক্তৃতা উপস্থাপনের সফল প্রয়াস। আধার ছবিকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার ব্যর্থ চেষ্টায় ভাঁড়ামি, ভিলেনি কাণ্ডকারখানা, মারপিট, নারীধর্ষণ, সাসপেন্স প্রভৃতি মশলা মেশানো হয়েছে এতই অসঙ্গত ও অপটু হাতে যে, গোটা ব্যাপারটা নিতান্তই খেলো হ'য়ে গেছে।

শহুরে ডাক্তারদের গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করার সরকারী আদেশের অনুপ্রাণিত এক তরুণ ডাক্তার গ্রামে এলেন। কিন্তু এ কোন্ গ্রাম, কবেকার? ছবিতে গ্রামীণ পরিবেশ ও পাত্র পাত্রীদের দেখে সেই শরৎ-চন্দ্রের যুগের গ্রামের কথাটাই মনে আসে। কিন্তু গ্রামে সরকারের দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভিলেনের কোম্পর বেঁকিয়ে 'রূপ তেরা মস্তানা' গান গাওয়ার চঙে এযুগের ছাপ পড়ার আবার বিভ্রান্তিও আগে। ডাইরেক্টর আদর্শবান ডাক্তার গ্রামে এসে সরকারী হাসপাতালে পুঞ্জীভূত নোংরামি, অসততা ও দুর্নীতির মুখো-মুখি হলেন এবং সে সবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে সাধুতা ও ন্যায় নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে শপথ নিলেন। উত্তম কথা। কিন্তু এ পথে এগুতে গিয়ে তিনি যে-সব বাধার সম্মুখীন হলেন এবং চক্রান্তের জালে পড়লেন, সেগুলি এতই অবাস্তব ও বালখিল্য সুলভ অকিঞ্চিৎকর এবং হাস্যকর যে, ছবির বক্তব্যটুকুও গ্রহণকে পর্যবসিত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত কম্পাউণ্ডারের মুখতী কস্তার সংগে আসন্নিষ্ঠ ডাক্তারের প্রণয়লীলা পরিবেশগত বৈসম্য ছিড়িয়ে অবাধ, গ্রামীণ পটভূমিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নয়। অথচ অন্ত দৃশ্যে নানা গোঁড়ামি ও সংস্কারের ছবি। প্রেমিকাকে ডাক্তারের বায়োলজি পড়ানো, জলাশয়ে হেঁটে হেঁটে মাছুলি চষে নায়িকার গান গাওয়া, প্রেমাবেগে আলিংগন, গ্রাম-প্রধানদের ঘোট পাকানো ইত্যাদি দৃশ্য ছবিতে এতই পানসে মনে হয় যে, বাসনা জাগে—এটিই বুঝি প্রথম সবাক ছবি! আজকের দিনে বিধবার গর্ভপাতে নীতিবাগীশ ডাক্তারের অযৌক্তিক অনিত্য যে নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হতে দেখি, তাতে কৌতুক বোধ না ক'রে পারি না। কৌতুক বোধ করি ছবির শেষেও—যখন সব কিছুরই সমাধান হয়ে যায় অতি সহজে। দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্বৃত্তের দল পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়, যায় কম্পাউণ্ডার সমেত—যে কেবলই সরকারী ঔষধপত্র কালো-বাজারে চালান দিত আর জোলো মিক্‌শ্চার দিয়ে গ্রামের রোগীদের কাছ থেকে গোপনে টাকা নিত। তারই মেয়ে ছবির নায়িকা চোখের জল ফেলতে ফেলতে নায়কের সংগে মিলিত হয়ে ছবিটির মধুর সমাপ্তি ঘটাল। দর্শকের ইচ্ছাপুরণের এই মেকি প্রয়াস আরও কতদিন চলবে কে জানে!

নারায়ণ গাঙ্গুলীর মূল কাহিনী অবলম্বনে ছবিতে প্রত্যুষ ঘটিয়েছেন স্বয়ং চিত্রপরিচালক যদেশ সরকার। চিত্রনাট্য ও-সংলাপ লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের অধ্যোগ্যতার পরিচয় ছবিটির সর্বাংগে। ক্যামেরা ধরেছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শব্দ গ্রহণে আছেন জে, ডি, ইরানী। কিন্তু তাঁরাও হতাশ করেছেন।—হ্যাঁ, ছবিটিকে একটি নেগেটিভ শট্ আছে, আর আছে চিত্ত-উথেলের কিছু সংকেতবাহী সুপারইম্পোজিসন শট্। কিন্তু এতে কি কিছু সামাল দেওয়া যায়? ছবিটির আপাদমস্তকে যে দৈন্যদশা। সুরকার মৃণাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সুর রচনাও বৈশিষ্ট্যহীন। সংগীত পরিচালনাও নিতান্ত সাধারণ। ছবির নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অসহায় মনে হয়েছে। আরতি অটাচার্য নায়িকা রূপে অচল। বিকাশ রায়ের টাইপ্‌টি সেই সনাতন মার্কা—আজ বড়ই ক্লান্তিকর লাগে। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোচ্চার অভিনয় সহনশীলতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে। ওরই মধ্যে দিলীপ রায় আর স্বরূপা চট্টোপাধ্যায়কে কিন্তু কিছুটা ভাল লাগে।

সুকান্ত জয়ন্তী

আমতা থানা সুকান্ত ৫০তম জন্মোৎসব সমিতি আয়োজিত কেন্দ্রীয় উৎসব গত ৩১শে অক্টোবর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে চাকদোতা 'সংস্কৃতি' প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি কবি নিমাই মাঝা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন সমালোচক মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। নিমাই মাঝা রচিত সুকান্ত সম্পর্কিত সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সুকান্তর বিরাট প্রতিকৃতিতে রক্ত মাল্যদান করেন সভাপতি ও প্রধান বক্তা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমতা শাখা সুকান্ত গীতি ও বিভিন্ন গণসংগীত পরিবেশন করেন।

এই উপলক্ষ্যে এক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে সুকান্ত সৃষ্টির সামগ্রিক মূল্যায়ন করেন ও সুকান্ত সম্পর্কে অপপ্রচার ও বিকৃতি বিষয়ে সকলকে হুঁশিয়ার করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমাঝা সুকান্তর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। গোপাল রাপ্ত, হীরাস্থিতা মাঝা, করালী বেরা, শশধর পাখীরা বিভিন্ন গণসংগীত পরিবেশন কোরে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। পরিশেষে 'সংস্কৃতি'-র সদস্যবৃন্দ নিমাই মাঝার সফল নির্দেশনায় বোম্বানা বিষনাথম্-এর 'সার্কাসের বাঘ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় প্রয়োগ সংযোগী দিলীপ মাঝা, তপন কেঁলি, অশোক যে, উত্তম মাঝা, বিষনাথ পাত্র, অরুণ যে, কুমুদ মাঝী সুন্দর অভিনয় করেন। সারা বছর ধরে এ অনুষ্ঠান চলবে।

ইউকোব্যাঙ্ক অভিনন্দন জানাচ্ছে

ঋতা সেনের জীবনে আমাদের পরামর্শের প্রত্যক্ষ সুফল

ঋতা সেন একাধারে গৃহিণী, মা এবং চাকুরিজীবী। তিনি তাঁর সঞ্চয় করবার জন্যেদের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই জমা দেন। বছর তিনেক আগে তিনি এজেন্ট এস-প্রাপিয়াঁর প্রাপ্ত টাকা জমা দিতে। তখন আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বলি, যদি করে তাঁর ৯৫০০ টাকা তিনি ডিপজিট বাড়াতে পারেন। আমাদের ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা নিতে তাঁকে অনুরোধ করি। ঋতা সেন আমাদের পরামর্শ মেনে নেন...

এখন থেকে কয়েক বছরের মধ্যে—সব যদি ঠিক থাকে—ঋতা সেনের মেয়ের নিশ্চয় বিয়ে হবে। সেই সময় তাঁর ইউকোব্যাঙ্ক ডিপজিট সার্টিফিকেটও ভাঙানো যাবে। ঋতা সেন তখন তাঁর মেয়েকে নিজস্ব উপহার দেবার জন্যে নগদ ৬৫০০ টাকা পেয়ে যাচ্ছেন—আমাদের সৎপরামর্শ তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ সুফল হয়ে দেখা দেবে।

অতএব, জমা টাকা থেকে কী ভাবে লাভ করবেন, জমা টাকা থেকে কী ভাবে লাভ করবেন, সারেন্ডার মূল্য জানতে চান, ইউকোব্যাঙ্ক আপনাকে ৬টি বিভিন্ন পরিকল্পনার হদিস দিচ্ছে। আমাদের যে কোন শাখায় আজই চলে আসুন।

ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা
আপনি যা পারেন জমা দিন, তাও তোলে নেবার এ সুদাদর সুদ পাবেন।

রিকারিং ডিপজিট পরিকল্পনা
মাসে মাসে সামান্য নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে পারেন তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

ফিক্সড ডিপজিট পরিকল্পনা
তাড়াতাড়ি সুদ পাবার পক্ষে সেরা পরিকল্পনা।

রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত
ফিক্সড ডিপজিট পরিকল্পনা
এই পরিকল্পনায় ১ বা ৩ বছরের জন্য সুদ পেতে পারেন।

ফিক্সড ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত বেনিফিট পারচেজ অ্যাসিস্টেন্স ইনসিওরেন্স পলিসি
কোন কারণে যদি এই সময়ের মধ্যে ইনসিওরেন্সের ভদ্রলোক ইনসিওরেন্সের সুবিধা পাবেন যেমন আপনার পরিবার নিশ্চিত সুদও পাবেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে সাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCOC-M SEN

সঙ্কটের আবর্তে সি পি আই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের মতো একটা উত্তেজক ট্যাবলেট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিলতে চান যদি অবস্থার ঘটে, এই আশ্রায়। ভাগ্যান্বেষী সি. পি. আই. আপাততঃ নির্বাচনের মকেটে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মকড়ুল দেখতে চায়। কিন্তু, ওরা ভালমতই জানে যে, জনসাধারণের কাছে ওদের বামপন্থী ভাবমূর্তি ভেঙে গেছে অনেক আগেই। তাই "কংগ্রেসের ভেতরকার প্রগতিশীল শক্তির" সঙ্গে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে ওরা ওদের অংকের নিঃসঙ্গতাকে কাটাতে চায়। এ এক অদ্ভুত পার্টি যে দেখেও শিখলনা ঠেকেও শিখলনা।

এই সংকটের মূল কারণ এই যে, সে একই সঙ্গে দেশের মানুষের কাছে বামপন্থীয়া নাও বজায় রাখতে চায় আবার শাসক শ্রেণীকেও খুশি রাখতে চায়। এই দুটো কাজ একই সঙ্গে করতে গিয়েই পদে পদে তার বিপদ ঘটে।

মূলতঃ, কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র মূল্যায়ন ও তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নেই বাটের দশকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়েছিল। এক পার্টি দু টুকরো হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তারা পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। এস. এ. ডাঙ্গে, "নিউ এজ" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিপ্লবী সরকার রূপে অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন। আজ সেই কেরালাতেই তারা কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার চালাচ্ছে এবং তাদের নেতা শ্রীচ্যবন মেনন দাবী করেছেন যে, কেরালাতে সাধন্তন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটেছে।

সি. পি. আই-এর এইসব উল্টাপাল্টা কথা দেশের মানুষ খুব কমই বুঝতে পারেন। একদিকে তারা সি. পি. এম-এর বাপান্ত করেছে প্রতিক্রিয়ার দোসর রূপে, অন্যদিকে আবার সুযোগ পেলেই সি. পি. এম-এর সঙ্গে সরকার গঠন করে তাকে "বিপ্লবী সরকার" বলতে দ্বিধা করে নি। গত কয়েক বৎসর যাবত সি. পি. আই-এর এই দ্বি-মুখী ভূমিকা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাকে এক চরম দুর্বিষাবাদী পার্টি রূপে চিহ্নিত করেছে।

একথা সি. পি. আই. খুব ভালভাবেই জানে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর আদর। একমাত্র নির্বাচনের সময়েই কংগ্রেস যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, বিশেষ করে যেখানে সি. পি. এম. ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলির গণভিত্তি শক্তিশালী সেখানে ততটুকুই কংগ্রেস সি. পি. আইকে চায়। এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে সি. পি. আই. দেখাতে পারে যে, কংগ্রেসের কাছে তার প্রয়োজনীতা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। জনসাধারণকেও ওরা বোঝাতে চায় যে, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি ওদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাই সি. পি. আই-এর সর্বভারতীয় নেতারা বাজাবে নেমেছেন নির্বাচনের দাবী নিয়ে।

একথা ঠিক, ভারতবর্ষের সংগঠিত পার্টিগুলোর মধ্যে সি. পি. আই. অন্যতম। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে বহুদিনের চেষ্টায় সি. পি. আই. যে গণসংগঠনগুলো গড়ে তুলেছে আজ তা ধুলে ধরা অবস্থায় এসে গেছে। এই সংগঠনগুলোকে চাঙা করে তুলতে যে ধরনের গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন সি. পি. আই-এর নেতৃত্ব সেই ধরনের গণ-আন্দোলন চায় না। পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারি, ওদের পার্টির বহু কর্মী ভয়োদ্যম হয়ে বসে পড়েছেন। যারা একটু নড়া চড়া করেন তাদের মধ্যেও কোন উদ্দীপনা নেই। পার্টির মধ্যে বহু উপদল। মাঝে-মাঝেই বহির্ষার, লাগপেজসন্ প্রভৃতির মাধ্যমে এই উপদলীয় বিবাদ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

এমন একটা সংকটের সময় নির্বাচনই হচ্ছে বিপদ-ভঞ্জন। নির্বাচন হলে ওরা কংগ্রেসকে দেখাতে পারবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া কত শক্তিশালী এবং এই শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেস একা লড়াই করতে পারেনা। সি. পি. আই-এর সহযোগিতা ও সাহায্য প্রয়োজন।

কংগ্রেসও সি. পি. আই-এর রাজনৈতিক দুর্গতার পরিচয় পেয়েছে। তাই, নির্বাচনের সময় পিঠ চাপড়ে কথা বললেও অন্ত সময় সি. পি. আইকে গুরুত্ব দিতে চায় না। এইরূপ একটা অবস্থা ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে সি. পি. আইকে অনেকটা মৃত সৈনিকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে। কংগ্রেসের কাছে তার কদর নেই, অন্যান্য বামপন্থী পার্টির কাছে সে অস্পৃশ্য, জনসাধারণ তাকে বিশ্বাস করেনা।" সি. পি. আই. এখন কী করবে?

নিঃসঙ্গতা কাটাতে হলে, সি. পি. আইকে একমুখো হতে হবে। তাকে ভারতীয় রাজনীতি পুনর্বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রতিবেশী বাংলা দেশে তাদের নীতির বিপর্যয় ঘটে গেছে। শাসক শ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে গিয়ে সেখানে তাদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহ ও ভদ্রলোক

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

"Take the most timid quaking wretch of a kayust (kayastha) you can find, put him in any district in India with a shadow of authority, and if he does not make Punjabee and sikh, Marhata and Hindustanee, work themselves to death for his benefit, and think all the while it is for their own, he is no true Bengali."

বাঙালী "ভদ্রলোকেদের" এই চরিত্র দেখলেই বোঝা যায় কেন এই শ্রেণী সেকালে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন করেননি। ইংরাজপ্রভুকে সর্বপ্রথম এঁরাই "বিধাতার আশীর্বাদ" বলে গ্রহণ করেছেন। কারণ বিধাতাদণ্ড শ্বেতাঙ্গ-প্রভুদের সহযোগেই তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে ভূস্বামী শ্রেণী এবং তাঁরই আশ্রয়ে পুষ্ট হতে শুরু করেছে তথাকথিত "মধ্য শ্রেণী।"

ইংরাজ-বিরোধিতার অর্থ তাঁদের সৌভাগ্যের পতন। কারণ শুধু জমিদার হিসেবেই নয়, নতুন মধ্যশ্রেণী ইতিমধ্যেই ব্যবসা এবং চাকরির ক্ষেত্রে ইংরাজের জুনিয়ার পার্টনার হয়ে গেছে।

ইংরাজদের জন্ত এই নির্বাক ওকালতি "বিদ্রোহীরা" সেকালে ক্ষমা করেনি। বেরিলিতে বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের ঘৃণা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে অনেককে বেআঘাত করা হয়েছে। সেকালে ফরাক্কাবাদ বা কানপুরে ইংরাজদের মতনই বাঙালী বাবুরা বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে (১৮৫৭-এর এপ্রিল-মে) সিপাহার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও অবশ্যই মধ্যে কাটাতে হয়।

সম্ভবত এই সকল কারণে ভূভাষচন্দ্রকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়, উনিশ শতকে বাঙালী দেশটাকে ইংরাজদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছিল, বিশ শতকে তাই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

সিপাহী বিদ্রোহে যে বাঙালী ভুল করেছিল সে কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

কৌতুকের বিষয় বহু যুগ পরে আজো পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর অভাব নেই যাঁরা সিপাহী বিদ্রোহে তৎকালীন বাঙালীর ভূমিকাকে যুক্তিপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন। কাঁরণ তাঁরাও বিশ্বাস করেন ঘটনাটি একটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ এবং মুঘল বাদশাহকে ফিরিয়ে এনে ইংরাজ-আনীত আধুনিক যুগকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বেশির ভাগ বাঙালী ঐতিহাসিকগণও এই মতের সমর্থক। যদিও বাস্তব ঘটনা আলাদা। বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে প্রথম শুরু হলেও অনতিকালেই তা কৃষক ও নিম্ন বর্ণের সাধারণ মানুষের যোগদানে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই অভ্যুত্থানে সামিল হয়। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ পরবর্তীকালে ইংরাজের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার শিকার হয়।

এই বাস্তব ঘটনা বিস্মৃত হলে আমরা অবিচারই করব।

শোন মিঃ গান্ধী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাগ পড়লে ছাত্ররা আজ নিশ্চয়ই ফেল করবে; 'সদা সত্য কথা বলিবে'···এমন অদ্ভুত উপদেশ আর থাকবেনা নতুন সিলেবাসে।

শোন মিঃ গান্ধী। আমাদের কাজ এখন অনেক সহজ হ'য়ে গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে শুধু ১০৮ বার ক'রে 'বিশ দফা' উচ্চারণ করলেই চলবে—না, বোঝার দরকার নেই, একটা বর্ণও না, শুধু উচ্চারণ করলেই হবে। কেবল খেয়াল রাখবে কেউ তোমার চেয়ে বেশীবার যেন 'বিশ দফা' না বলে ফেলে, তাহলেই তুমি হেরে যাবে। গান্ধীজী! হাঁ গান্ধীজীই বলছি, মিঃ গান্ধী বল্লাম না ব'লে অভিমান কোরো না—তুমি দেশের লোককে বন্দর পরতে বলেছিলে জেনে তোমার ওপর আর আস্থা রাখতে পারছিনা। এটা একটা প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার আজকের টেরিলিন টেরিকটের যুগে। আমাদের প্রস্তাব, লাল টেরিকটের স্পোর্টিং গেঞ্জী আমাদের জাতীয় পোষাক হওয়া উচিত। তাতে নবভারতের যুবকদের স্পোর্টসম্যান স্পোর্টসম্যান দেখাবে।

গান্ধীজী! তুমি তো ছাগল পুষতে, তুমি কিনেছো কখনো! জানো কি তুমি এযুগে গরু ছাগলে খাওনা—মানুষে খায়। তুমিই দৌলতে ভাগেরা কলকাতার দশতলা বাড়ি তোলে। তোমায় চুপি চুপি বলি, বলতে পারো কোন্ মন্ত্রীকে ধরলে এম. এল. এ. কিম্বা আর. টি. এ. এর মেম্বার হওয়া যায়? ওদের হাতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে যাতে রাতারাতি কুঁড়েঘর কোটা বালাখানা বনে যায়, বাসের টাইম কীপার চারখানা বাসের মালিক হতে পারে।

গান্ধীজী, তুমি অহিংসার কথা বলেছিলে। 'পেটো' কাকে বলে তুমি জানো কি? 'চেমবার' কথাটা শুনেছো কখনো? বেঁচে গেছ তুমি গুলী খেয়ে। তা না হলে, এযুগের রাজনীতিতে তুমি কচ্চে পেতেনা। যার হাতে যতো পেটো আছে, 'চেমবার' আছে, এযুগে সে ততো বড়ো রাজনীতিবিদ।

···একটা উপায় আমি অবশ্য বলতে পারি। তুমি তো আবার গোঁড়া লোক, মদফদ ছোঁওনা, ওটা আর চলছে না এযুগে। এবার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায় মদখাওয়া নিয়ে প্রস্তাব এসেছে। গোঁড়ামী ছাড়ো, বদ না খাও ম্যানেজ খাও অন্ততঃ—যুবনেতা হতে পারবে।

হায় গান্ধীজী! সুভাষ তোমাকে জাতির জনক বলেছিল একদিন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'মহাত্মা'! ওদের বিচার আমি নিতে পারছিনা, যেমন নিতে পারছিনা তোমার সত্য, অহিংসা আর খাদিকে জীবনের আদর্শ বলে মেনে নিতে এই যুগে দাঁড়িয়ে। তুমি আমায় ক্ষমা কোরো।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী

আমতা: হাওড়া জেলার গণসাংগঠনের অন্যতম ভিত্তিভূমি চারপোতা গ্রামে সংস্কৃতি প্রাঙ্গণে গত নভেম্বর মহান নভেম্বর বিপ্লব উদ্‌যাপনের জন্ত এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রি লেখক শিল্পী কলাকুশলী সংস্থানের কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য কবি নিমাই মাঝা। প্রধান কৃষকনেতা মদন হাজরা রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এবং নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস সংক্ষিপ্তার বর্ণনা করেন হাওড়া জেলার কৃষক নেতা গুপধর মাজী, শিক্ষক নেতা নিমাই ধাড়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে কবি নিমাই মাঝা নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে এই বিপ্লবের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্ত উদাত্ত আহ্বান জানান। সভায় বহু ছাত্র-শিক্ষক-প্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের বিভিন্ন এলাকা রক্ত-পতাকায় সজ্জিত করা হয়।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE 40 Paise

মতামত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

১৯৫০-এর ১১ই মে ষ্ট্যালিনকে অনুরোধ করেন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করা যায় কিনা বিচার করে দেখতে হবে। উত্তরে ১৫ই মে ষ্ট্যালিন লেখেন, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল এক হাজার ডলার। ১৯৫০-এর শেষ অবধি ৩৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার পরিশোধিত হবে। বাদবাকীর অর্দ্ধেকের উপর আমরা আমাদের দাবী ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। এখন যা পরিশোধনীয় রইল তা ১৫টি বাৎসরিক কিস্তিতে দিতে হবে।

পূর্ব কথায় ফিরে আসা যাক। সোভিয়েট ইউনিয়ন চিয়াং-প্রীতির নীতি কেন গ্রহণ করেছিল তার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন তৃতীয় পৃথিবীর কয়েকটি দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে তার যুদ্ধ-পূর্ব চীন নীতির কিছু আন্দাজ করা সম্ভব। দ্বিতীয় দশকে ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক সব দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে "সোভিয়েটাইজ" অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করে। নীতিটির মুখ্য কথা হল, যেভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, সর্বত্র ওই পদ্ধতিতেই বিপ্লব সফল করতে হবে। মাও অন্য একটি পথের উদ্ভাবক। সোভিয়েট বিশ্বাস করত না যে, মাও-প্রদর্শিত পথে কখনও কমিউনিষ্ট বিপ্লব সম্ভব। তা যখন সম্ভব নয় তখন চিয়াংকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সোভিয়েটের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল। অতএব চিয়াংকে চীনের অবিসম্বাদী নেতা এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। ষ্ট্যালিনের আশীর্বাদপুষ্ট বই "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। ষ্ট্যালিনের ১৯৪৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত চীন ছাড়া সর্বদেশের কমিউনিষ্টদের নিকট বইটি ছিল ধর্ম গ্রন্থের মত পূত। ১৯৪৫ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত বইটির ইংরেজি সংস্করণের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, চীনের জাতীয় সরকারের, অর্থাৎ চিয়াংএর নেতৃত্বে চীন জাপানের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। নিঃসন্দেহে চীন সফল হবে। বইটিতে কোন উল্লেখই নেই যে, মাও-এর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট বাহিনী আরও দৃঢ়সংকল্প হয়ে এবং অনেক বেশী সফলতার সহিত জাপান বিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল।

সর্বদেশের সর্বকালের কমিউনিষ্টদের শিক্ষার জন্য মস্কোর নীতি বহনকারী বইটির ১৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, সংখ্যায় কৃষক শ্রেণী অনেক বড়। সংখ্যার হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী আপেক্ষিকভাবে দুর্বল। তা সত্ত্বেও, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিপ্লবীদের নির্ভর করতে হবে এই শ্রমিক শ্রেণীর উপর।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব মুখ্যত কৃষক শ্রেণীর সংগঠিত সশস্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করেও যে বিপ্লব সফল করতে পারে, চীনে মাও তা প্রমাণ করেছেন। মস্কো কর্তৃক প্রচারিত পন্থার সঙ্গে মাও-এর পন্থার সাদৃশ্য নেই, তাই মাও যা সফল করেছেন তা কমিউনিষ্ট বিপ্লব হতেই পারে না।

মাও জাপানী অস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লব সংগঠিত করেন নি, বরঞ্চ জাপানের প্রধানতম শত্রু আমেরিকার দান হিসাবে চিয়াং যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন পেয়েছিলেন তাঁর সৈন্যদের নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে। সোভিয়েট কর্তৃক চিয়াংকে দেওয়া অনেক জাপানী অস্ত্রও যে কমিউনিষ্টরা দখল করেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই পত্রটি আপনাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বাধিত হব। আমার অনেক কমিউনিষ্ট বন্ধু পত্রটির বক্তব্যের সিরোধী, আমি জানি। তাঁরা আপনাদের পত্রিকা মারফৎ বিতর্ক শুরু করতে চাইলে, আমি রাজি।

নতুন দিল্লী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ রণজিৎ রায়

বিশ্বরূপা ও বিমল মিত্র

'বিশ্বরূপা'র ভেজাল সংস্কৃতির ভেজাল বিজ্ঞপ্তি—বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'মিত্রেন' দেখলাম হতভাগ্য হকার 'হরিসাধন'কে বেল একহাত নিয়ে বসেছেন। শ্রেণীভেদে জনাঞ্জলি দিয়ে তিনি শিক্ষা বঞ্চিত দরিদ্র পদযাত্রীকে পুঁজিপতি এক অর্ধশিক্ষিত সংস্কৃতি-ব্যবসায়ীর সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন। বিশ্বরূপা-বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ অপসংস্কৃতির প্রযোজক সম্পর্কে সমস্ত সচেতন মানুষই তীব্র ঘৃণা পোষণ করবেন—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন ব্যক্তিদের পসার-প্রতিপত্তির বৃদ্ধি ও প্রচারে যাঁরা আড়কাঠি স্বরূপ তাঁদের প্রতি 'মিত্রেন'র দুর্বলতাটুকু বড়ো বিস্ময়কর। তিনি কোন্ ভরসায় ভাবতে পারলেন যে, এযুগের রামায়ণ (!) 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর 'শব্দে' লেখক বিমল মিত্র 'বিবিধভারতী' শুনে একেবারে 'ফিদ' হয়ে উঠবেন? তাছাড়া, 'জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক'-এর লেখা থেকে রাসবিহারী সরকারের মঞ্চ প্রযোজনা অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট, এমন অপব্যাখ্যারই বা ভিত্তি কোথায়? উভয়েরই মার্কা তো অভিন্ন, আর উদ্দেশ্যও বহিরহ! তাই দুইয়েরই বিজ্ঞাপনে একই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদার আনাগোনা। এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেন, 'বিপ্রবী' সাংবাদিক বিবেকানন্দ (সম্বত্-কারণেই যিনি সম্প্রতি সোভিয়েট দেশ নেহেরু পুরস্কারে—১ম শ্রেণীতে বিভূষিত) মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যেমন উল্লেখ্য, তেমনি 'মিত্রেন'র স্বার্থে, ৬-ই নভেম্বরের যুগান্তরে প্রকাশিত বিশ্বরূপা-বিজ্ঞপ্তি থেকে স্বয়ং বিমল মিত্রের এই অভিমতাংশটিও উদ্ধৃতব্য: "আমার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের নাট্য রূপায়ণে গ্রহণ-বর্জনের সমন্বয় সাধন করে শ্রীরাসবিহারী সরকার যে অসামান্য কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন···তার জন্য···তিনি·· বর্তমানের শ্রেষ্ঠতম নাটককারদের হিসেবে চিহ্নিত হবার যোগ্যতা রাখেন।"

সুতরাং অপসংস্কৃতির এই যৌথ্যকারবারীদের আপাতত ধর্মের কাহিনী শোনাবার যে কোনো চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ বরং গ্রাম-নগরের অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষুদ্র-কিন্তু-নিঃস্বার্থ প্রয়াসগুলির সুস্থ-সবর্ধক প্রচারে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। 'জন-অরণ্য' বা 'মৃগয়া' ছবির প্রগতিশীলতা প্রমাণে বহু কবিতা পত্রে পর্যন্ত কতো প্রবন্ধের আদেখ্যিপনা অথচ মঞ্চের 'রামযাত্রা,' 'বিদ্রোহ-১৭৯৭,' 'বিদ্রোহী চাষাঢ়,' 'তিতুমীর,' 'পাপেট' প্রভৃতি সম্পর্কে একজাতের নাগর বুদ্ধিজীবীরা একেবারেই নির্বাক। এরা জানতেও চায় না যে, নাট্য-আন্দোলনের সচেতন-সংগ্রামী ধারাটিরই অবিরাম আঘাতের পরিবেশে, মূলত ব্যবসায়িক পণ্য চলচ্চিত্র-শিল্পকেও আজ বিদ্রূপের ভণিতা করতে হচ্ছে। কিন্তু নাঁরেট ব্যবসার বাইরে দাঁড়িয়ে জাতির দর্প কৃষকের মুক্তি সংগ্রামকে মঞ্চে তুলে ধরা, পুরাণ-কাহিনীর বাঁকে বাঁকে সংগ্রামী প্রেরণা আবিষ্কার করা, অতীতের ইতিহাস-বিকৃতকারী ইংরেজ-মিত্র সমাজ সেবা ও আজকের পাপেট বুদ্ধিজীবীর বিলাস-বিলম্বময় কেরিয়ারিজ্‌মকে অকাতরে ঘৃণা ছুঁড়ে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে লোক-শিল্পক নাট্যকর্মীদের অবদান অবিস্মরণীয়। আসুন—এবার থেকে এদের কথাই কিছু বেশী করে বলা যাক; 'বহু' ও 'সুধী'—এই উভয় অর্থেরই সার্থক ব্যঞ্জনা ফুটে উঠুক 'মিত্রেন'র বর্ণে বর্ণে!

নির্মল সাহা

স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

আবার সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্পেন। দীর্ঘকাল ফ্যাসিস্ত শাসনে নিয়ত দেশবাসী এবার স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন। ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর মানুষ আশা করেছিল যে দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু রাজা জুয়ান কার্লোস ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা দেশবাসীর সেই দাবিকে অগ্রাহ্য করে সেই পুরনো কায়দায় শাসন চালাচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ফ্যাসিস্ত শাসনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। শ্রমিক-দের জীবনযাত্রার মান য়ুরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নিম্নমানের। দীর্ঘকাল ধরে শ্রমিকরা যেমন প্রশাসন বদলের দাবি তুলছিলেন তেমনি দেশের অন্যান্য শ্রেণীও এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। এমন কি, সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশও এই পরিবর্তন চান। গীর্জার যাজকরা, পর্যন্ত ছাত্রদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পরিবর্তনের দাবি তুলে-ছেন। স্পেনে কমিউনিষ্ট পার্টি দীর্ঘ চার দশক ধরে নিষিদ্ধ। মানুষ আশা করেছিল সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রীদের মত কমিউনিষ্ট-দেরও নতুন প্রশাসন আইনী কার্যকলাপের অনুমতি দেবে। কিন্তু প্রশাসনের একটা অংশ এতে বাধা দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমিউনিষ্ট-সমাজতন্ত্রী-গণতন্ত্রীদের ব্যাপক ফ্রন্ট স্পেনে গড়ে উঠুক—এটা স্পেনের একপ্রভাবশালী পুঁজি-পতি মহলও চায়।

এদিকে সম্প্রতি এক সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয় ১২ই নভেম্বর। এই ধর্মঘটের ব্যাপকতা তাৎপর্যপূর্ণ। এমন কি, অ্যাসটুরিয়াসের রাঁধুনি ধনিরা একদিনের ধর্মঘটে সাড়া দেন। ভিদোতে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেন। দেভিল, কর্দোবার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের সংঘর্ষ হয়। বাসিলিয়া, মাদ্রিদে ধর্মঘটের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে বেরিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিলেন কমিউনিষ্ট, সমাজতন্ত্রী বামপন্থী দলসমূহ ও ট্রেডইউনিয়ন সংস্থা। অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক দাবিও তাদের ছিল।

চিত্রপ্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদমি অব্ ফাইন আর্টসে কয়েকটি শিল্পকলা প্রদর্শনী হয়ে গেলো। এর মধ্যে শিল্পী জীবনলাল প্রেম নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারেন। শিল্পী প্রেমের অন্ধ সাহোরে প্রায় ছ'বছর আগে। পেশায় সাংবাদিক, জাত কবি। নানা রঙিন কাগজ কেটে শিল্পী প্রেম কোলাজ পদ্ধতিকে শিল্প সৃষ্টি করেন। কোলাজের নানা বিচিত্র অভিব্যক্তিকে মনে হয় কোনটা তৈলচিত্র, কোনটা বা টেম্পারার কাজ, আসলে ওগুলো হল রঙিন কাগজের টুকরো সাজানোর এক কৌশল। তাঁর শিল্পের বক্তব্যে ছন্দে, আমেজে রহস্যময়তার এক ছাপ পাওয়া যায়। নৈসর্গিক কাজগুলো সুন্দর। ট্রিক কাজটি একদিকে যেমন নৈসর্গিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে, অন্যদিকে রয়েছে ছন্দময়তা। বার্থ অ্যাণ্ড ডেথ, কৃষ্ণকলা, জেসাস ক্রাই, ফিস পণ্ড, বিদু এক ও দুই, ব্লাক বার্ড মীলেলক্, নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সৈন্নিক কলাকৌশলের স্বাক্ষর। বার্থ অ্যাণ্ড ডেথের মত কাজ যে কোন শিল্পীর গর্ব করার মত। প্রদর্শিত ২৫টি কাজই কম বেশী আকর্ষণীয়।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৬/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৮পর্ণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

১৯শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা। শুক্রবার, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৭ ॥ ৩০ পয়সা

পশ্চিম বাংলার শেষ সংবাদ

প্রো-চেঞ্জাররা নো-চেঞ্জার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের রাজনীতিতে এক প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ঘন ঘন রূপ বদল করছে। এই মুহূর্তের "প্রো-চেঞ্জার" পরমুহূর্তে "নো-চেঞ্জার" হয়ে যাচ্ছেন। আর "নো-চেঞ্জার" হচ্ছেন "প্রো-চেঞ্জার"।

রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় রাজ্যে এখন "নো-চেঞ্জার"-রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সম্প্রতি রাজ্য খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, (প্রশাসনিক পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

শঙ্করবাবুর এই মত পরিবর্তনের পেছনে নেপথ্যে কিছু কারণ ঘটেছে। এক নেতা সরে গেলে তার জায়গায় কে আসবেন, দ্বিতীয় নেতা কে হবেন এসব ব্যাপারে বিদ্যুৎমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী গোষ্ঠীর সঙ্গে শঙ্করবাবুর একমত নন।

অন্যদিকে বিদ্যুৎমন্ত্রীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের তৃতীয় গোষ্ঠী লক্ষ্মী বসুর ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন। কারণ নেতৃত্বের ব্যাপারে লক্ষ্মীবাবু খোলাখুলি মত ব্যক্ত করেছেন বা গণি খান চৌধুরী ও তার সমর্থকরা ভালভাবে নেন নি। লক্ষ্মীবাবুও এখন "নো-চেঞ্জার"।

রাজ্য রাজনীতির বর্তমান অবস্থা টিকে থাকলে নিঃসন্দেহে বলা যায় রাজ্যের প্রশাসনিক পরিবর্তনের আশু কোন সম্ভবনা নেই।

তবে এখানকার রাজনীতি ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন হচ্ছে। তাই প্রশাসনিক পরিবর্তনের ব্যাপারে জোর করে কেউ কিছু বলতে পারছেন না।

জওহরনগরে কয়েকদিন

(প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন)

কি দেখে এলাম জওহরনগরে? এ, আই, সি, সির এরাকার অধিবেশনের বৈচিত্র্য চোখে পড়বার মতো। প্রকাশ্য অধিবেশন না থাকলেও অনুমোদিত সর্শক ছিলেন বেশ কিছু। অমকালো পরিবেশের জন্য যুবকংগ্রেসের নিখিলভারত সম্মেলন অনেকটা দায়ী। নানা রঙের খোয়াক মানা-ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এর সংগঠক ও শ্রোতা। বাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, সিকিম প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটি শুধু প্রথম যোগদানই করলেন না—সরাসরি একেবারে উদ্যোক্তার আসনে। কতোটা কংগ্রেস কমিটি করেছেন, কতোটা সরকারী ব্যবস্থাপনায় হয়েছে, সেই অংশীদারত্বের হিসাব করা দুরূহ, হয়তো নিষ্প্রয়োজনও। সরকারী অফিসার-কর্মী, সরকারী গাড়ীর ছড়াছড়ি। এমনকী বিশেষ প্রেস কার্ড নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ করেছেন আমাদ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর। প্রদর্শনী দেখতে, কাওকারখানা ও সাজসজ্জা দেখতেও চারপাশের শহর-গ্রাম থেকে লোক ভিড় করেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি যৌথভাবে কাজ করায় যে নজীর রেখেছেন, ইন্দিরা গান্ধী তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল আগামী দিনে এক তালে পা ফেলে চলবে কিনা এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এর ভূমিকা ও গুরুত্ব কতোখানি হবে, সেটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সাংগঠনিক বৈচিত্র্যের অনেক সিদ্ধান্তিক অভিব্যক্তি সম্মেলনে হয়েছে অনেকের বক্তৃতায় এই বিবিধের মাঝে ঐক্য মিলন মহান আদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ, আই, সি, সির রাজনৈতিক প্রস্তাবে সমাজবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, অর্থনৈতিক প্রস্তাবে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ ও ২০ দফা কার্যসূচি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা ও বিশ্বের হস্তক্ষেপ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা রয়েছে স্বাধীনতা। নতুন কথা শোনা গেছে, সে কথায় পরে আসছি। যুবকংগ্রেস সম্মেলনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনটে প্রস্তাব ছিল। এছাড়া পরিবার-পরিকল্পনা থেকে পদযাত্রা, গণজাগরণ থেকে খেলাধুলা—এমন নানা বিষয়ে প্রস্তাব বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যুবকংগ্রেস ও এ, আই, সি, সি,—দুই অধিবেশনেই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতির ওপর অনেক সুদৃঢ় ঘোষণা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।

উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বারবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও সঞ্জয় গান্ধীর কীর্তির কথা। যুবকংগ্রেসের দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনে শতকরা ১৯ জন বক্তা সঞ্জয় গান্ধীর অমুঠ সমর্থনে বারবার সোচ্চার হয়েছেন। আর এ, আই' সি, সি,তে শতকরা ২৫ জন বক্তা প্রধান মন্ত্রীর প্রশস্তি দিয়ে ও তাঁর প্রতি আনুগত্য জানিয়ে বক্তৃতার মুখবন্ধ বা পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। দুচার জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেমন শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব বা শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা যুবকদের বক্তৃতা করেছেন। শ্রীযাদবের কণ্ঠে ছিল যুব কংগ্রেসের বলিষ্ঠ কর্মপন্থা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও বুকভরা দায়িত্বের কথা। আর শুক্লাজীর কণ্ঠে যুবকংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্বুদ্ধিত প্রশস্তি ছিল। সমাপ্তি ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যুবরা যুব কংগ্রেসের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছেন। যুব কংগ্রেস নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কাযোর লেজুড় হয়ে থাকবে না, এমন বক্তব্য সঞ্জয় গান্ধী ও অন্য কয়েকজন যুব নেতা রেখেছেন। আশার যুবকংগ্রেস যেই শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে দেশের কল্যাণে কংগ্রেসের কর্মসূচি রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করবে তারও ঘোষণা ছিল শ্রীমতী অম্বিকা সোনীর ভাষণে।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

ওড়িশায় কংগ্রেসী বিরোধের কাহিনী

স্বাধীন রায়

সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ওড়িশাতে নন্দিনী শতপথী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের স্থান নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছেন। কিন্তু এখনও তিনি চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

ওড়িশার অবস্থাটা এখন পশ্চিমবঙ্গের থেকেও জটিল। শ্রীমতী সৎপথী ওড়িশা যাবার আগেই তাঁর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য পদত্যাগ করেছেন। সে পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্যে মারপিট হয়ে গেছে।

শ্রীমতী সৎপথী গোহাটি এ, আই, সি, সি, থেকে ফিরে এসেই মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করলেন। গত ২৭ নভেম্বর রাজভবনে রাজ্যপাল শঙ্কর নারায়ণের সামনে নতুন পাঁচজন মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট পর্যায়ে তোলা হল। মন্ত্রিসভার আয়তন আগের মতো ১৭ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পূর্ণ মন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১২। বলা বাহুল্য যাঁদের পদোন্নতি ঘটেছে তাঁরা অধিকাংশই নন্দিনীর অনুগামী। তাছাড়া শ্রীমতী সৎপথীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিনায়ক আচার্যর হাত থেকে অর্থদপ্তর কেড়ে নেয়া হয়েছে।

ওড়িশার রাজনীতিতে কংগ্রেসের এই যে ঘরোয়া বিবাদ তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ৩৬ বছরের ইতিহাস। ১৯৭৩ সালের ১ মার্চ নন্দিনী সৎপথীর নেতৃত্বাধীন প্রথম মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর ফলে পদত্যাগ করে। তারপরের বছর ৩ মার্চ তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন সি, পি, আই-র সহযোগিতায়। সে সময় ১৪৭ সদস্যক বিধান সভায় কংগ্রেসের আসন ছিল ৬৯টি। সি, পি, আইয়ের সমর্থন ভিন্ন তাঁর পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করাই ছিল অসম্ভব। এদিকে বিজু পট্টনায়ক, হরেকৃষ্ণ মহতাব, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, আর, এন, সিং দেও প্রমুখ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা তখন একযোগে বিরোধী দলে রয়েছেন। শ্রীমতী সৎপথীর সেই ঘোর রাজনৈতিক দুর্দিনের দিনে তাঁকে আগলে রেখেছিল সি, পি, আইয়ের বিধানসভা সদস্যরা।

কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। প্রধান বিরোধী গোষ্ঠি ভারতীয় লোক দলের নীর্ষ নেতারা জেলের হয়ে যান। তাঁদের থেকে ১৪ জন বিধানসভা সদস্য একে একে কংগ্রেসে যোগ দেন। এই অবস্থায় সৎপথী মন্ত্রিসভার টিকে থাকার জন্য আর সি, পি, আইয়ের ওপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন ছিল না।

ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ক্রমশঃ সি, পি, আই থেকে দূরে সরতে থাকে এবং কংগ্রেসের ভেতরে সি, পি, আই, বিরোধী গোষ্ঠি জোর মদত পেতে থাকে এই দলত্যাগী

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার সত্যকার অর্থবহ হয় যখন প্রতিটি নাগরিকের থাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা। ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্গত অর্থ সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বাধীনতা। তাই যুগ যুগ ধরে মানবতাবাদীরা এই ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে গেছেন। অনেক হু'কি নিয়ে দেশবরেণ্যরা স্বৈরাচারী শাসকের বিভিন্ন কাজের প্রতিবাদ করে গেছেন, যেমন রাজা রামমোহন ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ সরকারের নিষেধক প্রেস আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ, এই জঘন্য আইনে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করার সুপারিশ ছিল। অন্যতরে কংগ্রেসের সম্মেলনে ব্যক্তিস্বাধীনতার নাগরিক অধিকারের দাবী করা হয়েছিল। ১৯০১ সালে করাচিতে কংগ্রেস সম্মেলনে বাকস্বাধীনতা, সভা সমাবেশের স্বাধীনতা, শান্তি-পূর্ণ মিছিল করার স্বাধীনতা, ধর্মঘটের স্বাধীনতা, ইত্যাদি সহ বরাজের দাবী করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের লখনৌ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে জহরলাল নেহেরু ধর্ম-হীন ভাষায় বলেছিলেন, "যে সরকার মানুষকে বিনা বিচারে আটক করার ওপর নির্ভরশীল সেই সরকারের এক মিনিটও থাকার অধিকার নেই! ভারতের জাতীয় ইতিহাসই হল মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার সব ঘোষণা।

সম্প্রতি দিল্লীতে ও ভারতের নানা জায়গায় ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটি উঠছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই জাতীয় কনভেনশনে কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বাদে প্রায় সমস্ত বিরোধী দল, বিখ্যাত আইন জীবী লেখক প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ঐ কনভেনশন মনে করে যে, জরুরী অবস্থার পর নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার বিঘ্নিত হয়েছে। ঐ কনভেনশন থেকে ভারতত্যাগী একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮ই নভেম্বর কলকাতায় পিপলস্ ইউনিয়নের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় সংগঠন কংগ্রেসের নেতা অশোককৃষ্ণ দত্তের বাড়িতে। ঐ কনভেনশনে সি পি আই ও কংগ্রেস বাদে সি পি এম, ফরওয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন কংগ্রেস এস ইউ সি সহ পনেরোটি বিরোধী দল ও গোষ্ঠী, বিশিষ্ট লেখক, শিল্পী ও আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ কনভেনশনে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচটি দাবি তোলা হয়। তন্মধ্যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি রয়েছে।

২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে পিপলস ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংস্থার সভা হয়ে গেছে। পিপলস ইউনিয়নের আহ্বায়ক প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল মোষবার এক সাক্ষাৎকারে সমিতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জানান যে পিপ-লস ইউনিয়ন আগামী ১০ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী মানবাধিকার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করবে। ঐ দিন ভারতব্যাপী গণধরণার অভিযান, সভাসমিতি অনুষ্ঠান হবে। কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধান দাবি হল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।

ওড়িশায় কংগ্রেসী রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লোক দল সদস্যদের কাছ থেকে। স্বভাবতই এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে শ্রীমতী সংপথী। কারণ তিনি এবং তাঁর স্বামী বর্তমানে কংগ্রেসী এস. পি. দেবেন সংপথী উভয়েই একদা সি. পি. আই. এর কর্মী ছিলেন। শ্রীমতী সংপথীর কাকা সাহিত্যিক ভগবতীচরণ পানিগ্রাহী ওড়িশায় কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

রাজনৈতিক মতবিরোধের এটাই গোড়ায়। সেখান থেকে বিরোধ আর একটু বিস্তৃতি পেয়ে গ্রাস করে যুব সংগঠনকে। ওড়িশায় যুব কংগ্রেস আছে। কিন্তু তার সমান্তরালে আরও দুটি সংগঠন গড়ে উঠেছে—যুব ছাত্র সংগ্রাম সমিতি এবং ভাগ্যমান লোসালিষ্ট কোর। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সঞ্জয় গান্ধী যেমন জাতীয় নেতা বলে প্রচারিত হচ্ছেন তেমনি রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী নেতা ও নেত্রীদের সন্তানরাও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে উঠে আসছেন। এব্যাপারে সর্বাগ্রে নাম করা যায় কমলাপতি ত্রিপাঠী এবং নন্দিনী সৎপথীর। শ্রীমতী সৎপথীর পুত্র ওমাপথ সৎপথী দুটি পাল্টা সংগঠনের নেতা। তাঁরই নেতৃত্বে বিনায়ক আচার্যের জনসভায় হামলা হয়েছিল।

এই অবস্থার মধ্যেও এ. আই. সি. সি. থেকে ফিরে শ্রীমতী নন্দিনী যেভাবে মন্ত্রিসভা ভেঙে দাঙ্গালেন তাতে তাঁর সাধসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে মন্ত্রিসভায় এই রদবদল দলে কোন শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বিনায়ক আচার্য, বিধায়ী মন্ত্রী লক্ষণ মল্লিক এবং বিধান সভার অধ্যক্ষ ব্রজমোহন মোহান্তি সকলেই একথা প্রচার করছেন যে, শ্রীমতী সৎপথী দলের অবিকাংশ সদস্যের আস্থা হারিয়েছেন। তাঁরা পুনরায় দিল্লীতেও দরবার করছেন। ফলে দলের মধ্যে নন্দিনী বিরোধী হাওয়া এখনও পুরো দমেই বইছে।

এদিকে বিজু পট্টনায়ক এবং হরেকৃষ্ণ মহতাব জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জরুরী অবস্থাকে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁদের এই যৌথ সার্টিফিকেট লোক দল অনুগামীদের কংগ্রেসের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করবে। কিন্তু তাতে কংগ্রেস শক্তিশালী না হয়ে বিধায়ীনই হবে বেশী। নন্দিনীর বিরোধী গোষ্ঠী তাতে আরও মদত পাবে। আর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচাতে শ্রীমতী সৎপথীকে আবার আসতে হবে সি. পি. আইয়ের কাছে। অন্ততঃ ভুবনেশ্বর গুপ্তের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তিনি ভুবনেশ্বরের এক জনসভায় জানিয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেটা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ঠিকই কিন্তু দিল্লীতে বসে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন হতে পারে না। বিধানসভাই গণতান্ত্রিক উপায়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করবেন।

এই অবস্থার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ওড়িশা সফরে আসছেন ১১ ডিসেম্বর। এবং তাঁর কাছ থেকেই বোধ হয় শেষ বিধানটি শোনা যাবে।

আরবী শিক্ষক নেই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে কাঁপড়দা ডিউক স্কুলে দীর্ঘ বারো বছর ধরে আরবী শিক্ষা দেওয়া হতো। আরবীতে ছাত্রও আছে প্রচুর। অথচ হঠাৎ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন যে আরবী এখান থেকে হঠাতে হবে।

আরবী শিক্ষক অন্যত্র যাওয়ায়ই এ যোগ এসে গেছে। গত বছর থেকে আরবী শিক্ষকের সন্ধান না করে আরবী শিক্ষকের বদলে অন্য বিষয় পড়াবার জন্য শিক্ষক চাই বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কাগজে। ফলে একজন শিক্ষক নেওয়া হলো ম্যানেজিং কমিটির বেনামীতে।

এখন আরবীর ছাত্ররা দাবী করছেন শিক্ষকের। হাতের সেকেণ্ডারী বোর্ড বলছে শিক্ষক যখন নেওয়া হয়েছে তখন নতুন ভাবে কিছু বলতে পারব না। সুতরাং আরবী পড়াবার যৌগ্যতা সাধেবের পড় হবি অসম্ভব।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ছাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা সাধেদুল হক চৌধুরী দেরা করে স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য আমার কিছু করার নেই। এম, এস, এ, আনোয়ার আলি সাহেবও মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন বলে শুনেছি। নিকটবর্তী বাঁকুড়া স্কুলের সম্পাদক আহমদ হোসেন মণ্ডল এম, পি, এ ব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ এবং তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দর্পণের প্রতিনিধি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আরবী শিক্ষক নিয়োগের কথা। তিনি চটমটে বলেছেন, যে তিন চল্লিশজন ছাত্র আরবী পড়তে পারছে না তাদের আরবী সাবজেক্ট সমেত তারা অন্য স্কুলের পথ ধরুক না। এখানে আরবী থাকবী হবে না।

ভারত চীন মৈত্রী সমিতি

গত রবিবার, ২১শে নভেম্বর বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী এবং নাটক পরিচালকদের এক সভায় ভারত ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান হয়। এই দেশের জন-গণের হৃদয়হান ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। তাঁ বিশ্বর বন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা থেকে ভারত চীন মৈত্রী সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়েছে। কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রবীন্দ্র শিক্ষা বৈদেশী দেবী এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

মিস্টির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮·০০
পৃথিবীর বয়স	১৪·০০
জীবন নিরবধি	১৬·০০
ঘরে কেরারদিন	৫·০০
দিবস বিভাবরী	৫·০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬·০০
আলোর সহোদর	৪·০০
পারাবারের তীরে	১০·০০

শুকসারী ॥ ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী

এবারের বিধান সভা

কংগ্রেসী সদস্যরা অভিযোগে সোচ্চার

(দর্পণের প্রতিনিধি)

রাজ্য বিধান সভার (দ্বিতীয়) নীতকালীন অধিবেশন হয়ে গেল। বিধানসভার এই বছরকালীন অধিবেশন বসে ২৬ নভেম্বর। এবারকার বিধানসভা অধিবেশনে উপস্থিতির হার গতবারের তুলনায় বেশী ছিল। এই অধিবেশন ডাকার উদ্দেশ্য হল, ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী বিলটিকে রাজ্য বিধানসভায় পাশ করিয়ে নেওয়া।

২৬ নভেম্বর বিধানসভা অধিবেশন বসে দুপুর একটায়। সভার শুরুতেই উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। শাসক দলের সদস্য শ্রীগৌতম চক্রবর্তী সভার নবীনীয় পুলিশ-জোতদারের মিলিতভাবে কৃষকদের উপর আক্রমণের ঘটনার উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন, সেই সময় তাঁর ইবলের অপর কিছু সদস্যের উত্তেজিত চীৎকারে শ্রীচক্রবর্তীর পক্ষে সক্তব্য রাখা সম্ভবপর হয় নি। চীৎকারের মধ্যে শোনা যায়, মন্ত্রিসভার বিবৃতি চাই।

প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুনীতি চট্টরাজ বলেন, বীরভূম জেলার ধরা দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে বীরভূম জেলাকে খরাক্লিষ্ট অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হোক। আমরা সরকারের কাছ থেকে অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিন্তু কোনটাই বাস্তবায়িত হয় নি। তাই এবার প্রতিশ্রুতি নয় কাজ চাই। সুনীতিবাবুর বক্তব্যকে সমর্থন করেন দুলাল ইসলাম এবং অজিত ব্যানার্জী। গৌতম চক্রবর্তী বিধান সভার অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সি পি আই বিধানসভার অভ্যন্তরে দুটি পুস্তিকা বিলি করছে, যা বিধানসভার মর্যাদা হানিকর।

নারায়ণ ভট্টাচার্য (কং) বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে কলকাতার যে সাংবাদিক দল জলপাইগুড়ি গিয়েছিলেন, তাদের প্রতি অশালীন আচরণ করা হয়েছে। এমন কি পুলিশ তাদের গাড়ি তল্লাশী করেছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য পুলিশ মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি চাই এবং এই ঘটনার জন্য বিভাগীয় তদন্ত চাই এবং দোষী আমলাদের শাস্তি চাই। কৃষ্ণকুমার শুক্লা বলেন, এই ঘটনার বিচার চাই। সভার সদস্যদের মিলিত চীৎকারে নারায়ণবাবুর বক্তব্য আর শোনা যায় না। শুধু শোনা যায়, বিচার চাই, বিচার চাই।

বিধানসভা যখন উত্তেজিত সভ্যদের মিলিত চীৎকারে উত্তপ্ত, তখনই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের প্রবেশ। তিনি সভার এই পারিস্থিতি দেখে, উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা এখানে মিলিত হয়েছি একটি গুরুত্বর বিষয়ে আলোচনার জন্য। বিষয়টি ৪৪তম সংবিধান সংশোধন। তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন বিলটি উত্থাপন করার জন্য।

অতঃপর বিলটি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। তারপর আলোচনায় অংশ নেন সি পি আই সদস্য বিশ্বনাথ মুখার্জী, পংকজ ব্যানার্জী (কং), ডাঃ জয়নাল আবেদীন (কং), ভোলানাথ সেন (কং) এবং নির্মল সদস্য প্রীকাশীকান্ত মৈত্র। শ্রীমৈত্র তারস্বরে সংশোধন বিলটির বিরোধিতা করে বলেন,এই বিল কার্যকরী হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে না বরং এই বিলে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা আছে। সি পি আই সদস্যা শ্রীমতী ইলা মিত্র যখন তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন (৩০।১১।৭৬) তখন নির্মল সদস্য কৃষ্ণ শুক্লা বলেন, কংগ্রেসকে সমালোচনা না করে সংবিধান সংশোধনের ওপরে বক্তব্য রাখুন। পংকজ ব্যানার্জী (কং) বলে ওঠেন, কাজ না থাকলে কি করা যাবে।

আলোচনায় অনেক সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। অটোমেটিক রেকর্ডারে দেখা গেল যে, জনৈক কংগ্রেস সদস্য বিলটির বিরোধিতা করেছেন। সদস্যরা মিলিতভাবে তাঁকে চেপে ধরলে তিনি বলেন, আমি ভুল বোতাম টিপেছি। সভার মোট উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ২৮১ জন। ৫ জন সদস্য এই বিলের বিরোধিতা করেন। অবশ্য আর এস পি-র তিনজন এবং সংগঠন কংগ্রেসের একজন সদস্য এই বিলের আলোচনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক আউট করেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একমাত্র কাশীকান্ত মৈত্র বিলটির বিপক্ষে ভোট দেন। বিলটি বিধানসভার অনুমোদন পায় তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ৩০,১১,৭৬ (মঙ্গলবার)। সরকারীভাবে ১৮১—২ ভোটে বিধানসভায় সংবিধান বিষয়ক বিলটি পাশ হয়ে যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅম্বিকা পাঁজা বলেন, এমন কোন আইন থাকা উচিত নয় যা পরিবর্তন করা যাবে না। সরোজ রায় (সি পি আই) শরদিন্দু সামন্ত (সি পি আই) পরেশ গোস্বামী (সি পি আই), সুকুমার ব্যানার্জী (কং), পরেশ চাকি (কং) প্রমুখ সংবিধান বিষয়ক বিতর্কে অংশ নেন।

তপশীল জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীমনোরঞ্জন প্রামাণিক বিধানসভায় একটি সুপারিশ করেন। পরে শ্রীপ্রামাণিক বিধানসভার কমিটি হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সুপারিশটি হল, তপশীল এবং তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যে যারা এতদিন সুযোগ সুবিধা পেয়ে এসেছে তাদের জন্য আর কোন সুযোগ নয়। এবার সুযোগ তাদেরই পাওয়া উচিত যারা এতদিন অবহেলিত হয়ে এসেছেন।

মঙ্গলবার বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য নারায়ণ ভট্টাচার্য অধ্যক্ষকে বলেন, বিধানসভার সদস্যদের জন্য কোন খেলা-ধুলার ব্যবস্থা নেই। অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার আশ্বাস দেন যে তাঁরা বিধানে ইডেনে মুখ্যমন্ত্রীর দল বনাম অধ্যক্ষের দলের এক প্রদর্শনী ক্রিকেটের ঘোষণা করেন।

বিধানসভার অধিবেশনের শেষ দিনে ধরা পরিস্থিতির ওপরে ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅমরকৃষ্ণ সাহোদী বক্তব্য রাখেন। তারপর বিভিন্ন জেলার ধরা পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন, বিধনাথ মুখার্জী, শম্ভু ঘোষাল (কং), সুবল হেমব্রম, কৃপাল পাণ্ডা, অশ্বিনী রায়, নিত্যানন্দ ঘোষ, শ্রীমতী গীতা মুখার্জী প্রমুখ।

রাজ্য মন্ত্রীদের মধ্যে বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়, জ্ঞানসিং সোহন পাল, অজিত পাঁজা, জয়নাল আবেদিন, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, গোবিন্দ নস্কর, গোপালদাস নাগ প্রমুখ।

আজ বিধানসভার সমস্ত সদস্য একযোগে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করেন ধরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার নির্দিষ্ট সময়সীমা ৩ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ৪ ঘন্টা করার জন্য, কিন্তু অধ্যক্ষ তাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। আজ বিধানসভায় সদস্যদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

আজ বিধানসভায় পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান ১৯৭৪-৭৭ এর পাবলিক একাউন্টস এর খসড়া পেশ করেন। ট্রাম কোম্পানি অধিগ্রহণ নিয়েও আলোচনা হয়।

চীন-সোভিয়েট সম্পর্কে পরিবর্তন আসন্ন ?

কালিদাস কুণ্ডু

মাওবিরোধী চীনের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সেটি হচ্ছে এই যে, চীন-সোভিয়েতের সম্পর্ক চিরতাবস্থায় থাকবে না অচিরেই তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিবর্তনের রাঁক নেবে।

চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এযাবত পর্যন্ত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত এমন কোন ঘোষণা রাখেন নি কিংবা আভাষ ইঙ্গিত দেননি যে, এই মুহূর্তেই সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলা যেতে পারে। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে অভাবনীয় কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে সুদূরপ্রসারী।

পঞ্চাশের দশকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও পার্টিগত ভাবে চীন-সোভিয়েত মৈত্রী-বন্ধন একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পক্ষে ছিল নিদারুণ আতঙ্ক ও আশঙ্কার বিষয়, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষে এই মৈত্রীবন্ধন ছিল পরম রক্ষাকবচের মতো। জন্মানন্তর মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেসের কুখ্যাত 'শক্তিশূন্যতার অঞ্চ' মধ্যপ্রাচ্যের মৈত্রী সম্বন্ধ আরব দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। লেবানন, ইরাক প্রভৃতি দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ, অস্ত্রপ্রবেশ ও আগ্রাসী নীতি বিরুদ্ধে চীন-সোভিয়েত মৈত্রী ছিল শান্তিকামী বিশ্বমানবের পরম বলিষ্ঠ নির্ভর।

এশিয়া ভূখণ্ডে চীনকে পরিবেষ্টন করার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, পাকিস্তান ও জাপান প্রভৃতি দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে বিশ্বযুদ্ধের বিপদকে ঘনীভূত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সেদিন চীন-সোভিয়েত ছিল দৃঢ়বিহ্ব আত্মা।

মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে নাটকীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধের প্রযোচনা সৃষ্টি করতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে সোভিয়েতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ স্বয়ং পিকিং এসে উপস্থিত হন মাও সে তুংএর সঙ্গে গভীর শলা পরামর্শের জন্য। ষ্ট্যালিন পরবর্তী সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রথম দলকে এই ভাবে গড়ে উঠেছিল চীন-সোভিয়েত বন্ধুত্বের যে সমুচ্চ সৌধ ইতিহাসের পরিহাসে ক্রুশ্চেভের আমলেই তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়লো সেই সৌধ।

ষাটের দশকের প্রারম্ভ থেকেই চীন-সোভিয়েতের সম্পর্কে ফাটল ধরতে থাকে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত মতান্তর ক্রমশ মনান্তরে পরিণত হতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিতর্ক বিদ্বেষের পথ সপ্রসারিত করতে থাকে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রবলবেগে অবনতির দিকে ধাবিত হ'তে থাকে প্রথমদিকে সোভিয়েত সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা' পত্রিকায় "Blood is heavier than water"—মন্তব্যটি ছিল চীনের অনুকূলে। ক্রমশ উত্তাপ বাড়তে থাকে এবং একে অপরের প্রতি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করে। সোভিয়েত বর্তৃক চীনকে প্রদত্ত সমস্ত ধরণের কারিগরী, বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাহার হয়। অচিরেই দুই যুবদাকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে চরম বৈরিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে চীন-সোভিয়েতের বৈরিতার প্রতিক্রিয়া সমসাময়িক ইতিহাসকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। দুনিয়ার কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দুটি বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একটি ধারার নেতৃত্ব রইলো সোভিয়েতের কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অন্য ধারাটির হাইকম্যাণ্ড রূপে স্বীকৃত

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মাও-উত্তর চীনের শ্রেণী সংগ্রাম

করিম এসক

চু-এন-লাই-এর মৃত্যুর পরে পুঁজিবাদীরা যখন ক্ষমতায় ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিল তখন মাও-উত্তর যুগে শ্রেণী সংগ্রাম যে তীব্রতর হবে তা তো জানা কথা। শ্রেণীদ্বন্দ্বের এই প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদী শ্রেণী সর্বহারার চেয়ে দুর্বলতর। পুঁজিবাদী শ্রেণী যে কেবল উৎপাদনোপায়ে তার শক্তির ভিত হারিয়েছে তাই নয়, নির্ভ মাও চি, তিন শিআও এবং অন্যেরা তে সিয়াও পিংয়ের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে কোটি কোটি শ্রমিকের সমাবেশ হয়েছিল তারা কেবল শ্রেণী সংগ্রামের অগ্নিপরিক্ষায় উত্তীর্ণই হয় নি, তারা সর্বহারার একনায়কত্বের তাৎপর্য বুঝতে পেরে আজ প্রতিটি সাধনাত্মক আমাদে, কারখানার এবং সামরিক ইউনিটে তাদের ন্যায্য স্থান অধিকার করছে।

শ্রেণী সংগ্রাম অথবা ত্রিনির্দেশ—এর কোনটিকে মূল প্রশ্নরূপে গ্রহন করতে হবে, একে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক সংগ্রাম আজ উঠেছে। ত্রিনির্দেশ জারি করেছিলেন স্বয়ং মাও। তার বিচার্য বিষয় ছিল উৎপাদন এবং শিল্প, কৃষি, সামরিক বাহিনী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকরণ। তে মূল সংযোজক বিষয় অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম থেকে ত্রিনির্দেশকে পৃথক করে শ্রেণীসংগ্রামকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ত্রিনির্দেশকে সামনে এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এখন থেকে ত্রিনির্দেশই হবে সংযোজক বিষয়। এর সাহায্যে তে মাও সে-তুংয়ের নির্দেশকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে-নির্দেশের বক্তব্য ছিল শ্রেণীসংগ্রামকে মূল সংযোজকরূপে গ্রহন করা। অর্থাৎ তিনি লাল পতাকার দণ্ড দিয়েই লাল পতাকাকে আঘাত করে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে—সমাজবাদী দেশে এই যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা শোনা যায় এর তাৎপর্য কি? ১৯৪৯ সনের পরে উৎপাদনোপায়ের মালিকেরা অর্থাৎ পুঁজিপতি ও জমিদারেরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তার পরে পুঁজিবাদীরাই বা কোথায় ছিল আর তাদের দ্বন্দ্বই বা হয়েছিল কাদের সঙ্গে? ১৯৫৪ সনে মাও বলেছিলেন, "একদিকে আমলা শ্রেণী এবং অপর দিকে শ্রমিক তৎসহ গরিব এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত কৃষক তীব্র ভাবে পরস্পর বিরোধী। এদের নেতৃস্থানীয় যারা পুঁজিবাদের পথিক হচ্ছে তারা পুঁজিবাদী অংশে পরিণত হয়েছে বা হচ্ছে এবং শ্রমিকের রক্ত শোষণ করছে। এরাই হচ্ছে বর্তমান সংগ্রাম অর্থাৎ বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু।"

দলের ভিতরকার পুঁজিবাদী পথিকেরা যেমন চু-এন লাইয়ের মৃত্যুর পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নির্ভুল রায় উলটে দেবার চেষ্টা করেছিল, তেমনি দলের ভিতরকার পুঁজিবাদীরা হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা করবে। চীনের তীব্রতম শ্রেণীসংগ্রামের জন্য সব প্রস্তুত। এর ফলাফলের উপর নির্ভর করবে কেবল চীনের ভাগ্য নয়, আগামী কয়েক দশকে সারা মানবজাতির ভাগ্য।

এমা একটি নীতির কথা। যদি বলতে হয় যে সমাজে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং মাও কোন আপোষের প্রশ্রয় দেন নি তবে তা হল শ্রেণীসংগ্রাম। বেবেল এবং লাইবনেখ্‌টের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কস বলেছেন:

"প্রায় ৪০ বছর যাবৎ ইতিহাসের অব্যবহিত চালিকা শক্তিরূপে আমরা শ্রেণীসংগ্রামের উপর জোর দিয়েছি, বিশেষত আধুনিক সামাজিক বিকাশের চাবিকাঠি হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সর্বহারার মধ্যেকার শ্রেণীসংগ্রামের উপরে। অতএব যারা আন্দোলনের মধ্যে থেকে শ্রেণী-সংগ্রামের নাম কেটে দিতে চায় তাদের সংগে আমাদের সহযোগিতা অসম্ভব।"

লেনিনও এই তত্ত্ব সমর্থন করতেন এবং লিখেছেন যে, প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রেও এই তত্ত্ব প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, "সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ শ্রেণীসংগ্রামের অবসান নয়, বরং নতুন রূপে তার চলতে থাকা। সর্বহারার একনায়কত্ব হল বিজয়ী এবং ক্ষমতাসীন সর্বহারার দ্বারা পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম।"

নিউ মাও চি-র সঙ্গে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক লড়াই করতে গিয়ে মাও সে-তুং বলেছেন যে,চীনের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। "সমগ্র ঐতিহাসিক জুড়েই শ্রেণী বিরোধ, সর্বহারা এবং পুঁজিপতিদের মধ্যবর্তী শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমাজবাদী পথ ও পুঁজিবাদী পথের অস্তিত্ববিরোধ চলতে থাকে। আমাদের দলের এই মৌলিক মতাদর্শ এবং কর্মধারা ভুলে গেলে আমরা বিপথ চালিত হব।"

তেংয়ের মত পুঁজিবাদী পথিকেরা যখন শ্রেণীসংগ্রামকে অবদমিত করতে চেয়েছিলেন তখন মাও বলেছেন, "শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রামের কথা কখনো ভুলো না। স্থায়িত্ব এবং ঐক্যের অর্থ শ্রেণীসংগ্রামকে কেটে দেওয়া নয়। শ্রেণী-সংগ্রাম মূল চাবিকাঠি এবং অন্য সব কিছু তাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।"

তে এবং তার ছোট উপদলের পুঁজিবাদী পথিকেরা তা মনে করতেন না। তারা মনে করতেন উৎপাদিকা শক্তিগুলিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইজন্য তারা বিলাপ করেছে, "উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয় নি।" বক্তব্য অবশ্য এ নয় যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ প্রয়োজন নয়। কিন্তু প্রশ্ন এবং সেই হেতু দ্বোদ্ধা মতপার্থক্য—কী ভাবে? উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, না তাকে বাদ দিয়ে?

মাও সে তুং জবাব দিয়েছেন, "শ্রেণীসংগ্রাম হল মূল চাবিকাঠি এবং উৎপাদিকা শক্তিকে কাজে লাগানো শ্রেণী-সংগ্রামের উপরে নির্ভরশীল।"

আনশান সনদ

শ্রেণীসংগ্রাম কি ভাবে চালানো হয় এবং রাষ্ট্রীয় কারখানায় সর্বহারার একনায়কত্বকে কি ভাবে রূপ দেওয়া হয়? আনশান লৌহ এবং ইস্পাত কোম্পানীর সনদ এ বিষয়ে পথ নির্দেশ দিয়েছে।

১। রাজনীতিকে নেতৃত্বে রাখো।

২। দলের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করো।

৩। শক্তিশালী গণ-আন্দোলন চালাও।

৪। উৎপাদক শ্রমে দলকর্মীদের অংশগ্রহণ প্রবর্তন করো।

৫। পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ প্রবর্তন করো।

৬। পুরনো আইন কানুনের সংস্কার করো।

৭। দলকর্মী এবং প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে শ্রেণীগত সংহারাধিতা বিকশিত করো।

৪। প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবসাধনে আত্মনিয়োগ করো।

সনদ-বিধৃত শক্তির এই সম্পর্ক অন্যত্র কারখানায়ও ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো শ্রমিকেরা কারখানা পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব পায়নি। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর সভাকক্ষে শ্রমিক-দের দাবির ছাপ পড়ছে। এই সনদ তে এবং তার সহ-কর্মীদের চোখের বালি ছিল। শ্রমিকদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তার ভ্রমসংশোধন আন্দোলনের মাধ্যমে তে সনদকে বদলাতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারা ফেটিয়ে-ফেলা কিছু নিয়ম-কানুনের পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন। এর দ্বারা শ্রমিকদের সৃজনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। তে চেয়েছিলেন ঐগুলিকে ফিরিয়ে এনে শ্রমিকদের দুর্বল করতে। শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা শ্রমিকেরা যা লাভ করেছিল তা তিনি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

মূল চাবিকাঠি রূপে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের যে আওয়াজ তিনি তুলেছিলেন তার উদ্দেশ্য হল তার এই তত্ত্ব যে, চীনের প্রধান বিরোধ পুঁজিবাদ এবং সর্বহারার মধ্যে নয়—এই বিরোধ হল "অগ্রসর সমাজবাদী রাষ্ট্র এবং পশ্চাৎপদ উৎপাদন শক্তির বিরোধ।" সেই জন্য তিনি রুশি, শিল্প, জাতীয় প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণের ডাক দিলেন। সেই জন্য তিনি ঝড়ের বেগে কারিগরী শিল্প গড়ার উপরে জোর দিলেন। অর্থ-নীতিকে হুকুমদারি দিয়ে রাজনীতিকে তিনি মঞ্চের বাইরে ঠেলে দিলেন। আটজনের যে মডুলি-প্রগ্রা প্রবর্তিত হয়েছে তাতে পুঁজিবাদীদের সুবিধা এবং অধিকার খর্ব হবে। এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওরুলাভের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাই যে উৎপাদন বাড়ানে এই মৌলিক তত্ত্বে তে আস্থা স্থাপন করলেন না।

শিল্পের আধুনিকীকরণ শ্রমিকস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্রের প্রবর্তন করে বেকারি এবং দারিদ্র্য বাড়ানো হয়েছে। সর্বহারার কর্তব্য হল উৎপাদন-শক্তির আধুনিকরণ। কিন্তু শ্রমিক তা করবে নিজের মত করে এবং স্বার্থের সংগে সংগতি রেখে। এ এমন ভাবে করতে হবে যাতে পুঁজিবাদীরা দুর্বল হয় এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা খর্ব হয়। এর ফলে শ্রমিকদের যাতে দুঃখ কষ্ট না বেড়ে, সমৃদ্ধি বাড়ে। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণী যেন বিভিন্ন এবং অসংগঠিত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়।

তে সিয়াও পিংয়ের আধুনিকীকরণের ধারণা চীনা জনসাধারণের একটি মূল্যবান জিনিস নষ্ট করতে চেয়েছিল —তা হল আত্মনির্ভরতা। তেংয়ের আধুনিকীকরণের অর্থ হল পশ্চিম থেকে যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্র আমদানি। অন্য কথায় তিনি আশা করেছিলেন পুঁজিবাদ সমাজবাদকে কিনিয়ে করে দেবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বাণিজ্য এবং অর্থসাহায্যের দ্বারা সমাজবাদ এবং সর্বহারার একনায়কত্বকে দুর্বলই করে থাকে।

তেংয়ের পরাজয়ের অর্থ সংগ্রামের শেষ নয়। কারণ যে দেশের আট-তলার মডুলি-প্রথায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পুঁজিবাদী অধিকারের উৎস, কায়িক শ্রমের চেয়ে মস্তিষ্কের শ্রমের অধিক মান, শহর এবং গ্রামের পার্থক্য এখনো বর্তমান। সেখানে মৌল চাবিকাঠি হিসেবে উৎপাদন বিকাশ ও আধুনিকীকরণের চেয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে আরো ব্যাপক আকারে গ্রহণ করতে হবে।

টাংশানের খনি এলাকা যখন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়, চেয়ারম্যান তখনও জীবিত। এই ভূমিকম্প চীনকে ঐক্য-বদ্ধ করল এবং এক মুক্তি সংগ্রামের মত মানুষের উদ্যোগ এবং সৃজনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাল। আওয়াজ তোলা হল "মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবে; যত জোর ভূমিকম্প তত জোরদার আমাদের কাজ"। সমুখ সারির দলকর্মীরা বলল, "নিরাপত্তা অন্যদের দিয়ে বিপদ রাখব আমরা নিজেদের জন্য"। কয়েক দিনের মধ্যে রেল লাইন মেরামত হয়ে গেল বিধ্বস্ত খনি থেকে কয়লা উঠে এল; এবং কাজ-খানার কাজ আবার শুরু হল।

পুঁজিবাদীরা আগেকার মত আবার ফিরে আসতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যে শ্রমিকের সংগ্রামী মনকে ভূমিকম্পও নোয়াতে পারে না, পুঁজিবাদী তা পারবে কি?

বাংলার নবজাগৃতির স্বরূপ ও রবীন্দ্রমানস (৩)

কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

ভারতে ইংরেজ শাসনের যে প্রতিক্রিয়া সাধারণ শিল্পকর্মে দেখা গেল তা হল দেশীয় শিল্পকলার অবনমন ও তাদের অনুগ্রহজীবনের চাহিদায় শিল্পবস্তুতে য়ুরোপীয় প্যাটার্ন ও কর্মের (রুল রীতির) প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের শেষভাগে রচিত কয়েক জন ইংরেজের রচনায়

C. D. Halifax এর Pottery and Glass : Punjub (1892). F D. Maclagan এর Gold and Silver work. Punjub (1890) E. W. Collin এর Report on the Existing Arts and Industries of Bengal. (1890)

প্রভৃতিতে একথার সাক্ষ্য রয়েছে। ২৯ লেখকরা স্পষ্টই বলেছেন সে এই সময়কার শিল্প অধিকাংশই ছিল নীচুমানের নকল (bad copy) আর ভাল নকল হলেও তার মধ্যে দেশীয় শিল্পকলার প্রাণধর্ম রূপটি পাওয়া যেত না। ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্যতম কুফলই হল ভারতীয় জীবনচর্চার বদলে বিলাতী রীতির অন্ধ অনুসরণ। এটা সমস্ত বিদেশী শাসনেই দেখা যায়। "One of the harmful effects of a foreign rule is the imposition on conquered peoples of the ideals of the conquerors, and the newly created Indian "burgeoisie" showed itself during the later half of the century extremly ready to accept European standards and to pour scorn on everything Indian.....To follow European fashions was considered the hallmark of enlightment. ৩০ এই য়ুরোপীয়ভাবে ভাবিত হওয়াই ১৯শতকের "ভদ্রলোক" বা "বাবু" শ্রেণীর কাছে সংচেয়ে উন্নত, অনুকরণের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শিক্ষা, ভাষা, আচার কাহারা —সাবিক সংস্কৃতিই "ইংরেজী" হয়ে ওঠার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। ইংরেজী শিক্ষিত রঙ্গলাল-মধুসূদন কাব্যে প্রাচীন ধারা নাকচ করে য়ুরোপীয় রীতি গ্রহণ করলেন। গদ্য সাহিত্যে রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম আনলেন ইংরেজী যুক্তিনাদ ভিত্তিক প্রবন্ধ সাহিত্য। কাহিনী রচনায় মধুসূদন-কাব্য-বিভাসুন্দরের বদলে য়ুরোপীয় রোমান্সে ও নভেল আনলেন বঙ্কিম। প্রাক্ ইংরেজ যুগের ১৮শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কোন প্রভাবই যে উনিশ শতকী সাহিত্যে পড়েনি তার কারণও এই ইংরেজী মানসিকতা। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন "অন্নদামঙ্গলের ভাষা ও ছন্দের কোনরূপ খাস্তির বাখলে মাইকেল মেঘনাদবধ রচনা করতেন না, এবং প্রথম কাহিনীর কোনরূপ খাস্তির রাখলে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতেন না। মিল্টন এবং স্কট যাদের গুরু তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁষবার অধিকার ছিল না।" ৩১ এটা বাংলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য যে ঐ অনুকরণের যুগে মধুসূদন এবং বঙ্কিমের মত প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর অসামান্য মৌলিক প্রতিভা সত্ত্বেও স্কটও সেক্ষপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর সমকালীন চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন "দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল উহা স্কটের আইবান হো পড়িয়া লিখিত" (প্রবাসী। আষাঢ় ॥ ১৩০৪)। য়ুরোপ সমাজপতির মন্তব্য—"আমি উহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। (কালীনাথ দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র)। বঙ্কিম নিজেই তাঁর শ্রেষ্ঠতর রচনা লণ্ডনে স্বীকার করেছেন, "কপালকুণ্ডলা" লেখার সময় সেক্ষপীয়র বড় বেশী পড়িতাম।" (কালীনাথ দত্ত : বঙ্কিমচন্দ্র) কারণ কালীনাথ দত্ত বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী রচনাকালে তাঁর ঘরে 'অথেলো' নভেল সমূহ দেখেছিলেন বলেছেন।

প্রমথ চৌধুরী মশাই আধুনিক সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ধারা থাকেনি বলে খুশী হয়েছেন, কিন্তু একটা কথা ভুলে গেছেন যে ইংরেজী শিক্ষা ব্যতিরেকেও রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৮) তাঁর টপ্পা গীতিকবিতে মননশীল, মার্জিত প্রেমের মহিমা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হবার কিছু নেই। এ কালের মননশীল লেখকের মতে—"নিধুবাবুর টপ্পায় প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মননশীলতা। এই মননশীলতা তাৎকালিক নাগরিক জীবনের ফল। এইখানেই টপ্পা আধুনিক। ইহা প্রেমের কবিতা বটে, কিন্তু ভাবসর্বস্ব সরল ও কোমল কবিতা নহে, ইহা জটিল, চিন্তায় সবল এবং বুদ্ধির দ্বারা সুসংগত।" ৩২ কিন্তু য়ুরোপীয় ভাবে ভাবিত রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র এই গীতিকবিতার ইসারাধান না করে পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদ ও অনুসরণ করেছেন। এতে বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে উচ্চতরে উঠেছে কিন্তু বাঙালী ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে।

রবীন্দ্র মানসের উন্মেষ যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন "গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের যে দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবধারা বাঙালির চিত্তকে অভিভূত করে, মধুসূদন ও বঙ্কিমকে তাহাদের প্রতীক বলা যাইতে পারে। বাহিরের কাঠামোকে সর্বপ্রকারে ভারতীয় রাখিয়া সাহিত্যের অন্তরে য়ুরোপীয় মনোধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন মধুসূদন তাঁহার কাব্যে; আর য়ুরোপীয় আদর্শের ছাঁচে প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় সমাজনী হিন্দু ভাবসমূহকে মূর্তি দান করেন বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে...য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই বিপরীত-ধর্মী মনোভাবের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই আংশিক সমন্বয়ের সূচনা হয় বিহারীলালের কাব্যে ও পূর্ণ পরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে।"

প্রভাতকুমারের মন্তব্যের "বাহিরের কাঠামোকে সর্বপ্রকারে ভারতীয় রাখিয়া" অংশটুকু মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ছন্দে, আঙ্গিকে, পুরাণের ব্যবহারে মধুসূদন এবং ভাষায়, চরিত্র নির্মাণে, রচনার আঙ্গিকে বঙ্কিম পুরোপুরি য়ুরোপীয় কাঠামোই গ্রহণ করেছেন; কেবল পাত্রপাত্রী ও কাহিনী পরিবেশ ভারতীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকাল সম্বন্ধে লিখেছেন "আমি যখন এসেছি, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে। নতুনকাল সবে এসে নামল।" (আত্মপরিচয়) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকেও জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথে দাদা ও জামাইবাবুরা ইংরেজীয়ানার অভ্যস্ত হচ্ছিলেন। ৩৪ প্রভাতকুমার লিখেছেন "দেবেন্দ্রনাথের মার্জিত রক্ষণশীল মতামতের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ও বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য মতামতের মিল ছিল কম ...রবীন্দ্রনাথ বড় বয়সে তাঁহার "মেজোদাদা"র সঙ্গে বাস করিতে অধিক পছন্দ করিতে।" (রবীন্দ্র জীবনী ১।১ পৃঃ ২০) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম ছিল নাটকের অভিনয়। বালক রবীন্দ্রনাথ যে নাট্যচর্চা দেখেছেন "তাহা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় আদর্শে পড়া থিয়েটারের অনুকরণে রচিত নাটকের অভিনয়।" (রবীন্দ্র জীবনী ১।১ পৃঃ ২৬)

শৈশব শিক্ষার দিক থেকেও রবীন্দ্রমানস গঠন হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে। যে "বোধোদয়" দিয়ে তাঁর পাঠারম্ভ, তা বিদ্যাসাগর কৃত Chamber's Rudiment of Knowledge-এর অনুবাদ। এর "বিষয়বস্তু সবাই পাশ্চাত্য" (রবীন্দ্র জীবনী ১।১ পৃঃ ২৯) ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং নর্মাল স্কুলে বালক রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম পাঠ নিয়েছেন তার "পঠন পাঠন বিলাতি শিক্ষা প্রণালীর ছাঁচে চলিত।" (ঐ পৃ ৩০) বাড়ীতে বিদ্যাচর্চায় অক্ষয়কুমার দত্তের "চারু পাঠ," সতেরুড়ি দত্তের "প্রাণি বৃত্তান্ত" এবং "মেঘনাদবধ কাব্য" সবই পাশ্চাত্য প্রভাবিত রচনা। সন্ধ্যায় ইংরেজী পাঠ চলত, সীতানাথ ঘোষ (জীবনস্মৃতিতে সীতানাথ দত্ত) ইন্সট্রুমেন্ট সাহায্যে বিজ্ঞান দেখাতেন। ইংরেজী শিক্ষক মেডিক্যাল ছাত্র অঘোরবাবু ছাত্রদের "মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদপুরে" পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। এ সবই থেকেই রবীন্দ্র মানসে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ হয়। "রবিজন কুলো" এবং পৌলবর্জিনী ("অরোর বন্ধু" পত্রিকার কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত Pauet Virginie'র অনুবাদ) রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে—"পৌলবর্জিনী"র প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় অস্পষ্ট নয়, বনফুল কাব্য পাঠ করিলে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।" (রবীন্দ্র জীবনী ১।১ পৃঃ ৩৪) বার বছর বয়সে উপনয়নের পর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয়ে যান। তখন রবীন্দ্রনাথের জন্য মহর্ষি যেসব বই নিয়ে যান তার মধ্যে ছিল Peter Parleys Tales, এবং P. A. Proctor রচিত জ্যোতির্বিদ্যার বই। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থাও হয়েছিল, কিন্তু এ সময়ে ইংরেজীর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত জ্ঞান একেবারেই অপরিণত। কবি নিজেই বলেছেন—"আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না।" ৩৫ "জীবনস্মৃতি"তে দেখি "আরো একটু বড়ো বয়সে" কুমার সম্ভবের "মন্দাকিনী নির্ঝর" শ্লোকটি পড়ে তাঁর মন মেতে উঠেছিল, কিন্তু তা কেবল শব্দের দোলায়; অর্থ জানতেন না। পণ্ডিত মশাই মানে বুঝিয়ে দিলে তখন আর তেমন ভালো লাগল না।" (রচনাবলী ১০।৩৮) এই "আরো একটু বড়ো বয়স" কখন? তা অনির্দেশ্য। তবে সংস্কৃত এবং বিশেষ করে কবির প্রিয় কালিদাসের রচনা ও যে অনেকাংশেই পরবর্তী যৌবনকালেও কবির অপঠিত ছিল তার একটি প্রমাণ: "সেদিন একটা কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে। পড়ে একটু আশ্চর্য বোধ হল—রমণীর বীভ্য়....সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অনীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটি পড়ে আমার ভারি আনন্দ হল।" স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে কবি এই কবিতাটি প্রথম পড়লেন। "ছিন্নপত্রাবলীর" যে চিঠিতে বিষয়টি বলা আছে সেটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারীতে লেখা। কবির বয়স তখন ত্রিশোর্ধ্ব। উপনয়নের পর জ্ঞানচক্ষু খোলের কাছে ম্যাকবেথ ও কুমারসম্ভব পড়তেন। ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদের কিছু অংশ ভারতীতে প্রকাশিত হয় (৮ম বর্ষ ৪।১৮৮৪ আশ্বিন)। কিন্তু কুমারসম্ভবের কোন অনুবাদ কোথাও বের হয় নি বা কাউকে তা কখনো শুনিয়েছেন একথাও কোথাও বলেন নি।

পাশ্চাত্য কাব্য অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদ চর্চায় রত হন। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়সাবধি যে বহু কবিতার অনুবাদ করেছেন তা তাঁর নিজস্ব কবিতার ওপর চিন্তাকর্ষ, ছন্দোরীতি, স্তবক গঠন প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছে। এই ইংরেজী কাব্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন গুরু। "সে যুগের ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে তিনিই রবীন্দ্রনাথের নিকট মূর্তিমান করিয়া তোলেন এবং বোধ হয় তাঁহারই প্রেরণায় তিনি সে যুগের পক্ষে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কবিতা বাংলা ছন্দে ও ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হন। ইহারই কাছে রবীন্দ্রনাথ মূরের Irish Melodies ও বায়রন কবি চ্যাটার্টন সম্বন্ধে তথ্য অবগত হন।" (রবীন্দ্রজীবনী ১।১ পৃঃ ৬৪) সতের বছর বয়সে বিলেত যাত্রার জন্য কবির প্রস্তুতি শুরু হল। এসময় বিলিতি আদবকায়দা সম্পর্কে বইইট পড়েন। ফল—"ইংরেজদিগের আদব কায়দা" প্রবন্ধ

(এরপর ৭৪ পৃষ্ঠায়)

বাংলার নব জাগৃতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

(ভারতী ॥ ২য় বর্ষ । ২য় সংখ্যা) এক সঙ্গে আরম্ভ হল ইংরেজী সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ। "মেঘনাদবধ কাব্যে বললাম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার কিছুতে বিচার না করিয়া অতি ধীর খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমনকি অ্যাংলো স্যাক্সন ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য দফাটায় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।" ৩৬ এই প্রবন্ধ ৫টি হল—১। স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য (ভারতী ॥১২৮৪॥ শ্রাবণ) ২। নর্মান জাতি ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য (ভারতী ॥ ১২৮৪ ॥ ভাদ্রন এবং ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ) এ সময় ইংরেজি ছাড়া য়ুরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে আরো প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ :

১। "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাহার কাব্য" (ভারতী ॥১২৮৪॥ ভাদ্র)

২। "পিত্রার্ক ও লরা" (ভারতী ॥ ১২৮৪ ॥ আশ্বিন)

৩। 'গ্যেটে ও তাহার প্রণয়িনীগণ' (ভারতী ॥ ১২৮৫। আশ্বিন)

বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে থেকে ব্রাইটনে পাব্লিক স্কুলে ভর্তি হলেন। পরে ডারকনাথ পালিতের চেষ্টায় এসেন য়ুনিভার্সিটি কলেজে। এ সময় এক ভদ্রলোকের কাছে কিছুদিন লাটিন ভাষা শেখেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তিন মাস। এ সময়ে তাঁর সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন প্রখ্যাত সমালোচক মর্লি। এ সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র গুলোতে দেখা যাবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে য়ুরোপের মুক্ত জীবনধারা কতটা ছাপ ফেলেছে। তিনি লিখছেন—"মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই তো স্বাভাবিক।" "সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর তা হলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসন করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।"

আমরাও বেশ বুঝতে পারছি একথা গোঁড়া ব্রাহ্ম সমাজের নেতার ছেলের পক্ষে বেশ বেমানান। বুঝতে পারছি যে অগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথের মত তাঁরও ফিউডাল ঐতিহ্যে লালিত শুচিগ্রস্ত সংকীর্ণ চিন্তাধারায় য়ুরোপের ধনবাদী সমাজের ভাব আদৌ প্রশ্রয়ত নারী মুক্তি চেতনার প্রভাব পড়েছে। এ সময়ে তিনি পাশ্চাত্য সংগীত শিখেছেন, এবং ভোজের পার্টি, বাচের পার্টি সব কিছুতেই সোৎসাহে যোগ দিচ্ছেন—তা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে জানা যায়, তবে স্বদেশে এর প্রতিক্রিয়া হল। স্বয়ং অগ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছোট ভাইয়ের এই নব্য চিন্তা ও বক্তব্যের প্রতিবাদ প্রকাশ করলেন পত্রিকায়—ওই পত্রধারায় পাল্টা টীকায়। বিলেত থেকে তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হল।

প্রত্যাবর্তনের পর গান, নীতিনাট্য এবং সংগীত বিষয়ক রচনায় দেখা গেল সেকালের বিশ্বখ্যাত হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাব। স্পেন্সারের "essays" এর প্রথম খণ্ড "The Origin and Function of Music"-এর প্রভাবেই তিনি লিখলেন "সংগীত ও ভাব" (ভারতী ॥ জ্যৈষ্ঠ ॥ ১২৮৮) । "সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা" (ভারতী ॥ আষাঢ় ॥ ১২৮৮)। "সংগীত ও কবিতা" (ভারতী ॥ মাঘ ॥ ১২৮৮)। স্পেন্সারের প্রভাবের কথা বহু পরবর্তী কালেও স্বীকার করেছেন। "সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হুরুহ্যবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনা আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবল কথা দিয়া প্রকাশ করিনা কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আভ্যন্তরিক সুরটিকেই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীতে পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাগিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভেতর দিয়া প্রকাশ করিলে চলিবেনা কেন? (জীবনস্মৃতি)। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতার ছন্দের বা সুরতত্ত্বের প্রয়োজনের তত্ত্বের সঙ্গে স্পেন্সরের পূর্বোদ্ধৃত তত্ত্বের কিছুটা প্রভাব নিশ্চয়ই আছে।

এই সময় পর্যন্ত স্যাকসন, আইরিস, ল্যাটিন (হাফেজ ও পেত্রার্ক) এবং ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কবিতা অনুবাদ করে চলেছেন ভারতীর নানা সংখ্যায় এবং তাঁর স্বরচিত কবিতায় তার সুর ও সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে চলেছে। এই অনুবাদ চর্চার সামগ্রিক আলোচনা স্থানান্তরে করব।

মোটামুটি কবি মানসের উন্মেষপর্বে য়ুরোপীয় পরিবেশ, শিক্ষা, পাঠ ও চর্চা, চিন্তা প্রভৃতি সব দিক থেকেই রবীন্দ্র-মানসে পশ্চিমলোক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের যুগ দর্শনে, কাব্য রীতিতে, কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে এই আলোকেরই বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাব। এটা কোন অকস্মিকতা নয়, নিছক ভাবসাদৃশ্য নয়। দেশকালগত, ইতিহাসের পরিবেশ জাত অনিবার্য প্রভাব। বর্তমান আলোচনায় সেটুকুই দেখাতে চেষ্টা করা হল।

১। Radhakzmud Mukherjee : Indian Land System p. 22-24

২। F. Engels : Marx Engels Selected correspondence. Letter no. 22-23

৩। L. Mumford : Culture of the cities. p 5

৪। K. Marx : The Future Results of British Rule is India

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত : ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা : ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৮। পৃঃ ৪৩১

৬। Jenks : Migration of British Capital in India

৭। Price : Economic Problems of Europe p. 41

৮। রমেশচন্দ্র দত্ত : বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৮। পৃঃ ৩৮৪

৯। ঐ প্রবন্ধ : পৃঃ ৩৮৬

১০। ঐ পৃঃ ৩৮৫

১১। Wilsons Memorandum to Wood. June, 1853. Quoted in "British Paramountcy And Indian Renaisssance" Ed. by R. C. Mazumdar. P. 1104.

১২। রমেশচন্দ্র : প্রাগুক্ত প্রবন্ধ : পৃঃ ৩৮৫

১৩। ঐ. পৃ. ৩৩৫

১৪। D. R. Gadgil Industrial Evolution in India.

১৫। V. I. Lenin : On the Question of our Factory statistics : col. works. vol. 4. p. 28

১৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

১৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ৬৮।

১৮। Hunter : Statistical Account of Bengal. vol I,

১৯। Rev. W. Adam's Report, Ed. A. N. Basu. C. U. P. 67.

২০। Syed Mahmood : History of English Education in India. p. 11-13.

২১। Report of Indian Education commission 1882.

২২। B. Groethuysen : Encyclopedea of Social Science. vol 13-14. p 279

২৩। Ibid p. 280

২৩। Ibid p. 282.

২৪। Dr. Bhupendra nath Datta. Swami Vivekananda : Patriot Prophet: p. 37.

২৫। N. S. Bose : The Indian Awakening in Bengal. p. 16 তে উদ্ধৃত।

২৬। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা : বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ। সাক্ষরতা ॥ ১ ॥ পৃঃ ৩৮০।

২৭। "ধর্মতত্ত্ব"—১৪শ অধ্যায়।

২৮। ধর্মতত্ত্ব—১২শ অধ্যায়।

২৯। Dr. Gadgil : The industrial Evolution of India. p. 12, 40,41

৩০। Ibid. p. 41

৩১। প্রমথ চৌধুরী : বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য।

৩২। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য : বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস। প্রাচীন পর্ব। পৃঃ ৩৫৭।

৩৩। প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী। ১ম। পৃঃ ৮৮-১৯।

৩৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন স্মৃতি। পৃঃ ১২৩।

৩৫। রবীন্দ্র রচনাবলী। শতবার্ষিকী। ১০ পৃঃ ৩৭।

৩৬। জীবনস্মৃতির খসড়া। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৩৫০, কার্তিক-পৌষ।

বাঁকুড়ায় আদিবাসীদের দুর্দশা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রুখোশুখো লাল পাথর এলেবেলে পাথুরে দেশ বাঁকুড়ায় ধান তেমন ভাল হয় না কোন কালেই। এ বছরও হয়নি ভালো। জল ঝড় তো হলোই না, ধান শুকিয়ে দুধ পর্যন্ত জমে শুকিয়ে গেল। এখন কারো হাতে কাজ নেই। জনমজুরকে কেউ খোঁজে না। অভাব আর অভাব। বাঁকুড়ার শালডিহা আদিবাসী অঞ্চলের মানুষের অবস্থা চরমে দাঁড়িয়েছে। শালডিহা আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সুস্মরী সাবেন আমাদের তাদের সমিতি থেকে নাইট স্কুল চলছে। পরিষদ পরিকল্পনার কাজেও তাঁরা পিছিয়ে নেই। শুধু দরকার সরকারী সাহায্য। ঐ সমিতির কিছু সদস্য জল ইত্যাদি রেল প্যাসেনজার সমিতির উদ্যোগে দিল্লী যাবেন আদিবাসী বিভিন্ন নৃত্য গীত এবং বাঁকুড়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুষ্ঠান করতে। বাঁকুড়ার পাথুরে মাটিতে সয়াবীন এবং সূর্যমুখী ফুল চাষের পরিকল্পনা চলছে। ব্লক অফিসে খোঁজও নিয়েছি। অথচ কাজ তেমন এগোচ্ছে না। কোথায় যেন লাল ফিতার বাধনে "উন্নয়ন" শব্দটা দম বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে কেঁদে ফিরছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার রাজ্য সম্মেলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ৭ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির অফিসে ঐ সমিতির একটি সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল। উক্ত সভায় শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। তাঁহারা ঐ সভায় সমিতির বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও সমালোচনা করা হয়।

আগামী রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতির হিসাবে এই সভা ডাকা হয়। রাজ্য সম্মেলনের ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। এইজন্য আলাদা অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়।

উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় যে ছাত্ররা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান অধিকার করেছে, তাদের অভিনন্দন জানানো হয়।

জহরনগরে কয়েকদিন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস সম্মেলনে একজন বক্তা মানুষের কল্যাণে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয়ের অবদানের কথা এক নিঃশ্বাসে বলে গেছেন। আবার এ. আই. সি. সির অধিবেশনে মধ্য প্রদেশের জনৈক প্রতিনিধি রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শুধু সঞ্জয় গান্ধী ও পাঁচদফা কর্মসূচি নিয়ে যখন আলোচনা করছিলেন, প্রতিনিধিদলের একাংশ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তার কাছে রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দাবি জানান। সে সময় মঞ্চে সঞ্জয় গান্ধী উপস্থিত ছিলেন।

ছটি সম্মেলনে তিনবার বক্তৃতা করতে উঠে বারবার করতালি ও জয়ধ্বনি কুড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের সংশোধনী যোগ করে শ্রীরঞ্জন দাশগুপ্তও যথেষ্ট করতালি পেয়েছেন। শ্রীজগজীবন রাম তাঁর বক্তব্যসিক্ত ভঙ্গিতে ভাষণ দেওয়ার সময় শ্রীরঞ্জনের কিছু বক্তব্যের যৌক্তিকতার জোরালো সমর্থন করেছেন। যুবকংগ্রেস সম্মেলনে অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের মতো সিদ্ধার্থ রায়ও একবার মঞ্চে এসে বসেছিলেন। অন্যান্য প্রবীণ নেতা ও মন্ত্রীদের বেলায় যা ঘটেছে সিদ্ধার্থ রায়কে খুব বেশীরা তেমনভাবে অভ্যর্থনা করেন নি। সেটা দূর থেকেও চোখে পড়েছে। আর যুবকংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীরঞ্জন দাশগুপ্তীকে একবারও মুখ সম্মেলনে চোখে পড়েনি, মঞ্চে তো নয়ই।

এ. আই. সি. সিতে রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনায় একটু অন্যসুরে কথা বলেছেন কেরালা পদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এ. কে. অ্যান্টনি। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া অনেকবারই নানাকথা বলেছেন। সমাপ্তি ভাষণ দিয়েছেন বাংলা সহ চারটি ভাষায়। উত্তর পূর্ব ভারতের নানা কোম গোষ্ঠীর জীবনধারা এ, আই, সি. সি-র অধিবেশনের জন্য যৌথ উদ্যোগের প্রশ্ন ছাড়াও সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সংবিধান সংশোধনের পর সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণের কাজ নাহলে, ব্যর্থতার দায়িত্ব কংগ্রেসেই বর্তাবে।

প্রধানমন্ত্রী বৈদেশিক নীতি বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক কথার সঙ্গে শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীরা যাতে দপ্তর সঙ্গে মিলে মিশে কাজে করেন এবং তাদের আসন অটুট রাখার জন্য, সাধারণ কর্মীদের-সংগত রাখার জন্য নিজস্ব প্রভাব আর কতোদিন খাটাবেন, সে বিষয়ে সংকেত প্রকাশ করেছেন। এই বক্তব্যের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি উক্তি—জহরনগর অধিবেশন থেকে দেশের রাজনীতি একটা নতুন মোড় নিতে পারে—বিশেষ ভাব লক্ষ্য করবার মতো।

এদিকে কংগ্রেস দল ভাঙাভাঙির সময় শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে বিশেষ ভূমিকা যিনি পালন করেছিলেন, সেই শ্রীমতী নন্দিনী সংশোধনে যুবমঞ্চে দেখা যায়নি, এ, আই, সি.সি, অধিবেশন মঞ্চে দেখা গেছে সামান্য সময়। তাঁকে, অন্যান্য অনেক নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীকে মঞ্চ লাগোয়া ক্যান্টিনে দেখা গেছে বহুক্ষণ অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী, প্রদেশ কংগ্রেস ও যুবনেতারা অনেক জায়গায় বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ওড়িষ্যার নেতৃবৃন্দের আলোচনা বৈঠকও কম হয়নি।

জহরনগর ও যুবনগরের বিশাল এলাকার সবচেয়ে উঁচু টিলাটিতে নতুন অতিথিশালা তৈরী হল, তাতে ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। এর চেয়ে নীচু এক টিলায় নবনির্মিত দু'নম্বর অতিথিশালায় ছিলেন শ্রীবরুয়া। বেশি উঁচু নয় ছুটো টিলা। পাহাড়-কাটা পথ বক্রাকার হলেও সমতলে নেমে আসতে বেশি সময় লাগেনা।

চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হোয়া শিকিং। মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টি সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্বদিকায় প্রতিষ্ঠিত হল। দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোও বহু দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে যে চীন হাঙ্গেরীতে ইমরে নজের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছিল, ষাটের দশকের শেষভাগে সেই চীনই চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পররাজ্য আক্রমণ রূপে সমুচ্চ ধিক্কার জানালো।

চীন-সোভিয়েত বিরোধের চরম পরিণতি ঘটলো দু-দেশের সীমান্ত সংঘর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। সোভিয়েতের অনুসৃত নীতি ও আচরণকে চীন 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' রূপে বিশেষিত করলো।

এতদিন সবের চীন বিশ্বেরক্ষা রাজনৈতিক মহলে আজ প্রশ্ন উঠেছে—চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসন্ন কিনা? প্রশ্নটি ভেবে দেখার মতো। চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি-প্রবাহের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে কয়েকটি প্রশ্ন স্বতাবতই জাগ্রত হয়। প্রথমতঃ চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের যে অংশ সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদ পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল আজ তারা আর নেতৃত্বে নেই।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব মাওবাদকে, সরাসরি অস্বীকার ও বর্জনের নীতি গ্রহণ না করলেও পুঁজিবাদী দেশগুলোর উন্নত কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে অভিজ্ঞতাকে প্রশংসা করেছেন এবং চীনের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। শিল্প আধুনিকীকরণের নাম করে পুঁজিবাদী অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা আত্মনির্ভরশীলতার তত্ত্ব বিরোধী এবং মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার বৈপরীত্য ছাড়া কিছুই নয়।

তৃতীয়তঃ, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় যে সব শিল্পকর্ম ও সাহিত্য-নির্মাণ বুর্জোয়া ভাবধারার পরিপোষক বলে নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল সেই সব শিল্প-সাহিত্যকর্মকে বর্তমান নেতৃত্ব পুনর্বাসিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

চতুর্থতঃ, লিওনিদ ইলিচেভের নেতৃত্বে সোভিয়েতের যে প্রতিনিধিদল গত ২৭ শে নভেম্বর পিকিং বিমান বন্দরে উপস্থিত হল তাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য স্বয়ং উপপ্রধানমন্ত্রী উ চান বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আঠার মাস পর চীন-সোভিয়েত সীমান্ত-বিরোধ আলোচনার জন্য ইলিচেভের আগমন ও সংবর্ধনা লাভের ঘটনার উপর অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন।

এইসব ঘটনা দৃষ্টে চীন-বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন অদূর ভবিষ্যতে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব শুরু হতে পারে। আর তা যদি করে, তাহলে বর্তমান শতাব্দীর এটাই হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ ঘটনা।

চিলিতে ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

লাতিন আমেরিকার দেশপ্রেমিক নেতা সুই করভালনকে চিলির ফ্যাসিস্ত সরকার ধীরে ধীরে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। চিলিতে পিনোচেতের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত-বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর এই বর্বরোচিত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চিলির কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক সুই করভালন খুবই অসুস্থ। অথচ নিরাশনে করভালনের শরীর ভেঙে পড়েছে। কমিউনিষ্ট দেশ সমেত প্রায় শতাধিক দেশ থেকে করভালনের মুক্তি দাবি করে পিনোচেতের কাছে চিঠি এবং তার পাঠানো হয়েছে। এমন কি, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন চিলির রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য চিলিতে যেতে চাইলে পিনোচেত সরকার বাধা দেয়।

ফ্যাসিস্তরা ইতিমধ্যেই আড়াই হাজারের বেশী রাজনৈতিক বন্দীকে খুন করেছে, এই নিহতের তালিকায় কমিউনিষ্ট সহ সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী আছে। বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ রাজনৈতিক বন্দী রয়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পরে নাকি মুখ্যি থেকে শুরু করে হাত পা ভেঙে দেওয়া, অনন্ত সিগারেটে গা-পোড়ানো, হাতুড়ি দিয়ে চোয়াল ভেঙে দেওয়া, লোহার শিক দিয়ে চোখ গেলে দেওয়া, যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া ফ্যাসিস্ত সরকারের বর্বর অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা। এত অত্যাচার করেও দেশপ্রেমিকদের মনোবল ভাঙা যায়নি। দেশে জরুরী আইন, সেন্সরশিপ, শিটুনি কর। তৎসত্ত্বেও চিলির বড় বড় শহর-গুলোর দেয়ালে মাঝে মাঝে দেখা যায় লাল ইস্তাহার : "কমিউনিষ্টরা মরে নি, মরবেও না", "পিনোচেত তোমার মৃত্যুর দিন আসন্ন," "চিলির সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ"। চিলির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ফ্যাসিস্তশাসনের বিরুদ্ধে আজ ঐক্যবদ্ধ। এই ফ্রন্টে বিভিন্ন কমিউনিষ্ট দল, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীও আছে। তাদের মধ্যে যতই মত বিরোধ থাক না কেন, ফ্যাসিস্ত শাসন উৎখাতের ব্যাপারে তাঁরা একজোট।

সুখের কথা, চিলির জনতার যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা চিলির সামরিক ঘাঁটির ওপর বেশ কয়েকটা আঘাত হেনে পিনোচেতকে কাহিল করতে পেরেছেন। ক্রমেই দেশপ্রেমিকদের তৎপরতা বাড়ছে।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE 40 Paise

'বহ্নিশিখা' অবাস্তব ছবি

ভানুসিংহ

অজাতশত্রুনীল বিদ্যাসবিহারীর সঙ্গে লতিকার বিবাহ হতে পারল না যদিও উভয়ের মধ্যে প্রেমপর্ব অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। লতিকা আধুনিকা ও সাহসী হওয়া সত্ত্বেও অজাত বিবাহে সম্মত হল প্রেফ 'মায় মরা মুখ দেখনি' অভিশম্পাতটি এড়ো বলে। লতিকার ঘরে বিদ্যাসবিহারীর যেরকম যাতায়াত ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তা তাতে বিশ্বাস করা শক্ত, লতিকার পিতামাতা বিদ্যাসের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ পর্দায় দেখি, নায়ক নায়িকা দুজনেই যখন প্রস্তাব প্রেমালাপ ও বিবাহে সংকল্পবদ্ধ তখনই নায়িকার পিতার কাছে নায়কের অযাচিত অরুণ উঁকাচন। অবশ্য নায়ক অনেক আগেই নিজের পরিচয় নায়িকাকে জানিয়েছিলেন এবং নায়িকার পিতা নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। এসবই প্রাসঙ্গিক সংলাপে প্রকাশ এবং এত প্রকাশ পেল যে, নায়িকার পিতা মাতা বহু আগেই বাকী হিন্দী ফাইনাল ছাড়া বিষয়ের বংশ পরিচয় এবারকার কিছুই জানতেন না। যাক, শেষ পর্যন্ত যখন সব জানাই গেল এবং বড়ই অবিশ্বাস্য হোক, বিয়েটা ভেঙে না দিলে পরবর্তী সন্তার নাটকটি যে পচ্ছে' ফোলা বেশ না।

হঠাৎ প্রেফিক, অপমানিত বিদ্যাস এমন হ'য়ে গেল পুরোপুরি ক্রিমিন্যাল। অবশ্য ইতিমধ্যে সে বিদেশ থেকে ব্যারিস্টারী বিদ্যার ডিগ্রি-সহ পাসপোর্ট হয়ে ফিরেছে। কিন্তু সেই লোকই প্রেমিকাকে জীবনে পেল না বলে প্রতিহিংসার বশে একেবারে সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্ত বনে গেল। আজব ভাওতারখানা আর কি। এর পর ছবিটি পুরোপুরি একটি 'ক্রাইম' চিত্রের রূপ নিয়েছে। এবং এটা যে হওয়ে হবে। দীর্ঘায় ওঠার পরেই নিয়েই তো ছবিটি হয়েছে। চিত্র পরিচালক পীযুষ বসু অবশ্যই ঘুরছে ঘুরে উঠেছেন, অবশ্য বাংলা ছবির ঘুরানায়। বোম্বাই মার্কা হিন্দী ক্রাইম বি লারের তুলনায় আলোচ্য বাংলা ছবিটি নিশ্চিতই দীর্ঘপ্রভ, মন্থর গতি ও বিরক্তিকর। মারপিট, খুন, ক্যাবারে সবই আছে। কিন্তু কেমন যেন সব ফিকে! হ্যাঁ, ছবিতে একটা সাধু-বক্তব্য থাকার সচেতন প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। সমাজে যারা অন্যায় অপরাধ করে, নাম গোত্র পরিচয়হীন ছায়া সমাজের লাঞ্ছনা পেয়েই সমাজ বিরোধী ক্রিমিন্যাল হ'য়ে ওঠে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায়। কিন্তু ঘোরতর আপত্তি হল এই যে—যে অভিনী-চিত্রের মাধ্যমে এই সত্য পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে, তা একই দুর্বল, অযৌক্তিক ও সংগতিবিহীন যে শোচা ব্যাপারটা প্রেফ ভণ্ডামি বলে মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাপাচারকে justify করা ও ক্রিমিন্যালের প্রতি একটা সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা সৎ-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলেই মনে হয়। এসব ব্যাপার পরিবেশনের ত্রুটি এবং ভ্রান্ত দৃষ্টি কোণের জন্যে। যদি সমগ্র বিষয়টি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হত এবং কার্যকারণ যুক্তি সম্পর্কিত হত তবে উপরোক্ত 'সত্য দর্শন' ঘথার্থ Perspective-এ ফুটে উঠত। কিন্তু 'বহ্নিশিখা' চিত্রের নির্মাতার লক্ষ্য একটা রগ্‌রসে নাটক পরিবেশন করা। বক্তব্য গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা সেখানে ছলনা হ'য়েই দেখা দেয়।

প্রেম-প্রত্যাখ্যাত বিদ্যাসবিহারী লতিকার সুখের সংসার দেখে হিংসায় আর বিদ্বেষে ঘরে। অবশেষে লতিকার শিশু-কন্যাটি অপহরণ করে দুই ফন্দীর জাল বোনে। এরকমই আরও কিছু ছেলে মেয়ে কিডন্যাপ ক'রে ভাদেরকে মানুষ ক'রে তুলে স্মাগ্‌লিং-এর এক আন্তর্জাতিক চক্রের পুরোধা হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যাসবিহারী। সত্যিই ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসবিহারীর আর একটি রূপ —কৃতী ব্যারিস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সজ্জন, পরোপকারী ও সমাজ হিতৈষী। এটা বাইরের প্রকাশ রূপ। আর অন্তরালে সে মিঃ নিরু—স্মাগলিং আর দুষ্কর্মের শিরোমণি, অনেক শক্তিধর, বুদ্ধিমান আর কুটকৌশলী।

প্রতিদ্বন্দ্বী তিলের থেকে তাল করে সরকারী পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী তার অমিত বিক্রমের কাছে নাজেহাল। অবশেষে সে ধরা দিয়েছে বহ্নিশিখার প্রেমনিষ্ঠার মুখ হয়ে। প্রেমিক পুলিস অফিসারের সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেবার তাগিদেই যেন তার আত্মসমর্পণ।

এই বহ্নিশিখা কে? লতিকার সেই অপহৃতা কন্যা, যাকে বিদ্যাস মানুষ করে সমাজ বিরোধী দুষ্কর্মে লাগিয়েছিল আর অজাতকুলশীল বলে প্রচার করেছিল। এই বহ্নিশিখাই যেন তার জীবনে 'আগুনের পরশমণি' হয়ে দেখা দিল—এরকম একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা আছে ছবিটিতে, যার জন্য ছবির নামকরণ বহ্নিশিখা। কিন্তু সমগ্র আলঙ্কারিক ক্রিয়াকলাপের জন্য 'বহ্নিশিখা' একটি অবাস্তব ছবি হয়েই হাজির হয়েছে।

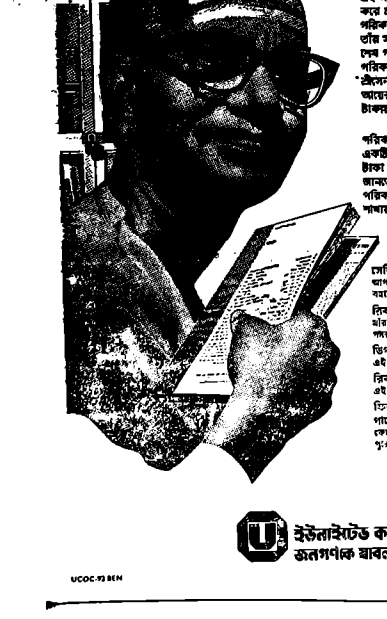

সেনাপতি রাও, বয়স ৫৮, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য সঞ্চয়ের টাকায় তাঁর দিন চালাতে হবে। কিন্তু কী করে চলবে?

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা নিয়ে শ্রীসেনাপতি রাওয়ের হাতে যেন কিছু টাকা সদ্য এসেছে। এই তাঁর একমাত্র সম্বল। সারা জীবনের এই সঞ্চয় ভাঙিয়ে তাঁর আগামী দিনগুলি কী করে চলবে? ইউকোব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়। এই পরিকল্পনাগুলোর তাঁর সঞ্চয় অনেকদিন সঙ্কুলে পারে। শ্রীরাও শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন একটি কিস্তে ডিপোজিট পরিকল্পনা। ১০ শতাংশ পর্যন্ত সুদের হারে শ্রীসেনাপতি রাও মনে মনে হিসেব চলনমই একটা আয়ের ওড়সা পেয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর সঞ্চিত টাকার মূল নড়ল না।

কিন্তু আরও ৫ রকম লাভজনক সঞ্চয় পরিকল্পনার আভাসও দেওয়া হল। এদের মধ্যে কোন একটি হয়ত ঠিক আপনার মনমত হবে। আর টাকা থেকে কী ভাবে আর করতে পারেন যদি জানতে চান, ইউকোব্যাঙ্ক আপনাকে ৬টি বিভিন্ন পরিকল্পনার হদিস দিচ্ছে। আমাদের যে কোনো শাখায় আজই চলে আসুন।

ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা
আপনি যা পারেন অল্প দিন, তার উপর বছরে ৫ শতাংশ সুদ পাবেন।

রিকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা
মাত্র মাসে মাসে নির্দিষ্ট কিছু টাকা জমা দিতে পারলে, মেয়াদ শেষে সমেত জমা।

ডিপোজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা
এই পরিকল্পনায় সুদের উপরেও সুদ পাওয়া যায়।

রিকারিং ডিপোজিটের সঙ্গে যুক্ত জীবনের ডিপোজিট
এই পরিকল্পনায় ১৫.৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দেওয়া পরিকল্পনা।

ফিক্সড ডিপোজিটের সঙ্গে যুক্ত আনতা
পাসসোনাল ম্যাক্সিমাইজার ইনসিওরেন্সের সুবিধা কোন ব্যক্তি ৬০ বা ৫৫ বছরের ঊর্ধ্বে ইনসিওরেন্সের পুরো সুবিধা যেমন পাবেন তেমন নিয়মিত সুদও পাবেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ী কর তুলতে সাহায্য করছে

UCOC-93 BEN

লেবাননে গৃহযুদ্ধ বন্ধ?

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, লেবাননে বুঝি গৃহযুদ্ধ বন্ধ হল। বিশেষ করে আবার লীগের দৌত্যে লেবাননের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর সশস্ত্র সংঘর্ষ বুঝি স্থগিত হল। ২১শে নভেম্বরের খবর,: আরব লীগ বাহিনী লেবাননের নানা অঞ্চলে শান্তিমিশন হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এ খবরের সঙ্গে আর একটি ছোট্ট খবর আছে, ইজরাইল যথারীতি ইজরাইল-লেবানন সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতায়েন করছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, লেবাননে প্যালেস্টাইনের মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটির ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো। অন্যদিকে, সিরিয়ার ফৌজের ওপর হামলা চালানোর অভিসন্ধি যে ইজরাইলের নেই এতথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই ভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাকরেদ লেবাননে যুদ্ধ জীইয়ে রাখতে চাইছে।

বর্তমান লেবানন সংকট দেখা দিয়েছে লেবাননের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রপতি (প্রোজন্ম) ফ্রাঙ্কজির শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে উপলক্ষ্য করে। ফ্রাঙ্কজি পেল প্রতিক্রিয়াশীলরা কৌশলে বিরোধ লাগিয়ে দিল সাম্প্রদায়িকতার নামে করে। লেবাননের খ্রীষ্টান ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে প্রথমে দাঙ্গা পরে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধল। কায়াল জুম্বলাতের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক সংগঠন, লেবাননের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন, লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, এই সংগঠন লেবাননে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের যোগ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠনের পক্ষে। এই সংগঠন প্যালেস্টাইনমুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ, ইজরাইল ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ লেবাননের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকে জীইয়ে রাখছে, এবং তারই সংঘর্ষ বাধানোর মূলে। লেবাননের ঘাঁটি থেকে ইজরাইলের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগে বহুবার ইজরাইলী হানাদাররা প্যালেস্টাইনের মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু অতীতের লেবানন সরকার এই আক্রমণের জবাব দেয় নি। কারণ লেবাননের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী চেয়েছিল প্যালেস্টাইনের মুক্তিবাহিনীর ধ্বংস। ১৯৬৯ সালের কায়রো চুক্তি অনুযায়ী, লেবাননে প্যালেস্টাইনের মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ছিল আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত।

সম্প্রতি মিশর, সুদান, সৌদি, আরব প্রভৃতি আরব রাষ্ট্র ও প্যালেস্টাইনের মুক্তি বাহিনীর প্রধানদের মধ্যে এক সম্মেলনে ইজরাইলের আগ্রাসী নীতির নিন্দা করা হয় এবং লেবাননে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যাতে লেবাননে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে লেবানন এক স্বাধীন সুখী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে তারই জন্যে সচেষ্ট হতে আরব শ সম্মেলন থেকে আহ্বান জানানো হয় তবে আরব জাতীয় শান্তি প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্য রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরাইল।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দী পালী প্রেস, ১২৭/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

চতুর্থ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৭ই ডিসেম্বর '৭১

২৪ পরগণায় সাত হাজার পরিবার উৎখাত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট সাব-ডিভিসনের কয়েক হাজার বিঘা কৃষি জমিকে মেছোভেরীতে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে হাজোড়া মালিখা ও সন্দেশখালি অঞ্চলের প্রায় সাত হাজার পরিবার এখন নিঃস্ব। এই কথা বলেছে ছয় জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি যার রিপোর্ট সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে।

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কমিটি গঠন করা হয়। এর নেতৃত্ব ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোর্ড অব রেভিনিউয়ের একজন সদস্য। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন মৎস্য দপ্তরের সেক্রেটারী, ২৪ পরগণার কালেক্টর, এ্যাণ্ড রেকর্ড ও সার্ভের ডাইরেক্টর এবং ২৪ পরগণার পুলিশ সুপার।

কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে, সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে যোগসাজসে হতদরিদ্র মেছোভেরীর মালিকরা জমি দখল করার ফলে প্রকৃত চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাদের দারিদ্র্যের পরিমাপ করা যায় এই ঘটনা থেকে যখন কমিটির সদস্যরা তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের বাড়িতে যায় তখন তারা "মাদুর" বা "চাটাই" দিতে পারে না বসার জন্য, কাঠের বেঞ্চি তো দূরের কথা।

অপর দিকে মেছোভেরীর মালিকরা বছরের পর বছর ধরে প্রচুর মুনাফা জমিয়েছে যার অধিকাংশই হিসাব বহির্ভূত। এইসব মালিক ও বকিত রাঘব বোয়াল বর্ণাঢ্যদের স্বার্থের সংঘাত ও অবিশ্বাস এত তীব্র যে, মালিকরা এদের মেছোভেরীতে কাজ দেয় না। তারা বাইরে থেকে লোক আনে। রিপোর্টে এরকম বলা হয়েছে।

কমিটি পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এবং তারা মনে করে ব্যাঙের ছাতার মত মেছোভেরী গজিয়ে ওঠা বন্ধ করতে হবে, যদি দরকার হয় অর্ডিনান্স জারী করে।

এর জন্য কমিটি আইন প্রণয়নের কথাও ভেবেছে। কমিটি একমত যে, জেলার কালেক্টরকে ক্ষমতা দেওয়া দরকার যাতে তাঁরা কৃষিজমিতে জমা জল দেখে যদি মনে করেন তা চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক তাহলে সেই জল তারা বার করে দিতে পারেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, যে আইন কালেক্টরকে এই ক্ষমতা দিতে পারবে না সেই আইন অর্থহীন কারণ এই ব্যাপারে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত এবং অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকে তাঁরা অকার্যকর আশ্রয় দিয়ে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখতে সক্ষম।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে চূড়ান্ত বিরোধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে প্রো-চেষ্টার ও নো-চেষ্টার অর্থাৎ পরিবর্তন-কামী ও পরিবর্তন-বিরোধীদের কোঁদল এখন প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। কে কোন পক্ষে সেটাও যেমন প্রকাশ্য, তেমনি একে অপরের বিরুদ্ধে কর্মসূচী হচ্ছে প্রকাশ্য মঞ্চে অবতীর্ণ। গত তিন মাস ধরে বাঘের কংগ্রেসী নেতাদের ঘন ঘন দিল্লী যাতায়াত, সেখানে শলা-পরামর্শ আলোচনা চলছিল এবং "প্রশাসনিক পরিবর্তন" অবশ্যম্ভাবী এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে।

কিন্তু গত মাসের শেষদিক থেকে ঘটনা অন্যখাতে বইতে শুরু করেছে। এখন আর কোন ভাসা ভাসা সংবাদ নয় বৃহৎ সংবাদপত্র নাম করে বিবৃতি, প্রাক্তন বিবৃতি, বক্তৃতা ছাপছে। এরকম বক্তৃতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না যে একদল কংগ্রেসী চাইছেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে চটাতে আর একদল চাইছেন তাঁর নেতৃত্বই বজায় রাখতে। দুই দলই জনগণের স্বার্থের দোহাই পড়েছেন। দুই দলই সুচক্রী শিল্পপতিদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করছেন।

এই বিচিত্র লড়াইয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল কংগ্রেসীদের গোষ্ঠী পরিবর্তনের বিচিত্র গতিপথ। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে ছাত্র-যুবদের অভ্যুদয়ের পর থেকে গোষ্ঠী রাজনীতির যে চেহারা এতকাল দেখা গেছে তাতে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী সুব্রত মুখোপাধ্যায় সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমুদ ভট্টাচার্য একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন আর লক্ষ্মীকান্ত বসু গুরুল ইসলাম বারিসবরণ দাস প্রদীপ ভট্টাচার্য সোমেন মিত্র অন্য গোষ্ঠীতে। সোমেন মিত্র অবশ্য দুবার ডিগবাজি খেয়েছেন এবং প্রবীণ গুরুদের মধ্যে নানা কারণে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে অনেক আগেই। কিন্তু যে ঘটনা একেবারেই অভিনব সেটা হল প্রিয় মুন্সী ও লক্ষ্মী বসুর জোটবদ্ধ হওয়া

(সেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বামপন্থী ঐক্য সম্পর্কে জ্যোতি বসু

রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে। যে কোন কারণেই হোক সি পি আই সি পি এমের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের কথা বলছে। সি পি এমও বলছে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির জোট গঠনের কথা। এই পরিস্থিতিতে সি পি এমের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন ও বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু কি ভাবছেন ও তার ধারে নীচের সাক্ষাৎকারটিতে। বলা বাহুল্য জ্যোতিবাবুর বক্তব্যকে সি পি এমের সরকারী বক্তব্য বলে ধরা যেতে পারে। এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সি পি আই ত মধ্যে প্রত্যাবিত "সপ্তাহ" পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

প্রশ্ন—আপনারা সম্প্রতি সি পি আই-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলেছেন। ঐ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে আপনারা কী সর্বপ্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর—সি পি আই-এর সঙ্গে আমাদের মূলগত রাজনৈতিক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে কোনো যৌথ এমনই সম্ভব নয়। কিন্তু সি পি আই-কে আমরা বাম-গণতান্ত্রিক দল বলে মনে করি। আমরা মনে করি বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সি পি আই ভুল পথে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় রাজনৈতিক মোর্চার সম্ভাবনা না থাকলেও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কর্মচারী প্রভৃতির দাবি দাওয়া নিয়ে যুক্ত আন্দোলন সি পি আই-এর সঙ্গে শুরু হতে পারে তাই নয়, হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমস্ত দিক থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ যখন ভীষণ-

(সেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

হায় নেতৃবৃন্দ হায় জনগণ !

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী বিরোধের পুঞ্জীভূত বহ্নি তথাকথিত প্রশাসনিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এখন ঘর সামলানো দায়। বিরাজমান গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর রাজনৈতিক পুঞ্জতা এবং তারপর কংগ্রেসী যুব নেতাদের আকস্মিক উত্থান। ১৯৭১-৭২সালে বামপন্থী বিরোধী শিবিরের সময় বোঝা যায় নি অদূর-ভবিষ্যতে এদের ঐক্যবদ্ধ বিরুদ্ধতা পর্যবসিত হবে। ৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসী বিরোধের যে চেহারা দেখা গেছে তা যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে আশঙ্কার কারণ, শাসক দলের পক্ষে তো বটেই। এই বিরোধে কত জীবন বলি প্রদত্ত হয়েছে তার হিসেব সংবাদপত্রের পাতায় পাওয়া যাবে। সংবাদপত্রের পাতায় আরও পাওয়া যাবে যুব নেতা প্রিয় দাসমুন্সী প্রবীণ ভট্টাচার্য প্রমুখের স্বীকৃতি যে তাঁদের গোষ্ঠী লড়াইয়ের জন্য কত মা সন্তান হারিয়েছেন।

জনগণ অসহায়। তারা শুনছে এবং সংবাদপত্রের পাতায় পড়ছে তাদের নানারকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তারা বঞ্চিত। শাসকশ্রেণী লুটেপুটে খাচ্ছে আর ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধে মত্ত। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর বিরোধ কিছুমাত্র কমেনি, কেবল অপ্রকাশ্য থেকেছে। অতঃকার পরিস্থিতি থেকে তাইই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রশাসনিক পরিবর্তন অথবা স্থিতাবস্থা—পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে কি আছে তা হয়ত কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে জানা যাবে। অর্থাৎ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় থাকবেন, না অন্য কেউ আসবেন সেটা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্থির করে দেবেন এবং তাঁরই নির্দেশে বিরোধের যেরও সাময়িক-ভাবে কেটে যাবে। যদিও পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই জটিল।

কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে? জরুরী অবস্থা কি শুধু জনসাধারণের জন্য? শুধু বামপন্থী তথা বিরোধী নেতা ও দলগুলির জন্য? অনুশাসনও কি তাদেরই জন্য?

একদিকে যখন কংগ্রেসীদের ঘেরোঘেরি চলছে অন্যদিকে তখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বছর দুয়েক আগে প্রায়ই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ব্যবসায়ীদের গোপন গুদাম থেকে মজুত উদ্ধারের সচিত্র বিবরণ ছাপা হত। উদ্ধার কর্তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুব কংগ্রেস, কোন কোন ক্ষেত্রে যুব সংঘ (সি পি আই)। কিন্তু তাতে মজুতদারীও বন্ধ হয় নি, চোরাকারবারীও বন্ধ হয়নি। জরুরী অবস্থার গভর্নমেণ্টের হাতে প্রচণ্ড ক্ষমতা। সাম্প্রতিক সংবিধান সংশোধন মারফৎ সে ক্ষমতা আরও বেড়েছে। তাতে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে কিনা জানি না, তবে গভর্নমেণ্ট অতি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের যে শায়েস্তা করতে পারছেন না সেটা প্রতিদিনের ঘটনাই প্রমাণিত হচ্ছে।

বাংলা দেশের লবণ-শিল্প ও রাজা রামমোহন

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

নীল, রেশম, আফিম ইত্যাদির মত লবণও ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম কৃষি-শিল্প। এই লবণ-শিল্পের সমগ্র ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয়নি। তবে এই শিল্পের পটভূমিকায় বাংলার লবণ সম্পর্কে রাজা রামমোহনের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ না করে কেউ কেউ দাবি করেছেন, "রাজা রামমোহনের আন্দোলনের ফলে ইস্টের একচেটিয়া ব্যবসা কোম্পানির হাত থেকে চলে যায়। ফল সস্তা হয়, ভালো ফল পাওয়া সুলভ হয় ও লক্ষাধিক লোক ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে রেহাই পায়।"১ কিন্তু ইতিহাস কি তাঁদের এই দাবি সমর্থন করে? লবণ-বিষয়ে রামমোহনের ভূমিকা কি লবণ-কান্দিবাসীদের (অর্থাৎ মালঙ্গীদের) পক্ষে সহায়ক হয়েছিল? তারা কি ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিল? এই সব প্রশ্নের আলোকে, তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর পেতে এবং এই বিষয়ে রামমোহনের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে লবণ-শিল্পের সমগ্র ইতিহাসের [illegible]

[illegible] প্রধান [illegible] বিশ্বনাথ ও [illegible] ইত্যাদি [illegible] ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্নদের মধ্যে "ব্যবসায়ী সংঘ" কেন্দ্রসমূহের ব্যবসায়ে পরিপূর্ণ একচেটিয়া আধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করে নি, গড়ে তোলে নতুন নেতা হল এই যে, এই সংঘ উৎপাদনের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেছিল।" ৩ উৎপাদক-ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণরূপে 'ব্যবসায়ী সংঘের' নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য তাঁরা [illegible] লবণের সাথায্য গ্রহণ করেন। মোগল কাস্তিগরদের (অর্থাৎ মেদিনীপুরের 'মালঙ্গী' ও খুলনার 'মাহিল্লার') টাকা দাদন দিয়ে চুক্তি করত এবং তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সংগ্রহ করে তারা সমগ্র দেশে লবণ সরবরাহ করত। কিন্তু 'ব্যবসায়ী সংঘে'র ক্রয়-বিক্রয়ের ঠিকাদার হিসাবে কাজ করা ছাড়া কাউকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পণ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে এই সংঘ দিত না।৪ জমিদারদের কাছ থেকে সেজন্য মূচলেকা নেওয়া হল যে তাঁদের জমিদারির মধ্যে উৎপন্ন লবণ কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে হবে, অন্য কারোর কাছে বিক্রয় করা চলবে না। ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা লবণের ব্যবসা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং মালঙ্গী ও মাহিল্লাদেরও খেত্তাধিকারের একচেটিয়া শিকারে পরিণত হয়। মাত্র দু বছরে পূর্বোক্ত ব্যবসায়ী সংঘের ৬০ জন সদস্য লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ে ৭০ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছেন।

প্রধান কর্মচারীদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বিদেশে রপ্তানি ও বিদেশ থেকে এদেশে আমদানির ক্ষেত্রে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার আদায় করেছিলেন।[illegible] ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারলাভের জন্য কোম্পানির দেশস্থ কর্মচারী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁরা বিক্ষুব্ধ হন। তাঁদের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়ী সংঘের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং সরকারি লবণ, সুপারি, তামাক ইত্যাদি পণ্যের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। কিন্তু এই সুযোগে কোম্পানি লবণের ব্যবসায়ের উপরে শতকরা ৩০ টাকা হারে কর ধার্য করে। এই নতুন ব্যবস্থায় কোম্পানির ইংরেজ-কর্মচারীরা লাভবান হলেও দেশীয় ব্যবসায়ীরা সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। কারণ 'কোম্পানির ইংরেজ-কর্মচারীরাই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী রূপে দেখা দেয় এবং রুক্ষকায় দেশীয় গোমস্তাদের মাধ্যমে লবণের ব্যবসা চালাতে থাকে।'৫ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, কোম্পানির প্রাবণতম কর্মচারী লুসিংটন, বারওয়েল, লরেল এবং গ্রাহাম লবণের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের মারফত লবণের ব্যবসা করতেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত কামালউদ্দীন (ইনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিলেন) বারওয়েলের 'native agent' ছিলেন।৬

কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি-আচরণের জন্য কর-আদায় ব্যবস্থা ব্যর্থতার পর্যবসিত হওয়ায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস লবণের ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। অতঃপর অবশ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে না। লবণের ব্যবসায়ে পূর্বের মতই দুর্নীতি চলতে থাকে। ইংরেজ-কর্মচারীরা লবণের ইজারাগুলি বেনামীতে নিজেরাই হস্তগত করত; অথচ 'ডাইরেক্টর বোর্ডের নির্দেশ-অনুসারে ইংরেজদের পক্ষে ঘনাবে ও বেনামীতে লবণের ইজারা নেওয়া অথবা লবণের কারখানা স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অদম্য ব্যক্তিগত লোভের জন্য বেনামী লেনদেন নিয়মিত ভাবেই চলত।'৭

এই অবস্থার হেস্টিংস রাজস্বের আয় বৃদ্ধির জন্য ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আর একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থানুসারে একজন উচ্চপদস্থ হিসাব রক্ষকের ('comptroller') তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের লবণ-অঞ্চলগুলিকে স্থাপন করে প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একজন করে 'এজেন্ট' নিযুক্ত করা হয়। 'মালঙ্গী অথবা লবণ-প্রস্তুতকারকদের এজেন্টদের নিম্নতাধীনে রাখা হয় কাছ থেকে তারা লবণ ক্রয় করে তারা অন্য কারোর কাছে লবণ বিক্রয় করতে না। এজেন্টরা লবণ ক্রয়ের রাজস্বের এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতি বৎসরই সরকার-নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতেন। মালঙ্গীদের জন্য নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে লবণ-ব্যবসায়ী-প্রদত্ত পাইকারী মূল্যের যে ব্যবধান থাকত, তা লবণের উপর শুল্ক হিসাবে ধরা হত। এই ভাবেই সরকার লবণের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর প্রকৃত একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।৮ এই নতুন ব্যবস্থায় কোম্পানির রাজস্ব প্রথম কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী বছরগুলিতে তা আবার হ্রাস পেতে থাকে।[illegible] তাই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উচ্চপদস্থ হিসাব-রক্ষকের অফিস তুলে দিয়ে এই অফিসের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব 'Board of Trade'-এর হাতে দেওয়া হয়।

কোম্পানি-সরকার লবণের উৎপাদন ও বিক্রির উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করার ফলে বাংলা-দেশে লবণের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভূদিনের মধ্যে তা জন-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। উইলিয়ম বোল্টস-এর মতে নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে প্রতি শত মণ লবণের মূল্য ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা ছিল।৯ কিন্তু ইংরেজ-কর্মচারীদের লবণের ব্যবসায়ী রূপে আবির্ভাবের ফলে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ 'ব্যবসায়ী-সংঘ' গঠনের পূর্বে লবণের দাম বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি শত মণের মূল্য ১৪৫ টাকা। কিন্তু 'ব্যবসায়ী সংঘ' গঠনের পর থেকে ইংরেজ-কর্মচারীদের শোষণ ও লুণ্ঠন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রতি শত মণ লবণের মূল্য ২৯৭ টাকা ও ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৩২ টাকা হয়। কিন্তু ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন 'ব্যবসায়ী সংঘ'কে ভেঙে দিয়ে লবণের ব্যবসাকে 'অবাধ ও উন্মুক্ত' করা হয়, তখন লবণের মূল্য-হ্রাস ঘটে—প্রতি এক শত মণ লবণের মূল্য হয় ১৪৮, টাকা।১০ আবার ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের আয়-বৃদ্ধির জন্য লবণের ব্যবসার উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিধি-বদ্ধ হওয়ায় লবণের দাম ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ের মত লবণের ব্যবসাও কোম্পানী-সরকারের মুনাফার শিকারে পরিণত হয়েছিল এবং লবণের মূল্য উর্ধ্বমুখী হয়ে গরীব জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল, তা এই তালিকা ১১ থেকেই বুঝা যাবে:

১৭৭৩ সালে প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য (চালা পরিবহ) ছিল ১৭৫ টাকা;
১৭৭৮ সালে ৩১২ টাকা; ১৭৯০ সালে ৩১৪ টাকা; ১৭৯৬—৯৭ সালে ৩১৮ টাকা; ১৭৯৮ সালে ৩৮০ টাকা; ১৮০৩—০৪ সালে ৬৪১ টাকা।

লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের উপর একচেটিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের পশ্চাতে ওয়ারেন হেস্টিংসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব-বৃদ্ধি।

খৃষ্টাব্দের নতুন ব্যবস্থার ফলে রাজস্বের পরিমাণ ২২৯,১৯২ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭, ১১১ পাউণ্ডে পরিণত হয়।১২ রাজস্বের বৃদ্ধিই লবণের মূল্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। লবণের অপরিমিত মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক সাধারণের পক্ষে তাঁদের নিত্য-প্রয়োজনের জন্য, এমন কি তাঁদের গৃহপালিত পশুগুলির জন্য লবণ ক্রয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কোম্পানি-সরকারের এই শোষণ-পীড়নের স্বীকৃতি রয়েছে সরকারী পত্রে: কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ববৃদ্ধি জনসাধারণের অপেক্ষ কষ্টের কারণ হয়েছিল। এর ফলে পশুগুলিকে লবণ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে উঠে। চালের মূল্য অপেক্ষা লবণের মূল্য অন্তত বারো গুণ বৃদ্ধি পাই লবণ করের বৃদ্ধিই লবণের এই মূল্য-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।"১৩ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হোল্ট ম্যাকেঞ্জী বলেছেন, "ব্যবসায় উদ্দেশ্যে নয়, রাজস্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই আকিব ও লবণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়।" ১৪ কারণ কোম্পানি-সরকারের কাছে লবণ ছিল 'রাজস্ব আদায়ের মূল্যবান উৎসমূল'।১৫ তাই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন (৩০. ১১, ১২৫৯ বঙ্গাব্দ) "লবণ বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাজপুরুষেরা বিপুলার্থ রাজকোষে গ্রহণ করিতেছেন ...লবণ ব্যতীত আহারীয় দ্রব্যাদি হইতে পারে না, কিন্তু কি চমৎকার! রাজপুরুষেরা ধনলোভ বশতঃ তাহাও একচেটিয়া করিয়াছেন, কোন প্রজা গবর্ণমেন্টের গোলায় লবণ না লইয়া লবণ প্রস্তুত করিলে তাহার সর্বনাশ হয়।"১৬

উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা রাজস্ব বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈধ-অবৈধ সমস্ত রকমের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লবণ-শিল্প উন্নয়নের জন্য কিংবা শোষণ-পীড়ন থেকে লবণ শিল্পের কারিগরদের রক্ষা করার জন্য কোম্পানি-সরকার কোনো চেষ্টাই করেন নি। সে-যুগের বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পের কারিগরদের মতো

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ভারতে বিদেশী শোষণের চিত্র

বর্তমানে বিদেশী মূলধন বা পুঁজি অধিকাম মুনাফার সন্ধানে ভারত। যেখানেই এই বিদেশী মূলধন অনুপ্রবেশ করেছে সেখানেই অবিরত অবৈধভাবে মুনাফা লুণ্ঠন করে চলেছে। ইন্দোনেশিয়ার বা চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো, কিংবা মধ্য প্রাচ্যের যে তরুণকটি যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের জীবন-প্রতিকে কেড়ে নিচ্ছে তাও ক্রমবর্ধিত হারে মুনাফা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই। বিদেশী পুঁজি দ্বারা লুণ্ঠন যে-সকল দেশে চলেছে সেই সকল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারদের ঘুষখোরী, আড়িপাতা ও ব্যক্তিচারবৃত্তি প্রভৃতি সকল রকমের অপকর্ম চলে মাত্রাহীন ভাবে। কারণ ঐ সকল লুণ্ঠনের রাজ্যে দুর্নীতি পর্ব খোলাই থাকে।

সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে হলেও নিশ্চিত রূপেই বিদেশী পুঁজি ভারতের বুকে অতি গভীরে এবং বিভীর্ণ স্থান জুড়ে আসন বিস্তার করে চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বেসরকারী মূলধন ১১৯ মিলিয়ন ডলার (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) বিনিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু, ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঐ মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে [illegible] মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়ায়। এই হিসাবের মধ্যে [illegible] ধরা হয় নাই। [illegible] মিলিয়ন টাকা। এই [illegible] সমস্ত [illegible] পেট্রোলিয়াম [illegible] মিলিয়ন টাকা। [illegible] এই হিসাবকেও এই [illegible] প্রয়োজনে [illegible] বিদেশী পুঁজি আসা, সংশ্লিষ্ট [illegible] নীতিগুলি [illegible] এবং আরও অন্যান্য [illegible] সহায়তা [illegible] বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে বিদেশী পুঁজি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ এই নয় যে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ প্রতি বৎসর নিজেদের দেশ থেকে কেবল নতুন মূলধন আমদানী করাই এই কাজটি করেছে। অত্যধিক মুনাফা অর্জনই এই বিরাট পরিমাণ মূলধন বৃদ্ধির কারণ। এই প্রসঙ্গে পেট্রোলিয়ামের বিষয়টি উল্লেখ্য। প্রারম্ভিক পর্বে এতে প্রায় ১৫৬ মিলিয়ন টাকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশের সরকার কর্তৃক অত্যন্ত সুযোগ ও প্রশ্রয় দানের ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এই ক্ষেত্রে যে শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তির (পুঁজির) পরিমাণ বিশ বৎসরে ৩৫ গুণ বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, যদি এর অধিক পরিমাণ লাভ হয় তবে সম-পরিমাণ অর্থ নিজেদের দেশে চালান করতে সক্ষম হয়েছে।

কি প্রারম্ভে পুঁজি বিনিয়োগ করে ঐ বিনিয়োগকারী দেশগুলি তাদের [illegible] ও অর্থনৈতিক জালে এক একটি দেশকে আষ্টে পৃষ্ঠে ফেলেছে তার সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ইন্দোনেশিয়ার ও পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন ব্যবসায়ীদের পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জনের চিত্র থেকে। ইন্দোনেশিয়াতে ১৯৭০ সালে মোট মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৮৬ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭৪ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৪ ভাগ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকার করেসারিকে পরিচালিত এক সামরিক-অভ্যুত্থানের ফলে সোকের্ণো সরকারের পতন ঘটিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় এক ফৌজি-সরকার ক্ষমতায় করা হয়। ঐ ফৌজি দেশে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ উন্মুক্ত এবং তার পরিণতিতে ঐ দেশের তৈল, কাঠ ও অন্যান্য আরও বহু সম্পদ সেদেশের লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেয়। এরূপে এক বৎসরের ভিতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুনাফা লুণ্ঠন দ্বারা তার 'মূলধনের সম্পূর্ণ সম-পরিমাণ অর্থই কেবল পুনরুদ্ধার করে মূলধনের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে তাই নয়, অধিকন্তু আরও শতকরা ৫৫ ভাগ বেশী অর্থ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

এই যখন ইন্দোনেশিয়াকে লুণ্ঠনের অবস্থা, তখন মধ্য প্রাচ্যে মার্কিনী ব্যবসায় মুনাফা শিকারের চিত্রটি আরও ভয়ঙ্কর। সেখানে ১৯৭২ সালে লগ্নীকরণ থেকে মোট মূলধনের শতকরা ৬৩.৮ ভাগ সমান অর্থ পুনরায়-বিনিয়োগ করা হয় এবং ১৯৭৩ সালে ঐ একই লগ্নীকৃতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংযোজনের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে উঠেছে শতকরা ৬৪.৯ ভাগে এবং ১৯৭৪ সালে উহাই বর্তমানে সংযোজনের [illegible] দাঁড়িয়ে গেছে শতকরা ৩৯.৬ ভাগে।

[illegible] মার্কিনী লুণ্ঠন

[illegible] কর্তৃক অনুসেবকে লুণ্ঠনের এক বৎসরের [illegible] মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্যে [illegible] ঘটনা বর্তমানে তুলনাহীন। তবুও [illegible] [illegible] আরবরা নীগণকে তেলের [illegible] ভাবে দাম দিতে অভ্যস্ত। অথচ তেলের [illegible] তেলের উপরই অধিক পরিমাণে উপকৃত [illegible] বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যে কোন [illegible] বাদের অন্যান্য অধিকার বর্তায়, অর্থাৎ [illegible] মার্কিনী বিদেশী তেল কোম্পানীর কথাই বলা [illegible]

[illegible] বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষাবলম্বী [illegible] অধিক বেশী মাত্রায় বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ সৃষ্টির পক্ষে ওকালতি করেন, [illegible] তাঁরা ভারতে ভালবাসেন যে ভারতের অর্থ উপার্জনের মাত্রার সম্পদ ও উপায়সমূহকে বিদেশী শোষণ দ্বারা বিপন্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীগণের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী বিনিয়োগের স্থান অত্যন্ত ভাল ভাবেই সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং ভারতীয় অর্থনীতি তেতে উহা সবচেয়ে দ্রুত প্রসার লাভ করছে।.....

ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রসারের চিত্রটি দেখা যেতে পারে ভারত-মার্কিন সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বেসরকারী যৌথ কারবার সংস্থার সংখ্যা বিচার থেকে। ১৯৫৭ সালে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি; কিন্তু ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৮১১ তে। ব্রিটেন এ বিষয়ে সবার উচ্চে। এরই সময়ের মধ্যে তার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১,৩৫৮ যে এবং বলা যায় যুরোপের এমন একটি দেশও নাকি নেই যার সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতের বুকে সহযোগিতার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথ কারবারে লিপ্ত হন নি। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বিদেশের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় পরিচালিত সংস্থার সংখ্যা এ দেশে এসে দাঁড়ায় ৯৩২৫। অতএব প্রতি বৎসর গড়ে ২৫০টি যৌথ কারবার সৃষ্টির নজীর ধরলে বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের শেষে আমাদের মোট বিদেশীদের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারে এসে উপনীত হবে।

দেশকে বরতে চলে প্রযুক্তি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য আমাদের মুক্তি বোধগম্য। কিন্তু, ভারতে মার্চ্চ লাগে এই পাঁচ হাজার যৌথ-সংস্থা সমন্বিত বনিয়াটির আওতাধীন নয়ন জানলে। প্রযুক্ত-কর্ম বিষয়ক এক পুরাপুরি আমদানী করা হচ্ছে, যাকী টাকার বিনিময়ের জন্য এক ভজনের মত প্রতিষ্ঠান অভিজাত হোটেল ঘর ও সৌখিন পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রব্যাদির কারবারে ব্যস্ত রয়েছে। সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে যারা মানসিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে তাদের অর্থ বিনিয়োগের ভুলাকোপূর্ণ ক্ষেত্র নির্দেশ। ভারতীয় অর্থনীতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করার চিন্তা নিয়ে দেশের ধন-সম্পদ বাহিরে চলে যাওয়ার পথ রোধ করা যায়, অপরপক্ষে দেশকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান সুপ্রসারিত হতে পারে। যদি দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ় শক্তিশালী করতে হয় তবে এইসকল বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় গঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। (১৯৭৬ সালের ২৪ শে জুলাইয়ের রিপোর্ট থেকে বিকাশ গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত)।

শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা

(দর্পণের সংবাদ দাতা)

হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার অন্তর্গত বেগড়াই হাইস্কুলে আরবী শিক্ষকের একটি পদ খালি আছে। অথচ মাধ্যমিক পর্ষদ শিক্ষক নিয়োগে অনুমতি দিচ্ছেন না। বেগড়াই হাইস্কুল-প্রধান শিক্ষক তাবাশ্বর ঘোষ আরবীর প্রাক্তন শিক্ষক মনাব আবু নাসের গোলাম মোহম্মদকে তাঁর স্থলে চাকুরী দেবার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহাকরণে বেশ কয়েক দফা অনুরোধ করেছেন। স্কুলের পরিচালক সমিতিরও ইচ্ছা আরবী শিক্ষক নিয়োগের। অথচ পাঁচ নম্বর কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের (কলকাতা) মধ্যশিক্ষা বোর্ডের কর্তারা বলেছেন এ নিয়োগ সম্ভব নয়। শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেছেন আমি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি ডাইরেক্টর সেকেণ্ডারী এডুকেশনের দপ্তরে। আজ এক বছর ধরে গ্রামবাসী স্কুলে আছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আরবী পড়া ছাত্রদের বলছেন—আমি আর কিছু করতে পারছিনা। আরবী ছাত্রদের অসুবিধা বাড়ছে।

মিকির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮·০০
পৃথিবীর বয়স	১৪·০০
জীবন নিরবধি	১৬·০০
ঘরে ফেরারদিন	৫·০০
দিবস বিভাবরী	৫·০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬·০০
আলোর সহোদর	৪·০০
পারাবারের তীরে	১০·০০

সকসাথী ॥ ১৭২।১এ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিরুদ্ধকেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী।

মতামত

চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন

দর্পণের ১৬শে নভেম্বর সংখ্যায় রণজিৎ রায়ের "চীনের মুক্তি যুদ্ধ ও সোভিয়েটের নীতি" শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর লেখা চিঠিতে রণজিৎবাবু কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন। এই তথ্যগুলি থেকে নতুন কোন সত্যের উদ্ঘাটন হওয়া যায় না। তথ্য এবং সত্য এক জিনিষ নয়। বাস্তবে যা আছে তা সবই হোল তথ্য বা ঘটনা। বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনার আন্তঃসম্পর্কের নিগূঢ় বিধি হোল সত্য। রণজিৎবাবু তাঁর চিঠিতে প্রকৃত পক্ষে কোন সত্যের সন্ধান করেন নি।

একটি ক্ষেত্রে তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং আরেকটি ক্ষেত্রে তিনি অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে কেবল ষ্ট্যালিনকেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন (সব তথ্যগুলির সঠিকতা যাচাই করা আমার পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নয়)। তিনি লিখেছেন, "ষ্ট্যালিনের আশীর্বাদ পুষ্ট বই সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। ষ্ট্যালিনের ১৯৩৮ সালে মৃত্যু পর্যন্ত চীন ছাড়া সব দেশের কমিউনিষ্টদের নিকট বইটি ছিল ধর্মগ্রন্থের মত মহাপুত।" এ তথ্যটি পুরোপুরি সঠিক নয়। ১৯৫৮ সালে ষ্ট্যালিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির (বলশেভিক) সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে মাও সে তুং তাঁর পার্টিতেও অবশ্যপাঠ্য একটি গ্রন্থ বলে গণ্য করতেন। ১৯৪১ সালে মাও সে তুং লিখেছিলেন, "Morever, in studying Marxism-Leninism, we should use the History of the Communist Party of Soviet Union (Bolshevik) Short Course as the principal material. It is the best synthesis summing up of the world communist movement of the past hundred years, a model of the integretion of theory and practice and so the only comprehensive model in the whole world:" (Mao Tse Tung, Reform our study, May, 1941) কাজেই রণজিৎবাবু যে লিখেছেন 'চীন ছাড়া' তা সঠিক নয়।

আরেকটি তথ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দ্বিতীয় দশকে ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক সংবদ্ধদের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে "সোভিয়েটাইজ" অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।" এই তথ্যটি অসম্পূর্ণ। ১৯২১ সালে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তকেই ষ্ট্যালিন পরবর্তীকালে কার্যকরী করেছিলেন। ১৯২২ সালে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন নিজেই বলেছেন, "At The third Congress, in 1921, we adopted a resolution on the Communist Parties and on the methods and content of their activities." চতুর্থ কংগ্রেসের এই ভাষণে লেনিন সেই সিদ্ধান্তের ভুল সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছিলেন, "I have the impression that we made a big mistake with this resolution, namely, that we blocked our own road to further success." সেই সিদ্ধান্তের ভুল দিকটি হোল—"The resolution too Russian, it reflects Russian experience." (সব উদ্ধৃতিগুলি লেনিনের, ১৯২২ সালের কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসের ভাষণ থেকে নেওয়া)। তবুও লেনিন কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করে দেননি। ফলে লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালে ৫ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং লেনিনের স্বীকারোক্তিগুলির প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে পৃথিবীর সব দেশের পার্টিগুলিকে 'বলশেভাইজ' (সোভিয়েটাইজ নয়) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই রণজিৎবাবুর এই তথ্যটিকেও সংশোধন করে নেওয়া প্রয়োজন।

রণজিৎবাবু যুক্তিহীন ভাবে চীনের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর চিঠির বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মার্কসবাদে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব মুখ্যত কৃষক শ্রেণীর সংগঠিত সশস্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করেও যে বিপ্লব সফল করতে পারে চীনে মাও সে তুং তা প্রমাণ করেছেন। মস্কো কর্তৃক প্রচারিত পন্থার সঙ্গে মাও-এর পন্থার কোন সাদৃশ্য নেই, তাই মাও যা সফল করেছেন তা কমিউনিষ্ট বিপ্লব হতেই পারে না।" মাও সে তুং-এর তৎকালীন বক্তব্য থেকে কিন্তু রণজিৎবাবুর এ কথার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না; বরং মাও সে তুং ষ্ট্যালিন নির্দেশিত পথের কথা উল্লেখ করে ষ্ট্যালিনের প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর ষ্ট্যালিনের ৬০ তম জন্মদিন উপলক্ষে মাও সে তুং লিখেছিলেন, "কেবলমাত্র ষ্ট্যালিন কর্তৃক নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে ও তাঁর সাহায্যেই মানব সমাজ সেই দুঃখবেদনার অবসান ঘটাতে পারে।...ষ্ট্যালিন হচ্ছেন চীন জনগণের মুক্তির প্রকৃত বন্ধু। মতবিরোধ ঘটাবার কোন প্রচেষ্টা, বা কোন মিথ্যা কথা বা দুরভিসন্ধি প্রচার—ষ্ট্যালিন সম্পর্কে চীনা জনগণের সর্বান্তঃকরণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাকে, বা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত বন্ধুত্বকে প্রভাবিত করতে পারবে না।" কোন বন্ধুর ভুল ত্রুটি গোপন করে যাওয়াটা নিশ্চয় প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় নয়। রণজিৎবাবু কি বলেন?

বর্তমানে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি রাশিয়াকে পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধীন বলে প্রচার করলেও ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে লেখা "নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে" বইতে মাও সে তুং কিন্তু ঠিক বিপরীত কথাই বলেছিলেন, "পুঁজিবাদের মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর এক অংশে (সোভিয়েট ইউনিয়নে) বাস্তবায়িত হয়ে নিয়েছে অন্যান্য দেশেও এর অবস্থা হয়ে উঠেছে পশ্চিম পাহাড়ে অস্তমিত সূর্যের ন্যায় ক্রত ডুবন্ত, মুমূর্ষু ব্যক্তির মত শীঘ্রই বাহুবন্ধনে এর স্থান হবে।" ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন এবং সোভিয়েট সম্পর্কে চীনা পার্টির মতের পরিবর্তন হোল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ষ্ট্যালিনের মৃত্যু এবং খ্রুশ্চেভের অভ্যুদয়ই যে ষ্ট্যালিন এবং রাশিয়া সম্পর্কে চীনা পার্টির মতের পরিবর্তন হবার কারণ এ সম্পর্কে চীনও কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি সরবরাহ করতে পারেনি। খ্রুশ্চেভের নেতৃত্বেই রাশিয়ার রাষ্ট্র চরিত্রটি পরিবর্তিত হয়ে গেল এটা কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। কারণ খ্রুশ্চেভ তো আর আকাশ থেকে পড়েন নি। সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা থেকেই তিনি উদ্ভূত হয়েছিলেন। তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সোভিয়েট পার্টির মতাদর্শ এবং সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সোভিয়েট পার্টির মতাদর্শ এবং সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার মূলিগতভাবে পরিবর্তিত নয়? রণজিৎবাবু কি এসব তথ্য বিশ্লেষণ করার সময়টা এড়িয়ে গিয়ে ষ্ট্যালিন এবং সোভিয়েট সম্পর্কে চীনের মূল্যায়নের গরমিলকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন না? রণজিৎবাবু নিশ্চয়ই জানেন যে যেকোন বস্তুর উদ্ভব এবং বিকাশের মধ্যেই তার পরিবর্তনের কারণগুলি নিহিত থাকে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন সম্পর্কে সোভিয়েট পার্টির বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও চীনা পার্টি পরবর্তী সময়ে দুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্ট্যালিনের মূল্যায়ন করে লিখেছিলেন,

"ষ্ট্যালিন সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুল করেছিলেন।"

"আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে তিনি কিছু ভুল নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

"ষ্ট্যালিন আত্মগত চিন্তা ও একপেশেদির শিকার হয়েছিলেন এবং বাস্তব পরিস্থিতি ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।"

"যদিও সময়ের সময়ের তফাৎ মেনে এই ত্রুটিগুলির কথা শুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে তবুও সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে আমাদের যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে—যাতে আমরা তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি এবং জনগণকে বিভ্রান্ত না করি। আমাদের মতে ষ্ট্যালিনের ভুলগুলি ছিল তাঁর সাফল্যগুলি থেকে গৌণ।" ("সর্বহারা একনায়কত্ব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে" এবং "ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও বক্তব্য," ৬ই এপ্রিল ও ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৭)

ষ্ট্যালিন সম্পর্কে চীনা পার্টির এসব বক্তব্য ভারতের মার্কসবাদী মহলে খুবই পরিচিত। তবুও চীন এবং রাশিয়ার ঐক্যের সমস্যা যেমন থেকেই গেছে তেমনি আন্তর্জাতিক এই মতৈক্যের ফলে ভারতের জাতীয় ক্ষেত্রে মার্কসবাদে বিশ্বাসীরা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েই রয়েছেন। তাহলে রণজিৎবাবু বহুমতীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে ষ্ট্যালিন এবং সোভিয়েট সম্পর্কে নতুন কি সত্যের সন্ধান দিলেন? তিনি চীনের থেকেও ষ্ট্যালিন এবং সোভিয়েট সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে পেরেছেন?

রণজিৎবাবু জেনেই হোক অথবা না জেনেই হোক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্রকে এক করে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "যুদ্ধাবসানের পর থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানী থেকে নানা পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া পূর্ব জার্মানী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকরে আত্মপ্রকাশের পরও চলতে থাকে।" অর্থাৎ যে জার্মান কমিউনিষ্টরা হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের হিটলারের উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করে তাঁদেরই দ্বারা পুঁজিপতি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঘাড় ভেঙ্গেছে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন।" এ কথার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা একনায়কত্বাধীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে শোষণ করতে পারে এবং সর্বহারা একনায়কত্বাধীন আরেকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের দ্বারা শোষিত হতে পারে। রণজিৎবাবুর বক্তব্য থেকে এ ছাড়া অন্য কোন অর্থ করা যায় না। উক্ত রাষ্ট্রের নেতাদের পারস্পরিক ভুলের জন্য এ ঘটেছিল অথবা উক্ত দেশের সর্বহারা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রকৃত কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি—এমন কোন মর্ম রণজিৎবাবুর বক্তব্য থেকে করা যাচ্ছে না। ফলে রণজিৎবাবু যা বলতে চাইছেন তা হোল কোন দেশকে শোষণ করা এবং কোন দেশের দ্বারা শোষিত হবার ব্যাপারে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চীন যে কোন দেশকে শোষণ করে না এবং অন্য কোন রাষ্ট্রের দ্বারা যে সে নিজেকে শোষিত হতে দেয় না—এমন কোন তথ্য রণজিৎবাবু উপস্থিত করতে পারেন নি। ফলে স্ট্যালিন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসবাদী মতবাদকেই সরাসরি আক্রমণ করেছেন।

(শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়)

লবণ-শিল্প

(২২ পৃষ্ঠার পর)

মালঙ্গীর (অর্থাৎ লবণ-শিল্পের কারিগরেরা) ছিল দেশী-বিদেশী বণিকদের অসহায় শিকার। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে লবণ শিল্পে বণিক-সওদাগরের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও মালঙ্গীদের উপরে অত্যাচার উৎপীড়ন কিছুমাত্র লাঘব না হয়ে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এমন কি "হেষ্টিংসের শাসনকালের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মালঙ্গীদের উপর এই উৎপীড়ন অব্যাহত ছিল।'১৭ হেনরী বিস্তারিত তাঁর গ্রন্থে যাথর্ব-সঙ্গের মালঙ্গীদের উপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "....লবণ উৎপাদনের জন্য এমন ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলেছিল যে, তা সহ্য করতে না পেরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৩৫-টি মালঙ্গী পরিবার বাস্তুভিটা প্রভৃতি সর্বস্ব ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেছিল।১৮ খুলনা জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ বলা হয়েছে যে, মাহিষ্যারদের (লবণ-কারিগরদের) উপর 'লবণ-কর্মচারীদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন সকল সময়েই চলত। ছোট-খাটো কাজে মাহিষ্যারদের যে দাদন দিতে বাধ্য করা হত, সেই দাদনের প্রতি টাকায় টাকার তিন ভাগ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হত।" ১৯ 'সংবাদ প্রভাকর'-পত্রিকা লিখেছেন (৩০. ৩. ১৮৫৩ বঙ্গাব্দ), "লবণ সংক্রান্ত কর্মচারিবিদের অত্যাচারে জমীদার ও সাধারণ প্রজাগণ অতিশয় ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছেন এবং জিলার মোহরার অব্দি সাহেবরা সেই অত্যাচারি লবণের কর্মচারিদিগের প্রতিই সাহায্য করিতেছেন।" ২০ স্যার জন ষ্ট্র্যাচীও মালঙ্গী-মাহিষ্যারদের উপর উৎপীড়ন-নিপীড়নের কথা অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "লবণ-বিভাগে শঠতা ও অসদাচরণের একটা নির্লজ্জ ব্যবসা চালু ছিল। বহু হাজার লোককে কাজ করতে বাধ্য করা হত, আর তাদের দেওয়া হত বেঁচে থাকার মতো খুব সামান্য খাবার। কয়েক শত লোককে জোর করে এই চাকরি নিতে বাধ্য করা হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের হাত-পা বেঁধে মুন্সদবরদের সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে পাঠানো হত কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের লবণ-উৎপাদনের জন্য।২১

সেকালের বাংলাদেশে লবণ-উৎপাদনের বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল বেদিনীপুরের তমলুক ও তেজুলী অঞ্চল। এই অঞ্চলে গ্রাণ্ট সাহেবের উদ্যোগ অনুসারে প্রায় ৩০,০০০ হাজার কারিগর লবণ-কারিগরদের কাজে নিযুক্ত ছিল।২২ তাঁরা প্রত্যেক বৎসরে ২৮ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করতেন। মেদিনীপুরে এই লবণ-কারিগরদের 'মালঙ্গী' নামে অভিহিত করা হত। মালঙ্গীরা দুভাগে বিভক্ত ছিল—(১) আজুরা মালঙ্গী (২) টিকা মালঙ্গী। এরা ছাড়া মুন্সি, মাস্তি, গাড়োয়ান, ওজনদার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হত। মালঙ্গীদের দৈনিক মজুরী এত অল্প ছিল যে তা দিয়ে তাঁরা কোনোরকমে এক-বেলার আহার-দ্রব্য সংগ্রহ করতেন, সেজন্য তাঁরা জমিদারের জমিতে দিন-মজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হতেন।

ভারতের কয়েকটি উপকূলে উৎপন্ন 'কর্কচ' লবণ বাংলার আমদানি করে বাংলার লবণ-শিল্পে সর্বপ্রথম সংকট সৃষ্টি করা হল এবং তা করা হয়েছিল ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ-শিল্পের স্বার্থে। সামুদ্রিক কর্কচ লবণ বাংলার সিন্ধু লবণের তুলনায় দরে সস্তা ছিল এবং ভিজাশালিত্ব, রাঙ্গামুণ্ডী, নেল্লোর, কভেলঙ্গ ও তাঞ্জোর থেকে কর্কচ লবণ জাহাজযোগে বাংলাদেশে আমদানি করা হত। অষ্টাদশ শতকের সত্তর দশকে বাংলাদেশে লবণ-আমদানির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে লবণ-আমদানি সুরু হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার পরিমাণ বেড়ে যায়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তারতের সমুদ্রোপকূল থেকে ৪, ২০, ০০০ মণ লবণ বাংলায় আমদানি করা হয় এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের একটি বিজ্ঞাপনে ছয় লক্ষ মণ লবণ আমদানির সংবাদ পাওয়া যায়।২৩

কোম্পানি-সরকার বাংলার লবণ-আমদানির প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্য ১৭৮৬ সালের গৃহীত নীতিকে ("বাংলাদেশে এসে পৌঁছালেন সমস্ত বিদেশী লবণের উপর শুল্ক দিতে হবে এবং বাংলাদেশে লবণ-উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্য প্রণোদন হলে অতিরিক্ত দিতে হবে।" ২৪) বাতিল করেছিল। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য লবণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অন্যত্র লবণ-শিল্পের জন্য তার জন বাংলায় লবণ আমদানির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সাধারণ অভিজ্ঞতাথেকে এটা আমরা ধরে নিতে পারি যে বাংলাদেশের লবণ উৎপাদন যখেষ্ট পরিমাণে সন্তুসারণক্ষম নয় এবং বিগত কয়েক বৎসরে লোক-সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুপাতে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আর যা পুরই সম্ভব, তাহলে এই পণ্যের চাহিদার জন্য অতিরিক্ত যোগানের প্রয়োজন হবে।, ২৫ কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কথা বলা যে একটা অনুমানের মাত্র, তা শ্রীএন, কে, সিন্হা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলা, বিহার, আসাম ও নেপালের মোট জনসংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। এই অঞ্চলে গড়পরতা বার্ষিক মোট লবণের ব্যবহার প্রায় ৩২ লক্ষ মণ— এর মধ্যে ২৮ লক্ষ মণ বাংলার লবণ আর ৪ লক্ষ মণ সমুদ্রোপকূলের লবণ (টু কোট, ৮৪ ডিসেম্বর, ১৮২৩খৃঃ) অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যাতবিদদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে গড়পড়তা বার্ষিক মাথাপিছু লবণের ব্যবহার হয় ৭ পাউণ্ড। এই হিসাবের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা নিশ্চয়ই ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ হয়ে থাকবে। এখানের মানুষ ২০ লক্ষ মণ লবণ ব্যবহার করে একটা ধরে নিলে বাংলোদেশের জনসংখ্যা (তাগলপুর, পাটনে, পূর্ণিয়া ও সিলেট সহ) নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ২½ কোটি ছিল।" ২৬ (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

[পাদটীকা প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হবে

সাম্প্রতিক হিন্দি ছবির হালচাল

ভানুসিংহ

কলকাতার অধিকাংশ চিত্রগৃহেই এখন হিন্দি ছবি চলছে। এমনটা অবশ্য শুধু আজই নয়, বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। কিন্তু এইসব হিন্দি ছবি কোন ধরণের, কি প্রকৃতির বা তার শিল্পগত মানদণ্ডই বা কি? অধিকাংশ হিন্দি ছবিই এক ধরণের—নিছিট্ট ফরমুলা মাফিক নাচ, গান, ডাঁড়ামি, যৌনদৃশ্য, প্রেমবিহার ও রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর, যা দর্শকদের একপ্রকারের তাৎক্ষণিক আনন্দ ও উত্তেজনার খোরাক করে। প্রকৃতিগত চরিত্র হল দর্শক মনোরঞ্জন করা, তা যে-মূল্যেই হোক্ । কলাকৌশলগত মান সাধারণভাবে বেশ উন্নত কিন্তু শিল্পরূপ সৃষ্টিতে শোচনীয় রকম ব্যর্থ। এ ধরণের ছবির প্রয়োজকদের একমাত্র লক্ষ্য বক্স অফিস জয় করা। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে ছবি তৈরী যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মানসিক শর্তপূরণে কোন মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। এমন কি, সুস্থ রুচি, বাস্তব বোধ, কার্যকারণ সম্পর্ক সব কিছুই সেখানে উপেক্ষিত। এমন ধারার হিন্দি ছবিই আজ কলকাতার বুকে দোর্দণ্ড প্রতাপে চলছে।

হিন্দি ছবির নির্মাতাদের কাছে চোর, জোচ্চোর, ঠগ্, শয়তানদের প্রসংগ খুবই প্রিয়। সেই 'জুয়েল থীফ্', 'দো ঠগ্' থেকে আজকের 'মহাচোর' একই ধারার সাক্ষী। তবে চোর, জোচ্চোরদের মধ্যেও মহিমা আরোপের একটা চেষ্টা আছে এবং সেটাই এদের জনপ্রিয়তার কারণ। ছবির নির্মাতা তখন ছবির বক্তব্য নিয়ে কিছু গুরুগম্ভীর কথা বলেন। এটা তাঁদের ভণ্ডামি। আসল ব্যাপার হল, চোরশয়তানের নানারকম ভেল্কি লাগানো খেল্ দেখিয়ে বাহিয়াৎ করা পরে কিছুটা 'রবিনহুড' জাতীয় বদমতা দেখিয়ে হাততালি কুড়োনোর মতলব। প্রত্যেক সফলকাম দীর্ঘাখেলাও 'দেই ঠগ্ ৪২-' থেকে আজও 'ফকিরা', 'হংকংমেলা'-তেও অব্যাহত। সাম্প্রতিক কালের মুগ্ধারহিট্ ছবি 'চোরা ফেরি' ও একই ঘরানার। অমিতাভ বচ্চন, সায়রা বানু, বিনোদ খান্না তারকাখ্যাতি দ্রুতগতি এই অ্যাকশন ফিল্মটি টেক্নিক্যাল দিকের প্রশংসা পেতে পারে, কিন্তু বক্তব্যে সায়রুর বলতে তো কিছুই নেই।

'এক নারী এক ব্রহ্মচারী' ছবিতে নায়ের চরিত্র থাকলেও সত্যিকারের ফিল্মি সত্তার এক কোঁটাও নেই। বেশ বুঝতে পারা যায়, ছবির নির্মাতা একটি রঙচে হাসির ছবি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবাস্তব কাঠখোট্টা কাণ্ডকারখানা ছবিটিকে প্রকৃত কমেডি করে তুলতে পারেনি। মাত্রাজ্ঞান যেখানে নেই, সেখানে রসসৃষ্টির অবকাশও নেই। জীতেন্দ্র ও মুমতাজ শুধু একটি অভিনেতা চিত্রনাট্যের শিকার হয়েই থাকলেন। বেবর সাহেব 'হাতি মেরে সাথী' মুগ্ধারহিট্ করার পর থেকেই জন্তু জানোয়ারের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে ছবি করতে মেতে গেলেন। দু-তিনটে ছবির অর্থ-ভাগ্যও মোটামুটি দেখা গেল্। এবার তিনি 'মা' ছবি উপহার দিলেন ধর্মেন্দ্র ও হেমামালিনীকে নিয়ে। এ ছবিটিতেও জানোয়ারের খেলা মুখ্য, তবে ধর্মেন্দ্রর খেলা বোধকরি তার থেকেও বেশি। যেভাবে নায়ক একপাল বাঘের মুখোমুখি হয়ে কসরত দেখিয়েছেন তাতে চমকে উঠতে হয় বৈকি দেখেও। তবে গল্পের শেষ হয়েছে এক প্রাথাক পেয়ে বসে!

Regd. No. WB/CC-32

PRICE 40 Paise

বাংলাদেশের ঘটনা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মুজিব-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে মুখ্য সামরিক প্রশাসকরূপে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ও ক্রমপ্রধান্য প্রতিপত্তি নবজাত এই রাষ্ট্রটির অন্যান্য রাজনীতিতে সামরিকভাবে হলেও একটা স্থায়িত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চোখে পড়ে। একটি হচ্ছে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সামগ্রিক সন্ধানপরতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিয়ার প্রশাসনের প্রতি বামপন্থীদের কিছুটা সহিষ্ণু মনোভাব।

বাংলাদেশে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা বেড়ে উঠেছে প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে। এই সাম্প্রদায়িকতার ভূত শুধু মুসলিম লীগের কাঁধেই ভর করে ছিল না—এমনকি তথাকথিত কিছু বামপন্থী পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় এরা দীর্ঘদিন বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

সদ্য-প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমান পরিচালিত জাতীয় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সংগ্রামী ও প্রগতিশীল অংশের নেতৃত্বে ছিলেন মণ্ডলানা ভাসানী। তাঁকে ঘেরিয়ে আসার পর জাতীয় আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের যে অংশ বরাবরই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে দলের নীতি-নির্ধারণে ও নেতৃত্ব বিধানে তাদেরই প্রাধান্য ঘটে।

অপরদিকে, মুজিব-চালিত আওয়ামীলীগের অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলো সংহত হচ্ছিল। আওয়ামী লীগ কোনদিনই সুস্থমনস্ক রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে ওঠে নি। এর চরিত্র ছিল ঢিলেঢালা গণসংগঠনের মতো। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রভাব বিলুপ্তির পটভূমিকায় দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের একটা অংশ আওয়ামী লীগকে রক্ষ হিসেবে ব্যবহার করেছে। খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ, ওবায়দুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রভাব আওয়ামী লীগের সংগঠনে খুব একটা নগণ্য ছিল না। সারওয়ার্দী যখন আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে তখন কাশ্মীর-প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলোই সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিল। এরা মুখে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বললেও গোপনে যোগাযোগ রাখতো হামিদুল হক চৌধুরী ও সবুর খাঁর মতো ঘটর দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে। তাজুদ্দিন, মনসুর আলী প্রমুখ আলী প্রগতির যে সব নেতা কিছুটা উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল মনোভাব পোষণ করতেন তাদের সঙ্গে মোস্তাক আহমেদের সম্পর্ক তেমন মধুর ছিল না কোনদিনই।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে যতগুলো শক্তিশালী গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে সেখানে সবচেয়ে আলোড়নকারী সংগ্রামী অংশের নেতৃত্ব ছিলেন চরমপন্থী পার্টি, সিরাজ সিকদারের পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি, মতিন আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের একটি গ্রুপ, টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী পরিষদ। বাংলাদেশে বামপন্থী শক্তি বলতে প্রধানতঃ এদেরই বোঝায়। অবশিষ্ট দলগুলোর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে নিয়ন্ত্রক আখেরপর্যন্ত সর্বত্রই সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলো সক্রিয় ছিল এবং আছে।

বাংলাদেশে আরও একটি বিচিত্র পার্টি আছে যার নাম জাতীয় আওয়ামী দল। সংক্ষেপে এর নাম জাপ। মুজাফ্ফর আহমেদ এই পার্টির নেতা। যদি সিংহের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্ট পার্টি 'জাপের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকে বলে এই পার্টিটি মস্কোপন্থী গ্রুপ নামেই পরিচিত। সম্প্রতি এই পার্টি নির্বাচনের দাবীতে মোচার্চ তওগার এর বহু নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে বেগম মতিয়া চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। জাপ বরাবরই আওয়ামীলীগের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মুজিবের সঙ্গে মস্কোর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাপের দৌত্য বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

ভিয়েতনাম রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (আওয়ামীলীগের ভাঙ্গনের অংশ) সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রভাবকে জিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়। ফলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে জিয়ার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মোস্তাক আহমেদ এই সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি চালে ভুল করলেন। সেনাবাহিনীর প্রধানদের উপর তার কোন প্রভাব ছিল না। ডালিম-ফারুক প্রমুখ কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ অফিসারদেরও সৈন্যবাহিনীতে এমন কোন প্রভাব ছিল না যে মোস্তাক আহমেদ তাদের উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেন। যেভাবেই হোক, মোস্তাক সাহেবের নাম মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

শেষের দিকে, মুজিবের জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হলেও যে উপায়ে তাকে এবং তার পরিবারের অন্যান্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষই তা সমর্থন করতে পারে নি। মোস্তাক সাহেব তাই নূতন বেশে মঞ্চে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের সাহায্যে নূতন দলও গঠন করেছিলেন একটা। কিন্তু জিয়ার অনমনীয় মনোভাবের জন্য সেই সাধ পূর্ণ হোল না।

হাজী মঃ দানেশ, মঃ তোপা প্রভৃতি বামপন্থীদের খুশি হওয়ার কথা। তাঁরা বেশ কিছুদিন যাবত নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী জানিয়ে এসেছেন। কারণ, এই মুহূর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সুবিধে হোত।

বামপন্থী ঐক্য সম্পর্কে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তখন বিশেষ করে যুক্ত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সি পি আই তার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অনেক কথাই স্বীকার করেছেন তারা Negative feature-এর প্রাধান্যের কথা বলেছে কিন্তু এই সব বিশ্লেষণ থেকে যে-সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ দুর্ভাগ্যবশত তারা সেই সিদ্ধান্তে আসছেন না।

সি পি আই-এর সঙ্গে আরও আলোচনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে তবে ওদের সর্বভারতীয় কৃষক সমিতির কাছে আমাদের সর্বভারতীয় কৃষক সভার কাছ থেকে যে-চিঠি দেওয়া হয়েছে, যতদূর জানি, তার কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। টেবলে চাপা রাজার ভ্রূণিক হাঁচাই হয়েছে। ভীষণ ভুলুম চলছে সেখানে। সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্ব টি ইউ সি কে এ ব্যাপারে অনেক আবেদন করেও দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও কোনো সাড়া পায়নি।

প্রশ্ন—সি. পি. আই (এম)-এর পলিটবুরো সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করেছে তাতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। কী ভাবে ঐক্য ও গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে উঠবে ?

উত্তর—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমন অনেক শক্তি আছে যারা নিজেদের বামপন্থী বলে মনে করেন না কিন্তু তারা গণতান্ত্রিক শক্তি। কংগ্রেস থেকে যারা বিতাড়িত হচ্ছেন তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যাদের আমরা গণতান্ত্রিক শক্তি বলে মনে করি। কংগ্রেসের মধ্যেও এমন ব্যক্তি আছেন যারা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং যারা আমাদের মতো বামপন্থী না বলেও গণতান্ত্রিক শক্তি। এরাও গণতান্ত্রিক মোর্চায় যোগ দিতে পারেন। তবে কংগ্রেসকে না ছাড়লে তা সম্ভব নয়।

আমরা দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসের কথা বলতে গিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলেছি। এই কেন্দ্র যত শক্তিশালী হবে তত গণতান্ত্রিক মোর্চা ব্যাপক হবে। মোর্চা যত ব্যাপক ও শক্তিশালী হবে ততই তার মধ্যে নতুন ধরণের Development হতে পারে বৈকি। কংগ্রেসের মধ্যে যাদের নীতিগত পার্থক্য রয়েছে তারাও সেই গণতান্ত্রিক মোর্চার সামিল হতে পারেন।

চীন ও সোভিয়েট

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন মাও প্রত্যেকেই ভুল করেছেন। ব্যক্তিমানুষ যতই প্রতিভাবান হোন না কেন তাঁরাও ভুল করতে পারেন। কারণ তাঁরা যখন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তখন তাঁদের গবেষণা বিভিন্ন অজ্ঞাত তথ্য এবং অনাবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু স্ট্যালিনের ভুলের কারণ কেবল অজ্ঞাত তথ্য এবং অনাবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা সীমাবদ্ধতা নয়। কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগী এবং কম আন্তর্জাতিক ভুল কিছু ভুল এড়াতে পারতেন এবং কিছু ভুল সংশোধন করতে পারতেন। কাজেই মার্কস এঙ্গেলস লেনিন এবং মাও-এর ভুল আর স্ট্যালিনের ভুল একইভাবে বিচার করা চলে না। সে যাইহোক, স্ট্যালিন এবং সোভিয়েট সম্পর্ক নতুন করে মূল্যায়ন করার জন্য সর্বহারা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার প্রকৃতই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট পার্টি এবং রাষ্ট্রের বিকাশ কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এ নিয়ে কেউ বিতর্ক করতে চাইলে আমি প্রস্তুত আছে।

পঙ্কজ চৌধুরী

কংগ্রেসীদের বিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং ফকর ইসলাম ও লক্ষ্মী বসুর দুই বিরোধী গোষ্ঠীতে অবস্থান।

সেপ্টেম্বর মাসে যখন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল তখন শোনা গিয়েছিল যে, প্রো-চেঞ্জারাইট সিরভুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এক নিশ্চল নায়ক। ব্যাপারটা এমন অপেক্ষোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন, এমন কি কংগ্রেসী রাজনীতির কোন যোগ নেই সেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও প্রণব মুখোপাধ্যায় কারনানী ম্যানসানে সাংবাদিকদের ডেকে এই রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে বক্তৃতা করেন। অদূরের এমনই পরিহাস যে, আজ যখন প্রো-চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জারদের তীব্র বিরোধ চলছে তখন এঁদের নাম একেবারে মুছে গেছে। কিন্তু আর একটি নাম ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে। ইনি নির্বাচনী মামলায় সুপ্রীম কোর্টে প্রধানমন্ত্রীর আইনজীবী অশোক সেন।

এক সময়ে সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী বরকত সাহেবের নামও শোনা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী পদের অন্যতম প্রার্থীরূপে। জানা গেছে মালদা সফরে তাঁর "বিজয়" উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রাও বেরিয়েছিল এক সময়ে। সেই বরকত সাহেব এখনও পরিবর্তন চাইছেন, কিন্তু এটা বুঝে নিয়েছেন তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে একাত্তই দুরাশা।

যদিও ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের মধ্যে বিভেদ সবচেয়ে বেশি। দুই গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছুঁড়ছে। ১৯৭১-৭২ সালে কংগ্রেসে "নতুন রক্ত" সঞ্চারের পর থেকে ঐক্য অনৈক্যের খেলা চলছে। কখনও বিভেদ তুঙ্গে ওঠে, আবার ঐক্য আলোচনা শুরু হয়। কিছুদিন শোঁয়ানে শান্তি। তারপর কিছু সময় দিয়ে আবার অশান্তি। কিন্তু অতীত অবস্থার পর কংগ্রেসীদের বিরোধ এই প্রথম এত প্রকাশ্য ও তীব্র আকার নিয়েছে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ
বর্ষ ১৮শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৬ই ডিসেম্বর '৭৬ ॥ ৩০ পয়সা

প্রো-চেঞ্জাররা দিল্লীর শক্তিতে বলিয়ান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের অন্ধকারে পশ্চিম বাংলায় কোন পরিবর্তন করা হলে জনসাধারণ কোন মতেই তা মেনে নেবে না। পরিবর্তন বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা শ্রীসত্যকিঙ্কর বসু এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানান।

পরিবর্তনপন্থী নেতা চঞ্চল ইদানীং সম্প্রতি বলেছেন ১৯শে ডিসেম্বর মধ্য কলকাতার জনসভায় বলব কেন পরিবর্তন চাই। আর ডিসেম্বরের শেষে ময়দানে জনসভা করে বলব কেন পরিবর্তন হল। শ্রীইসলামের এই বিবৃতি সম্পর্কে সত্যবাবুর বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে শ্রীবসু এই মন্তব্য করেন।

সারা সপ্তাহ ধরে উভয় গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। উভয় গোষ্ঠীর নেতারাই তাঁদের জয় সম্পর্কে আশাবাদী। তবে পরিবর্তনপন্থী নেতারা স্থির নিশ্চিত যে, রাজ্য প্রশাসনে পরিবর্তন হবেই।

সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ কয়েক ঘন্টার জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন। জানা গেছে কেন্দ্রের জনৈক নেতা তাঁর অসন্তোষের কথা শ্রীঘোষকে জানিয়ে দিয়েছেন। দিল্লীর এই প্রভাবশালী নেতার কথা শুনে শ্রীঘোষ খুব চিন্তিত। জানা গেছে, কলকাতায় শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি তাঁর রাজনৈতিক হতাশার কথা আক্ষেপের সুরে বলেছেন।

হালফিল দেখা দিয়েছে পরিবর্তনপন্থী নেতারা দিল্লীর শক্তিতে বলিয়ান। এই গোষ্ঠীর জনৈক নেতার মতে হাইকম্যাণ্ড পরিবর্তনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে অপেক্ষা কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই নেতা বলেন যে, সর্বভারতীয় রাজনীতির পেক্ষাপটে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়ত কিছুটা দেরি হতে পারে।

তবে পরিবর্তনপন্থী নেতারা যত জোরেই বলুন না কেন, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কিছু হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে পারে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে পারে বলে কংগ্রেসের প্রভাবশালী মহল থেকে শোনা যাচ্ছে। অবশ্যই এই পরিবর্তন নির্ভর করছে আগামী কয়েকদিনের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ওপর।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লী যেতে পারেন। দিল্লী যাওয়ার সময় তিনি কয়েকজন মন্ত্রীর কার্যকলাপের রিপোর্ট সম্বলিত একটি ফাইল নিয়ে যাবেন। দিল্লীতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এইসব মন্ত্রীদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানাবেন। মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযশবন্ত বরুয়ার সঙ্গেও কথা বলবেন। দিল্লী সুনিশ্চিত করে কিছু না বললে মন্ত্রিসভার দপ্তর পুনর্বণ্টন করবেন।

এই দপ্তর পুনর্বণ্টনে অবশ্যই পরিবর্তনপন্থী মন্ত্রীদের প্রভাব খর্ব করা হবে। যদি দিল্লী ওড়িশার 'ষ্টাইলের শাসন অথবা নেতৃত্ব পরিবর্তন না করে তবে পশ্চিমবঙ্গে এই রদবদল হতে পারে বলে ঐ মহল থেকে জানা গেছে।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

জটিল পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে। সবার উপরে এখন কংগ্রেসীদের লড়াই। প্রশাসনিক পরিবর্তন নিয়ে কংগ্রেস দল বিধাবিভক্ত হয়ে দুই শিবিরে দাঁড়িয়ে আছে। কোন্ দিকে পাল্লা ভারি বলা শক্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুপক্ষেরই সমান জোর। কাগজে কলমের খবর ও বিবৃতির লড়াইয়ে কেউই কম যায় না। সেই জন্যেই এই রাজ্যের ভাগ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলে আছে। স্পষ্টতই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত। কাদের দাবি মেনে নেবেন —পরিবর্তনকামী, না পরিবর্তন বিরোধীদের? যাদের দাবি অস্বীকৃত হবে তারা যে সব দমন করে যাবে, কোন গোলমাল করবে না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? পরিবর্তনের দাবি মেনে নিয়ে যাকে বসানো হবে তিনি কতদিন পরিবর্তনকামীদের আস্থাভাজন থাকবেন? এই সব প্রশ্ন সম্ভবতঃ কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডকে বিব্রত করছে। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড মানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দু দলই বলেছেন "আমাদের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী" যা বলবেন তাই মেনে নেব। কিন্তু নেত্রী এখনও নীরব। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের মধ্যে সংঘর্ষের পটভূমি প্রস্তুত। সংঘর্ষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে কিনা জানা যায়নি, কিন্তু আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের হুমকী দেওয়া হচ্ছে।

তিন মাসের ওপর হয়ে গেল এই রাজ্যকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। যিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা, যাঁর ওপর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত তিনি সদা আশঙ্কিত এই বুঝি দিল্লীর নির্দেশে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। এই অবস্থায় যে ব্যক্তি প্রশাসনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তিনি সাধারণ মানুষ নয়, মহামানব। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিশ্চয় নিজেকে মহামানব মনে করেন না। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য যাঁরা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একই ছাদের তলায় বসে তাঁর বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছেন। তারপরও কোন্ নির্বোধ ব্যক্তি আশা করেন এঁরা একসঙ্গে বসে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করবেন?

১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংসের সচিবালয় দপ্তর প্রায় দশীয় দপ্তরে পরিণত হয়েছে। কোন কোন মন্ত্রীর খোদ দপ্তরে এবং অন্যান্য ঘরে কংগ্রেসীদের সব সময় ভীড় করতে দেখা গেছে এবং মন্ত্রীরা সরকারী কাজে যতটা না সময় দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি সময় দিয়েছেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়। এই ভাঙাচোরার বাজারে সেটা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। মন্ত্রীরা অপর পক্ষকে ধরাশায়ী করার স্ট্রাটেজী নিয়ে এত ব্যস্ত যে তাদের ফাইল পত্র দেখার সময় নেই। সহজেই অনুমেয় অফিসারদের অসহায়তা। এই অবস্থার তাঁদের পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড পশ্চিমবঙ্গে যাঁকেই ক্ষমতায় বসান কংগ্রেসীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটবে না, দু পক্ষে আপস রফা হলেও নয়। অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকবে।

রাজ্যে আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

এই রাজ্যে আন্দোলনের পটভূমি তৈরী হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছে। খরায় কবলে পড়ে কয়েকটি জেলার মানুষ চরম দুর্গতাগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতে সাতটি বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, "এটা গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, সমস্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম ঊর্ধ্বমুখী। খরার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ফসলহানি ঘটেছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা যখন একেবারেই কম তখন এই দু বৃদ্ধি তাদের এই চরম দুর্দশা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।" বামপন্থী দলগুলো সভার আয়োজনও করেছেন। প্রশ্ন হল কোন সভা হবে? কিন্তু জনসাধারণ এই সভায় যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত কারণ রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতিতে তারা অতিষ্ঠ। তারা ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর নানা বিধি নিষেধের বেড়াজালে প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়েছিল। বামপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে পরিচিত বহু নেতা ও কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক বামপন্থী কর্মীও কারাগারে নিক্ষিপ্ত। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নতুন পরিস্থিতিতে বামপন্থী তথা বিরোধী দলগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থা যে গ্রহণ করা হতে পারে এবং তা বিরোধী দলের নেতৃত্বন্দ একেবারেই বুঝতে পারেন নি। বামপন্থী নেতারাও একটু প্রদিরে ভাবতে পারেন নি সেটাই আশ্চর্য। ১৯৭১ সালের আগে তাঁরা ভেবেছিলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বিঘ্নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তেমনি তাঁদের ধারণা ছিল বিনা বাধায় তাঁরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন। দলীয় মুখপত্রে শাসক দল ও সরকারের তীব্র সমালোচনা করা যাবে, মিছিল মিটিং আন্দোলন চলবে আগের মতই এবং তারপর নির্বাচনে শক্তিপরীক্ষা। সেই জন্য জরুরী অবস্থা তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কোন সাদুনিয়ার সমস্যার সমাধান করা যায় না। যায় না বলেই সমস্যার ভারে দেশ আজ

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব প্রসঙ্গে

অন্নদাশংকর রায়

এক কথায় সংবিধান-রচয়িতাদের মনে ছিল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের একটা স্বরূপ যার ইতিহাসের উৎস ব্রিটেনে। এটা ভারতীয় রাজনীতিক চেতনার একটা অমূল, অনাত্মীয় কথা। আমেরিকার মত এরকম না একবিন এর বিপর্যয় অবিশ্বার্য ছিল। বর্তমানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কাজ করতে পারছে না অজরী অবস্থা এবং তৎপরবর্তী সংবিধানের আমূল সংশোধন ছাড়া, যেগার নিয়ম কানুন চেনা যায় না একেবারে না বদল করে। এ পটভূমিতে কালের গতিতে বৃটেনের মত একটা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভূত হবার কোন অবকাশ নেই। যে কোন সংখ্যায় বিভিন্ন দলগুলি পার্লামেন্টে স্থান নিতে পারেন, কিন্তু একত্রিত হলেও কোনদিন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন না, দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার কথাও ওঠে না। স্বভাবতই তাঁরা চাইবেন একটা পার্লামেন্ট বহির্ভূত খেলা খেলতে। কিন্তু খেলার নয়া কানুনে তাঁরা তা করতে বাধা পাবেন।

একটা বৃহৎ পরিমাণ জাতীয় প্রয়াস নষ্ট হবে বেড়ালে-ইঁদুর খেলায়। লোককে জেলে পোরা, তাঁদের ছাড়া, আবার তাঁদের ধরায়। এরকম ব্যবস্থার কোন রকম আশু পরিবর্তন সম্ভব নয়। শত্রুরা বরাবরই শত্রু থেকে যাবেন। অধির উত্তেজনায় তাঁরা উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে উঠবেন। উভয় পক্ষই উত্তরোত্তর বেশি মিথ্যা বলবেন। মিথ্যাবাদ হিংসা-মূত্রার উল্টো দিক।

এইখানে আমরা নাগরিকরা এসে দাঁড়াই। আমরা অল্পমতি পাব না সত্য জানতে। সমস্ত বই পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্র প্রি-সেন্সরশিপ ব্যবস্থায় ন্যস্ত হবে। কিছু সম্পূর্ণত আটকান হবে। যদি আমাদের মধ্যে কেউ লেখক হন, তাঁকে তাঁর লেখা প্রকাশের আগে সেন্সারের কাছে পাঠাতে হবে। ফল পরিণাম হবে একটা মন-গড়া বিশ্বাসের জগত। অনমাধারণ সহজেই মেনে নেবেন সরকম গুজব। মোহভঙ্গের পর তাঁরা সব কিছুই অবিশ্বাস করবেন ঘটনা বলে। যখন সত্যও বলা হবে তখন তাঁরা তা বাতিল করবেন মিথ্যা বলে। লেখকরা দেখবেন তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা আর নেই।

সংবিধান সংশোধনের পরিণামে নিশ্চয়ই কিছু সুফল পাওয়া যাবে কিছু ভাল আইন, কম শোষণ এবং বেশি চাকরীর মাধ্যমে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মাটিতে পার্লামেন্টের হাতেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতি হবে। কেননা একে আপনি পার্লামেন্ট বলতে পারেন না যদি কিছু নেতা এর নাম করে টেনে নিয়ে যান যাঁরা সমস্ত সমালোচনার ওপরে। এ একটা রাজ-দরবার।

[ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ইংলে "সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব" বিষয়ক এক সভায় পঠিত লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রবীণ মুখোপাধ্যায়।]

কৃষকের ধান লুট

বর্ধমান, ৮ই ডিসেম্বর—বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল আমুড়িয়া থানার ভুড়ি গ্রামের কৃষক আজার কাজী ও বসির কাজীর প্রায় তিন বিঘে জমির ধান গত ২৩শে নভেম্বর দুর্বৃত্তরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। ধান লুঠ করার সময় সেখানে স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষের জনৈক অফিসার সশস্ত্র অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ভাগচাষীরা দীর্ঘদিন যাবত ঐ জমি চাষ করে আসছেন। আমুড়িয়া ২নং এল আর সার্কেলের ভাগচাষ অফিসারের নিকট জমির মালিক ভুড়িগ্রাম নিবাসী ভিক্ষাকর মণ্ডল তাঁদের ভাগচাষী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু পাশের গ্রাম পুরাতন জমিশোলগ্রাম নিবাসী নবনী মণ্ডল গত ২৩শে নভেম্বর শস্যাহরি ভাড়াটে লোক নিয়ে এসে ধান কেটে নিয়ে যায়। এরকমই প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই উপরোক্ত অঞ্চলে চাষের কাজ হয়। বৃষ্টির অভাবে এবার চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তার উপর আবার শুরু হয়েছে ধান লুঠের ঘটনা। আজার কাজী ও বসির কাজীর জমির ধান লুঠের ঘটনা আমুড়িয়া ২নং সার্কেলের যে এল আর ওকে জানানো হয়েছে।

["গণশক্তি" থেকে উদ্ধৃত]

চীনের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা

মধু গোস্বামী

হ্যানোভার হাসিয়ার পর মাও সে তুং-পরবর্তী চীনে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। পার্থক্য শুধু নোভিয়েত হাসিয়ার অভিযুক্ত করা হয়েছিল স্বয়ং হ্যানিবকে আর চীনের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত মাও সে তুং নয়, তাঁর স্ত্রী চিয়াং চীনকে। চিয়াং চীনের বিরুদ্ধে চীনের সরকারী কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য : চিয়াং এবং তাঁর হঠকারী চক্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছেন, মাও সে তুং-এর উইল জাল করেছিলেন এমন কি মাও সে তুং-এর জীবিত অবস্থাতেই এই চক্র তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেছিলেন। মাননীয় মাও সে-তুং সম্পর্কে এ কথাও বলা হচ্ছে তিনি নাকি ব্যভিচারিণী, তিনি বিলাসিনী। বলা বাহুল্য সব দেশের মতই এই ক্ষেত্রে বিরোধীদের কোন বক্তব্য আমরা জানতে পারছি না।

বর্তমান চীনা পার্টি-নেতৃত্বের বক্তব্য যদি সত্যি হয়, তবে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠাতা এবং স্বয়ং মাও সে তুং-এর পত্নী হোয়েও তিনি যদি চক্রান্তকারিণী, ক্ষমতালোলুপা এবং ব্যভিচারিণী হন, তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে, বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে কমিউনিষ্ট নৈতিকতা কোথায়? আর যদি বর্তমান পার্টি-নেতৃত্বের বক্তব্য মিথ্যা হয়, তা হোলেও প্রশ্ন মতামদর্শগত বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানর নামে এই ধরণের ব্যক্তিগত কুৎসা কি কমিউনিষ্ট নৈতিকতার সঙ্গে সংগতিসম্পন্ন?

প্রসংগক্রমে আরো একটা জিজ্ঞাসা জাগছে, সেটা হোলো আমরা যখন আজ সংবাদ মারফত জানতে পারছি সমগ্র লালফৌজ, সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনাবাহিনী চিয়াং চীন পরিচালিত হঠকারিতার বিরুদ্ধে, তখন মাও সে তুং জীবিত অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের স্বয়ং উৎসাহের আস্থান দেন নি কেন? তবে কি বুঝতে হবে সেটা তাঁর অন্ত পত্নীপ্রেম? তাই যদি হয়, সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে, কমিউনিজমের মহান আদর্শের চেয়ে মহাবিপ্লবী মাও-এর কাছে দাম্পত্য প্রশ্নটাই তাহলে বড় ছিল? তবে কি স্বয়ং মাও সে তুং কমিউনিষ্ট নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন?

শোষণ ভিত্তিক বুর্জোয়া সমাজের গর্ভজাত বুর্জোয়া নৈতিকতার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট নৈতিকতার যে মহান ইতিহাস বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এক জলন্ত জীবন্ত প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল সেই কমিউনিষ্ট নৈতিকতার এই অন্তঃসারশূন্যতার করুণ অবস্থা আজ বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষকে জীবণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এ অন্ধকারের শেষ কোথায়?

ক্যামেরায়

অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা

আমার কাঁধে একটা ক্যামেরা আছে।
তাতে প্রতি প'ল ফিল্ম গোঁজা। এক,
দুই, তিন ক্লিক করলেই
ছবি ওঠে সময় গুণে।

....এই ধরুন এখনো যারা বলে বেড়ায়
আমরা ভারি সুখে আছি বটেই,
কিন্তুক শান্তিতে ঘোপ ঘরন্ত নিদ্রায়
আমাদের কোন সাধ-বিবাদ ভয় ভাবনা নাই—
আমার ক্যামেরা তখন মূর্তি হয়ে
ঘুরে চলে কোলাজিয় অমল ফিল্মে।

একটা সময় আসছে জানেন, ঝঞ্ঝাউত্তাল সে সময়,
বড় ভয়াবহ অথচ বড়াভয় সে সময়।
.....আসছে.....
এবং তা চলন্ত চাকার মতো অতি ঘোর কৃষ্ণ চক্র যেন।
শুনুন,

একদিন কব্জি অবধি ডুবিয়ে ঘোষো,
ক্যামারির অমাবস্যার কালো গহ্বরে।
মুঠো খুলে, অন্ধ করে, হিসাব নোষো—
ছবি হয়ে যাওয়া বিকৃত-ভঙ্গিল
নির্মম ফ্রেমগুলোর। তারপর রক্ত মেখে
যোষা যাবে সময়ের হিংসোল ভালে একালীন
সুখী খুনী মূর্ত পৃশাদের
উদ্ধবক্ষ মুষ্টিটাই স্থিত—হা।
ধড়গুলো অন্তিম ভাগ্যকে
নিরুদ্দেশ,
নির্বাসিত।

হাসপাতাল-ডাক্তার-রুগী কথা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সবই আছে। আছে ডাক্তার, নার্স, বর্ষের সংখ্যক ওষধার বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, যন্ত্রপাতি এবং শুধু-পত্র। তবুও কেন হাসপাতালগুলিতে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা ভালভাবে হয় না? হাসপাতাল অর্থে আমি বড় বড় হাসপাতালগুলির কথাই বলছি এবং চিকিৎসা বলতে প্রত্যাশিত সুচিকিৎসার কথাই বলতে চাই, বলতে চাই সদাচার ও ভদ্র আচরণের কথা। বড় হাসপাতাল-পরিতে রোগীরা যে শুধু সুচিকিৎসার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হন, তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা হাসপাতাল কর্মীদের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহারও পান না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আমি সবাইকে এই মাপকাঠিতে ওজন করছি না, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, যেমন আছেন ভালো চিকিৎসক, তেমনি আছেন সৎ ও ভদ্র কর্মী। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা কতজন? শতকরা দশজন আছেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাকী যে নব্বই জন তাঁরা কি নূনতম, কর্তব্যও পালন করেন? এ সম্পর্কে আজ উপযুক্ত তথ্য হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্য যে, সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেন সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য, কিন্তু সেই টাকার বিনিময়ে কি হচ্ছে? জানাশোনা লোক না থাকলে কিছু হয় না—এমন অভাব আমি নিজেই পেয়েছি বারকয়েক। অথবা, ওপর থেকে চিঠি না আনলে কিছু হবে না—এমন কথা হাসপাতালের বাতাসে কান পাতলেই শোনা যাবে। তার মানে, গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ যদি পি জি হাসপাতালে যান, যদি তার ব্যাপারে সার্জেন সুপারিটেন্ডেন্ট নজর না দেন, কিংবা কোন কর্তব্যক্তির চিঠি তার কাছে না থাকে তাহলে একমাত্র ঈশ্বর জানেন, তার পরিণতি কি হবে! যেখানেই যান সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে এই হাল।

ডাক্তারবাবুরা গ্রামে যেতে চান না, কিন্তু কলকাতার থেকে হাসপাতালেই কি যেতে চান? নামকরা ডাক্তার মানেই দারুণ পশার। তাঁরা সর্বনাশিহোমের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা দারুণ ব্যস্ত। হাসপাতালে সময় দেবার মত সময় কোথায় তাঁদের? কোন এক হাসপাতালের একজন বড় ডাক্তারের কথা আমি জানি। দারুণ তাঁর নাম। বিভিন্ন কমিটি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তি তিনি। তুচ্ছ হাসপাতালের জন্য ব্যয় করার মত সময় কোথায় তাঁর? প্র্যাকটে প্র্যাকটিস করার কথা নয়, তবু চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ীও করেছেন, কিন্তু হাসপাতালে থাকেন কতক্ষণ? এ্যাম্বোরোর পর বড় এবং নামকরা ডাক্তারদের হাসপাতালে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সকাল বেলায় তাঁরা চলতে চলতে আসেন, এ্যাম্বোরো বাজতেই সবাই খুজে বিদীন হয়ে যান। বিকেলের দিকে তো তাঁরা হাসপাতালের ধারে কাছেও আসেন না। ছোট ডাক্তার এবং হাউস স্টাফ ছাড়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একেবারেই পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যাবে না, এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

নামকরা ডাক্তারদের নামে রোগী ভর্তি হয়, কিন্তু সেই নামকরা ডাক্তারদের কতজন রোগীদের স্পর্শ করে দেখেন? একজন রোগীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে জোরকদমে হেঁটে ডাক্তারবাবু চারজন রোগীকে অতিক্রম করে যান, একটু দাঁড়িয়ে কথা বলার মত সময় কোথায় তাঁর? অথচ, সময় থাকা উচিত। বিশেষ করে ফ্রী বেডের রোগী কিংবা পেয়িং বেডের সাধারণ বোগীরা যেন ঈশ্বরের নামে সমর্পিত। এরই মধ্যে দু'একজন মাকারি ডাক্তার আছেন, আছেন কয়েকজন হাউস স্টাফ—যাঁরা এখনও ডাক্তারকে পুরোপুরি ব্যবসায়ে পরিণত করতে পারেন নি, তাঁরাই রোগীদের শেষ আশা অথবা বলা ভালো শেষ ভরসা। এই সব নামী ও দামী ডাক্তারদের হাসপাতাল প্রশাসন ঘাঁটাতে চান না। অথচ, তাঁদের কীর্তিতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে হাসপাতাল প্রশাসনকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়। যাঁরা প্রেসিডেন্সী সার্জন কিংবা নামকরা ডাক্তার, তাঁরা হাসপাতালগুলিকে একটা অবহেলা করেন কিভাবে? তাঁরাও তো সরকারী কর্মচারী এবং দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টা হাসপাতালে ডিউটি করাটা তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয় কেন? সকাল এবং বিকেল মিলিয়ে সাত আট ঘণ্টা হাসপাতালে যে বা যাঁরা থাকবেন না, যত নামী বা দামীই তাঁরা হন না কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্য সরকারের এত দ্বিধা কেন?

রাজ্য সরকার ডাক্তারদের গ্রামে পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই গ্রামের মানুষ একান্ত বাধ্য হয়েই ছুটে আসেন কলকাতার চিকিৎসার আশায়। রাজ্য সরকার যদি মোটা বেতনের ডাক্তারদের কলকাতার বা জেলার হাসপাতালগুলিতে নিদিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী হাজিরা দেওয়াতে বাধ্য না করেন, তবে গ্রামের মানুষরা কি করবেন? মেডিকেল কলেজ প্রশাসন সম্পর্কে নানা রকম দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে এবং জুডিসেল কমিশন সে সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক বিস্তৃত মন্তব্যও করেছেন, তবুও স্বাস্থ্যমন্ত্রী নীরব কেন? কেন দুর্নীতিপরায়ণদের বিতাড়িত করা হচ্ছে না? স্বাস্থ্যমন্ত্রীই বলেছিলেন, একজন ডাক্তার তৈরী করতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয় সরকারী হিসাব থেকে। তবে সেই লাখ টাকার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে এত দ্বৈধমিতা কেন?

খাতা-কলমে এই মুহূর্তে নাকি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বেড়েছে দশহাজার। ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট শয্যা সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার ৫ শত। এখন হয়েছে ৪৭ হাজারের কিছু বেশী। এক একটি শয্যার জন্য সরকারী তহবিল থেকে বছরে ব্যয় হয় ৬ হাজার টাকা। প্রতি ১০ জন রোগী পিছু একজন ডাক্তার ও ৫ জন রোগী পিছু একজন নার্স থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ডাক্তার আছে কাগজে কলমে, রোগীদের জন্য নয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় নার্সের সংখ্যা খুবই কম। তাই অসহায় রোগীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয় ওয়ার্ডবয়দের ওপরে। এরা আবার হাতে নগদ না পেলে একমাস জলও এগিয়ে দেয় না। অথচ এদের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। ডাক্তারেরাও নাকি অসহায়, অসহায় হাসপাতাল প্রশাসনও। এরই মধ্যে সরকারী হাসপাতালগুলির বাস্তব চিত্র। যদি কোন প্রশাসক এই সব দুর্নীতি রোধ করতে উদ্যোগী হন, তখন দেখা যায় কাজের স্বার্থে সক্রিয় হয়, ইউনিয়ন নেতারা সব সময় হন, ফলে শুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি আর কতদিন চলবে?

প্রেসিডেন্সী কলেজে গণ্ডগোল

কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রহৃত ঃ অধ্যক্ষ ঘেরাও

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

গত শনিবার ১১ই ডিসেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে একটি ঘটনা ঘটে। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের একজন ছাত্রকে অন্য বিভাগের কয়েকজন ছাত্র অন্যায়ভাবে মারধোর করে। প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জমায়েত হয় এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকদের ঘটনাটি জানাবার চেষ্টা করলে তাদের ওপরও মারধোর ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যারা মারধোর এবং ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রত্যেকেই কলেজ ইউনিয়নের অবর্তমানে অধ্যক্ষ কর্তৃক গঠিত অ্যাড হক কমিটির সভ্য।

এদিন কলেজে অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে লিখিত ভাবে ঘটনাটি জানানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ঐদিনই তারপরেও আরো একজন ছেলেদের বিক্ষিপ্তভাবে মারধোরের ঘটনা ঘটে।

পরদিন, অর্থাৎ সোমবার সকাল ১০-৩০টা নাগাদ কলেজের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্র ছাত্রী অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং এই ঘটনার প্রতিকার দাবী করেন। অধ্যক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এদিন বেলা তিনটার সময় শনিবারের দিনের ঘটনায় আক্রান্ত ছাত্ররা ও কলেজের অন্যান্য প্রায় পনেরো ষুড়ি জন ছাত্র-ছাত্রী কলেজ থেকে বেরোবার চেষ্টা করলে কলেজ গেটের সামনে একদল ছাত্র তাদের প্রচণ্ড প্রহার করে এবং ঘটনায় একজন ছাত্রী আহত হন। তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষের ঘরে সমবেত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালে অধ্যক্ষ সেই সময় ছাত্ররা যারা মারধোর করেছিল (ছাত্র পরিষদের 'সমর্থক' বলে পরিচিত) তাদের ডেকে পাঠান। সেই ছাত্ররা তখন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সামনে "আর মারপিট না করার" আশ্বাস দেয়। কিন্তু কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই মৌখিক আশ্বাসের পরিবর্তে লিখিত আশ্বাস ও দোষী ছাত্রদের শাস্তির দাবি করে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে।

অবশেষে চাপে পড়ে অধ্যক্ষ মেনে নেন যে তিনি সন্ধ্যা সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং (মঙ্গলবার ১৪ই ডিসেম্বর) সমস্ত অধ্যাপকদের একটি জরুরী মিটিং ডাকবেন। কিন্তু বেরোবার সময় অধ্যক্ষকে মিটিংএর সময় ইত্যাদি ঘোষণা করতে বললে তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। তখন একজন ছাত্র অধ্যক্ষের ঘরের দরজায় শুয়ে পড়লে তিনি তাদের লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা "সেম-সেম" আওয়াজ তোলেন এবং অধ্যক্ষের সামনে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যান।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে গত শনিবার সকাল বেলায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যে ছাত্রটিকে মারা হয় তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরফ থেকে সংবিধান সংশোধনের উপর একটি সেমিনার আয়োজন করার ব্যাপারে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সেমিনারে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপি. বি. মুখার্জী ছিলেন একমাত্র বক্তা। কিন্তু ঘুঁষিটাটি কারণের জন্য অধ্যক্ষের আদেশ অনুযায়ী এই সেমিনার আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে।

মতামত

শুভ্রা লাহিড়ীর হত্যা সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গের দৈনিকগুলোতে লখনউর কুমারী শুভ্রা লাহিড়ী হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে খবর সামান্যই বেরুচ্ছে যদিও জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে এটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

উচ্চশিক্ষিতা শুভ্রা লখনউর কোনো বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীর নামে চোরাকারবার ও জাল ওষুধ বিক্রীর অভিযোগ এনে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি তথ্যসম্বলিত পত্র লেখেন। এর পরেই গত ৩ জানুয়ারী শুভ্রা লাহিড়ী রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হন। দশই জানুয়ারী নাকি তাঁর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল কোনো জায়গায়। তারপর ৩০ জানুয়ারী শুভ্রার মৃতদেহ সর্যূনদী রোডে নালার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথমে বিশেষ কিছুই হয় নি। মৃত্যুর শিওর চেষ্টার শেষ পর্যন্ত দি. বি. আই তদন্তের ভার নিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এখানকার খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে লখনউ পুলিশের কোনো লোক যার নামে অভিযোগ তার কাছে সব ফাঁস করে দেয়। (আরও দুজন ঠিকাদারের নামেও অভিযোগ ছিল) এটা কি করে হল জানি না কারণ অভিযোগকারীর নাম কোনো ভাবেই প্রকাশ করা হবে না সরকার বারবার এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল যে শুভ্রকে যদিও অপহরণ করার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয় নি (মৃতদেহ বিশেষ বিকৃত হয় নি) তবু ৩০ জানুয়ারী এই ২১ দিনের মধ্যে লখনউ সহরে পুলিশ শুভ্রাকে খুঁজে বের করতে পারল না।

যে বা যারা শুভ্রাকে অপহরণ করেছিল সরকারের সামনে তারা এই হত্যার দায় বিরাট চুনোতী ছুঁড়ে দিয়েছে। জরুরী অবস্থার একবিন্দু পরোয়া না করে তারা যে শুধু বে-আইনী ও সমাজ বিরোধী কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল তাই নয় তারা অভিযোগকারীর নাম জেনে নিয়ে তাকে শুদ্ধ অপহরণই করে-নি রাজের রাজধানীতে পুলিশের নাকের ডগায় তাকে দীর্ঘদিন লুকিয়ে রেখেছে;

পুলিশ কিছু করতে পারে নি। এত দুঃসাহস তাদের কি করে হয়, বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার মধ্যে?

এখন সামনা চলছে। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে এটা দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব।

কেউ কেউ হয়তো শুভ্রা লাহিড়ীকে "বোকা" বলবেন। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দুঃসাহসের জন্য নিন্দে করবেন। কিন্তু এই রকম "বোকা" দু চারটে দুঃসাহসী লোক আছে বলে আমাদের মত নিরীহ ভীরু ফেরুদণ্ডহীন লোকেরা এখনও পৃথিবীতে বাস করতে পারছে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকী লড়তে গিয়ে শুভ্রা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর সাহায্যে কেউ এগোয় নি। শহীদ দিবসে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাঁর বীরত্ব কোনো বিখ্যাত শহীদের চেয়ে কম নয়।

সুকুলা দত্ত

'জনঅরণ্যে'র অর্থনীতি

শঙ্করের লেখা 'জনঅরণ্য' উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য ও সত্যজিৎ রায়-কৃত ঐ নামের সিনেমার মূল বক্তব্য একই। ঐ মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য প্রদর্শন করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো হয়েছে এবং সমস্যা সমাধানের একটা উপায় বা আলো দেখানো হয়েছে। "বেকার তো হয়েছে কি? চাকরি পাচ্ছে না তো ব্যবসা করুক" কথাটা মেনী জঁতোয়ানেতের "রুটি পাচ্ছে না তো কেক খাক"-এর মতনই লাগে শুধু শুনতেই নয় কাজেও।

চাকরি ব্যবসাই ফল, সে নিজের ব্যবসাই হোক কি অপরের। দেশে যে 'মুহূ' মন্দা চলছে সেকথা অর্থমন্ত্রী সুব্রহ্মণীয়ম তাঁর ৫ই মার্চের (তারিখটা Caesar-এর প্রতি সাবধানবাণীর কথা মনে করিয়ে দেয় না?) বাজেট ভাষণে স্বীকার করেছেন।

ঐ মন্দার ধাক্কায় বড়, বাঘা এবং নামী দামী অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত। লোক নেওয়া তো দূরের কথা লোক ছেঁটে এখন বাজারে টিকে থাকতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করছে। সমস্যার মূলে আছে চাহিদার ঘাটতি (যোগানের নয়), সেই জন্যই প্রতিষ্ঠানগুলি লোক ছাঁটাই করে খরচা কমাতে চাইছে যার একমাত্র উপায় হল, "আজ বাঁচলে কাল বড় হওয়া যেতে পারে"। এই পরিস্থিতিতে সকলেই যখন মাল কম কিনছে এবং খরচ কমাচ্ছে তখন কি করে "বেকারদের দ্বারা ব্যবসা" টিকতে পারে, কমমমা হওয়া তো দূরের কথা? ব্যাপারটা যদি উল্টো হত অর্থাৎ যোগানের ঘাটতি (চাহিদার নয়) অবশ্যই বেকারদের দু পয়সা কামানোর সুযোগ থাকত।

যে পরিস্থিতিতে আজ কল্যাণীরা ধাম পুড়িয়েছে কি করে আশা করা যায় Order-supplier বা নতুন ডিসপ্ল সৃষ্টি করবে? সব বেকারেই যদি ব্যবসা করতে আরম্ভ করে তো মাল কিনবে কে? আর্থিক অবস্থা এখন কিছু হলে কেঁপে ওঠে নি যে পরস্পর পরস্পরের মাল কিনে একে অপরকে বাঁচাতে পারবে।

অনেকেই বেরুবী ফোর্ড ও অন্যান্য দিগন্তসৃষ্টিকারী entrepreneurদের কথা উল্লেখ করে বেকারদের রোষাক আগিয়ে দেন কিন্তু তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন ঐ সময়কার আমেরিকার ও বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক তারতম্যের কথা? অথচ মার্কিন অর্থনীতি ছিল growing আর আমাদের? দেখে আছে। 'ব্যবসা দিয়ে' বেকারেরা এই অর্থনৈতিক ক্ষত সারাতে অক্ষম—একমাত্র সরকারেরই সেই ক্ষমতা থাকে।

কিন্তু বেকার "করে খাচ্ছে" সন্দেহ নেই। যখন অর্থনীতি থমকে থাকে সম্পদ তখনও সৃষ্টি করা যায়, সৃষ্টি করা যায় না। তারা "করে খাচ্ছে" অন্তরের বিনিময়ে। সুতরাং বেকারদের ব্যবসার নাবার উপদেশ বা ইঙ্গিত মোটেই জরুরী অর্থনৈতিক উপদেশ নয়। এর দ্বারা সমস্যার উন্নয়ন কখনও হতে পারে না।

সুজিত ভট্টাচার্য

রঙ্গিনী দহে মৎস্য চাষ

বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের দীঘি পাড়াতল অঞ্চলের সীমান্ত বরাবর একটি দহ আছে, নাম রঙ্গিনী দহ। আনুমানিক ৫০ মিটার চওড়া এবং ২ কিলোমিটার পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর প্রায় ছয় বৎসর এই দহটি অধিগ্রহণ করেছেন এবং বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে টোরুও কাটিয়েছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত মাছ চাষের কোনো সুবন্দোবস্ত হয়নি। কেবল পশ্চিম দিকের অংশটিতে চারামাছ তৈরীর ব্যবস্থা আছে, তাও উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে অনেকে এই মৎস্য পোনা উৎপাদন কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন না কারণ এই কেন্দ্র থেকে তিন মাইল দূর দিয়ে চক্কীদীঘর ওপর দিয়ে যান চলা চলা যায়। পূর্বাংশের কাঁচা টোরুগুলি এখনও খাসি পড়ে আছে। আনুমানিক জলকর (৫০ মিঃ × ১.৫ কি. মি.)। এই অংশটিতে প্রচুর পরিমাণে মাছ চাষ করা সম্ভব।

উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনই কি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে নিরুত্ত রেখেছে, না অন্য কিছু? কর্তৃপক্ষ বহু অর্থ ব্যয় করে যে টোরু কাটিয়েছেন তা আবার পানায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া যায়না কি? জনসাধারণের অর্থের কি কোনো মূল্য নেই? অবিলম্বে চক্কীদীঘি থেকে রঙ্গিনী দহ ফিস ফার্ম অবধি পাকা রাস্তার ব্যবস্থা কি মৎস্য দপ্তর করতে পারেন না?

অর্ধেন্দু ঘোষ
ইলামপুর

হাসপাতালে ঘুষের রাজত্ব

ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতালে ঘুষের রাজত্ব চলছে। দর্পণের মাধ্যমে তা স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টিগোচর করতে চাই। কিছুদিন আগে আমি সাবডিভিসন হাসপাতালে মেল ওয়ার্ডে ২৮ নং বেডে ছিলাম। আমার নাভিতে ধান ঢুকে যাওয়ার জন্য খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আমাকে অপারেশনের কথা জানানো হয়। রোগমুক্তির আশায় আমি রাজি হই। আমাকে অপারেশন করা হয়। পরে আমার কাছে জনৈক ডাক্তার টাকা চাইলে আমি এক শত টাকা দিই মুক্তির আশায়। এইভাবে ক্যানিং, কাকদ্বীপ, সগর, নামখানা ও রায়দীঘির কোন কোন ব্যক্তির কাছ থেকেও টাকা নেওয়া হয়েছে। এখানকার একজন ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বার আছে।

মোহন সাহা

ফ্যাসিস্ত গুয়াতেমালায় গণ-প্রতিরোধ বাড়ছে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

আমেরিকার দুই মহাদেশের মধ্যে এককালি সুন্দর বাগানের মত দেশ গুয়াতেমালা। ১৯৭৪ সাল থেকে যে দেশে প্রগতিশীলতার জোয়ার বইতে শুরু করেছিল তাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হামলা এসে শুদ্ধ করে দিল ১৯৫৪ সালে। মার্কিন ভাড়াটে ফৌজের হস্তক্ষেপে একটি দেশের গণতন্ত্র নিহত হল। গুয়াতেমালার জনপ্রিয় আরবেন্‌জ্ সরকারের উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত হল একটি ফ্যাসিস্ত সরকার। সি-আই-এর অবশ্য কার্যকলাপে এখন গুয়াতেমালা একটি নরকে পরিণত হয়েছে।

গুয়াতেমালা একটি ছোট্ট দেশ, প্রায় তিন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার যার ভূখণ্ড। জনসংখ্যা ষাট লক্ষের কিছু বেশী। এই কুড়ি বছরে ফ্যাসিস্ত সরকার তিরিশ হাজার দেশপ্রেমী গণতন্ত্রী মানুষকে খুন করেছে। শুধু খুন করেই ক্ষান্ত নয়, ১৯৬৬ সালে তথাকথিত সংবিধান মারফৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গুয়াতেমালার কমিউনিষ্ট পার্টি সি.আই.এ-নিষিদ্ধ। শুধু কমিউনিষ্ট পার্টি নয়, গণতন্ত্রী সমস্ত পার্টি আজ গুয়াতেমালায় নিষিদ্ধ। গুয়াতেমালার নাগরিক সরকারের উপরোক্ত নীতি মারিও সাল্যোভাল আলারকনের নেতৃত্ব ঘাতক জোন্ড (মার্ডার স্কোয়াড) নির্বিচারে বিপক্ষদলকে খুন করে চলেছে। ফ্যাসিস্ত শাসক কিল ইটজেনিও লাগারদের যে একমাত্র বৈধ দল তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে; বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি, খুন-জখম লেগেই রয়েছে। সৈন্যবাহিনী, প্রশাসন ইত্যাদির নানা পর্যায়ে এই বিরোধ রয়েছে। মারিও আলারকনের ঘাতকদল সর্বদাই সক্রিয়। শুধু খুন, মানুষ লোপাট হয়ে যাওয়া, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বেহদ্দ মারধোরের ফলে মৃত্যু বা অঙ্গহানি গুয়াতেমালার জীবনে প্রাত্যহিক ঘটনা।

অন্যদিকে গুয়াতেমালা হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরণকার মৃগয়া ক্ষেত্র। ব্যাপক মার্কিন পুঁজি, বিশেষ করে প্রায় চল্লিশটি মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির অবাধ মৃগয়ার ফলে গুয়াতেমালার অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। জিনিষপত্রের দাম বহু করে বাড়ছে। সরকারের মূল্যবোধ করার প্রতি-

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

বাংলা দেশের লবণ-শিল্প ও রাজা রামমোহন

কুসুমকুমার ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে লবণ আমদানির পশ্চাতে জনহিতৈষণার পরিবর্তে বৃটিশ জাহাজের মালিকদের আর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিটাই যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তা জানা যায় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত বোর্ড অব ট্রেড-এর একটি চিঠি-তে, 'যখন যেখ বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী জনবহুল বলে বিবেচিত হত এবং সমুদ্র-উপকূলের লবণের আমদানি আদৌ ছিল না, তখন দেশের অভ্যন্তরে বহু বাণিজ্য-কেন্দ্রে দেশী লবণ এখনকার অর্ধেক দামে বিক্রয় হত।...বিদেশী লবণ-আমদানি তাদের যারাই বেচে যায়, যাদের স্বার্থ এই লবণ আমদানিতে উৎসাহদানের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং তা হল এই, যে-লবণ জাহাজ এ-দেশে বিদেশী লবণ আমদানি করত, তারা ফিরে যাবার সময়ে এ-দেশ থেকে চাল ভর্তি করে নিয়ে যেত।" ২৭ এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদের বোর্ড অব রেভেনিউ-এর লিখিত পত্রে, "কোর্ট সেন্ট জর্জের সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে লবণ রপ্তানি যাবৎ সংগৃহীত রাজস্ব খুবই সামান্য ছিল, কিন্তু এই ব্যবসা জাহাজ-মালিকদের কার্যতঃ সাহায্য করেছে বলেই কেবলমাত্র সেখোক্ত কারণেই রাজস্ব-বোর্ড এই ব্যবসায়ের অবলুপ্তিতে দুঃখিত হবে।" ২৮

বাংলার লবণ-শিল্পের বিনিময়ে আহাজের ব্যবসা থেকে আরো মুনাফা সুটবার জন্যই ইংরেজদের স্বার্থে করতগুলি উপকূলে লবণ-শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল এবং সেইজন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিশ সামুদ্রিক লবণ-আমদানিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতেইউরোপীয়জাহাজী-কোম্পানির ব্যবসায়ের লাভ প্রচলিত টাকার অঙ্কে বার্ষিক প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই জাহাজী-ব্যবসায়কে উৎসাহিত করার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভিজাগাপট্টম, রাজামুণ্ডী, মেল্লোর, কডেলঙ্গ ও তাঞ্জোর থেকে বম্বেই পরিমাণে সামুদ্রিক লবণ আমদানি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।" ২৯ তাই শ্রীএন. কে. সিংহ বলেছেন, "সামুদ্রিক লবণ বলে যা পরিচিত, তা ১৭৮০ ও ১৭৯০-এর দশকে করমণ্ডল উপকূল থেকে বম্বেই পরিমাণে বাংলা-দেশে আমদানি করা শুরু হল। কারেমী স্বার্থ সৃষ্টি হল। বৃথা প্রতি-বাদের ঝড় তোলা হল। বাংলাদেশ তার নিজের ও প্রতিবেশী অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য যথেই পরিমাণে লবণ উৎপাদন করত। সস্তা দরে সমুদ্রো-পকূলের লবণ আমদানি বাংলাদেশের লবণ-শিল্পের টিকে থাকার পক্ষে প্রথম বিপদ রূপে দেখা দিল। বাংলা-দেশে আমদানিকৃত সামুদ্রিক লবণ থেকে যে-রাজস্ব কোর্ট সেন্ট জর্জের সরকার পেতেন, তা ছিল যৎসামান্য। কিন্তু মাদ্রাজের রাজস্ব-বোর্ড লিখলেন, "ব্যবসাটি জাহাজী-মালিকদের কাছে বাস্তবোচিত সহায়ক হওয়ায় রাজস্ব-বোর্ড এই সেখোক্ত কারণেই এর অবলুপ্তিতে দুঃখিত হবে।" করমণ্ডল উপকূলে লবণ-উৎপাদন বৃটিশ জাহাজ-মালিকদের স্বার্থেই গড়ে উঠেছিল, যদিও তা বাংলাদেশের লবণ-শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলে ছিল।" ৩০

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লবণ-বাণিজ্যের ইতিহাস হল দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার ইতিহাস, নিষ্ঠুর শোষণ ও নৃশংস লুণ্ঠনের ইতিহাস। বৃটিশ-বণিকদের সীমাহীন শোষণ-লুণ্ঠন থেকে বাংলার লবণ-শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডের বৃটিশ সরকার এগিয়ে আসেন নি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পুনরায় সনদ দেবার পূর্বে বৃটিশ পার্লামেন্ট তদন্তের জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি সেই সকল শিল্পের মধ্যেই তাঁদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছিল, যে-শিল্পগুলিকে বৃটিশ-পুঁজি লগ্নি করা হয়েছিল বা লাভজনক ভাবে লগ্নি করা যেত।" ৩১ সেজন্য তাঁরা হোম্ট ম্যাকেঞ্জীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৃটিশ-পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ভারতবাসীদের মনোভাব কিরূপ? উত্তরে হোম্ট ম্যাকেঞ্জী বলেছেন, "আমি মনে করি যে কলকাতাকে ধরে বিচার করলে দেখা যায় যে বিলিতি বিলাস-সামগ্রীর দিকে অধিবাসীদের একটা নির্দিষ্ট ঝোঁক রয়েছে। আমন্ত্রিত আসবাব-পত্রে সজ্জিত তাদের গৃহ, অনেকেই ঠাতঘড়ি ব্যবহার করছে, তারা জুরি-গাড়ীর ভক্ত হয়ে উঠেছে, ও বন্দরাদে অভ্যস্ত বলে জানা যায়।" ৩২ তাই শ্রীরমেশচন্দ্রদত্তমন্তব্য করেছেন,"তারছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃতি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ পেয়ে ইংলণ্ডের করদ সত্তার রাজভারী ও প্রভেদ সদস্যদের মুখমণ্ডলে নিশ্চয়ই গুরুগম্ভীর সন্তুষ্টির চাদি ছাড়িয়ে পড়েছিল।" ৩৩ করদ কমিটির কাছে প্রদত্ত রাজা রামমোহনের সাক্ষ্য সম্পর্কেও শ্রীরমেশ-চন্দ্র দত্তের উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। কারণ ইউরোপীয় মদ্য-পানে ভারতীয়-দের আসক্তির কথা তিনিও বলেছেন সস্তা দরে বিলিতি লবণ ভারতে আমদানি করা হলে ভারতীয়রা সেই লবণ ব্যবহার করবেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বিলিতি লবণ আমদানি না করে বাংলার লবণের মূল্য হ্রাসের কোনো দাবি করেন নি; পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন, "এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বিলিতি লবণ আমদানি করা হলে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছাড়া ভারতীয়রা তা খুব আনন্দের সঙ্গেই কিনবে। দেশীয় ভাগ লোক দেশী ও আমদানিকৃত লবণের মধ্যে কোনো পার্থক্যই বুঝতে না। আমার মনে হয়, কলকাতায় ইউ-রোপীয়দের খাদ্য প্রস্তুত ছাড়া সোডা-জল (ও অংশ নাই বা যদি হয়) কলকাতার ও সহরাঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়রা ব্যবহার করে থাকে; ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত মদেরও একটা উল্লেখ-যোগ্য অংশ তারা ব্যবহার করে থাকে।" ৩৪

অষাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থক রাজা রামমোহন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক-চেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং লণ্ডনে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা-কালে লবণ ইত্যাদি ব্যবসায়ে কোম্পানির এক-চেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, "১৮৩১ সালের ১২ আগ্রিলের লিবরপুল নগরের পত্রে লেখে যে··· নগরস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমিটির কয়েকজন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমন জন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কম্পানীর বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে যে অভিপ্রেত তাহা বিবাদের দ্বারা সিদ্ধ নি হইয়া সলা দ্বারা যে সিদ্ধি হয় এমত বাঞ্ছা। আমাদের সম্পর্কীয় কোনো কোনো মুনিষ্য রচিতে এবং বীর বাণিজ্য রচিতে এবং যে মধ্যে লবণবিষয় একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরো-পীয়দিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমা ব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে ভূমিন বহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।" অর্থাৎ তাঁর আন্দোলন শোষক-পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল, শোষণ-বন্ধে নয়। কারণ কোম্পানির একচেটিয়া শোষণের অবসানে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত-ব্যবসায়ীরা ভারত-শোষণের অধিকার লাভ করে-ছিলেন, ভারতের শিল্পের বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের দেশে উন্নত শিল্প গড়ে তুলেছিলেন; আর ভারতও নিরন্ত্রণ অবনতির পথে ক্রত এগিয়ে গিয়েছিল। বাংলার অন্যান্য শিল্পের মত লবণ-শিল্পও রক্ষা পায় নি, লবণ-চাষিগ-রেরাও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত পান নি, তাঁরা অনাহার আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

কমল কমিটি রামমোহনকে প্রশ্ন করেছিলেন যে বিলাতী লবণ সস্তা দরে বাংলাদেশে আমদানি করা হলে কাজের অভাবে মালঙ্গীরা প্রচণ্ড দুর্দশার সম্মুখীন হবে কিনা। উত্তরে রামমোহন বলেছেন, "মালঙ্গীদের এখনো অধিক সংখ্যায় সরকার কর্তৃক (যদি সরকারকে ভবিষ্যতে একচেটিয়া লবণ-ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়) লবণের কারখানায় অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত লবণ-শিল্পে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং অবশিষ্টের কৃষি এবং বাগানের মালী, গৃহকৃত্য ও দিনমজুরের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। বাঙ্গালীদের মধ্যে সাধারণ প্রমিক যেমন বাগানের মালী ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর থাকায় অধিক সংখ্যায় ভড়িগাবাসীদের এই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণের জন্য বাংলার আসতে উৎসাহিত করা হত।" ৩৫ কিন্তু রামমোহনের বক্তব্য তথ্যসম্মত নয় এবং তা ছিল মালঙ্গীদের স্বার্থ বিরোধী। তাঁর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়েছিলেন ইউরোপীয় বণিকেরা আর মালঙ্গীরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন; তাঁরা দেখেছিলেন অনাহার আর মৃত্যুর ছবি।

পুরীই বলেছি যে, মালঙ্গীদের মতো কুলি, মাঝি, পাড়োয়ান, জলবা-হার এবং অনেকে লবণ-উৎপাদন ও ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের দৈনিক মজুরী এত অল্প ছিল যে তা দিয়ে অতি কষ্টে তাঁদের জীবন-নির্বাহ করতে হত। এঁদের জন্য কোনো কৃষি-শিল্পে নিয়োগ করার মত চিনি নীল ইত্যাদি বৃহৎ শিল্প মেদিনীপুরে ছিল না এবং তাঁদের মধ্যে ওড়িশা থেকে আগত ব্যক্তিদের সংখ্যা খুব সামান্যই ছিল। এই বিষয়ে শ্রীএন. কে. সিংহ বলেছেন, "আমরা মেদিনী-পুরে কোনো বড় ধরণের চিনি বা নীল চাষ দেখতে পাই না এবং লবণ উৎ-পাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশ অন্য স্থান থেকে আগত নয়। যখন সস্তা লবণ-আমদানি অকল্পনীয়ভাবে অষাধ ও স্বাধীন হয়ে পড়ল, তখন কোনোরকমের বিকল্প চাকরীর অবর্তমানে তাঁদের দুর্দশা নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক রূপে দেখা দিয়েছিল। তাঁদের দুর্ভোগ-বহুলার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির সীমাহীন ভোগ-র প্রকাশ ঘটেছিল।" ৩৬

সুতরাং বিনেতে যে ক লবণ আম-দানি করে বাংলার লবণ-শিল্পের চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনা হল। অথচ বাংলাদেশের লবণ শিল্পকে রক্ষা করার জন্য শিল্প-সংরক্ষণ নীতি দাবি করা, বিলাতী ও ভারতের করমণ্ডল উপকূলে উৎপন্ন লবণ-আমদানি বন্ধ করা, দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানির এক-চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারকে বাতিল করা, কর্মচারীদের শোষণ-উৎপীড়ন ও দুর্নীতিকে বন্ধ করা, দেশীয় ব্যবসায়ী-দের অধিকতর সুযোগ দেওয়া, উন্নত যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে এ-দেশে লবণ উৎপন্ন করা ও বাতাকে সস্তাদরে যোগান দেওয়া, মালঙ্গীদের রাজার মত মজুরী তথাসুবিধাজনক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি দাবি উত্থাপনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজা রামমোহন শ্রেণীস্বার্থে (বিদেশী বণিকদের মনুষ্যবুদ্ধিতে করে অর্থ উপার্জন করাই ছিল তাঁদের দেশীয় বণিক-জমিদারশ্রেণীর প্রধান স্বার্থ) লবণ-সমস্যার গভীরে না গিয়ে কমল কমিটির সামনে যে-বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন, তা ছিল দেশের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং অদূর-দর্শিতার পরিচায়ক। এ-দেশেই উরো-পীয়দের বসবাসের অধিকার ও তাদের অষাধ-বাণিজ্যের অধিকার প্রসারের জন্য তাঁর আন্দোলন বাংলার লবণ-শিল্পকে কোনো আঘাত করবে না—এটা আশা করা অসঙ্গত। তাই শ্রীএন. কে. সিংহ বলেছেন, "যখন অষাধ বাণিজ্যের উক্ত তাপ-প্রবাহের সাথনে ভারতে ও চীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অপৃত হতে লেগ তখন বৃটিশ লবণ শিল্প ও জাহাজী-ব্যবসায়ের স্বার্থে যে বাংলাদেশের লবণ-আইনের উপরও আক্রমণ নেমে আসবে না এটা তারা খুব বেশী আশা করত।' ৩৭

ইতিপূর্বে বাংলা ও বিহার থেকে সুদ্ধিত অর্থে ইংলণ্ডে বিভিন্ন শিল্পের মতো লবণ-শিল্পও নতুন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। অষাধ-বাণিজ্যের সুযোগে ইংলণ্ডের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা উন্নত যন্ত্র উৎপন্ন লবণ প্রচুর পরিমাণে সস্তা দরে আমদানি করে বাংলার লবণকে হটিয়ে বাংলা-দেশের বাজার দখল করে। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানের লবণের কার-খানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায়। 'বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প যেমন বাংলা-দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশের লবণ-শিল্পও একদিন বাংলাদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।' ৩৮ উইরোপীয় শিল্পপতি-বণিকদের অষাধ-বাণিজ্যের আক্রমণে ও তাকে রাজা রামমোহনের

(শেষাংশ ৭৪ পৃষ্ঠায়)

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি ও কামাথ

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

পরবর্তীকালে আমার বিদ্ধ কৌতুকের "নেতাজী" হিসেবে সুভাষচন্দ্রের পরিচয়টিই মুখ্য হয়ে উঠলেও অথচ রাখতে হবে কংগ্রেসের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও প্রবর্তক তিনি। কংগ্রেসের ওংকার-চর্চিত চরকানীতির বদলে তিনিই সর্বপ্রথম এদেশে যন্ত্রশিল্প নির্ভর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আনতে চেয়েছিলেন।

১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে তাঁরই উদ্যোগে "জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি" গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছায় ও চেষ্টাতেই জহরলাল নেহেরু প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন।

মজার ব্যাপার সুভাষচন্দ্রের এই ভূমিকাটি আজকের মানুষের মন থেকে মুছে যেতে বসেছে। জাতীয় প্ল্যানিংএর সমস্ত গৌরব পরবর্তীকালে নেহরুর উপর বর্তেছে। তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' কেতাবে জাতীয় প্ল্যানিংএর নায়করূপে তিনি নিজেকেই স্থাপন করেছেন। এমনকি প্রশান্ত মহলানবিশের মতন মানুষও নেহরুর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষণা করেছেন "নেহরু ভারতবর্ষ-পরিকল্পনা-'বম্বাক' চিন্তার প্রবর্তক।" ইত্যাদি। যাঁরা শ্রীমহলানবিশ উল্লেখ করেছেন "১৯৩৮-এ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন এবং নেহরুকে তার চেয়ারম্যান করেন" তাঁদের এই "কংগ্রেস সভাপতি" যে সুভাষচন্দ্র সে-নামের কোথাও উল্লেখ নেই।

ব্রিটিশ ভি. পি. গিরি অবশ্য ১৯৭০-এ নেতাজী-প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের কাছে তারবার্তায় জানান "He (Netaji) was primarily instrumental in establishing the National Planning committee which laid down the foundations for realistic econonic Planning of our resources.

এই প্ল্যানিং কমিটির সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছিলেন এইচ্. ভি. কামাথ। শ্রীকামাথকে শেষপর্যন্ত সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করতে হয়েছিল। কামাথের তরফের অপরাধ তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচনদ্বন্দ্বের সময় সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কিছু ঝিহুতি দিয়েছিলেন, যার মধ্যে জহরলালের সমালোচনা ছিল। এবং ত্রিপুরীর পরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলে তাতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

শ্রীকামাথের সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই রাজনৈতিক অনুরক্তির অপরাধে নেহরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরবর্তী সময়ে কামাথ নেহরুর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য নেহরুর অনুমতি নিয়েই।

নেহরুর চিঠিগুলিতে লক্ষ্য করা যায় কামাথকে তিনি অন্যতম কর্মী রূপে পেতে চেয়েছিলেন। কামাথ রাজনীতিতে নবাগত, তাঁর শিক্ষানবীশির কাল পেরোয়নি বলে যথেষ্ট অভিভাবকত্বও করা হয়েছে।

অথচ নেহরু ভালোই জানতেন, রাজনীতিতে যোগ দেবার আগে শ্রীকামাথ সাতবছর ধরে আই, সি, এসের চাকরি করেছেন এবং দেশকে তাকোবেসেই চাকরি ছেড়েছেন। কামাথ গোড়ায় প্ল্যানিং কমিটির যুগ্ম সেক্রেটারি ছিলেন। নেহরু তাঁর উপর কে. টি. শাহকে জেনারেল সেক্রেটারি বসিয়ে দিলেন ত্রুর কামাথকে ডিফেন্স সেক্রেটারির অনারারি করলেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল, "বিপ্লবাত্মক রাজনীতির" সঙ্গে কামাথের যোগাযোগ রাখা চলবেনা।

কামাথ নেহরুকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ প্ল্যানিং কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর কর্মদক্ষতা কমিয়েছে, একথা তিনি প্রমাণ করুন। তা না করে কতকগুলি বিধি নিষেধ এবং মাসিক ৩৫০ টাকার একটি চাকরি কামাথের মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কামাথ পদত্যাগ করতে চাইলে নেহরু তৎপরতার সঙ্গে তাতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।

দৃঢ় কামাথ চিঠিতে লিখেছিলেন, "In any case, I did not resign the Indian Civil Service merely in order to exchange one prison house for another."

শ্রীকামাথের কাছে এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিতে ত্যাগ করে নেহরুর পক্ষপুটে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। সাত বছর সরকারি চাকরির পরে কামাথ যখন বুঝেছিলেন, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, তখনই তিনি যৌবনের আদর্শ সুভাষচন্দ্রের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন পরামর্শ চেয়ে। উত্তরে সুভাষচন্দ্র লেখেন : "সমস্ত হৃদয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই, সিভিল সার্ভিস থাকে হাবাগ, দেশ পেল তাকে।"

এর কিছু পরেই নাগপুরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন রামপ্রসাদ মিশ্রের বাড়িতে। কামাথের বর্ণনা : "আমি ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি যে-খাটিয়াতে বিশ্রাম করছিলেন সেখান থেকে লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মাতৃহারা মুখে যত সাদর হাসি দেখেছি, তার মধ্যে মধুরতম হাসি তাঁর মুখে দেখলাম সাদা-মাঠা ঘরটি ঝলমল করে উঠল তাতে—আমি অন্তত করলাম আমি ঠিক পথই নিয়েছি।"

১৯৩৯, ২৯ জুন ত্রিপুরীর স্ট্যাণ্ডার্ডে কামাথের পদত্যাগ সংবাদটি এইভাবে বেরিয়েছিল।

Congress Ban on Politics

National Planning Committee
Mr. Kamath Resings Secretaryship

Mr. H. V. Kamath, Joint Secretary of National Planning Committee has tendered his resignation of the Secretaryship.

In a statement he says, "I am forced to resign the Secretaryship of National Planning Committee, faced as I am with the impossible alternative of the nonpartition in politics. Though I gave the assurance that I will not let spare time extra sacretarial activities interfere in any manner with the work of the Planning committee, yet the chairman and members apparently think that such activities on my part create difficulties.

"When I accepted the office in January last, I was not told that I would have to refrain from political activities, controversial otherwise. Objection was first taken to the statements issued by me in connection with the controversy relating to the Presidential election and subsequently to my part in the formation of the Forward Bloc in Bombay."

কামাথের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ৮ই জুলাই ১৯৩৯ এ নেহরুকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সে-চিঠির উত্তর নেহরু দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না।

সুভাষচন্দ্রের চিঠির শেষাংশ "..... I would not have written to you on this matter if you had not done so first, because Shri Kamath happens to be supporting my views··· you have not so far cared to consult me regarding the secretarial arrangement, though I was largely responsible for bringing this committee into being and have incurred the displeasure of the Ghandians in consequence thereof."

বাংলার লবণ-শিল্প

(৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নেতৃত্বে দেশীয় বণিক-জমিদারদের অবশ্য সহযোগিতায় এই কৃষি-শিল্পটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তার ফলে সারা বাংলাদেশে প্রায় ছয় লক্ষ লবণ-কারিগর বেকার হয়ে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। ৩১

১. সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন, পৃঃ ৩
২. N. K. Sinha : Midnapore salt Papers, p. 2
৩. Ibid, p. 3
৪. Ibid, p. 3
৫. Harry Verelst : A Narrative of The Transactions in Bengal, p. 28
৬. N. K. Sinha The Economic History of Bengal, vol. I, p. 85
৭. N. K. Sinha Midnapore salt papers, p. 4
৮. N. K. Sinha : The Economic History of Bengal, vol. I, p. 217
৯. William Bolts : Considerations of Indin Affairs, p. 216
১০. N. K. Sinha : The Economic History of Bengal, vol. I, p. 216
১১. N. K. Sinha : Midnapore salt Papers, p. 6
১২. প্রফুল্লকাল রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১৪
১৩. Quoted from J. C. Sinha : Economic Annals of Bengal, p. 187
১৪. Quoted form R. C. Dutta : The Economic History of India, vol. I, p. 198
১৫. Ibid, p. 198
১৬. বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়), পৃঃ ৮৯
১৭. J. C. Sinha : Economic Annals of Bengal, p. 188
১৮. Henry Beveridge : History of Bakhargany, p. 105
১৯. Khulna District Gazetteer, p. 44
২০. বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম), পৃঃ ১৬
২১. Quoted from R. C. Dutta : The Economic History of India, vol. I, p. 219
২২. Quoted from N. K. Sinha : The Economic History of Bengal, vol. I, p. 218
২৩. N. K. Sinha : Midnapore salt papers, p. 7
২৪. Ibid. p. 7
২৫. Ibid, p. 12
২৬. Ibid, p. 7
২৮. Ibid, p. 8
২৯. N. K. Sinha : The Economic History of Bengal, vol. I, p. 126
৩০. Ibid, p. 229
৩১. R. C. Dutta : The Economic History on India, vol. I. p. 198
৩২. Ibid, p. 200
৩৩. Ibid p. 200
৩৪. Edited by S.C. Sarkar : Rammohun Roy on Indian Economy, p. 81
৩৫. Ibid, p. 82
৩৬. N. K. Sinha : Midnapore salt papers, p. 11
৩৭. Ibid, p. 9
৩৮. Ibid, p. 10
৩৯. প্রফুল্লকাল রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১৯৩

গ্রন্থ সমালোচনা

উল্লেখযোগ্য গল্পসংগ্রহ

বই-বাজারে অপরিচিত একটি নাম চিত্ত ঘোষাল। কিন্তু এই বাজারের বাইরে যেখানে সংসাহিত্য সেখানে চিত্ত ঘোষালকে বার দিয়ে বর্তমান বাংলা ছোটগল্পের কথা ভাবা শক্ত। গত পনেরো বিশ বছরে এমন বেশ কিছু ছোট গল্প তিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে তাঁর কলমের প্রতিভা নিশ্চয়তার স্বাক্ষর বর্তমান। কি বিষয় নির্বাচনে কি গল্পের শরীর নির্মাণে চিত্ত ঘোষালের সচকিত ছোট গল্প লেখক বর্তমানে দুর্লভ। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গল্প সংগ্রহটিতে (গল্প-সংগ্রহ। চিত্ত ঘোষাল। শুকসারী প্রকাশন। দাম দশ টাকা) পাঠকরা তার পরিচয় পাবেন।

'একটি ঘুনের বৃত্তান্ত' ও 'বয়সের কথা' গল্প দুটি অনুসরণীয়। ঐতিহ্যের অনুসারী হয়েও ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পেরেছেন এই লেখক। 'পলায়নপর' বাংলা সাহিত্য অবশ্য, নিজের ভিতরে ও বাইরে মানুষের যে সংগ্রাম সেখান থেকে পলায়নে তাঁর অব্যাহতি নেই, বরং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই মানুষের অস্তিত্ব সার্থক, এই শুদ্ধতি স্তরকের আশ্রয় অসাধারণ ব্যাপ্তি লাভ করেছে এই গল্পে। 'বন্ধুতা' দুই হংসী যুদ্ধের সাধারণ সুখদুঃখের গল্প থেকে নিপুণ কলমের কয়েকটি আঁচড়ে একজনের শ্রেণী-অবস্থান থেকে তার পতনকে স্বীকার করে নেওয়ার ঘটনায় গূঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'ঈশ্বরের মৃত্যু' গল্পে একজন সৎ সাধারণ মানুষের মৃত্যুকে ঈশ্বর ধারণার সঙ্গে

বামপন্থী আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জর্জরিত। মুদ্রাস্ফীতির বাগাড়ম্বরে প্রকৃত কোন কাজ হওয়া অসম্ভব। আজ আমাদের দেশের যা অবস্থা ধন-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় এ না হয়ে পারে না। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোই যেখানে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে সেখানে ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশ কি করবে। সংবিধানে "সমাজতন্ত্র" কথাটা জুড়ে দিলেই সমাজতন্ত্র আনা যায় না। কিংবা "সমাজতন্ত্র চাই" বললেই সমাজতন্ত্র আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে না। কংগ্রেসের লোকেরা কি এতই মূর্খ যে তাঁরা জানেন না উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজতন্ত্র আসে না?

নিশ্চয়ই তাঁরা জানেন। কিন্তু যে ধনতান্ত্রিক ভিত্তের ওপর সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে তাতে সমাজতন্ত্র আনতে গেলে বার্ত্তমানিক প্রশাসনের সমস্ত ইমারতটাই ধ্বসে যাবে। যার ফলে কায়েমী স্বার্থের উৎখাত অনিবার্য। এবং সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কায়েমী স্বার্থ কখনও নিজের শ্মশানশয্যা রচনা করতে পারে?

অতএব আবার আন্দোলন শুরু হবে, জনগণ মিছিলে সামিল হবেন। কেননা বিক্ষোভ কখনও অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারেনা। তার প্রকাশ ঘটবেই।

মন্ত্রী সভায় রদবদল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত সপ্তাহে মন্ত্রী শ্রীঅন্নদাল আবেদিন দিল্লী গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে শ্রীমতী মায়া রায়ের সঙ্গে শ্রীআবেদিনের বেশ কিছু উত্তপ্ত আলোচনা হয়। শ্রীমতী রায় পরিবর্তনের বিপক্ষে "লবি" তৈরির জন্য প্রচণ্ড তৎপর হয়ে উঠেছেন।

এদিকে পরিবর্তনপন্থীরা দল বেঁধে জেলায় জেলায় ঘুরে ব্যাপকভাবে জনমত গড়ে জনমত গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। পরিবর্তন বিরোধীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। আক্রমণ হলে পাল্টা আক্রমণ। দরকার হলে মন্ত্রিসভাও রদবদল করা হবে।

প্রতীকী তাৎপর্যে মেলানোর দক্ষতা বহুকাল মনে রাখার মতো। জীবনের প্রতি দুর্মর ভালবাসার অসাধারণ আলেখ্য 'আলোর চোখ', যে ভালোবাসা সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তীব্র, অপ্রতিরোধ্য। 'পীড়া' 'ভবনাথের কালীপূজা' 'কেষ্টদার গল্প' ভিন্ন ভিন্ন রসের অত্যন্ত উজ্জ্বল রচনা। কিন্তু 'রাংতার প্যাকেট' গল্পটির বিষয়বস্তুর দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও এই সংকলনে স্থান পাবার উপযুক্ত গল্প বলে আমার মনে হয়নি।

অনিলকুমার বিশ্বাস

কবিতায় সংগ্রামী জীবন

যেখানে সহজ কথাকে দুর্বোধ্য করে বলার আপ্রাণ প্রয়াসে আঁতেল কবিকুল ব্যস্ত, সেখানে সংগ্রামী জীবনের অমল গভীরতা, অসহজ সহজভাবে বলার (যা মহৎ কবিতার মূললক্ষণ) সক্ষম সবল সার্থক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল মৃণাল বসুগুপ্তর আটাত্রটি কবিতার এই সংকলনে (যেখানে জীবন। মৃণাল বসুগুপ্ত। শুকসারী প্রকাশন। দাম চার টাকা।)। প্রথম আবির্ভাবেই মৃণাল প্রমাণ করলেন সাম্প্রতিক কবিতার আসরে তিনি এক ব্যতিক্রম। মৃণালের শুদ্ধি শব্দপ্রয়োগ সচকীত, আধুনিক, শুদ্ধু। বিষয়ের বর্ণবুলে অবলীলায় পৌঁছে যেতে পারেন বলেই মৃণাল স্পষ্ট। এই গভীর স্পষ্টতা এক সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পাওয়া যেত, অবশ্য মৃণাল সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নি।

প্রথম কবিতা জীবন-স্মৃতিতে বিসর্গ বর্ণনায় জীবনানন্দের কিছু প্রভাব থাকলেও ছ পাতার এই দীর্ঘ কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ এই কারণে যে আত্মপরিচয়মূলক এরকম কবিতা কোনো আধুনিক কবি লিখতে সাহস করেছেন বলে আমার জানা নেই। এবং প্রথম কবিতায় নিজের অবস্থান ভোলাবে ভুলে ধরেছেন কবি, তাতে সমগ্র সংকলনের বিষয় ভাবনা ও কবিকর্ম সম্পর্কে সোচ্চার না হয়েও যে প্রতিশ্রুতি তিনি পাঠকের সামনে রাখেন, বইটি পড়া শেষ করলে তা আশ্চর্য সার্থক মনে হয়। কবিতাগুলিতে এমন একজন সংগ্রামী প্রেমিক কবি-ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁর কাজ 'জীবনের শিকড়ে সুস্থির'।

একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি—'পৃষ্ঠাত্ত স্বরণ বলি,—একটি রেশ ···নাম···ভিয়েননামে/যে হাত বন্দুক ধরে সেই হাত চাঁদের আলোয়/দুপুরের রাঙা ফুল হাতে তুলে দেয় প্রেমিকায়,/সংগ্রামের প্রথমই স্পর্শের মদিরা দিয়ে ধোয়/দুপুরের সমাচার হৃদয়ের নিকটে শুধোয়,/নাচে, গায় গল্প করে, খোঁড়া জানে জীবনের দায়,/কবিতা লেখেন চাচা যে চিমনও চাঁদের আলোয়।'

ছিমছাম প্রচ্ছদ, সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই শুকসারী প্রকাশনের ঐতিহ্যানুগ।

শান্তিময় চক্রবর্তী

গুয়াতেমালা

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রতি ভাষায় পরিণত। ১৯৭৪ সালেই জনের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় বাট কোটি ডলারের মত, এখন এই ঋণের পরিমাণ আরও দেড়গুণ বেড়েছে। বেকার সমস্যার শেষ নিরসন। গৃহ সমস্যাও জটিল। প্রায় আট লক্ষ (৮৩,০০০) পরিবার গৃহহীন। শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বদলে সামরিক-খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ছে।

ফ্যাসিস্ত লাগারুদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমেই মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে। ফ্যাসিস্ত হামলা সত্ত্বেও আখ শিল্পের শ্রমিকরা, হাসপাতাল ও অন্যান্য সংস্থার কর্মীরা সাম্প্রতিক অর্থ-নৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছে। মিলিত কমিউনিষ্ট পার্টি, গুয়াতেমালার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল ও গোষ্ঠী নিয়ে ফ্রন্ট করে ফ্যাসিস্ত জুন্টার বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। ওরা লালপাতা লাল ইস্তাহার ফ্যাসিস্তদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

উত্তর কলকাতায় একটি কারখানা বন্ধের কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার একটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কারখানার তালা ঝুলল। রবীন্দ্র সংগীতে অধিকন্তু ভক্তা তৈরির এই কারখানা থেকেই স্থানীয় প্রায় একশ' মুখকে জরি-রোজগার হত।

সম্প্রতি তাজ কয় হওয়ায় অনুহাত তুলে কারখানার মালিক মুখ্যাত এক শিল্পপতি বন্ধের হুমকী দেখাচ্ছিলেন। কর্মচারীদের দৃঢ় মনোবল এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম তাকে বাধ সাধে।

কিন্তু চতুর কালোবাজার ব্যবসায়ী নাকি হাতাহাতি ইউনিয়নের সভাপতির সঙ্গে গোপন চুক্তি করেন। এর পরই এখানে লোডার ঘোষণা করা হয়।

এদিকে কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি বলে পরিচিত ঐ ব্যক্তি নিজেকে কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা বলে দাবি করে থাকেন। গত কয়েকমাসে তিনি বার দুয়েক দিল্লি কলকাতা করেছেন। এর মধ্যে কতটা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রভাব বজায় রাখার জন্য আর কতটুকু শ্রমিক দরদে তা অবশ্য কেউ জানেন না। তবে শ্রমিকদের কাছে মিথ্যে থেকে এসেই তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এলাম। এবার কারখানা খুলবে।

কারখানা বন্ধ হয়েছে প্রায় চার মাস। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেশিরভাগই রাস্তায় বসেছেন। স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে তাঁরা বাড়ি বাড়ি সাহায্য চেয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ রাস্তার আনাজ বিক্রি করে কোনক্রমে বেঁচে আছেন। কেউ বা পাশলের মত ঘুরছেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিক বহাল তবিয়তেই আছেন। ইউনিয়নের সভাপতিও সকাল হলেই নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে তাঁর ছাপাখানার মালিকানা বজায় রাখছেন। হবেলা নাম কটা হোটেলে খানাপিনাও চলছে। কেবল বন্ধ কারখানার দরজা আর খুলছে না। শ্রমিক দরদের এমন অদ্ভুত নমুনা নাকি শ্রমিক-কর্মচারীরা আর কখনও দেখেন নি।

মিহির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮·০০
পৃথিবীর বয়স	১৪·০০
জীবন নিরবধি	১৬·০০
ঘরে ফেরারদিন	৫·০০
দিবস বিভাবরী	৫·০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬·০০
আলোর সহোদর	৪·০০
পারাবারের তীরে	১০·০০

শুকসারী ।। ১৭২।৩এ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ।। নথ ব্রাদার্স। বুক ষ্টোর্স। কথা ও কাহিনী।

Regd. No. WB/CC-3 PRICE 40 Paise

বাংলা ছবির সমস্যা নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ ?

ভানুসিংহ

বাংলা ছবির নানাবিধ সমস্যা নিয়ে বহুবার অনেক জায়গায় আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে কি? আজও তো বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের আকাশে দুর্ধরাশ দেখা কাটেনি। সত্যজিৎ রায়ের বাংলা ছবি দি'য়িরস ক'রে এলেও বাংলা ছবির শিল্পগত মানের তো কোন উন্নতি হয়নি! ব্যবসাগত দিক থেকেও বাংলা ছবি মার খেয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। এরাজ্যেই বোধের হিন্দি ছবি বাজার মাত করে দিচ্ছে রঙেও বাহারে, টেকনিকের চাতুর্যেও আর আর্কষণীয় মুক্ত সম্ভারে। সেখানে বাংলা ছবি হচ্ছে বিত্তস বিরক্তিকর, বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত। তাই বাংলা ছবির দর্শকপাওয়া যায় না। শুধু 'বাংলা ছবি দেখুন' স্লোগান তুললে কী হবে? সুস্থরুচিসম্পন্ন, আনন্দের বাংলা ছবি তৈরী করেই দর্শক টানতে হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে কোথায়? স্টুডিওর সংখ্যা নামমাত্র, জরাজীর্ণ সেই যন্ত্র-সংখ্যক স্টুডিওতে সাবেকি ভাঙা চোরা যন্ত্রপাতি, অনন্দর পীড়িত কলাকুশলী, বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিত চিত্রমুক্তি, প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক গোষ্ঠীর মধ্যে সুস্থ বোঝা-পড়ার অভাব ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পীকে কেন্দ্র করে সরকারী মহাবথী থেকে শুরু করে বেসরকারী রথী অনেকেই সমবেদনা, সহানুভূতি, সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু সবই মুক্তগর্ভ মনে হচ্ছে। কারণ শিল্পের মুমূর্ষু অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন এখনও নজরে পড়ে না।

সম্প্রতি পার্ক হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে এই সব সমস্যা নিয়ে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন 'ফ্রান্সস্থল কোরাস অফ ফিল্ম অ্যাণ্ড পারফরমিং আর্টিস্টস'-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি ক্যাথলেন কমিটির সেক্রেটারি যশপাল কাপুর সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চক্রে প্রস্তাবিত মীমাংসাগুলি সম্পর্কে সরকারকে উদ্যোগী করার দায় দায়িত্ব নিয়েই নাকি শ্রীকাপুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একবার তিনি জানিয়েও ছিলেন, মুমূর্ষু চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার কখনই অস্বীকার করেন না। ...অস্বীকার তো করেন না কিন্তু স্বীকার করেই বা কাজের কাজটা কি হচ্ছে, তাও তো বোঝা যায় না।

আলোচনা সভায় অনেকেই অনেক কথা বললেন, নানা সমস্যার ছবি তুলে ধরলেন, কেউ কেউ সমাধানের ইংগিতও দিলেন। বর্তা ব্যক্তরা সভার মনোযোগ সহকারে সে সব শুনলেন, হয় তো হৃদয়ঙ্গমও করলেন। তারপর কি ঘটবে, সেটা অবশ্য বলা যায় না। আদৌ কিছু ঘটবে কিনা, তাও না। কারণ আজ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের তেমন কিছুই ঘটাবে যে।

তবে রাধামোহন ভট্টাচার্য আর ভূপেন হাজারিকা বৈঠকী আসর যেন জমিয়ে দিয়েছিলেন। রাধামোহন-বাবু বললেন, আওয়াজ্ঞতে সম্মান পুরস্কার আমরা অনেক পেয়েছি কিন্তু আজও আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের টিকে থাকাটাই একটা বড় সমস্যা। প্রযোজক পরিবেশক ও প্রদর্শক—সকলকে মিলে মিশে সমস্যা সমাধানের পথ বার করতে হবে। ভূপেন হাজারিকা বললেন আমরা দয়া চাইনা। সরকারী পুরস্কারেই বা সত্যিকারের কি লাভ? আমাদে যতদিন ছবি চলে, ততদিনের পুরো প্রমোদ কর সরকার প্রযোজককে ফিরিয়ে দেন। সেই টাকায় প্রযোজক আবার ছবি করতে পারেন। এই ব্যবস্থা বাংসার কর চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে কেন করা যাবে না?

বড় বড় হিন্দি ছবিতে প্রচুর রঙের ছোঁয়াচ্য দেখা যায়। অথচ কত প্রতিভাবান তরুণ পরিচালক সামান্য রঙিন ফিল্ম ব্যবহারের সুযোগটুকুও পান না। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকুশলীদের পক্ষ থেকে পারিজাত বসু কিন্তু একটা যোক্ষম প্রশ্ন সোজাসুজি বসপাল কাপুরকে করে বসেন। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত অডিনান্সটি এখনো কেন ঝিড়িতে আটকে আছে? ...অনেকে আবার বলেন, সেই অডিনান্সটি পাশ হলেই কি চলচ্চিত্র শিল্পের সব সমস্যা মিটে যাবে?

তা হয়তো যাবে না। কিন্তু একটা সমস্যা তো কাটবে। পশ্চিমবঙ্গে তৈরী ছবির প্রাধান্য তো ঘটবে। বাংলা ছবির মুক্তি নিয়ে ঝামেলা তো মিটবে। বছরে ছাব্বিশ লক্ষাধিক কলকাতার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হলে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা তো দেখা দেবেই। প্রথমেই সমস্যা দেখা দেবে—অন্ত বাংলা ছবি তৈরী হচ্ছে কোথায়? কিন্তু বাংলা ছবি যে বেশি পরিমাণে তৈরী হতে পারছেনা অনিশ্চয়তার জন্যে—স্টোও তো মিথ্যে নয়। আজও তো কত বাংলা ছবি সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে আর ছবির নির্মাতা হতাশ, টাকার বিপুল পরিমাণ সুদ গুণে যাচ্ছেন। এটা ছবির ব্যবসায়ে লোকসান ডেকে আনে না কি? এই জন্যই তো চিত্র নির্মাতার পুনরায় চিত্র নির্মাণে উৎসাহ থাকে না। নতুন করে এই ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করতেও অনেকে উৎসাহিত হন না। তবে অধিকাংশ বাংলা ছবি যে-নীচুমানে তৈরী হচ্ছে, সেটাই যদি বজায় থাকে, তবে ছবি অধিক পরিমাণ নির্মিত হলেও এবং ছবিমুক্তির অঢেল ব্যবস্থা থাকলেও দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না—এটাও নির্মম সত্য। বাংলা ছবির মানকে উন্নত করতেই হবে। এখান থেকেই উৎকৃষ্ট হিন্দি ছবিও তৈরী করতে হবে সর্বভারতীয় বাজার অধিকার করতে। মনে হয়, এসবই হতে পারে যদি বাংলার ছবি এখানে প্রাধান্য পায়, চিত্রমুক্তির সমস্যা যদি মিটে যায়, সরকারের শক্তির সাহায্য যদি এই শিল্প পায়। কিন্তু তা কি হবে? প্রশ্ন আগে, বাংলা ছবির সমস্যা নিয়ে এত আলোচনা, পর্যালোচনা—সবই কি ফাঁকা আওয়াজ?

আন্দোলন গড়ে তুলুন ঃ বামপন্থীদের আহ্বান

(দর্পণের প্রতিনিধি)

গত ১৪ই ডিসেম্বর 'ভারত সভা ভবন হলে সাততি বামপন্থী দল বর্ধক আহোজিত এক সভায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই সভায় সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, কংগ্রেস সরকার বলেছিল, জনগণের কল্যাণেই নাকি জরুরী অবস্থা কিন্তু কল্যাণ কী হল। সংবিধান বদলে গেল, জনগণের অধিকার হেটুকু ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ সংবিধান সংশোধন নাকি জনস্বার্থেই করা হয়েছে। বলা হয়েছিল, জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য, জিনিসপত্রের দাম কমাবার জন্য। কিন্তু আমরা এখন কী দেখছি? দাম কমেনি, বাড়ছে। উৎপাদন বেড়েছে জরুরী অবস্থার পর। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা ভালো হয়নি। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অনেক শিল্পে আবার সংকট দেখা দিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি জমিদারদের ওপর শাসন নেই, ওরা অবাধে লুটতে পারে।

শ্রীবসু বলেন: এখনও ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। দশ বছরে ৪৫ লক্ষ রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার বেড়ে ৯৫ লক্ষে পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চল থেকারে তে গেছে, উচ্চশিক্ষা রোধ হচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক, মাঝ বয়ের মানুষ কাজ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছেন। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ। অনেককেত্রে দাম বাড়াবার অনুমতি সরকার নিজেই দিয়েছে। বৃক্ষরোপণ, রাস্তার জঞ্জাল দূর করে জনগণের মৌলিক সমস্যার কি করে সমাধান হবে? দোকানে দোকানে সরকার তালিকা টাঙাতে নির্দেশ দিল। কিন্তু আইনগতভাবে কোন জিনিসের দাম তো বাঁধা নেই। কাজেই দাম বাড়াদের কালোবাজারী মনাফাখোরেরা শাস্তি পাচ্ছেন। দাম হ্রাসের কোন ব্যবস্থাই তাঁরা নেননি। খরা ও বন্যাপীড়িত মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ।

শ্রীবসু বলেন, কিন্তু এই পরিবর্তন জনগণকেই করতে হবে।..... মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌছে দেওয়া ঐক্যবদ্ধ করা এখনকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে যাবেন, অবশ্য যাই হোক না কেন এইভাবে ধাপে ধাপে আমাদের লক্ষ্যের পথে এগুতে হবে।

সভায় উদ্যোক্তা সি পি এম, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস পি, আর সি পি আই, মার্কসিষ্ট ফরোয়ার্ডব্লক এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার আনা, খরা ও বন্যা পীড়িত অঞ্চলের জনগণকে সাহায্য দান, খরা ও বন্যা পীড়িত অঞ্চলের খাজনা মকুব এবং প্রয়োজনমত লেভির হার কমানো এবং সেত মজুতদের নিয়ন্ত্রিত কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবি করা হয়। এই দাবি পুরণে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমন্মথ চক্রবর্তী (ফ, ব)। অন্যান্য দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীহরিপদ মল্লিক চৌধুরী, নিখিল মুখার্জী, সৌমেন ভট্টাচার্য, মধুসূদন ঘোষ।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

চাঁদার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাষিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

সম্পাদক—ধীরেন বসু

স স্পাদক বর্ধক ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

দর্পণ
১৯শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর '৭৬ ॥ ৪০ পঃ

সিদ্ধার্থ রায় আপাততঃ থেকে গেলেন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ রায় আপাততঃ থেকে গেলেন। অনেক আলোচনা, পরামর্শ করার পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সিদ্ধার্থবাবুকে এখুনি সরানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ালেন। তবে সিদ্ধার্থবাবুর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশের মেঘ এখনো কাটলো না।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায় পরিবর্তনপন্থী রাজ্য নেতাদেরকে আপাততঃ সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে সহাবস্থান করার জন্য দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছেন।

দিল্লীর নির্দেশ মেনে নিয়ে এই মহল থেকে তাঁদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে। এর মধ্যে অর্থ ও শিল্প দপ্তর অন্যতম। প্রথমে জানা গিয়েছিল শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী বরকত গনিখানের মধ্যে এই দপ্তর নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। এখন জানা গেল বরকত সাহেব তরুণবাবুর পক্ষে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশ্যই দপ্তর পুনর্গঠন করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবেন। দিল্লীর সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার পর কলকাতার কংগ্রেসের দুই মহলেই জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। সবাই চিন্তিত এই ভেবে যে সংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোনোর পর আবার কী ভাবে আপোষ হতে পারে। কারণ, ঘরোয়া বৈঠক থেকে শুরু করে প্রকাশ্য জনসভা পর্যন্ত নিজেদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী পরস্পর যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে দলীয় সংহতির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। বিশ্বে এখন ব্যক্তি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তারপরও একসঙ্গে মন্ত্রিসভায় থাকা ও দলের মধ্যে কাজ করা কি করে সম্ভব দেখা সকলেই ভাবছেন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পঙ্কজের বিরোধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ব্যানার্জীর সঙ্গে যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

পঙ্কজবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সভায় প্রশাসনিক পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং শ্রীমতী সরকে সমর্থন করেছিলেন। এরপর পঙ্কজবাবু মাদ্রাজে পার্টির কাজ

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কৃষকদের ফসল তোলার সংগ্রাম

জোতদারদের আক্রমণ ঃ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ

গ্রামে গ্রামে জোতদারদের আক্রমণ চলছে তারা প্রশাসন ও পুলিশকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য তৎপর। কোন কোন জায়গায় জোতদাররা গুণ্ডা বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও অনেক ক্ষেত্রে সংগঠিতশক্তির জোরে কৃষকরা তাদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলেছেন এবং এখনও তুলছেন। কয়েকটি জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। তবে তাদের সঙ্গে জোতদারদেরই যাতির।

প্রশাসন ও পুলিশ সরকারের আইন ও নীতিকে খোড়াই কেয়ার করে। তাই দেখা যায় পুলিশ পাহারা দেয় আর জোতদাররা গুণ্ডা বাহিনীর সাহায্যে কৃষকের ধান কেটে নিয়ে যায়। সাতাশ বছর ধরে এভাবেই চলছে। বড় বড় কাগজে এসব খবর বেরোয় না। ভাগচাষী ও কৃষকদের জন্য আইন রয়েছে, কিন্তু সে আইন জোতদাররা মানে না। তারা খুশিমত ভাগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে, কৃষকদের ফসল জোর করে নিজেদের ঘরে তোলে। এবারকার ধানকাটার মরশুমে জেলায় জেলায় যে ঘটছে তার কিছু খবর আমরা "গণশক্তি" থেকে তুলে দিচ্ছি। জোতদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন কৃষক কর্মী খুন হয়েছেন এবং অনেক আহত হয়েছেন। বিভিন্ন জেলায় তিন সভাধিক কৃষক কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। "গণশক্তি" লিখেছে—

॥ কৃষক খুন ॥

গণশক্তির সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানার অন্তর্গত জগপুর গ্রামের ৮ঙর পাড়ার ধান লুট প্রতিরোধ করতে গিয়ে একজন কৃষক খুন হয়েছেন। বিশ্বস্ত প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জোতদার ও গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং দাগের ধান লুট করতে আসে। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে এলে তাদের প্রতি গুলি ছোঁড়া হয়। গুলিতে পদ্মলোচন সিং মারা যান। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুলিয়া চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ৩০১, ৩৭১, ১৪৭ ধারা বলে মানবাজার থানার জমাদার অরুণকুমার মুখার্জি সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করা হয়েছে। আগামী ৪ঠা জানুয়ারি শুনানির দিন।

॥ সিঙ্গলাপাল ॥

গত ২২শে নভেম্বর সিঙ্গলাপাল থানার দুবরাজপুর অঞ্চলের খয়রে গেড্যা মৌজার ১১৩ নং দাগের অন্তর্ভুক্ত জমি থেকে পুলিস ধান সীজ করে। হাইকোর্টের ইনজাংশন থাকা সত্ত্বেও কৃষক বাবল দাসের খামার ও জমি থেকে প্রায় দুই কাহন ধান সীজ করা হয়। কৃষক মহিলাদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত ও সি সিজার লিষ্ট দিতে বাধ্য হন।

২৩শে নভেম্বর ওই মৌজারই বর্গা মর্ণজা,ভূষণ বাগিক ও প্রাণভোম মর্ণজা যখন নিজেদের লাগানো ধান কাটছিলেন তখন পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করে ও ধান সীজ করে। এদের সিজার লিষ্ট দেওয়া হয় নি। ইতিপূর্বেও একবার পুলিস সিজার লিষ্ট ছাড়াই বর্গা মর্ণজার খামার থেকে ধান সীজ করেছিল। পরে এস ডি জে এম-এর আদেশে পুলিস সীমার লিষ্ট দেয়।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কাঁসাশিল্প ও শিল্পীরা আজ মৃত্যুমুখে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দুশো বছরের প্রাচীন কাঁসাশিল্প আজ মৃত্যুমুখে। মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার এই প্রসিদ্ধ শিল্পের কারিগররা চিরকালই মহাজনের বন্ধ্যার। বর্তমানে মূলধনের অভাবে তাদের ব্যবসা অচল, দিন কাটছে অনাহারে। তাদের সংখ্যা এখন মুষ্টিমেয় এবং অধিকাংশেই হয় যক্ষ্মারোগে নতুবা হাঁপানিতে ভুগছে।

কয়েক বছর আগেও খাগড়া, কান্দি, বহরমপুর ও জাঙ্গিপুরের কাঁসার বাসনের প্রচণ্ড চাহিদা ছিল সারা দেশে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং স্টেনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়ম ও অন্যান্য ধাতুর বাসনপত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে মুর্শিদাবাদের কাঁসাশিল্প এমন ধাক্কা খেয়েছে যে এই প্রাচীন শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের পেশা বদল করতে বাধ্য হয়েছে।

এদের জন্য কোন সমবায় সমিতি নেই। ব্যাঙ্কের ঋণ কিম্বা সরকারী সাহায্য সুদূর। রাজ্য সরকার একবার এদের কাঁচামাল যোগান দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঘুঘু মহাজনরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং কারিগররা আবার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়।

বস্তুত বহরমপুর শহরের খাগড়ার সরু গলি দিয়ে হাঁটা এক বিরাট অভিজ্ঞতা। আয়নাটোর নাম এখনো কাঁসারিপাড়া, কিন্তু মাত্র ছয়টি কাঁসারি পরিবার এখনও তাদের প্রাচীন পেশাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

কাঁসারিপাড়া একসময়ে বহরমপুর শহরে কর্মব্যস্ত ব্যবসাকেন্দ্র ছিল যেখানে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ৪০০ কাঁসারি পরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাণী ভবানীর পৃষ্ঠপোষকতায় বসবাস শুরু করে। তারপর থেকে তারা সেখানেই রয়ে যায়।

দরিদ্র কাঁসাশিল্পীরা যে অবস্থায় বর্তমানে আছে তা সত্যিই ভয়াবহ। তাদের যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল তার সবই মহাজনের পেটে। পৈত্রিক বাড়ি থাকলে বাঁধা পড়েছে।

এদের কাঁচামাল কেনার ক্ষমতা নেই। এদের নিজেদের সমবায় সমিতি না থাকায় মহাজনদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় যারা জিনিসের অর্ডার দেয়, তাদের কাঁচা মাল দেয়, যার বেশির ভাগই ভাঙা বাসনপত্র। কারিগররা মজুরির বিনিময়ে কাজ করে। এক কিলোগ্রাম ওজনের একটি বাসন তৈরি করতে সময় লাগে তিনজন লোকের দুই থেকে তিনদিন সকাল থেকে রাত্রি। আর এর মজুরি ছয় টাকা। অতএব একজন কারিগরের একমাসে ৫০ টাকার বেশি রোজগার হয় না। তাও যখন কাজ থাকে। সম্প্রতি একটি ব্যাঙ্ক একজন কারিগরকে কাঁচা মাল কেনার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কিছু টাকা দিয়েছে। কিন্তু এতে তাদের কি উপকার হবে বলা শক্ত, কারণ এখনও তারা মহাজনদের অক্টোপাসে।

সম্পাদকীয়

ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে

সম্প্রতি আমাদের দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটি খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নানা মহলে আলোড়ন। বস্তুত 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' শব্দটি মহত্ত্বজ্ঞাপক শব্দভাণ্ডারে একটি অমূল্য সম্পদ। গ্রীক নাগরিক রাষ্ট্রের কাল থেকে মুদ্রাযন্ত্রকারী ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত যে অর্থে 'স্বাধীনতাই' মানুষের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদরূপে বিবেচিত হয়েছে বিশ্ব সভ্যতাই এই মুহূর্ত পর্যন্ত সেই অর্থের কোন মৌলিক তারতম্য ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে সেন্ট্রাল্‌-পীয়ারের অমর চরিত্র সেনিক্লিসের অন্তিম উচ্চারণের কথাও স্মর্তব্য যেখানে স্বাধীনতাকেই চরম মূল্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেন নি। ব্যক্তি ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করেছেন।

ধনতন্ত্র-বিপ্লবের প্রথম যুগে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ধনতন্ত্রের স্বার্থেই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মকভাবে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সহ সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংগ্রামী-সাথী রূপে পেতে হলে তাদের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, ট্রেড-ইউনিয়নের স্বাধীনতা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারগুলো শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়ে থাকে এবং এই সংগ্রাম-লব্ধ অধিকারগুলো উদীয়মান বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠানেও সংবিধানে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করে থাকে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরেও দীর্ঘদিন শ্রমিক শ্রেণী গণতান্ত্রিক অধিকার-গুলোর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় নি। বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে ব্যক্তি ও নাগরিকের জীবনের স্বাধীনতার আদর্শ আরও বেশী সম্প্রসারিত হয় এবং প্রাধান্য লাভ করে। এই অর্থে ধনতান্ত্রিক বিপ্লবকে রাজতন্ত্রের সমাধির উপর ব্যক্তিস্বাধীনতার গৌরবকে অভিষিক্ত করা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যক্তি-সত্তা বা নাগরিক সত্তাকে শ্রেণী বহির্ভূতভাবে বিচার করা যায় কিনা? ব্যক্তি ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র, ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র—যে ভাবেই সমস্যাটিকে আমরা উপস্থাপিত করি না কেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটি শ্রেণীর উর্দ্ধে স্থাপন করা সম্ভব নয়।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ব্যক্তিসত্তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শ্রেণীসত্তার অঙ্গীভূত এবং ব্যক্তি কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিভূ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, ব্যক্তির চরিত্র, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে স্ব স্ব শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য প্রতি-ফলিত হতে বাধ্য। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই ব্যক্তিকে শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত সত্তারূপে চিহ্নিত করে থাকে। তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে কিভাবে শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা সম্ভব?

ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রাথমিক গণতন্ত্রের মৌল সর্ত। অনগ্রসর দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবস্তু ভূমি-সমস্যা কে কেন্দ্র করেই প্রাথমিক গণতন্ত্রের সংগ্রাম চালাতে হয়। কিন্তু লক্ষ্যটা নির্ধারণ করেই বিপদের কারণ ঘটে। নির্বাচনী ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার সনদকে যত বৃহৎ ও ব্যাপক করেই নির্মিত হোকনা কেন সেখানে নেতৃত্বের অস্থই বড় করে দেখা দেবে। আমাদের দেশে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ব্যাপারটি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের জীবনের আদর্শ-সিদ্ধান্ত রূপে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর, শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' শব্দটি এখনও দুর্বোধ্য। মজার কথা হচ্ছে, তথাকথিত শ্রমিক-দরদী পার্টিগুলি যারা উদ্‌ভ্রান্ত জনগণকে বিপ্লবের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে তারাও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বিপ্লবের মৌলিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে অসমর্থ। অথচ এ কথা কে না জানে যে মূল দ্বন্দ্বের সমাধান ছাড়া আংশিক প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থেকে যায়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথাই বলুন আর ব্যক্তি স্বাধীনতার কথাই বলুন জনগণের বৃহৎ অংশকে সাথ দিতে এসব কিছুর তাৎপর্য নেই।

দুঃখের কথা, আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনটা প্রায় বৈ বৈ করে কেটে গেল। "খাদ্য চাই", "চাকুরী চাই" "বোনাস চাই" সর্বোপরি "চাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা" —এসব চাওয়ার মধ্যে আসল কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। তাই বিপ্লবের কথা শুনলে লোকে হাসে। ওটা যেন একটা অথার কথা।

একথা ঠিক যে, শহরাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ রাজনীতিগত ভাবে সচেতন। তাই, শহরাঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমাবেশ করার সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু কৃষক আন্দোলন। গ্রামাঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শহরের শ্রমিক মধ্যবিত্তের আন্দোলনকেই ব্যাপক গণতান্ত্রিক ধর্মঘটে পরিণত করতে হবে। গ্রামকে জাগাতে পারলে শহর কখনই ঘুমিয়ে থাকবেনা।

বিগত ৩৫ বছরের বামপন্থী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই যে, সহরকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক সমর্থন ও অংশগ্রহণ সত্ত্বেও সেই আন্দোলন অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জনগণের মধ্যে নেমে এসেছে হতাশা ও ক্লান্তির ভাব। আজকের যুগে এই ধরনের আন্দোলনে জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় না। কিংবা সাময়িক ভাবে সঞ্চারিত হলেও তা রাজনৈতিক চেতনার স্তরে উন্নীত হয়না। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার লড়াইকে মূল রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য চিলিতে রাষ্ট্রসংঘের অফিসার খুন

ওয়াশিংটন, ২৫ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রসংঘের একজন অফি-সারকে গত জুলাই মাসে চিলিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ অনুযায়ী দেখা যায় ওই অফিসারকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু চিলির সরকারী কর্তৃপক্ষ ওই ঘটনাকে নেহাতই একটি দুর্ঘটনা বলে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

৫৪ বছর বয়স্ক ওই অফিসারটির নাম হচ্ছে কার্ল মেলা সোরিয়া এস্পিনোসা। প্রাক্তন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত অব-নৈতিক কমিশনে একই শাখা জাতির আমেরিকান ডেমো-ক্রাটিক পেটার্টে প্রকাশন বিভাগের তিনি ছিলেন প্রধান। সোরিয়ার জন্ম স্পেনে। তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি চিলিতে চলে আসেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, "বিশ্বে চিলিই হচ্ছে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ।" চিলি ও স্পেন—দু-দেশের নাগরিকত্বই তাঁর ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘে একজন অফিসার হিসেবে কূটনৈতিক স্বীকৃতির ফলে তিনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর পারিবারিক লোকজন ও বন্ধু-দের মতে কূটনৈতিক স্বীকৃতি পেলেও চিলির গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী 'দিনা' তাঁর উপর নজর রাখা থেকে একটুকু বিরত ছিল-।। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উপর খোলাখুলি নজর রাখার কাজ চলত।

তাঁর সহকর্মীদের মতে, গত ১ ই জুলাই সোরিয়া তাঁর বাসস্থানের উদ্দেশ্যে ভীষণ ত্যাগ করেন। অফিস থেকে তাঁর বাসস্থানে যোগাযোগাক্তিতে পৌঁছতে লাগে মাত্র পনের মিনিট। কিন্তু তিনি সারি পৌঁছাননি।

রাত প্রায় টোর সময় ওই এলাকার সাড়া আইন শুরু হয় স্থানীয় অধিবাসীরা একটি গাড়ির সংঘর্ষের আওয়াজ শোনেন। শব্দটি এমনভাবে হয় যে যেন কোন গাড়ি সংঘর্ষের পর গভীর খেদখালে গিয়ে পড়েছে। পরদিন অপরাহ্নে পুলিশ খালের নিচে সোরিয়ার গাড়িটি দেখতে পায়। খালের ধারে গাড়ীর পাশে সোরিয়ার রাষ্ট্রদূত প্রদত্ত পাসপোর্ট পড়েছিল। তাছাড়া সিগ্নাম হিসেবে তাঁর পরিচয়পত্র ও একখানা রুমালটিও ওখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

কাউকে পাওয়া না যাওয়ায় পুলিশ খালে বোঁজাখুজি করে। ১৬ই জুলাই দুপুরের একটু আগে আধমাইল দূরে জলের নিচে সোরিয়ার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

সরকারী ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখানে প্রকাশ করা হয়নি। তবে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্ঘটনার দরুন তাঁর মস্তিষ্কে ব্যাপক আঘাত লাগে। কিন্তু তিনজন ডাক্তার অন্য রিপোর্ট দিয়েছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, মোটর গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে আহত হওয়ার চিহ্ন দেখা যেতে পারে, কিন্তু তিনি যে আঘাত পেয়েছেন, তার সঙ্গে মোটর গাড়ী দুর্ঘটনার প্রায় আঘাতের চরিত্র বিভক্ত। তাঁরা উল্লেখ করেছেন: তাঁকে টেনে মাথা ও বুকে বেধর পেটানো হয়, গলা টিপে ধরা হয় এবং শেষে ধারালো কিছুর সাহায্যে গলার পেছনে আঘাত করে খুন করা হয়। সোরিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা বা নেওয়ার জন্য চিলিতে অব-স্থিত রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা অসন্তুষ্ট। তাঁরা আশঙ্কা করছেন সোরিয়ার পরিবারকে সাহায্যের দরুন তাঁদের উপরও এই ধরণের আক্রমণ নেমে আসতে পারে। সোরিয়ার বিধবা পত্নী এবং ছেলেমেয়েরা এই ঘটনার ওপর চাইলে তাদের উপরও সোরেন্দা বিভাগ নজর করতে শুরু করে এবং তাদের ভীতি প্রদর্শন করে হামেশাই টেলিফোন আসতে থাকে। অবশেষে তাদের চিলি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে তারা স্পেনে চলে গেছেন।

চিলির কবি পাবলো নেরুদার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন সোরিয়া। আলেন্দে সালভের সময় সরকারী মালি-কানার প্রকাশন সংস্থার তিনি উচ্চপদে আসীন ছিলেন।

চিলির সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রাষ্ট্রসংঘ সোরি-য়ার মৃত্যু সম্পর্কে পুরো এবং বিস্তৃত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

সংবাদটি 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকা থেকে গৃহীত। ২

যে ডালে বসেছে সেই ডালটাই কাটছে, এরকম একটি লোকের কাহিনী ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। কাহিনীটা ছিল হাস্যরসাত্মক। কিন্তু সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে করুণ রসও আছে। একটি স্বাধীন দেশের সর্বস্বীকৃত সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা সংবিধানটাকেই এমনভাবে পরিবর্তন করতে উদ্যত হয়েছেন যে তাঁদের নিজেদেরই বাক-স্বাধীনতা ও অন্যান্য মৌল অধিকার হতে যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল, মারাঠা ও ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অনুরূপ। তাহলে এত খরচ পত্র করে পার্লামেন্টারি নির্বাচনের লাভটা কী? যার প্রয়োজন নেই তাকে আর কতকাল টিকিয়ে রাখা যাবে? এর পরে হয়তো আর একটা চ্যানেল আসবে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাটাই রদ করা হবে। বলবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। সুতরাং বলতে পারা যাবেনা যে কাজটা অগণতান্ত্রিক।

ইউরোপের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা জানেন যে গত দুই শতাব্দী ধরে ফরাসীরা উত্তর সন্ধানে আছেন। দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে অজস্র প্রাণের মূল্য দিয়ে ত্যাগের মূল্য দিয়ে লাভ করা গেল দেবোপম মৌল অধিকার। কিছুকাল পরে দেখা গেল কতক লোক তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই ব্যবহার করছে ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহরণের কাজে। কেউ বা তাদের ব্যবসাকে, কেউ বা, ধর্মকে। তখন তাদের অংশাত্মক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হয়। নিয়ন্ত্রণ করতে করতে একদিন সংবিধানটাকেই খোল আর নলচে বদলে দিতে হয়। কিংবা তাকে সরাসরি বাতিল করতে হয়। তা বলে সেই কি শেষ কথা? না, তার পরে আর একদফা সংগ্রাম, রক্তক্ষয় কারাবাস, ত্যাগস্বীকার।

ইংরেজরা কিন্তু এক চরম পন্থা থেকে আরেক চরম পন্থায় লাফ দিয়ে চলে না। তারা স্বভাবত মধ্যপন্থী। কত দূর এগোতে হয়, কোন্‌খানে দাঁড়ি টানতে হয়, কখন আবার খানিকদূর পেছানো আর একটুখানি বাড়িয়ে নিতে হয় এটা তাদের মজ্জাগত। এর জন্যে চাই অন্তত পাহারা। এমন কয়েকটি পত্রিকা বা লংখা থাকে, এমন কয়েকজন লেখক বা বক্তা থাকেন যাদের যা খাঁদের বলা যেতে পারে অন্তত প্রহরী। রবিবারে লণ্ডনের হাইডপার্কে গেলে দেখবেন একটি কাঠের বাক্স জোগাড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বক্তৃতা করে চলেছেন এক উৎসাহী পুরুষ বা নারী। শুনছে হয়তো পাঁচজন কি দশজন। শুনে হয়তো টিপ্পনী দিচ্ছে। কিংবা প্রতিবাদ করছে। বক্তা অনন্য। কেউ কেউ তো শিকল দিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখেন যাতে স্থানচ্যুত হতে না হয়। এছাড়া রাস্তার মোড়ের বক্তৃতা তো লেগেই থাকে। লোক চলাচল বন্ধ না করে নিজের বক্তব্যটা পথিককে ডেকে শুনিয়ে দেওয়া যায়।

পাবলিক ওপিনিয়ন তৈরী করার আরো একটা আড্ডা পাব বা পানশালা। তবে সেখানে আমি যাইনি। সভা-সমিতির উপর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পানশালার উপর নয়। ইংরেজরা সেখানে যাবেই, পানপাত্র নিয়ে বসবেই, যা খুশি বলবেই। কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? সাধারণ পুলিশে কুলোবে না। জনসাধারণের একাংশে যখন কার্য হাতে না নিলে অধিকাংশের কণ্ঠরোধ দুরাশা। ইংরেজরা কখনো ক্যাসিস্টদের প্রশ্রয় দেয়নি। তার দরকার হয়নি। যেখেনে কমিউনিজম প্রবল হয়েছে সেই দেশেই ফ্যাসিজম প্রবলতর হয়ে তাকে রুখতে গেছে। যেমন ইটালীতে বা জার্মানীতে রুশ বিপ্লবের পূর্বে ফ্যাসিজমের অস্তিত্ব ছিল না। কমিউনিস্টরা কিন্তু বিপ্লব চায় এই আশঙ্কায় ফ্যাসিজমের আবির্ভাব। সে আশঙ্কা ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে ছিল না। তাই সেসব দেশে ফ্যাসিস্টরা আমল পায়নি।

গণতন্ত্র আমাদের দেশে অবাঢ়ীন। আমাদের ইতিহাসে এর শিকড় নেই। এই অমূল তরু যদি আপনাকে আপনি উচ্ছেদ করে তবে জনসাধারণ এর জন্যে অশ্রুপাত বা রক্তপাত করবেন না। ওরা বোঝে রেড আর সার্কাস। ভাত কাপড় আর পালপার্বণ। এরকম্ভ কেউ যদি তাদের বেগার খাটিয়ে নেয় তা হলেও যে তারা খুব একটা আপত্তি জানাবে তা নয়। বিদ্রোহ বা বিপ্লব তো দূরের কথা। করলে করবে তখনি, যখন তাদের ভাত কাপড়ে টান পড়বে কিংবা সহ্য তামাশা বন্ধ হয়ে যাবে। রাজতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র এ তত্ত্ব ভালো করেই বুঝত। সমাজতন্ত্র যে না বোঝে তা নয়। অসুখ যদি কেউ থাকে তবে তাদের বলে গণতন্ত্রী। তারা শুধু কাপড়ে বা বড় তামাশায় ভুলবে না। বলবে, কি করব আমি এসব নিয়ে, যদি বাক স্বাধীনতাই না থাকল? যদি না থাকল মত প্রকাশের ও মতভেদের স্বাধীনতা? নির্বাচন থাকে বলা হয় তাতো এক প্রকার মতপ্রকাশ ও মতভান। আমার মত আমি ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করব, দান করব, এ বিষয়ে আমার মনোনয়নের অবকাশ ও পরিসর থাকা চাই। নির্বাচনকালে একজনমাত্র প্রার্থী থাকলে নির্বাচনের কথা ওঠে কি করে? অন্তত চাই দুজন প্রার্থী। একদলের নয়, দুই দলের। গণতন্ত্র কখনও একদলীয় ব্যাপার হতে পারে না। হলে হবে দলতন্ত্র।

দলতন্ত্র এখন বহু দেশ মেনে নিয়েছে। তারাও মেনে নিতে পারে। কিন্তু তোমাই দাদা, একে গণতন্ত্র বলে গোঁজামিল দিয়ো না। দেশে কিছু না হোক লাখখানেক বুদ্ধিজীবী তো আছেন। এঁরা হয়তো ইউরোপ আমেরিকা যান নি, তবু গত দুই তিন শতাব্দীর পাশ্চাত্য ইতিহাস পড়েছেন। গণতন্ত্র কেমন করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে তার খবর রাখেন। গণতন্ত্রের প্রকারভেদও তাঁদের জানা। একথা এঁরা বলবেন না যে ভারত অমুক দেশের অন্ধ অনুবর্তী হবে। দেশভেদেও প্রকারভেদ হয়। ভারত যেশতা আর কোনো দেশের মতো নয়। তার গণতন্ত্র আর কোন দেশের মতো হতে বাধ্য নয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটা কে দেবে? মনোনয়নের অধিকারটা কার? আমার, না আমার পাঁচঘরের আশেপাশে প্রতিনিধির যিনি আমার খবর জানেন না, আমার কথা শোনেন না, আমার লেখার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন প্রি-সেনসরশিপ, আমাকে পড়তে দেন বা সেনসর না হওয়া দেখা বা খবর। আমার মত আমি স্থির করবো কেমন করে? শুধু একপক্ষের বক্তব্য শুনে?

গণতন্ত্র এদেশে আমারি জীবদ্দশায় ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হয়েছে। মর্লে-মিন্টো, মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রভৃতি প্রত্যেকটি ধাপ আমার দেখা। ছেলেবেলা থেকেই আমি খবরের কাগজের ঘোরাক পুই। সাতবছর কি আটবছর বয়সে বাবা আমাকে পড়তে দেন 'বসুমতী' সাপ্তাহিক ও বছর দুই বাদে 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক, পরে বিশ্বমিত্র। আর একটু বড়ো হয়ে কতকগুলি দেশী ও বিদেশী পত্রিকা যে আমি চোখ দিয়ে গিলেছি তার সুমাপি নেই। জোগাড় করেছি নানান সূত্র থেকে। চেয়েছি সাংবাদিক হতে। তাও বিদেশে গিয়ে। আমি সবুজের মানুষ। আমি কখনো ডোবার মাছ হতে পারি? আমি খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে অভ্যস্ত। আমি কখনো বন্ধ কক্ষে নিঃশ্বাস নিতে পারি? সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার কোনো পেছুটান নেই। আঠারো উনিশ বছর বয়স থেকেই আমি ওই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। লোকে যদি সমাজতন্ত্র চায় তো দ্যাখতেই হবে। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় নয়, লোকের ইচ্ছায়। লোকের মধ্যে আমাকেও গণনা করতে হবে। আমার মতামতও শুনতে হবে। ব্যক্তি বাদ দিয়ে সমাজ নয়। ব্যক্তির অধিকারকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র নয়। যেখানে তেমন চেষ্টা হয়েছে সেখানে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে হয়েছে।

পুরুষার্থ

অন্নদাশঙ্কর রায়

। তিন ।।

তার স্বাধিকারকে বিনাশ করে হয়েছে। তার ফলে পূর্ণি-ধর্মী সাংহতের ও সভ্যতাধর্মী দর্শনের স্রোত শুকিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে তা ঠিক। সেটাও প্রধানত কলিত বিজ্ঞানের। নতুন বিওরি কোথায়?

বহু শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে ব্যক্তিকে দমন করে রেখেছিল সমাজ তথা রাষ্ট্র। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দিয়েছিল ধর্ম। তাই স্রষ্টার লীলা নিয়ন্ত্র ছিল ধর্মীয় সাংহতো বা শিল্পে। দর্শনও ছিল ধর্মের আঁচলে বাঁধা। আমাদের সেই উত্তরাধিকার পরম বিস্ময়কর। কিন্তু যুগের পর যুগ তারই অনুবৃত্তি চলতে থাকলে মানবাত্মা নিজেই ক্লান্ত ক্লান্ত নিশ্চেষ্টিত হয়ে যায়। তখন যার প্রয়োজন হয় তার নাম রেনেসাঁস। নতুন করে বাঁচতে হয়, ভাবতে হয়, বিচার করতে হয়, অন্বেষণ করতে হয়, আবিষ্কার করতে হয়, কল্পনা করতে হয়, সৃষ্টি করতে হয়। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায় যথেষ্ট নয়। চাই কায়িক, মানসিক, বাচনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতা। চাই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পূর্ণতা। এসব মূল্যের মহিমা ধর্মীয় সাংহতো ছিলনা। এসেছে রেনেসাঁসের মুক্ত মুক্ত হিউম্যানিজম থেকে। মাধবিকবাহ একদিকে বিজ্ঞানের অন্যদিকে শিল্পের নব নব উন্মেষ ঘটিয়েছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তারই সোনালী ফসল গণতন্ত্র।

ইংরাজ সাহিত্যিক কলিঙ্গর গণতন্ত্রকে বলি টোমাস দেবনি, সিংহেল্ড টু চীয়ার্স'। কারণ গণতন্ত্র যাদুকের সামাজ মনোমনয়নের ও পরিবর্তনের অধিকার সবেও বহুবিধ মৌল অধিকার দিলেও দীনতম, হীনতম ও দুর্বলতম মানুষের আর্থিক দায়ত্ব মোচন করতে পারেনি। সুতরাং গণতন্ত্র যদি বলি টোমাস চায় তবে তাকে দীনতম, হীনতম ও দুর্বলতম মানুষের আর্থিক দায়ত্ব মোচন করতে হবে। গণতন্ত্রকে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করাটাই আবর্শ। তার জন্যে যা করণীয় তা করা হোক। আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। কিন্তু তোমরা যদি গণতন্ত্রকে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ না করে তাকে অবহীন করাটাই জোর মনে কর তাহলে আমরা কেমন করে তোমাদের সঙ্গে থাকি? তখন খুঁ টোমার্স তো পাবেই না, টু টোমার্স দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হব। তোমরাও হয়তো বলবে অমন একটা বিকলাঙ্গ গণতন্ত্রের বদলে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্র তো দিলবে। তাকেই বা বলি টোমার্স দেওয়া হবে না কেন? সমাজতন্ত্র কি ইতিহাসের উচ্চতর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাস কি তারই অভিমুখে যাত্রা করছে না? কোনো কোনো দেশে কি ইতিমধ্যেই উপনীত নয়? মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া ছাড়া গণতন্ত্রের জন্যে কার মাথা ব্যথা। আর ডেমোক্রাসী শব্দটার যদি এতখানি আবর্ধ থাকে তবে পীপলস্ ডেমোক্রাসী কেন নয়? এদম কী কথা আছে যে তাকে পার্লামেন্টারি হতেই হবে?

সিমনি ওয়েব প্রমুখ ফেবিয়ানরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে পার্লামেন্টের উপযোগিতা না দেখে বিকল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ল্যাস্কিরা তার সুযোগ নেবে ও প্রক্রিয়া বর্জিত হবে বলে সেধার পাঁচি ওয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন ওয়েব দম্পতী সোভিয়েটে কমিউনিস্টদের মধ্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত নতুন সভ্যতার পূর্বাভাষ পান। ইংলণ্ডের হীন হীন ও দুর্বলতম জন যারা তারা পর্যন্ত ওর উপর বিমুখ। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী ওদের রক্তমাংসের ও অস্থিমজ্জার সমিল। ওর সংস্থার যত ইচ্ছা হোক, কিন্তু বিপোপ কোনোমতেই নয়। সামাজিক স্তরের অনুযোগেও সততরা একজন কি দুজন ভিন্ন আর কোন ইংরেজ ওর বিপোপ চায় না। এরা কমিউনিষ্ট। কিন্তু কমিউনিষ্ট অকমিউনিষ্ট নির্বিশেষে প্রমিক শ্রেণীর লোক প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে একটা না একটা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিতে হবে, সেই ট্রেড ইউনিয়নকে জোরদার করতে হবে। অকমিউনিষ্টরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস

(শেষাংশ ৮র্থ পৃষ্ঠায়)

মতামত

আপত্তিকর যাত্রা পালা

যাত্রাপালা দেখবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ আজকাল উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। উত্তর কলকাতার রবীন্দ্র কাননে গত ২৬শে নভেম্বর থেকে ২৯ দিন ব্যাপী যে যাত্রা উৎসব সুরু হয়েছে, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় কেটে পড়ছে জনসমুদ্র। যাত্রার পৃষ্ঠপোষকরা বলছেন, যাত্রার এসেছে বিরাট অগ্রগতি এবং যাত্রাপালাগুলো হল লোকশিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম-কথা বলে। যাত্রা উৎসবে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। অধিকাংশ পালাগুলোই হল আজগুবি উদ্ভট শিশুসুলভ অযৌক্তিক কাহিনীর প্যানপ্যানানি। সেখানে সমাজ-চেতনা বলে কোন পদার্থ নেই। সমাজচেতনা বিহীন যাত্রাপালা কখনও লোকশিক্ষার মাধ্যম হতে পারে না। সে সব পালা বরং জনচিত্তকে দূষিত করছে।

আমার গত রাত্রের (:৩, ১২, ৭৬) অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। "রক্তাক্ত প্রজাপতি" নামে একটি পালাভিনয় হল। নাটকের একটি উপকাহিনী এই ধরণের : মিঃ সান্যাল এক দরিদ্র বৃদ্ধ। তার কোন আয় নেই। তার দুটি যুবতী কন্যা রীতা ও রমলা। এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে, তাদের সংগে নানা রকম ছলাকলার মাধ্যমে মেয়ে দুটি টাকা আদায় করে। মদনমোহন নামে মিঃ সান্যালের এক বৃদ্ধ মোক্তার বন্ধু এগারোটি সন্তানের পিতা। বলতে গা ঘিন ঘিন করে, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক রমলার গাল টেপে, নাক টেপে, তাকে জড়িয়ে ধরে দেহের সুখ উপভোগ করে অবশ্য রমলা বিন্দুমাত্র আপত্তি জানায় না।

পালার মূল কাহিনীটি শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বসুভবাবু একজন বড় অফিসার। তাঁর তিন ছেলে অরুণ, সুশান্ত ও বপন। প্রথম দুটি ছেলেই লোচ্চা। অরুণ একটি মেয়েকে গর্ভবতী করে বাঁড়ির বাড়ি। অরুণদের বাড়িতে মঞ্জু নামে একটি যুবতী ঝি আছে। বছর পনেরো বয়স। এখনও ফ্রক পরে। সে মাঝে মাঝে সুশান্তর গা টিপে দেয়। সুশান্তর বয়স হবে তিরিশের ওপর। সুশান্ত মঞ্জুকে নানারকম উপহার দেয়, তাকে আদর করে, জড়িয়ে ধরে। তারপর তার সংগে অশ্লীলভাবে দেহের সুখ মেটায়। ঘন্টাখানেকের মধ্যে এই দৃশ্যটা ঘটে এবং এই দৃশ্যটা দেখার সংগে সংগে আমি ক্রোধে ও ঘৃণায় প্যাণ্ডাল ছেড়ে চলে আসি। সেরিটেই যাত্রা সম্বন্ধনের সম্পাদক ও সভাপতি অপেরার মালিক শ্রীবেদনন মোহান্ত সংগে আমার দেখা হয়। তাঁকে আমি প্রশ্ন করি এই ধরণের নোংরা পালাকে উৎসবে স্থান দিয়ে তাঁরা পবিত্র যাত্রাঅঙ্গনকে কলুষিত করছেন কেন। তাঁর কাছে উত্তর অপেরার শ্রীশিব ভট্টাচার্যও বসেছিলেন। দর্শকদের মধ্যে অনেক কিশোর কিশোরী ছিল। ঐ সব নোংরা দৃশ্যের সময় তাদের অভিভাবকদের মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল তা একবার কল্পনা করুন। এই কি লোকশিক্ষার যাত্রাপালা? কিছু নাট্যকার পেশাদার থিয়েটার-মঞ্চকে ক্লেদাক্ত করে যাত্রা-মঞ্চকেও সেই আবর্জনায় নামাতে চাইছে। দর্শকরা কেন এর প্রতিবাদ করছেন না? আমাদের সরকার ছায়াছবি থেকে যৌনতা দূর করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা কি যাত্রাপালা থেকে এই পাপ দূর করবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না?

পরেশ ধর

প্রতিবাদ

গত ৩রা ডিসেম্বর সংখ্যা দর্পণ পত্রিকায় 'আরবী শিক্ষক নেই' শিরোনামে 'দর্পণের সংবাদদাতা' পরিবেশিত সংবাদটির প্রতিবাদে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের বিদ্যালয়ের আরবী শিক্ষক মহাশয় অবসর গ্রহণ করেন। তার পর থেকে বিদ্যালয়ে আর আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়নি, আরবী শিক্ষকও নেওয়া হয়নি। এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে আমি এই বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করি। এই বিদ্যালয়ে একজনই মাত্র আরবী শিক্ষক ছিলেন এবং তিনিই এই বিদ্যালয়ের প্রথম ও শেষ আরবী শিক্ষক। আরবী শিক্ষা এখান থেকে উঠেই গেছে প্রায় এগারো বছর আগে। আর পড়ানো হচ্ছে 'বারো বছর ধরে' নয়, তারও অনেক বেশী বছর ধরে—ও সংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ সময়।

'গত বছর' থেকে কথাটি উনি কেন বলেছেন জানিনা তবে যখন থেকে এখানে আরবী পড়ানো বন্ধ হয়েছে তখন থেকেই এখানে 'আরবী শিক্ষকের সন্ধান' করা বন্ধ হয়েছে। 'ফলে একজন শিক্ষক নেওয়া হলো ম্যানেজিং কমিটির বেনামীতে।'—এ সংবাদটিও ঠিক নয়। ১৯৭৪ সালে

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পুরুষার্থ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে যে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে, সব ক'টা ট্রেড ইউনিয়ন মিলে ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে তুলতে হবে, সেই কংগ্রেস হবে পার্লামেন্টের বাইরে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তির ঘাঁটি। পার্লামেন্ট যতদিন না করায়ত্ত হচ্ছে ততদিন ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থের সংরক্ষক। পার্লামেন্টারি নির্বাচনের সময় শ্রমিকরা কেউ ব্যক্তি হিসাবে ভোট দেয় না, দেয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বলে ও সদস্যবলে। এর নাম ব্লক ভোটিং। কাকে ভোট দিতে হবে সেটা ট্রেড ইউনিয়নই নির্দেশ করে। তা বলে আর ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে কোথায়? আছে যারা ভিন্নপথী তাদের।

ইংলণ্ড তার নিজস্ব ধারায় দিন দিন সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উৎখাত করে নয়। বরং শ্রমিকদের সন্তানরাই হয়ে উঠছে মধ্যবিত্ত। বিয়ে করছে উচ্চস্তরে শ্রেণীতে। এটাও একপ্রকার বর্ণচোরা সমাজবিপ্লব। রানী ভিক্টোরিয়া কি ভাবতে পারতেন যে রাজকুমারী মার্গারেট বা রাজকুমারী অ্যান প্রতিলোম বিবাহ করবেন? চার্লস যখন রাজা হবেন তার রানী যে রাজবংশীয়া হবেনই এমন কোন নিয়ম আছে কি?, কে জানে হয়তো শ্রমিক কন্যারই পাণিগ্রহণ করে রাজতন্ত্র রক্ষা করবেন। রাজতন্ত্র রক্ষা পেলে অভিজাততন্ত্রও রক্ষা পায়। ইংলণ্ডের অভিজাতরা এ তত্ত্ব বোঝেন বলেই বহুসংখ্যক শ্রমিক বংশীয়কে জাতে তুলে নিয়েছেন লর্ড উপাধি দিয়ে। আজকাল তো লেডী উপাধিও দেওয়া চলে। এরা মুখে রাজাউজীর মারলেও তাঁদের শিবিরে এক পা রেখেছেন। আর এক পা শ্রমিক শিবিরে।

ভারতের নেতারা সংবিধান প্রণয়ন করতে বসে নানা দেশের সংবিধান মিলিয়ে দেখেন ও অংশের জন্যে ইংলণ্ডের সংবিধানকেই প্রধান বিবেচনা করেন। তবে চোখ বুজে অনুকরণ করেন না, প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করেন। পার্লামেন্টকে তাঁরা ইংলণ্ডের মতো সোভরেন করেন না, জুডিসিয়ারিকে ক্ষমতা দেন পার্লামেন্ট কী করে না করে তা খতিয়ে দেখার, ভুল করলে শুধরে দেবার, ক্ষমতার বাইরে পা বাড়ালে নিবৃত্ত করার। এখন পার্লামেন্ট চাইছে সংবিধানের সংশোধন করে নিরঙ্কুশ হতে, সোভরেন হতে, ইংলণ্ডের মতো হতে। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সহীষ্ণু নিরীক্ষার পর এটা ভারি দরকারী হয়ে পড়েছে প্রাইভেট সম্পত্তির গ্রাসকের কবলের জন্যে। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এটা নাকি একটা অপরিহার্য পদক্ষেপ।" দীন হীন ও দুর্বল যারা তারা তো এর অনুকূলে ভোট দেবেই। তাদের ভোটদানের অধিকার থাকবে। ক্ষতি যেটা হবে সেটা জুডিসিয়ারির। জুডিসিয়ারিকে বলবীন করলে সে আর মৌল অধিকারের নিষ্ক্রিয়তা দিতে পারবে না কাউকেই। ধনীকেও না, নির্ধনকেও না। পার্লামেন্ট যদি একদিন ফ্যাসিস্টদের কবলে পড়ে তাহলে তাদের দ্বারা নির্যাতিতদেরও না। পার্লামেন্ট যদি একদিন কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে তাহলে তাদের দ্বারা উৎপীড়িত-দেরও না। সৈনিকরা তাকে ভেঙে দিলে তাদের দ্বারা নিহতদেরও না। শেখ মুজিবুর রহমানও তাদের জন্যেই সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্টকে সর্বেসর্বা ও জুডিসিয়ারিকে অর্থর করেছিলেন। এখন কোথায় সেই সোভরেন পার্লামেন্ট? কোথায় সেই সংশোধিত সংবিধান? নামিক শাসকরা সেটাকে যখন খুশি উপেক্ষা করছেন, যখন খুশি নিজেদের কাজে লাগাচ্ছেন। বড়লোকরাও গরীব হয়নি, গরীবরাও বড়লোক হয়নি। মাঝখান থেকে কাটা পড়েছে গণতন্ত্র। বিনা যুদ্ধে তার পুনঃপ্রবর্তন হবার নয়।

গণতন্ত্র বলতে আমি বুঝি পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্র। ও জিনিস ইংলণ্ডে বিবর্তিত হতে তিন শতাব্দী লেগেছে। এদেশে ওর সূচনা ১৯২১ সালে যখন বিধিবদ্ধ মন্ত্রীদের হাতে গোটা কয়েক দফতর দিয়ে লাটসাহেব করেন তত্ত্বাবধান। ওর আদত কথাটা হলো মন্ত্রীরা দায়ী পার্লামেন্টের কাছে আর পার্লামেন্ট দায়ী নির্বাচক মণ্ডলীদের কাছে। রাজার বা রাজপ্রতিনিধির কাছে কেউ দায়ী নন। ইংরেজ সরকার এটা মেনে নেন ১৯৩৭ সালে। ভারতের সংবিধান সভার অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এদেশ থেকে বিদায় নেন। তারপর তৈরি হয় লোকতন্ত্র সংবিধান। এরই ভিত্তিতে পঞ্চাশ কয়েক দফা নির্বাচন হয়ে গেছে। কিন্তু এদেশের লোকের অভিজ্ঞতা তিন শতাব্দীর অভিজ্ঞতার পরিণত হয়নি। এখন কি তিন পুরুষের অভিজ্ঞতাও নয়। যেখানে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সেখানে রাতারাতি ফল পাবার জন্যে একটা বলশালিকে ছেঁটে কেটে ছোট করলে বা গোড়া ঘেঁষে উচ্ছেদ করলে সেটা হবে সেটা আর যাই হোক পার্লামেন্টারি সংস্কার নয়।

তাহলে কি সেটা প্রেসিডেনসিয়াল গণতন্ত্র? নয়, তাও নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্ট সব ক্ষমতার অধিকারী। সোভরেন কেউ একতাবে নন। ও জিনিস এদেশে প্রবর্তন করলে পাঁচটা বছরও টিকবে না। বাকী থাকে শিপলস ডেমোক্রাসী। যেমন রাশিয়ায় বা চীনে। সেসব দেশের সরকার আইনসভার কাছে দায়ী নন, আইনসভা নির্বাচকদের কাছে দায়ী নয়। ক্ষমতাকে তিনভাগে ভাগ করে দেওয়াও হয়নি। আইন-সভা আজাবহ, সুপ্রীম কোর্ট অথর্ব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সোভিয়েট রাশিয়া ষাট বছরের মধ্যে বিশ্বে দ্বিতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে ও গণচীনকে চল্লিশ বছর সময় দিলে সেও বিশ্বের তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হবে। এরা শুধু যে বিশ্বশক্তি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে তাই নয় সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থারও বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়ে। দেখে শুনে দুনিয়ার অন্যরক দেশগুলো এখন আর ইংলণ্ড বা আমেরিকার দিকে তাকায় না, তাকালে তাকায় আর্থিক সাহায্যের জন্যে। এরা ওরা চায় সোভিয়েট বাণিজ্য বা গণচীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। পার্লামেন্টারি গণ-তন্ত্রকে পাঁচ সাত বছর সময় দিতে না দিতেই তাকে কবরে পাঠাচ্ছে। কিংবা তাকে টেনে হেঁচে এমন রূপ দিচ্ছে যে চিনতেই পারা যাচ্ছে না সেটা হাঁস না সজারু না হাঁসজারু।

আমাদের নেতারা আর ইংলণ্ডের দিকে তাকান না, তাকান চীনের দিকে। জনগণ তো কোন কালেই ইংলণ্ডের জনগণের মতো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিল না। যখন সচেতন হলো তখন তিন বছর বা পাঁচ বছর অন্তর একবার নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে এল। বাকী সবসময় ঘুমিয়ে থাকল। অন্তত প্রথমে যারা হতে পারতেন তাঁরাও বিধির অর্জর। ইংলণ্ড যেহেতু পুঁজিবাদী দেশ সেহেতু তার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রটাই পুঁজিবাদের মতোই পরিত্যাজ্য। পুঁজিবাদের থেকে তাকে আলাদা করে দেখতে তাঁরা নারাজ। কিছুতেই ওদেরে বোঝানো যাবেনা যে একটা দেশের সব কিছু খারাপ নয়। যেটা ভালো সেইটেই ইংরেজরা আমাদের শিখিয়ে গিয়ে গেছে। আমরা যদি ভুলে যাই তো ক্ষতিটা ওদের নয়, আমাদেরই। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা সমাজতন্ত্রী ভাবুক। আর একদল আছেন যাঁরা জাতীয়তাবাদী। ইংলণ্ড পুঁজি-বাদী বলে নয়, সাম্রাজ্যবাদী বলেই তাঁদের চক্ষুশূল। সুতরাং ইংলণ্ডও পক্ষে যেটা ভালো তাঁদের পক্ষে সেটা মন্দ। ইংলণ্ডের কাছ থেকে তাঁদের শেখবার কিছু নেই। তার অধীনে থেকে দুটো শতাব্দী বৃথা কেটেছে।

এমনি করে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের মৌল অধিকার। সেকালের ভাষায় যার নাম চতুর্বর্গ বা পুরু-ষার্থ। চিত্তার-স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা। পুরুষের যেমন পুরুষের, পুরুষার্থ তেমনি নাগরিকের। ওটা হারালে আর থাকে কী?

ব্রিটিশ শাসনের এক যুগ

মিহির আচার্য

এটি বিস্ময়ের কথা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, ইংরাজ আমলে এবং ইংরাজের শাসকের ভূমিকা থেকে বিদায় নেবার পরও, আজ পর্যন্ত, এমন মানুষের অভাব নেই যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সোনালী দিনগুলির জন্যে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেন। বিদেশী প্রভুর এই অপূর্ব মাহাত্ম্য যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সওদাগরি রূপে এদেশে প্রথম প্রকটিত হল সেই দিন থেকে তার অন্ধ ভক্তজনকে রথের তলায় গড়াগড়ি দিতে দেখা গেল। ভারতপথিক রাম-মোহনই মুলত কোম্পানির দোষরা চোমরা সাহেব সুবোদের 'ব্যক্তিগত' রোজগার কিংবা বিলাসব্যসনের প্রয়োজনে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে সুদখোরের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এবং কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই আখিক সহযোগের ফলে রামমোহন ১৮১৪-১৬ সাল থেকে বিরাট বিরাট বাড়ি কিনে কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বসে তৎকালীন বাঙালী 'ভদ্রলোকদের' মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। ইংরাজদের অনুকরণে রামমোহনও সভা সমিতি গড়ে তুললেন। বড় বড় মজলিসে সাহেব সুবোদের খানাপিনা 'নিকি' বাইজির নাচে তিনি দেদার টাকা খরচ করতে লাগলেন। অন্যদিকে চলল ধর্ম সংস্কার, সমাজ-সংস্কারের কার্যাবলী। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই সকল সংস্কার-মূলক কার্যাবলীতে সরকারের অনুমোদন ছিল। যেহেতু এই সকল 'সাধু' কাজে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে আঘাত পড়েনি।

'নেটিভদের' মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে রামমোহনের মতো ধনী ব্যক্তির সহযোগিতা ইংরাজদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হল। কারণ রামমোহন ভবিষ্যতের জন্যে ভারতের যে-পথ উন্মুক্ত করে দিলেন সেই পথের চিহ্ন ধরে আগামী কালের শাসকশ্রেণীর মজবুত 'ইতিহাস' তৈরি হল, যার সঙ্গে স্বভাবতই বৃহত্তর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

বলা বাহুল্য, রামমোহন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পুষ্ট 'নব্য জমিদার শ্রেণী,' মধ্যস্বত্বভোগী এবং তাঁরি আশ্রয়ে লালিত 'মধ্য শ্রেণী' গড়ে উঠল, যারা দীর্ঘকাল, এবং আজো পর্যন্ত শ্রেণী-বর্ণ-বর্ণ নির্বিশেষে তাবৎ ভারতবর্ষের মানুষের ধনির্বাচিত' মুখপাত্র! এই 'মধ্য শ্রেণীই' ইংরাজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদেরি স্বার্থে তৈরি ইতিহাসের শব্বাধারটিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর মানুষের কাঁধে চাপিয়ে ঘিরে নিশ্চিন্ত আছেন।

গ্রামে গাঁথা কৃষি ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মূলত কৃষক মাজুর রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের বাইরে কেবল যুগে যুগে শোষণের জোয়ালটাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে ফেলেছে, দুর্ভিক্ষ মহামারী মৃত্যুর শিকার হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে, মার খেয়েছে। এ ব্যাপারে ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য মধ্য শ্রেণী ও শাসক শক্তির স্বার্থ মিলেমিশে তাদের চোখে এক হয়ে গেছে। মধ্য শ্রেণীর নেতৃত্বে ইংরেজের কাছ থেকে আরো অধিক শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধে দাবি করেছে, অথচ ঘুণাক্ষরে বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে পর্যন্ত এদের রাজনৈতিক পাটি ঘৃণ্য জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের সামান্য প্রস্তাবও নিতে সক্ষম হয়নি।

বৃহত্তর মানুষের হাতে মধ্য শ্রেণীর এই 'ইতিহাসের' পতাকাটা ধরিয়ে দিয়ে এই সরণিতেই আমাদের মধ্য শ্রেণী অদ্যাবধি ঐতিহ্যাসিকগণ আজো পর্যন্ত ইতিহাসচর্চা করে চলেছেন। ফলে সত্যিকার জনগণাশ্রিত ইতিহাস আজো লেখা হল না। অবশ্য এর জন্য আমরা দুঃখ করিনা, কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ইতিহাস সবসময় শাসকশ্রেণীর ইতিহাস!

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উনিশ শতকের ক্রমাগত কৃষক অভ্যুত্থান, সিপাহী যুদ্ধের মতো জনগণের 'ব্যাপক জাগরণ' কোনো কিছুই মধ্য শ্রেণীর কাছে সাড়া পায়নি। যেহেতু এই আন্দোলনগুলো সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে একযোগে আঘাত হানে। এর চেয়ে বরং ধর্ম ও সামাজিক নেতা সেজে সংস্কারপন্থী কৌঞ্জগুলোকে কাজে লাগানো নিরাপদ। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ইংরিজি- মাধ্যম সহ চালিয়ে দেওয়াই ভালো।

কৌতুকের বিষয় এই ইংরেজ-সহযোগী নেতৃবর্গ যখন ধর্ম-সমাজ-শিক্ষার বেনেশাঁসের খোয়াব দেখছেন অন্য দিকে কৃষক বিক্ষোভ চলাকালীন রামমোহন লেখাদেই তালুক কিনছেন, ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সুদে টাকা দিচ্ছেন, বাবা রামকান্ত রায় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন বাকি খাজনার দায়ে জেলে বন্দী থাকলেও চিত্তরঞ্জন পুত্র টাকা দিয়ে তাঁদের মুক্ত করছেন না। রামকান্তের মৃত্যু হল। রাম-মোহন নানা কারণে পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। বন্দী জগমোহনের কাতর প্রার্থনায় সুদ সমেত ফেরত পাবার ভরসায়, রামমোহন তাঁকে এক হাজার টাকা বর্জ দেন। জগমোহন মেদিনীপুর জেল থেকে মুক্তি পান।

বিষয় আশয়ের প্রতি এই আসক্তি রামমোহনের ধর্ম-চর্চায় যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি তার কারণ সম্ভবত রামমোহন 'ধার্মিক' ছিলেন না, ধর্মোপলক্ষে তিনি সমাজ সংস্কারের অঙ্গতম রাহন মনে করতেন।

যেমন করতেন তাঁরই মন্ত্রশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বিষয়বুদ্ধি ভ্রাতৃবধূ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উৎসাহিত করে। তাঁরি পাবনার জমিদারি থেকে বে-আইনি করের অত্যাচারে যখন কৃষকরা বিদ্রোহ করে তখন দেবেন্দ্রনাথের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েসন জমিদারি স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে কৃষক বিক্ষোভকে "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা" বলে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেন।

দৃষ্টান্ত না বাড়িয়েও স্বীকার করা ভালো এই হচ্ছে নব্য মধ্য শ্রেণীর চরিত্র। যার সঙ্গে বৃহত্তর দেশের মানুষের স্বার্থের কোনো যোগ নেই। এই শ্রেণীই প্রথমাবধি এদেশে ইংরাজ শাসনের মস্ত সমর্থক। এবং স্বীকার করে নেওয়াই ভালো উনিশ শতকে বিশেষ করে বাঙালী মধ্যশ্রেণীই এই কৃতিত্বের অংশীদার। গান্ধীজি রাজনীতিতে প্রবেশ করবার আগে এই বাঙালী ভদ্র-লোকদের রাজনীতিই সর্বভারতীয় 'মধ্য শ্রেণীর' রাজনীতির আকার ধারণ করেছিল।

ইংরাজ প্রভুত্ব আর এদেশে নেই, কাজেই নিরাবেগ ভাবে তাদের শাসনকালের একটা অমাবস্তুক নেওয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ সমর্থকদের যুক্তিগুলি এই জাতীয় :

ক) এঁরাই প্রথম ভারতব্যাপী সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন।

খ) রাজস্ব আদায়ের একটি আইনমাফিক ব্যবস্থা করা হল।

গ) দেশরক্ষার ভার নিলেন তাঁরা।

প্রশ্ন হচ্ছে : কার স্বার্থে? এর দ্বারা দেশের ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোনো মানোন্নয়ন হয়েছিল কী?

ভারতবর্ষের মানুষের পিঠে কয়ের বোঝা চাপিয়ে যে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে তার ½ ভাগ ব্রিটিশ ও ভারতীয় সিপাহীদের হাতি পোশায় খরচে গেছে, ½ ভাগ গেছে সিভিল সার্ভিসদের উদরে, যাদের বেশির ভাগ ছিল ব্রিটিশ-পুরুষ। ১/১০ শিক্ষাখাতে, ১/১০ স্বাস্থ্য রক্ষায়, ১/১০ কৃষিকাজে এবং অন্যান্য গৌণ বিষয়ে।

ব্রিটিশ-শক্তির ভারতবর্ষে কোন্ স্বার্থ রক্ষা কাজ চলে-ছিল? ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই অন্যান্য বেনেদের মতো এদেশে ইংরাজদের পদার্পণ। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনিস কেনা বেচা ছাড়াও তাদের রোজগার বাড়াতে পেরেছিল ভারতীয় রাজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে করের মারফত। কোম্পা-নির সমুদয় রোজগার সরকারকে অর্পণ করা হত। পরবর্তী কালে এল ইংরাজ পুঁজির লগ্ন এবং ইংরাজ শাসকবর্গকে মাইনে দেবার ব্যবস্থা।

ফলত, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ তিন ধরনের স্বার্থরক্ষা করার চালাও সুযোগ পেল।

১. পুঁজি লগ্নি করবার ক্ষেত্র
২. ইংলণ্ডেতে তৈরী জিনিসের বাজার
৩. শাসকবর্গকে মাইনে দেবার জন্য রোজগারের পথ।

১২৫৭-২৮ সালে ইংলণ্ডেতে তৈরী জিনিসের আমদানি এবং ভারতবর্ষের জিনিসের রপ্তানির গড় হচ্ছে যথাক্রমে ৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ৮০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ব্রিটিশ দ্রব্যের এদেশের বাজার দখল করার হিসেব অবশ্যই দূরদের অফুরন্তে যায়।

দ্বিতীয়ত, শাসকবর্গের খরচ যোগাতে ভারতবর্ষের রাজস্বের ½ অংশ শুষে নেওয়া হয়। তার পরিমাণ মোটা-মুটি বার্ষিক ৩২,৮০০,০০০ পাউণ্ড।

বেতনের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করা যাক :

ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল.....	১৮,০০০ পাউণ্ড
সেনাবাহিনীর প্রধান	৭,৪০০ "
গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের সভ্য...	৬,০০০ "
দশটি প্রাদেশিক গভর্ণর	৪,৯০০ থেকে ৯,০০০ "
প্রধান বিচারপতি (কলিকাতা)	৫০,০০০ "

এই শাসকবর্গের খরচ যোগাতে বেতন হিসেবেই ভারতবর্ষ থেকে যায় বছরে ১,২২০,০০০ পাউণ্ড।

এছাড়াও রয়েছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের জন্যে খরচ পাউণ্ড, তার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দিত ১৩৬,০০০ পাউণ্ড, বাকিটা ভারতবর্ষে থেকে যেত।

সেনাবাহিনীর মোট খরচ বছরে ৪০,৭০১,০০০ পাউণ্ড। স্মরণ রাখা উচিত যে সেনাবাহিনীর ½ অংশ ব্রিটিশ। ব্রিটিশ সৈন্য ভারতীয় সৈন্যের অপেক্ষা চারগুণ বেশি পেত। ব্রিটিশ সেনা অফিসার ভারতীয় অফিসার থেকে ছয়গুণ বেশি।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ভারত শাসনের ভার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ওপর এলে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড এলেনবরো, লর্ড ডালহৌসির আমলে শাসনযন্ত্রের যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা গেছে তা কোম্পানির শাসনের থেকেও অযন্ত।

কোম্পানির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার শুরু করল আফগান যুদ্ধ। পরিণামে আফগানের আক্রমণে, ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায় ১৬,০০০ সৈন্য ক্ষয় হল। বিত্ত রাজ্য সিন্ধু জয়ও বহুমূল্য যুদ্ধ। পাঞ্জাব অধিকারও এই জাতীয় ঘটনা। বাধ্য অধিকার করা হল যেহেতু ইংরাজ বণিকদের ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল।

সবচেয়ে নিন্দার কাজ উত্তরাধিকারের অভাবে রাজত্ব-বর্গের স্বত্ত্ব নেবার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে দেশের রাজ্য দখল করা। সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর এবং আরো ছোট ছোট রাজ্য এইভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসে আহুতি দিল।

নানাভাবে আদায়ীকৃত ভারতের এই রাজস্ব ব্রিটিশ কোথায় কোথায় নিযুক্ত করল? তার পরিচয় আগেই

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কোরিয়া থেকে মার্কিন ফৌজ হটাও

কোরিয়ার বুকে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রাখা হচ্ছে। আর এই সর্বনাশা কাজের প্রবক্তা হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে, মার্কিন পুতুল দক্ষিণ কোরীয় সরকারের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলেকোরীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসের ভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। উত্তর কোরিয়া বিশেষ করে গণতন্ত্রী কোরিয়া সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কিম ইল সুঙ্ এই অঞ্চলে স্থিরস্থায়ী শান্তির জন্য দুই কোরিয়ার সম্মিলনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার সংখ্যাধিষ্ঠ মানুষ এই একীকরণে বিশ্বাসী ফ্যাসিস্ত পার্ক জুং হি'র বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রগতিশীল মানুষ এই প্রগতিশীল কোরিয়া গঠনের দাবি তুলছেন। ফ্যাসিস্ত পার্ক জুং হি এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য বর্বর সব ফ্যাসিস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই, কঠোর প্রেস সেনসরশীপ! গ্রেপ্তার সিটুনি খুন নিত্যকার ঘটনা। তৎসত্ত্বেও, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রগতিশীল মানুষ কোরিয়া ভূখণ্ড থেকে রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যবাহিনী অপসারণের দাবি করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর অবস্থিতির সিদ্ধান্ত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোরীয় ভূখণ্ড থেকে মার্কিনসহ পশ্চিমী ফৌজের অপসারণেরও দাবি রয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধা আফ্রিকান ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন থেকে মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশী ফৌজ অপসারণের দাবি করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংবিধানের নীতির ভিত্তিতে দুই কোরিয়ার একীকরণের দাবির ওপর জোর দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রস্তাবে ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দক্ষিণ কোরীয়ার

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

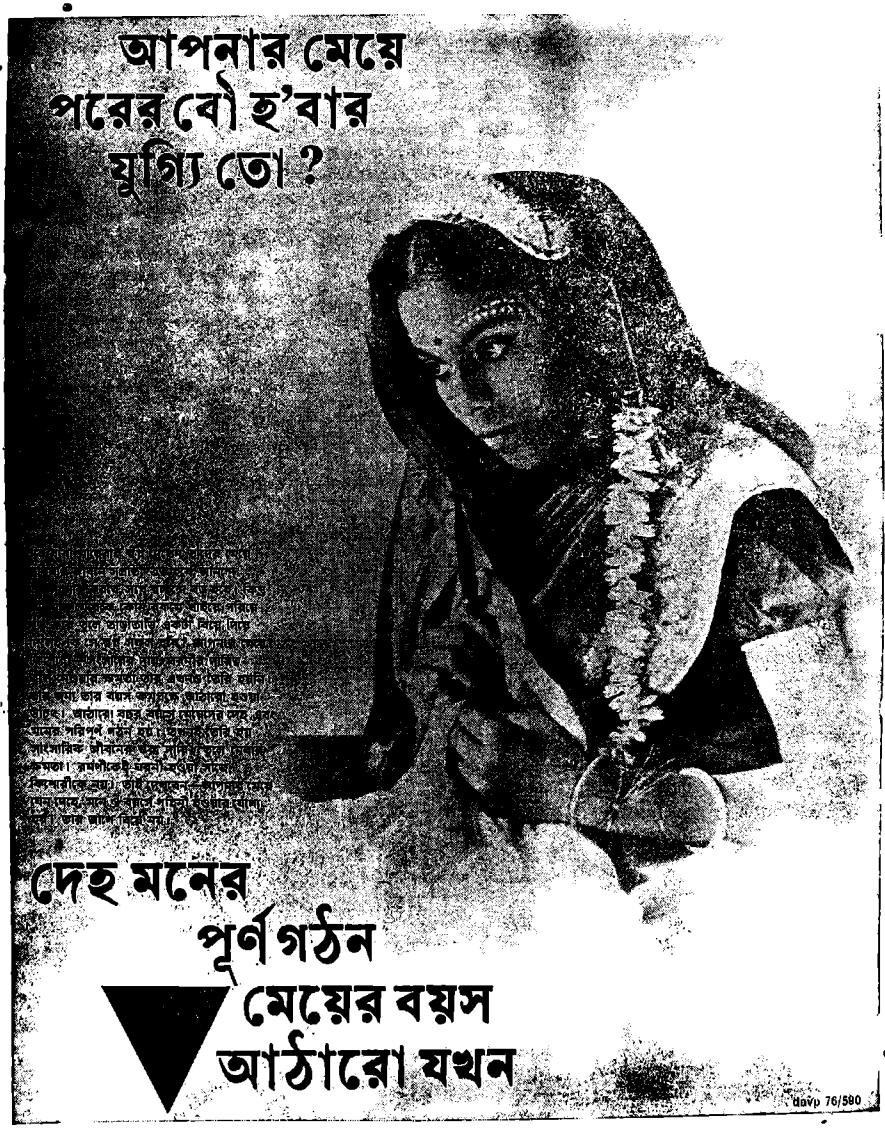

বিপ্লব ঐতিহ্য গতানুগতিকতা

কালিদাস কুণ্ডু

হঠাৎকোর মতো বিপ্লবও এসা আসেনা। সে আসে কৃষাঙ্গুরী জোয়ার সৃষ্টি করে। সে আসে মানুষের গতানুগতিক চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের লাগানো বাগানে মত হস্তীর ন্যায়। এক দিকেরে, বিপ্লব যেন নির্মম আনাগোনার। যুগ-ব্যাপী ব্যবস্থাগুলোর দৌহ-উপদৌগুলো ভেঙে দিয়ে সে বাজায় নবসৃষ্টির দুন্দুভি।

মানুষের ইতিহাসে বিপ্লবের উত্থান ও প্রত্থান ঘটেছে একাধিকবার। অর্থনৈতিক সংকটের চাইল থেকে উদ্ভূত চরম রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে দুঃসহ বিপ্লবী পরিস্থিতি এবং উক্ত বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করাটাই চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপ্লবের। তবু ইতিহাস একথাই বলে—বিপ্লব যতই আক্রমণাত্মক হোক না কেন—ঐতিহ্যকে সে ধ্বংস করতে পারেনা। বিপ্লবের উগ্র ধ্বংসে ঐতিহ্য শুধু আহত ও বিধ্বস্তিত হয় মাত্র। ইংলণ্ডে ক্রমোয়েলরা শিরশ্ছিন্নের সংবেতিত করেছে, রাজতন্ত্রের সমাধির উপর সগর্বে উড়িয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিজয় পতাকা। কিন্তু শত শত বছর ধরে সামন্ততন্ত্র যে ঐতিহ্যকে সৃষ্টি করেছে, লালন করেছে সযত্নে তার কেশাগ্রেও স্পর্শ করতে পারেনি বিপ্লবের হস্তক্ষ বটিকা। বিপ্লবের রণদামামা মিলিয়ে গেছে দূরে—মীর্জার ঘণ্টা, গোপের বাণী, বাইবেলের মন্ত্র সমানভাবে আকর্ষণ করেছে বিপ্লবোত্তর মানুষকে। প্রতিদিনের সৌজন্যমূলক আচরণে, ভোজ সভার আপ্যায়ন রীতিতে ও বিবাহ অনুষ্ঠানে পুরনো ঐতিহ্য পুরনো চালের মতো ভাতে বেড়েছে।

ফরাসী বিপ্লব আরো বেশী নির্মম ও আক্রমণধর্মী হওয়া সত্ত্বেও রিপাব্লিকের ক্লান্ত গতানুগতিক জীবনধারায় ফিরে গেছে অচিরে সচকেনে। প্রত্যাবর্ত্ত করেছে সামন্ততন্ত্রের কোলে আশ্রিত নিরন্ধ্র ঐতিহ্যের গুহায়। দুনিয়া কাঁপানো রুশ-বিপ্লবের গুতিক ও সুদূরপ্রসারী দুর্দিন পেরিয়ে সমাজতন্ত্রের সংহিতা বচনা করেছিল যৌথ খামার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের মাধ্যমে। আজ সে সমাজতন্ত্র জীবিত না মৃত বিতর্ক চলছে দুনিয়া জুড়ে। কিন্তু বিতর্ক নেই একটি বিষয়ে গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে মানুষ এসনও উপ সনার সময়ের ধর, টনইর ও ভয়ংকরির রচনা পড়ে আনন্দের সন্ধোষের অবগাহন করে।

বাস্তবঃ দেখতে গেলে ঐতিহ্য বিপ্লবের চেয়ে ওজনে ভারী ও শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু, বিপ্লব ও ঐতিহ্যের মধ্যকার সম্পর্কটি তো মধুর সম্পর্কের সম্পর্ক নয়। বিপ্লব ঐতিহ্যকে সন্দিগ্ধভাবেই প্রতিপক্ষ মনে করে এবং তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। ঐতিহ্য চাতুর্যের সঙ্গে সম্পাদপসরণ করে। ও যেন তার সম্মানজনক পশ্চাদপসরণ (glorious retreat)। বিপ্লব থেমে গেলে ঐতিহ্য এগিয়ে আসে ধুটি ধুটি—বিছিয়ে দেয় তার শীতল মাটি বিপ্লবের অগ্নিদহনে দগ্ধ, শ্রান্ত মানুষের জন্য।

তাহলে ঐতিহ্য কি সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত এমন এক শক্তি যা বিপ্লবের ঘোরতর প্রত্যাপকে রুদ্ধ করেও নিশ্চয়ে বয়ে যায় মানুষের ইতিহাসে? না। জগত সংসারে শ্রেণীবিহীনতা, শ্রেণী নিরপেক্ষ কিছু থাকতে পারেনা। ঐতিহ্যও শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে যে শ্রেণীর শ্রেণীগত ঐতিহ্য গড়ে ওঠে সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রে। যে সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবেনা সেই সমাজে জাতিগত-শ্রেণীগত ঐতিহ্যও বিলুপ্ত হয়ে যাবে অবশ্যই। কিন্তু মনুষ্যসমাজে যতদিন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পৃথক পৃথক যুগও পৃথক পৃথক জাতিসত্তার ঐতিহ্যগত পার্থক্যও থাকতে বাধ্য। বিপ্লব তাকে পাশ কাটাতে চাইবা। শ্রেণী সংগ্রাম ভাকে শক্তি যোগান। তথাপি সে টিকে থাকে বহুদিনের সঞ্চিত শক্তির রক্ষাকবচের মধ্যে।

বিপ্লব তো ফাঁকা আওয়াজ নয়। সে একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া। সে নিজে কিছু মূল্যবোধ সৃষ্টি করে থাকে এবং এই মূল্যবোধগুলিকে জাতিগত ঐতিহ্যের মূল্যবোধ থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে নাম দেয় 'প্রগতিশ্রেণীর বৈপ্লবিক ঐতিহ্য'।

জনসমুদ্রের তরঙ্গ ভেঙে বিপ্লবের জাহাজ এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য তার স্থির। ঐতিহ্য বিক্ষোভের অন্তরালে সমুদ্রের তলদেশের প্রবালের মতো ছড়িয়ে আছে জীবনের সূর্যকরোজ্জ্বল পথে পথে।

বিপ্লব থেমে যায়—থেমে যাবে। বিপ্লব পরবর্তী নূতন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঐতিহ্য বৃদ্ধ প্র-পিতামহের মতো সমাজের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দ—এইতো মানুষের ইতিহাস।

ঐতিহ্য কি? হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষত্রিয়, ব্রহ্ম, বৈশ্য ও শূদ্র হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে মাথা নিচু করেছে, সরযূকার সলিলে স্নান করেছে, গঙ্গাকে 'মা' বলে ডেকেছে—এটাই ঐতিহ্য। আমরা যখন ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা বলে থাকি তখন কোন এক বিশুদ্ধ জাতীয় ঐতিহ্যের কথা বোঝাতে চাই না। ঐতিহ্য গঙ্গা যমুনা নয় যে তেজাল বা বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ ধারণ করবে। ঐতিহ্য গড়ে ওঠে সেই পথে যে পথে বহু মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছে বহুকাল ধরে। বিপ্লব এক বিপথগামী নয় যে, সে সেই পথকে অস্বীকার করবে পুরোপুরি।

আমাদের কালের সাহিত্যকর্মে বিপ্লব ও ঐতিহ্যের সম্পর্কটি অত্যন্ত জরুরী। কত বিপ্লবের রক্তঝরা বছর পরেও এমন সাহিত্য রচিত হয়নি যা মানুষকে সবৎ আবেগে উদ্বুদ্ধ করে। কেন?

সাহিত্য বিপ্লবের জয়ধ্বনি করুক—শ্রেণী সংগ্রামের মহাকাব্য হয়ে উঠুক আপত্তি নেই। কিন্তু ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে নয়। ঐতিহ্য লোকায়তিক এবং লোকায়তিক বলেই প্রগতিশীল।

ব্রিটিশ শাসন

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেওয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার ভারতবর্ষের বাইরে ব্রিটিশের যুদ্ধ অভিযানের খরচও এই হতভাগ্য দেশকে বহন করতে হয়েছে। যেমন ইজিপ্ট-আবিসিনিয়া, আফগানিস্তান ও বার্মার যুদ্ধ। এইভাবে ভারতের রাজস্বের ঠু অংশ সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় হয়েছে।

হাসান ইমাম ১৯১৮-তে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে যে তীব্র মন্তব্য করেন ইতিহাসের প্রয়োজনে আর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার টানছি।

"The apologists of British Rule in India have asserted that the presence of the British in this land has been due to humane motives; that the British object has been to save the Indian peoples from themselves; to raise their moral standard, to bring them material prosperity, to confer on them the civilising influences of Europe, and so forth and so on. The fact is that the East India Company was not conceived for the benefit of India, but to take away her wealth for the benefit of Britain. The greed of wealth that characterised its doings was accompanied by greed for territorial possession, and when the transference of rule from the Company to the crown took place, the greed of wealth and the lust of power abated not one jolt in the inheritors, the only difference being that tyranny became systematised and plunder scientific."

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মতামত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের পর বিদ্যালয়ে যে কমিটি এসেছেন তাঁরা এখনও কোন শিক্ষকই নিয়োগ করেন নি। আমার কার্যকালের মধ্যে ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আমাদের বিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগ খুলবার নির্দেশ দেন এবং তার জন্য একজন মাত্র বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ করতে করেন। তা-ও অস্থায়ীভাবে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত-এই বিদ্যালয়ে আর কোন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়নি। উপরন্তু বর্তমানে 'ব্রীফ প্যাটার্ন'-এর সরকারী সার্কুলার অনুযায়ী কোন্ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ হবে তা প্রধান শিক্ষক বা ম্যানেজিং কমিটির নির্ধারণ করবার ক্ষমতা নেই, তা নির্ধারণ করবেন জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শক মহাশয়ের দপ্তরিন অনুযায়ী সুতরাং 'বেনামীতে' শিক্ষক নিয়োগের কথা অবান্তর উক্তি ছাড়া কিছু নয়। দর্পণের কোন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে কোনদিন দেখা করতে আসেন নি, এ পত্রিকার কোন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার কোনদিন কথাও হয়নি।

দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী
প্রধান শিক্ষক
ঝাঁপড়দহ ডিউক ইনষ্টিটিউশন

কোরিয়া

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দক্ষিণ কোরীয়বাসীদের সমর্থন জানানো হয়। প্রস্তাবে দক্ষিণ কোরিয়ার পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। ঐ সম্মেলনে বাইশটি আফ্রিকান দেশের ছাত্র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

। চাঁদার হার ।

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫'৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

মিত্রির আচার্য প্রবীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮'০০
পৃথিবীর বয়স	১৪'০০
জীবন নিরবধি	১৬'০০
ঘরে ফেরারদিন	৫'০০
দিবস বিভাবরী	৫'০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬'০০
আলোর সহোদর	৪'০০
পারাবারের তীরে	১০'০০

শুকসারী ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। বুক ষ্টোর্স। কথা ও কাহিনী।

Regd. No. WB/CC-3 PRICE 40 Paise

বাংলা ছবি রিলিজ চেন পায় না

ভানুসিংহ

এত সমর্থক-বাণী, গালভরা আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও একটা নির্মম সত্য যে, আজও বাংলা ছবি রিলিজ-চেন পায় না। সে সংবাদ ছাপতে অনেকবার আগে পেয়েও বাংলা ছবি বারম্বার হয়ে পড়ে থাকে আর অর্থনৈতিনের জোরে সদ্য সদ্য সেন্সরের সার্টিফিকেট নিয়ে বাহিত রিলিজ-চেন পেয়ে যাচ্ছে তুরি তুরি হিন্দি ছবি বছরের পর বছর। এমন কি বাংলা ছবির জন্য নির্দিষ্ট হাউস-গুলিও হিন্দি ছবিওয়ালারা ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে পয়সার লোভ দেখিয়ে। আর আমরা অসহায় দৃষ্টিতে এসব দেখে যাচ্ছি দিনের পর দিন। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসি-য়েশন, বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সরকার অবশ্য মাঝে মধ্যে কিছু জেরবার্তা পোষা-ছেন, সমস্যা সমাধানের আশাও কিছু দিয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। স্বতন্ত্রার ফলর নাস্তি!

সিনেমা হাউসের মালিক তথা প্রদর্শক ব্যবসায়ে অর্থলাভ করতে নেমেছেন, তা যে কোন উপায়েই হোক্ না কেন। অধুনা বেশির ভাগ সিনেমা হাউসই ভাড়া খাটে এবং যেশ মোটা হারেই খাটে। আগে পার্সেন্টেজের ভিত্তিতে ছবি দেখানো হোত। তাতে মাঝে মাঝেই প্রদর্শক-দের লাভের অঙ্ক তাঁদের মনকে ছুঁতে পারতে না। আরও লাভ চাই, আরও বেশি টাকা—এই মতলবেই তাঁরা এখন হাউসগুলি স্বত্বতার অঙ্কে ভাড়া দিচ্ছেন। ছবি চলুক আর নাই চলুক তাঁদের তা দেখার কথা নয়—সে সব বুঝুক ছবির পরিবেশক আর প্রযোজক। কিন্তু এতেও তবু রক্ষা ছিল—এর ওপর আছে কালো-টাকার বিপুল পরিমাণ লেনদেন বা ঘুষ। এ ব্যাপারটা অলিখিতই থাকে এবং লেনদেই যার টাকের জোর যেশী সেই হাউস দখল করে বসে—এখানে টাকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট হার। হিন্দি ছবিওয়ালারা দেদার পয়সার মালিক—তারা এসব পরোয়া করেনা। তারা জানে, ছবি যত বেশী হাউসে রিলিজ পাবে তাদের টাকা তত তাড়াতাড়ি ঘরে 'ফিরে আসবে আনুপাতিক লাভ সমেত। গোটা ভারতেই তাদের রাজত্ব, সুতরাং তাদের যোগে কে? আর বেচারি বাংলা ছবি তার অল্প পুঁজি নিয়ে, সীমিত বাজার এই পশ্চিমবঙ্গেই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। কোন প্রোটেকশন নেই। বাংলা ছবির স্বার্থ রক্ষার কোন কার্যকরী পরিকল্পনাও নেই। এ সব কথা তুললেই 'প্রভিন্সিয়ালিজম'-এর অভিযোগ শুনতে হয়। কলকাতা যে সবাকার। কলকাতার ছবি যতই কোণঠাসা হয়ে পড়ুক্—এ আদর্শ নীতির নড়চড় হয় কি ক'রে?

টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিও কর্তৃক নির্মিত 'যুগমানব কবীর' ছবিটি এক-বছর আগে সেন্সরেরও ছাড়পত্র পায়। এতদিন ছবিটি রিলিজ-চেনের অপেক্ষায় ছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেও কোন রিলিজ-চেন না পেয়ে ছবিটি এলোমেলো কয়েকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর হাউসে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে বাধ্য হয়ে। একদা নিউথিয়েটার্স স্টুডিও চিত্র প্রযোজনা করে খ্যাতির তুঙ্গে উঠেছিল। সেই আদর্শ সামনে রেখে টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিওটি চিত্র প্রযোজনায় এগিয়ে আসে এবং উক্ত ছবিটি নির্মিত হয়। কিন্তু চিত্রমুক্তির সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার কারণে স্টুডিওর কলাকুশলীবৃন্দ আজ নিরাকর্ম বণ্ডাশী-স্থিতি। স্টুডিও কর্তৃক চিত্রনির্মাণের উৎসাহেও ভাঁটা পড়তে বাধ্য। আজকাল তো স্টুডিওগুলি শুধু ভাড়া খাটে, যার জন্য ছবির কোন নির্দিষ্ট মানও বজায় থাকে না। যাঁর কিছু পয়সা আছে ছবি করার উৎসাহে স্টুডিও ভাড়া নিয়ে ছবি করেন নিজের খেয়াল খুশীতে। কেউ টাকা রোজগারের ধান্ধায়, কেউ বিদেশ শখ বা বাসনা মেটাবার ফন্দীতে বা কেউ শিল্পরুচির ফক্কর ফোটাতে ছবির জগতে আসেন। ফলে ছবির স্ট্যাণ্ডার্ড চড়া আর হয় না। স্টুডিওগুলি ছবি প্রযোজনা করলে চিত্রমানের এমন বিশৃঙ্খলা ঘটার সম্ভাবনা অন্তত থাকে না। বহুকাল পর যদিও একটি স্টুডিও পূর্বাংশে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এলো, তাদের কপালেও সেই একই ফলা। চড়াছারে সুদ গুণে ছবিকে মুক্তির প্রতীক্ষায় বন্দিতে রেখে লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে ক'জন চিত্রনির্মাতা বাংলা ছবির ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন—সেটাই এখন একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নলহাটি সম্মেলন

নলহাটি: গত ১১ই ডিসেম্বর নলহাটিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রবেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মৈত্র, তিনি উদ্বোধনী ভাষণে আজেশের সাথে বলেন, পশ্চিমবাংলার ভূমি সংস্কার হয়নি। এই বার্ষক্যের জন্য তিনি প্রশাসনিক যন্ত্রকে দায়ী করেন।

শ্রীমুরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, তিনি প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং পরিবর্তন বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করেন।

এরপর ১২ ডিসেম্বরের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর ভাষণে সি, পি, আই সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। এবং খাদ্য পরি-স্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি সম্বন্ধেও বক্তৃতা দেন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বলেন, এই সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরও ক্ষোভ আছে, কিন্তু এই সরকারকে অপদার্থ বলা পার্টিকেই অপদার্থ বলার সামিল।

শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর নতুন কর্মসূচি নিয়ে এবং পরিবর্তন ও পরিবর্তন বিরোধী উভয় পক্ষের নেতৃ-বৃন্দের মধ্যে বিরোধ আরও দানা বেঁধে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শ্রীমুরুল ইসলাম এবং তার অনুগামীরাও ঐ সম্মেলন বয়কট করে কলকাতায় চলে যান। যদিও বড় রকমের কোন অঘটন ঘটেনি তথাপি সম্মেলন মঞ্চে চাপা গুঞ্জন দুর্ভাবের মধ্যে বিশেষ ভাবে ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ খবর দিয়েছে যৌথ-মুখের সাপ্তাহিক "কালো মেঘ"।

ফসল তোলার সংগ্রাম

(৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই অঞ্চলের প্রায় সবত্রই জোতদাররা কৃষকদের জমা ধানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর ভূমিহীন চাষী নবীন বাগ্দি ও বঙ্কিমনাথ বাগ্দির দখলীকৃত জমি থেকে ধান জোতদারের লোকেরা লুট করতে আসে। কিন্তু কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে ধান লুট করতে ব্যর্থ হয়।

প্রকাশ, নবীন বাগ্দি ও বঙ্কিমনাথ বাগ্দির দখলে থাকলেও ওই জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে একটি জোতদার পরিবারের ছেলেকে। পাট্টার জোরেই ওই জোতদার ধান লুট করতে আসে। এই এলাকায় ২০-২৫ বিঘা জমির অনেক 'ভূমি-হীন' আদিবাসীকেই পাট্টা দেওয়া হয়েছে।

কাঁকড়ীল থানার রামগোপালপুর ও ডায়মণ্ডহারবার থানার ভূষণা গ্রামে ও আশেপাশের বহু অঞ্চলেই সরকার স্বীকৃত ভাগচাষীদের চাষ করা জমি থেকে জোর করে ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি জোতদার-দের আক্রমণের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে বলে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন।

গত ১৩ই নভেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর মধ্যে বিভিন্ন চাষীর প্রায় ১০ বিঘা জমির ধান জোতদারের গুণ্ডারা লুট করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় যে এল আর ওর মুলপ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত ভূষণা গ্রামের সেরিয়ার নিরক্ষ দরিদ্র ভাগচাষী আক্‌ছাস আলি জমাদারের চাষ করা ৫ বিঘা জমির ধান জোতদার কেটে নিয়ে গেছে। ২৩শে নভেম্বর রাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জোতদারের বাহিনী এই ধান লুট করে।

সরকারের ঘোষিত নীতি হল,—যে কৃষক ধান পুতেছেন তিনি ধান কাটবেন। কিন্তু তাও অগ্রাহ্য হচ্ছে। ২৩শে নভেম্বরে বজেরহাট ও'ই দেখা গেল। থানার ও সি পুলিস বাহিনী নিয়ে মোতায়েন থাকলেন। আর নিরিহ এবং 'শান্তিপূর্ণভাবে' বর্গাদার বিজয় বাগদী ও অন্যত্র বাগদীর পৌঁতা ধান জোতদারদের লোকেরা কেটে নিয়ে জোতদারের খামারে তুলল। প্রশাসন তত্ত্বপক্ষও এ ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। তাছাড়া সে এল আর ও, ও-সি এবং বি ডি ও-কে নিয়ে ব্লক ভিত্তিক যে তিন সদস্য বিশিষ্ট যারেছেরি কমিটি রয়েছে, তারা আপসের নামে কৃষকদের আইন সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

পঙ্কজের বিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নেবে মিটী যান। সেখানে যুব কংগ্রেসের অনেক প্রভাব-শালী নেতা পঙ্কজকে ডেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক পরি-বর্তনের ব্যাপারে তার মতামত জানতে চান। পঙ্কজ অক-পটে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

পঙ্কজের এই বক্তব্য উক্ত নেতা পছন্দ করেননি। তিনি দোআঁশলি পঙ্কজকে বলেন, তুমি যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একমত হতে পারছো না। এটা উচিত নয়। এ অবস্থায় তোমার পদত্যাগ করা উচিত।

পঙ্কজ ব্যানার্জী উক্ত প্রস্তাবখানা নেতাকে বলেন, যদি আপনারা মনে করেন যে, আমাকে বর্তমান পদে রাখা সম্ভব নয় তবে আমাকে বরখাস্ত করুন।

পঙ্কজ ব্যানার্জী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়েও পরিবর্তন বিরোধীদের অন্যতম নেতা লক্ষ্মী বসুর হাত শক্ত করেছেন, কিন্তু লক্ষ্মীবাবুর অন্য সহযোগী বাদ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদ্রিবরধন দাসের নীরব ভূমিকায় এই মহল খুশী নয়।

সম্পাদক—বীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক বীণাপাণি প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

দর্পণ
১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ৩১শে ডিসেম্বর '৭৩ ॥ ৪০ নঃ পঃ

মার্চে সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নেতারা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পর এই ধারণা নিয়ে ফিরে এসেছেন যে, আগামী মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই মর্মে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে।

এবার রাজ্য নেতারা দিল্লী যাবার পর প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে বলেন যে, সেখানে দ্বিতাবস্থার পরিবর্তন করা ঠিক হবে না। সিদ্ধার্থ রায়ের ওপর লোকের আস্থা রয়েছে। তিনি রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

এরপর সিদ্ধার্থ রায়কে প্রধানমন্ত্রী ডেকে পাঠান এবং তাঁর প্রতিবেদন ও বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী সিদ্ধার্থবাবুকে অনুরোধ করেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তর পরিবর্তনপন্থীদের ছেড়ে দেবার জন্য, কারণ এই দপ্তর নিয়েই যত গণ্ডগোল। সিদ্ধার্থবাবু বলেন যে, তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে কথা না বলে তিনি কোন কথা দিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী তখন সিদ্ধার্থবাবুর সমর্থক, অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত বসু, সৌগত রায় ইত্যাদিকে দিল্লীতে ডেকে পাঠাতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসে জানসিং সোহনপালকে টেলিফোন করে ওদের খবর দিতে বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রী এরপর দেখা করেন তরুণকান্তি ঘোষ, জয়নাল আবেদিন, বরকত গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে এবং তাদের বলেন, সেপ্টেম্বরে এম এল এদের মধ্যে তোমাদের মেজরিটি ছিল, এখন তোমরা মাইনরিটি হয়ে গেলে কি করে।

জানা গেছে, প্রিয় দাসমুন্সী লক্ষ্মীকান্ত বসু ও প্রফুল্লকান্তি ঘোষ পরিবর্তন বিরোধীদের পক্ষে চলে যাওয়ায় অবস্থা বদলে গেছে। তাঁদের অনুগামী এম এল এরা তো আছেই, তাছাড়া হাওয়া উল্টো দিকে বইতে থাকার ফলে অনেকে পরিবর্তনপন্থীদের দিকে পীঠ ফিরিয়েছে।

এদিকে সিদ্ধার্থ রায় তখন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তর ছেড়ে দিতে রাজী নন। একে তিনি পরাজয় বলে ভাবছিলেন। তিনি এই রকম ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, পদত্যাগ করবেন।

দপ্তর পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে একটি চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সেখানে আলোচনা হল না এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিতও থাকলেন না। অভিবিদের আপ্যায়ন করলেন শ্রী এন রায়। কারণ লক্ষ্মী বসুরা তখনও পর্যন্ত দিল্লী পৌঁছতে পারেন নি।

এর পরই সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা। সিদ্ধার্থ রায়ের স্থির সিদ্ধান্ত: মুখ্যমন্ত্রীর পদ তিনি ত্যাগ করবেন। তিনি মর্মাহত, তিনি অপমানিত, স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তর তাঁকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

প্রিয় দাসমুন্সী ও লক্ষ্মী বসুও ছাড়বার পাত্র নন। এত দিন পর তাঁদের সমস্তোতা, একই মঞ্চে গা ঘেঁষাঘেঁষি ব্যর্থ হয়ে যাবে? আজ যদি পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক পরিবর্তন হয় তবে তাঁরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? এখনই বিরোধী পক্ষ বজায়ে ওড়াপাচ্ছে ক্ষমতা কব্জা করতে পারলে তারা কি তাঁদের আস্থা রাখবে? প্রিয় ও লক্ষ্মী দুজনেই পাকা রাজনীতিক। তাঁরা জানেন, এই লড়াই নীতিগত নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দখলের লড়াই। তাই প্রিয় ও লক্ষ্মী মহাশিল্পীর এক পাঁতাই রাজে সিদ্ধার্থ রায়কে বোঝাতে লাগলেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তর ত্যাগ করাটা

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

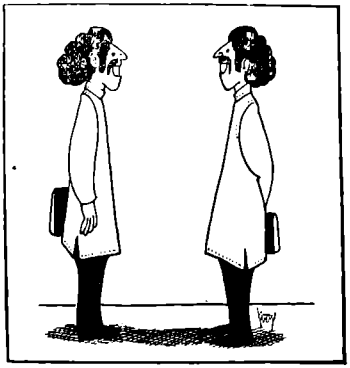

..... কি হে পরিবর্তনপন্থী.....কি হে পরিবর্তন বিরোধী।

মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

রাজেশ্বর রাওয়ের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

কমরেড রাজেশ্বর রাও সি, পি, আই, অর্থাৎ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মহাসচিব। সি, পি, আই-র দাবী শুধু ওরাই ভারতে একমাত্র সাচ্চা বৈপ্লবিক দল। কমরেড শুরিগিন মস্কোর দৈনিক প্রাভদার সাংবাদিক। প্রাভদা হল সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি'র প্রধান মুখপত্র। কমরেড শুরিগিন কমরেড রাও-এর সংগে সাক্ষাৎ করেছেন এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন প্রাভদার ১৯ ডিসেম্বরের সংখ্যায়। তিনি জানিয়েছেন :

"কমরেড রাজেশ্বর রাও আমাকে বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। ...দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর সুফল ফলেছে। খাদ্যশস্যের আর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় (ভাইটাল) শিল্পদ্রব্যসমূহের মূল্য স্থিতিশীলতা এসেছে, মুদ্রাস্ফীতি রুদ্ধ হয়েছে, পাবলিক সেকটরের কাজে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহিত ভারতের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।"

প্রতিবেদনে আরও আরও অনেক কথা আছে। যেমন, "কংগ্রেস এবং সি, পি, আই—কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেন্দ্র হওয়া উচিত। রাজনৈতিক মহলে প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্টি দুটির বাইরেও বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক বিরোধীরা

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

একটি অনাহার মৃত্যু

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ছাড়া হয়ে যায়। সাহাজাদপুর গ্রাম থানার ১৭ই ডিসেম্বর একটি মর্মান্তিক নিবাসী মায়ারানীর স্বামী প্রমথ ঘোষ "হউবায়ইটেড ব্যাঙ্ক" থেকে ঘটনা ঘটেছে। ৪০ বৎসর বয়স্কা একটি গাভী ধারে আনেন। কিস্তিতে মায়ারানী ঘোষ অনাহারে মারা যান। ধার শোধ করতে হচ্ছিল। সেই টাকা এবং গাভীর দৈনন্দিন খরচার পর প্রকাশ, মায়ারানী ঘোষের ডাই- দুধ বিক্রির দুই বা আড়াই টাকাতে ভোলা কার্ডখানি প্রায় তিনমাস চত্ত ৭ জনের সংসার চালাতে হত। ব্যক্তিদের করে দেওয়া হয়। ৫টি ছেলে- ছেলেমেয়েদের মুখে কিছু দেওয়ার পর মেয়ে এবং স্বামী সহ ৭ জনের পরি- প্রায়ই মায়ারানীকে অভুক্ত থাকতে বারে অর্ধাহার অনাহার লেগেই ছিল। হত। অনাহারের নির্মম পরিণতি ১৭ই ডিসেম্বর বিকেলে মাথাঘুরে পড়ে এই মৃত্যু।
যান মায়ারানী। এবং মারা যান।

মায়ারানীর স্বামী প্রমথ ঘোষের কিছু জমি ছিল। সেই জমিও হাত-

সম্পাদকীয়

টিকিটের ধাঁধা

আজ বৃহস্পতিবার। একদিন পরেই খুশিতে উচ্ছল হাজার হাজার মুখ ইডেন উদ্যানের গোত্রে বসন্ত করে উঠবে। কিন্তু এর সংখ্যা বেশি নয়। মাত্র ৬০ হাজারের মত। যাঁদের প্রতি এই মুহূর্তে ঈর্ষা পোষণ করছেন লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদী। তাঁরা টিকিটের জন্যে হন্যে হয়ে ছোটা-ছুটি করেও একখানা টিকিট জোগাড় করতে পারেন নি। তাঁরা ভাগ্যে শিকে ছেঁড়বার আশায় লটারীর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। একেক জন একাধিক লটারীর টিকিট কেটে লক্ষ লক্ষ টাকা সি এ বির হাতে তুলে দিয়েছেন। এই লটারীর বরাদ্দ ৩৩ টিকিট? মাত্র পাঁচ হাজার। কিন্তু

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কো-অর্ডিনেশন কমিটির অনুরোধ

সম্প্রতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের নিকট প্রেরিত একখানি চিঠিতে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চারটি জরুরী বিষয়ের আশু সুমীমাংসার অনুরোধ জানান হয়েছে। বিষয় চারটি হ'ল : (১) মূল্যসূচী অনুযায়ী মহার্ঘ-ভাতা প্রদানের সুষ্ঠু ফর্মুলা প্রবর্তন এবং উৎসাপেক্ষ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত মহার্ঘ ভাতার সম পরিমাণ মহার্ঘ-ভাতা বকেয়া সহ প্রদানের ব্যবস্থা (২) প্রমোশন সহ কর্মচারীদের প্রাপ্য সর্বপ্রকার চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত সরকারী আদেশ-নামাগুলি প্রত্যাহার (৩) মূল বেতনের ১৫% ভাগ বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান ও এই ভাতা প্রদানের ব্যাপারে মফঃস্বল অঞ্চলের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেতন সীমার যে বাধা রয়েছে তা দূর করা এবং (৪) ১৯৭১ ও '৭৩ সালে দুই দফায় সংগঠনের যে সমস্ত কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী বরখাস্ত হয়েছেন তাঁদের পুনর্বহাল।

প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত যুক্তি প্রদর্শন করে উক্ত চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান হয়েছে যাতে মহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে তিনি অবিলম্বে কর্মচারীদের এই সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রণী হন। সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবিলম্বে একটি সাক্ষাৎকারও চাওয়া হয়েছে।

পশ্চিমী দুনিয়াতে রবাহুত ভারতীয়

রমাপ্রসাদ মল্লিক

আশ্চর্য হবার মত কথা, তবু আশ্চর্য হয় না ভারতীয় প্রশাসন যন্ত্রের আমীর-ওমরাহ, এমন কি বিশেষ সুবিধা-ভোগী উদীয়মান স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসী শ্রেণীর প্রতিনিধিরাও যখন জানা যায় যে, আমাদের স্বজাতীয়রা ব্রিটেন ও পশ্চিমী দুনিয়ার থোর পুঁজিবাদী দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে যাচ্ছে এবং ফিরে আসবার নামও করেনা। অথচ যারা যায় তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাগত অর্থে কুশলী, অর্থকুশলী তো বটেই। এরা আমাদের মাথা বলা যেতে পারে। মাথা বিকিয়ে গেলে (যাকে ব্রেন-ড্রেন বলে সোর-গোল করা হয়) দেশের ক্ষতি বাড়ে বৈকি।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার যাদের হঠাৎ উর্ধ্ব-গতি সম্ভব হয়েছে এবং যাদের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী শাসকদের অর্থাৎ এলিট শ্রেণীর উদ্ভব তারা কিন্তু এই ব্রেন ড্রেন, এমন কি ব্রেন-ড্রেন অর্থাৎ কর্মশক্তি সম্পন্ন শ্রমজীবীদের চলে যাওয়াতেও বিচলিত নয়। এই সমস্যা সম্পর্কে দেশের প্রভু শ্রেণীর মানসিকতার মধ্যে রয়েছে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। একদিকে রুপট দেশ-প্রেমের বুলি, কর্মসন্ধানী ও দক্ষ স্বজাতীয়দের দেশত্যাগের দরুন মায়াকান্না, অপর দিকে রয়েছে শিক্ষিত সুবিধাবাদীর নিষ্ক্রিয়বোধ—যারা চলে গিয়েছে ও যাচ্ছে তাদের যাওয়ার চাকরীর বাজার হাল্কা হল এবং দায়িত্বও কমল। প্রশাসন যাদের কব্জায় তাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে বেকারত্বের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে এ সমস্যা সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত। দেশে যে প্রচারযন্ত্র রয়েছে তার মাধ্যমে বিদেশে, বিশেষত ব্রিটেনে ভারতীয়দের ওপর সেখানকার মুষ্টিমেয় জাতি-বিদ্বেষীদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে আওয়াজ তুললেই যেন এই শ্রেণীর প্রশাসকদের কর্তব্য শেষ। অথচ আন্তর্জাতিক স্তরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মত ও বার্তা বিনিময়ের দ্বারা ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয়দের অধিকার যাতে স্বীকৃত হয় তেমন পদক্ষেপ আজও নেওয়া হলনা। লঘুভাবে রাজনৈতিক দৌত্য থাকার উল্টো ফল হয়েছে। যারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে এবং যারা যেতে চায় তাদের ধারণা হয়েছে ভারত সরকার বুঝি বিদেশে তাদের অধিকার বজায় রাখার জন্য সব কিছু করবেন। সুতরাং দেশে ফেরবার দিধা দেশে থেকেই নিজেদের শ্রম ও গুণের সদ্ব্যবহার করার গরজ আর রইল না।

তাহলে মানবশক্তির সম্পূর্ণ ও সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে সমিতি শিক্ষা মন্ত্রকের এক কোটি টাকা খরচে গবেষণা-রত তার ফলাফল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিলল কই? কিন্তু বিদেশের নাগরিক যারা ব্রিটেনে পাকাপাকিভাবে বাস করতে এবং সেখানকার উচ্চ জীবন ও জীবিকা মানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায় তাদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার "হেলি" সমিতি দ্বারা অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বহিরাগতদের আগমনের হার কত সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করছে। এই সমিতির রিপোর্টে ব্রিটিশ জনতা হঠাৎ জানতে পারল যে, অন্যূন ৪০ লক্ষ বিদেশী প্রাজুয়েটদের শিক্ষিত কর্মসন্ধানী ব্রিটেনের চৌকাঠে অপেক্ষমান। অথচ খোদ ব্রিটেনেই ১৫ লক্ষ বেকার। এই সংখ্যা মুদ্রাস্ফীতি ও চরম অর্থনৈতিক সংকটে আরও বেড়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ কি।

এদেশে ও ওদেশে সর্বত্রই ওয়াকিবহাল মহল জানে, কর্ম তথা জীবিকার বাজার উত্তরোত্তর ভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের পক্ষে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা শক্ত। ব্রিটেনে তাই জাতি বিদ্বেষী এবং ইমিগ্রান্ট খেদাও আওয়াজে তার প্রতিফলন ঘটছে।

ব্রেন-ড্রেনের সূত্রপাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় শ্রমজীবীদের অভিযান শুরু হয় কর্মের সন্ধানে। লক্ষ্য প্রধানতঃ ব্রিটেন এবং তাছাড়াও যারা উচ্চমানের প্রশিক্ষা পেয়েছিল তাদের লক্ষ্য প্রসারিত হয়ে পৌঁছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত পশ্চিম জার্মানীতে। যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার কাজে দরকার হল শ্রমিকের। সুতরাং কর্মপ্রার্থীরা আসতে শুরু করল কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত সেই দেশগুলি থেকে যেখানে বিকাশের অভাব বা অল্প ও অনগ্র বিকাশের জন্য বেকারত্বের প্রকোপ বেশি। মোটা মাইনের প্রলোভন কর্মপ্রার্থীদের দেশত্যাগের পূঁজি বাড়িয়ে তুলল। শ্রম-চলমানতার বন্ধ নিয়মে এইটাই ছিল স্বাভাবিক। তার পর থেকে একটানা চলেছে মস্তিষ্ক ও কর্মশক্তির দেশ থেকে অবিরাম নির্গমন। ব্রেন অ্যাণ্ড ব্রন ড্রেন থাকে বলা হয়ে থাকে।

এ প্রায়ন রুপট দেশপ্রেমের বুলি দিয়ে আটকানো যায় না। আটকানোর কার্যকরী চেষ্টা আজও করা হল না। দেশের ব্যাপক বেকার সমস্যা সমস্তত আমাদের নীতি নির্ধারক উচ্চতম প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিবেক পঙ্গু করে দিয়ে থাকবে। দেশের ছেলেরা দেশে থাকলে উন্নয়নের ব্যাপারে কত সদর্থক ভূমিকা নিতে পারত, কিরূপ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরী হলে তারা দেশসেবায় আগ্রহে দেশে ফিরে কায়েমী স্বার্থের রক্ষক বৃহৎ আমলাদের শিকারে পরিণত হওয়া সেদিকে সরকারী দৃষ্টি পড়েছে বলে মনে হয় না। প্রায় বিশ বছরেরও আগে জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তি-গত আহ্বানে দেশে ফিরে আসা ডাঃ কাটিয়ালের পুনরায় বিদেশ গমন এবং সাম্প্রতিক কালে ডি এম ঢাণ্ডেকরের—যাকে ভারতেগবেষণা তথা বিকাশ সম্পর্কে তার কাজ করার আগ্রহ দেখে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে এক রিসার্চ অধি-কর্তার পদ দেওয়া হয়েছিল—উক্তি সরকারী স্তরে ব্রেন-ড্রেন বন্ধ করার ওপর কশাঘাত। তিনি জানান যে, কেবল বাণিজ্যিক নিয়মের অধীন মুলধান পার্থক্যের জন্যই দেশের মস্তিষ্ক ও কর্মশক্তির পলায়ন ঘটছে না। তিনি মনে করেন বহু যুগ ধরে দেখে আসা (এবং মেনে নেওয়া) বিদে-শনীতি শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ওপর অহেতুক ও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের জন্যই এমনটা ঘটছে। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নীতির ঘোষণা কই?

প্রচার ও সূচনা প্রদানের বিভাগের কার্যকলাপে ও কথা-বার্তায় মনে হতে পারে যে, ভারত সরকার বুঝি ভারতীয়-দের বিদেশে পাড়ি দেওয়া বন্ধ করতে, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। কয়েকমাস আগের কথা, শ্রীদামানির প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় রাইমন্ত্রী বিপিনপাল দাস বলেন, এবার থেকে শ্রম মন্ত্রক সরকারী প্রচেষ্টায় "কেন্দ্রিবদ্ধভাবে কাজ করবে, যাতে বিদেশে গমনেচ্ছু কুশলী, অর্ধকুশলী ও অকুশলী শ্রমজীবীদের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মুশ-কিল নাকি এই যে, যারা বিদেশে যায় তাদের নিয়োগ সোজাসুজি নিয়োগকর্তা তথা তাদের সংগ্রহকারী "প্রাই-ভেট" সংস্থাগুলির মাঝে হয়ে থাকে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে ঝুঁকছেন।

অভিপ্রায় সাধু। কিন্তু জনমতের সাহচর্য, বিশেষতঃ স্বেচ্ছামূলক বা অর্ধ-সরকারী প্রয়াস প্রচেষ্টার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। যেমন উচ্চশিক্ষিত ও গুণী ডাক্তারদের কথা ধরা যাক। গবেষণা ও ডাক্তারী বিদ্যাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ ও ক্ষেত্র স্বদেশে না থাকায় বহু সংখ্যক ভারতীয় ডাক্তার কানাডা ও ব্রিটেনে চলে গিয়ে-ছেন এবং প্র্যাকটিস করছেন, সেই সঙ্গে হাসপাতাল ও গবেষণাগার ইত্যাদিতে চাকরী তো আছেই। এদের সঙ্গে রয়েছেন এদের সহায়ক ফার্মাসিষ্ট এবং অন্যশিক্ষিত কৃশে ডাক্তারও। শোনা যায় আমেরিকায় এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ১২০০০ যাদের মধ্যে ৮০০০ ডাক্তার ও সার্জেন রয়েছেন। ব্রিটেনে তত তা সঠিক অনুমান করা কঠিন হলেও আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ও দেশটা নিছক মাটির হলেও ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্বন্ধে সংযুক্ত রয়েছে বহু যুগ ধরে। ডাক্তারী প্রশিক্ষণ তারতে ইংরেজদের প্রবর্তিত পদ্ধতিতেই মূলতঃ রচিত ও বিধিবদ্ধ। তাই যখন বিলাতে ভারতীয় ডাক্তারী ডিগ্রির মর্যাদা অবীকৃত হল তখন হা হা রব উঠল এদেশের কর্তাব্যক্তি মহলে। প্রায় প্রতিযোগিতামূলক ভঙ্গীতে ভারত সরকার ব্রিটেনের সর্বোচ্চ ডাক্তারী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা-লক্ষ ডিগ্রি অবীকার করতে চাইছেন, অথচ দেশের মধ্যে এই ডিগ্রিগুলির সমকক্ষ প্রশিক্ষা, গবেষণা ও তার সর্বস্তরে স্বীকৃতি ও প্রয়োগের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছেন না। ডাক্তারদের "গ্রামে চলো" শ্লোগান শোনানো হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামে যে হাসপাতাল ও ছোটখাট চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেখানে নিযুক্ত ডাক্তারদের জন্য ওষুধ ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ হয় না; অহিথকির সুখ সুবিধাও নেই। প্রশাসনিক নীতি ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই এমনটা ঘটছে।

সম্প্রতি আমেরিকা নিয়ম চালু করেছে যে, আমেরিকান মেডিকেল পরীক্ষক সমিতি দ্বারা গৃহীত পার্টওয়ান পরীক্ষা ও পার্ট টু পরীক্ষা সেখানে কর্মরত বিদেশী ডাক্তারদের জন্য আবশ্যিক ধরা হবে। ফলে ভারতীয় এলিটদের মধ্যে তীব্র খেদোক্তি আর এক ধক্কা খোনা গেল। গোপনে খবরাখবর করা হলে ভারতস্থ মার্কিন দূতাবাস থেকে জবাব মিলেছে যে, ভারত থেকে ডাক্তারদের ফ্রেনিং আউট অর্থাৎ বহির্গমন রুখবার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী তরফেই বলা হয়েছে যে একজন ডাক্তারকে পূর্ণ প্রশিক্ষিত করতে রাষ্ট্রের খরচ হয় ১'৫০ লক্ষ থেকে ২'৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রতি বছর প্রায় দু হাজার ডাক্তার তৈরী হয়। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়াররা বিদেশে পাড়ি দেওয়ায় দেশের পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ অপচয় হয় তা হিমালয় সদৃশ অঙ্ক বিশেষ। অথচ প্রায় ৩০ হাজার বেকার ডাক্তার রয়েছে ভারতে। যদি যদেশে ফিরে হত তাহলে পশ্চিমী জগতে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে যারা জন্ত এদের লোলুপ চোখে তাকিয়ে থাকতে হত না এবং অতী-তের মত সেখানে যাবার রাস্তা যাতে খোলা থাকে তার জন্ত গোপনে চেষ্টা করতেও হত না।

চাকা ঘুরছে কেন?

এককালের বাঞ্ছিত কালা শ্রমিকরা আজ শুধু রবাহুত নয়, অবাঞ্ছিতও বটে। অথচ দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির যুগাৎ সাঁড়াশী আক্রমণে ভারত থেকে কর্মপ্রার্থীরা দলে দলে এবং চাই কি বেআইনীভাবে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। ওপারে হাতছানি দেয় সুখ সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু ঠিক এই বিষয়েই ব্রিটনদের আপত্তি। তারা মনে করে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেক বেশি বিপর্যস্ত। সমাজে যে সমস্ত কল্যাণকর বন্দোবস্ত রয়েছে—শৌর সেবা, বাড়ি-ঘর-অ্যাপার্টমেণ্ট এবং শিক্ষায়—তার ওপর বিদেশাগতদের অনাহুত উপস্থিতি চাপ ফেলেছে। ফলে নেটিভ (কদর্থে নয়) ইংরেজদের প্রাপ্য সুখ সুবিধা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বেকারত্বের প্রকোপ সাধারণ মানুষকে ভাবতে বাধ্য করছে যে "কৃষ্ণাঙ্গ" কর্মীরা না থাকলে বুঝি দেশে কর্ম সংস্থান বেশি হত। মজার ব্যাপার, পাওয়েল সাহেবের মত উগ্রপন্থী বলে বলেছেন,

(সেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সিভিল লিবার্টি ও পলিটিক্যাল লিবার্টি

অন্নদাশঙ্কর রায়

[বর্তমান লেখাটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি চিঠি এবং শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী শ্রীরায় এখানে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন বলেই চিঠিটি তাঁর এবং প্রাপকের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করা হল। বলা বাহুল্য দর্পণে প্রকাশিত যে কোন স্বাক্ষরিত লেখার মতামত লেখকের নিজস্ব। তার সঙ্গে পত্রিকার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। —সম্পাদক, দর্পণ]

শ্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। সিভিল লিবার্টিজ কথাটির সংজ্ঞা যদি এতদূর ব্যাপক হয় যে রাজনৈতিক বন্দীদের পলিটিক্যাল লিবার্টিও তার মধ্যে পড়ে তাহলে আপনাদের উচিত ছিল ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় ও বিনা বিচারে আটক যখন তার দ্বারা বিধিসম্মত হয় সেই সময়ই সংঘবদ্ধভাবে তার বিরোধিতা করা। তারপর থেকে ২৬ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। এতকাল পরে হঠাৎ এই বিরোধিতা কি নীতিগতভাবে বিরোধিতা? তাই যদি হয়ে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রস্তাবও পাশ করিয়ে নিন যে বিনা বিচারে আটক করার বিধিটাই সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে ও ডিক্লেয়ার অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া রুলস, মেন্টেনান্স অফ ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইত্যাদিও রদ করতে হবে। দেখবেন ততদূর যেতে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বা শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়রাও রাজী নন। তার কারণ তাঁরাও তাঁদের আমলে বহু ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করেছিলেন ও আবার করবেন, যদি ক্ষমতা ফিরে পান। সম্ভবতঃ তাঁরা নিজেরাই আততায়ীর হাতে মরবেন। নীতিগতভাবে আপত্তি যদি তাদের থাকে তবে বলবেন আবার সভা ডেকে সেকথা ঘোষণা করতে।

রাজনৈতিক বন্দী বলতে কি কেবল অগ্নিপ্রকাশকীর অনুবর্তীদেরই বোঝায়? উগ্র সন্ত্রাসবাদী বা হিংস্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বোঝায় না? আপনি কী গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে আবার কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাগরিক খুন, হিন্দু খুন হবে না? এদের প্রত্যেকেরই একটা রাজনৈতিক পরিচিতি আছে। প্রত্যেকেই একটা না একটা দলের সদস্য। কেউ নকশাল, অর্থাৎ মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট। কেউ আর এস এস, অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্রগামী। বিবিচারে সবাইকে আটক করা যেমন অন্যায় নির্বিচারে সবাইকে খোলা রাখাও তেমনি বিপজ্জনক। এই ছাব্বিশ বছরে তার প্রমাণ জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। তাই জনমত সরকারকে নিঃশব্দে সমর্থন করছে। সভা সমিতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেও সব রকম রাজনৈতিক বন্দীকেই ঢালাওভাবে খালাস দিতে হবে এমনতর দাবী উঠবে না।

সমাজতন্ত্রী দেশে 'ইহাই নিয়ম'। কিন্তু গণতন্ত্রী দেশেও যদি এটাই নিয়ম হয়ে ওঠে তবে জনপ্রতিনিধি বলে যাঁরা পরিচয় দেন ও নির্বাচনে দাঁড়ান তাঁদেরই প্রাথমিক কর্তব্য কতগুলি চেক ও ব্যালেন্সের জন্যে দাবী জানানো। তাঁরাই নেবেন এর দায়িত্ব। প্রধানত পার্লামেন্টে বা বিধানসভায়। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রে, তৃতীয়ত জনসভায়। এর জন্যে তাঁরা দলাদলি ভুলে একজোট হতে পারেন। সে সব কিছু না করে বা তার দরুন ঝুঁকি না নিয়ে তাঁরা যা করতে চাইছেন সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন। এটাও একটা করণীয় কাজ। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাওয়েস্টোল রাইটস সংরক্ষণ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ফাওয়েস্টোল রাইটস হস্তচ্যুত হবে। যাঁরা রাজনৈতিক বন্দী নন তাঁদের স্বাধীনতাও লোপ পাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌল অধিকার ছিল, লেখনীর স্বাধীনতা ছিল, ভাষণের স্বাধীনতা ছিল। অন্নদাশঙ্কর রায়ের তা নেই। আগে তো স্বাধিকার ও স্বাধীনতা ফিরে পাই। তারপরে বন্দীদের সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখব বা বলব। আমার তিন তিনটে নিবন্ধ এখন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। কেউ ছাপতে সাহস পাচ্ছেননা। একটাই কেবল 'আলেয়া' ঝুঁকি নিতে ছেপেছে। পরে 'জনমহল'। বড়ো বড়ো পত্রিকার তত্ত্ব থেকে আমি নির্বাসিত। আমাকে আমার স্থান ফিরিয়ে দেবার জন্য কোথাও কোনো দাবী উঠছে কি? সেদিন আমি যদি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু বলতুম তা কোথাও প্রকাশিত হতো কি? আগেকার ভাষণগুলো কোথাও প্রকাশিত হয়নি। শুধু 'স্টেটসম্যানে' কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

রাজনৈতিক বন্দীরা একদিন না একদিন মুক্ত হবেই। ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক মুক্ত হয়েছে। ইমারজেন্সীও চিরস্থায়ী নয়। ইতিমধ্যেই অনেকটা বিলি হয়েছে। কিন্তু ভূতিসিয়ারির স্বাধীনতা ও প্রেসের স্বাধীনতা যদি সংবিধান সংশোধনের ফলে খর্ব হয় বা ক্ষুণ্ন হয় বা বরবাদ হয় তাহলে নিকট ভবিষ্যতে তো নয়ই, সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ববৎ হবে না। সুতরাং জোর দিতে হবে এই দুটি স্বাধীনতার উপরেই। শ্রীঅশোককুমার দত্ত যেদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন সেদিন তাঁকে আমি বলেছিলুম যে, আপনারা ভূতিসিয়ারির স্বাধীনতা ও প্রেসের স্বাধীনতা এই দুটি প্রশ্নেই আপনাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখুন। অর্থাৎ সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের প্ল্যাটফর্ম কেবলমাত্র এই দুটি প্রশ্নেরই মধ্যে সংক্ষিপ্ত হোক। অন্যান্য বিষয়ের জন্যে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম আছে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বা শ্রীজ্যোতি বসুর কি প্ল্যাটফর্মের অভাব? প্ল্যাটফর্মের অভাব অজদেরই, লেখকদেরই। এদেরকে সঙ্গে পেতে হলে এদের যেখানে যথার্থ প্রয়োজন সেইখানেই এঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে সম্ভবতে হলে এঁদের উপর সাধারণ লোকের আস্থা চলে যাবে। কয়েকজন যেমন কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত মেলাবেন তেমনি কয়েকজন মেলাবেন কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত। অজদের ও লেখকদের বিক্ত করে নীট লাভ হবে শূন্য। সংশোধিত সংবিধান যেমনকে তেমন থেকে যাবে। অজদের স্বাধীনতা প্রেসের স্বাধীনতা হবে অতীতের ছায়া। দু দিন বাদে লোকেরও সেটা সয়ে যাবে। কেউ আর চু শব্দটি করবেনা।

অশোকবাবুকে যা বলেছি আপনাকেও তাই বলি। রাজবন্দীরা লড়াই করেছে, জেল তাদের সংগ্রামের অঙ্গ। জেলে না গেলেই বরং তারা নিন্দার্হ হতো। তাদের জন্যে ভিক্ষা না করে আপনি আপনার লেখক বন্ধুদের কথাই একটু ভেবে দেখুন। এরখানা কাগজই কি আছে যেখানে তাঁরা মুখের কথা খুলে বলতে পারছেন? যদি থাকে, তবে তার অস্তিত্ব বিপন্ন। লেখকেরা এর পরে মনের কথা মনে চেপে রেখে মুখে বলবেন অন্যকথা ও লেটারে হবে দেশের সাহিত্য পরিচালনা। অন্যান্য দেশে এর দৃষ্টান্ত দেখে আপনি কি মুখ? আমার নিষিদ্ধ লেখাগুলি বই করে বার করে দেবার পর আইন আরো কড়া হয়েছে। এখন সরকার যদি ইচ্ছা করেন ছাপাখানাটাই বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। এরপরে আর কোনো বইয়ের জন্যে প্রকাশক পাওয়া যাবে না। নিজে প্রকাশক হতে চাইলেও আমি ছাপাখানার অভাবে বই বার করতে পারব না। এখন সংবিধানের নামে ওকালীলে এসব বিধিনিষেধ আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে তুলে রাখা হয়েছে। এর প্রতিকার যদি অভিপ্রেত হয় তবে সিভিল লিবার্টিজইউনিয়নকে রাজনীতিকদের প্ল্যাটফর্ম না করাই শ্রেয়। তাঁদের লড়াই তাঁরা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে করুন। আমাদের যেটা লড়াই সেটা রাজনীতি বর্জিত ও দলনিরপেক্ষ। নয়তো আমরাই দুষ্টভাগে বিভক্ত হয়ে যাব। তার লক্ষণও দেখছি। এরই দিনে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেখা গেল সরকার পক্ষের অন্যতম সভায়।

আমাকে আমার ইমেজ রক্ষা করতেই হবে। এটা শুধু আমার পক্ষেই নয়, আমার দিকে যাঁরা তাকিয়ে রয়েছেন তাঁদের পক্ষেও জরুরি। একজন মানুষ তার লেখনীর সাহায্যে যতদূর যেতে পারে ততদূর আমি যাব। তার চেয়ে বেশিদূর যাওয়া আমার সাধ্য নয়। আমার লেখনীই আমার অস্ত্র। বক্তৃতা আমার অস্ত্র নয়। পুস্তক ও পত্রিকাই আমার বাহন। সভা সমিতি আমার বাহন নয়। তবে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হলে এরও প্রয়োজন আছে। বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। যখন পুস্তক আর পত্রিকাও আমার বাহন হতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে আমি বিশেষ কোনো শিবিরভুক্ত হতে রাজী হব না। আমার কথার কাজ হলে আমি অশোকবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করব। তা তো হচ্ছে না।

একদা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আমাকে সিটিজেনস ফর ডেমক্রেসীর কলকাতা শাখার সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। আমি রাজী হইনি। সুতরাং এই যে ইউনিয়নের সভাপতি হতে নারাজ হওয়া নতুন কিছু নয়। এক এক করে সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সভাপতিত্ব থেকেও আমি বিদায় নিচ্ছি। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর সাম্প্রদায়িক মৈত্রী পরিষদেরও আমি নামমাত্র সভাপতি ছিলুম। এখনো আছি বিনা জানিনে। থাকতে আর ইচ্ছে নেই। বাংলা সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি যতদিন থেকেও আমি অসাধারণ করার অভিপ্রায় শ্রীবিমল সরকারকে ও শ্রীমনোজ বসুকে জানিয়েছি। লেখনর্মঘর পি ই এনই আমার একমাত্র ঠাঁই হবে। ভারতের পি ই এন কেন্দ্রের আমি প্রথম স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট। পশ্চিমবঙ্গের পি ই এনের আমি চেয়ারম্যান। প্রিসেনসংশিপের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পি ই এন প্রতিবাদ করেছিল।

আপনি শ্রীসাওকাত ওয়ের কথা কেন তুলেছেন জানিনে। আমার কন্যা তাঁর স্কুল থেকে পদযাত্রা করে কটকের মহিলা কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছে। সাওকাতবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই সাহিত্যিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। তিনি বিপদে পড়েছেন বলে আমি ওঁকে ত্যাগ করব এতখানি নির্মম আমি নই। তাঁর অপরাধ বিচারের ভার আমার উপরে নয়, কোর্টের উপরে। আর তাঁর সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচারের ভার দেশের বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর উপরে। বিচারের কাল উত্তীর্ণ হয়নি।

সেদিনের সম্বন্ধে এখনো মনস্থির করিনি। রাজনীতির ছোঁয়াচ আছে জানতে পেলে ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলব। এটা আমার চিরকালের নীতি। বহু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি। বহু ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনিও যদি হন তবে আমি নিরুপায়।

আপনার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার। ইতি ভবদীয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

কংগ্রেস-সি পি আই আঁতাতের এক দশক

কালিদাস কুণ্ডু

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজেদের বামপন্থী বলে দাবী করলেও বিগত এক দশকের কীর্তিকলাপের জন্য দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি রূপেই জনগণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

ভেলেঙ্গানা কাকদ্বীপের বিপর্যয়ের পর, ওদানীন্তন অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস সরকারের মূল্যায়নে একথাই বলেছিল যে, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করলেও কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত আভ্যন্তরীণ নীতিগুলো জনগণের স্বার্থ বিরোধী এবং পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রের স্বার্থের পরিপোষক বলেই প্রতিক্রিয়াশীল।

কোন সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি প্রতিক্রিয়াশীল হলে তার পররাষ্ট্রনীতি কতটা প্রগতিশীল হতে পারে বা আদৌ হতে পারে কিনা—এই জাতীয় তত্ত্বগত প্রশ্ন পঞ্চাশের দশকে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত পত্র পত্রিকাগুলোতে প্রচুর আলোচিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের মোবিড ও অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং তদ্বারা তার আভ্যন্তরীণ নীতিগুলোকেই সমালোচনা করেছে।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিব্বতের ঘটনাবলীতে নেহেরু সরকারের প্রতিক্রিয়া এবং অব্যবহিত পরে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের মধ্যে পুনরায় তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি নেহেরু সরকারকে "সাম্রাজ্যবাদের পুরুল সরকার" রূপে চরিত্রায়িত করলে এস, এ, ডাঙ্গে মেনন, এ, আমেদ, ভূপেশ গুপ্ত, ভবানী সেন ও রাজেশ্বর রাও প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতারা চীনের এই মূল্যায়নকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং নেহেরু সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

১৯৬৪ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হবার পর দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থনের নূতন অধ্যায় শুরু হয়। তৎসত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে একথা ঘোষণা করা হয় যে, "কম্যুনিষ্ট পার্টি ইহা উপলব্ধি করে যে, আমাদের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দেশের সংসদীয় সংস্থাসমূহকে রক্ষা করা ও শক্তিশালী করা, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের ঐক্য ও সমাবেশ এবং বিপ্লবী গণসংগ্রামের প্রসার এই কাজগুলি ঐ লক্ষ্যকে কার্যকরী করার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বৈদেশিক নীতির প্রশ্নেই হোক বা আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রেই হোক প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সি. পি. আই, কংগ্রেসকে অর্থহীন ভাবে ও অব্যাহত ভাবে সমর্থন করতে থাকে।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সমর্থনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, সি, পি, আই এমন এক সময়ে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের হস্ত প্রসারিত করেছিল যখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিরোধী শক্তিগুলো সংহত হচ্ছিল। একথা ঠিক যে, সি, পি, আই, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণেই সেদিন কংগ্রেস, সি, পি, আই, সংযোগিতার বন্ধনে জড়িয়েছিল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নে, রাজন্যভাতা বিলোপের প্রশ্নে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নে তাবৎ দেশের প্রশ্নে সি, পি, আই-এর লোচ্চার সমর্থন তাদের পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে সমঞ্জস্যপূর্ণই ছিল।

তৎসত্ত্বেও, আজ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সি, পি, আইকে "বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী" বলে ধিক্কৃত করছেন। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের 'প্রগতিশীল' নীতিগুলোকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমর্থন জানিয়েও সি, পি, আই, আজ তৎসত্ত্বা কুড়োচ্ছে—এটা কেমন করে সম্ভব হোল?

সি, পি, আই-এর নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেছেন, "১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস যখন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল সি, পি, আই সেদিন দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসের পাশে।"

তিনি অভিমান করে বলেছেন, "সেদিন তো প্রধানমন্ত্রী ১৯৪২ সালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। আজ কেন তুলছেন?

"আজ কেন তুলছেন"—একথাই সি, পি, আইকে বুঝতে হবে। হয় সি, পি, আই-এর আদর্শগত মূল্যায়ন ও অবস্থান ভ্রান্ত ছিল, না হয়

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

লক্ষ্মী আমার সোনা। ডাক্তারবাবু বলেছেন কম করে তিন বছর ওর যত্ন-আত্তি, তারপর যদি চাই তো আর একটি।

প্রথম তিন বছর শিশুর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। বড় হয়ে উঠতে যদিও তার আরও উনিশ কুড়ি বছর লাগবে, তার বুদ্ধির বা মাথার ব্যাপারটা কিন্তু ছেলে বেলাতেই পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়।

ডাক্তাররা তাই বলেন—প্রথম তিন বছর শুধু কোলেরোটিরই যত্ন আদর। তাকেই ভাল খাইয়ে মাপেন্ট প্রটিট যোগানো। যাতে বাচ্চার শুধু স্বাস্থ্যই নয়, বুদ্ধিও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। এ তিন বছরের মধ্যে কিন্তু আর কোন বাচ্চা নয়। পিঠোপিঠি বাচ্চা হলে না সন্তানেরা উপযুক্ত হয়, না ঘরে লক্ষ্মীর শ্রী আসে।

–মনে রাখবেন, আগে কোলেরোটির স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হবে। পরেরটি আসবে কম করে তিন বছর পর।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের নানান উপায়—নিরোধ, লুপ, পিল। যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশদ পরামর্শ নিন।

davp 76/592

সমকালীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের একটি বিশ্লেষণ

পঙ্কজ চৌধুরী

"মানুষের সামাজিক অবস্থাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। মানুষের চেতনা তার সামাজিক অবস্থাকে নির্ধারণ করে না।" —কার্ল মার্কস

কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বৈষয়িক এবং ভাবাদর্শগত অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেই দেশের সংস্কৃতি। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এই সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিতে বিভক্ত থাকে। যদিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী শ্রেণীর চরিত্রের দ্বারাই কোন দেশের জাতীয় সংস্কৃতির চরিত্রটি নির্ধারিত হয়, তথাপি সংস্কৃতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর "way of life" বা জীবনযাত্রা পদ্ধতি। এই জীবনযাত্রা পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটে প্রতিটি দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংগীত নাটকে। শিল্প সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে জীবনযাত্রা পদ্ধতির এই প্রতিফলনকে বোঝায়। শিল্প সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলনই গড়ে তোলে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক শিল্প সাহিত্য। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-হীন শিল্প সাহিত্য হতে পারে না। শিল্পী সাহিত্যিকরা যে শ্রেণী-অবস্থান থেকে যেভাবে বিভিন্ন ঘটনাকে দেখেন, অনুভব করেন সেই অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী তাদের শিল্প সাহিত্যে ধরা দিয়ে হয়। তার দ্বারাই প্রতিটি শিল্প সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র নির্ধারণ করা যায়। শিল্প সাহিত্যে প্রতিফলিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী শিল্প সাহিত্যকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মর্মক পাঠকদের কাছে রসগ্রাহী করে তোলে। রসগ্রাহিতাই শিল্প সাহিত্যের প্রথম কথা। এইভাবে শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে এক একটি শ্রেণীর ভাবাদর্শ সমাজে সক্রিয় হয়। জেনেই হোক অথবা না জেনেই হোক শিল্পী সাহিত্যিকরা কোন না কোন শ্রেণীর ভাবাদর্শকে সমাজে প্রচার করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প সাহিত্য সংগীত নাটকের বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতা বিশাল। শরৎচন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি পড়েই অনেকে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য করেছিলেন। বিশেষ করে চরিত্র-হীনের রুচি এবং নৈতিকতার প্রশ্নটাই সবচেয়ে জোরাল করে দেখা দিয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৩ সালের মে মাসে শরৎচন্দ্র তার চরিত্রহীনের প্রকাশক প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন,—"রবিবাবুর চোখের বালি ভদ্র-ঘরের বিধবা বিন্দের ঘরের মধ্যে এমন কি আখাটি কুটিয়ে সঙ্গে নষ্ট হইতেছে কেহ কথাটি বলে নাই। (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে?) আর আমার চরিত্র-হীন যত অপরাধে অপরাধী? যাহারা ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ কিম্বা জার্মান নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বলিবে ইহা সত্যই immoral কিনা। যাই হোক, আমি এখনও স্বীকার করিনা যে চরিত্রহীনে একবর্ণও immorality আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু পাঁচজনে যাহা বলিতেছে তাহা নাই।" (শরৎ রচনা সংগ্রহ ঃ একাদশ সম্ভার)

চোখের বালির মাত্র দশবছর পরে শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন রচনা করেন। এই দশ বছরে ঔপনিবেশিক আধা সামন্ত-তান্ত্রিক ভারতীয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হবার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। ১৯০৩ সালে লেখা চোখের বালিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কোন প্রভাব পড়তে পারে না। ১৯১৩ সালে রেঙ্গুনে বসে লেখা চরিত্র-হীনেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কোন প্রভাব নেই। তাছাড়া লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার শিছনে কোন বৈপ্লবিক মতাদর্শগত প্রস্তুতি ছিল না। মতাদর্শগতভাবে বরং হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্বারা সেই আন্দোলন পরিচালিত হতে শুরু করেছিল। তারফলেই ১৯০৬ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা গঠন করেন মুসলিম লীগ। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হোল "বন্দেমাতরম" এবং "আল্লাহ্ আকবর" এবং ধর্মীয় স্লোগান। রবীন্দ্রনাথের মত ধর্মীয় ব্যক্তিরা ক্রমে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। এমন কি মতিলাল নেহেরুর মত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা সেদিন সেই আন্দোলনের হিন্দু চরিত্রকে সমর্থন করেন নি। বস্তুতঃ আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রের থেকে তার ধর্মীয় চরিত্রটিই প্রাধান্য পেয়েছিল। সেই সংকীর্ণবাদী হিন্দু আন্দোলন থেকে ভারতের ধর্মীয় সামাজিক নীতি নৈতিকতার পরিবর্তে নতুন কোন নীতি নৈতিকতার জন্ম হওয়া সম্ভব ছিল না। তথাপি সমকালীন ভারতে চোখের বালি এবং চরিত্রহীনের রুচি এবং নৈতিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এ দ্বন্দ্বের কারণ কি?

শিল্প সাহিত্যে রুচিবোধ এবং নীতিবোধ কোন বিমূর্ত ব্যাপার নয়। নির্দিষ্ট শ্রেণীর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের রুচি এবং নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে তাদের শিল্প সাহিত্যে। চোখের বালি এবং চরিত্রহীনের রুচি এবং নৈতিকতা ভারতীয় সমাজের ভিন্ন দুটি শ্রেণীর লেখকদ্বয়ের সংস্কৃতির প্রতিফলন। চোখের বালিতে শহরে জমিদার নন্দন মহেন্দ্র মেডিকেল ছাত্র। তার সঙ্গে বিধবা বিনোদিনীর স্থায়ী প্রেমের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ তার শ্রেণীর পক্ষে অকল্যাণকর বলে মনে করে তাদের সমর্থন করেন নি। কারণ মহেন্দ্রের স্ত্রী বর্তমান এবং সে দুর্বল চরিত্রের পুরুষ। অন্যদিকে বিহারীর ভাবনাহীন আর্থিক সংগতির উৎস জমিদারী হলেও সে অবিবাহিত চরিত্রবান যুবক। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর স্থায়ী প্রেমের সম্পর্ককে সমর্থন করলেন কিন্তু তাঁর শ্রেণীর পারিবারিক কল্যাণের কথা ভেবে উভয়কে বিবাহিত জীবনের আশ্রম থেকে বঞ্চিত করলেন। কিন্তু চরিত্রহীন সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর প্রেমের সম্পর্ককে শরৎচন্দ্র মেনে নিলেও রুচিবান ভারতীয় পাঠক মাত্রেই মেনে নেওয়া কঠিন। তার কারণ কেবল এই নয় যে মেসের বি সাবিত্রীর সঙ্গে মেসের বাবু সতীশের কুরুচিপূর্ণ আচরণ, তার প্রধান কারণ হলো সরোজিনীর সঙ্গে সতীশের বিয়ের কথা স্থির হবার পর সাবিত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বন্ধন। এ ধরণের সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা যাত্তবে ঘটলেও যে সমাজে এক স্বামী-স্ত্রী প্রথা বর্তমান সে সমাজে এই ধরণের সম্পর্ক কোন নৈতিক সমর্থন লাভ করতে পারে না। অথচ শরৎচন্দ্র এই নীতি-হীন সম্পর্ককেই সমর্থন করেছেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রুচি এবং নীতিবোধের পার্থক্য এখানেই।

সতীশ তার বাবার মৃত্যুর টাকা আসে জমিদারীর অঙ্কের টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অন্তর্বর্তী সতীশ ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েও পড়াশুনার প্রতি নিষ্ঠাহীন। সে গান বাজনা জানে, নেশাভাঙ্গ করে, শরীর চর্চা করে'সে অমিত শক্তির অধিকারী। নিষ্ঠাবতী হয়েও সতীশ দুবেলা সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভোলে না। এরকম দ্বান্দ্বিকতাহীন বৈষয়িক এবং ভাবাদর্শগত অবস্থা নিয়ে কারো পক্ষেই সম্পাদ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসের মাঝ-করণ চরিত্রহীন করলেও সতীশকে কিন্তু চরিত্রহীন হিসাবে ঘৃণার পাত্র করে তোলার পরিবর্তে তাকে মহিমান্বিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এ হেন সতীশকেই সাবিত্রী এবং সরোজিনী ভালবাসে! সেটাও শরৎচন্দ্রের নায়িকারা, তারা আর নায়ক খুঁজে পায় না। তথাপি সতীশের আচরণ কিন্তু লম্পটের মতই। সে ঠিক করে একটা টাকা মেসেতে ফেলে দিয়ে মেসের বাঁধা বি সাবিত্রীর কোন বাঁধা বাবু আছে কিনা পরীক্ষা করে, কাঁকা ঘরে সাবিত্রীর কাপড় টেনে ধরে, গভীর রাত্রে মাতাল হয়ে মেসে ফেরে। পর-বর্তীকালে সাবিত্রীর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তার প্রেমের পিছনে সতীশকে ছুটতে দেখে পাঠক অনুমান করতে শুরু করে যে এ হেন সতীশকেই কলমের খোঁচাতে শরৎচন্দ্র হয়তো চরিত্রবান প্রেমিক করে তুলবেন! কিন্তু না, পাঠক ঘটটি শেষ করে সতীশের চরিত্র পরিবর্তনের কারণটিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার অবসর পায় না। তার পূর্বেই সতীশ তার ভাবী স্ত্রী সরোজিনীকে গোপন করে সাবিত্রীর কাছ থেকে তার নিজের স্বামীত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এবার আর সতীশকে নীতিহীন বলে রুচিবান ভারতীয় পাঠকের চিনতে অসুবিধা হয় না। সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের এই সম্পর্কের বহুবই উত্তরকে নীতিহীন বলে প্রমাণ করে দেয় পারিবারিক সম্পর্কে শ্রেণীগত নীতি-হীনতাই চরিত্রহীনতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। সামাজিক দায়দায়িত্বহীন অঢেল টাকার মালিক সতীশের পক্ষে দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাকে ভালবাসার পরিবর্তে রক্ষিতা হিসাবে রাখাটাই স্বাভাবিক এবং ক্রিয়ের কাজ করতে এসে সাবিত্রীর মত শ্রেণীর পক্ষে দেহগত সতীত্ব রক্ষা করতে পারাটা তেমনি অস্বাভাবিক, বিশেষ করে সতীশের মত নীতিহীন জমিদার নন্দন যে মেসের ঝিয়ের প্রভু। শরৎচন্দ্র শ্রেণীগত নীতিতে ভেদেই চরিত্রহীনের অস্বাভাবিক নৈতিকতাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন। দায়িত্বো নীতিহীনতা যখন নীতিহীন হিসাবেই পরিবেশিত হয় তখন তার জন্য চিন্তার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু সাহিত্যিকরা যখন তাদের সাহিত্যে নীতিহীনতাকে সরাসরি সমর্থন করেন অথবা নীতির ছদ্মবেশে পরিবেশন করেন প্রকৃত চিন্তার কারণ ঘটে তখনই। কিন্তু Ethics এর ছাত্র শরৎচন্দ্র নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের গর্ব করে বলেছেন,—"আমি Ethics এর student—সত্য student. Ethics যুক্তি এবং কারাবো অপেক্ষা কম যুক্তি বলিয়া মনে করিনা।" (শরৎ রচনা সংগ্রহ ঃ একাদশ সম্ভার) এ কথা বলে শরৎচন্দ্র কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? রবীন্দ্রনাথকে কি?

Ethics বা নীতি শাস্ত্রও শ্রেণী-নিরপেক্ষ কোন বিষয় নয়। শ্রেণীগতভাবে নীতিশাস্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই এক শ্রেণীর নীতি নৈতিকতা নিয়ে অন্য শ্রেণীর নীতি নৈতিকতা বিচার করা যায় না। স্বাধীন পুঁজিবাদী ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান নীতি নৈতিকতা দিয়ে পরাধীন আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতের নীতি নৈতিকতা বিচার করা আদৌ বেশী অসঙ্গত ছিল। শরৎচন্দ্র সেই অসঙ্গত কাজকে সম্ভব করতে গিয়ে অবান্তবতার শিকার হয়েছেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পরাধীন সামন্ততান্ত্রিক ভারতে পারিবারিক সামাজিক নীতি নৈতিকতার প্রকৃত সংকট শুরু হয়ে গেছিল। বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণী ভারতে পুঁজিবাদী প্রথায় উৎপাদন শুরু করার ফলে ভারতের ব্যবসায়ী, মহাজন এবং সামন্ত শ্রেণীও সেই উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন। তার ফলে ভারতের পরাধীন সামন্ত সমাজে দেখা দিল ভাঙন। আবির্ভাব ঘটতে শুরু কোরল ভারতীয় সর্বহারা শ্রেণীর। পরাধীন সামন্ততান্ত্রিক ভারত পরিবর্তিত হতে শুরু কোরল পরাধীন আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতে। প্রয়োজন দেখা দিল সর্বহারা সাম্যবাদী নীতি নৈতিকতার। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিদেশী এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর মিশ্রিত নৈতিকতা সেই প্রয়োজনের প্রতি আলোক-

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মতামত

চীন ও স্তালিন প্রসঙ্গে

দর্পণের ২৬শে নভেম্বর সংখ্যায় রবীন্দ্র রায় 'চীনের মুক্তিযুদ্ধ ও সোভিয়েতের নীতি' শীর্ষক বিতর্ক অবতারণা মানসে ১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মস্কো নিউ টাইমসের একটি উদ্ধৃতির উপর মন্তব্য করেছেন: "ঐ সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরামর্শ ছিল মাও যেন চিয়াঙের আওতায় সরকারে যোগ দেন। মাও তাই পরামর্শ গ্রহণ করেননি।" কি ভীষণ ভুল ব্যাখ্যা তা প্রমাণিত হয় তখন, যখন ঠিক মস্কো টাইমসের দেখার ২৩ দিন পূর্বে এবং স্তালিন আপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৯ই আগষ্ট "জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শেষবারের লড়াই" শীর্ষক প্রবন্ধে মাও সে তুঙ ঘোষণা করেছেন—"৯ই আগষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের যুদ্ধ ঘোষণাকে চীনের জনগণ আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাচ্ছে।...এই পরিস্থিতিতে চীনা জনগণের সকল জাপবিরোধী শক্তিকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশসমূহের সঙ্গে যনিষ্ঠ ও কার্যকর সমন্বয় রক্ষা করে জাতি মোরা প্রতি আক্রমণ শুরু করতে হবে। সমস্ত অংশের জনগণের যুক্তফ্রন্টকে বিস্তৃতির করে তুলতে হবে, সমগ্র দেশের জনগণকে যুদ্ধযুদ্ধের বিপদ এড়াবার জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশান সরকার গঠনের ব্যাপারকে বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়াসী হতে হবে। চীনের জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে এক নতুন স্তরই সূচিত হয়েছে।" [মাও নির্বাচিত রচনাবলী ৩য় খণ্ড। পৃঃ ৪৩১। নবজাতক প্রকাশন] মাও রচনাবলীর কমিন্টার্ন এবং স্তালিনের অন্যত্র নির্দেশ শ্রদ্ধাসংকারে গ্রহণ করার কথা লেখা আছে।

রবীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় মন্তব্য,—"যেভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, সর্বত্র ঐ পদ্ধতিতেই বিপ্লব সফল করতে হবে। মাও অন্য একটি পথের উদ্ভাবক। সোভিয়েট বিশ্বাস করত না যে, মাও প্রদর্শিত পথে কখনও কমিউনিষ্ট বিপ্লব সম্ভব। তা যখন সম্ভব নয় তখন চিয়াংকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সোভিয়েতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল।" এই মন্তব্যের পাশাপাশি মাও সে তুঙ এবং সি. পি. সির উদ্ধৃতিগুলি বিচার করা যাক। (১) ১৯২৮ চিকাং পাহাড়,—"আমরা কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের চীন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি। নিঃসন্দেহে চীন এখনো পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই রয়েছে। [ঐ ১ম খণ্ড/২১৪ পৃঃ] (২) ১৯৩৮—চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ শীর্ষক প্রবন্ধে—"চীনে সমগ্র বিপ্লব সমগ্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। এটা চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধে। কমরেড স্তালিনের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক, এবং এটা উত্তর অভিযানের যুদ্ধে, কৃষিবিপ্লবের যুদ্ধে কিংবা বর্তমানে জাপ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। [ঐ ২য় খণ্ড ২৪/১৮২ পৃঃ] (৩) ১৯৪৫—ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। চীন কমিউনিষ্ট পার্টির গৃহীত প্রস্তাব। ঐ খণ্ড ৩৩/পৃঃ ২২৮—"চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম যুগে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালে এবং বিশেষ করে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালে চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহান বিপ্লবে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি'র সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছে।"..

আবার—ঐ গৃহীত প্রস্তাব, ঐ ২৪৮ পৃঃ—"কমরেড স্তালিন এটি দেখিয়ে দিয়েছেন (চীন বিপ্লবের সমস্যাবলী—স্তালিন) এবং কমরেড মাও সে তুঙ বিস্তারিত ভাবে তার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন যে বর্তমান স্তরে চীন হচ্ছে একটি আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ ...তা হচ্ছে একটি সাম্রাজ্যবাদ্‌বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লব অর্থাৎ,তা হচ্ছে একটি নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যা অতীতের পুরনো গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দুয়ের থেকে স্বতন্ত্র।" আবার এ গৃহীত প্রস্তাব / ঐ ২৫৩ পৃঃ—"কমরেড স্তালিনের মতোই কমরেড মাও সে-তুঙ সঠিক ভাবে অনেক আগে কৃষি বিপ্লবী যুদ্ধের যুগের শুরুর দিকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চীনের বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ এবং মূলতঃ কৃষকদের নিয়ে গঠিত একটি সৈন্য বাহিনীই হচ্ছে সংগঠনের প্রধান রূপ।"

এবার রবীন্দ্রবাবুর উৎসহীন উদ্ধৃতিতে আসা যাক। এটা কোথায় দেখেন লেখা নেই। রবীন্দ্রবাবু লিখেছেন, ১৯৪৫ সালে পোটসডাম কনফারেন্সে স্তালিন বলেছেন—"চীনে চিয়াংএর সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার সম্ভব নয়; ওখানে কমিউনিষ্ট বাহিনী নামে যা আছে তা আদপেই কমিউনিষ্ট নয়।" নাম গোত্রহীন উৎসহীন উদ্ধৃতির আলোকনা বিশেষ নয় তাই মাও সে-তুঙের স্তালিন মূল্যায়ন মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। ঐ ৩য় খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠায় চীনা জনগণের বন্ধু স্তালিন শীর্ষক প্রবন্ধে পাই—"...স্তালিনকে অভিনন্দন জানানো মানেই হচ্ছে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে সমর্থন জানানো, সমাজতন্ত্রের বিজয়কে এবং মানব জাতির অগ্রগতির যে পথ তিনি নির্দেশ করছেন তাকে সমর্থন করা...কেবলমাত্র স্তালিন কর্তৃক নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে এবং তাঁর সাহায্যেই মানব সমাজ সেই দুঃখ ভোগের অবসান ঘটাতে পারে।...বন্ধুর সাড়া পাবার আশায় পাখী করে গান। চীনা জনগণের এমন কিছু ওয়াকিবহাল ব-ঘোষিত বন্ধু আছেন, যাদের কিছু কিছু চীনা ভাষনা চিন্তা না রেখে বন্ধু বলে গ্রহণ করে।...কিন্তু আর এক ধরনের বন্ধু আছেন যাঁরা আমাদেরকে দেখেন ভাইরের মতো। তাঁরা কারা? তাঁরা হচ্ছেন সোভিয়েত জনগণ ও স্তালিন।...স্তালিন হচ্ছেন চীনা জনগণের মুক্তির প্রকৃত বন্ধু। মতবিরোধ ঘটাবার কোন প্রচেষ্টা, কোন মিথ্যা কথা বা কুৎসা প্রচারই স্তালিন সম্পর্কে চীনা জনগণের সর্বান্তকরণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাকে বা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত বন্ধুত্বকে প্রভাবিত করতে পারবেনা।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত সি. পি. সি. এ মূল্যায়ন বদলায়নি। "ওথাকথিত ব-ঘোষিত বন্ধুদের" agony for China থেকে রবীন্দ্রবাবু প্রভাবিত হয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে স্তালিন বলেছেন যে সি. পি. সি. যদি কমিউনিষ্ট হত তবে তাঁদের হাতে চীনকে তুলে দেবার জন্য স্তালিন আবেদন নিবেদনের থালা ধরে বেড়াতেন; আবার বৈরী স্তালিনের এমন মারাত্মক উক্তির পরও মাও তাঁর চাটুকারিতার জন্য লজ্জিত হচ্ছেন না। মাওএর স্তালিন মূল্যায়ন জানা থাকলে "উদ্ধৃতিটির" উৎস খুঁজে পেতেন সমালোচক মহাশয়। স্তালিনকে "মার্কসিয়ার লুটেরা" দেখাতে রবীন্দ্রবাবুর উচিত ছিল তার সমর্থনে সি. পি. সির দলিল দস্তাবেজ এবং মাও থেকে উদ্ধৃত দেওয়া, অন্যথায় আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

ডাঃ নরেশ চৌধুরী

লঘু প্রমোদ চিত্র 'দম্পতি'

ভানুসিংহ

সাত বছর বিয়ে হবার পরও কোন সন্তান না হওয়ার দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট এক দম্পতিকে কেন্দ্র ক'রে ফিল্ম আর্টস ইন্টারন্যাশনালের 'দম্পতি' চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর আশ্রয়ে যে চিত্রনাট্যটি পল্লবিত হয়েছে, তা কিন্তু আদ্যন্ত লঘু প্রমোদ চিত্রের লক্ষণাক্রান্ত। দুঃখের কথা এই যে, ছবিটিতে কোন গুরু বিষয়ের অবতারণার কোন ভণিতা নেই, কোন কিছু নীতি শিক্ষা প্রদানের ছলনাও নেই। নিছক দুঃখটার আনন্দ পরিবেশনই একমাত্র লক্ষ্য। তবে কাহিনীর মূলসূত্রে অপুত্রক দম্পতির মনোব্যথা থাকলেও অজস্রধারে সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে ঘিরে একের পর এক কৌতুক দৃশ্য যোজনা করা হয়েছে। এ অবস্থায় বেদনা ও হাসির যে কন্ট্রাস্ট একই ফ্রেমে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ ছিল, চিত্র নির্মাতা সেই বাস্তবের দিকে না গিয়ে প্রেম ভাঁড়ামি আর অতিমাত্রায় প্রক্ষেপ উপকরণের মাধ্যমে দর্শক সাধারণকে হাস্য কৌতুকের খোরাক জোগাতে চেয়েছেন। সেখানে দম্পতির মনোব্যথার অভিপ্রকাশ প্রায়শঃ উপেক্ষিত। তবুও বলব, দর্শকের গরিষ্ঠাংশে তাৎক্ষণিক একটা আমুদে মেজাজ হয়তো পাবেন।

সন্তান লাভের জন্য নানারকম শিকড় বাকড়, টোটকা ইত্যাদি উপায় অবলম্বনের দৃশ্যগুলি ক্রমেভির ছকে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রশ্ন, এক ডাক্তার তার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কোন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন না কেন? ছাবিটিতে সেরকম কোন বিষুর পরিচয়ই দেওয়া হয়নি। পুত্র না হওয়ার দুঃখ স্ত্রীকে যতখানি ভারাক্রান্ত করে তোলে, স্বামীটিকে তার কিয়দংশও স্পর্শ করে না সেও লক্ষ্য করি। ডাক্তারের দৃষ্টি থাকে শুধু স্ত্রীর শান্তি লাভের দিকে —তার মন যুগিয়ে বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকার দিকে। এই পর্যায়ে বেশ কিছু হাস্য কৌতুকের দৃশ্য যুক্ত, যেগুলির অভিপ্রায়টা কমোডের লক্ষিকে হয়তো প্রশ্রয় পেতে পারে কিন্তু রসাবেদন সৃষ্টিতে তেমন সার্থক নয়। রবি ঘোষ ও সুলতা চৌধুরী ডাক্তারদম্পতির দায়িত্বশীল রূপে হাস্যরস পরিবেশন করতে গিয়ে যে মাত্রা ছাড়া ক্রিয়াকাণ্ড করে বসেন, তাতে দর্শক হাসেন ঠিকই, কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত কখনই নয়। জোর করে হাসানোর ফলে প্রকৃত আনন্দ উপভোগ শুধু বাধাই পায়। মালা সিন্‌হার অভিনয় কিন্তু চারু চরিত্রটিকে সজীব করে তুলেছে। কি বেনার্জ অভিনীতিতে আর কি আনন্দ উচ্ছলতায় তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। তুলনায় ডাক্তার সরোজ রুপে রঞ্জিত মল্লিককে নিষ্প্রভ লাগে। তবে চাকর বাবার ভূমিকায় উৎপল দত্ত ও শৈলেন বাবা রূপে কালী ব্যানার্জী স্বল্প পরিসরে নজর কেড়ে নেন। মহুয়া রায়চৌধুরীর ট্রাস্ট নাচের কোন প্রয়োজনই ছিলনা যেমন প্রয়োজন ছিলনা সুলতা চৌধুরী যখন তখন সিঠ দেখানো। পরিচালক অনিল ঘোষ এই সব বিকৃত রুচির দৃশ্য মুক্ত করে দর্শক মন আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন বোঝাই যায়। শোভা সেন ও পার্থ মুখার্জী চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন, কিন্তু সব সময় সহনীয় অভিনয় নিঃসন্দেহে হয়ে ওঠেন নি। সংযোজের সাহচর্য হৃদয়ের বারণে কোন উচ্ছেদই চরিতার্থ হয় না একথা আজও কিছু দৃশ্য অকারণে এসে বিরক্তি সঞ্চারই করে। তবে রুক্ষ চক্রবর্তীর ক্যামেরা কিছুটা সহায়তা করেছে। সিনেমাস্কির প্রয়োগটি তেমন অস্বস্তিকর নয় আর ক্যামেরা বেশি রকম 'আই লেভেল'-এ থাকেনি। কয়েকটি ভিন্ন প্রবেশের নাচের দৃশ্য ছাড়া ফুলের হাজারিকার সংগীত পরিচালনা এক রকম ধামাচাপা

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

।। চাঁদার হার ।।

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

সহযোগীর সম্পাদকীয়

জনগণের স্বার্থহানি ?

কেন্দ্রীয় সরকারের এক তথ্যে প্রকাশ যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১৯৭৪-৭৫ সালের চাইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বিদেশে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার মধ্যে খাদ্যশস্য রপ্তানি হয় ৩৭ শতাংশ। মোট ২৮৮ প্রকারের খাদ্যসম্ভার বিদেশে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে প্রধান প্রধান রপ্তানিকৃত খাদ্যদ্রব্য হলো : চিনি, চা এবং মাছ। ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারত চিনি রপ্তানি করে ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ; চা রপ্তানি করে ২৬৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং মাছ রপ্তানি করে ১২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। এর পরের স্থান হলো খাবার তেল, মাংস, মশলাপাতি, কফি, তৈলবীজ, ফল এবং শাকসব্জী।

দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাক, রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে যেন যেশি বেশি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করুক—তাতে কারো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কি জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে করা হবে? খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে তিনটি দ্রব্যের অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি দ্রব্য হলো চিনি, চা এবং মাছ। অথচ এই তিনটি দ্রব্যের অত্যন্তরীণ বাজারের অবস্থাটা কি? চিনির কথাই ধরা যাক। চিনি নিয়ন্ত্রণ ভিত্তি হলো আখ। আখ উৎপাদন করতে কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। অথচ কৃষকেরা কি তাঁদের এই কঠোর পরিশ্রমের ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন? কৃষক সভার দীর্ঘদিনের দাবি হলো আখের দাম দুইশ টাকা প্রতি পনেরো টাকা করা হোক। অথচ আখের সরকার নির্ধারিত মূল্য হলো মাত্র নয় টাকা। এই সামান্য কৃষকেরা লভ্যাংশ পান না। সরকার নির্ধারিত দামের চাইতে কম দামে তাঁদের আখ বিক্রি করতে হয়। কৃষকেরা যখন তাঁদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দর থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তখন অত্যন্তরীণ বাজারে চিনি ক্রেতাদের অবস্থাটা কি? খোলাবাজারে চিনির দাম বাড়তে বাড়তে এখন কেজি প্রতি পাঁচ টাকার উপরে উঠেছে। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার অর্থাৎ রেশনেও এক কেজি চিনির দাম হলো ২ টাকা ১৫ পয়সা। অথচ এই চিনি বিদেশের বাজারে ১০ পয়সা কেজি দরে বিকোচ্ছে।

এবারে চায়ের কথা ধরা যাক। চা রপ্তানি করে ভারত এ বছর ৬৩০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। অথচ চা বাগিচার শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি আজও স্বীকৃত হলো না। চা বাগিচায় কর্মরত শ্রমিকদের অর্ধেকই নারী। নারী পুরুষের জন্য সমান কাজের সমান মজুরি আইনও পাশ হয়েছে। অথচ এই আইন আজও যথার্থভাবে কার্যকর হয়নি। চা বাগিচার মালিকরা দিনের পর দিন শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা বাড়িয়েই চলেছে। কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও চা-বাগিচার মালিকরা শ্রমিকদের উপর চালাচ্ছে নির্মম শোষণ। তাঁদের চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি জরুরী সমস্যার কোন সুরাহাই হচ্ছে না। মাছের কথা না বলাই ভালো। মাছের পাইকারী ব্যবসাদারদের মুনাফা বেড়েই যাচ্ছে, বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অঙ্কও বেড়ে যাচ্ছে আর মাছে ভাতে বাঙালী এখন মাছের স্বাদ ভুলে যাচ্ছে। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে কোমরে একটু "ছেঁড়া ন্যাকড়া" জড়িয়ে আদুল গায়ে যারা মাছ ধরেন সেই জেলেদের পাইকার, মহাজন, বিকিরিদের শোষণে প্রতিনিয়ত শোষিত হতে হচ্ছে।

দেশের শ্রমিক - কৃষক-মেহনতী জনগণের তাই প্রশ্ন : খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি তো বাড়ছে—কিন্তু কিসের মূল্যে ?

[গণশক্তি]

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

পাত্ত করা তো দূরের কথা তাকে আরো বেশী জটিল এবং ঘোলাটে করে দিয়েছে।

১৯১৩ সালে চরিত্রহীনের Ethics এর পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র চোখের বালির নৈতিকতাকে কটাক্ষ করলেও ১৯৩১ সালে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন,—"রবীন্দ্রনাথের চোখেরবালি তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিন সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি কোনদিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে পাঠক যে এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায় এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।"; (শরৎ রচনা সংগ্রহ : ঘাসস সম্ভার)

আর সেই পরিচয়েরই অনুকরণ ঘোস চরিত্রহীন।

চোখের বালির নৈতিকতার ট্রাজেডি চরিত্রহীনে ব্যঙ্গচিত্র হিসাবে খাজির হোল। পরাধীন আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতে রবীন্দ্রনাথ জমিদার শ্রেণীর নৈতিকতার মাহাত্ম্য প্রচার কোরলেও তার বাইরে যেতে পারলেন না। আর তবুপুরে শরৎচন্দ্র বিদেশী ভাবাদর্শ নিয়ে কৃষিজ সামন্ত শ্রেণীর নৈতিকতার মধ্যে প্রবেশ করলেন, সর্বহারা শ্রেণীর ভাবাদর্শ গ্রহণ করলেন না।

সি পি আই-কংগ্রেস

কংগ্রেসের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে বাস্তব কারণেই। আদর্শগত মূল্যায়নের ব্যাপারটা সি, পি, আই-এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু একথা তো ঠিক যে, সংকটের দিনে কংগ্রেস সি, পি, আইকে ব্যবহার করেছিল শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়, অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেওয়ার জন্যও। অন্ধ্র, কেরালা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলগুলোকে কোণঠাসা করে দেওয়ার জন্য সি, পি, আই নির্দ্বিধাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়ী হঠকারিতার বিরুদ্ধে সি, পি, আই এর নেতৃত্বে সি, পি, আই-কে কিছু হেরফের (কেরালাতে মন্ত্রিত্ব ছাড়া) কিন্তু কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করেছে। এতখানি শক্তিশালী করেছে যে আজ কংগ্রেসের কাছে সে আর অপরিহার্য নয়।

সি, পি, আই-এর অভ্যন্তরে আজও অসংখ্য নিষ্ঠাবান কর্মী আছেন যাঁরা দেশের স্বার্থে সর্বপ্রকারের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত। এইসব কর্মীদের নিষ্ঠা, সংকল্প ও কর্ম উদ্দীপনার উপর আস্থা হারিয়ে সি, পি, আই নেতৃত্ব ভুল রাস্তায় চলেছিল, চেয়েছিল কৌশলে বাজীমাৎ করতে। ইতিহাসের শিক্ষা, সেটা কখনও কোন দেশেই সম্ভব নয়।

স্তালিন জয়ন্তী

কমরেড জে. ভি. স্তালিনের ১৭তম জন্মবার্ষিকীতে বহুস্থানে জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা সি. পি. আই (এম)। থাগড়া "কালচার" প্রাঙ্গণে ২১শে ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রভাত রায়-চৌধুরীর সভাপতিত্বে। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।

গগনচাঁদ সংঘের শিল্পী অনেক সাম্ভাল সময়োপযোগী সংগীত পরিবেশন করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "স্তালিন" কবিতা আবৃত্তি করেন সোমনাথ চক্রবর্তী। সুনীতি বিশ্বাস এবং সমর সমাদ্দার বক্তব্য রাখেন। সভার পর উদ্দীপনা-পূর্ণ মিছিল সহর পরিক্রমা করে।

রাজেশ্বর রাওয়ের বক্তব্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস ও সি, পি, আই-র মধ্যে সহযোগিতা তত্ত্বনত করার বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টা চালিয়েছে যেমন দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো তেমনি চালিয়েছে বামপন্থী দলগুলো।"

কিন্তু এই সব বক্তব্যে আমাদের আপাততঃ প্রয়োজন নেই। দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে কমরেড রাও প্রাওদাকে যা বলেছেন বলে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় তাই। প্রতিবেদনটির ইংরেজি ভাষ্য "ভারতের অবস্থা এবং সি, পি, আই-র ভূমিকা" শিরোনামায় সি, পি, আই-র কেন্দ্রীয় সাপ্তাহিক নিউ এজ-এ প্রকাশিত হয়েছে ২৬শে ডিসেম্বর সংখ্যার ১০ম পৃষ্ঠায় প্রায় পৌনে এক পৃষ্ঠা ব্যাপী। নিউ এজ-এর সম্পাদক কমরেড ভূপেশ গুপ্ত।

কমরেড গুপ্তর কাণ্ডটা দেখুন। নিউ এজ-এর ওই ২৬শে ডিসেম্বরেই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান সংবাদ হিসাবে তিনি ছাপিয়েছেন প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত একটি স্মারকলিপি যার মূখ্য বক্তব্য হচ্ছে এই যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৃদ্ধি রুখবার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। স্মারকলিপি থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"সম্প্রতি খাদ্যশস্য এবং কাপড়, রান্নার তেল, ঔষধপত্রের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যে আবার বৃদ্ধি ঘটছে।...এমন কি, সরকারী পরিসংখ্যানেই দেখা যায়, পাইকারী বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশ। খুচরা বাজারে মূল্য তো অনেক বেশী ঘটেই।....সর্বাধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার, এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে যখন ধান ও গমের উৎপাদন হয়েছে আশাতিরিক্তভাবে ভাল (বাম্পার) এবং সরকারী গুদামে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ খাদ্য শস্য মজুত আছে। চীনাবাদাম, সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজের ফলও হয়েছে খুবই ভাল। তথাপি তৈলের মূল্য অতিশ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যাপক আকারে চোরাবাজার চলছে। চিনির ক্ষেত্রে অবস্থা আরও খারাপ।"

স্মারকলিপিটিতে দত্তযশুকারীদের মধ্যে প্রথম নাম কমরেড রাও-এর ঠ সঙ্গে আছেন, সি, পি, আই-র পাঁচটি গণদগঠনের মহাসচিবগণ। গণদগঠন-গুলি হচ্ছে এ, আই, টি, ইউ, সি., কিসান সভা, ক্ষেত মজুরর ইউনিয়ন, যুব ফেডারেশন।

নিউ এজ-এর একই সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে, কমরেড রাও গোতিয়ের ইউ-নিয়নের উদ্দেশ্যে এক কথা বলেছেন, যদেশের জন্য বিপরীত কথা। একক্ষে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ভারতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যে স্থিতিশীলতা এসেছে ; অন্যকে বলা হয়েছে, না মূল্যে স্থিতিশীলতা নেই, মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কমরেড রাও-এর তথা সি, পি, আই-র পরস্পর বিরোধী উক্তির হেতু কী ? উদ্দেশ্য কী ?

তর্ক করা চলে, কমরেড রাও-এর সংগে কমরেড গুরিদিনের সাক্ষাৎকার ঘটে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, স্মারকলিপি দেওয়া হয় তার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, সি, পি, আই-এর মতে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মূল্য এত বৃদ্ধি পায় যে দলটির নেতৃত্বন্দ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই কারণেই কমরেড রাও প্রাওদার প্রকাশিত তাঁর মত থেকে তিনি সরে এসেছেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন।

তবে আসুন, আমরা ওই নিউ এজ-এরই ১২ই ডিসেম্বরের সংখ্যার প্রতি নজর দেই। এই সংখ্যার সম্পূর্ণ প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সি, পি, আই র কমরেড শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে সমেত সব কেন্দ্রীয় নেতা এবং ক্রুড সংগঠনগুলির মহাসচিবগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি। বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে দেওয়া হয় ৬ই ডিসেম্বর। এর দু-একদিনের মধ্যেই কমরেড রাও-এর সংগে কমরেড গুরিদিন সাক্ষাৎ করেন। বিবৃতিটির বক্তব্য পরে স্থান পায় প্রধান মন্ত্রীকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে, প্রায় একই ভাষায়। বিবৃতিটিতেই সি, পি, আই ডাক দেয় ১৩ই জানুয়ারী "মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস" হিসাবে পালন করতে।

কমরেড রাও যদি সত্যি সত্যিই প্রাওদায় প্রকাশিত মন্তব্যগুলি করে থাকেন তবে তা করেছেন নিজের পার্টি কর্তৃক গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে। কেমন যেন খটকা লাগে। কমরেড রাও-এর পক্ষে পার্টি ডিসিপ্লিন এমন ভাবে অগ্রাহ্য করা কি সম্ভব ?

যা ঘটেছে মনে হয় তা এই। প্রাওদার সংবাদদাতা নিজের বক্তব্য কমরেড রাও-এর নামে চালিয়েছেন। কেন চালিয়েছেন, সে অন্য প্রসঙ্গ। এর পূর্বেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কমরেড গুরুর তা অজানা নয়। কমরেড রাওকে চুপ করে থাকতেই হবে। প্রাওদায় প্রকাশিত "সংবাদের" প্রতিবাদ ? না, তা সি, পি, আই-র পক্ষে সম্ভব নয়।

আর, সত্যি সত্যিই যদি কমরেড রাও প্রাওদাকে ওই সব কথা বলে থাকেন, তবে তাঁর হাঁড়ি কমরেড গুপ্ত এমনভাবে আমাদেরই দেশে ভাঙ্গলেন কেন ? প্রতিবেদনটি নিউ এজ-এ না ছাপালে তো এদেশে কেউ ব্যাপারটি জানতে পারত না।

Regd. No. WB/CC-32 PRICE 40 Paise

দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত আন্দোলনের প্রস্তাব প্রসঙ্গে রামমূর্তি

সম্প্রতি ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যুক্ত আন্দোলনের জন্য সি পি এমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সেই সম্পর্কে সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক পি রামমূর্তি এক বিবৃতি দিয়েছেন। সি পি এমের সাপ্তা দৈনিক "গণশক্তি" থেকে তার বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল।

শ্রীরামমূর্তি বিবৃতিতে বলেছেন: দিল্লির 'পেট্রিয়ট' পত্রিকার ১৯৭৬ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সংখ্যা সংবাদে প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে, সি পি আই, এ আই টি ইউ সি, সারা ভারত কিসান সভা এবং আরো কয়েকটি গণ-সংগঠন একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। ঐ বিবৃতিতে তাঁরা মুদ্রাস্ফীতি, কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীসহ ব্যাপক জনগণের অবস্থার ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছেন। এই সকল দাবির মধ্যে খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল ও অন্যান্য অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর পাইকারী ব্যবসায়, বস্ত্রশিল্প, চিনি, বিদেশী ওষুধ কোম্পানি এবং চটশিল্পের জাতীয়করণের দাবি, ফসল কাটার মরশুমে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের লাভজনক দাম দিয়ে সরকার কর্তৃক কিনে নেওয়া সুনিশ্চিত করা এবং সারা দেশে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর দাবিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঐ বিবৃতিতে "লে-অফ, লকআউট, ছাঁটাই, দুর্মূল্যভাতা কেটে নেওয়া এবং তাদের বোনাস পাওনা থেকে বঞ্চিত করার জন্যে" শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত কর্মচারিদের ক্ষেভ-দুর্ভোগের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঐ বিবৃতিতে যে সকল গণ-সংগঠন যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে রাজ্য ও জেলাস্তরে কমিটি গঠন করা, জনসভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা "জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্যে আগ্রহশীল সমস্ত রাজনৈতিক, দল, গণ-সংগঠন সমূহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা ও সাহায্য করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৯শে ও ২১শে মে সি আই টি ইউ এবং অন্যান্য যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও এই সকল দাবির অনেকগুলি উপস্থাপিত করেছিলেন এবং যৌথ প্রচেষ্টায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে যুক্ত প্রচারাভিযান এবং সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এক সাধারণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সর্বসম্মত ঐক্যমতের মাধ্যমে সংগ্রামের কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্যে ঐ সভায় যে কমিটি নির্বাচিত হন তাঁরা সি আই টি ইউ-র আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সক্রিয় হয়ে উঠতে সমর্থ হননি।

সে যাই হোক, রাজনৈতিক মতামত, মতাদর্শগত এবং দল-সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ করার অবিচল নীতি নি আই টি ইউ বরাবর অনুসরণ করে এসেছে এবং ঐ নীতি কার্যকরী করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

এ আই টি ইউ সি এবং অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা এতদিন যে সকল নীতি অনুসরণ করে এসেছেন তাদের বর্তমান বিবৃতি দেখে মনে হয় তাদের আগেকার নীতি থেকে ব্যতিক্রম ঘটেছে।

সি আই টি ইউ এই ব্যতিক্রমকে স্বাগত জানায় এবং যদিও আমরা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যৌথ প্রচারাভিযানের কার্যক্রম কেন্দ্রীয় স্তরে আলোচনার মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে বলে কেন্দ্রীয় স্তরে আলোচনাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করি; তবুও আমরা আমাদের অনুমোদিত সমস্ত সংগঠনকে এই সকল প্রশ্নে যুক্তপ্রচারাভিযানে সহযোগিতা করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি এবং আমাদের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলিকেও এই যুক্ত অভিযানে সামিল করার জন্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করব। এই সঙ্গে সি আই টি ইউ পরিষ্কারভাবে বলতে চায় এই সকল প্রশ্নের উপর যৌথ প্রচারাভিযানে কোন অংশগ্রহণকারীই তার নিজ রাজনৈতিক অথবা মতাদর্শমূলক অভিমত প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করবেন না।

কিন্তু এই সকল প্রশ্ন আলোচনার জন্য আহূত আলোচনা চক্রে নিজেদের স্ব স্ব বিশেষ অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকবে। কেননা কতকগুলি প্রশ্নে নানা প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যালোচনাই আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সি আই টি ইউ আনন্দের সঙ্গে এই ধরনের আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং বারাই এই রকম আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন সানন্দে সেই সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

রবাহূত ভারতীয়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

১০০৭ পাউণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে ব্রিটেনের "বিদেশী"দের নগদ বিদায় দেওয়া হক। নিঃসন্দেহে এমন দাবি গড়পড়তা ব্রিটন পছন্দ করেনা, সমর্থন তো নাই। কিন্তু এ ধরণের কথাবার্তা এক শ্রেণীর অতুগ্র দেশপ্রেমীদের উৎসাহিত করছে পাল্টা উগ্রতা দেখাতে। যেন যে কোন ভারতীয় একবার ব্রিটেনে পৌঁছে গেলে তার আত্মীয় অনাত্মীয় প্রিয় পরিজনদেরও চুকতে দিতে তাদের বাধা।

ব্রিটিশ সরকার বলেন যে, ইমিগ্রান্ট বা আগন্তুকদের ছাড়পত্র ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় দেওয়া হচ্ছে: ১৯৭৪ সালে ২৩১০৪ জন, ১৯৭৫ সালে ২৬,২৪১ জন। ওদেশের সঙ্কীন অর্থনীতি বাধ্য করছে ওদেশকে কমনওয়েলথের পিছুটান থেকে মুক্ত করে সংযুক্ত য়ুরোপীয় মহাসংস্থায় যোগ দিতে। ব্রিটেনের আহ্বানে এখন আর ভারতের প্রতিনিধি দেখা যায় না আর সেই জন্য ভারতকে এড়াতে পারলে ব্রিটিশ জাতির কোন বিশেষ দংশন হবার কথা নয়। একথা লিখেছেন "এ ডিভিসন্স অফ স্পয়লস" বইতে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বুদ্ধিজীবী পল স্কট।

রবাহূত ভারতীয় ব্রিটেন, আমেরিকা বা অন্যত্র আমাদের আপন জন। তাদের বৈষয়িক ত্যাগ নিয়ে দাবা খেলা চলে না।

মার্চে সাধারণ নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁর কাছে অসম্মানের কোন ব্যাপার নয়। পাহাড় গলল। সিদ্ধার্থ রায় রাজি হলেন।

এই ডামাডোলে ভরপাকান্তি ঘোষ ভেবেছিলেন তাঁর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর যেমন আছে তেমনি থাকবে, যদ্যপি (পুলিশ) দপ্তর বাড়তি। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর চলে যাওয়াতে তিনি বড় মনোকষ্টে ছিলেন। সিদ্ধার্থ রায় তাঁকে বুঝিয়েছেন, কোন্ দপ্তর গেল এস এ নিয়ে না ভেবে এস আমরা একসঙ্গে কাজ করি।

তবে পাঞ্চমবঙ্গের ব্যাপার নিয়ে এখন আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়া যাবে না। এই রাজ্যের ব্যাপারে এখন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রঘুরাম্যাইয়া। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁকেই জানাতে হবে।

টিকিটের ধাঁধা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই সটারীতে জিতেও কেউ কেউ টিকিট পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সি এ বি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্লেক টিকিটের বণ্টন নিয়ে অভিযোগ অনেক। সবশুই একটা রহস্যের ব্যাপার। আনন্দবাজার একে বলেছে ধাঁধা। ধাঁধাই বটে। গতবারের চেয়ে টিকিটের সংখ্যা বেড়েছে। তবু অনেকের টিকিট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকের টিকিট একেবারেই কেটে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পৌরসভা ৩০০ টিকিট পেত, এবার তাদের একটিও দেওয়া হয়নি এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত। এম এল এদের টিকিট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের অনেকের নাম খুশিমত কেটে দেওয়া হয়েছে। এরকম বহু তালিকা দেওয়া যায় এবং খবরের কাগজে কদিন ধরে এ ধরনের অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে। সি এ বি কর্তৃপক্ষ এর তেমন সদুত্তর দিতে পারেন নি, কেবল একটা অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন। ইডেন উদ্যানে নবনির্মিত ক্লাব হাউসে বসার জন্য ৫০০ টাকায় প্রায় ১৪০০ টিকিট বিক্রির ব্যাপারও রহস্যজনক।

একদিকে এই চিত্র, অন্যদিকে কোন কোন ব্যক্তির পকেটে গোছা গোছা টিকিটের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরা কারা? কোথা থেকে এদের পকেটে এত টিকিট আসে? এই বাজারে সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী হল সি এ বি'র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা।

তবে যেটা প্রধান লক্ষণীয় ব্যাপার সেটা হল ব্লেক টিকিটের একটা আলাদা অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। যেখানে টিকিটের এত চাহিদা সেখানে যে ব্যাপক হারে টিকিট কালোবাজারে হবে এ তো জানা কথা। কিন্তু এখন নগদ উৎকোচের পরিবর্তে ব্লেক টিকিট উৎকোচ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ যারা ব্যবসা বা অন্য সুবিধার জন্য অর্থ নারী বা সুরা ঘুষ দিত তাদের এখন টিকিট ঘুষ দিতে হচ্ছে। কলকাতার ক্লাবগুলো টিকিটের একটা বৃহদাংশ পায়। ছোট ছোট অনেক ক্লাবই তথাকথিত যেটা ভোগে-স্থানের বদলে বাইরের লোককে টিকিট দিয়ে থাকে। এবার সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শুধু টাকা—মোটা টাকা ছাড়লে টিকিট হয়ত পাওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে ইডেন উদ্যানের বাইরে, রেডিও ও টেলিভিশনের সামনে ভীড় করা ছাড়া আর উপায় কি।

টিকিটের ব্যাপার নিয়ে তদন্ত হবে নাকি? ফল: পর্বতের মুষিক প্রসব?

মাদ্রাসার নির্বাচনে এম এল এর পরাজয়

গত ২৭শে ডিসেম্বর ২৪ পরগণার বাঙ্গিড়াড়া হাই মাদ্রাসার কার্যকরী কমিটির নির্বাচন হয়। নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন এম. এল. এ. অপরপক্ষে স্থানীয় লোক দুজীবর রহমান। এই নির্বাচনে অনেক দলাদলির পর ইনস্পাংশনের জন্য এম এল এ'র দল কোর্টে আবেদন করেন কিন্তু আবেদন বাতিল হয়। ভোটের পর গণনা করে দেখা যায় যে এম এল এ মহাশয়ের পরাজয় ঘটেছে এবং দোচনাও তাদের। এখন তারা চেষ্টা করছেন কি করে সব কিছু ওলট পালট করা যায়।

সম্পাদক—হীরেন বসু
সম্পাদক কর্তৃক বীণাপাণী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

ইংরেজের খেলা ক্রিকেট নিয়ে অসুস্থ মাতামাতি

দর্পণ
১৫শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা। কলকাতা, ৭ই জানুয়ারী '৭৬ ১০ পয়সা

সময় ও অর্থের অপব্যয়

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

ভারত দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস পরাজয় এড়াতে পেরেছে। খুব মন্থর সংস্কৃতি বৈকি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, এত ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের অপব্যয় করে ক্রিকেট-স্যানরা এই একটিমাত্র সাফল্য নিয়ে ইডেন উদ্যান থেকে ফিরলেন যে, ইংলণ্ডকে তো দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য মাঠে নামতে হল।

এবার টেষ্ট টিকিটের জন্য পাগলামি আগেকার সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। যারা সত্যিই ক্রিকেট খেলা বোঝে ও ভালবাসে বা যারা তথাকথিত বিশেষজ্ঞ বা খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ তারা ছাড়া আছে লক্ষ লক্ষ হুজুগে দর্শক যারা যে কোন উপলক্ষেই বেসামাল হয়ে পড়ে। এদের উৎসাহটা এবার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। গত কয়েকদিন যেন লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যে দেশে সব কিছুই অনিয়ন্ত্রিত সেখানে এই অংশের টিকিটের ব্যাপক কালোবাজারী, ক্ষমতাশীনদের মাতব্বরি, বেপরোয়া দুর্নীতি অস্বাভাবিক বলার মত ব্যাপার নয়।

রাইটার্স বিল্ডিংসে ও অন্যান্য সরকারী অফিসও ক্ষেপে উঠেছিল। কর্মচাঞ্চল্য স্তব্ধ। গত দুমাস প্রশাসনিক পরিবর্তনের ধুয়া ধরে কংগ্রেসীদের ধাপাধাপিতে সরকারী অফিসারদের মধ্যে যে অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কাটতে না কাটতেই এসে পড়ল ক্রিকেটের হুজুগ। ফলে সব অফিস প্রায় ফাঁকা। মন্ত্রী নেই, অফিসার নেই, ভাগ্যবান কেরাণীরাও মাঠে। যারা নিজেদের দায়ে মন্ত্রী বা অফিসারদের পেছনে অনেকদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান খেলা শেষ হতে এবার তারা যোধহয় শক্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু ক্রিকেটের আলোচনা কি বন্ধ হবে? কয়েকদিনের মধ্যেই পরবর্তী টেষ্ট। এবার তারা দর্শক নয়—ট্রানজিষ্টার রেডিও নিয়ে শ্রোতা।

কিন্তু কেন এই হুজুগ? বিপুল মূলের উপযোগী, বাহুল্যের স্থান হওয়ার যোগ্য একটা খেলা নিয়ে কেন এই অসুস্থ বৈচৈ? যে খেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এককালে ভারত ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল সেই খেলা যেখার জন্য এই পাগলামি কেন?

সারা বিশ্বে মাত্র ছয়টি দেশ ক্রিকেট খেলে। এবং এর সব কয়টিই একসময়ে ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল। আর ইংল্যাণ্ডে লর্ডদের খেলা ছিল এই ক্রিকেট—সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধ ব্যবস্থায় যাদের ছিল অঢেল অবসর ও প্রচুর অর্থ। ভারতেও ক্রিকেট ছিল ইংরেজের শোষক রাজা-মহারাজাদের খেলা। আমরা ভুলে যাই পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত আর কোন

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

রাজ্য রাজনীতিতে এখনো কোঁদল চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে আবার জল ঘোলা হতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের উত্তর গোষ্ঠীর দিল্লী সফরের পর মন্ত্রিসভায় রদ্দর অদল-বদল করার পর সবাই জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন, ঐক্য ফিরে এসেছে।

কিন্তু সপ্তাহ পার হতে না হতেই এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পড়েছেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রিয় দাসমুন্সী, লক্ষ্মী বসু, প্রণীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ ক্যানিংয়ের এক বিরাট জনসভায় মন্ত্রি-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যকে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেছেন। তাঁরা মন্ত্রিসভায় বর্তমান পুলিশ মন্ত্রীকে চৌকিদারের মন্ত্রী বলে পরিহাস করেন।

এই সভার পরদিনই কলকাতার হাজরা পার্কে আর এক সভা হয়েছে।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

আন্দোলনের ডাক নেতৃত্ব দিচ্ছে পাঁচটি শ্রম সংগঠন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি আই টি ইউ, ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এইচ এম এস ও এইচ এম পি—এই ক'টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও খেটে-খাওয়া জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে শাসক শ্রেণীর অভূতপূর্ব আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য। জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করার অধিকার ও নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রত্যাহারের পর বিভিন্ন উপায়ে এই আক্রমণ শুরু হয়েছে।

তাদের বক্তব্য : নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেপরোয়া লক-আউট, ছেঁটাই, লে-অফ, হাঁটাই ও বেকারি বাড়ার ফলে শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চরমের সীমায় পৌঁছেছে। এর ওপর সর্বশ্রেণীর মানুষকে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি দিক

ভারতের স্বাধীনতা লাভের ২৯ বৎসর পরে এখানকার জনসাধারণের দৈনিক সঙ্গতিপত্তা আর মাত্র এক টাকায় উঠেছে। নিম্নে বিগত সাত বৎসরের ভারতীয় জনগণের বাৎসরিক সঙ্গতিপত্তা আয়ের একটি হিসাব দেওয়া হল।

সাল	টাকা
১৯৬৯—৭০	৩২৪·০
১৯৭০—৭১	৩৪১·৮
১৯৭১—৭২	৩৪০·২
১৯৭২—৭৩	৩৩৩·২
১৯৭৩—৭৪	৩৪৭·২
১৯৭৪—৭৫	৩৪২·৭
১৯৭৫—৭৬	৩৭১·১

সূত্র :—ব্রিংস, ৩০. ১০. ৭৬

বিগত সাত বৎসরের ভারতের জাতীয় আয়ের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :—

সাল	টাকা (কোটিতে হিসাব)
১৯৬৯—৭০	১৮,৩২
১৯৭০—৭১	১৯,০৩
১৯৭১—৭২	১৯,৩৪৭
১৯৭২—৭৩	১৯,০৭৭
১৯৭৩—৭৪	২০,৭৭৪
১৯৭৪—৭৫	২০,৫০৬
১৯৭৫—৭৬	২২,৩১৭

সূত্র :—ব্রিংস, ৩০. ১০. ৭৬

প্রায় একশতটি সর্বৃহৎ শিল্প-মালিকপরিবার যারা আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে তাদের ভিতরের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ছেঁটি ধনী পরিবারের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির ভিন্ন বৎসরের একটি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল। ইহা শ্রেণীশোষণের একটি বীভৎস চিত্র। আমাদের দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেছে বলে সরকার প্রচারিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে তো শ্রেণীশোষণ লোপ পায় এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কোন লক্ষণ তো এখানে দেখা যাচ্ছেই না, বরং বিপরীত চিত্রই দেখা যাচ্ছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে ধনীকে আরও ধনী করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নয়।

ধন সম্পদের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	(কোটিতে টাকার হিসাব)		
	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩
টাটা	৫৩৫·৮	৫৭৯·৪	৬০৮·৬
বিড়লা	৪৮৭·১	৫৪০·৯	৬০১·৭
মফতলাল	১৬৬·৮	১৮৫·৪	২২৪·০
আই, সি, আই	১০৯·৯	১৩৫·২	১৪৫·৬
আপার	১২০·৪	১২৬·৭	১৩৯·৪
এ সি-সি	১২১·১	১৩৪·৩	১৩৯·২
অয়েল ইণ্ডিয়া	৮৯·০	১১৭·৩	১৩৪·২
সিন্ধিয়া	৮৭·৩	১০৭·২	১৩০·৯
জে, কে, সিংবানিয়া	১০৭·১	১১৮·৮	১৩১·৭
সাভাই	৯৫·৯	১২০·২	১২৯·৫
শ্রীরাম	১১০·০	১০৯.৩	১১৫·২
ওয়ালচাঁদ	৯৪·৮	৯৩·৯	১০০·০
কিরলোস্কর	৭৩·৫	৭৭·০	৮৩·৪

সূত্র : পাল'মেন্ট, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৫ সাল
'স্যানডে' পত্রের ১৯.১.৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত
সংগ্রহ : বিকাশ গুপ্ত

ব্রিটিশ শাসন ও মধ্য শ্রেণীর সাহিত্য

মিহির আচার্য

পরিক্রমায় সাউথ বাঙলা সাহিত্যের দিকে একবার মনোযোগটি দুটি দিনে যে-দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার চোখে পড়বে তা হচ্ছে আমাদের প্রধান সাহিত্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যেমন বিরুদ্ধতা নেই তেমনি সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা।

অথচ দীর্ঘকাল এই দুটি শক্তিই ছিল এ দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সামাজিক শোষণের মূল। এবং প্রশাসনের অপেক্ষা রাখে না এই শোষণের বিরুদ্ধে যারবার নিষ্পেষিত মানুষ বিদ্রোহ করেছে, বিক্ষোভ করেছে। সে সবই স্থানিক বা আঞ্চলিক হোক সে গণআন্দোলন। অর্থাৎ এই বিদ্রোহগুলিই প্রমাণ করে এই শোষণের যন্ত্রটি সম্পর্কে জনমানস সচেতন ছিল। প্রায় গোটা উনিশ শতক মূলত কৃষক-সংশ্লিষ্ট এই আন্দোলনের ধারা রক্তাক্ত।

এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে প্রশ্নটি সহিনের মতো উদ্যত হতে বাধ্য, কেন আমাদের প্রধান প্রধান সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারিপ্রথার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক জেহাদ নেই।

এই প্রশ্নের চাবি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বন্দোবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।" [রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৫১৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বন্ধনে বঙ্গ সমাজের যোগ্যতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" [বঙ্গদেশের কৃষক, ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৮৯]

একেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সত্যদ্রষ্টা। বঙ্কিম এগিয়ে এসে পুরো ব্যাপারটাকেই কাঁস করে দিয়েছেন।

তাঁরা যে বঙ্গসমাজের কথা বলেছেন, যা সম্ভব হয়েছে ইংরাজের আগমনে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে, যাকে ঐতিহাসিক পরিভাষায় "মধ্য শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার অস্তিত্ব ইংরাজ-সরবনে তথা জমিদার ও মধ্য-বস্বভোগীর প্রশ্রয়ে পুষ্ট, সেই বিশেষ শ্রেণীর জন্যেই 'ভারত-পথিক' রামমোহন পথ তৈরি করে গেছেন। যে-পথে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারি-প্রথার সঙ্গে সংঘর্ষের কথা ওঠেই না।

সমস্যাটা হয় যখন এই শ্রেণীগত ধারণা নির্বিশেষে আপামর দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় যেহেতু এই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর দর্শন 'অ-শিক্ষিত' জীবন ও জীবিকার অর্জায়িত অবস্থাই মাতৃভ গ্রহণ করেননি।

এমন কেন হয়? এর চমৎকার উত্তর : শ্রেণী-অধ্যুষিত সমাজে ইতিহাস সর্বদাই ক্ষমতাবান শাসনবর্গ ও তার সহযোগী শ্রেণীর ইতিহাস।

রামমোহন থেকেই আমাদের মধ্যশ্রেণী এই ইতিহাস রথ করে উত্তরাধিকার সূত্রে বহুদিন তার পতাকা বহন করে চলেছে।

পলকে প্রণয় কথাটা কী পরিমাণ সত্যি তা উনিশ শতকের বাঙালী ভদ্রলোকদের দেখেই বোঝা গেল। কোম্পানির শাসনভার গ্রহণ করার কালেই তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন ইংরাজ-শাসন এদেশে বিধাতার আশীর্বাদ এবং আমাদের সাবালক করার প্রয়োজনে প্রভুদের দীর্ঘকাল এদেশে থাকা উচিত। কারণ? কারণ মুসলমান শাসন অত্যন্ত বর্বর এবং অত্যাচারমূলক ইত্যাদি। যে 'হিন্দুয়ের' জন্যে এই প্রশাসিন সেই বিত্তবান্ হিন্দুরা কিন্তু মুসলিম আমলে সরকারের দিনানুদিনার বিদেশে সরকারে একাধিক-কাল যথেষ্ট প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি খাটিয়েছে। মুসলিম শাসনে হিন্দুদের 'দুর্গতির' যে লোকপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে তার মূলে সরকারি কর কাঁকি দেবার অপচেষ্টাটা ঢাকা দেবার কৌশল-টুকুও কাজ করেছে। কারণ সরকার ইসলামই হোক কি ইংরাজই হোক হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র মানুষ নির্বিশেষে একই ভাবে বঞ্চিত। বিত্তবান্ হিন্দু-মুসলমান বিত্তহীন মানুষদের কথা কোনোকালেই ভাবেনি।

এই বিত্তবান হিন্দু কিনাবসিয়ারদের উজ্জ্বল প্রতিনিধি জগৎশেঠ, যে-বেনিয়াটি বর্ষার সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে চুক্তি করে নবাবকে ফাঁসিয়ে দিতে পেরেছিল। ইতিহাসে যার নাম পলাশীর যুদ্ধ।

বিশেষ করে বাঙালী ভদ্রলোকেরা যখন মুসলিম শাসনের নিন্দা করেন তখন ব্যাপারটা বেশ মজাদার হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক তাদেরকে মুঘল শাসনের কর গুণ হয়েছে, যদিও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও মুঘল শাসন ব্যবস্থা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি এবং তখনো এই বাঙলা দেশ সমৃদ্ধির চূড়ায় বাস করছে, এমতাবস্থায় বাঙালী 'হিন্দুয়া' খাপোথা বাঙলা দেশের শাসন সম্পর্কে কেন নিন্দার পঞ্চমুখ হয়ে উঠে বিদেশী শাসনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন তার কারণ বোঝা কী খুবই কষ্টকর?

এই হচ্ছে বেনিয়াদের চরিত্র, যখন যে শাসকগোষ্ঠী আসে তারা তাদেরি সহযোগী হয়ে ওঠে। দিল্লির মুঘল বাদশাহের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং ইংরাজ বণিকদের একেকটি করে বাণিজ্য কেন্দ্র দখল, সেনাবহিনী ও দুর্গ নির্মাণ এবং আরো বেশি করে বাণিজ্যের কর্তৃত্বের জন্যে অবশ্যম্ভাবী শাসনসভার দখল করার হিসাবটা ইংরাজের সঙ্গে এই হিন্দু বেনিয়ারাও বুঝতে পেরেছিল। তাই আগে ভাগেই তারা ইংরাজের সমর্থক 'বেরাদার' হয়ে যেমন যেমন প্রভু একেকটি প্রদেশ দখল করেছে বাঙালী ভদ্রলোক তার জুনিয়র পার্টনার হয়ে সে সে প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা ভারতের মানুষ সাহেব প্রভুদের সঙ্গে এই বাঙালী নেটিভ বাবুদেরও তাদের হুজুর বলে চিনেছে।

ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর মানসিকতার চেহারাটা যদি এই হয় তাহলে এই শ্রেণী-জাত লেখকদের সাহিত্য-ধারণা স্বাভাবিকভাবেই এমনটিই হবে। এ দেশের বৃহত্তর মানুষের পাইকারী অশিক্ষার কারণে সাহিত্যের হাটে লেখক তথা পাঠকের চৌহদ্দি তথাকথিত মধ্য শ্রেণী। যাদের চরিত্রে ইংরাজের প্রতি বিনম্রতে বাদশত এবং টিকে-থাকার জৈবিক তাড়নায় জমিদার কিংবা মধ্য-স্বত্বভোগীর অনুগ্রহে গাঁটছড়া বাঁধা।

আমাদের প্রধান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের কারণেই ইংরাজ-বিরোধিতার বিষয়টি চিন্তাও করতে পারেননি। এমন কি মধ্য শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে কেউ যদি সামান্য সংসাহসও দেখাবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার বিরুদ্ধতা করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ কিংবা মুনারুক্ত বোসেদের জমীদার দর্পণ সাহিত্যসম্রাটের অনুমোদন পায় নি। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীতে তিনি সন্ন্যাসে জনগণের ইতিহাসকে খর্ব করেছেন। অথচ তাবতে অবাক লাগে এই বঙ্কিমই তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' নিবন্ধগুলিতেজমিদারি শোষণের অক্টাক্ষে ধরিয়ে দিয়েও শ্রেণীস্বার্থে জমিদারেরই মুন খেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও একই কারণে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যেছ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'লক্ষিকতার' প্রশংসা করেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আদেশিক ব্যাপ্তির সুবাদে বর্ষ করে ১৯১৫-তে সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ লিখিবার নাইট উপাধি গ্রহণ করতে পারলেন। ১৯১৭-১৮-তে তাঁর প্রিয় বিসিস "ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ"। এমন কি ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি ভাইসরয় লর্ড চেমসফোরডকে উপসংহারে লিখলেন : "... রাজাবিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজ-প্রতিনিধির বলে হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদার-চিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে।...বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অস্ত এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।" [প্রভাতকুমার / রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০] জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরও রবীন্দ্র-নাথের এদেশের ইংরাজ শাসনের চরিত্র সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়নি। ১৯৩১-এ হিজলী জেলে গুলিচালনার বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত তাৎপে পুনরায় জানিয়েছেন "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে"। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র যে পর্বসময়েই এক, এটা জানা সত্ত্বেও কবি বারবার এক ধারার মধ্যে আটকে পড়েন। এরই কারণে শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে-দুঃসাহসিক মুখোশ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেখানে তাঁর সমর্থন মেলেনি। বরং পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুলনায় ইংরাজ যে কত ক্ষমা ও সহনশীল তার পক্ষে ওকালতি উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন ইংরাজ তার শাসনের বৈশদেই তথাকথিত বাঙালী ভদ্রলোকেদের মত সমর্থক পেয়ে ক্রমে সারা ভারতে তাদের শাসনরশী শোষণের জাল বাঁধতে পেরেছিলেন। ১৭৭৭-তে এই বাঙলার মাটিতেই পলাশীর যুদ্ধ নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কাজেই প্রথম থেকে এ দেশে বাঙালী নামক ভদ্রলোকরা ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় বাধা দেননি। কাজেই বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যবাদী নগদত্ত তেমন করে প্রকটিত হবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙলা দেশই তো সেদিন সারা ভারতবর্ষের ক্লীবত্বের চেহারা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবারই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেটা ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কিন্তু সেই আন্দোলন যখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করল তখন রাজনীতিবিমুখ কবি সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে কোটরবাসী হলেন।

এই হল কবির সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মনোভাব। অন্য-দিকে জমিদারি ব্যবস্থার বিলক্ষেত্রে যে তিনি যেতে পারেন নি তার কারণ.তিনি "ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি-অধিকারকে ব্যক্তির-বিকাশের সহায়ক" বলে মনে করতেন। [প্রভাত-কুমার/রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭] বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি পিতার সুযোগ্য নির্বাচন। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা জমিদারি রক্ষণের ব্যাপারেও যে-অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রমাণ রেখেছে যার জন্যে শুধু সিলাইদহ নয়, কুষ্টিয়া, উড়িষ্যার সমস্ত জমিদারির দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর বর্তেছিল। মহর্ষি জমিদারির ব্যাপারে অন্য পুত্রদের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করে আখণ্ড হয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কিংবা গ্রাম্য চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র ভূমিকা লেখার কালেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ছাড়ার কথা ভাবেননি। সোভিয়েতে ঊর্ধ্বমণের অব্যবহিত পরেই কবি আমেরিকার ধর্ণা দিয়ে বসলেন রকফেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথের শান্তিনিকেতনের জন্যে কিছু অর্থভিক্ষার আশায়। বলা বাহুল্য রকফেলার তাকে নিরাশ করেন। অন্যদিকে রায়তের কথার ভূমিকায় তিনি কার হাতে জমিদারি ছেড়ে যেতেন এই চিন্তিয় ব্যস্ত। কারণ লোভী বায়রণ বিজেরাই একেকজন বঙ্গচোরা জমিদারে পরিণত হবে।

শরৎচন্দ্রে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারির বিরুদ্ধে একটি সচিক বক্তব্যরী দৃষ্টির উন্মেষ দেখা যায়। জমিদারেরা যে প্যারাসাইট, কৃষকদের দুর্গতির মূল জমিদার শ্রেণী একথা সচিক জেনেও মধ্য শ্রেণীর মানসিকতার যে সর্বগ্রাসী আকর্ষণ, বিশেষ করে জমিদারশ্রেণীর প্রতি দুর্বলতা, তার থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে তিনি পারেননি।

শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার সেকালে বহন করেছিলেন আরেকজন লেখক। তিনি প্রেমেন্দ্র

ঐতিহ্য বনাম বিপ্লব

দর্পণে (২৪শে ডিসেম্বর ৭৬) কালিদাস সুতুর "বিপ্লবঐতিহ্য গতানুগতিকতা" প্রবন্ধে লিখেছেন, "শুধু ইতিহাস এ কথাই বলে—বিপ্লব যতই আক্রমণাত্মক হোক না কেন—ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে পারে না।"

না, ইতিহাস সে কথা বলে না। ইতিহাস বলে, বিবর্তন সব সময় ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ করে চলে আর বিপ্লব চলে ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে। অপ্রয়োজনীয় ঐতিহ্যকে ধ্বংস না করে বিপ্লব এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। বিপ্লবে নেতৃত্বকারী শ্রেণী ঐতিহ্যকে যতটা অপ্রয়োজনীয়বলে মনে করে ততটা ঐতিহ্যকেই ধ্বংস করে। তাই কোন দেশের সমাজ বিপ্লবের এক স্তরে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি সম্রাটকে ঐতিহ্য ভেবেই গিলোটিনে মাথা দিতে হয়েছে। আবার অন্য দেশে সমাজ বিপ্লবের অন্তস্থলে জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি পুঁজিবাদের পথিক হবার অপরাধে জনগণ ঐতিহ্য ভেঙেই সমালোচনার জর্জরিত করে তাকে সম্মানের সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে। যেখানে বিপ্লবকে ফাঁকি দিয়ে ঐতিহ্য চাতুর্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে পারে সেখানে ঐতিহ্যের কাছে বিপ্লবই পরাস্ত হয়। সেই পরাজয়ের ফলে পরবর্তীকালে বিপ্লব আরও বৃহৎ আকারে দেখা দিতে বাধ্য। বস্তুগত ভাবে যেখানে বিপ্লব যত বেশী অসম্পূর্ণ থাকে সেখানে সেই পরিমাণে পুরনো ঐতিহ্য থেকে যায়। ইংলণ্ড এবং জার্মানীর সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের অস্তিত্বের কারণ বস্তুগতভাবে সেখানে বুর্জোয়া বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা। এই কারণেই ইংলণ্ড এবং জার্মানীর সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের জড়তার তুলনায় ফ্রান্সের জড়তা অনেক কম। আমেরিকার সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য ছাড়াই পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার ফলে সেখানে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুপস্থিত। পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যেটুকু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রভাব সেখানে দেখা যায় তাও অন্তদেশথেকে আগতআমেরিকায়ভূত হয়ে থাকায়। ভারতীয় সমাজ বিকশিত হয়েছে বিবর্তনের পথে তাই আজও ভারতে আদিম উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আদিম সেবাদেবী-আচার অনুষ্ঠান এবং গ্রাম ধারণার এতবেশী প্রাধান্য বর্তমান।

কালিদাসবাবু লিখেছেন, "ঐতিহ্য শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রম শ্রেণীর শ্রেণীগত ঐতিহ্য গড়ে ওঠে সম্পত্তি ও ব্যক্তিমালিকানার সূত্রে। যে সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না সেই সমাজে জাতিগত-শ্রেণীগত ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে অবশ্যই।"

না, বিলুপ্ত না করলে নিজে থেকে কিছুই বিলুপ্ত হবে না। সমস্ত বিশ্বের রূপ পরিবর্তন করে নেবে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর ঐতিহ্যই জাতিগত ঐতিহ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনিশ্চই সমাজে টিকে থাকে যতদিন না আরেকটি শ্রেণী এসে শাসন ক্ষমতা দখল ক'রে তার জাতিগত ঐতিহ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। এই অর্থেই প্রতিটি শ্রেণী সংগ্রাম রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়। তার ফলে ব্যক্তি মালিকানা শ্রেণী এবং রাষ্ট্র বিলুপ্তির দিকে যেতে থাকে। কিন্তু বিশ্বে প্রতিটি জাতির অসম বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ বিকাশের একটা পর্যায়ে উন্নত জাতি অনুন্নত জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে সুরু করে। ফলে উন্নত দেশের আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাহত হতে থাকে এবং অনুন্নত দেশে বিদেশী প্রভুত্ব বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম বিকশিত হতে থাকে। তার ফলে হয় যুদ্ধ নয় বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত কোন দেশে জাতীয় বিপ্লব সমাধা করতে হলে দেশের বিপরীত স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শ্রেণী এবং ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্টের দ্বারাই কেবল সাম্রাজ্যবাদ অনুচরদের পরাস্ত করে জাতীয় বিপ্লব সমাধা করা যায়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে স্বাধীন এবং মুক্ত দেহে বাগে বাগে শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা করে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণী জাতিহিসাবে নিজেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র এইভাবেই নিজেই যেমে শ্রেণী, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্ত করার প্রক্রিয়াটি সুরু হতে পারে। ক্রমে কমিউনিষ্ট পার্টি নিজেই দেশের সর্বহারা জাতিকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করে কমিউনিষ্ট পার্টিকেই বিলুপ্ত করার পথ প্রশস্ত করে। এ সবই হোল শ্রেণী বিভক্ত সমাজে আগতশ্রেণী-ঐতিহ্য বিলুপ্ত করে বিশ্বে একটি মাত্র কমিউনিষ্ট মানব জাতি সৃষ্টি করার পূর্ব শর্ত।

কালিদাসবাবু ভারতীয় ঐতিহ্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে কেবল হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের বর্ণনা করেছেন। কেবল হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ভারতীয় ঐতিহ্য বলে বর্ণনা করাটা হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

পাহাড়, গাছ, পাথরে ঐশ্বরিক শক্তি আরোপ করে মাথা নীচু করা, বিশেষ বিশেষ নদীতে পুণ্য স্নান করা এবং গলাকে মা বলে ডাকার ঐতিহ্য আর্য পূর্ব অথবা আর্য পরবর্তী এনিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু এসব ঐতিহ্য যে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য তা নিয়ে কোন বিবোধ নেই। কালিদাসবাবু এসব ঐতিহ্য বজায় রেখেই বিপ্লবের জয়ধ্বনি করার পক্ষপাতি। কিন্তু ইতিহাস পক্ষপাতহীন, নির্মম। সে বিপ্লবকে দিয়ে এতিহ্যকে ভাঙবেই। একটি বিপ্লবের পরে যে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় তাকে ভাঙার জন্য প্রয়োজন হয় আরেকটি বিপ্লবের। এইভাবে একের পর এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে থাকবে যতদিন সমস্ত ধরণের ঐতিহ্য শেষ না হচ্ছে। একটা বিপ্লব থেকে আরেকটা বিপ্লবের মধ্যবর্তী অবস্থাই হোল গতানুগতিকতা। লোকায়ত হলেও মতাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐতিহ্য হোল রক্ষণশীল শক্তি এবং রক্ষণশীলতার বোঝা মাথায় নিয়ে ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না। তাই যে কোন কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পূর্বপর্ব হোল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত রকম ঐতিহ্যকে খুঁটিয়ে বিচার করা এবং মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ঐতিহ্যকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রকৃত একটি কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করা।

পংকজ চৌধুরী

মতামত

বুদ্ধিজীবীর ফাঁপা চাহিদা

শ্রীঅনিলাস সুতুর বিভ্রান্ত চেতনায় এক বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত ২৪শে ডিসেম্বরের প্রবন্ধ 'বিপ্লব ঐতিহ্য গতানুগতিকতা'। "মনুষ্যসমাজে যতদিন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পৃথক পৃথক ভূখণ্ডের পৃথক পৃথক জাতিসত্তার ঐতিহ্যগত পার্থক্যও থাকতে বাধ্য।" শ্রীসুতুর একথাটা অদ্ভুত। আসলে এক ভূখণ্ডেই ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারা, কারণ ভূখণ্ডের মানুষগুলি শ্রেণী-বিভক্ত। একশ্রেণী হচ্ছে শাসক শুষকে শোষক; অন্যটি শোষিত মানুষের সংখ্যাগুরু শ্রেণী। মানুষের আদিম ভয় ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শোষকশ্রেণী গড়ে তোলে গীর্জা আর ধর্মীয় ঐতিহ্য। অন্যদিকে গীর্জার গিয়ে ঘন্টানাড়া শুনে ইহলৌকিক শোষণ-জ্বালা জুড়োতে চায় অদৃষ্ট বিধাতা, অজ্ঞ-দরিদ্র মানুষ। 'নিত্য-পেষ' পুরোহিতরূপী যে মধ্যশ্রেণী ভাববাদের ঘন্টা নেড়ে কাল্পনিক মরীচিকা সৃষ্টি করে বেড়ায়, অপিচ ঈশ্বর-প্রতিনিধি শাসকের ভ্রান্তনীতি আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নকি গেয়ে আপন-আপন আখের গুছিয়ে তোলে, তারাও মূলত শাসকশ্রেণীরই সেবাদাস, পাঁড় রক্ষণশীল। শোষণধূসর ভূখণ্ডগুলিতে শ্রেণীভেদের এই একই চিত্র, ঐতিহ্য-ভেদের চিত্রও অদ্রূপ। তবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের শ্রেণীবিশেষের মাঝে ঐতিহ্যগত সাদৃশ্য বর্তমান। শোষিত শ্রেণীর যে-অংশ বিপ্লব-সচেতন সে-টি বিদেশী হোমের 'মহান' শোপকে ছেড়ে বিদ্রোহী প্যাটার্নসকেই স্বজনরূপে স্বাগত জানায়। একইকারণে ভিন্নদেশী মার্কস-লেনিন এদেশেও প্রিয়তম নাম। হিমাচল শীর্ষ থেকে চন্দ্রালোকে পা রেখে মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে, দেবলোক একটি দীর্ঘকালীন গুজবের ফল। গঙ্গাস্নানেও তথাকথিত পুণ্য নেই। বিবাহ-আদি অনুষ্ঠানের ধরণাই মীতের অবমাননায়ও নেই পাপ। এই ভাবেই পুরাতন ঐতিহ্যের হচ্ছে ঝাড়াই-বাছাই বর্তমান। পথ হচ্ছে নবীন ঐতিহ্যের। আর এ-সবই হতে পারছে ছোট-বড় বিপ্লবের অসীম ক্ষমতায়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় যিনি অনন্ত সেই মাও-সে-তুঙ বলেছেন যে, সঠিক ধারণা মাত্রই পাস—'সার তা গমিঙ' অর্থাৎ তিন মহান বিপ্লব বা সংগ্রাম থেকে—উৎপাদনের সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম, ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার সংগ্রাম থেকে। সুতরাং সঠিক ধারণাধারী বিপ্লব থেকে 'বৃদ্ধ প্রপিতামহ'-সম ঐতিহ্য 'ওদের ভারী' ও 'অধিকন্তু শক্তিশালী'—একথা মেনে নিলে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম ও তার ক্রম-অগ্রগতিকেই অস্বীকার করা হয় নাকি? যে-পথে বহু মানুষের পদচিহ্ন, সে-টাই যদি ঠিক পথ, তবে তো রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের পথ, পোপ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ পথ, এমন কি চীন-কি-কোচিন যাবার প্রাচীন পাহে-হাঁটা দুর্গম পথকেও পরিহার করা চলে না। আসলে সঠিক ধারণার সৃষ্ট ঐতিহ্যই শুধু শ্রদ্ধেয়। এবং প্রত্যেক যুগেই সঠিক ধারণার কাছে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে দিয়ে ঐতিহ্যকে টিকে থাকার অধিকার অর্জন করতে হয়। নিবিচারে সব ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে বিষ বাড়ুক—এ চাহিদা একান্তভাবেই অসুস্থ, অবাস্তব।

অবশ্য এদেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের লৌকষ বা চাহিদাটাও যে কত ফাঁপা, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পুরুষার্থ'। সেনসর করিয়ে লেখা ছাপাতে হবে, সেনসর-না-হওয়া সংবাদাদি পড়তে পাওয়া যাবে না—এতেই তাঁর মাথন-থোলা-মেম ক্ষোভ, তাঁর গণতন্ত্রী মানসের ব্যক্তি-স্বাধিকার ধর্ব। ত্রিসেনসর-সিপে নাকি 'সৃষ্টিশীল' লেখার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যাজিৎ রায়-

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

'বৃটিশ শাসনের এক যুগ'

২৪শে ডিসেম্বরের দর্পণ পত্রিকাতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পুরুষার্থ' এবং মিহির আচার্যের 'ব্রিটিশ শাসনের এক যুগ' প্রবন্ধ দুটি পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলাম। কারণ একটি স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত মননের অভিব্যক্তি এবং অন্যটি অন্ধ ক্রুদ্ধ বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ। প্রবন্ধের শুরুতেই মিহির আচার্য সুদ নেওয়া সম্বন্ধে যে-যের প্রকাশ করেছেন তা সেকেলে বাতিল মনোভঙ্গি, আজকাল আমরা ব্যাঙ্কে পোস্টাপিসে সাইড ইনসিওরেন্সে সর্বত্র সুদ নিই। যায়, নিলে সুদ দিতে হবে এটা সর্বজনীন বিচার। সুতরাং রামমোহন যে বিশ্বভান ইয়োরোপীয়দের টাকা ধার দিয়ে সুদ নিতেন এতে আচার্য মশায়ের উষ্মা কেন?

সিপাহী যুদ্ধকে তিনি জনগণের ব্যাপক জাগরণ বলেছেন, কিন্তু মধ্য শ্রেণী তাকে পাত্তা দেয়নি বলে তার তীব্র ক্ষোভ। তিনি আরও বলেছেন, সিপাহী যুদ্ধ 'সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে একযোগে আঘাত হানে'। এটা যদি জনগণের ব্যাপক জাগরণ-ই হতো তাহলে তিনি কেন একে সিপাহী যুদ্ধ বললেন? জনগণ মানে কি কোম্পানীর মাইনে করা সিপাহী? মধ্যযুগীয় যুদ্ধ বাণবাদী আমলকে ১৮৭৭-র অস্ত্রাখান ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, কোম্পানীর কর্তাগিরির পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তারা মুঘল সাম্রাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছিল। আচার্য মশায় কী বলতে চান?

আজকাল এক শ্রেণীর বাঙালী যেমন উঠতে বসতে বাঙালীর নিন্দেমন্দ না করলে জলপান করতে পারে না তেমনই এক জাতীয় মধ্যবিত্ত আছেন যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত জাগরণকে খতম না করলে প্রগতিলীল হওয়া যায় না বলে মনে করেন। মিহির আচার্য মশায় কি সেই জাতীয় মধ্যবিত্ত?

সুব্রজিৎ সাহানা

মনীষার অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে

যজ্ঞেশ্বর দেবশর্মা

শরৎচন্দ্র তাঁর এক ভক্তকে বলেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য ; আমরা লিখি তোমাদের জন্য।

তোমরা অর্থে এখানে বলতে পারা যায়, সর্বসাধারণ। আজকের যুগের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে। রবীন্দ্র অনুধ্যান বা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কবিকে যথার্থ উপলব্ধি করা কিছুমাত্র সহজ কর্ম নয়। যেমন ভাবে সহজে শরৎচন্দ্রকে তাঁর অনুপম রচনার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। প্রচুর কেতাবী বিদ্যের অধিকারী বা ডিগ্রিধারী সুপণ্ডিতও তাই দেখা যায়, মূল্যায়নের নামে অবমূল্যায়নই করেন বেশী। আজকের সমাজে এমন মানুষের সংখ্যা দেখার কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মাপকাঠিতে কিংবা অধ্যাপনা বা অন্য কোন সাহিত্যবৃত্তি পেশাগত ভাবে থাকলেও প্রকৃত শিক্ষালাভ নাও হতে পারে। যথার্থ 'শিক্ষা' হচ্ছে অন্য বস্তু। অনেক কেতাবী বিদ্যে থাকলে তা জীবিকার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না বা শিক্ষা তাতে সম্পূর্ণ হয় না।

প্রসঙ্গত বলা যায়, কয়েক মাস আগে মহাজাতি সদনে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসবে জনৈক অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শরৎচন্দ্র যে বড় এবং জনপ্রিয় ছিলেন এমন কথা প্রকারান্তরে বলেছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁর বক্তব্যে বলেন : ষোড়শ শতকে বাংলায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যে মানব প্রেম সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল সারা দেশে, সাধারণ মানুষের জীবনে মিলনের যে আবেগ প্রকাশমান হয়েছিল, তার প্রতিরূপ তিনি যেন দেখতে পান শরৎচন্দ্রে। এখানে তাঁর, মতে শরৎচন্দ্রকে বলা যায় মহাপ্রভুর যোগ্য উত্তরাধিকারী। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই বাংলার মানুষ নন। অর্থাৎ নেই তাঁর মধ্যে শাশ্বত মানব প্রেমের কথা। নেই রবীন্দ্র সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভাবনা। রবীন্দ্রনাথ সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের পরিবৃত্ত। কবি সেই নব্য ধারারই প্রতিভূ।

মোটামুটি ভাবে অধ্যাপক মহাশয় যেদিন যে কথা বলেছিলেন, তার সার মর্ম এই যে, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মানব প্রেমিক কথা মানব দরদী দ্রষ্টা হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সেদিন যাঁদের উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল, তাঁরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। ইতিপূর্বে এই অধ্যাপক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কবিমানসীকেও খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই সব চিন্তার ধারক এবং বাহক যাঁরা, তাঁদের এই অজ্ঞতাকে কি উপেক্ষা করা যায়? কারণ, এঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন নানা ভাবে। এঁদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসলে অনেক ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের ফলন শক্তিটি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কালক্রমে সেখানে চিন্তার জড়ত্ব সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে যেমন অবমূল্যায়ন হয়েছে, ইদানীং শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি জীবন নিয়েও এই জাতীয় অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ নজরুল এক্ষেত্রে তুলনা করাটা নিতান্ত অশোভন এবং অসাংস্কৃতিক মনেরই পরিচায়ক। তার পরে যদি কোনো প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতেই হয়, তাহলে দেখতে হবে যে মানুষটির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তাঁর মনের অভিব্যক্তি বা মানসিকতা কি রকম?

দেখা যাক, শরৎচন্দ্র কবির সম্বন্ধে কি বলছেন। শরৎচন্দ্র কবিকে দেখতেন গুরুর মত। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের সম্বর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য সভায় পুরোধা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : সাহিত্যের আসরে সভানায়কের কাজ আরম্ভ করবার ডাক ইতিপূর্বে আমার এসেছে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি। নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসংকোচে কর্তব্য সমাপন করে এসেছি। কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আরও লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এই গৌরব আমার প্রাপ্য নয়। এ ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয় বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

প্রকৃতই কবির সম্বন্ধে কিছু বলতে কুণ্ঠাবোধ করতেন শরৎচন্দ্র। কারণ, কবি ছিলেন তাঁর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, অত্যন্ত পূজনীয়। সে বিরল শ্রদ্ধা বা পূজার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আজকের অধিকাংশ সাহিত্যিক বা অধ্যাপকের তা সাধ্যাতীত। সেই মানসিকতাও তো আজ অবসিত। পরম শ্রদ্ধার পাত্রকে অশ্রদ্ধা এবং অপমান করাটাই তো আজকের যুগধর্ম। তাই এ হতভাগ্য দেশে প্রায়শই বিচার বিশ্লেষণের নামে মূল্যায়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে জাতির বংশ্য এবং পৈত্য মনীষীদের চরিত্র হননের অপচেষ্টাই বেশী।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে জাপান হয়ে আমেরিকা যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ হেজুনে উপস্থিত হন। পরের দিন অর্থাৎ ৯ই মে তারিখে স্থানীয় জুবিলী হাইস্কুল হলে প্রবাসী বাঙালীরা বিরাট একটি জনসভায় কবিকে সম্বর্ধিত করেন। শরৎচন্দ্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং মানপত্রটি তিনিই রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন : আপনার কাব্যবীণার সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী সত্য-শিব-সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এক বিশাল সৃষ্টির অণু পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছন্ন প্রেম সূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং কোন দেশ বা যুগ বিশেষের নয় সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায় কাব্যে নাট্যে সঙ্গীতে যে মহান আর্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সভার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত। আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্গ উৎসুকে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ গীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার মুমোহন কাব্যবীণার নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক—ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। অপরাহ্নের কথাশিল্পীর উপরোক্ত রচনাংশের অভিব্যক্তি সপ্রমাণ করছে যে রবীন্দ্রনাথ নিত্যকালের দরবারে সমাসীন করি, সেখানে তিনি কালজয়ী। উনিশ শতকের নবজাগরণের কবি তিনি নন। তিনি সর্বকালের এবং সর্বমানবের কবি। আমাদের সনাতন ধর্মের তিনি অন্যতম প্রবক্তা, তাইতো তিনি বিশ্ববন্দিত, বিশ্বকবি। আর তাঁরই কারণে তিনি অপরাজেয় কথাসাহিত্যিকেরও প্রণম্য গুরু। শরৎচন্দ্র সে কথাই সবিনয়ে বলেছেন : আর কোথাও না হোক সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি। কবির সৃষ্টির সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য মাধুর্যের বিবরণ দেওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত। তাও সবিনয়ে সকৃতজ্ঞচিত্তে এবং অকপটে স্বীকার করেছেন শরৎচন্দ্র।

তাহলে সেখানে কবির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা অযৌক্তিক নয় কি। ঋষি কবির ঈশ্বর ভাবনা মহোত্তম সাধনা কিন্তু সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা কবির বহু রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কবিতায়, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, পত্রসাহিত্যে কোথায় নেই? এমন কি নিরন্ন চাষীদের দুঃখে ব্যথিত কবি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখেছেন রুশ বিপ্লবেরও অনেক আগে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে।

শোষিত মানুষের দুঃখে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে তাঁরাজাত্ত বিশ্বকবিকে ঝাড়বার মুখর হতে দেখেছি। এমন কি কৈশোরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর মুক্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কবি মন্ত্রজ্ঞ বলছেন : দেশের জন্য আমার যত কিছু ভাবনা সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করেছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায়নি, আমি বক্তৃতারই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এইজন্য সর্বত্র পদ্য করেছিলুম। আমার সর্বত্র খুব বেশী ছিল না। যতটুকু ছিল তক্তপুষ্টই নিঃশেষে উজাড় করে পদ্যকার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয়নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাশলের মত বেড়িয়েছি পথে পথে। দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্য দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা করে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।... আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিলনা তাই ভাবি। জাতীয় জীবনে প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলুম। শিল্প সাহিত্যের প্রসার চেষ্টা তো ছিলই। পল্লী মঙ্গল, পল্লী সংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাচিত্তা, কুটির শিল্প, কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্য নির্মাণ—আমরা করিনি কি?

এখেন সত্যদ্রষ্টা কর্মযোগী মানুষকে আটপৌরে অর্থাৎক এবং নিতান্ত মেকী চিন্তা দিয়ে আংশিক ভাবে মূল্যায়ন করা, কিংবা তুলনামূলক ভাবে অন্য কোন প্রষ্টার সঙ্গে সমালোচনার অবতারণা অথবা ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রহননের চেষ্টা নিছক শুধু অপচেষ্টারই নামান্তর। কেননা, এই জাতীয় চিন্তা মহোত্তম জাতীয় জীবনের এবং ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন আদর্শের একান্ত পরিপন্থী। জাতীয় জীবনাদর্শের প্রতি যিনি একান্ত অনুরাগী, শ্রদ্ধাশীল তিনিই এইসব মন্তব্যে বিচলিত বোধ করবেন নিঃসন্দেহে। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যায় যে, সম্প্রতি লোকান্তরিত সর্বজনপ্রিয় কবি কাজী নজরুলও তেমনি পূজনীয় মহাবরেণ্য গুরুর মত অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বিশ্ববিকবিকে। আমাদের পক্ষে সেই শ্রদ্ধার পরিমাপ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিনেই কাজী নজরুল অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের মুমধুর মর্মাঘাত ব্যাপারে কাজী নজরুল ছিলেন অত্যন্ত সজাগ এবং অবহিত। তাই জানত কবিগুরুর প্রতি তিনি কোনদিন অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। কেউ সে চেষ্টা করলে কাজী নজরুল তাঁকে যথোচিত তিরস্কৃত করেছেন। অথচ আজকের সাধারণ মানুষ এতখানি অজ্ঞ যে, অকপটে নিঃসঙ্কোচে একত্রে একই মানদণ্ডে বিচার করেন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে। রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী একসঙ্গে পালনের মাধ্যমে নবাসংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসারে আত্মগর্ব লাভ করে থাকেন। কবি গুরুকেও আবার একই সঙ্গে একই মঞ্চে নিষিধায় টেনে আনতে তাঁদের দ্বিধা নেই কিছুমাত্র এমনি সংস্কৃতির অজ্ঞানতা তাঁরা। মোটকথা, এক সাধিক অপসংস্কৃতি এবং অনভ্যস্তার শিকার হয়েছি আমরা। যাঁরা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বলে সবিশেষ চিহ্নিত, সভ্যসমিতিতে জ্ঞানগর্ভ বচনসুধা যাঁরা অহরহ বিতরণ করে থাকেন তাঁদের এক্ষেত্রে বাতুলতা অপরিসীম দুঃখজনক। দেশীয় সংস্কৃতির চেয়ে বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি যাঁরা সবিশেষ আস্থাবান তাঁরা জাতির বরেণ্য মনীষীদের মূল্যায়ন করার অধিকারী হতে পারেন

(সেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাই শ্রমিক শ্রেণীকে ডাক দেওয়া হয়েছে মিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর মেহনতী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে নিয়ে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। দাবিগুলো হল—

(১) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা ও মিসা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তিদান, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মের স্বাধীনতা ও সভা সমিতি ও আন্দোলনের অধিকার সহ নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংবিধানের সেই সব ধারা বাতিল করা যা শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে। ফেলে বন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার :

(২) ছাঁটাই, লোডার, লক-আউট ও লে-অফ বেআইনী ঘোষণা এবং সমস্ত বন্ধ কারখানা চালু করা।

(৩) সুবিধাদানে কাজ করার ও চাকরীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা এবং বেকারদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা করা।

(৪) ৮-৩৩% মূলমত বোনাস পুনরায় চালু করা এবং বোনাস আইন সংশোধন বাতিল করা এবং সর্বোচ্চ বোনাস সীমিত করার ব্যবস্থা প্রত্যাহার।

(৫) প্রয়োজন-ভিত্তিক মূলমত বেতনের ব্যবস্থা এবং বর্ধিত কাজের বোঝা হ্রাস। যেখানে বেতন ও অধিকার কেটে দেওয়া হয়েছে অথবা খর্ব করা হয়েছে তা অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৬) গ্রাম ও শহরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সস্তা দরে সরবরাহ এবং গ্রামাঞ্চলে কর ও জিনিসের মূল্য হ্রাস।

(৭) বৃহৎ মুৎপাদীদের জমি যখন করে দরিদ্র কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ।

(৮) বর্গাদার ও ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষা এবং যেখানে তাদের ফসলের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেখানে অবিলম্বে তাদের ন্যায্য অংশ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) কৃষি শ্রমিকদের রোজ ৮ টাকার নির্দিষ্ট করা এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে তা কঠোরভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা।

(১০) কৃষকের স্বার্থে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি এবং সমস্ত হকারের কর হ্রাস করে কৃষকদের সাহায্য করা এবং বড়া ও খরা কবলিত অঞ্চলের লোকদের সাহায্য দান।

ট্রেন ইউনিয়ন সংগঠকের সভায় সমস্ত শ্রেণীর মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শীঘ্রই মেলা ও রাজ্য স্তরে সভা সমিতি ডাকা হবে।

শিক্ষিকারা বেতন পাচ্ছেন না

(দর্পণের নিজস্ব সংবাদদাতা)

মেদিনীপুর জেলার বাউর নিবেদিতা গার্লস্ হাইস্কুলের শিক্ষিকারা দীর্ঘ একবছর যাবৎ তাঁদের ন্যায্য বেতন ও ভাতা থেকে বঞ্চিত। এই বিদ্যালয়টিকে অনুমোদন দেওয়ার আগে শিক্ষিকারা যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করেছিলেন এখন উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী তা বিস্মৃত হয়েছেন। জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী ও অভিভাবকেরা নির্মম শিক্ষিকাদের উপর অযথা জুলুমবাজী করছেন।

কিছু শিক্ষিকা এই প্রতিবেদনের কাছে এমনও বলেছেন যে যারা দিন মজুর তাদের আর্থিক অবস্থা এই শিক্ষিকাদের অবস্থার থেকে ভালো। রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? এটাই তাঁদের প্রশ্ন।

লেখক শিল্পী সম্মিলনী প্রতি বাদ

রাণীগঞ্জ বেঙ্গল পেপার মিল কারখানায় শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবত বেতন পাচ্ছেন না, এবং মালিকপক্ষ বহু শ্রমিককে ছাঁটাই করার কথা অথবা কারখানা বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন জেনে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও মালিকপক্ষের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করছে। কাগজের অনটন ও দুর্মূল্য ইতিমধ্যে সাহিত্য শিল্প রচনাও প্রকাশনার পক্ষে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে আবার বেঙ্গল পেপার মিলের বন্ধ কাগজ-কারখানায় শ্রমিকদের বঞ্চিত রাখা এবং উৎপাদন বন্ধ করার কল্পনা জনবিরোধী। সরকার এর প্রতিবিধান করতে পারেন। আমরা প্রতিবিধানের দাবী জানাচ্ছি।

এই সঙ্গে আমরা আরো অভ্যন্ত যেসব নিম্নে ও কারখানায় ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয়েছে বা কারখানা লোডার বা লকআউট করে উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও উপযুক্ত প্রতিবিধানের দাবী জানাচ্ছি।

রাজ্য রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই সভাতেও প্রবীণবাবু গঙ্গীবাবুরা দলের বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন।

এদিকে এই দুই সভায় বক্তব্যে অপর পক্ষ বিচলিত হয়েছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস, গোবিন্দ নস্কর প্রমুখ পালটা আঘাত হানবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আগামী ন'ই জানুয়ারী তাঁরা ক্যানিংয়ে এক সভার ডাক দিয়েছেন। রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা টেস্ট ম্যাচের ফাঁকে ফাঁকে এনিয়ে শলাপরামর্শও করছেন। ছ'ই জানুয়ারী ক্রিকেট খেলার পর চুকে গেলে আর এক খেলা শুরু হয়ে যাবে বলে তথাভিজ্ঞ মহলের অনুমান।

ধনীয়ার অবমূল্যায়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কি? যাঁদের সত্য উপলব্ধি নেই, সত্যতা নেই, নেই কিছুমাত্র বর্ষবোধ, উত্তরণের সাধনা; তাঁরা যদি বরেণ্য মনীষীদের বিচার করতে বসেন, তাহলে যে বিচার শুধুমাত্র প্রহসন হয় না, হয় তা সবৈব অপোগণ্ড এবং আপত্তিকর।

তাই মনে হয় মহাকবি আজ জীবিত থাকলে নিবন্ধের বহুতো সভ্যতার নিষ্ঠারুণ সংকটের কথা। বাঙালীর নাগরিক অবক্ষয়ের কোথা ইতিবৃত্ত। হায় আজকের এইসব আত্মদর্পণ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী, এই জাত বুদ্ধি বিচার অহমার নিয়ে তোমরা আত্মগর্ব, আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাও? তোমরা যে আজ প্রকৃতই সর্বহারা। আত্মবিশ্লেষণে আপন চরিত্রের মূল্যায়ন আগে কর তারপর অধিকারী হবার যোগ্যতা অর্জনের সাধনা করতে হবে অন্যথায় সব কর্ম শুধু অপকর্ম হয়ে যাবে।

ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেশ—আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, চীন কেউই ক্রিকেট খেলাকে গ্রহণ করেনি। তার মানে ক্রিকেট পুরোপুরি ইংরেজদের খেলা। ইংরেজরা তাদের উপনিবেশে এই খেলা চালু করেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুগের অবসানে ইংরেজরা এখেন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে রেখে গেছে ক্রিকেট খেলা। আমরা দাস মনোভাবাপন্ন "নেটিভ"রা এখনো তাতে মেতে নির্বিকার আনন্দে আছি।

মিহির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮'০০
পৃথিবীর বয়স	১৪০০
জীবন নিরবধি	১৬'০০
ঘরে ফেরারদিন	৫'০০
দিবস বিভাবরী	৫'০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬'০০
আলোর সহোদর	৪'০০
পারাবারের তীরে	১০'০০

শুকসারী ১৭২।৩এ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক ষ্টোর্স। কথা ও কাহিনী।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫'৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর উদ্যোগে

আলোচনা সভা

: বিষয় :

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের সমস্যা

স্থান কে.কে.সেন হল

তারিখ : ৮ই জানুয়ারী '৭৭ শনিবার

সময় বিকাল ৫টে

আলোচনা করবেন :

শ্রীঅন্নদাশংকর রায়

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য

সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে

Regd. No. WB/CC-3?

PRICE 40 Paise

অনুল্লেখ্য প্রহসন 'অঘটন'

ভানুসিংহ

কাশী বিশ্বনাথ মন্দের বর্তমান নাটক 'অঘটন' রসমূলের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন বীরু মুখোপাধ্যায়। জানেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা। প্রহসন অবশ্যই হাসির খোরাক যোগাবে। কিন্তু যে নাট্য পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য প্রকৃতই উপভোগ্য হয়ে ওঠে সেই হাসির খোরাক জোগায়, তার সংগঠন ও উপস্থাপনার কোন বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ চাতুর্য লক্ষ্যে পড়ে না। তুচ্ছ অভিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গ নিয়ে জোর করে হাসাবার চেষ্টাকে ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে? যদিও হাসির উৎস বিচ্ছুটা অভিনয়জা ত অত্যাত্যবিওয়ায়, তবুও সেটা কখনই নির্বোধ অসামঞ্জস্যের নয়। কিছু কৃষ্টকল্পিত দৃশ্যসমাহার ঘটিরেও অকারণ হাস্যকর বাচালতা দেখিয়ে দর্শককে কিছুক্ষণ হাসানো যেতে পারে কিন্তু কখনই উপভোগের তৃপ্তি দেওয়া যেতে পারেনা। অথচ পরিবেশিত নাটকটির মধ্যে কাহিনীর যে রূপটির সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যেই ছিল প্রহসন রচয়িতার চিহ্ন। শুধু নাট্যরূপ দানে ও মঞ্চরূপে অতিরিক্ত কৌতুক সৃষ্টির আতিশয্য রসসৃষ্টির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

স্ত্রীকে ট্রেনের কামরায় তুলে স্বামীর ট্রেনে চড়তে না পারা, ট্রেনসেই হঠাৎ সেখা এক বান্ধবীর সংগে স্বামীর গন্তব্যস্থলের দিকে যাওয়া করা, পথিমধ্যে ট্যাক্সি খারাপ হয়ে যাওয়ায় এক পান্থনিবাসে বাধ্য হয়ে স্বামী স্ত্রী রূপে উভয়ের রাত্রিযাপনকে কেন্দ্র করে নাটকটির কৌতুক জমিয়ে তোলার নিশ্চয়ই অবকাশ ছিল। কিন্তু প্রথম দৃশ্য থেকেই কৌতুক সঞ্চারের অতিসহজ প্রবণতার ফলে ও অকারণ দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিরক্তি উৎপাদনই শুধু করে। রসসৃষ্টি সম্ভব হয় স্রষ্টার পরিমিতি জ্ঞানটুকুর প্রকাশ যদি ঘটে। কিন্তু এখানে সবকিছুই যেন অপরিমিত।

সুশোভন ও অনিতার বিবাহ প্রেমসঞ্জাত। অনিতার রঙ্গলা মা স্বয়ংপ্রভা সুশোভনের বাড়ির পরিবেশ পছন্দ করেন না। স্বামী তাঁর হাতের বুঠোয়। এই আত্মম্ভরী স্বয়ংপ্রভা আর সদাশিব সুশোভন—এই প্রকৃতিগত বৈষম্যীতে নিশ্চয়ই মজা আছে। কিন্তু মাত্রাছাড়া আচরণে সেই মজার অনেকটাই তো নষ্ট হয়ে যায়। যে ভাবে সুশোভন অনিতাকে ট্রেনে তুলে নিজে ট্রেন ফেল করে ও বান্ধবী সান্ধনার সঙ্গে পান্থনিবাসে দৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, তা কিন্তু স্বাভাবিক যুক্তিকে হার মানিয়েই ছাড়ে। এখানে শিল্পীর দোষ অবশ্যই নেই, নাট্যরূপের শিকার হয়েছেন শুধু। এভাবেই রাজেশ্বর চরিত্রেও অনংগতিদেখা দিয়েছে। বিষয় অধ্যাপকটিকে তো প্রথমে ছিটগ্রস্ত হিসেবেই ধরেছিলাম। পরে যেটি তিনি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। স্বয়ংপ্রভাও একই ধারায় বিসর্পন। অথচ একটু মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিলে এই চরিত্রই মঞ্চে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু 'অঘটনে' তা আর ঘটল না।

ট্রেনসের দত্ত প্রসংগটা পাবেন। স্বয়ংপ্রভা আর সদাশিবের মোটর সাইকেলে বাধিত হবার দৃশ্যটিকে জোর সেনের আলোর যাদু আরো চমৎকৃত করে। সংগীত পরিচালনায় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন নৈপুণ্যই তেমন উল্লেখ্য নয়। নির্দেশনার জানেশ মুখোপাধ্যায় আরও সতর্ক হতে পারতেন। দৃশ্যগুলি অত্র দার্ঘস্থায়ী কেন? কেন অযথা কৌতুক সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততায়? তবে এরথা স্বীকার করতেই হবে, অভিনয় শিল্পীদের কোন নিষ্ঠারই অভাব নেই। সকলেই অভিনয় করেছেন জোর কদমে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুশোভনরূপে অরুণকুমারের নাম। তিনিই বলতে গেলে নাট্য কৌতুকের প্রাণ। স্বয়ংপ্রভা রূপে গীতা দে উঁচু পর্দার একটি টাইপ চরিত্র উপহার দিলেন। ফল্গু চরিত্রে দেবী চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবেই নজরে পড়েন। সান্ত্বনার ভূমিকায় বাসবী নন্দীও অভিনয় সুন্দর। অনিতারূপে নবাগতা মধুলা দেবীকে সুন্দর মানিয়েছে। আর ভাল লাগে জানেশ মুখোপাধ্যায়ের সদারঘটকে।

নান্দীকারের 'সওদাগরের নৌকা'

(দর্পণের সমালোচক)

নান্দীকারের নবতম প্রযোজনা সওদাগরের নৌকা নাটক (অভিজেৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা রাধারমণ ভাণ্ডারী) একথা অনস্বীকার্য যাজ্ঞাদলের অভিনেতা-প্রসন্নময় ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। কী করে এই অ্যাক্টিভান অভিনেতা তাঁর শিল্পীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন তার বাস্তব কোথো পরিপ্রেক্ষিত নাটকে উহ্য। সুতরাং মনে করতে হয় এই চরিত্রের পরিধিটি নেহাতই ব্যক্তিক, যেখানে সাধারণ দর্শকের কোথো সহানুভূতি জাগাবার অবকাশ নেই যেমন সহানুভূতি ছিল না তাঁর সন্তান কালোর। বস্তুত যাত্রা জগতের বাণিজ্যিক কাটকাবাজির ফলেই যে প্রসন্নর এই মানসিক বৈকল্য তথা বিচ্ছিন্নতা বোধ, এমন ইঙ্গিতও নেই নাটকের পরতে। তাহলে প্রসন্নর এই পরিণতির জন্য দায়ী কে? দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ চাঁদ সওদাগরের চরিত্রে বিপন্ন অভিনয়ের কারণে যখন তাঁর ভাক পড়ল প্রসন্ন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি কী তাঁর অভিনয় শক্তি ফিরে পেলেন? আবার কী তিনি দল বাঁধার স্বপ্ন দেখছেন? দুরন্ত বিপর্যয়কর অবস্থার আরেক দল থেকে তাঁর ডাক এল। না, চাঁদ সওদাগরের ভূমিকার নয়, সোহাগালোর কমিক চরিত্রে। দর্শক আশ্বস্ত হলেন সেই কমিক চরিত্রেই তাঁর সওদাগরের নৌকা ভালালেন।

এবং নাটকও শেষ।

যদ্যত নাট্যকার কী বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন তা প্রসন্নর কাটা কাটা কাথিক সংলাপে যেমন চরিত্রের স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলানোর তেমনি প্রয়োজনীয় রূপগ্রহণের পক্ষেও নেহাতই উপযোগ। কারণ বানিজ্যের কালো হাত যে যথার্থ শিল্পী প্রতিভার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে এমত মহৎ বক্তব্য এই নাটকে অনুপস্থিত। কার্যত প্রসন্নর চরিত্রের ভঙ্গেও কোনো মমতা প্রদর্শন করবার সুযোগ নেই।

ফলে নান্দীকারের নবতম প্রযোজনা নাট্য জগতের কোনো বাস্তব অবস্থাকে সাক্ষ্যরেখে মনে কোনো দাগ কাটেনা। শুদ্ধ মৌখিক নাটকেপনার পর্যবসিত হয়। স্বীকার করতে দুঃখ নেই নাটকের মতন শক্তিশালী মাধ্যমকে আমরা সামাজিক মানুষের ঔদাসীন্যকে জাগ্রত করবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি। দুরন্তর জনসাধারণের বোধশক্তির বাইরে তথাকথিত নাট্যযোদ্ধী ও নাট্যকেপনার বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থেকতে চাইনে। দুর্ভাগ্য এই যে, নান্দীকার গোষ্ঠী তাঁদের অসাধারণ প্রযোজনার ক্ষেত্রেও এই দায়ীকে মেনে চলেননি।

এই নাকে প্রসন্নর ভূমিকায় অভিজেৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ই বৃথা হয়ে উঠেছে, যেহেতু এই নাটকে তিনিই নবেনতা। প্রসন্নর স্ত্রীর ভূমিকায় পাকজা বসু যথাযথ। কালোর ভূমিকায় ও পরিচালনার রাধারমণ ভাণ্ডারীর নাটকের প্রয়োজন মিটিয়েছেন মাত্র। প্রসন্নর বন্ধু প্রাক্তন অভিনেতা অরুণ চট্টোপাধ্যায় শুদ্ধ অবকাশে শক্তির পরিচয় রেখেছেন।

মতামত

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বৃণাল সেন-কথিক ঘটকের কি প্রধান করেন নি যে, প্রি-সেনসরশিপ দেওয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের পুষ্টিশীলতা অনাহত? এবং রবীন্দ্রনাথক সাক্ষ্য সেবেন যে, নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিধির আওতায় থেকেও 'দেনের মতো' নাটক লেখা গেছিলো। আসলে বৃটিশ-উপনিবেশলাভ বুদ্ধিজীবীদের গণতন্ত্র-বোধটা কোনো-কালেই স্বচ্ছ নয়। সেনসরশিপ-বাক্-স্বাধীনতা ইত্যাদি ভালা-ভালা বিষয় নিয়েই এদের শুরু-গন্ডীতুনিনাদ। দীর্ঘ মানুষের আর্থিক দাসত্ব মোচনে অক্ষম বলেই, ইংরেজ সাহিত্যিক কয়েদার যে-গণতন্ত্রকে করুণা করেছেন দুটিমাত্র 'চীচার্স' দিয়ে, তারই প্রবর্তক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারকে অনুনাসকর 'থ্রী চীচার্স' দিতে চলেছেন, কারণ "বেচা ভালো, সেইটেই ইংরেজরা আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে।" সেই সঙ্গে ইংরেজনির্যাতনের শিকার যখনেই জনসাধারণ সম্পর্কে চরম অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেও তাঁর আটকায় নি। ইংরেজের দেওয়া এই মহান গণতন্ত্র ধ্বংস হলে নাকি "জনসাধারণ এর জন্যে অশ্রুপাত বা রক্তপাত করবে না। ওরা যোঝে ব্লেড আর সার্কাস।" অতঃপর পাকা গণতন্ত্রী হিসেবে তিনি যাজ্ঞব্য-জায়া মৈত্রেয়ীর চঙে বলে উঠেছেন, "কি করব আমি এসব নিয়ে যদি বাক্ স্বাধীনতাই না থাকল?"

কিন্তু বাক্-স্বাধীনতা নিয়েই বা কি করার আছে এঁদের? আজীবন সে-সুযোগ পেয়েও এরা কি সমাজের যে বৃহত্তর অংশ বাস-বাসা ব্লেড থেকে চিরবঞ্চিত, তাদের প্রণাধে করার কথা কখনও ভেবেছেন? বা তাদের আর্থিক-দাসত্ব-মুক্তির পথ-নির্দেশ করেছেন? যা-কি তাদের অজ্ঞ অন্ধ-অসহায় জেনেই বলতে সাহস পেয়েছেন, "লোকে যদি সমাজসত্য চায়, তো সমাজতন্ত্রই হবে।" কিন্তু ভালো জিনিস চাইলেই যেখানেও কি বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য শেষ? স্বাধীন ফ্রান্সের মহান বুদ্ধিজীবী রম্যাঁ রলাঁ তো সম্বর্পে ঘোষণা করেছিলেন: "আমি স্বাধিক-শোধিত-নির্যাতিতের সেবক..... মনের সম্পদ দেবার আগে আমি তাদের খাদ্য, ভাদ্য-বিচার ও স্বাধীনতা দিতে বাধ্যবদ্ধ। বুদ্ধিজীবীদের মুখোশ-মুখবিহীন অংশীদার আমি, সমাজকে সক্রিয় সাহায্যদানের ক্ষমতা আমার আছে। আর ক্ষমতা আছে বলে কর্তব্যও আছে। তাই আমাকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করে তুলতে হবে, সমাজ-প্রত্যাবর্তনের সুযোগ খুলে দিতে হবে।" আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু ভাত-কাপড়ের অভাব-বেদনা বুঝতেই চান না, তাই তাঁদের মুখে 'not by bread alone'-এর বিলাস। বাঁচার আগিদে ছুকার ছাড়া এঁদের কাছে শূন্য। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাই বলশেভিকদের নিবিচারে 'মানুষখেকো' বলে গাল পেড়েছেন। অনেকে ভাত-কাপড়ের দাবীর মধ্যে এমন করে রাজনীতি আবিষ্কার করেন, যেনো ওটা একটা ঘৃণ্য বস্তু। অথচ এঁরাই আবার রক্ষণশীল রাজনীতিকের নিষ্ঠাবান সেবক, অপিচ সমানাধিকারের রাজনীতির পরম বিষ্ণুক। অবশ্য কখনও যুক্ত দিতে পারেন না বলেই এঁদের গালমন্দ-মন্তব্যগুলিকে অশ্রদ্ধা করা সহজ হয়।

নির্মল স. হা.

আকাশবাণীর কৃষি বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আকাশবাণী কলকাতার কর্তাদের দুর্ব্যবহারের কথা মাঝে মধ্যে নানা লোক আনাদের জানিয়ে যান। অভিযোগ পেয়ারের লোকদের প্রোগ্রাম দেওয়া সম্পর্কে। একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রোগ্রাম দেওয়ার অভিযোগও শোনা যায়।

কদিন আগে আকাশবাণীর কৃষি দপ্তরের কর্তা প্রবীণতমদের যে মহাশয়ের কাছে দুবলী জেলার চাষীভাই এক নম্বর ব্লক মনাচে কৃষি ও শিল্প মেলায় আমন্ত্রণ জানাতে এসে কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেই কথা আমাদের জানিয়েছেন মনাচ কৃষি মেলার অন্যতম হালদার। শ্রীহালদার এপীপনাবুকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি বলেন আপনাদের মেলা টালো বোগাস মশাই। ওসব বাজে আমগায় গিয়ে এনারজী লস আকাশবাণী করে না। আনন্দবাজার ঘুগান্তর-ভালালেরে বোতল টোতল থাকলে কিছু পাবলিসিটি লবেন সে যান।

শ্রীহালদার এই প্রতিবাদ করলে তাঁকে যর থেকে বার করে দেওয়ার ছমকী দেওয়া হয়।

তিনি আকাশবাণীর ডিরেক্টরকে একথা জানিয়েছেন। বেলার উদ্যোধক গুরুপদ খান (মন্ত্রী) পৃষ্ঠপোষক মহম্মদ সফিউল্লাহ এম, এল, এক্ষে জানানো হয়েছে।

সম্পাদক—বীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মহ সেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৪ই জানুয়ারী '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

সি পি আই নতুন সুরে কথা বলছে কেন ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার"—এই শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সি, পি, আই-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র সাপ্তাহিক নিউ এজ-এর ৯ই জানুয়ারীর সংখ্যায়। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য এই :

"ভারত একটি বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। সমস্যাও অনেক। এমন একটি দেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা তর্কাতীত। কিন্তু এই শক্তিশালী সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার হতেই হবে।..... আমরা শিক্ষা পেয়েছি এবং বাস্তব দৃষ্টান্তও আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, ক্ষমতার মধ্যেই আমাদের মহান [illegible] করতে হবে।... কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজন স্ব স্ব এক্তিয়ারের মধ্যে শক্তিশালী রাজ্যসমূহ—এমন রাজ্যসমূহ যারা গণতন্ত্র এবং দেশের ঐক্যে বিশ্বাসী।...আমরা কখনও গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী সরকার পেতে পারিনা যদি প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহ প্রদানের কথা ছেড়েই দিলাম, গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও রীতিনীতি লঙ্ঘনকে আমরা উপেক্ষা করি। ...উন্নয়নশীল দেশে জাতির পুনর্গঠনের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি অসম্ভব।"

যদি নেওয়া চলে, প্রবন্ধটি সি, পি, আই-র কেন্দ্রীয় কমিটির মত বহন করে। কিন্তু সি, পি, আই কী চায় ?

রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা

[illegible] সালে [illegible] কমিশন [illegible] প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভয়াবহ। [illegible] ছাড়া [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে গরু-[illegible] একটি সুন্দর নাম। কিন্তু নামে [illegible] কোন ওজনা... প্রকাশ পায় না। [illegible] ছিটেফোঁটা [illegible] উত্তর কলকাতার চীৎপুর অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের [illegible] এই ছিটেফোঁটা সাহায্যে ১০০ জন ছাত্র পড়ে এবং [illegible] রাস্তার কাছে বড় রাস্তার ওপর বিদ্যালয়টি অবস্থিত। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ১০০ ছাত্রের জন্য একটি মাত্র ঘর। স্বাভাবিকভাবে অনেক ক্লাস প্রায় নিয়মিত পাশের ফুটপাথে বসে। ফলে যাচ্ছেতাই পঙ্কে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। শিক্ষকরা অবশ্য সে সম্পর্কে সচেতন। সেই জন্য তারা ফুটপাথের যে বিশেষ অংশে ক্লাস হয় ঠিক সেই

(সেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

গণতন্ত্রি সংবিধান সংশোধনের জন্য যে সব বিল পার্লামেন্টে পাশ করেছে এবং যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নতুন নতুন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সি, পি, আই কি তার বিরোধিতা করতে চাইছে ? সংসদে এবং রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভার সংশোধনীগুলি গৃহীত হওয়ার সময় তো সি, পি, আই, এমন সুরে কথা বলেনি। বরঞ্চ তার পক্ষে সমর্থন করেছে এবং পক্ষে ভোট দিয়েছে। গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও রীতিনীতিকে কোথায় আঘাত দেওয়া হয়েছে ? যা কিছু করা হয়েছে সবই তো হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে। আজ নতুন সুরে কথা বলার কারণ কি এই যে, প্রধানমন্ত্রীও সি, পি, আই-র সমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যে।

সি, পি, আইকে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (সেলফ-ডিটারমিনেশন অব ন্যাশনালিটিস) সম্বন্ধে কী বলেছিল, অতীত দিনের সে সব কথার উল্লেখে প্রয়োজন নেই। প্রায় হালে, ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সি, পি, আই যে অভিমত প্রকাশ করেছিল, তার অভিমত কি এখনও তাই আছে, অথবা বদলেছে ? বদলে থাকলে, তার বর্তমান অভিমত কী এবং ১৯৬৮ সালের সঙ্গে আজকের পার্থক্য কোথায় ?

১৯৬৮ সালে পাটনায় সি, পি, আই-র অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত "রাজনৈতিক প্রস্তাব" এবং "রাজনৈতিক প্রতিবেদন" এই দুইটি দলিলে উল্লিখিত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায় তখন "বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মোর্চা" গঠনের জন্য সি, পি, আই যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তা এই :

"গণতন্ত্র হরকা, সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন —পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব এবং বিহারের যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির পতন ঘটিয়ে সংখ্যালঘু সরকার গঠন এবং এইসব রাজ্যে ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এই প্রচেষ্টার উদাহরণ। সকল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য ভারতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব এবং বিহারে যে গণ আন্দোলন চলছে তার সহায়তা।

"কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সারা ভারতে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন।

"যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের জন্য সংগ্রাম যার উদ্দেশ্য হবে : কেন্দ্রের হাতে রাজ্য সরকারসমূহের কাছে হস্তক্ষেপ করার যে অত্যধিক ক্ষমতা আছে তার অব-

(সেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদে এ্যাড হক ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস কমিটি ও ছাত্র পরিষদ শিগগির ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। দর্পণের সংবাদদাতা নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই সংবাদ জানতে পেরেছেন।

এ সম্পর্কে জানা যায়, যুব কংগ্রেস কমিটি ও ছাত্র পরিষদের বর্তমান কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে এ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করা হবে। সম্প্রতি দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে এক উচ্চ-পর্যায়ে আলোচনার পর কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যায়।

ছাত্র পরিষদের এ্যাড কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে শ্রীরূপ ভট্টাচার্যের নাম শোনা যাচ্ছে। যুব কংগ্রেসের প্রস্তাবিত এ্যাড হক কমিটিতেও নতুন মুখ দেখা যেতে পারে বলে মনে করা যাচ্ছে।

তবে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের বর্তমান প্রথম সারির নেতাদের যে ঐ দুই এ্যাড হক কমিটিতে রাখা হবে না কেন্দ্রীয় নেতারা নাকি তা সাফ সাফ বলে ফেলেছেন।

সি পি আই-র প্রতি সি পি এম পলিট ব্যুরোর আহ্বান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগে সি পি এম নেতৃত্ব অভীকার করেছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পলিট ব্যুরোর সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৭১-৭২ সালেও পার্টি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এই দল নীতিগত বিচ্যুতির স্বীকার হয়নি বলেই এখনও জনগণ এর প্রতি আস্থাশীল।

সি পি আই-এর নেতা ও কর্মীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে সি পি এম নেতৃত্ব বলেন যে, আপনারা শ্রেণী সমঝোতার নীতি পরিত্যাগ করুন, শ্রেণী সংগ্রামের পথে আসুন এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।

সি পি আই সম্পর্কে শাসক দলের আক্রমণাত্মক প্রচারের উল্লেখ করে সি পি এম নেতৃত্ব বলেন যে, বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য সি পি আই বিভেদমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং শাসক দলের সঙ্গে মিলে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু সি পি আই যখনই সরকারের কোন কোন নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে তখনই তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু হয়েছে।

সমাজতন্ত্র ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র আসতে পারেনা

—অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

গত শনিবার স্টুডেন্টস হলে আয়োজিত এক সভায় প্রখ্যাত আইনজীবী অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, সমাজতন্ত্র ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের একটি অংশ।

এই সভার আয়োজন করেছিল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী। সভায় বহু লেখক শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সৌরীন্দ্রিত্য করেন জ্যোতি ভট্টাচার্য। বক্তা ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী ও অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। আলোচ্য বিষয় ছিল : বিশ্বে গণতন্ত্রের সমস্যা।

এই সভায় অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, গণতন্ত্রের সঙ্গে মৌলিক অধিকারকে এক করে ফেলা উচিত নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে পূর্ণ গণতন্ত্রের স্বাদ জনগণ কোনদিনই পায় না। কিন্তু ফেটুকু সীমাবদ্ধ সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাদ জনগণ পাচ্ছিলেন তাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

(সেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা হরণ

অবশেষে শ্রীলঙ্কায়ও প্রাক্ সেন্সর ব্যবস্থা চালু হল। সংবাদে প্রকাশ, জরুরী আইন অনুসারে ১৫ই জানুয়ারী থেকে সমস্ত সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, মাসিক পত্র, প্রচার পত্র, পুস্তিকা ও অন্যান্য সর্বপ্রকার প্রকাশনা সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আদেশের আওতায় আনা হল। এই দিন থেকে সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আদেশ চালু হয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় গণতন্ত্রের একটি বাহ্য কাঠামো বজায় করা হল। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ যারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারা অনেকেই ধীরে ধীরে এই পথ থেকে সরে আসছে। সংসদীয় গণতন্ত্র দেশের প্রতিটি মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও চাকরীর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। সেখানে একদিকে পর্বতপ্রমাণ সম্পদ এবং সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা একশ্রেণীর কুক্ষিগত, অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও কতকগুলো নাগরিক অধিকার স্বীকৃত। যদিও গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সেখানে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ কোন অধিকার নেই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার ছাড়া।

কিন্তু শাসক শ্রেণী ক্ষমতা হারাবার ভয়ে প্রচণ্ড শঙ্কিত। কেননা যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা ক্ষমতাসীন সেই ব্যবস্থা জনগণের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন ও প্রচার চালাচ্ছে, সংবাদপত্রগুলোও সমালোচনামুখর, আদালত মাঝে মাঝে সরকার বিরোধী রায় দিয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় সমস্ত জলোট পালোট হয়ে যেতে পারে। তাই জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও প্রাক্-সেন্সর ব্যবস্থা চালু করে এদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

শোষক ও শাসক শ্রেণী যুগে যুগে ভাল ভাল কথা বলে জনগণকে ধোঁকা দিতে চিরকালই ওস্তাদ। তাই সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়। বলা হয় সমস্ত অধিকার হরণ করা হল জনগণের স্বার্থে, সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করার স্বার্থে। কিন্তু এঁদের বলে দেওয়া দরকার যে, জনগণ বোকা নয়। তাঁরা জানেন, বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো তাতে সমাজতন্ত্র আনা যায় না এবং আমূল পরিবর্তন ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।

ধর্মঘট ও আন্দোলনের মধ্যে ভারমান শ্রীমতী বন্দরনায়েক স্বাধীনতা হরণ করে বাঁচতে চাইছেন।

॥ মতামত ॥ রাস্তাঘাটের অভাব

জেলায় জেলা পরিষদের মধ্য দিয়ে রাস্তাঘাট তৈরী হয় বলে শুনেছিলাম। এখন দেখছি সরকারী দপ্তরে চিঠি দিলে উত্তর পাওয়া অসম্ভব। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানায় মশাট এক নম্বর ব্লকে মশাট ধাঁরুপুর রাস্তা থেকে যে পথ সোজা চুটেছে তার গা বেয়ে রাস্তা ঘোড়া শহীদ আজানা ছুঁয়ে চলে গেছে বাদপুর ইছাপুরের রাস্তার ধারে।

ঐটুকু রাস্তা একের চার মাইল হবে না। অথচ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করে উত্তর পাইনি। গ্রামের লোকের পথ চলার কষ্টও বাড়ছে। এই সঙ্গে বাদপুর মাদপুর পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামতও দরকার। বর্তমানে অঞ্চল পঞ্চায়েত এর ভারপ্রাপ্ত। তাদের গাঁটে কড়ি নেই। সাহায্য কে?

তাই আমরা এ্যাডমিনস্ট্রেটর হুগলী জেলা পরিষদ, পি ডব্লু ডি মন্ত্রী তোলা সেন মহাশয়কেও লিখেছি। জানি না কবে কর্তৃপক্ষের কাছে সাড়া পাবো। সরকারী দপ্তরে চিঠির জবাব না দেওয়া কি জরুরী অবস্থাতেও অপরাধ নয়।

সাজেদুল হক চৌধুরী

সহযোগীর সম্পাদকীয়

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের চেষ্টা ব্যর্থ

কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৭৬ সালে দ্রব্যের পাইকারী মূল্যসূচক ৮·২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী তথ্যে জানা যায়, ১১৭৬ সালের (১৯৬১-৬২কে ভিত্তি বছর ধরে) ২৫শে ডিসেম্বর পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১৫·৮ পয়েন্টে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই পাইকারী মূল্যসূচক ছিলো ২৯১·১ পয়েন্টে অর্থাৎ বিগত এক বছরে পাইকারী মূল্য সূচক বেড়েছে ২৪·৭ পয়েন্ট বা আনুমানিক ৮·২ শতাংশ। এই সময়ে চাহাটি দ্রব্যের দাম সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চাহাটি দ্রব্য হলো: ভোজ্য তেল, রেড়ির তেল, তেলবীজ এবং ঘইল। ভোজ্য তেলের পাইকারী দাম সবচাইতে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোজ্যতেলের পাইকারী মূল্য সূচক ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিল ২৬৮·৪ পয়েন্ট, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭১ পয়েন্টে। খাদ্যশস্য এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দামও এই সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিলো ৩২০·৩ পয়েন্ট। এবার তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩৪·৩ পয়েন্টে। আর শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পাইকারী মূল্যসূচক বেড়েছে ৩২·৫ পয়েন্ট।

মুদ্রাস্ফীতি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা কদর্য রূপ। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে এই মুদ্রাস্ফীতি তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে দ্রব্যের পাইকারী মূল্যসূচক ছিলো ২০৭১ পয়েন্ট। এক বছর পরে ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৪·৩ পয়েন্টে। ১৯৭৪-৭৫ সালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩১৩.৭ পয়েন্টে। ১৯৭৫ সালে মুদ্রাস্ফীতি রোধের নামে সরকার থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। বলা বাহুল্য, এর ফলে শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। এই সময়ে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হলো: বর্ধিত মহার্ঘভাতা ও মজুরির বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প চালু; মহার্ঘভাতা প্রদানে বিলম্ব। বোনাস হ্রাস। গ্রামীণ জনসাধারণ সহ সর্বস্তরের জনগণের উপর বর্ধিত কর; পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি, বিদ্যুতের রেট বৃদ্ধি; পেট্রোলের রেট বৃদ্ধি। এই সমস্ত পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের নামে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দাম হ্রাস পায়নি। আবার কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাম হ্রাস পেলেও সেই সময়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতাও আনুপাতিকহারে আরো বেশি হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এক ১৯৭৪-৭৫ সালেই জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত এক হাজার কোটি টাকা কর আদায় করেছে। এই সময়ে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পের দরুন শ্রমিক কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ছ'শ কোটি টাকার; আর বোনাস হ্রাসের দরুনও এই একই পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।...

...এর উপরে রয়েছে ছাঁটাই লে-অফ, লক-আউট এবং ঘেরাও। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সর্বহীন হয়ে পড়েছেন—তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পেয়েছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, পাইকারী মূল্যসূচক যে হারে বৃদ্ধি পায় তার অনেক বেশি শুণ বৃদ্ধি পায় খুচরা বাজারের দাম। ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। ১৯৭৪-৭৫ সালে যখন পাইকারী মূল্যসূচক ৩১৩·৭ পয়েন্টে ছিলো তখন ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচকে ছিলো৩১৯থেকে ৩২৩ পয়েন্টের হয়ে। এবারে ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক বেড়ে কত দাঁড়িয়েছে তার হিসাব অবশ্য সরকারীভাবে এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

দ্রব্যমূল্যের পাইকারী সূচক সংখ্যার এই ব্যাপক বৃদ্ধি এই সত্যই উন্মোচিত করে যে, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধের নামে যে সমস্ত বড় বড় বুলি আওড়ানো হয়েছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম যে গতিতে বাড়ছিলো সেই গতিতেই বেড়ে চলেছে, পক্ষান্তরে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে আরো হ্রাস পাচ্ছে। "গণশক্তি"

সি পি আই নতুন সুরে কথা বলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সান। রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের প্রসার, বিশেষ করে রাজস্ব এবং রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে; নির্বাচিত বিধানসভা এবং মন্ত্রিদলই রাজ্যে যাতে একমাত্র এবং নির্বাচিত প্রতিভূ হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হয় সেই জন্য গভর্নরদের পদ আর বিধান পরিষদগুলির বিলোপ এবং উচ্চতর অফিসারদের বিশেষ সুবিধার অপসারণ।"

ওই সময়ে সি, পি, আই-এর অঙ্গ কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্টে দলের কার্যসূচী হিসাবে এও ঘোষণা করা হয়:

"বিগত তিন বৎসরের গণসঙ্ঘর্ষের পরিণামে বাস্তব অবস্থা বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পক্ষে অতীব অনুকূল হয়েছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে সম্মিলিত (কোয়ালিশন) গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে নেতৃত্বদ্বারা গণআন্দোলনকে ক্রমগত-ভাবে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা পরিষ্কার হয়েছে।"

সেই ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী আর আজ ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী। বদলেছে কে—কংগ্রেস না সি, পি, আই? সি, পি, আইকি বিগত কয়েক বৎসর ১৯৬৮ সালে গৃহীত নীতি কার্যকরী করায় লিপ্ত ছিল, নাকি ঠিক উল্টো কাজ করে এসেছে? আজ এই বিলাপ কেন?

গণতন্ত্রের সমস্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় এখানে তাও অস্বীকার করা হচ্ছে। সংবিধান সংশোধন ও বিচারালয়ের ক্ষমতা খর্ব করার ব্যাপারে তিনি সমালোচনা করেন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে সমর্থন করেন। নারায়ণ চৌধুরীও এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতার কথা ঘোষণা করেন।

সভাপতি জ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম গোটা সমাজের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে গণতন্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব

মানিকলাল মুখোপাধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্ত উনিশ শতকের নবযুগের ইতিহাসে একটি স্থায়ীর নাম। রামমোহনের ধর্মচিন্তার জ্ঞানবাদী দিকটি অক্ষয় দত্তের অসামান্য ব্যক্তিত্বের স্পর্শেই সম্পূর্ণতা পেয়েছিল। সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অক্ষয় দত্তের মনীষার প্রভাব ইতিহাসের সত্যরূপে স্বীকৃত হবার যোগ্য। সামাজিক শক্তির বিভিন্নমুখী দ্বন্দ্বের মাঝখানে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। খৃষ্টান মিশনারী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, পাশ্চাত্য শিক্ষিত উগ্রপন্থী ও ব্রাহ্মধর্মের অনুগামীরা যখন পরস্পর বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় লিপ্ত, তখন সেই ঐতিহাসিক আবর্তে অক্ষয় দত্ত চিন্তায় ও কর্মে ছিলেন স্বকীয়, ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথের পথিক। মিশনারীদের ধর্মীয় অন্ধতা, হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি, নব্যপন্থীদের উগ্রতা যেমন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, তেমনি নিজে ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মসমাজের সকল সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে আজীবন আপোষহীন যুদ্ধ করে গেছেন। একথা তাঁর সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিল,—"The negative, critical and destructive part of the work of the Brahmo Samaj, thirty years ago, was principally done by him. ব্রাহ্ম আন্দোলনের নৈতিবাচক, সমালোচনামূলক ও সৃষ্টিমূলক চরিত্র অক্ষয় দত্তের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ব্রাহ্মসমাজের পাদপীঠ থেকে এই ধর্মান্দোলনকে তিনিই পরিণত করেছেন দৃঢ়ভিত্তির বৃহত্তর আন্দোলনে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি যথোচিত নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। অক্ষয় দত্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এর মুলোচ্ছিত্ত প্রগতিশীলতার আকৃষ্ট হয়ে। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর মতো একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনার নিযুক্ত করে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার সুদীর্ঘ বারো বছর (১৮৪৩—'৫৫) এই পত্রিকা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকার ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মনীষা। কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্মমতের বক্তৃতা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি এই ধর্মের অনুবর্তী ছিলেন না। যুক্তি ও মননের পথে চলাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে তিনি এক আপোষহীন যুক্তিবাদী মনের অধিকারী ছিলেন। এই বিশেষ মানসিক কাঠামোর জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আদর্শগত বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী'র কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী ও বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবক্তারূপেই 'তত্ত্ববোধিনী' সেকালের বাংলা দেশে জনপ্রিয় পত্রিকার সম্মান পেয়েছিল, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরূপে নয়। বিশেষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হয়েও এই পত্রিকা নবযুগের যুক্তচিন্তার ধারক ও বাহক ছিল; সেই কারণেই বিদ্রোহী 'ইয়ংবেঙ্গলে'র সত্যরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ মূলত যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে 'তত্ত্ববোধিনী' প্রকাশ করেছিলেন, পত্রিকাটিতে অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে উঠেছিল। বেদিদীপুর ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত রাজনারায়ণ বসুর কোনো একটি ভাষণ একসময় 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশের জন্য দেওয়া হলে তা অমনোনীত হয়। সেই প্রসঙ্গে একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথের কটূক্তিবর্ষিক হয়েছিল এভাবে—"কতকগুলান মাস্কিক গ্রাম্যবাক্য হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পত্র হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" "মাস্কিক গ্রাম্যবাক্য" বলতে দেবেন্দ্রনাথ শুধু অক্ষয় দত্তকেই নয়, অবশ্যই বিদ্যাসাগরকেও ইঙ্গিত করেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক সমিতির মধ্যে এই দুই সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তির উপস্থিতি এক লক্ষণীয় ঘটনা। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের যুগ্ম প্রয়াসেই এই পত্রিকার লোকপ্রিয়তা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, তা অবশ্যই স্বীকার্য। চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এঁরা ছিলেন সমগোত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্মবিষয়ে কালক্ষেপ না করে এই দুই লোকমান্য ব্যক্তি তাঁদের সকল শক্তি ও সাধনা নিয়োজিত করেছিলেন সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধানে। উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত সমাজে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর এই যুগে বিকশিত দুটি ফুলের মতো। এই যুগ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 'তত্ত্ববোধিনী'র খল নলচে একেবারে পাল্টে যাচ্ছিল। আর সেই কারণেই তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি ও পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ বিচলিত না হয়ে পারেন নি। 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে অক্ষয়কুমার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন—'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।" ঘটনাটি অস্বীকার করার উপায় নেই। দেবেন্দ্রনাথ যে পথে চলতেন, অক্ষয় দত্ত চলতেন তার বিপরীত পথে। কোনো বিশেষ ধর্মমতের অন্ধ অনুসরণ অক্ষয়কুমারের নিকট এক ধরণের জীবতা। তাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণই প্রকৃত ধর্ম। জর্জ কুম্বের 'কনষ্টিটিউশন অব ম্যান' অবলম্বনে রচিত অক্ষয় দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটি তাঁর এই মনোভঙ্গীর নিদর্শন বহন করছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাদির মধ্যেও এই বিশেষ মতবাদের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা প্রবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রার্থনায় অসারতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন সমীকরণের সাহায্যে। যেমন, পরিশ্রম=শস্য; প্রার্থনা + পরিশ্রম=শস্য, অতএব প্রার্থনা=০। কোনো বিশেষ ধর্মীয় প্রথার অন্ধ অনুসরণকে তিনি অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রসঙ্গে মূলতঃ বেদবেদান্তের ধর্মই ছিল। দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন বেদের অভ্রান্ততার বিশ্বাসী। 'বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত'—এই বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে স্বমতে আনতে পেরেছিলেন অক্ষয় দত্ত। নিজের ধর্মমতের অনুকূলে উপনিষদের বিশেষ বিশেষ শ্লোক চয়ন করে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, অক্ষয় দত্ত সেটিকে কোনোদিনই প্রামাণ্য ধর্মীয় গ্রন্থরূপে স্বীকার করেননি। ধর্মের এক নির্ভেজাল উদার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন একটি ভাষণে, 'অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য। জ্যোতিষ ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোমৃত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। বঠ ও তলবকার, মুশা ও মহম্মদ এবং বীশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।" এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি এই মর্মের সকল সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধশক্তি গড়ে তুলেছিলেন। সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র পথ রচনা করে সেই পথে প্রবাহিত করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার প্রবাহ। ফলতঃ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তৎকালে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ধর্মনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, শারীর বিদ্যা, জ্যোতিষ, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনাই ছিল 'তত্ত্ববোধিনী'র লক্ষ্য।

এই জন্যই অক্ষয় দত্তকে "ব্রাহ্ম সমাজের জ্ঞানমার্গের প্রবর্তক" বলা হয়। এই বিচারে তিনিই হলেন রামমোহনের সার্থক উত্তরসূরী। কারণ দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদের প্রবল স্রোতে রামমোহন প্রবর্তিত জ্ঞানমার্গের যে ধারাটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল, অক্ষয় দত্ত সেই ধারাটিরই পুনঃপ্রবর্তক।

শুধু সাংস্কৃতিক জীবন নয়, বাঙালীর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকটাও অক্ষয় দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী'তে অবহেলিত হয়নি। দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশাও ছিল 'তত্ত্ববোধিনী'র আলোচ্য বিষয়। গ্রামের চাষীদের প্রতি নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনীও এই পত্রিকার দৃষ্টি এড়ায়নি। অক্ষয় দত্ত এদিকেও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন। বৈরাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল জনমত গঠনে অক্ষয় দত্তই ছিলেন পুরোধা। রামমোহন নীলচাষকে দেশের অর্থনীতির পক্ষে কল্যাণকর মনে করতেন; অক্ষয়কুমার তা মনে করতেন না। তাঁর মতে নীলচাষ গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার মূল। দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার প্রতি অক্ষয়কুমারের সহানুভূতির অন্ত ছিলনা। সেই কারণেই ইংরেজ শাসনের প্রতি তিনি ছিলেন নির্মোহ। রামমোহন ইংরেজ শাসনকে অদৈবব্যাণীর পক্ষে মঙ্গলজনক বলেই বিশ্বাস করতেন। কেশব সেন তো ইংরেজদের দৈবপ্রেরিত জ্ঞান করতেন। তাঁর মতে 'It is providence that rules India through England." অক্ষয়কুমার কিন্তু দেশবাসীর পরাধীনতার দুর্ভাগ্যে অশ্রুপাত করেছেন। তিনি বলেছিলেন,—'আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খ্রীষ্টান ধর্মের ন্যায় প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে শঙ্কা হয়, কি জানি পরের ধর্ম যা এদেশের আতীয় ধর্ম হয়।"

নিরীশ্বরবাদী (agnostic), বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী এই মানুষটির পক্ষে সম্ভবতঃ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদকতার দায়িত্বে আর থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ধর্মান্ধতার সঙ্গে বিরোধ হয়তো প্রবল হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল পত্রিকা পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ডাকে নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরী করতে। প্রচলিত ধারণা, দুরারোগ্য শিরঃপীড়ার আক্রান্ত হয়েই পত্রিকা ও সমাজ থেকে তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট লিখিত একটি পত্র থেকে জানা যায়, তিনি এই নতুন চাকরি পেয়ে যারপরনাই সন্তিবোধ করেছিলেন। এই খুশি হওয়া যা ব্রাহ্মদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরোধের অবসান প্রসূত।

মিত্রির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮·০০
পৃথিবীর বয়স	১৪·০০
জীবন নিরবধি	১৬·০০
ঘরে ফেরার দিন	৫·০০
দিবস বিভাবরী	৫·০০
অতন্দ্র প্রহরী	৬·০০
আলোর সহোদর	৪·০০
পারাবারের তীরে	১০·০০

শুকসারী ॥ ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক ষ্টোর্স। কথা ও কাহিনী।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর এক অনবদ্য ছবি

ভানুসিংহ

ভারত সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রক আয়োজিত বলবত্তার মেট্রো সিনেমায় সপ্তাহব্যাপী এক ফরাসী চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হয়েছে গত ২৪ ডাসুয়ারি থেকে। প্রথম দিনের ছবিটি ছিল ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো পরিচালিত 'দি বিসিরি অফ আদেলে এইচ'। আশ্চর্য সুন্দর ছবি। ছবি দেখার এক তৃপ্তি সুখকর অভিজ্ঞতা।

খনামধন্য সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর দ্বিতীয় কন্যা আদেলের জীবনে প্রেম, ব্যর্থতা ও হতাশা যে মর্মন্তুদ পরিণতি ডেকে আনে তারই নিপুণ চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন একালের অন্যতম দীমান • চিত্রপরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো। বিশ্বিত হই যখন ভাবি, উনবিংশ শতাব্দীর এক রোমান্টিক জীবন যখন ছবির বিষয়বস্তু, তখন কি পরম নিষ্ঠার আর কি আশ্চর্য দক্ষতার ইতিহাসের ছিন্নপত্র থেকে অতীত-চরিত্রগুলি আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত বাদির করেছেন চিত্রপরিচালক। প্রত্যয়ে সেখানে সন্দেহ জাগে না, বাস্তব চেতনাতেও কোন আঘাত লাগে না। জীবনী চিত্রের ডকুমেন্টারি সুলভ বিরসতার বদলে এক অনাস্বাদিত কাব্যময়তার সন্ধান পেয়ে মন পরিতৃপ্তই হয়ে ওঠে। গত বৎসর কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব চলার সময় পাসোলিনি পরিচালিত আর এক অবিস্মরণীয় ছবি দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্যাসোলিনিকৃত সেই বিখ্যাত 'ইদিপাস রেক্স' ছবিটির পর এই অসামান্য ফরাসী ছবিটি আবার এক বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সাক্ষর রাখল।

ভিক্টর হুগোর প্রথমা কন্যা লিওপোল্ডাইন তাঁর স্বামী সহ জলে ডুবে মারা যান। দ্বিতীয়া কন্যা আদেলের জীবনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বিভীষিকাময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে যখন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তখন হুগো সপরিবারে জার্সি দ্বীপে চলে যান। আদেলের তখন কাজই ছিল প্রতিদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা। এই সময়ই আদেলের সংগে সাক্ষাৎ ঘটে এক তরুণ ইংরেজ লেফটেন্যান্ট আলফার্ট পিনসনের। উত্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, পরে প্রেম হয় ঘনীভূত। বিবাহের সপ্তপদ পরস্পরের মধ্যে দানা বাঁধে। আদেলের আর বিবাহ করতে ইচ্ছে হয় না আগন্তুকে যদিও আগন্তুক আসে থেকেই ভালবাসত আদেলকে। এই আগন্তুর দাবায় সংগেই আদেলের দিদি লিওপোল্ডাইনের বিবাহ হয়েছিল। আদেলের এখন একমাত্র প্রেরিক পিনসন।

আদেলের যে প্রেম নিষ্ঠা ও প্রেম-আকৃতি ছবিটিতে প্রকাশ পায়, তা সত্যই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেফটেন্যান্ট পিনসন তার বাহিনী নিয়ে ক্যানাডার হ্যালিফ্যাক্সে চলে যায় এবং তখন থেকেই তার ভাবান্তর ঘটে। সে আর আদেলেকে চায় না—এক নারী নয়—বহু নারী ভোগ করার বাসনায় সে ভাড়িত। আদেলে কিন্তু প্রেমে অবিচল—পিনসন ছাড়া তার জীবনে অন্য কোন পুরুষকে কল্পনা করাও অসম্ভব। হ্যালিফ্যাক্সে ছুটে এসেও আদেলে কিন্তু হতাশ হয় পিনসনের আচরণে। সে এখন পিনসনের জীবনে অবাঞ্ছিত। বারবার অনুরোধ, মিনতি, কাতর আবেদন বেশ পর্যন্ত তাকে লেখা পিনসনের গোপন প্রেম-পত্র প্রকাশ করে দেওয়ার হুমকি সত্ত্বেও যখন আদেলে তার প্রেমিককে পেল না, তখনকার সেই বিদীর্ণ হৃদয়, যন্ত্রণাকাতর, মর্মভেদী প্রেম বঞ্চিতার যে রূপ ছবির পর্দায় ভেসে ওঠে তাতে মন বিষন্ন না হয়ে পারে না। কিন্তু পরিচালক সে সব আবেগময় দৃশ্য যেন স্থানী হতে দেননি। মাঝে মাঝে নায়িকার বিগ ক্লোজ-আপ-এ প্রেম ও প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব সংঘাতমুখর রূপ ফুটিয়ে তুলে মননশীলতার পরিচয়ও দিয়েছেন। আদেলে যখন তার প্রেমিক পিনসনের কাছে চিঠি লিখে অন্য এক তরুণীকে গ্রাহ্যে এবং জানিয়ে দিচ্ছে পিনসন ইচ্ছে করলে সেই তরুণীকে ভোগ করতে পারে, তখনই আদেলে আমাদের কাছে সত্যিকারের রক্তমাংসের মানবীরূপে ধরা দেয়। প্রেম যতই সনিষ্ঠ হোক, সেই প্রেম যখন চরম অবহেলা পায় তখন সাধারণ মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। প্রতিহিংসা ও দেষ ক্ষণিকের জন্যেও মনের দুয়ারে হানা দেয়। এখানেও আদেলের মনে দ্বেষ বিদ্রুপ ও হিংসা ক্ষণকালের নিমিত্তই দেখা দেয় পরে চূড়ান্ত হতাশার শিকার হয়ে আদেলে উন্মাদিনী হয়ে পড়ে। এই মর্মস্পর্শী পরিণতির যে দৃশ্য বাহিত রূপ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, তা প্রকৃতই অনবদ্য। পিনসনকেও যদি উন্মাদিনী আদেলে আর চিনতে পারে না তখনকার দৃশ্য বাস্তবও কি কম সংবেদনশীল? প্রকৃতপক্ষে প্রেম ও ব্যর্থতার সেই চিরন্তন বিষয়বস্তুই পরিচালক শুধুমাত্র উপস্থাপন কৃতিত্বের জোরেই দর্শকের চিত্তে নতুন তাৎপর্যে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। হুগোর ইম্প্রেসিভনে আদেলের দিদির জলমগ্ন হবার দৃশ্যটির অর্থময়তা সত্যিই চমকপ্রদ। এ ছবির ক্যামেরার কাজ তো অসাধারণ। তবে কি ছবিটি ত্রুটি-মুক্ত? মোটেই না। আদেলের জীবনের প্রেম ও ব্যর্থতা ফুটিয়ে তুলতে চলচ্চিত্রকারকে যতগানি ব্যস্ত দেখি, শেষে তার জীবনের উত্তরণেরও যে একটি মহান দিক আছে, তার প্রতি-ফলনে তাঁকে মোটেই ব্যস্ত দেখিনা। কিছুটা বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে সংলাপ প্রকাশ করা হয় যে, আদেলে পরে সুস্থ হয়ে আরও চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন এবং পিতামোবাদে বিশ্বাস হয়েছিলেন, ভায়রী লেখিকা হিসেবেও খনস্বিনী হয়েছিলেন। ব্যর্থ প্রেমের অংশ কমিয়ে যদি এই উত্তরণের দিকটির ছবিটিতে যথাযোগ্য স্থান করে দিতে পারতেন পরিচালক তবে ছবিটি আদেলের জীবনের এক উজ্জ্বল সম্পূর্ণ ভাষ্যরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকত। আদেলের জীবনঘটনার পটভূমি হিসেবে পরিবারের উপস্থিতিও উপেক্ষিত। আদেলের ভূমিকায় ইসাবেলের অভিনয় কিন্তু চমৎকার।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

॥ চাঁদার হার ॥

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাষিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫·৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

জনৈক শিক্ষকের চাকরী খতম

প্রধান শিক্ষকের হীন ষড়যন্ত্রের বলি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাঙ্গইপুর : ২৪ পরগণার বাঙ্গইপুরের অন্তর্গত রামনগর হাইস্কুলের আরও একজন শিক্ষককে বিশেষ স্বার্থের বলি হতে হল। ব্যক্তিস্বার্থের সর্বশেষ বলি হলেন শ্রীকৃষ্ণিভূষণ দফর্দার বিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞানের স্থায়ী শিক্ষক পদে প্রায় আড়াই বছর ধরে শিক্ষকতা করার পর। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসার পর বর্তমান পরিচালক সমিতি এ পর্যন্ত ১ জন শিক্ষক এবং ১ জন শিক্ষাকর্মীকে চাকরি থেকে নানা অজুহাতে বরখাস্ত করে বাঙ্গইপুরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের সম্মান লাভ করেন। এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির একাদশ সদস্যের এই খেলার সর্বশেষ গোলটি অবশ্যই সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই গোলে সহকারী শিক্ষক দলের একাদশ সদস্যের মধ্যে ফণিবাবুর মত একজন নিরীহ শিক্ষককে এক অযুত চক্রান্ত করে মাত্র কিছুদিন আগে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, পরিচালক সমিতির সহঃ সভাপতি ডাঃ সুনীলকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট আত্মীয় শ্রীরঞ্জনী সর্দারকে স্থায়ী শিক্ষক পদে নিয়োগ করার জন্য প্রধান শিক্ষকের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়ায় মাননীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীবিভূতিপদ সরকার হঠাৎ একদিন তাঁর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সহকর্মী শ্রীফণিভূষণ সর্দারের কাছে তাঁর নিয়োগ পত্রটি কোন এক অনুল্লিখিত কারণের জরুরী প্রয়োজনে জেলা স্কুল পরিদর্শক দেখতে চেয়েছেন বলে জানান এবং এ বিষয়ে তিনি ফণিবাবুকে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করতেও অনুরোধ করেন। ফণিবাবুও সরল বিশ্বাসে তাঁর নিয়োগ পত্রটি পরের দিন প্রধান শিক্ষককে দেন। চার-পাঁচ দিন পরে ফণিবাবু তাঁর নিয়োগ পত্রটি ফেরৎ চাইলে প্রধান শিক্ষক মশায় বলেন "ওটার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ভয় নেই, আপনার চাকরী যাবেনা। দু'একদিনের মধ্যে আমি ডি. আই. অফিসে যাব। আপনি ওটা সাইই ফেরৎ পাবেন।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এইভাবে দশ-বারদিন আটকে রাখার পর তিনি বিশেষ কায়দাদুরস্ত সাহায্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে বিদ্যালয়ের ন্যাতে সম্পূর্ণ নূতন করে লেখা যথারীতি সম্পাদকের স্বাক্ষর সম্বলিত ফণিবাবুর নিয়োগ পত্রটি পূর্ববৎ তাঁজ করা অবস্থায় তাঁকে ফেরৎ দেন। যে-কোন মানুষ নিয়োগ পত্রটি দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে তা মাস ছয়েক আগের লেখা। তাছাড়া ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট তো আছেই। কিন্তু সন্দেহের কোন প্রকার কারণ না থাকায় ফণিবাবু সেদিন ভাল করে না দেখে সরল বিশ্বাসে নিয়োগ পত্রটি নিয়ে বাড়ি যান। এই ঘটনার মাস দেড়েক পরেই একদিন সকালে বিদ্যালয়ের পিওন ফণিবাবুর বাড়িতে তাঁর বরখাস্তপত্র নিয়ে হাজির হয়। চিঠি পড়ে ফণিবাবু হতবাক। পত্রে বরখাস্তের পক্ষে যে সব কারণ প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ তা হল : আপনাকে অস্থায়ী ভাবে ছ'মাসের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। এতদিন পরে ফণিবাবু তাঁর নিয়োগ পত্রটি ভাল করে দেখলেন। বুঝলেন, ডি. আই.-কে দেখাবার নাম করে প্রধান শিক্ষক শ্রীসরকার কেন তাঁর নিয়োগ পত্রটি চেয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্বাসহন্তার প্রতি ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে ফণিবাবু একেবারে রুদ্ধবাক্। বরখাস্তের পত্র প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভাবতেও পারেন নি যে তাঁকে কোনদিন এই ভাবে এক হীন ষড়যন্ত্রের বলি হতে হবে।

খবর নিয়ে জানা গেল, ফণিবাবুকে সরানোর পর উক্ত শূন্য পদে যথাযথ বি, কম শিক্ষক শ্রীরঞ্জনী সর্দার, শ্রীসুনীল সরকার আত্মীয়কে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ বর্তমানে বিদ্যালয়েনতুন করে কোন বি, কম, শিক্ষক নিয়োগের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এ ব্যাপারে স্থানীয় অভিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দেয়ায় ডাঃ লস্কর বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে রঞ্জনীবাবুর পক্ষে তাঁদের মতামত যাচাই করছেন। স্থানীয় অভিবাসীদের কারো কারো মতে ডাঃ লস্কর হলেন বাঘবন্দীর ভবেশ ব্যানার্জী। তিনি বাঙ্গইপুরে একাধিক বিদ্যালয়ের সহঃ সভাপতি, বিশিষ্ট দলপ্রতি। তাঁর মূল পেশা রোগী চিকিৎসা বর্তমানে তিনি আঙ্গার তুলে দিয়েছেন।

অদ্ভুত এক খবরে প্রকাশ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক সমিতি এ পর্যন্ত যে দশজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে নানা অজুহাতে বরখাস্ত করেছেন, তার মধ্যে একজন শিক্ষক শ্রীআবুবক্কর মণ্ডল দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের আপিল কমিটি সহ রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন স্তরে এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও সন্তায় তাদের কোন প্রকার আশ্বাস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর গত ২২, ১২, ৭৬ তারিখের পত্রে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন। জবাব অবশ্য শ্রীমণ্ডল এখনও পাননি।

উলঙ্গ সভ্যতা

মহম্মদ দুল হক

মনে হচ্ছে যেন এক যুগ বা তারও বেশী সভ্য সংস্কৃত মানিত পরিচ্ছন্ন জীবন তথা জগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখিনি। তাতে কার, কতি কার লাভ কতখানি হয়েছে জানিনা, শুধু জানি আমি যেন লাই-থেকে-লাখা বোকা, শান্ত ছেলের মত নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিছু হয়ে বসেই আছি এবং ফাই-থেকে-বসা রূপোর চারু-মুখে জমানো সন্তানেরা চটপট সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যাইয় মশাইদের গুড-বুকে স্থান পাচ্ছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে তারা ক্রমাগত জীবনের সমুদয় পরীক্ষা বৈতরণী সসৌরবে সোজাসে পার হয়ে যাবে (শুক্তকের বহি-উৎসব করেও)—সেই ভাল।

আমার জীবন-দর্শন বা বিশ্বস্ততা আমার কাছে তেমন মন্দ মনে হচ্ছে না যখন দেখছি তাদের উত্তরের মধ্যে অনেক ফাঁক এবং ফাঁকি আছে (ঝুঁকি নেই), অনেক আল 'সার্টিফিকেট' নেবার কোশিস আছে এবং তাদের জীবনরাত্রির অন্তরে অন্তরে বহু দুঃখিত, বিষাক্ত জল প্রশ্ন পাচ্ছে যে সবের সংস্পর্শ এড়িয়েই আমি থাকতে চাই। তাতে যদি কেউ আমাকে অসাংবিধানিক ভাষায় গালমন্দ করে, জেল-ফাঁসিতে দাঁচাবার বড়ন্ত্র করে তো আমি বাঁচায়। তথাকথিত সভ্যতার আধুনিকতম সংজ্ঞা তথা রূপবিজ্ঞানে যে আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না এবং এই ঊর্দ্ধগামী জীবনটি সম্পর্কেও আমার মত অর্বাচীন প্রাচীনের একই সন্দেহ, একই অভিযোগ। আমি আমি গোল্ড-ফ্লেক সিগারেটে ফুলফুস ফাটানো টান মেরে, বেলবটমের ডিলেমিকে 'ট্যুইষ্ট' নৃত্যের ছন্দে নাড়া দিয়ে, ঘাড়-উপরানো ছাঁস্থ করা চুলের প্রান্তভাগ (মায় ঝুলফি) ইঞ্চিতে ফেলে নয়া সভ্যতা প্রথা বর্ষবতার প্রতীক নগ্নোয়ারা আমার প্রতি অজোধিক সন্দেহ বান নিক্ষেপ করবে।

নগ্নোয়ান বলতেই আমার কিন্তু নজরুলের নির্ভেজাল, বলিষ্ঠ, অনিভ নগ্নোয়ানকে মনে পড়ে—ব্রহ্মাণ্ডাবকে সভীব করে মধ্যযৌবনের গান গেয়ে, খুলার আজন্মবল গড়তে যে নগ্নোয়ানকে তিনি আহ্বান করেছেন। সেই উদাত আহ্বান হালফিল বিলকুল বরবাদ হয়েছে (একদা বৃটিশ শাসকদের খাসকার্যের ক্ষতিসাধন তা অবশ্যই করেছিল) —তার বদর্থ ব্যাখ্যা করতেই এখনকার নগ্নোয়ানরা আরাজন খেয়ে লেগেছে। এই বীরপুরুষদের জীবনাচরণে বড় বাধা পাচ্ছি, নিফল আক্রোশে গুমরে গুমরে মরছি। তারা যে পথ হারিয়ে ফেলেছে—'দাঁড়াও পথিকবর' ব'লে ডাকলে অথবা 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' ব'লে হুঁশিয়ার করলে আমাদের পূর্বপুরুষী সাংস্কৃতিক অমর আত্মাদের কবরস্থ তাদের কর্মকুহকে প্রবেশ করবে না, যারা ইতিহাস সৃষ্টি করলে তারা নিজেদেরকেই যে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে, সভ্যতাপরী মানুষদের তোপা সোফা পরিবৃত সেন্টার টেবিলে সাজানো চায়ের কাপে (হুইস্কির ঘোতল সবিনয়ে উহ্য রাখছি), বহুলপ্রচারিত সিনেমা পত্রিকার যৌন আবেদনমূলক গল্পে ও ছবিতে, রেডিওর হিন্দি ফিল্মী গানের ঢেউনিয়া চটুল ঐতিহ্যে সেই আঁস্তাকুড়ের গুরুত্ব পরিচয় পাচ্ছি এবং 'প্যাশন'-মত ফ্যাসন-রপ্ত পরিচ্ছদ পরিহিতা (অথচ যেন নগ্ন) যুবতীদের প্রধানম সামগ্রীতে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার গন্ধ পাচ্ছি।

আমাকে তারা 'ব্যাকডেটেড' বলে করুণা করুক, বকনা করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমারও পাল্টা প্রশ্ন—তারা কি সত্যিই 'আপ-টু-ডেট' মডার্ণ? সভ্যতার পরোয়ানা, না মৃত্যু-পোয়ানা তাদের হাতে? আগে নগ্নোয়ান বেখলে বুকটা আশায়, আনন্দে ও গর্বে ফুলে উঠত, তাদের বলবীর্যের সংগ্রামী ঐতিহ্যে ও হৃদয়বৃত্তির বিমুক্ত ঔদার্যে যত চোর-ছ্যাঁচোড়-দাগাবাজ দাবাবাজরা ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না কিন্তু এখনকার নগ্নোয়ানরা যেন ঐ বিশ্বাস প্রেক্ষিতকে স্থানচ্যুত করে আমাদেরকে বিরক্ত, বিব্রত (এবং নীরক্ত) করছে, চুরি-ডাকাতি এবং নারীর শ্লীলতাহানিরূপ যাবতীয় দুঃসাহসিক অসামাজিক অপরাধের নায়ক নাকি তারাই। আমার তাদের সঙ্গে যদি কোন কুলীন রাজনৈতিক দলের ক্ষীণতম যোগসূত্র থাকে তো কথাই নেই। (মাহলা নিয়মাদালতেই ফর্সা, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্ট দূর অস্ত) তখন সব অপবাদ বাদ দিয়ে তাদেরকে সাধুবাদ দিয়ে বা জিন্দাবাদ জানিয়ে সংসদ যোজন দূর দিয়ে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আমি এখন তাই করি। সভ্যতার সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতা অসহ্য লাগছে, কিন্তু উপায় নেই। এই বিচ্ছিন্নতা তথা নিঃসঙ্গতা আমার জীবনী-শক্তিকে রক্ষা করে চলেছে, তাতে নতুন কোন উপাদান যোগান দিতে না পারলেও।

অন্ত মুহূর্তে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের উক্তির প্রতি সমর্থন জানাতে এবং সেই সঙ্গে নিজ আত্মবিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার্থে এখনও সেই বিশ্বত বিশ্বাস ফিরে পেতেও চাইছি। যুক্তি ও সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করলে কিন্তু অনেক নগ্নোয়ান অনেক অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েও যাবে, কিন্তু এসনই একটা পরিবেশ পরিমণ্ডল ভূমণ্ডলে পড়ে উঠেছে যে তারা রেহাই পেতেও এগিয়ে আসবে না, সে সৎ সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছে (শুধু আমার মত তারা নির্বাক বিক্ষুব্ধ হয়েও কথা ছিল না, আমার মত তারা নিউট্রালিটি বজায় রাখতে পারছে না) —তারাও যে গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। আমার নিউট্রালিটি বজায় রাখাটাই একমাত্র পরিত্রাণ-কর্তা-কর্ম বলে ধরে নিলেই চলবে না, এই অভিমত ব্যক্ত করতে হবে (বস্তু নির্দোষে না হলেও নিরপরাধে) নিজস্ব পরিচিত জনদের কাছে প্রথমে, তারপর এই অভিমত অভিব্যক্তির পরিধি বাড়তে থাকবে ক্রমশঃ। 'মোদ্দা কথা, আমি দোটানায় পড়েছি। এই দোটানা থেকে টেনে বের করে মানবীয় আদর্শের নিংহাসনে বসিয়ে আমার অভিমত করতে পারে ঐ নগ্নোয়ানরাই, শুধু তারা যদি সংযত হয়, সংহত হয়, যদি বিবেকের কষ্টিপাথরে নিজেদের সব অপকর্ম যাচাই করে আসল-নকল চিনতে পারে এবং যদি স্থিত সম্বিত ফিরে পায় আমি শুধু এই ইঙ্গিত তুলে ধরতে চাই তাদের কাছে। মানবজমিন আবাদ করলে সোনা ফলবেই, বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেও তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে অনেক উত্থান পতনের হৃদিন উত্তীর্ণ করে—নগ্নোয়ানরা সত্যার কিতিমাৎ করার অভ্যাস ত্যাগ ক'রে সেই অমোঘ পাঠ গ্রহণ ক'রে বৃহৎ জীবনাটো উন্মেষ্য ভূমিকা গ্রহণ করুক।

মালিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন

কটন টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শিল্পের শ্রমিকেরা যে তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন তা পূর্বের সকল নজিরকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি সুতা-কলে কাজের বোঝা বাড়ানো হয়েছে প্রায় বিগুণ, কোন কোন ক্ষেত্রে বিগুণেরও বেশি। দু তাঁতের জায়গায় শ্রমিকদের চার তাঁতের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, স্পিনিং-এর কাজ এক বা দুই সাইডের জায়গায় তিন এবং চার সাইডের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ ছাড়া 'শট' নম্বর অহরহ বদল করে তাঁতীদের মুনাফার কাজের মজুরি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এজন্য শ্রমিককে ১০·১২ খানা কার্ডের জায়গায় ২০।২৫ খানা কার্ড মেসিনে চালাতে বাধ্য করা হচ্ছে, ১০টি স্পিণ্ডেলের জায়গায় ৩০টি পর্যন্ত স্পিণ্ডেলের কাজ একজন শ্রমিককে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ওয়ারপিং ও সাইজিংয়ের নতুন নতুন মেসিন এনে শ্রমিকের সংখ্যা কমান হচ্ছে। রোলম্ব থেকে ফিনিশিং পর্যন্ত প্রতিটি বাগে কাজের বোঝা বাড়ানো হয়েছে। কাজের বোঝা বাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের সুতাকলগুলিতে কর্মীর সংখ্যা কমানো হয়েছে প্রায় ৮ হাজার। সপ্তাহে ৬ দিনের জায়গায় ৭ দিন কাজ চলছে কিন্তু এর জন্য কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। এর উপর শ্রমিকদের মেডিকেল আনফিট করে অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বোনাসের দাবি ত্যাগও মেটেনি।

আর একদিকে পাঁচটি বন্ধ মিল হলো—মধুরাপুরী, মোহিনী, শ্রীদুর্গা, মেটিয়া কটন মিলস এবং হুগুমান কটন মিলস্।

পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি মিল কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয়করণ করেছে এবং আরও চারটি মিল আই আর সি আই-র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এই ১৮টি মিলেও শ্রমিকেরা দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মুসলমান সূচক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন মাসিক মহার্ঘভাতা বেড়েছে ২৪ টাকা কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান কল্যাণী স্পিনিং মিলের শ্রমিকদের তা দেওয়া হচ্ছে না।

পাওয়ারলুমের শ্রমিকদের নূনতম মজুরি সরকার স্থির করেছে ২১৭ টাকা কিন্তু মালিকেরা এই নূনতম মজুরি আজও চালু করেনি।

দিন দিন মালিকেরা শোষণের মাত্রাকে তীব্রতর করেছে। শ্রমিকদের সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের জীবনযাত্রা [illegible] বহন করছে।

আজ লক্ষ্য করার বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সুতাকলের নীচুতলার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি তাদের আগ্রহ মুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'ওয়ার্ক লোড' বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাদের কটন মিলের হাজার শ্রমিক ঐক্যভাবে আন্দোলনের এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। মালিক এখানে মাথা নত করলেও চারজন শ্রমিককে এখনও নাস-পেণ্ড করে রেখেছে। মালিকের আক্রমণে প্রতিটি সুতা-কলেই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাসন্তী কটন মিলে শ্রমিকেরা আন্দোলন করলে মালিক লক-আউট করে। ফুলেশ্বর কটন মিলে ৭ জন নেতৃস্থানীয় শ্রমিককে ছাঁটাই করলেও কাজের বোঝা বাড়ানোর প্রতি-বাদে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন, মালিক তখন লক-আউট করে। জয়শ্রী কটন মিলেও একজন শ্রমিককে নাসপেণ্ড করার প্রতিবাদে শ্রমিকেরা একদিনের ধর্মঘট করেন। বোনাসের দাবিতে পোদ্দার ও কেশোরামের শ্রমিকেরা ঐক্য-বদ্ধভাবে একদিনের ধর্মঘট পালন করেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এই পরিবেশ আরও বিস্তৃত করাই আজ আমাদের প্রধান কাজ। ১৯৭৭ সালের যে মাসে সুতাকল শিল্পের বিপাক্ষিক মজুরী চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। কাজেই মজুরী বৃদ্ধির দাবী আদায় করার জন্যও আমাদের যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এই সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে গত ১৯শে ডিসেম্বর কটন টেক্সটাইল্স ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের ডাকে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে নিম্নোক্তদাবীগুলি আদায় করার জন্য সুতাকল শিল্পে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করতে হবে।

(১) বন্ধ মিল ও কারখানাগুলি অবিলম্বে খুলতে হবে এবং জাতীয়করণ করতে হবে।

(২) কাজের বোঝা বাড়ানো চলবে না, ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

(৩) নূনতম ৮·৩৩ শতাংশ বোনাস দিতে হবে।

(৪) বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

(৫) বন্ধ পাওয়ারলুম ও প্রসেসিং কারখানাগুলি খুলতে হবে।

(৬) পাওয়ারলুমে নূনতম মজুরি ২১৭ টাকা চালু করতে হবে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শিল্পের সকল ট্রেড ইউ-নিয়ন ও শ্রমিকের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি এই দাবিগুলি আদায় করার জন্য যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং প্রতিটি মিলে সভা করে যুক্ত আন্দোলনের মনোভাবকে জোরদার করুন।

Regd. No. WB/CC-32

PRICE 40 Paise

প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠারপর)

অথচটি ফড়ি দিয়ে দিয়ে রাখেন। ছাত্ররা রাস্তার কল থেকে জল খায়। স্কুল বাড়িতে কোন প্রস্রাবখানা নেই।

কলকাতার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই পরিস্থিতি। বড়বাজার অঞ্চলে যে গলিতে গণিত বর্ধক বিদ্যালয় ও ভৈরব বিদ্যালয় অবস্থিত সেই বোরো গলিতে নাকে রুমাল না দিয়ে কারো পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। উত্তর কলকাতার আর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আহিরীটোলা ইউ পি স্কুলে ছুটো টানির ছাদের ওলায় বাঁশের চার দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই। বেঞ্চিগুলো ভাঙা এবং ব্ল্যাকবোর্ড উধাও। একটিমাত্র ঘরে অবস্থিত গৌরীবাড়ি আদর্শ বিদ্যালয় ফ্রি প্রাইমারি স্কুল এবং এখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা। এখানে ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষিকাদের জন্ত কোন প্রস্রাবখানা নেই।

১৯৬৬ সালে সি এম পি ও-র মুনিয়াদি উন্নয়ন প্রকল্পে এই চিত্রই ফুটে ধরা হয়েছিল। কিন্তু তারপর কি কোন পরিবর্তন হয়েছে?

'অভিনয়' পুরস্কার

১৯৭৬-এ কলকাতা ও মফঃস্বল বাংলার অপেশাদার মঞ্চে অভিনীত প্রগতিধর্মী নাটকগুলির মান বিচার করে নিম্নলিখিত সংস্থা ও ব্যক্তিকে 'অভিনয় পুরস্কার' দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : দানসাগর (থিয়েটার কনিউন)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : মানব গোস্বামী (দণ্ডায়ন/অন্বেষণ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : পঙ্কজ মুখী (আবু হোসেন / টি, এস, জি)। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : স্বপ্না দাস (অভাগীর স্বর্গ / রূপদক্ষ) ও রত্না চ্যাটার্জী (কোলকাতা থেকে দূরে/একতারা)। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার : শিশির বসু (ভ্যামপায়ার / সায়ক)। মফঃস্বল বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : পাপেট থিয়েটার (রূপনারায়ণপুর রিক্রিয়েশান সেন্টার)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : শ্রীসুমন্ত ঘোষ (গেরীলেল পেরী / নটেশ্বর)। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার : নমীরণ প্রামাণিক (ইস্কুলেশান /নাহানা)। আগামী ৩১শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে 'অভিনয় পুরস্কার' বিতরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'এপার ও ওপার বাংলার নাট্য পত্রিকার' (১৮৮৭-১৯৭৬) একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে সারা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবমূলক নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়কে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বাড়িভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব যাদের সেই শিক্ষা বিভাগ নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নিরুৎসাহ দেয় যেহেতু তাদের আর্থিক বোঝা বহনের ক্ষমতা নেই। সারা রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়ার জন্ত রাজ্য সরকারের যে বার্ষিক বরাদ্দ তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, বিশেষত যেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আবেদন অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে। বর্তমানে একমাত্র কলকাতাতেই ৩০০ বিদ্যালয় অনুমোদন লাভের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বলে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতে পারেন না। ঝাড়ুদার বা দারোয়ানকে বেতন দেবার জন্ত কোন বিদ্যালয়ের কোন আলাদা তহবিল নেই। ব্ল্যাকবোর্ড, চক, আসবাব কেনার জন্ত বা ছুটো ছাদ, ভাঙা দরজা বা জানলা মেরামতের জন্ত বা চুনকাম অথবা ক্লাসঘর পরিষ্কার করার জন্ত কোন টাকা নেই। এই উদ্দেশ্যে সরকার কোন টাকা দেন না। ফলে বিদ্যালয়ের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর এবং পরিষ্থিতি ভয়াবহ।

কলকাতা কর্পোরেশনও ২৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালায় প্রায় ৫৮ হাজার ছাত্র নিয়ে। এইজন্তে কর্পোরেশনের নিজস্ব বাড়ি আছে ১৬১টি আর ভাড়া বাড়ি ১০টি। ছাত্রদের ৭৪ শতাংশ বস্তিবাসী দরিদ্র ও নিম্নস্তর পরিবারের। তার মানে অধিকাংশ ছাত্রই পরিবারে এই প্রথম লেখাপড়া করছে।

আর্থিক অথবা অন্যান্ত যত অসুবিধাই থাকুক কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও ছাত্ররা সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠিত ফাইনাল পরীক্ষায় সব সময়ই ভাল ফল করে। মোটামুটি ৯০ শতাংশ ছাত্র সফল হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার, বহু ছাত্র, বিশেষত যারা হিন্দী বা উর্দু মাধ্যমে পড়ে ফলের সময় ক্লাস করতে পারে না, কারণ তারা বাবা-মার সঙ্গে কলকাতার বাইরে চলে যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্ত কর্পোরেশন এক কোটি টাকা খরচ করে। দিল্লী কর্পোরেশন এর জন্ত খরচ করে চারগুণের বেশি টাকা। যোজনা কমিশন সাহায্য দেয় দু কোটি আর দিল্লী প্রশাসন দেয় প্রায় একই পরিমাণ টাকা। বোম্বাই কর্পোরেশনের অবস্থা আরও ভাল। শিক্ষা কর থেকে তারা পায় ৩২ কোটি টাকা এবং মহারাষ্ট্র সরকার দেয় বছরে ৩ কোটি টাকা।

সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের আলোচনা প্রসঙ্গে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক আলোচনার অবকাশ সর্বদাই থাকে। এই আলোচনা শুধু পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, অনেক সময় জাতীয় স্তরে একটি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

আমাদের দেশের সরকার-বিরোধী শক্তি বহু দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়ায় ক্ষমতাসীন দল বিরোধী শক্তিকে বেশীর ভাগ সময় উপেক্ষার মনোভাব দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বিরোধী দলের গুরুত্বকে সরকার কখনই উপেক্ষা করতে পারেন না। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধী দল ধারে না কাটলেও ভারে কাটে।

ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উন্নত পুঁজিবাদের উপর একটি সৌধীন শিল্প কর্মের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদকে সংরক্ষণ করার প্রাথমিক শর্তে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল সেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার গণতান্ত্রিক বিধি অনুসরণ করে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যখন সংকট আসে উভয় দলই সেই সংকটে আক্রান্ত হয় সমভাবে। এই মৌলিক কারণের সুত্রটি সেখানকার বিরোধী দল ও সরকারকে বেঁধে রেখেছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মধ্যে।

ভারতবর্ষের সমস্যা আরও জটিল। প্রাক স্বাধীনতা যুগে বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর বেশীর ভাগই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে। যে সব দল বা উপদল আজ সরকার বিরোধী শক্তিরূপে চিহ্নিত তাদের নেতৃত্বের একটি বৃহৎ অংশ স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও ক্ষমতাসীন দলের মঞ্চে সমাসীন ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা, এদের অনেকেই নীতি ও আদর্শের দিক থেকে আজও কংগ্রেস থেকে খুব দূরে অবস্থান করে না। সরকার পরিচালনা বা নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য কিছু থাকতে পারে এবং সেটা হচ্ছে কৌশলগত ব্যাপার এমনকি একই দলের মধ্যে কৌশলগত মতপার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। অকম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জনসংঘই একমাত্র দল যার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের আদর্শগত পার্থক্য চোখে পড়ার মতো।

অভিযোগ-প্রত্যভিযোগে আজ কোন কামরা নেই। বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে সরকার পক্ষের আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্ব শর্ত আরোপের প্রশ্নও ওঠেনা। কেননা, পূর্ব শর্তের যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হচ্ছে সেই গুলি জাতীয় সমস্যা। সামগ্রিকভাবে তার সমাধান অন্বেষণ করাই হবে প্রস্তাবিত বৈঠকের আলোচ্য সূচী।

তবে কথা হচ্ছে, কোন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার চেয়ে স্বিতাবস্থা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এটা বাস্তব সত্য যে, সরকার পক্ষ তুলনামূলক ভাবে বিরোধী দলগুলোর চেয়ে অনেক বেশী সংহত ও শক্তিশালী। শক্তির তারতম্য সমাধানের পথে তখনই বাধা হয়ে দাঁড়ায় যখন শক্তির অবস্থান থেকে সর্তাবলী নির্দেশ করা হয়। গণতন্ত্র ও উদারতা একে অপরের হাত ধরে না চললে গণতন্ত্র হোঁচট খায় প্রতি পদে।

বিরোধী দলগুলো বহুধা বিভক্ত হয়েও সন্তুষ্ট নয়, তারা একটা নূতন বিভাজন মেনে নিয়েছে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলোর মধ্যে। এবং সেই ভাবেই আলোচনায় প্রস্তুতি চলছে। সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিভাজন সরকারকে আরও শক্তিশালী করবে এবং অপরদিকে বিরোধী দলগুলোকে আরও বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করে দেবে। এই অবস্থাটাও জাতীয় স্তরে একটা সুস্থ রাজনৈতিক আবহাওয়া পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে বলে মনে হয়না।

কম্যুনিষ্ট বিরোধী দল বলতে শুধু দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই বোঝায় না, তার মধ্যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিও পড়ে যায়। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি বিগত এক দশকে তাদের সরকার ঘেঁষা নীতির জন্ত এখনও পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে সরকার বিরোধী দল রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি কিংবা অন্তান্ত বিরোধী দলগুলোও কাছে সংঘবদ্ধ সহযোগী রূপে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তৎসত্ত্বেও, নিজেই বলুন আর প্রশংসাই বলুন তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী কম্যুনিষ্ট রূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

এদিকে, সি. পি. আইকে শাসক শ্রেণীর সহকারী শক্তি রূপে যত সমালোচনাই করুক না সি. পি. এমও বিভিন্ন সময়ে শাসক পার্টির কিছু কিছু নীতির প্রতি সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেনি—সে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নেই হোক্ বা রাজ্যভাতা বিলোপের প্রশ্নেই হোক্ বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নেই হোক। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকের মতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের আলোচনা শুরু করতে বা আড়ি ভাঙতে বাধা কোথায়? কয়েকটি বিরোধীদল ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় তাদের সম্মতির কথা ব্যক্ত করেছেন। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের বিশ্বাসের কথাও তাঁরা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন।

বিরোধী দলগুলোর এই প্রস্তাবে সরকার পক্ষের সাড়াও ঘোষিত হয়েছে। পুরাতন বৎসরের ২৮শে ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র বিষয়ের প্রতিমন্ত্রী ভূবনেশ্বরে বলেছেন, "বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার একটি মাত্র ভিত্তিই হতে পারে এবং সেটি হচ্ছে এই যে, তাদের দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকার করতে হবে যে, তাদের অতীতের কার্যকলাপ ভ্রান্ত ছিল।"

অপরদিকে, সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি অশোক মেহেতা নববর্ষের এই আহ্বানটা একটি বিবৃতিতে বলেছেন, আলোচনার ক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই পূর্ব শর্ত আরোপ করা ঠিক হবে না। তবে সরকার পক্ষ যদি পূর্ব শর্ত আরোপের ব্যাপারে অনমনীয় থাকেন তবে বিরোধীদলগুলোও একটি দাবী রাখবে—"সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দাও।"

আলোচনা সূত্রপাতের আগেই যদি বাক্যস্রোত সঙ্কাচিত হতে থাকে তবে সন্তাব্য আলোচনার যবনিকাপাত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

তাই, এই মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা জরুরী সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সব পক্ষেরই আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে এই ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের দায়িত্বই সর্বাধিক। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব প্রায়ই বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছেন এবং প্রকারান্তরে বলতে চাইছেন তাদের জন্তই দেশের এই অবস্থা। তাছাড়া বিরোধী দলগুলো কেন স্বীকার করবে তাদের কার্যকলাপ ভ্রান্ত ছিল। শাসক দল বলছে বলেই স্বীকার করতে হবে?

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৯১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

দর্পণ

১৯শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২১শে জানুয়ারী '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

পঙ্কজ ব্যানার্জী কেন অপসারিত হলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"দেশের স্বার্থে নীতিগত কারণে নেতৃত্বের কাছে হাসখত দিতে দিতে পারি নি বলেই আমাকে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।" এক সাক্ষাৎকারে পঙ্কজ ব্যানার্জীর কাছে "কেন আপনাকে চলে যেতে হলো" জানতে চাওয়া হলে পঙ্কজবাবু উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় বক্তব্য যা নোট করে এনেছিলাম তা পঙ্কজবাবুর বক্তব্যেই পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

পঙ্কজবাবু বলেন: সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর থেকেই কতকগুলি নীতিগত প্রশ্নে আমি নেতৃত্বের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। আর যখনই এরকম ঘটেছে, আমার মতামতকে উদ্ধত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যুব কংগ্রেসের যে পাঁচ দফা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত ছিল না। পাঁচ দফার সবগুলিই ছিল সামাজিক কর্মসূচী। আমি বলেছিলাম একটা সংগঠন চালাতে গেলে কিছু রাজনৈতিক বক্তব্যও থাকা দরকার। থাকা দরকার রাজনৈতিক কর্মসূচী। এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাবে নেতৃত্ব অসন্তোষ প্রকাশ করে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে।

সেপ্টেম্বর মাসে ভাগলপুরে একজিকিউটিভের মিটিংয়ে প্রস্তাব করা হয় যে, দৌহাটির কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি দুদিন ব্যাপী একটি প্রতিনিধি নিয়ে যুব কংগ্রেসেরও অধিবেশন করা হবে। এ প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম পূর্বাঞ্চলের যে সমস্ত রাজ্য কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন করছে যেমন, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচল, সিকিম, ও যেখানে প্রভৃতি রাজ্য কংগ্রেস সাংগঠনিক দিক থেকে সবেমাত্র প্রভাব বিস্তার করছে। এই অবস্থায় এ আই সি সির পাশাপাশি যুব কংগ্রেসের বিরাট সমাবেশে আমাদের যুব সংগঠন কংগ্রেসের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। পূর্বাঞ্চলে রাজ্যগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। তাই এই প্রস্তাব বাতিল করা হোক।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বারিদবরণ দাস পদত্যাগ করলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য যুব কংগ্রেসের নতুন সভাপতির নাম খুব তাড়াতাড়িই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেল। এদিকে বর্তমান সভাপতি বারিদবরণ দাস তার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

দিল্লী থেকে ঘুরে এসে সোমেন মিত্র তাঁর গোষ্ঠির লোকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সোমেন-সুব্রত-প্রব্রত ত্রিনজনে বসে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করবেন। অনেকেরই ধারণা সোমেন মিত্রকে রাজ্য যুব কংগ্রেসের স্বাধিষ্ঠ দিতে বলা হতে পারে।

সদ্যই বহু-প্রিয় মুখীরা জেলায় সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমেন-সুব্রত গোষ্ঠিও বিভিন্ন জেলায় সভা করবেন বলে জানা গেল। তারা প্রথমে সভা করবেন মেদিনীপুরে।

এই গোষ্ঠির অনেক যুবনেতা বলেন, রাজ্যের সর্বস্তরেই পরিবর্তন আসছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের মনোভাব পরিষ্কার। অন্ততঃ সপ্তাহি যারা দিল্লী ঘুরে এসেছেন তাদের তাই বক্তব্য। তাহলে কি প্রশাসনে পরিবর্তন হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে যুবনেতাটি বলেন, অপেক্ষা করুন, সময় হলেই সব দেখতে পাবেন।

তরুণকান্তি ঘোষ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুরো দায়িত্ব পাচ্ছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আগামী লোকসভার নির্বাচনের আগে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুরো দায়িত্ব তরুণকান্তি ঘোষের ওপর দেওয়া হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দিল্লী থেকে ঘুরে এলে এই ঘোষণাটি করা হতে পারে।

জানা গেল, দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই রাজ্যের লোকসভার নির্বাচন পরিচালনার ভার বরকত সাহেব, তরুণকান্তি ঘোষ প্রমুখ নেতাদের ওপরই ন্যস্ত করতে চান। কারণ এই গোষ্ঠী এখন দিল্লীর বিশ্বাসভাজন। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ভারও এদের ওপর থাকবে। অবশ্য দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ও দেবী চট্টোপাধ্যায় এদের মাথার ওপর থাকবেন।

নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। যাতে দিল্লীর নির্দেশ মত নির্বাচন পরিচালনা হয় সেই জন্য বিশ্বাসভাজন তরুণবাবুর ওপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার পুরোপুরি ন্যস্ত করা হতে পারে বলে জানা গেল।

এদিকে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মনোনয়ন পাবেননা বলে জানা গেল। তবে বাম্পন্থী পাবেন না তারাই দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

একই পরিবারে আর একটি অনাহারে মৃত্যু

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহর পাড়া থানার অন্তর্গত সারাঙ্গপুর গ্রামের অধিবাসী পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রমথ ঘোষ শুক্রবার ৭ই জানুয়ারী অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছেন। ঘটনার দিন রাত্রে হঠাৎ কাশতে কাশতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

তাঁর স্ত্রী ৪০ বৎসর বয়স্কা নারায়ণী ঘোষ ২৬ দিন পূর্বে (১৭।১২।৭৬) অনাহারে মারা যান। নারায়ণী ঘোষের বেদনা করুণ মৃত্যু সংবাদ ৩১শে ডিসেম্বর '৭৬ দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংবাদে দর্পণ উল্লেখ করেছিল,—"৫টি ছেলে-মেয়ে এবং স্বামী সহ ৭ জনের পরিবারে অর্ধাহার অনাহার লেগেই আছে।" মাত্র ছাব্বিশ দিনের ব্যবধানে নারায়ণীর স্বামীও সেই একই পথে অনাহারে মারা গেলেন।

অভাবের দায়ে প্রমথ ঘোষদের সামান্য জমিটুকুও বিক্রয় হয়ে গিয়েছিল। "অভাবের দায়ে বিক্রয় জমি-ফেরৎ" পাওয়ার সরকারী ঘোষণা অনুসারে প্রমথবাবুও যথাপদ্ধতি দরখাস্ত করেছিলেন তাঁর জমি ফেরৎ পাওয়ার আশায়। (দরখাস্ত ভিত্তিতে Case No. 53—58)। আইন ঘোষিত হলেও প্রমথবাবু কিন্তু জমি ফেরৎ পাননি।

অতর্কিতে তাঁদের "ডাই ডোল কার্ড" খানা কেন বন্ধ করে দেওয়া হল? এই কৈফিয়ৎ বিভিন্ন তরফ থেকে বি-ডি-ও-র কাছে চাওয়া হয়েছে। জবাব পাওয়া যায় নি।

প্রমথ ঘোষের ৭জনের সংসারে একমাত্র সম্বল ছিল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে ধারে পাওয়া একটি গাভী। কিস্তিতে সেই ধারের টাকা শোধ করতে হচ্ছিল। এবং গাভী পোষার দৈনন্দিন খরচার পর দুই আড়াই টাকা তাঁদের থাকত। মাত্র এই দুই আড়াই টাকাতেই বর্তমান বাজারে ৭ জনের সংসার চালাতে হত। ফলে ৫টি সন্তানের মুখে কিছু তুলে দেওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রীকে প্রায়শই অনাহারে থাকতে হত। সেই দীর্ঘ অনাহারের অনিবার্য এবং নির্মম পরিণতি এই মৃত্যু। সন্তান ৫টি এখন একান্তই অসহায়।

সাগরে নাগা সন্ন্যাসীদের কীর্তিকলাপ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

আমি কুম্ভমেলা দেখি নি, হিমালয়েও যাই নি। নাগা সন্ন্যাসীদের দর্শন করার সৌভাগ্যও হয়েছে শুধু লালগড় মেলায় কয়েকবার। এবারে গিয়েও ঘুরে ঘুরে তাঁদের দেখছিলাম। কারণটা অবশ্যই ভক্তি নয়, কৌতূহল। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার এই কৌতূহলে বেশ খানিকটা অপছন্দের মিশেল দেওয়া আছে। তাঁদের উলঙ্গ হয়ে বেড়ানটা যেমন তাঁদের ব্যাপার, আবার অপছন্দটাও তেমনি আমারই ব্যাপার।

এবারে সাগরে অবশ্য তাঁদের সংখ্যা কম। কারণ অবশ্যই কুম্ভ মেলা। তাঁদের অধিকাংশই এবার সেখানে। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের আস্তানা হয়েছিল কপিল মুনির মন্দিরের পাশে। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে ছোট্ট খোপলার কুটির। অধিকাংশ সময় ওখানেই তাঁরা বসে, দাঁড়িয়ে বা শুয়ে থাকেন, ভক্তরা গিয়ে দর্শন করে। চাল পয়সা ইত্যাদি দিয়ে আসে। তাঁরা কথা বলেন কম শুধু ঐগুলো চাওয়ার সময় ছাড়া। ভক্তরা এমনিতেই তা পান, আর চাইলে ত কথাই নেই, নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত দিয়ে ফেলেন।

ভক্ত মানে অবশ্যই রাজস্থান গুজরাট মহারাষ্ট্র হরিয়ানা কাশ্মীর উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের গণ্ডগ্রামের চাষীরা। বাঙালীর সংখ্যা সাগরে খুবই কম, এবারে বলিও বেড়েছে মনে হল। অধিকাংশেরই পরণে রঙীন পাগড়ি, শীতের জন্য সেই একমাত্র কালো কোট বা মলমা মোটা চাদর, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, খালি পা, চোখে বিশ্বাস-কৌতূহল-ভক্তি-অ নি শ্চ য় তা-সংশয় জড়ানো দৃষ্টি। অধিকাংশেরই বোধহয় নিজের প্রদেশের বাইরে এই প্রথম পদার্পণ অনেকের ভরত নিজের মহকুমার বাইরেই এই প্রথম। সমুদ্র নদী লক্ষ দ্বীপ ভীড় ইত্যাদি দেখে এমনিতেই অবাক কাহিল, তার উপরে ঐ কালো ছাই মাখা উলঙ্গ সন্তদের মূর্তি যেন বেচারাকে একেবারে হকবাক।

আমার কাছে সবচেয়ে কৌতূহলজনক মনে হয়েছে, নাগা বাবাদের যৌনাঙ্গের প্রদর্শনী। কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে···সে আর বর্ণনা করে কাজ নেই। তাদের হচ্ছে—দেখ আর পয়সা ফেল। পয়সা পড়ছেও। বহুত ভক্তিমতীরা বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে পয়সা দিচ্ছেন। তখন দাবী হচ্ছে, আরও দাও তাঁরা ভয়ে ভয়ে আরও দিচ্ছেন। দু'একজন যৌনাঙ্গ দিয়ে নানা রকম কায়দা কসরৎ দেখাচ্ছেন এবং ডাকছেন, "আও, দেখো···"। একেবারে সেই "ডাণ্ডা কা পুল দেগো নাগিন কা মুখ দেখো" গোছের ব্যাপার।

দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজনকে দেখে মনে হল,

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পঙ্কজ ব্যানার্জী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমার প্রস্তাব মানা হল না। তবুও আমি আমার বক্তব্য সভার কার্যবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছি।

এরপর আঠারোই মতেরর গোঁহাটিতে যুব কংগ্রেস অধিবেশনের পর রাজ্যে জাপানাল এডভিকিটিতের সভা হয়। সেই সভায় প্রস্তাব রাখা হয় বিশে নভেম্বর যুব কংগ্রেসের সব প্রতিনিধিকে শিলংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে নেতৃত্ব বলেন, যুব কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না। আরও বলা হয়, যুব কংগ্রেস আলাদা সংগঠন, কংগ্রেসের থেকেও এর স্বাধীনতা ওপরে রাখতে হবে। সভার প্রতিনিধিদের শনিবের বাস, রবি করে শিলংয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার আমি বিরোধিতা করলাম। কিন্তু আমার কথা শোনা হল না। ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে অনেকেই মুখ খুললেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমি আমাদের অনেক সহীর সাহায্যে যানবাহনের সহবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে সক্ষম হই।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করি এটা কি হচ্ছে। যে সংগঠনের জন্য অনেক ত্যাগ অনেক মূল্য দিয়ে আমরা আজ এখানে পৌঁছেছি, সেই সংগঠন এই নেতৃত্বের হাতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে? সামনে নিশ্চিত সর্বনাশের প্রতিচ্ছবি দেখে ভয়-ভীতি, পদের লোভের কথা ভুলে সবাইকেই বলতে লাগলাম এ কোন নেতৃত্বের হাতে পড়লাম। সেই দিনই সিদ্ধান্ত নিলাম, আর নয় এবার উচিত কথা স্পষ্ট করেই বলব। এর জন্য সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়তেও প্রস্তুত।

আমার এই মনোভাব নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে গেল। তারা ভীষণ চটে গেলেন।

এরপর এলো রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদলের প্রশ্ন। সিদ্ধার্থবাবুকে সরিয়ে যাদের বসানোর ব্যবস্থা হলো, সেই জয়নাল বরকত সাহেবদের যোগ্যতার কথা সবাই জানে। আমি পশ্চিম-বাংলার অসংখ্য মানুষের সঙ্গে একমত যে, নেতৃত্ব পরিবর্তন করে ওদের হাতে রাজ্যের ভার দিলে ভরাডুবি অনিবার্য।

দিল্লীতে আমার নেতৃত্ব পরিবর্তন-পন্থীদের সমর্থন করার নির্দেশ দিলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। এর মধ্যে রাজ্যের স্বার্থে প্রিয় রামমূর্তী ও সৌগত রায়ের সঙ্গে আমার এবং আমাদের গোষ্ঠীর ঐক্যমত হওয়ায় ব্যাপারটা নেতৃত্ব খুব কঠোর ভাবে গ্রহণ করে।

এ মাসের দুই তারিখে আমাকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে বলা হল, তুমি আমার নির্দেশ মানছ না তোমাকে পদত্যাগ করতে হবে। আমাকে একথা জাপনাল এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে বলা হল। আমি সরাসরি বলেছিলাম পদত্যাগ করব না; পদ্ধন না হলে আমাকে সরিয়ে দিন। তারপরেই কলকাতায় চলে এলাম তারপর থেকে প্রতিদিনই অপেক্ষা করেছি কবে অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। যদিও সভানেত্রী বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি করেছেন, তবুও বলব তাঁর কোনও উপায় ছিল না।

এখন আপনি কি করবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে পঙ্কজবাবু বলেন, 'সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে পাল্টা যুব কংগ্রেস গঠন করব। পরিণতির কথা চিন্তা করি না। যে মুখ সমাজ গঠনের শপথ নিয়েছিলাম, বাংলার যুব সমাজের সাহায্যে সে কাজ অব্যাহত থাকবে।'

বাস দুর্ঘটনা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

উপায় নেই। প্রশ্ন করেছিলাম ৭৭নং বাস রুটের টাইম কীপার শ্রীঅরবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাসের লেট ফাইন সম্পর্কে। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের থেকে এক মিনিট দেরী হলে ৫০ পয়সা, দুই মিনিট হলে এক টাকা, তার বেশী হলে মিনিট পিছু এক টাকা করে লেট ফাইন দিতে হয় বাস-গুলিকে। এই লেট ফাইনের টাকা পাবে পেছনের বাস। ৭৭ নং বাস রুটে মোট ৭টি চেক পোষ্ট (সময় নির্ধারণ) আছে। যদি কোন বাস তার সময় বজায় রেখে অর্থাৎ সঠিক সময়ের আগের বাসকে অতিক্রম করে চেক পোষ্টে এসে পৌঁছায় তবে সেই বাস পাবে দশ টাকা। টাকা দেবে আগের বাস। দুর্ঘটনা কেন ঘটছে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বাসের সংখ্যা কম, অবিলম্বে যাত্রী সংখ্যার কথা চিন্তা করে বাস বাড়ানো প্রয়োজন। বাসকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীদেবানীষ মুখার্জী বললেন, যাত্রীদের সঙ্গে বাস কর্মীদের সম্পর্ক মোটামুটি ভালই তবে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা যে না ঘটে তা নয়। এতে উভয় পক্ষই দায়ী। যাত্রীদের সঙ্গে বাসকর্মীদের সম্পর্ক ভাল হোক এটাই আমরা চাই। ড্রাইভার নিজের দোষে দুর্ঘটনা ঘটায় একথা ঠিক নয়। আংশিক বাইরে চলে গেলেই ঘটে দুর্ঘটনা। তবে কেউ কেউ জোরে গাড়ী চালায় একথা ঠিক। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বাসের গতিবেগের জন্যই ঘটে। আমরা সব সময়েই চেষ্টা করব যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। বাসের সংখ্যা অবিলম্বে বাড়ানো দরকার।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

ভানুসিংহ

ফরাসী চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত ছ'টি ছবির মধ্যে প্রথম ছবি ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো পরিচালিত 'দি হিস্টরি অফ আদেলে এইচ'-এর সমালোচনা গত সংখ্যাতেই প্রকাশিত। অবশিষ্ট পাঁচটি ছবি কি বিষয়বস্তুতে আর কি আংগিক প্রকরণে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি বিশিষ্ট। তবে প্রথম ছবিটি যে পরিমাণ রসাবেদন সঞ্চারে সার্থক, তেমনটি কিন্তু পরবর্তী ছবিগুলি নয়।

কখনো দেখা গেছে বিষয় অভীতের বিষয়বস্তু—যে অতীত মহিমময় ও গরিমাপূর্ণ, কখনো কোন অভিযান-রোমাঞ্চ—যেখানে পদে পদে শিহরণ ও উত্তেজনা, কখনো বা আধুনিক সভ্যতার শিকার হয়েছে দাম্পত্য জীবনের সুখ ও শান্তি—জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সমাজ পরীয়ে, আবার কখনো এসেছে অপরাধী মনের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া, জ্ঞানবোধের চিরন্তন প্রশ্ন, শিল্পী জীবনের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। বিষয় ও বক্তব্য যাই থাকুক, প্রায় প্রতিটি ছেমেই দেখা গেছে আধুনিক প্রকরণ রীতির আঙ্গিক ও মননের ছাপ।

আরিয়ে মুঁচকিনে পরিচালিত '১৭৮১' ছবিটি নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা ও বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি-একটি এরেনায় অপেরার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবতঃই ঘটনার উত্তেজক উপস্থিতি এখানে সম্ভব হয় নি। শিল্পীদের অভিনয়, তাদের ভঙ্গী ও সংলাপ, সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মাঝখানে বিভিন্ন ভাবের রূপায়ণে, কখনো তির্যক বাঙ্গ, কখনো উদ্দাম আবেগ—সবকিছু মিলে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। ছবিটি সংলাপবহুল বলে মাঝে মাঝে দর্শকদের ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু বার্শাল স' সংক্রান্ত স্টেট জেনারেলদের সভা, বাস্তিল-এর পতন, জনগণের আতঙ্ক, ৬ই আগষ্টের যুদ্ধ ইত্যাদি দৃশ্য পর্যায় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অভিজাত সমাজের কৃত্রিমতা ও সেন্টিমেন্ট বিদ্রুপাত্মক রূপায়ণে দর্শকবৃন্দের সহর্ষ অভিনন্দন ও উৎসাহিত উল্লাস ছবিতে প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হতে হয়।

ইভস রবার্ত্রুক 'ভালুট দি আর্টিস্ট' চিত্রটি এক অভিনেতার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়, মানসিক দ্বন্দ্ব, শিল্পীজীবন ও বাস্তব জীবনের সংঘাত তথা দ্বৈত সত্তার অভিঘাত সুন্দরভাবে ফুটিয়েছে। এই ভাব রূপায়নে চিত্র-পরিচালক মাঝে মাঝে কয়েকটি আংগিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ফলে ছবিটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অভিনেতা নিকোলাস তারকা নন। এক দক্ষ শিল্পী মাত্র। তিনি অর্থো-পার্ডনের জন্য সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিসন, নাইট ক্লাবসবত্রই অংশগ্রহণ করেন। আবার দুই প্রেমি-কার সঙ্গে প্রেমলীলাও চালাতে হয়। নিজে 'লেডিমান' বলে সব কাজ মুখ্যভাবে করাও হয় না। অথচ সব কিছু সম্পন্ন করতে গিয়ে নিকোলাসের যে প্রাণান্ত-কর অবস্থা—তা যুবতেও আমাদের অসুবিধে হয় না। নায়ক চরিত্রটি অবশ্যই আকর্ষণীয়। কিন্তু মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানির নিপুণ অভিনয় সে চরিত্রটিকেও প্রাণবন্ত করে তোলে।

জ্যাকুইস এরটাউড নির্দেশিত 'দি ডেথ্ অফ এ গাইড' ছবিটিতে দেখা যায় এক গাইড ও তার সহকারী হু আমাইটির পাঁচ দিন কোন হদিস না পেয়ে এক সাংবাদিক তাদের অনু-সন্ধানে বার হন। তিনি জানতেন গাইডের আল্পস পর্বতঅভিযানের পরি-কল্পনার কথা। তাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে ছবিতে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছে। গাইডকে জীবন উদ্ধার করা গেলেও সহকারীর জীবন রক্ষা হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত গাইডটিকেও আল্পস পর্বত কিভাবে গ্রাস করল সেই কাহিনীই ছবিটির উত্তেজক পরিণতি। আল্পস পর্বতের রমণীয় দৃশ্যাবলী ছবি-টির বড় সম্পদ। সমগ্র বিষয়টি এক সাংবাদিকের দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালনার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

বেত্রো টাভিনিয়ার পরিচালিত 'দি জাজ অ্যাণ্ড দি অ্যাসাসিন' ছিটটি এক অপরাধী মনের বিশ্লেষণ ও বিচারকের মানবিক জ্ঞান ফুটিয়ে তুলে এক প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—কে আসামী আর কেই বা বিচারক? ছবির নায়ক প্রেমহীন হৃদয়া সহ্য করতে না পেরে তাকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হতে চেয়েছে। কিন্তু সে হয়েছে ব্যর্থ। তার ধারণা তার মাথায় দুটো গুলি রয়ে গেছে। অতঃপর সে জীবনে হত্যার চেয়ে মেয়ে-দের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ও পর পর হত্যা করে। সে নিজেকে মনে করে অসুস্থ, মনোরোগী। কিন্তু বিচা-রক তাকে বুঝে জান করেই গিলো-টিনের আদেশ দেন। বিচারকের কাছে নায়ক আসামী স্বকৃত অপরাধের সব কথাই অকপটে যখন বলেছিল, তখন এ হেন বিচার প্রহসনের নাম্যতার কিনা—এ প্রশ্নটাই আমাদের তুলেছেন চলচ্চিত্রকার তাঁর মননশীল চিত্র পরি-চালনায়।

সাগরে নাগা সন্ন্যাসী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছর আঠারো বয়স। সাদা গায়ে ছাইভস্ম মাখিছুকি। জিজ্ঞাসা করতে বললেন বয়স ত্রিশ বছর। আমি তাড়া দিলাম কি বাবা মান-বার পাজ নয়। বললেন সাগরেই নাকি তেইশ বছর ধরে আসছেন। নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা,কিন্তু বেশী বয়স না হলে ও বাবা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অসুবিধা। বুঝলাম আর বছর দশেক পরে জিজ্ঞাসা করলে শুনব, বাবার বয়স একশো আট বছর। বাবার নামটি ভাল—বট্ পট্ ভারতী। কেউ নাম রেখে নি, নিজেই নিয়েছেন।

আর এক নাগা বাবার কাছে অনেকক্ষণ ঘোরা-ঘুরি করলাম, আলাপ করার সাহস হল না। বাবা খৌনাজল উপরে চিতাবাঘের চামড়া ফেলে শিব-নেত্র হয়ে পড়ে আছেন, ভুঁড়ি প্রকাণ্ড। হাতে পায়ে নানা রকমের ঘালা আটি পরা। ভাবসাব দেখে মনে হল, বাবা ভোরের দিকেই গজি-কাটা অধিকমাত্রায় সেবন করেছেন। সাহস করে বাবার এক এ্যাসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি প্রথমে বললেন, বাবা হিমালয় পর্বত থেকে নেমে এসেছেন। তারপরে বললেন, হিমাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন। নামটা অত্যন্ত ঘটনট ঠিক ধরতে পারি নি। এক সাধ্বী মেয়ের তীর্থযাত্রী অত্যন্ত ভক্তিভরে বাবার পদসেবা করছেন। তিনিও বাবার নাম জানেন না।

নাগাবাবাদের মধ্যে দু'চার জন বাঙালীও আছেন। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলেন অমুক বাবা, তমুক বাবা। গভীরভাবে হিন্দীতে কথা বলেন। বাংলা ভাষাটা ইন্টের সমাজের মত ওঁদের সমাজেও কেতার বাইরে। অবশ্য কক্কনজন অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার করে ফেলেন বাড়ী মালদায় বা হাও-ড়ায়। পুলিশ এবং অন্যান্য দফলে খোঁজ খবর করলে জানা যায় নাগা বাবারা এবং অজান্ত অর্ধনাগা ও অ-নাগা সাধুবাবা যাঁরা সাগরে আসেন ওঁদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধী। বেশীর এঁরা জেলকী দেখিয়ে পয়সা রোজগার করতে আসেন। এরাদেও পুলিশ পকেট মারা এবং ঠকিয়ে পয়সা নেওয়ার অভিযোগে কয়েকজনকে ধরেছে। লক আপে গিয়ে দুজনের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজন উত্তর ভারতের লোক, আর একজন দাইমাণা কৌপীন পরা বাঙালী। দুজনই খুব বিদ্বান বিবরণ দিয়ে জানালেন, তাঁরা নিরপ-রাধ, আমার সূত্রের পুলিশ অফিসারটি খুব হাসছিলেন।

মেলা কমিটির এক অফিসার বল-লেন, মশাই এঁদের আসল রূপ দেখতে হলে মেলা সুরু হবার কয়েক দিন আগে এসে রাতে কপিল মুনির মন্দি-রের আশেপাশে একটু ঘোরাফেরা করুন। লব চেরিনিবের শার্ট প্যান্ট পরে, হাতে ঘড়ি দিয়ে, ট্রানজিসটর বাজাতে বাজাতে আসে। তারপরে প্যান্টখুলে ফেলে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

সুভাষচন্দ্র বসু এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

পঙ্কজ চৌধুরী

সুভাষচন্দ্র বসু জন্মেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের যুগে। পুঁজিবাদ বিকাশের যুগে সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কারণে সামন্তবাদ বিরোধী সেই বিপ্লবকে বলা হোত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সামন্তবাদের গর্ভে জন্মলাভ করে পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে পুঁজিবাদ ক্রমে ক্রমে সামন্ত সমাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে পরিবর্তিত করে দিত। অবশেষে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক বিরোধী বুর্জোয়া সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রচার, কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী জনগণের সাহায্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিজেদের স্বার্থে পুরনো সমাজের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বাধাগুলিকে অপসারণ করে পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিত। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৮৪৮ সালে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝপথে তাদের 'রক্তের রক্ত' কৃষকদের পরিত্যাগ করে সামন্তদের সঙ্গে আপোষ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজি রপ্তানী করে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হবার পর এমন কি স্বাধীন অনুন্নত, অধীনস্থ রাষ্ট্র এবং বুর্জোয়া শ্রেণীও সাম্রাজ্যবাদী ঋণ পুঁজি এবং লগ্নী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এরফলে সাম্রাজ্যবাদের যুগে দেখা দিল নতুন ধরনের নির্ভরশীল (dependent) এবং আধা ঔপনিবেশিক (semi colonial) রাষ্ট্র। এই সমস্ত দেশে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যস্বত্বভোগ সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষ করে বলতে শুরু করেছিল। ফলে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ এবং দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐক্য এই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিল। সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন পরাধীন দেশে এই বাধা হোল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই নির্ভরশীল, আধা ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষ করে চলার কোন পেটি বুর্জোয়া (মধ্যবিত্ত) শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরা জনগণের সংগ্রামগুলি পরিচালনা করার সঠিক কোন রাজনৈতিক লাইন ছাড়াই জাতীয় বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন।

পরাধীন আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন চীনের সান ইয়াৎ সেন এবং তুরস্কের কামাল পাশার মতই সাম্রাজ্যবাদী যুগের একজন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতা। তিনি ভারতের ব্যবসায়ী, বৃহৎ বুর্জোয়া এবং সামন্তদের প্রতাবিত কংগ্রেসে থেকেও আপোষপন্থী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক আন্দোলনই জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়—জীবনের কেন্দ্রটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না—মূলগত রূপান্তর চাই।" (মধ্যপ্রদেশে যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ১৯২৮) পরাধীন ভারতে বৃটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামের উপর গুরুত্ব দিয়ে যে কোন উপায়ে ভারত থেকে বিদেশী শাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তার জন্য তিনি যেমন ভারতে বামপন্থী সমস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে আগ্রহী ছিলেন তেমনি প্রয়োজনে বৃটিশ বিরোধী বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতেও পিছপা ছিলেন না। এই সংগ্রামী মনোভাবের জন্যই আপোষপন্থী সংস্কারবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অবশেষে সেই বিরোধ ফেটে পড়ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতের আন্তর্জাতীক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্বের সমস্যার কথা ভেবে সুভাষচন্দ্র ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সহ কংগ্রেসের ভিতরের এবং বাইরের সমস্ত বামপন্থীদের সমর্থনে দ্বিতীয় বার কংগ্রেস সভাপতির (প্রেসিডেন্ট) পদপ্রার্থী হলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পট্টভী সীতারামাইয়াকে মনোনীত করেছিলেন। শুরু হোল প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা পাল্টা বিতৃষ্ণা। সুভাষ পট্টভী সীতারামাইয়াকে পরাস্ত করে নির্বাচনে জয়ী হলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে গান্ধীজি তাঁর প্রকাশ্য বিবৃতিতে সীতারামাইয়ার পরাজয়কে তাঁর নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনের বিশুদ্ধতার প্রতি কটাক্ষ করে লিখলেন, "কংগ্রেস তত নীতিচ্যুত সংগঠনে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং তাহা এই অর্থে যে ইহার ধাতাপত্রে বিপুল সংখ্যার ভুয়া সদস্য তালিকা ভুক্ত হইয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া আমি এই সব ধাতা পত্র চালিয়া সাজাইবার কথা বলিয়া আসিতেছি। এই সব ভুয়া ভোটদাতাদের দোষে যে সমস্ত ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেককে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যে আসনচ্যুত হইবেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।" কিন্তু আমি এ প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলিতেছি না।" এখানে গান্ধীজির বিবৃতি খুবই স্পষ্ট। সেই একই বিবৃতিতে সংখ্যালঘু সুভাষ-বিরোধীদের কংগ্রেস ত্যাগ করে আসার পরামর্শ দিয়ে তিনি লিখলেন, "যতই হোক সুভাষ বোস দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাঁহার যতে তাঁহার নীতি এবং কার্যক্রমই সর্বাধিক অগ্রগামী ও দুঃসাহসিক। সংখ্যালঘুরা কেবলমাত্র ইহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাহারা যদি ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তাহাদের কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে।" (গান্ধীজির বিবৃতি, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯) গান্ধীজি ত্রিপুরী কংগ্রেসে ব্যক্তিগত ভাবে অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেস ত্যাগ না করে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন ভূমিকাকে অসম্ভব করে তুলেছিলেন।

একদিকে সুভাষের অদম্য দেশপ্রেম অথচ গান্ধীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীবাদীদের চক্রান্ত। এ রকম মতাদর্শগত সংকট তাঁর জীবনে পূর্বে কখনও আসেনি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে একদিকে অসহ্য অস্থিরতা সুভাষ অন্যদিকে 'ওয়ার্কিং' কমিটির বারোজন গান্ধীবাদী সদস্য, সাতটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মন্ত্রিবর্গের এবং জহরলাল নেহেরু। কংগ্রেসের সভাপতি-পদের বিরোধীদের চক্রান্তের ফলে সুভাষ স্বাধীনভাবে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ১৯৪০ এপ্রিল তিনি অমিয় বসুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার অসুখটা দারুণ দুর্দৈব হয়ে দাঁড়াল। ত্রিপুরীতে পরিষ্কার ভাবে আমাদের পরাজয় ঘটেছে।" ত্রিপুরী কংগ্রেসে জহরলাল নেহেরুর ভূমিকা সম্পর্কে সেই একই চিঠিতে লিখলেন, "এই সংকটের সময় পণ্ডিত নেহেরু ব্যক্তিগত ভাবে আমার এবং আমাদের আদর্শের যতখানি অনিষ্ট করেছেন তেমন আর কেউ করেনি। তিনি যদি আমাদের সাথে থাকতেন আমরাই সংখ্যার দেশী হতে পারতাম। এমন কি তিনি যদি নিরপেক্ষ থাকতেন তাহলেও সম্ভবত আমরা সংখ্যাধিক্য হতাম। কিন্তু ত্রিপুরীতে তিনি ছিলেন দক্ষিণপন্থীদের দলে।" (সুভাষ-চন্দ্র বসু : কোন পথে)

মর্মর ভাবে এক আর হয় আবেক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে দেশ জোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এদেশ থেকে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার অস্থির ভাবনায় সুভাষ বিদেশ, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন, এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসে সংকটের বেলা শুরুর দিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী ঐক্যের উপর, তখন তিনি নিশ্চয় অনুমানও করতে পারেন নি যে আর মাত্র সাতেক মাসের মধ্যেই তাঁকে কংগ্রেস ছেড়ে চলে যেতে হবে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরী কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত হোল আর মে মাসে সুভাষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর পদত্যাগের খবর শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে : লিখলেন, "অনন্যত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থেকেও তুমি আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়িষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছ। তোমার নেতৃত্বকে আমি অভিনন্দন জানাই। তাতে আমার আস্থা বাড়ল। ফ্রটিবীন এই শালীনতা বাংলাকে তার নিজস্ব আত্মসম্মানের জন্যই। বস্তুত: বাংলাকে হবে এবং এই উপায়েই তোমার আপাত পরাজয় থেকে স্থায়ী জয়ের সূচনা দেখা দেবে।" এর কিছুদিন পর আগষ্ট মাসে বৃথা দেশরক্ষা তত্ত্বের অভিযোগ এনে সুভাষকে কংগ্রেস থেকেই সাসপেণ্ড করা হোল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য না হয়েও তখন গান্ধীজিই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান নেতা। তাঁর পরামর্শ ছাড়া কংগ্রেসে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। অথচ গান্ধীজি প্রথম থেকেই ব্যবসায়ী, বৃহৎ বুর্জোয়া এবং সামন্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন আইন সংক্রান্ত কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য। সেখানেই তাঁর ধর্মীয় রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯২৫ সালে আমেদাবাদে পুরে টাটার সভাপতিত্বে আয়োজিত এক সভায় গান্ধীজি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "টাটাদের সঙ্গে আমার কি ভাবে সম্বন্ধ হোল তার একটি ছোট্ট কাহিনী যদি আপনাদের না শোনাই তবে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন আমি দেশবাসীর অধিকারের দিনে আমাদের সম্মান বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের অবস্থার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য সংগ্রাম করছিলাম তখন স্বর্গীয় স্যার রতন টাটাই সর্ব প্রথম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং এক হাজারের স্থান ২৫০০০ টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেন। আর চিঠিতে এ কথাও দিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে আরো টাকা পাঠাবেন।" (গান্ধী রচনা সম্ভার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৭৬) গান্ধীজির জীবনী লেখক টেন্ডুলকার "মহাত্মা" নামক গান্ধীজির জীবনীতে লিখেছেন যে, রতন টাটা পরে আরো ২১০০০ টাকা পাঠিয়ে ছিলেন, হায়দ্রাবাদের নিজাম একবারে দান করেছিল ২৫০০ টাকা এবং বি: মে, বি, পেটিট পাঠিয়ে ছিল ৪০০ পাউণ্ড। "The Nezam of Hyderabad subscribed Rs. 2500 to the fund, Ratan Tata gave another Rs. 25000. and Mr. J. B. Petet sent 400." (Tendulkar, Mahatma Vol. one, Page-112)

গান্ধীজি তাঁর ধর্মীয় রাজনৈতিক জীবনের সূচনাই ব্যবসায়ী, বৃহৎ বুর্জোয়া এবং সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে ভাবাদর্শগতভাবে গান্ধীজি ভারতীয় ধর্মীয় ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তী-কালে তিনি খৃষ্টান ভাবাদর্শের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহান্সবার্গ থেকে ডারবান যাবার পথে তিনি জন রাস্কিনের 'আন টু

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

অন্তরঙ্গ দেবব্রত বিশ্বাস

শঙ্কর মজুমদার

রবীন্দ্র গানের অধ্যাত্ম মাধুর্য যাঁরা গেওয়ে জড়িয়ে পড়তে পারেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও দুঃখ কম বা না থাকারই কথা। তাঁর গানে সেই স্বয়ংলোকের চাবি নিশ্চয়ই আছে যা আধুনিক জীবনের ধোঁয়ামেলা অভাব অভিযোগ বিচ্ছিন্নতা বিশৃঙ্খলের সব ধরণকে অকস্মাৎ খুলে দিয়ে শ্রোতাকে বা রসিককে করে তুলতে পারে শান্ত, সমাহিত এবং মনেপ্রাণে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রগানের শিল্পীর সংখ্যা ক্রমশই আদমসুমারীর হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছে। কলকাতা যথা বঙ্গদেশের জনজীবনের পরতে পরতে সংকট যতই দানা বেঁধে উঠছে ততই তাঁর গান গাইবার লোক, তাঁর গানের অনুরাগীতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। লক্ষণটি যে ভালো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ এতে করে বিশৃঙ্খল সমাজ মানসের ওপর হয়ত পরোক্ষভাবে কোনো আন্তর্গত বিভার উন্মোচন সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেন তাঁদের দিকে তাকাবার অবকাশ যথেষ্ট কম হলেও প্রয়োজন —প্রচণ্ড কারণ কোনো শিল্পই শিল্পীকে নির্ভর না করে সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করে না। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীরা অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এবং বিপুল সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী। তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে ফল ভাল হয় না। কারণ ছোটোখাটো পত্রিকার লোককে সময় দেবার সময় তাঁদের নেই, জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছেন অথচ সমাজের এক কোণে ম্লান সন্ন্যাসীর মত একা জীবিত, এমন শিল্পী বিরল।

'দর্পক'-এর ৩ তারক থেকে শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করতে যাবার প্রধান কারণ হল তিনি এই বিরল শিল্পীদের বিবেক একজন। রবিবারের সকাল স্বভাবতই শিল্পীর ঘরে আরও লোকজন ছিলেন। প্রথমেই উদ্যুক্ত হলাম এই দেখে যে উপস্থিত দর্পনপ্রার্থীদের মধ্যে বেশীর ভাগই বালিকা, এবং গৃহস্থ মহিলা। শিল্পী আত্মামকেদারায় বসা। আমার স্ত্রী, আমি এবং দেবব্রতর বহু ভেতরে আসতে চাইলে শিল্পী দরজে আহ্বান জানালেন। ঘরটি কিন্তু প্রচণ্ড ছোটো। অসংখ্য বই, খাতা, প্যাঁচরা, শিল্পীর খোয়ার অজোগোয, হারমোনিয়াম, রেকর্ডার, হেডিও, সম্ভবত কিছু রান্নার সরঞ্জাম—এরই মধ্যে কয়েকটা মোড়া ধরে গেলো। শিল্পীর জান পাশে দুটি আসলা। আসলার ধারে ধরে আছেন জনৈক শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, অমিতাভবাবুর বিনম্রই একলনরে আমারের পছন্দ হয়েছিল। তিনি সুজধরের মত আহ্বান করলেন—'বলুন, আপনাদের কি জানার আছে? অর্জধা উত্তর দেবেন।' শিল্পীরও একই কথা। কিন্তু কি জানবার আছে তা তো ভেবে আসিনি, আমারের তো উদ্দেশ্য ছিল দেখা এবং অবশ্যই শোনা। জানার কি আছে? দেবব্রত বিশ্বাসের মত এত বিরাট একটি ব্যক্তিকে কি জিজ্ঞেস করে বলবো কেন আপনার গান আজকাল বোম্বাসা বেসুরো বলেন, কেন বিশুদ্ধবাদী আপনাকে শ্রেণীশত্রু ঠাওরান? নাকি তাঁকে রবীন্দ্রগানের নন্দনতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিব্রত করতে শুরু করবো আসন্ন শরতের এমন এক ঝকঝকে দুটির সকাল বেলায়? অথচ আলাপ কিছুই নেই। হঠাৎ এলে 'আলোর অমল কমল' গাইতে বলতে পারিনা কারণ শুনেছি তিনি আমাদের মত কথার কারবারীদের কখনই আমল দেননা এবং এদিক থেকে তিনি নাকি কিঞ্চিৎ দম্ভেও ভোগেন।

কথা আরম্ভ করতে করতেই কিছুটা সময় বয়ে গেলো। ইতিমধ্যে শিল্পী তাঁর বাচা পান, চুন এবং গুঁড়ো খয়ের খেলেন। অন্তত দুবার আগন্তুকের প্রতিষেধক অক্সিজেন নিলেন এবং একেবারে আপাতীতভাবে বলে উঠলেন 'কি লিখবেন, আমাকে নিয়ে লেখার কি আছে? আমার এখন বাড়াবাড়া কেস করছে। ইনকমটোয়ারওয়ালারা পেছনে লাগছে। শরীর অসম্ভব খারাপ তাছাড়া বলার মতন কিছু নেই।'

সূত্র পেয়ে গেছি ভেবে বলে উঠলাম—'না, মানে আপনার অতীতের কথা, মানে আপনার সংগীত শিক্ষা ইত্যাদি—'

'অতীতের কথা কিছু মনে টনে নেই। বলতে পারবো না। শিক্ষা? মা খুব ভাল গান গাইতেন! পেটে যখন ছিলুম তখন থেকেই শিখেছি।' খুব হতাশ লাগলো শিল্পীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে। বললাম—'আপনি তো আই, পি, টি, এতেও ছিলেন; তখনকার কথা কিছু—'

'হ্যাঁ, আই, পি, টি, এতে ছিলুম। ওবে ওসব কোনো কথা নয়। আসলে গাঁইত্রিশ বছর ক্লার্ক ছিলুম। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কেরানী। অমিতাভ, আই, পি, টি, এর কথা অনেক জানে। আমার ওসব মনেটনে নেই।' অমিতাভ ঘোষ অম্লান শিগারেটের খান। সিগারেটের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হ'ল—আই, পি, টি, এতে সলিল চৌধুরী সুর করতো আর জর্জধা গাইতেন। সে সংগঠন সাংঘাতিক সাড়া জাগিয়েছিল। শিল্পী এর প্রতিবাদে বললেন—'আসল কথা তা নয়। জর্জ বিশ্বাস ভালো গান গাইতো বা গায় এটা সবাই জানে। আই, পি, টি, এর সঙ্গে এর কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। আসল কথা হল আই, পি, টি, এ একটা রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে চাইছিল দেশের মানুষের মধ্যে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেই চেতনা এক ইঞ্চিও জাগানো যায়নি। দেশের লোক: রাজনৈতিক নবজাগরণের ধার ধারে না। দেবছেন না অনসংখ্যার বৃদ্ধি? আমি এককালে ঘরেই করতাম। বাবা একদিন ডেকে বলেছিলেন, তোর কি মাথা খারাপ? সাহেবদের ভাড়াতে দেশ চালাবে কে? ওরা তো 'ডিভাইন ডিসপেনসেসন'। বাবার কথা পছন্দ হয়নি। পেখে কমিউনিষ্ট হই। সেখানেও একই অবস্থা। অফিসেও আধা রাজনৈতিক দলাদলি চিরকাল ছিল। অনেক বুঝিয়েছি দলটল করে কোনো লাভ নেই। পেখে হাল ছেড়ে দিলুম। আসলে দলফল করে এদেশে কিসহ হবে না।'

'—আই, পি, টি, এর প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের নামটা খুব মনে পড়ছে—' আমি বললাম।

'ঋত্বিক ঘটক? সে তো ফিল্ম করতো।'

'হ্যাঁ, তাঁর ছবিতে আপনার গান শুনেছি।'

'আরে মশাই ফিল্মটিল্ম বুঝি না। একদিন এক অথর এসে হাজির। শক্তিপদ রাজগুরু। তার গল্প ছবি হচ্ছে। একটা গানের সিকোয়েন্স-এ আই যোনকে গান শেখাচ্ছে। সেই গান আমাকে গাইতে হবে। আমি বললাম তোমার পছন্দ করা গান চলবে না। ভাগো। অথর চলে গেলো। তারপর ঋত্বিক এলো, সে বললে এই সিচুয়েশন। এইখানে আপনাকে গাইতে হবে। আমি বললাম গাইতে পারি যদি যে ফিমে সেখানে তাকে কিভাবে গাইতে হবে আমাকে শেখাতে দেওয়া হয়। রাজী। চলে গেলাম।'

সম্প্রতি ঋত্বিক ঘটক লোকান্তরে গেছেন। কলকাতার কয়েকমাস আগে তাঁর উৎসবে প্রথম কোমল গান্ধার দেখি। কোমল গান্ধারে শ্রীবিশ্বাস নিজেও ছিলেন। 'বিদ্রোহে আজ বিদ্রোহ চারিদিকে' এবং এবং 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি'—দুটি গানই তাঁর গাওয়া কিন্তু যে সুরে কথা চলছিল তাতে গান্ধারের কোমল পর্দা লাগানো প্রায় অসম্ভব জেনেই চলে কথায়।

'আপনি সত্যজিতের ছবি দেখেছেন?'

'দু একবার। ওবে সত্যজিৎ আমার দেশের লোক। একই সাবডিভিশন। আই অ্যাম প্রাউড অফ হিম। সিনেমা দেখা কি সহজ? যা লোক। লাইন লাগানো আমারা যারা অসম্ভব। আগে দেখতুম। মেট্রোয় হয় আনা। এখন যা লোক চারিদিকে। টিকিটই পাবো না। আগে বালীগঞ্জে পনেরো মিনিট অন্তর ট্রাম আসতো, তাও খালি। এখন মিনিটে মিনিটে ট্রাম।...তাতেও ঝুলোর না।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে মরীচা ধরে উঠেছিলাম সংগীতের প্রসঙ্গে পৌঁছবো বলে। আমাদের দলে একটি তরুণ ছিল। তার কাছে টেপ রেকর্ডার ছিল। দেবব্রতবাবুকে বললেন —'অর্জধা একটা গান হবে তো?'

'—অসম্ভব। শরীর খুব খারাপ। লাঙ্গটা বেড়ে গেছে। হার্ট এর একটুখানি কাজ করে। গান গাইলে বুকে ব্যথা হয়। নড়তে পারি না।'

কিন্তু সেই সব অলৌকিক রবীন্দ্র সন্ধ্যায় যাঁরা উপস্থিত থাকেন যেখানে 'অকারণে অকাণে মোর পড়ল যখন ডাক' বা 'আমার যেদিন ভেসে গেছে'র মত 'গানের ভেতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি'র মত সংগীত অগ্রহণ করে। আমি তো ভাগ্যক্রমে তাদেরই একজন। এসব গৃহস্থ কথায় আমার কি হবে? এসব তো শেষ পর্যন্ত আনা যাবেই। বললাম—'আচ্ছা আপনি যখন গান করেন—তখন যে আবেগটা তৈরী হয় তার অস্থানান কি আপনি চেনেন?'

'না। আমি ওসব আবেগটাবেগ বুঝি না। আমার গাওয়ার গেয়ে যাই। শ্রোতার ইমোশন এবং ইনটেলেক্ট আমার উইকেট। শ্রোতারা ব্যাটসম্যান। আর গান হল বল। দুটোর কোনটাতে ঠেকাতে পারলেই আউট। আরে মশাই, আজকাল আমি হলে আলো আলিয়ে রাখতে বলি। কেন জানেন? মজাটা দেখবো বলে। অনেকে কেঁদে ফেলে। আমি কিন্তু আমি একটা আমার খেলা। আমাকে কোনো অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করতে হয় না এই কাঁদানো হাসানোর জন্যে। তাছাড়া যদিও তা করি কি ভাবে তা করি আমি না।'

'আচ্ছা আপনি রবীন্দ্র সংগীতকেই বেছে নিলেন কেন?'

'কেন না ওটা গাওয়া সবচেয়ে সোজা। অন্য নানারকম গান আছে। সে সব শক্ত। রবীন্দ্র সংগীত গাইতে গেলে বেশী কষ্ট করতে হয় না। হাঁ একটা কথা আছে। আমি যখন গাই তখন নিজেকে কিন্তু ইনভলভ করি না। ইনভলভ করলে গান গাওয়া অসম্ভব।' ব্রেখটের নাটকের মত গানের ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতাবাদ চলে কিনা জানতে ইচ্ছে ছিল। তবে সেদিকে যাওয়া গেল না। শিল্পী বলে চললেন—'বিচ্ছিন্নতা না হলে গান হয় না। এই তো সেদিন চাকায় গেছলাম, ওখানে আমার বহু পুরনো বন্ধু ছিল যারা হামলায় কাটা পড়েছে। আমাকে সেই পুরনো আবগায় নিয়ে যেতেই আমার সব মনে পড়ে গেলো। ব্যস্। আর গান এলোই না গলায়। অনেক চেষ্টা করেও গাইতে পারলুম না। চাকা রেডিওতেও গান করা সে যাত্রা বানচাল।'

আমরা আসতে অথবা সময় বায় হয়েছে কিনা জানতে চাইলে শিল্পী সে কথার সমর্থন করলেন। বললেন —'আমি একটা মিউজিয়াম বানাবো। রবীন্দ্রনাথের যত গান নিজের মত করে আমি রেকর্ড করে নিচ্ছি। এই কাজেই গীবন যাক। রোজ সকালে রেকর্ড করি। যেদিন থাকলে শরীর খারাপ থাকে, পারি না। বিকেলে আসে। আছে। বেলা হয়ে গেলে কাক ডাকে। লোকজন এলে কথা বলতে বলতে সময় নষ্ট হয়। দাঁড়াও তোমাদের শোনাই।

(লেখাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়)

লেখাটি 'দর্পক' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সুভাষচন্দ্র বসু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দিস্ লাভ্' বইটি প্রথম পড়েন এবং পরের দিন সকাল থেকেই সেই বইয়ের নির্দেশগুলিকে নিজের জীবনে অনুশীলন করতে শুরু করেন। (দ্রষ্টব্য : পুস্তকের দ্বাদশ, প্রথম খণ্ড, গান্ধী রচনা সম্ভার) পরে তিনি গুজরাটি ভাষায় বইটির সারাংশ "সর্বোদয়" নামে অনুবাদ করে তার উপসংহারে দেখেন, "রাস্কিন তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইংরাজদের জন্য যদি একবার খাটে ভারতবাসীর জন্য খাটে হাজার বার। (গান্ধী রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮) এইভাবে গান্ধীজি খৃষ্টান ভাবাদর্শকে ভারতীয় ধর্মীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীজির উপর খৃষ্টান ভাবাদর্শের প্রভাব সম্ভা করেই হয়তো শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, গান্ধীজির মানসিক গঠনটাই ইউরোপীয়দের মতো, তাই সম্ভবত তিনি ভারতীয় দর্শনের ভাবধারাকে বুঝতেন না এবং তিনি সবকিছুকে একটা আচরণগত নীতি নিয়মে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। এইভাবে কোন কিছু নীতি নিয়মে পরিণত করাটা শ্রীঅরবিন্দের মতে ইউরোপীয় ঝোঁক ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলতেন, গান্ধীজি সেই ইউরোপীয় ঝোঁকগুলিকে কেবল ভারতীয়-করণ করে নিয়েছিলেন। "As I say the whole turn of his mindislike that of the European. I doubt if he ever had the grasp of the ideas of Indian philosophy. Besides the whole turn of his mind is vital—always tries to put things into life and make a rule of it. That again is the European tendency—everything to be turned into a code, a rule. Only be put it in Indian terms." (Aurobindo : Evening talks. A. B. Purani).

জহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে গান্ধীজি সম্পর্কে লিখেছেন, "বহুবর্ষ ধরিয়া ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার সন্দেহ হয় তাঁহার নিজের ধারণাও স্পষ্ট কিনা। তিনি বলেন, আমার পক্ষে একপদ অগ্রসর হওয়াই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না অথবা কোন মুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করেন না। তোমরা উপায়ের উপর দৃষ্টি রাখ উদ্দেশ্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতে তিনি ক্লান্ত হন না। তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ভাল করিয়া তোল আর সব আপনা হইতেই হইবে। ইহা রাজনৈতিক অথবা নৈতিক মনোভাব নহে কিম্বা সম্ভবত নৈতিক মনোভাবও নহে। ইহা অতি সংকীর্ণ নীতিবাগীর কথা এবং ইহাতে একই প্রশ্ন মুহিয়া ফিরিয়া আসে। সাধুতা কি? ইহা কি কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার না সামাজিক ব্যাপার? গান্ধীজি চরিত্রের উপর বেশী জোর দেন, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন ও পরিপুষ্টিকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। চরিত্র ব্যতীত বুদ্ধি বিপদজনক হইতে পারে কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিলে চরিত্রের মূল্য কি? কি ভাবে চরিত্র গড়িয়া ওঠে? গান্ধীজিকে যথাযুগীয় খৃষ্টান সাধুদের সহিত তুলনা করা হয়, তাঁহার অনেক কথা উহাদের সহিত মিলিয়া যায়; কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও উপায়ের সহিত উহা সামঞ্জস্যহীন।" (জহরলাল নেহেরু, আত্মচরিত : অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃঃ ৪১৬) জহরলাল নেহেরু কোনদিনই প্রকৃত অর্থে গান্ধীবাদী ছিলেন না। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং দর্শন সবক্ষিত্রে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পার্থক্যই ছিল প্রধান। তিনি তাঁর আত্মচরিতে সে কথা বহুবার বলেছেন। এমন কি ১৯২৪ সালে গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা হয়েছিল, "ইচ্ছামত কার্য করিবার বাধা উপস্থিত হইলে গান্ধীজি নিয়মতন্ত্রকে কদাচিৎ মর্যাদা দিয়া থাকেন", (পৃঃ ১০১) সে কথাও তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন। অথচ জহরলাল নেহেরু কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ১৯২১ সালে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি নিজেকে এসম্বন্ধে স্পোনসিষ্ট রিপাবলিকান বলে ঘোষণা করেন, গান্ধীজির ট্রাষ্টীশিপ বা অছিনীতিকে সমালোচনা করেন, এবং দাসত্ব কথার থেকেও যে হিংসা শ্রেয় সে কথা বলেন। আবার ১৯৩০ সালে গান্ধীজির অসহন সংক্রান্ত বিধির জবাবে লিখেছিলেন, "আপনার পত্র পাইলাম। যে বিষয়ে আমি বুঝিনা, সে সম্বন্ধে কি বলিব? আমি যেন অজ্ঞতাবশে হাওয়ায় গিয়াছি, সেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আর আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া অগ্রসর হইতেছি কিন্তু পদস্খলন হইতেছে। যাহাই ঘটুক, আমার অনুরাগ ও চিন্তা আপনারই অভিমুখীন হইয়া রহিল।" (ঐ, পৃঃ ৩০২)

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে পরাধীন ভারতবাসীকে পরিচালনা করার গান্ধীজির নিজস্ব একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক লাইন ছিল। কিন্তু জহরলাল নেহেরুর নিজস্ব কোন বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক লাইন ছিলনা। তিনি গান্ধীজির ধর্মীয় লাইনকেও সঠিক বলে মনে করতেন না। অথচ যে কোন রাজনৈতিক সংকটে গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রতি তিনি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। ১৯৩৪ সালে জহরলাল নেহেরু সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন, "নেহেরুর ধ্যান ধারণার বেশীটাই আমাদের পক্ষে। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ কয়েদ গান্ধীকে। তাঁর মাথা তাকে একদিকে টানে, তাঁর হৃদয় টানে অন্যদিকে। তাঁর হৃদয় গান্ধীর দলে।" (Nehru's ideas are more in our favour. But in action he gives full support to Gandhi. His head pulls one way and his heart in another direction. His heart is with Gandhi. Letter to Mrs. Kitty Karti 1934) জহরলাল নেহেরুর নিজস্ব কোন বলকারখানা ছিল না। কোম্পানীর কেনা শেয়ার থেকে তিনি যে লভ্যাংশ পেতেন তাতে তাঁর জীবন নির্বাহ হোত না। তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন, "আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিবার পর আমার বস্তুতঃ কোন আয়ই ছিল না। শেয়ার হইতে যে মুনাফা আসিত তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।" (আত্মচরিত, পৃঃ ৮৫) এই কারণেই ১৯২৪ সালে তিনি যখন কংগ্রেসের একজন সাধারণ সম্পাদক তখন সাধারণ সম্পাদকদের বেতন দেবার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। তথাপি তিনি তাঁর নিজের শ্রেণী সম্পর্কে লিখেছেন, "আমার রাজনীতি আমার শ্রেণীর অর্থাৎ—বুর্জোয়া রাজনীতি।" (ঐ, পৃঃ ৩৮) এবং তিনি তাঁর মানসিক গঠনের জন্য ইংলণ্ডের নিকট ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমার মানসিক গঠনের জন্য আমি ইংলণ্ডের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী।" (ঐ পৃঃ ৩৪০) তিরিশের দশকে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "রাশিয়ার সমাজ গঠনের পরীক্ষা কার্যগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতার দ্বারা মার্কসবাদের কোন অপচয় ঘটে না।" (ঐ, পৃঃ ৪৮৮) ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "সোভিয়েত রাশিয়া যা করেছে তার জন্যই ভবিষ্যতের উপর আস্থা রাখা যায়। আমি নিশ্চিত যে যদি কোন বিশ্ব দুর্যোগ না ঘটে তবে এই নতুন সভ্যতা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়বে এবং পুঁজিবাদী যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অবসান ঘটাবে।" (If the future is full of hope it is largely because of Soviet Russia and what it has done, and I am convinced that, if some world catastrophe does tot intervene, the new civilization will spread to other lands and put an end to the wars and conflicts which capitalism feeds. Jawaharlal Nehru, Presidential address-1936) কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের ভূমিকা দেখে তিনি হতাশ হয়ে লিখেছিলেন, "রুশ-জার্মান চুক্তি, রুশ ফিনল্যাণ্ড অভিযান, জাপানের সহিত বৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা—এই জগতে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোন নীতি কি আছে? না সবই সুবিধাবাদ?" (পাঁচছত্র পর, আত্মচরিত)

জহরলাল নেহেরু ১৯৪০ সালে যখন একথা লেখেন তখনো কিন্তু রাশিয়া বৃটেন ফ্রান্স ও আমেরিকার মিত্র পক্ষে যোগদান করে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র বসু একটি চিঠিতে জহরলাল নেহেরুকে লিখেছিলেন, "বৈদেশিক নীতি ব্যতব বৃদ্ধিতে চালিত হয়। সে নীতি নির্ধারণে জাতির নিজস্ব স্বার্থের দিকটাই প্রধান। যেমন ধর স্তোভিয়েত রাশিয়া। তার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যতই কমিউনিজমের মাপই থাক, বৈদেশিক নীতিতে যে কখনও ভাবাবেগের প্রাধান্য দেয় না। সেই জন্য সে নিজের প্রয়োজন যখনই বুঝেছে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনি। ফ্রাংকো স্তোভিয়েত চুক্তি এবং চেকোস্লোভাক স্তোভিয়েত চুক্তি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমন কি স্তোভিয়েত রাশিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মেলাতে উদ্যত।" (কোন পথে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হোল আর ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। রাশিয়া যোগদিল বৃটেন-ফ্রান্স ও আমেরিকার মিত্র পক্ষে। জহরলাল নেহেরুর মত সুভাষচন্দ্র বসু মার্কসবাদী ছিলেন না এবং তিনি রুশ সমাজতন্ত্র অনুকরণ করারও বিরোধী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সুভাষ ১৯২৭ সালে কলকাতার যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, "আপনারা হয়তো জানেন যে রাশিয়াতে যে বলশেভিজম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সহিত Marxian Socialism এর দিল যতটা আছে পার্থক্য তাহা অপেক্ষা কম নয়.....আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ আমার মনে হয় যে Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একইভাবে রূপায়িত না হইয়া সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এইসব কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে আমি অন্যদেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী। পরাধীন ভারতে যদি কোনও 'ism' গ্রহণ করিতে হয় তবে তাহা Nationalism." (তরুণের স্বপ্ন)

বলশেভিকবাদ এবং মার্কসবাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর একথা ঠিক। তা বলে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের স্তর বিবেচনা না করে সমাজতন্ত্র একইভাবে উদ্ভব এবং পল্লবিত দেশে প্রতিষ্ঠিত কোরতে হবে এমন কথা মার্কস-এঙ্গেলস কোথাও বলেন নি। ১৮৪৭ সালে কমিউনিষ্ট ইশতেহারে তাঁরা লিখেছিলেন, "কমিউনিষ্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি মোটেই এমন কোন ঘুলীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা বিশেষ কোন ভাবী বিশ্ব সংস্কারকের রচনা বা আবিষ্কার। যে শ্রেণী-সংগ্রাম, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন আমাদের বিভের চোখের সামনে বর্তমান তা থেকে বাস্তব যে সম্পর্কগুলির উৎপত্তি কমিউনিষ্ট তত্ত্ব কেবল তাকেই সাধারণ সূত্রাকারে প্রকাশ করে। প্রচলিত মালিকানা সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের একাত্ত বৈশিষ্ট্য নয়।" প্রতিটি দেশের সমসাময়িক কালের প্রভাব যাদব শ্রেণী-সংগ্রামের অবস্থার ভিত্তিতেই যে রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে এ কথা মার্কস-এঙ্গেলস ইশতেহারে স্পষ্ট করেই বলেছেন। ১৮৮৮ সালে কমিউনিষ্ট ইশতেহারের ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় কমিউনিজমের মূলনীতির প্রয়োগ সম্পর্কে এঙ্গেলস আরো স্পষ্ট করে লিখেছিলেন, "সর্বত্র এবং সব সময় মূলনীতিগুলির প্রয়োগ নির্ভর কোরবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, ইশতেহারের ভিতরেই সে কথা রয়েছে।"

জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। মার্কসবাদীদের মতে প্রতিটি দেশে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকৃত বিকাশ ছাড়া সমাজে

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

Regd. No. WB/CC-32

PRICE 40 Paise

বাস দুর্ঘটনার ময়না তদন্ত

কল্যাণ ঘোষ

'ভাল' এবং 'অ্যাভিডেন্ট' কথা দুটি নাকি আমাদের অজ্ঞাতেই বহিঃপ্রকাশ। আমরা যখন কোন ঘটনার কারণ খুঁজে পাই না অথবা খুঁজে পেলেও প্রকাশ করতে চাই না, তখনই সেটাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে অপর হই। প্রতিটি ঘটনায় পেছনেই কারণ আছে এবং থাকে, বাস দুর্ঘটনার পেছনেও আছে। তবে সেই ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করব কেন?

গত ১১ই জানুয়ারী বসিরহাট-বাসনবাদ জাতীয় সড়কে ঘটে গেল রাজ্যের বৃহত্তম বাস দুর্ঘটনা। নিহত হয়েছেন ৩৪ জন নিরীহ যাত্রী, আহত ত্রিশেরও অধিক। ১২ ঘন্টার যাবতীনে ২৪ পরগণার সৈলানে আবার এক বাস দুর্ঘটনা ঘটল। এবার নিহতের সংখ্যা তিন এবং আহত অনা চল্লিশেক যাত্রী।

আমাদের দেশ গরীব বলে কি হবে বলীর বেশ আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা এগিয়ে যেতেই চলেছে। বসিরহাট বাস দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজ্য সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অনুও কি আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, এ ধরনের বাস দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না? না, এ নিশ্চয়তা কেউ দেবে না, বড় জোর যাত্রীসাধারণকে শোনানো হবে যে, দুর্ঘটনা এড়াবার চেষ্টা করা হবে। যান দুর্ঘটনা কেন ঘটে তার কারণ কম বেশী সবারই জানা আছে। এবেছু যান যানেই বয়ে নেয়েছু যাত্রী বহনের আগে তার শক্তি সামর্থ্য পরীক্ষা করে দেখা অপরিহার্য। অবিকাংশে ক্ষেত্রেই যাত্রীবহনকারী যানের এবং যানের সেই ফিটনেস সার্টিফিকেট থাকে না কিংবা সেগুলি পড়ুয়াঘরে পৌঁছাবার মত কর্মক্ষম নয়। যাত্রীদের জানার উপায় নেই কিন্তু মালিক চালকদের একথা অজানা নেই যে, ঐ ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া গাড়ী চালানো স্রেফ বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো। তাছাড়াও আরও একটি কারণ আছে, যাত্রীসংখ্যার তুলনায় বাসের সংখ্যার অপ্রতুলতা। সেই কারণেই বাসে যাত্রীর ভীড় হয় প্রচণ্ড। লেখা থাকে কেবল '৩৫ জন বসিবেক' কিন্তু এক একটা বাস তার তিন চার গুণ যাত্রী বহন করে থাকে। প্রতিটি যানের বহন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষে আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু সে নিয়ম মানছে কে? না যাত্রী, না যান। তাই বহনক্ষমতার বেশী যাত্রী নিয়ে বিপদেও পড়তে হয়। এখানে অবশ্য দায়িত্ব যাত্রীদেরও রয়েছে, কিন্তু অল্পকা কাজকর্মের জন্য যাদের বাসের পরপাপর হতে হয় তাদের সামনে বিকল্প পথই বা কী আছে? কাজেই নিরুপায় যাত্রীরা বাস মালিক মরুক বাঁচে নিজেদের প্রাণ বন্ধক রেখে যাতায়াত করেন। বিশেষ করেও বহু ক্ষেত্রে চাকরী পাঁচাতে বা রোজগারের ধান্দায় ঘরে চাপতেই হয়। এর ওপর রয়েছে বাসের তীব্র গতিবেগ। বাসগুলির বেপরোয়া গতিবেগ দেখে মনে হয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে এবং তার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট যানের গতিবেগ।

কিন্তু প্রতিটি দুর্ঘটনাই ইচ্ছাকৃত একথা আমরা বলতে চাই না, কিন্তু বলব এতথাই যে, দুর্ঘটনার অধিকাংশগুলিই কিন্তু অনিবার্য ছিল না। একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেই বহু দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বা যায়। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার বা প্রাণহানি ঘটার পর তার কারণ অনুসন্ধান মামলা তদন্তেরই সামিল, কিন্তু তাতে কি মৃত ব্যক্তির জীবন ফিরে আসবে? রাজ্য সরকার এখনই যা করতে পারেন তা হল বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি, ফিটনেস সার্টিফিকেট পরীক্ষা ব্যাপ্তামূলক করা, গতি সীমিত করা, নির্দিষ্ট যাত্রীর বেশী যাতে না নেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। এতে হয়ত রাজ্য সরকারের ব্যয় একটু বাড়বে, কিন্তু মানুষের জীবনের চেয়ে সেটা নিশ্চয় বেশী নয়।

আমরা জানি বাসের ছাদে যাত্রী তোলা বেআইনী। কিন্তু কেউ যদি ছাতলা আমতা নাইবের সিনের চেহারা দেখেন, তাহলে দেখবেন, বাসগুলির প্রতিটিই ভরল ডেকার। আইন থাকা সত্ত্বেও সেখানে ছাদে যাত্রী তোলা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

রোজ বেহালা থেকে ডায়মণ্ডহারবার যাতায়াত করেন ৭৬ নং বাসের জীবেন্দ্রত মুখার্জী। তাঁকে এক করে-ছিলাম বাসের গতিবেগ সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমি বুড় কর্পোরেশনের কর্মী, তাই, চাকরী সূত্রে আমাকে রোজই প্রাণ হাতে করে বাসে যাতায়াত করতে হয়। বাস এত জোরে চলে, যে কোন মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথচ প্রতিবাদ করার কোন

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সুভাষচন্দ্র বসু

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকৃত বিকাশ ঘটতে পারে না। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পূর্ণ বিকাশের পথে কেবল কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের সঠিক বিকাশ ঘটতে পারে। কমিউনিষ্ট ইশতেহারে মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছেন, "সেহনতীদের দেশ নেই। যা তাদের নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির পরিচালক শ্রেণীর পদে উঠতে হবে, নিজেকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতি, যদিও কথাটির বুর্জোয়া অর্থে নয়।" ১৮৭৯ সালে কমিউনিষ্ট ইশতেহারের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস আরো পরিষ্কার করে লিখলেন, প্রতি জাতির স্বাতন্ত্র্য শাসন ও ঐক্য পুনরুদ্ধার না করে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক মিলন অথবা এই সব জাতির প্রলেতারিয় লক্ষ্যে বিপ্লোচিত, শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা অসম্ভব।" কিন্তু এ সবই হোল সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের পূর্ববর্তী সময়ের কথা। ১৯১৪ সালে লেনিনই প্রথম বললেন, "কেবল মাত্র ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি নয়, উদাহরণ স্বরূপ, এমন কি রাশিয়ার মত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্মী পুঁজির শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।" (জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার) এই ভাবে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু তার অনেক পূর্বেই আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং দেশপ্রেমের বিরোধিতা করে রাশিয়ার বলশেভিকরা রুশ বিপ্লবের রণনীতি এবং রণকৌশল নির্ধারণ করেছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা না করেই যে বলশেভিকবাদ গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের কোন পথনির্দেশ ছিল না, অথচ লেনিনের মৃত্যুর পর লেনিনের নামটিকে মার্কস-এঙ্গেলসের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর অনাদরকে মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে স্তালিন আলাদাভাবে লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব কারণেই পরাধীন ভারতে সুভাষচন্দ্র বসু যে দেশপ্রেমিক নেতাদের মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হবার ফলে গান্ধীবাদের বিরোধী কোন কার্যকরী মতাদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি। একই কারণে বোধহয় সাম্রাজ্যবাদের যুগে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি তার পথনির্দেশের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদের সঙ্গে মাও সে তুং চিন্তাধারাকে যুক্ত করে দিয়েছে।

অন্তরঙ্গ দেবব্রত বিশ্বাস

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তাপোষের তলা থেকে সাবধানে বার করা হল অজস্র ক্যাসেট। রেকর্ডারের মধ্যে একটি ক্যাসেট পুরে সিটিও সাউণ্ড বক্সের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে শিল্পী বললেন আমার গানের যে সংগ্রহ তৈরী করছি তার একটা ভূমিকা আছে। সেইটা শোনো।

বজ্রকণ্ঠে মেঘে উঠল দেবব্রত বিশ্বাসের সংগীতের জগতে আবির্ভাবের কাহিনী। সত্যেন সেনগুপ্ত প্রথম ওঁকে রেকর্ড করতে অনুরোধ করেন। ওঁর প্রথম গান 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজের অপরাধ—'। দ্বৈত সংগীত। কমল দাসের সঙ্গে। গান আরম্ভ হবার আগেই টেপ বন্ধ হয়ে গেল। বললাম, 'কি হল পাবটা।'

'আমরা কি ডুববে? সঙ্কোচের বিহ্বলতা—'

পেড়াপিড়িতে গানটা শোনালেন। অপূর্ব গান। কিন্তু রেকর্ড তো, মন ভরল না। বললাম—'কণ্ঠে কিছু সত্যি ডুববো না?' স্পষ্ট উত্তর। 'না। শোনালে রটে যাবে। ব্যাপারটা সংক্রামক। যদি একবার চাউর হয়ে যায় যে মেঘলত বিশ্বাস বাড়ী গেলেই গান করেন, তাহলে আর যজে যেই।' শ্রীবিশ্বাসের ঘরে যাত্র দুটি ছবি। একটি ব্যক্তিগত, অন্যটি সাঁইবাবা। সাঁইবাবা আজকের বলকাতার অবতীবসের সঙ্গে যে যে কারণে যুক্ত তার একটি মনে হয় যান। ওঁর ভজনগুলি সংগীতের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সাঁই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে শিল্পী কণ্ঠীর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন—'একজন কানাডা থেকে এই ছবি আমাকে এনে দিয়েছে। সে আমার গান খুব শোনে। সেই চাঙিয়ে দিলে। ধর্মটর্ম আমার আসে না। আমার গানেও অনেকে অশান্তির আনন্দ পায় বলে চিঠি লেখে। আমি আধ্যাত্মবাদ বা অশান্তির আনন্দ বুঝি না। গান গাইলে লোকের ভাল লাগে। ওইটেই যথেষ্ট। আমার অহঙ্কারীর লক্ষ্যা অজস্র। আর কি চাই।'

দেবব্রত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী সম্প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ওঁদের বক্তব্য হল লোকটি রবি ঠাকুরকে ঠকাচ্ছে তার সুরের বিকৃতি করে। এ প্রসঙ্গ আজকের সাক্ষাৎকারে আসা উচিত কিন্তু শিল্পী নিজেই একটি চূড়ান্ত ঘটনা শোনালেন। বাইশে শ্রাবণ ওঁকে টেলিভিশনে ডাকা হয় আধ ঘণ্টার একটি প্রোগ্রামে। উনি যান। কয়েকটি গান করেন। কিন্তু সে গান নাকি এত অন্যোগ্য হয় যে, যে মহিলা ওঁকে এই আমন্ত্রণ পাঠান অতিরিক্ত ওঁর চাকরী খেতে বসে। শ্রীবিশ্বাস এই খবর পেয়ে টেলিভিশনের অধ্যক্ষকে ব্যক্তিগত পত্রে মেয়েটির প্রতি সদয় হতে অনুরোধ জানান। মেয়েটি তারপর ওঁকে এই সাহায্যের জন্য পত্র লিখে ধন্যবাদ দেয়। পত্রটি শ্রীবিশ্বাস আমাদের পড়ে শোনালেন। চলে আসবার সময় মনে আসছে আমার ওনার গানের মাধুর্যের বিষয়ে ওনার মুখ থেকে আরও কিছু শুনতে চাইলাম। শিল্পীর সামনে একটি ছোট্ট মেয়ে বসেছিল। হঠাৎ তাকে বললেন—'কোন স্কেল?'

'কি'—

হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে শিল্পী আঙাতে লাগলেন। মেয়েটি গাইল—আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে, কি এনেছিল বল?—

আমি, আমার স্ত্রী, দেবব্রতবাবুর এবং উপস্থিত সকলে এবং সম্ভবত সারা বিশ্ব এমন গান হয়ত শুনতে পাবে না। এ যে কোন নিখিল প্রাবিদ করা গান আমি না। শিল্পী আমাদের স্তম্ভিত হয়ে যেতে দেখে বললেন—'বলতো? আর কিছু বলার আছে? এইটুকু মেয়ে কি আপনার মনের ভাবটুকু বোঝে? কি করে গাইল তাহলে?'—ঠিক সত্যবাদ। বাইরে তখনও শ্রাবণের বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। বলতে বিধা নেই পথে নেমে মনে হলো দেবব্রত বিশ্বাসের একাকীত্বের মুখোশ নিয়ে আজ এত কথার পাহাড় না সাজালেই বুঝি ভাল করতাম।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীরালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ সট সেন রলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত